শুকতারা-র

১০১ গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প

ছোটদের কাছে গেয়েন্দা গল্প আর রহস্য গল্পের মতো আকর্ষণীয় জিনিস আর নেই। জমজমাট একখানা গোয়েন্দা গল্প কি গা-ছমছম রহস্য গল্প পেলে তারা নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। শুধু কি ছোটরা! ছোটদের হাতে গল্পের বই দেখলে যাঁরা ধমক দেন, লুকিয়ে তাঁরাও সেই বই নিয়ে মশগুল হয়ে যান। এমনই নেশা এসব গল্পের।

এক-এক সময় এক-এক গোয়েন্দার কদর হয়। কখনও জয়ন্ত-মাণিক, কখনও ব্যোমকেশ বক্সী, কখনও ফেলুদা, কিন্তু এরা ছাড়াও আরও অনেক শখের গোয়েন্দা আছে, গোয়েন্দা গল্পের জাদুকর অনেক লেখকও আছেন। একই কথা বলা যায় রহস্য গল্প সম্বন্ধে। এক-এক ধরনের রহস্য গল্পের এক-এক রকম রোমাঞ্চ। এ জাতীয় গল্পের কয়েকজন দুর্ধর্ষ লেখকও ছিলেন। 'শুকতারা' পত্রিকায় দীর্ঘ চৌষট্টি বছর ধরে এরকম রুদ্ধশ্বাস গোয়েন্দা গল্প আর রোমাঞ্চকর রহস্য গল্প বেরিয়েছে প্রচুর, সেগুলো থেকেই অত্যন্ত যত্ন করে বেছে বেছে সেরা একশো একটি গল্প এখানে জড়ো করা হয়েছে। লেখকদের মধ্যে যেমন আছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ রাহা, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ সান্যাল, লীলা মজুমদার বা আশাপূর্ণা দেবীর মতো লেখক, তেমনি আছেন একালের মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অদ্রীশ বর্ধন, অজেয় রায়, শক্তিপদ রাজগুরু, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায় বা হিমানীশ গোস্বামীর মতো বাঘা বাঘা লেখক।

এক সময় যে সব গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প পাঠকদের চমকে দিয়েছে, সেইরকম একশো এক গল্পকে হাজির করা হয়েছে তোমাদের জন্যে। সাবধানে পড়তে হবে, একবার ধরলে কিন্তু এ বই ছাড়া যাবে না!

ISBN: 978-93-5060-002-3

শুকতারার ১০১

গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প

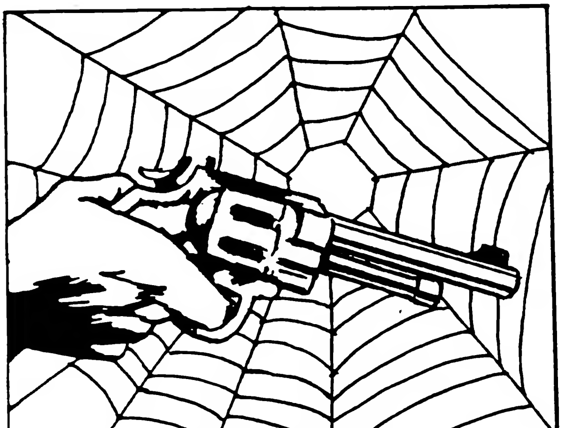

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

SUKTARAR

101 GOENDA O RAHASHYA GALPA

(A collection of 101 crime and detective stories)
Code No. 87 S 28
ISBN 978-93-5060-002-3
Price : Rs. 250·00

Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd.
21 Jhamapukur Lane, Kolkata- 700 009
Tel : 2350-4294/4295/7887

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, জানুয়ারি ২০১২, মাঘ ১৪১৮
পুনর্মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর ২০১২, পৌষ ১৪১৯
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে শ্রীঅরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার কর্তৃক বি. পি. এম'স প্রিন্টিং প্রেস, রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে মুদ্রিত। বর্ণ সংস্থাপন ঃ বীণাপাণি প্রেস, ১২/১এ বলাই সিংহ লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদ ঃ গৌতম দাশগুপ্ত

দাম ঃ ২৫০·০০ টাকা

ভূমিকা

ছোটদের পত্রিকা হিসাবে 'শুকতারা'-র একটি বিশেষ স্থান আছে। একসময় 'শিশুসাথী' আর 'মৌচাক' পত্রিকার যখন ছিল জয়-জয়কার, সেই সময় এর সঙ্গে পাল্লা দিতে এসেছিল 'শুকতারা'। শুধু পাল্লাই যে দেয়নি, দীর্ঘকাল সুনামের সঙ্গে টিকে গেছে, তার প্রমাণ তার চৌষট্টি বছরের জয়যাত্রা। মধ্যে অনেক পত্রিকার জন্ম হয়েছে, সুনামও অর্জন করেছে, কিন্তু এরকম দীর্ঘ স্থায়িত্ব তারা লাভ করতে পারেনি। অনেক পত্রিকাই লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় হয়েছে, কিন্তু 'শুকতারা' দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে চলেছে, আজও।

'শুকতারা' পত্রিকার হরেক আকর্ষণ, কিন্তু অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এর গল্প। অত্যন্ত সন্তর্পণে সেই সব গল্প থেকে ভূতের গল্পগুলি বেছে নিয়ে আমরা গত বছর একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলাম। সেই বইয়ের প্রভূত জনপ্রিয়তাই আমাদের উৎসাহিত করেছে এই ধরনের আর একটি বইয়ের সংকলন করতে। ভূতের গল্পের মতোই কিশোরদের কাড়াকাড়ি করে পড়ার মতো গল্প হল গোয়েন্দা গল্প। সেকালে হেমেন্দ্রকুমার রায় থেকে শুরু করে অনেকেই ছিলেন গোয়েন্দা গল্পের জাদুকর, একালেও দক্ষ গোয়েন্দা গল্পের লেখক নিতান্ত কম নেই। গেয়েন্দা গল্প ছাড়াও বিচিত্র ধরনের রোমাঞ্চকর রহস্য গল্প প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকায়। একসময় সেই সব গল্প কেবল ছোটদের নয়, বড়োদেরও টানতো সমানভাবে। সেই কারণে আমরা এবার উৎসাহিত হয়েছি ১০১ গোয়েন্দা ও রহস্য গল্পের সংকলনে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, এরকম একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। ঐতিহ্যশালী পত্রিকা 'শুকতারা'-য় একসময় লিখেছেন গোয়েন্দা ও রহস্য গল্পের দিকপাল সব লেখক। তাঁরা যখন প্রবীণ হয়েছেন তখন উদীয়মান কিছু লেখক এসে কিশোরদের মন জয় করে নিয়েছিলেন—আজ তাঁরাও অনেকেই প্রবীণ। বর্তমান নতুন প্রজন্মের কিছু লেখক এখন আসর জাঁকিয়ে বসেছেন, ছোটদের কাছে তাঁরাও এখন খুব জনপ্রিয়। আমাদের গল্প বাছাই করতে হয়েছে এই তিন প্রজন্মের লেখকদের রচনা থেকে। এর পরেও একটি কথা আছে, দীর্ঘ চৌষট্টি বছরের জনপ্রিয় পত্রিকায় যেসব লেখক গল্প লিখেছেন, তাঁরা অনেকেই নিয়মিতভাবে লিখেছেন। অর্থাৎ একদিকে যেমন তিন প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে বেছে নিয়ে একটি সংকলনগ্রন্থ করা কঠিন ব্যাপার, তেমনি তাঁদের প্রচুর লেখার মধ্যে সেরা লেখাটি নির্বাচন করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। সেকালের ও একালের যেসব লেখদের আমরা এই সংকলনে রেখেছি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাম—হেমেন্দ্রকুমার রায়, যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ধীরেন্দ্রলাল ধর, সুধীন্দ্রনাথ রাহা, নীরদচন্দ্র মজুমদার, মুরারিমোহন বিট, শৈলেশ ভড়, মহাশ্বেতা দেবী, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, আশাপূর্ণা দেবী, স্বপনবুড়ো, লীলা মজুমদার, নারায়ণ সান্যাল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

এরকম একটি দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করা একার পক্ষে সম্ভব নয়, বিভিন্ন ব্যাপারেই আমরা বিভিন্ন মানুষের শরণাপন্ন হয়েছি। এঁদের সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। তবে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে সাহিত্যিক শ্রীরূপক চট্টারাজের কাছে। এই সংকলনের কাজে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমাদের অনেকেরই শ্রম এবং উদ্বেগ জড়িত আছে এই গ্রন্থের সঙ্গে, যাদের জন্য এত শ্রম এই বই তাদের মনের মতো হলেই আমাদের এই উদ্যোগ সার্থক হল মনে করব।

প্রকাশকের নিবেদন

বিগত বছরে 'শুকতারা' পত্রিকার নির্বাচিত ১০১ ভূতের গল্পের সংকলন যখন আমরা প্রকাশ করি তখনই আমাদের পরিকল্পনা ছিল, এই পত্রিকায় প্রকাশিত গোয়েন্দা ও রহস্যের সমসংখ্যক গল্প নিয়ে আর একটি সংকলন প্রকাশ করবার। কারণ ভূতের গল্প কিশোর পাঠকদের খুবই প্রিয় সন্দেহ নেই, কিন্তু গোয়েন্দা গল্পের জনপ্রিয়তাও নিতান্ত কম নয়—কিশোর পাঠক তো বটেই, তাদের অভিভাবকরাও এসব গল্প উপভোগ করেন বলে আমাদের প্রচুর চিঠিপত্র দিয়ে উৎসাহিত করেন। এছাড়া বিশেষত আগেকার দিনে হাড়-হিম-করা রোমাঞ্চ গল্পেরও কয়েকজন জাদুকর ছিলেন, তাঁদের বেশ কিছু গল্প আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সব গল্প আমরা একসঙ্গে সাজিয়ে দিয়েছি যাতে আজকের পড়ুয়ারা সেসব গল্পের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং বয়স্ক পাঠকের পুরনো স্মৃতি উজ্জীবিত হয়।

দীর্ঘদিন ধরে 'শুকতারা' পত্রিকায় যেসব গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প পাঠকের মন রোমাঞ্চিত করেছে, এখনও কিশোরদের মনে যাঁরা এ জাতীয় গল্পের আকর্ষণ জাগিয়ে রেখেছেন প্রাচীন ও নবীন লেখকদের সেই সব গল্পের একটি আকর্ষণীয় সংকলন হয়ে উঠেছে এই গ্রন্থ। এইরকম একটি সংকলন করতে গেলে গল্প নির্বাচন, সংগ্রহ, তার আকর্ষণ অনুযায়ী বিন্যাস ইত্যাদি কাজ অত্যন্ত দুরূহ। অনেকেই এ কাজে আমাদের সাহায্য করেছেন কিন্তু এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পেয়েছি কবি ও সাহিত্যিক শ্রীরূপক চট্টরাজের কাছ থেকে। তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

১০১ ভূতের গল্পের সংকলন কিশোর পাঠকদের মধ্যে যেভাবে আলোড়ন জাগিয়েছিল, এই গ্রন্থও যদি সেভাবেই তাদের আকর্ষণ করে তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়ে উঠবে।

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

সূচীপত্র

	লেখকের নাম	গল্পের নাম	পৃষ্ঠা
১।	হেমেন্দ্রকুমার রায়	কামরার মামলা	৯
২।	প্রেমেন্দ্র মিত্র	ফুটপাথের বই	১৪
৩।	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	গুপ্তধনের সন্ধানে	২২
৪।	ধীরেন্দ্রলাল ধর	শাহাজাদা সুজার সিন্দুক	২৯
৫।	ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য	চোবাটোকার গুপ্ত রহস্য	৪৭
৬।	যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রেতাত্মার আবাহন	৫৩
৭।	শৈল চক্রবর্তী	পল-কাটা হীরে	৫৭
৮।	আশাপূর্ণা দেবী	মেয়ে গোয়েন্দাদের বাহাদুরি	৬২
৯।	স্বপনবুড়ো	হারানো হীরের আংটি	৭১
১০।	লীলা মজুমদার	গাঁজাখুরি গল্প নয়	৭৪
১১।	বিশু মুখোপাধ্যায়	ধোঁয়াটে মুখ	৮৪
১২।	নারায়ণ সান্যাল	সার্লক হেবো	৮৭
১৩।	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	রামপুরের মানুষ-খেকো	৯৩
১৪।	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	স্নাই গাই	৯৮
১৫।	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	তিনটি ছবির রহস্য	... ১১৩
১৬।	প্রফুল্ল রায়	দুই বন্ধুর কীর্তি	... ১২০
১৭।	হিমানীশ গোস্বামী	সুপ্রিয়া পিসির হারানো হীরে	... ১৩০
১৮।	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	রহস্য	... ১৩৮
১৯।	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	নয়নচাঁদ	... ১৪১
২০।	মহাশ্বেতা দেবী	হুলের গল্প	... ১৪৫
২১।	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	যমের মুখে হোমস্	... ১৫১
২২।	সংকর্ষণ রায় ...	সোনার চেয়ে দামী	... ১৫৮
২৩।	জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়	নেইকো খুনীর মাফ	... ১৬৮
২৪।	অদ্রীশ বর্ধন	বালি সাগরের ভুতুড়ে আলো	... ১৭৪
২৫।	আনন্দ বাগচী ...	হাতে-নাতে	... ১৮০
২৬।	নীরোদচন্দ্র মজুমদার ...	রিসার্ভ বাস	... ১৮৪
২৭।	ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	সোনার তাল	... ১৯১
২৮।	সুষমা সেন	কিরণ-ভবন	... ১৯৪
২৯।	বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী	বিক্রম বর্মন	... ২০২
৩০।	শিশুপাল	সত্যি খুনের কাহিনী	... ২০৯
৩১।	পূরবী দেবী	তেল চুরির রহস্য	... ২১৪
৩২।	প্রফুল্ল সরকার	ভানুমতীর খেল	... ২১৯
৩৩।	নারায়ণ চক্রবর্তী ...	গোয়েন্দা চূড়ামণি বর্তিলা	... ২২৬
৩৪।	মুরারিমোহন বিট	পোড়োমন্দিরের রহস্য	... ২২৯
৩৫।	শৈলেশ ভড়	নব সাজে শার্লক হোমস	... ২৩৬
৩৬।	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ...	তিনুকাকার অন্তর্ধান রহস্য	... ২৩৯

লেখকের নাম	গল্পের নাম	পৃষ্ঠা
৩৭। রবিদাস সাহারায় ...	সাগর বুকের গুপ্তধন ...	২৪৫
৩৮। সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ...	রুদ্র আর একজন অদ্ভুত সন্ন্যাসী ...	২৫০
৩৯। নিমাই ভট্টাচার্য ...	বাহাদুর ভাইমণি ...	২৫৩
৪০। পরেশ ভট্টাচার্য ...	তান্ত্রিকের ত্রিশূল ...	২৫৮
৪১। মানবেন্দ্র পাল ...	কনস্টেবলের গোয়েন্দাগিরি ...	২৬৩
৪২। পরেশ দত্ত ...	ডাইনীর জঙ্গল ...	২৬৯
৪৩। রাধারমণ রায় ...	গণেশ হালদারের হেঁয়ালি ...	২৮১
৪৪। মঞ্জিল সেন ...	অর্কর গোয়েন্দাগিরি ...	২৮৯
৪৫। অনিল ভৌমিক	জয়পুরী কঙ্কণ ...	৩০০
৪৬। শিশিরকুমার মজুমদার	গড় চামুণ্ডেশ্বর ...	৩০৬
৪৭। শক্তিপদ রাজগুরু	তিল থেকে তাল ...	৩১৩
৪৮। দেবল দেববর্মা	গোয়েন্দা প্রলয় এবং সাইকেল রহস্য ...	৩১৭
৪৯। অজেয় রায় ...	টিয়া রহস্য ...	৩২৪
৫০। শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ...	ছদ্মবেশী ...	৩৩৮
৫১। সুকুমার ভট্টাচার্য ...	বজ্রবাহিনী রহস্য ...	৩৫০
৫২। পার্থ চট্টোপাধ্যায়	আমার প্রথম মক্কেল ...	৩৫৮
৫৩। শ্রীধর সেনাপতি	হাতের ছোঁয়া ...	৩৬৬
৫৪। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বৈজ্ঞানিক নিরুদ্দেশ ...	৩৭১
৫৫। মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়	বিল্লু-মিমি-কাকাতুয়া ...	৩৭৬
৫৬। নির্মলেন্দু গৌতম	আলমারির চাবি ...	৩৭৯
৫৭। কুমার মিত্র	শাকুন-শাস্ত্র ...	৩৮৭
৫৮। ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	অপারেশন এক্স ...	৩৯২

কামরার মামলা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ক

রাজা সাহেবের আমন্ত্রণে গিয়েছিলুম দেশীয় রাজ্য সেরাইকেলায়। সেখানকার চৈত্র-পর্ব্বে বিখ্যাত 'ছউ' নাচ দেখবার জন্যে। জয়ন্ত এবং আমি—অর্থাৎ মাণিক।

সত্যসত্যই সে নৃত্যোৎসব দেখবার মত। সংস্কৃতে নৃত্যকে দেওয়া হয়েছে একরকম সঙ্গীতের মর্য্যাদা—কেননা তাকে বলা হয়েছে "দৃশ্যসঙ্গীত", অর্থাৎ যে গান চোখে দেখা হয়। সেরাইকেলার নাচ দেখে এ নামের সার্থকতা বুঝতে পারলুম।

সেরাইকেলা থেকে বনজঙ্গল এবং পাহাড়ের আশপাশ দিয়ে একটি পথ সর্পিল গতিতে এসে পৌঁচেছে সিনি জংসন ষ্টেশনে। সেখান থেকে ধরলুম কলকাতার ট্রেণ। তখন সন্ধ্যা উৎরে গিয়েছে। চাঁদের আলোয় মাখানো ছিল মধুযামিনীর স্বপ্ন।

সেকেণ্ড ক্লাসে দুখানা আসন 'রিজার্ভ' করাই ছিল। উপরকার 'বাঙ্কে' একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাড়া আর কেউ ছিল না। লোকটার গায়ের রং আমাদের চেয়ে কালো হ'লে কি হয়, আমাদের পোষাক দেখে বোধ করি তার কোট-পেণ্টালুনের আভিজাত্যে আঘাত লাগল, কারণ আমরা কামরায় প্রবেশ করতেই সে মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে অন্য পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

নীচেকার আসনের একটা কোণ অধিকার ক'রে ব'সেছিলেন একটি হৃষ্টপুষ্ট লোক। ঠোঁটের উপরে তাঁর চার্লি চ্যাপলিন গোঁফ। সাজ-পোষাক দেখলে তাঁকেও ফিরিঙ্গি ব'লে মনে হয়। তাঁর পাশেই উপবিষ্ট একটা কালো-মিশমিশে রোমশ কুকুর, তিনি আদর ক'রে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

কুকুরটার দিকে আমি কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি দেখে লোকটির মুখে ফুটল ঈষৎ হাসির রেখা।

আমি ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলুম, "ওটা কোন্ জাতের কুকুর?"

—"চীনদেশের চৌ-চৌ কুকুর, ভারতে বড় একটা দেখা যায় না।"

তাঁর মুখে পরিষ্কার বাংলা কথা শুনে বুঝলুম, তিনি ফিরিঙ্গি নন।

গাড়ী যখন ছাড়ে ছাড়ে, হন্তদন্তের মত কামরায় এসে উঠলেন আর এক ভদ্রলোক। তাঁর বয়স পঞ্চাশের ওপরে। আকারে মাঝারি, মাথায় অযত্নবিন্যস্ত কাঁচা-পাকা চুল, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, পরনে ধুতি আর পিরান, একহাতে একটি ছোট ব্যাগ ও আর এক হাতে একখানা মোটা কেতাব। চেহারা ও হাবভাব অতিশয় গম্ভীর।

ভদ্রলোক এসেই কুকুরের মালিকের পাশে গিয়ে ব'সে পড়লেন এবং তারপর অন্য কোনদিকে না তাকিয়েই হাতের বইখানার খানকয় পাতা উল্টে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন তার দিকেই। লোকটি নিশ্চয়ই গ্রন্থকীট।

গাড়ী ছেড়ে দিলে। জয়ন্ত জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

খ

পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার সমারোহের ভিতর দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে, দিকে দিকে ফুটে উঠছে কবিত্বের ছবি। জয়ন্তের চোখ আর মন সেই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যপট নিয়েই নিযুক্ত হয়ে রইল।

আমি ততক্ষণে কুকুরের মালিকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছি। তাঁর নাম ইন্দুলাল সিংহ। জাতে বিহারী এবং বিহারের আরো অনেকের মত তিনিও পরিষ্কার বাংলায় কথাবার্ত্তা বলতে পারেন। কলকাতার একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা। কার্য্যসূত্রে আদ্রায় গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ধরেছেন কলকাতার ট্রেণ।

তিনিও ছউ নাচ দেখেছেন শুনে তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ আলোচনা হ'ল। আমার মত ইন্দুবাবুরও ছউ নাচ খুব ভালো লেগেছে।

ইতিমধ্যে ট্রেণ এসে থামল টাটানগর ষ্টেশনে। উপরের 'বাঙ্ক' ছেড়ে নেমে প'ড়ে ফিরিঙ্গিটা কামরা থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। তার সঙ্গে কোন মোটমাট নেই। বোধহয় সে রেলেই কাজ করে।

ইন্দুবাবু জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, "বাইরে যেন কিসের গোলমাল শোনা যাচ্ছে না?"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, একবার দেখে আসি।" সে গাড়ী থেকে নেমে গেল।

গ্রন্থকীট মহাশয় নিজের কেতাব নিয়েই মেতে রইলেন, দুনিয়ার সব গোলমাল যেন তাঁর কাছে একেবারেই তুচ্ছ! বইখানার চক্‌চকে মলাটের উপরে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে—"ওয়ার্ক্‌স্ অফ উইলিয়ম সেক্সপিয়ার"।

গ

মাঝে মাঝে আমার মনে জাগে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন ঃ জয়ন্ত কি চুম্বকের মত অপরাধীকে আকর্ষণ করে?

জয়ন্ত পেশাদার পুলিস নয়, সখের গোয়েন্দা মাত্র। তবু প্রায়ই দেখেছি, তার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই অপরাধ বা অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যায়।

কোন অপরাধীর সন্ধানে আমরা এদিকে আসিনি। হালকা মনে এসেছিলুম বেড়াতে আর নাচ দেখতে। কিন্তু এখানেও পাওয়া গেল এক নিষ্ঠুর অপরাধের রক্তাক্ত নমুনা।

জয়ন্ত গাড়ী থেকে নেমে যাবার পর আমিও জানলা-পথে মাথা গলিয়ে দেখলুম, ষ্টেশনে এক বৃহৎ জনতা শশব্যস্ত হয়ে এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি ও চেঁচামেচি করছে, প্রত্যেক লোকের মুখের ভাব রীতিমত ত্রস্ত। জনতার মধ্যে রয়েছে রেল-পুলিসেরও অনেক লোক।

একজন লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, "ব্যাপার কি মশাই?"

লোকটা দ্রুতপদে চ'লে যেতে যেতে বললে, "খুন হয়েছে, খুন!"

কথাটা গ্রন্থকীট মহাশয়েরও কাণে গেল। তিনি চম্‌কে উঠে বই থেকে মুখ তুলে বললেন, "কে খুন করলে কাকে?"

ইন্দুবাবু চৌ-চৌয়ের মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, "ও প্রশ্নের জবাব দেবার লোক এখানে নেই।"

ভদ্রলোক বইখানা আবার মুখের সামনে তুলে ধরলেন।

খানিক পরে জয়ন্ত আবার ফিরে এল। তার মুখে যা শুনলুম তা হচ্ছে এই ঃ

মারা পড়েছেন বুল্‌চন্দানি নামে এক সিন্ধী ভদ্রলোক। তিনি কলকাতার একজন নামজাদা রত্ন-ব্যবসায়ী। ব্যবসা-সূত্রে চক্রধরপুরে এসে ফিরে যাচ্ছিলেন কলকাতায়। তাঁর অনুচর ছিল তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। সে টাটানগরে এসে প্রথম শ্রেণীর কামরায় আবিষ্কার করেছে মনিবের মৃতদেহ। রক্তে কামরা ভেসে যাচ্ছে এবং বুল্‌চন্দানির বুকে বিদ্ধ হয়ে আছে একখানা ছোরা। কামরায় আর কেউ নেই।

অনুচর বলে, তার মনিবের সঙ্গে ছিল কয়েকখানা হীরা, মনিব্যাগ ও হাতঘড়ি। হীরা আর ঘড়ি অদৃশ্য। মনিব্যাগটা প'ড়ে আছে, কিন্তু তার ভিতরটা শূন্য।

জনৈক যাত্রী দেখেছে, ট্রেণ যখন ধীরে ধীরে সিনি ষ্টেশনে প্রবেশ করছিল, তখন কোন লোক একটা কামরা থেকে নেমে প'ড়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠেছিল এই গাড়ীরই অন্য একটা কামরায়। রেল-পুলিসের লোক এখন প্রত্যেক কামরায় সেই লোকটাকে সন্ধান করছে।

ঘ

মিনিট তিন পরেই আমাদের কামরারও সামনে এসে দাঁড়াল জনকয়েক পুলিসের লোক।

একজন ইন্‌স্পেক্টার ভিতরে ঢুকে বললে, "আপনাদের টিকিট দেখি।"

আমরা টিকিট দেখালুম। টিকিট দেখে ইন্‌স্পেক্টারের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। সে হুকুম দিলে কামরার ভিতরে খানাতল্লাসী চালাবার জন্যে।

পুলিসের লোকজনরা প্রথমে আমাদের মালপত্তর এবং তারপর প্রত্যেকের জামাকাপড় হাতড়ে দেখতে লাগল।

তারপর আচম্বিতে আমাদের চমকিত দৃষ্টির সামনে সেই গ্রন্থকীটের পকেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একখানা রক্তমাখা রুমালে জড়ানো একটা হাতঘড়ি!

ইন্‌স্পেক্টার কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার পকেটে এ ঘড়ি কেন?"

ভদ্রলোক প্রথমটা স্তম্ভিতের মত হয়ে গেলেন। তিনি যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

ইন্‌স্পেক্টার বললে, "ন্যাকামি রাখুন। জবাব দিন। এ ঘড়ি আপনার পকেটে এল কেমন ক'রে?"

ভদ্রলোক হতভম্বের মত মাথা চুলকোতে চুলকোতে ক্ষীণস্বরে বললেন, "জানি না তো।"

—"বটে, জানেন না? আপনার রুমালে রক্ত কেন?"

—"ও রুমাল আমার নয়।"

—"চমৎকার সাফাই! আপনার নাম কি?"

—"গৌরীচরণ ঘোষাল।"

—"কোথায় থাকেন?"

—"খড়গপুরে।"

—"কি করেন?"

—"স্কুলমাষ্টারি।"

—"এখানে কেন?"

—"সেরাইকেলায় আমার জামাই-বাড়ী। মেয়ের অসুখ শুনে দেখতে এসেছিলুম।"

—"তারপর যাবার সময়ে রোজগার ক'রে ফিরে যাচ্ছেন? এখন হীরেগুলো কোথায় লুকিয়ে ফেলেছেন বলুন দেখি?"

—"মশাই, আপনার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না!"

—"চোপরাও বদমাইস! পুলিসের কাছে এ-সব ধড়িবাজি খাটবে না! এই সেপাই, আসামীর হাতে হাতকড়ি দিয়ে ফাঁড়িতে নিয়ে চল।"

ভয়ে, লজ্জায়, অপমানে গৌরীবাবু কেঁদে ফেললেন। কিন্তু পুলিসের কাছে চোখের জল ব্যর্থ। তাঁকে পাহারাওয়ালাদেরই সঙ্গে যেতে হ'ল।

ঙ

আরো বেশ খানিকক্ষণ পরে ট্রেণ আবার চলতে সুরু করল।

এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় প্রথম কিছুক্ষণ আমরা স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলুম। তারপর ইন্দুবাবু বললেন, "এ যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার! লোকটির বাইরের পরিচয় নিরীহ স্কুলমাষ্টার, আর তার পকেটেই পাওয়া গেল বামাল! মানুষ চেনা কি কঠিন!"

জয়ন্ত এতক্ষণ গুম্ হয়ে ব'সে একমনে কি যেন চিন্তা করছিল, ইন্দুবাবুর কথা শুনে মুখে তুলে মৃদু হাস্য করলে।

আমি বললুম, "সত্য কথা। গৌরীবাবুর ভিতর থেকে হত্যাকারীর চেহারা আবিষ্কার করা অসম্ভব বলাও চলে।"

জয়ন্ত বললে, "না মাণিক, অসম্ভব নয়! আকৃতির উপরে প্রকৃতি নির্ভর করে না। সুন্দর দেহেও বাস করতে পারে অসুন্দর মন। ধর, এই গাড়ীতে আছি আমরা তিনজন—তুমি, আমি, ইন্দুবাবু। আমাদের দেহ সবাই দেখছে, কিন্তু আমাদের মন কেউ দেখতে পাচ্ছে না। অথচ মনই হচ্ছে ক্রিয়ার কর্ত্তা, দেহ উপলক্ষ্য মাত্র। তোমার বা আমার বা ইন্দুবাবুর মন কি করতে পারে, বাহির থেকে সেটা জানবার উপায় নেই।"

ইন্দুবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "না মশাই, খানকয় হীরার লোভে আমার মন কোনদিনই নরহত্যা করতে চাইবে না। তবে আপনি যা বললেন, যুক্তিসঙ্গত। মন হচ্ছে রহস্যময়। নিরীহ স্কুলমাষ্টারেরও মনে খুন করবার প্রেরণা জাগে।"

জয়ন্ত আর কিছু না ব'লে বাইরের দিকে মুখ ফেরালে। ধু-ধু প্রান্তর পরিণত হয়েছে যেন জ্যোৎস্না-সরোবরে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে যেন তালীকুঞ্জের স্বপ্নদ্বীপ।

ইন্দুবাবু আসন ত্যাগ ক'রে বাথরুমের ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

চীনা চৌ-চৌ কুকুরটা এতক্ষণ পরে আমাদের দিকে তদারক করতে এল। একবার আমার আর একবার জয়ন্তের পা শুঁকে পরীক্ষা করলে। পরীক্ষার ফল হ'ল বোধ হয় সন্তোষজনক।

কুকুরটা বড়ই আদুরে। জয়ন্ত তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই সে তার জানুর উপরে দুই পা তুলে উঠে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। আমি তার জন্যে কিছু খাবারের খোঁজে টিফিনবাক্সটা খুলে ফেললুম। আমিও কুকুর ভালোবাসি।

এমন সময়ে ইন্দুবাবু বাথরুমের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ধমক দিয়ে ডাকলেন, "জনি, জনি!"

কুকুরটা ছুটে গেল মনিবের কাছে।

ইন্দুবাবু সচমকে ব'লে উঠলেন, "জনি, তোর বগ্‌লস্‌টা কোথায় গেল?"

জয়ন্ত হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "আমার কাছে।"

—"কেন?"

—"বগ্‌লস্‌টা পরীক্ষা করছি।"

—"মানে?"

—"দেখছি এটা অসাধারণ বগ্‌লস্, ফরমাশ দিয়ে তৈরি। এর ভিতরটা ফাঁপা।"

হঠাৎ ইন্দুবাবুর মুখের উপর থেকে স'রে গেল শান্ত ভদ্রতার আবরণ এবং সেখানে ফুটে উঠল তাঁর হিংস্র মনের কুৎসিত আভাস! ক্রুদ্ধ স্বরে তিনি ব'লে উঠলেন, "আপনি কি বলতে চান?"

জয়ন্ত কিছুই বলতে চাইলে না, কেবল বগ্‌লস্‌টা নিয়ে আসনের গদীর উপরে ঝাড়তে লাগল।

বিদ্যুতের মত চাকচিক্য নিয়ে গদীর উপরে ঝ'রে পড়ল কয়েক খণ্ড স্ফটিক! চোরাই হীরা!

ভীষণ এক চীৎকার ক'রে ইন্দুবাবু জয়ন্তের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করলেন। জয়ন্ত এক ধাক্কায় তাঁকে ফেলে দিয়ে রিভলভার বার ক'রে কঠিন কণ্ঠে বললে, "আমার পরিচয় তুমি জানো না। চুপ ক'রে থাকো। মাণিক, গাড়ী পরের ষ্টেশনে থামলেই তুমি নেমে গিয়ে পুলিস ডেকে আনবে। বুল্‌চন্দানিকে খুন করেছে এই ইন্দু।"

চ

ট্রেণ আবার ছুটছে। কামরার ভিতরে কেবল আমি ও জয়ন্ত।

জয়ন্ত বলতে লাগল, 'ইন্দু নিশ্চয়ই পুরাতন পাপী, নরহত্যা ও চুরির জন্যে সে আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিল।

পুলিস খুব সহজে টোপ্ গিলেছে। রক্তাক্ত রুমাল আর হাতঘড়ির উপরে নির্ভর ক'রে গৌরীবাবুকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু আমি এত সহজে ভুলিনি। কারণ তার আগেই আমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলুম।

নিহত বুল্‌চন্দানির কামরায় গিয়ে রক্তাক্ত মেঝের উপরে আমি দেখেছিলুম কুকুরের কয়েকটা পদচিহ্ন। সে কামরায় কোন কুকুর ছিল না, তবে সেই পদচিহ্ন কোথা থেকে এল? নিশ্চয়ই কুকুর ছিল হত্যাকারীর সঙ্গে!

বুঝতেই পারছ, তারপর থেকেই আমার সন্দেহ আকৃষ্ট হয়েছিল কার দিকে? ইন্দুর কুকুরই তাকে ধরিয়ে দিয়েছে!

ইন্দু যখন বাথরুমে যায়, তখন আমি তার কুকুরটাকে পরীক্ষা করবার সুযোগ পেলুম। স্পষ্ট দেখলুম, তার থাবায় রয়েছে রক্তের দাগ! আমার সন্দেহ পরিণত হ'ল দৃঢ় ধারণায়।

বুঝলুম, ইন্দুই পুলিসকে বিপথে চালনা করবার জন্যে বেচারা গৌরীবাবুর পকেটে হাতের কায়দায় চালিয়ে দিয়েছিল রুমাল ও ঘড়িটা।

কিন্তু আসল চোরাই মাল গেল কোথায়? পুলিসের খানাতল্লাসীর ফলে ইন্দুর কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি। আর চোরাই মাল না পেলে ইন্দুর বিরুদ্ধে কোন মামলাই রুজু করা চলবে না।

তখন আমার লক্ষ্য পড়ল কুকুরটার বগ্‌লসের উপরে। সেটা বিশেষ কৌশলে তৈরি ফরমাশী বগ্‌লস্। ভিতরটা ফাঁপা। হাতের চাপ দিয়ে অনুভব করলুম তার মধ্যে রয়েছে কতকগুলো কঠিন জিনিস।

তারপর আর কিছু বলা বাহুল্য।"

[আষাঢ় ১৩৬৩]

ফুটপাথের বই

(তুক না তাক)

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সামান্য একটা বই কেনা নিয়ে এমন ব্যাপার হবে ভাবতেই পারিনি।

তাও একটা পুরানো ছেঁড়াখোঁড়া বই। রাস্তার ধারে ফুটপাথের ওপর পুরানো বই ছড়িয়ে যারা বিক্রী করতে বসে সেই এক ফেরিওয়ালার কাছে কেনা।

বইটাও এমন কিছু আহামরি নামকরা বইও নয়। বেশ কয়েক বছর আগে বিলেতে ছায়াছবি হিসেবে যে কাহিনীটা কিছুটা নাম করেছিল, বইটা তারই ছাপানো চিত্র-নাট্য মাত্র। চিত্র-নাট্যটা অবশ্য বেশ পাকা হাতে লেখা, পড়তে ভালো লাগে।

কয়েক বছর আগে ছায়াছবিটা এই কলকাতা শহরেই একটা নামকরা সিনেমা হলে দেখেছিলাম। এতদিন বাদে হঠাৎ রাস্তার ফুটপাথে ছাপানো চিত্র-নাট্যটা পেয়ে তাই সেটা কিনে ফেলি।

বইটা বেশ সস্তাতেই পেয়েছিলাম। সস্তা পাবার কারণ ছিল অবশ্য। একটা নয়, অমন দশ-বারোটা ওই বই-এর কপি পাশাপাশি ফুটপাথের ফেরিওয়ালাদের অন্য সব বেচবার বইয়ের মধ্যে যেভাবে ছড়ানো ছিল তাতে বোঝাই গেছল যে কোনও বই-এর দোকানের এক লট-এ চালান হয়ে আসা এ বইটার বাণ্ডিল যে কারণেই হোক বিক্রী না হয়ে দোকানেই এতদিন পড়েছিল। এখন হয় দোকানটাই উঠে যাওয়ার দরুন কিংবা বইটার আর বাজার নেই বলে ওগুলো পুরানো বই-এর ফেরিওয়ালাদের হাতে চলে এসেছে।

আগেই বলেছি বইটা এমন কিছু 'আহামরি' দুষ্প্রাপ্য সওদা নয়। তার ওপর বিক্রীর জন্যে পড়েও আছে গাদাখানেক। তাই বেশ সস্তায় সেটা পাওয়া কোনোরকম দাঁও বলে মনে করবার কোনো কারণই ছিল না।

কিন্তু বইটা কিনে আনার দিন দুই বাদেই সেই রকম একটা সন্দেহের কারণ ঘটায় অবাক হয়ে গেলাম।

পুরানো বইটা কিনে এনে আমি তখনই সেটা পড়বার সময় পাইনি। সে রকম একটা দারুণ উৎসাহও যে ছিল তাও নয়। বইটা আমার লেখার টেবিলের ওপর অন্য সব পত্রপত্রিকা আর বইয়ের গাদার মধ্যেই ফেলে রেখে সেটার কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম।

মনে করিয়ে দিলে বইটা যার কাছ থেকে কিনেছিলাম সে-ই বা তারই মতো চেহারা পোশাকের এক পুরানো বই-এর ব্যাপারী। বই-পাড়ার মধ্যে বড় রাস্তাটার ধারে কাঠের শেল্‌ফে সাজিয়ে আর ফুটপাথে ছড়িয়ে যারা পুরানো বই বেচাকেনা করে থাকে তাদের প্রত্যেককে আলাদা ভাবে চিনব এমন ঘনিষ্ঠ কারবার তাদের সঙ্গে আমার নয়। তবে মাসে একবার-দুবার ও-পাড়ায় গিয়ে বই ঘাঁটাঘাঁটির একটু নেশা আছে বলে ব্যাপারীদের কেউ কেউ কিছুটা মুখ-চেনা হয়ে গেছে।

সেদিন সকালে বাড়ি থেকে বার হবার সময় গেটের কাছে সেইরকম একজনকে দেখে একটু অবাক হলাম।

গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে সে আমারই জন্যে অপেক্ষা করছিল, আমি বার হতেই এক পা এগিয়ে এসে সেলাম জানিয়ে বললে—আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি, আজ্ঞে।

আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ!—তার সম্ভাষণের ধরনে একটু হেসে বললাম—তা আমার এ সৌভাগ্যের কারণটা তো বুঝতে পারছি না।

আজ্ঞে, সেদিন আপনি যে বইটা কিনেছেন আমার কাছে....

সেটার দাম যা চেয়েছিলে, বই-এর ব্যাপারীকে একটু অধৈর্যের সঙ্গেই তার কথার মাঝখানে থামিয়ে বললাম—তা তো পুরোই দিয়ে এসেছি বলে মনে পড়ছে....

না, না,—অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে অপরাধীর মতো গলায় পুরানো বই-এর ব্যাপারী বললে....দাম আপনি ঠিকই দিয়েছিলেন। আমি সে জন্যে আসিনি। আমি....মানে, আমি বইটা আপনার কাছে ফেরৎ চাইতে এসেছি।

ফেরৎ চাইতে এসেছ!—কথাটা ঠিক শুনেছি কিনা বুঝতে না পেরে প্রশ্নটা আবার করে বললাম—বইটা বিক্রী করে আবার তুমি তা ফেরৎ চাও?

আজ্ঞে হ্যাঁ—অত্যন্ত অপরাধীর মতো ব্যাপারী অনুনয় করে বললে,—ও বইটার বড় দরকার পড়ে গেছে। আপনি দাম যা দিয়েছেন তা আপনাকে দেবার জন্যে এনেছি। যদি বলেন তো তার চেয়ে বেশী কিছুও দিচ্ছি। বইটা শুধু আমাকে ফেরৎ দিন।

এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার!—হেসে উঠে না বলে পারলাম না—এই দুদিন আগে যে বইটা কিনে এনেছি সেইটেই আবার ফেরৎ চাইতে এসেছ? তার জন্যে আরো বেশী দাম দেবার জন্যেও তৈরী?

আজ্ঞে,—লোকটি বেশ একটু কুণ্ঠিত হয়ে জানালে,—আপনি পছন্দ করে বইটা কিনে ছিলেন, সেইটে আবার ফেরৎ চাইছি। তাই আপনি যাতে এটা লোকসান বলে না মনে করেন, সেই জন্যে দামটা বাড়িয়ে....

সেই জন্যে দামটা বাড়িয়ে কিনে নিচ্ছ!—লোকটার কথায় বাধা দিয়ে নিজেই সেটা শেষ করে দিয়ে বললাম,—কিন্তু কিনে নিতে চাইছ কেন সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। বইটা দারুণ নাম-করা কিছু নয়, আর তা যদি হয়ও, তাহলেও সাত রাজার ধন এক মাণিক তো নয়। যখন গোটা দশ-বারোটা বই তো সেদিন তোমাদের ক'জনের কাছাকাছি দোকানে জমা হয়ে থাকতে দেখেছি, তার একটা কিনে নিলেই তো তোমাদের ল্যাঠা চুকে যায়।

আজ্ঞে, তা যায় কিনা জানি না।—লোকটি বিনীত ভাবে জানালে,—আমাকে আপনার কাছেই এই বইটি কিনে নিতে পাঠিয়েছে।

আমার কাছের এই বইটিই কিনে নিতে পাঠিয়েছে!—বেশ একটু রহস্যের গন্ধ এবার পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—কে পাঠিয়েছে? কে?

আজ্ঞে, আমাদের দোকানের মালিক।

তোমাদের দোকানের মালিক আমার কেনা বইটিই বেশী দাম দিয়েও ফেরৎ নেবার জন্যে আমার কাছে পাঠিয়েছে!—বলতে বলতে মনে যা হলো তা তখনকার মতো মনের মধ্যেই রেখে বললাম,—আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার কেনা বইটিই তোমাদের দোকানের মালিক কিছু বেশী দাম দিয়েও ফেরৎ চান। বেশ! তাঁর প্রস্তাবটা আমি শুনলাম। কিন্তু এখন বাড়ি থেকে কাজে বেরিয়েছি। এখুনি তো তোমাদের বইটা খুঁজে বার করে আনার জন্যে আবার বাড়িতে ফিরে যেতে পারব না। তা ছাড়া ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখার সময়ও তো আমার চাই। তাই বলছি কাল সকালে এরকম সময়ে এসো। যা ভাববার ভেবে নিয়ে বইটা তখন তোমাদের দিতে পারব বলে মনে হয়।

আজ্ঞে না বাবু, আমার কথা শেষ হবার আগেই লোকটি যেন কাৎরে উঠে বললে,—দোহাই আপনার, কাল পর্যন্ত দেরী করবেন না। আমি নেহাৎ গরীব-দুঃখী মানুষ। আজ শুধু হাতে ফিরে গেলে আমার চাকরিটি যাবে। আপনি বরং যা দাম দিয়েছিলেন তার ডবল, না হয় তিন ডবল লাভ নিন। বইটা আজ আমায়....

না,—বেশ কঠিন স্বরেই ধমক দিয়ে এবার বললাম,—তোমার কাছে যা শুনলাম আর বইটার জন্যে

তোমাদের যা ছটফটানি দেখছি তাতে এখন আর সেটা কিছুতেই ভালো করে না বুঝে শুনে খোঁজ না নিয়ে ফেরৎ দিতে পারব না। বইটা যদি শেষ পর্যন্ত ফিরিয়েও দিই তাও আজ নয়—কাল সকালে এই সময়ে এলে তবে জানাতে পারব।

কথাগুলো বলে আর অপেক্ষা না করে আমি চলে এসেছিলাম। কিন্তু—বইটা নিয়ে মনে বেশ একটু অস্বস্তি ছিল বলে দুপুরের কাজকর্ম সারা হবার পর বিকেলেই বইপাড়ার সেই রাস্তার ধারের পুরানো বই-এর ব্যাপারীদের কাছে গিয়েছিলাম, আমার আগের দিনের কেনা বই-এর আর একটা কপির খোঁজে।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। আগের দিন যে বই-এর অন্ততঃ দশ-বারোটা কপি কাছাকাছি স্টলের সামনে ছড়ানো থাকতে দেখেছি, তার একটারও আর সেখানে চিহ্ন নেই। বইটা সম্বন্ধে আমার খোঁজ নেওয়াতেও দোকানদারদের কেউ বা বিরক্ত হলো একটু, কেউ বা ঠাট্টা করে বললে—আপনিও সেই বইয়ের খোঁজ করছেন? সে বই পেতে হলে এখন যেখানকার ছাপা সেই খাস বিলেতে যেতে হবে।

কেউ বা বিরক্ত, কেউ বা রসিক এসব পুরানো বই-এর ব্যাপারীদের সঙ্গে অল্প চেনাশোনা একজনের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা একটু ভালো করে জানতে পারলাম। তার বিবরণ মতো জানা গেল—হপ্তাখানেকও নয়, মাত্র তার চার-পাঁচ দিন আগে কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পাড়ায় একটি পুরানো বাড়ির মালিক যত সব পুরানো কাগজপত্র আর বইটই তাদের ঐ পুরানো বই-এর বাজারে প্রায় জলের দরে বেচে দিয়ে যায়। এরকম ঘটনা তাদের বাজারে একেবারে অদ্ভুত কিছু নয়। পুরানো এক একটি বাড়ির নতুন মালিক কি ওয়ারিসন মাঝে মাঝে নিজের কাছে অকেজো আগেকার এইরকম বই কাগজের পুঁজি প্রায় জলের দরে বিকিয়ে দিয়ে বাড়িঘর সাফ করবার ব্যবস্থা করে।

এবারের সস্তায় বিকিয়ে দেওয়া বই-এর গাদার মধ্যে একেবারে নতুন এক সেট বইও যে ছিল সেটাও খুব আশ্চর্য কিছু নয়। মালিকের অবহেলায় কি খামখেয়ালে ওরকম ব্যাপারও কখনো যে ঘটে না এমন নয়।

এবারের ব্যাপারটা শুধু এই দিক দিয়ে একটু বেশী অদ্ভুত যে, ভিন্ন ভিন্ন নয়, একই বই-এর পুরো একটি দশ-বারোটি নতুন কপির সেট বাজারে বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ব্যাপারটাকে যদি একটু অদ্ভুত মনে করা যায় তাহলে তার চেয়ে অনেক বেশী অদ্ভুত, রীতিমত অবাক করা ব্যাপার ঘটেছে বইগুলো বাজারে আসবার হপ্তাখানেক বাদে। সদ্য ছাপা নতুন বইয়ের মতো ঝকঝকে তকতকে হলেও বহুকাল আবার সামান্য একটু সুনামের লেখকের লেখা বলে ফুটপাথের বাজারে আসবার পর বইটির কোনও চাহিদা হয়নি বললেই হয়। ফুটপাথে ছড়াবার পর তিন-চার দিনে আমার মতো আর একজনই এ বই-এর একটি কপি কিনে নিয়ে যান। কিন্তু তারপর কোথা দিয়ে কি যেন ভোজবাজি হয়ে যায়। আমি বইটির একটি কপি নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বইটার জন্যে এমন কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে তা কে ভাবতে পেরেছিল। ফুটপাথের স্টলে যে সব বই তখনও ছিল সেগুলিও চক্ষের নিমেষে বিক্রী হয়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে খোঁজ পড়েছিল অন্য যে দুটি বই আজ বিক্রী হয়ে গিয়েছিল সে দুটিরও।

কিন্তু হেলায় যা প্রায় বিকিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে বই-এর জন্যে হঠাৎ কাড়াকাড়ি কেন? বইগুলি সংগ্রহ করবার জন্যে হঠাৎ এমন আগ্রহই বা কার, আর কেন?

ব্যাপারটা যে মোটেই সামান্য নয়, সেদিন রাত্রেই তা জানতে পারলাম আরো ভালো করে। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাবার আগে যা নিয়ে এত রহস্য, আমার সম্প্রতি কিনে আনা সেই বইটাই একটু উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।

ফোনটা তুলে সাড়া দেবার আগেই ওদিকে থেকে বেশ ভারী আর রুক্ষ গলায় একটা শাসানি শুনলাম,—সাধ করে নিজের বিপদ যদি না ডাকতে চান, তাহলে কাল সকাল আটটায়—মাথায় তিনটে শূন্য লেখা চিঠির কাগজ শুধু 'অজানা' এই সই নিয়ে যে যাবে তার কাছে আপনার কেনা বইটি দিয়ে

দেবেন। বই-এর যা দাম তার পাঁচ-গুণ মূল্য আমার পত্রবাহকই আপনাকে দেবে। শেষে আবার জানাচ্ছি, যা লিখেছি তা অগ্রাহ্য করে নিজের চরম বিপদ ডেকে আনবেন না।

এ শাসানির উত্তরে কিছু বলতাম কি না জানি না, কিন্তু সে সুযোগ না দিয়ে ওদিক থেকে ফোনটা নামিয়ে রাখা হলো।

এরপর পরাশরকে ফোন করে পরের দিন সকালে সাতটার মধ্যে আসতে বলা ছাড়া আর কি করা যায়।

তাই করলাম, কিন্তু সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো না। পরাশরের বোধহয় একটু ঢিলে সময় যাচ্ছিল, মাথাটা পুরোপুরি খাটাবার মতো কিছু গোলমেলে ধাঁধা হাতে ছিল না। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে সে আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়ে রাতের খাবারটা আমার সঙ্গেই খেল।

খেতে খেতে সমস্ত ব্যাপারটা তাকে জানালাম। কোনো রকম মন্তব্য-টন্তব্য না করে সে আমার কেনা পুরানো বই-এর দোকানের বইটা নিয়ে গেস্টরুমে শুতে গেল।

সকালে ওঠবার পর সে যা করল তা অতি সোজা চালাকি বলেই সেটার কথা আমার মাথায় আসেনি।

'সামনাসামনি দেখা দিলে বইটি বিনামূল্যেই দিতে প্রস্তুত' শুধু এই কথাগুলি নাম-টাম না ছাপা একটা সাদা কাগজে লিখে সেটা সকালে যে পত্রবাহক এসেছে তাকে দিতে বলে নিজে সেই চিঠি নিয়ে আসা বেয়ারাকেই লুকিয়ে অনুসরণ করবার জন্যে দূরে এক জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করেছে।

রহস্যটার প্রথম জট-টা এত সহজে খুলে যাবার পরই কিন্তু ব্যাপারটার আসল চেহারাটা পুরোপুরি ভাবে ধরা পড়েছে।

উত্তর কলকাতায় শোভাবাজারের একটা ঘিঞ্জি মধ্যবিত্ত পাড়ায় সরু একটা আঁকাবাঁকা গলি। সেই গলির একটা বাঁকেই তেতলা একটি পুরানো বাড়ি।

লুকিয়ে অজানা বেয়ারার পিছু নিয়ে পরাশর এই বাড়িটিই দূর থেকে দেখে এসেছিল। বেয়ারাকে পরাশরেরই নির্দেশে আমি তাকে আরও একটু দূর থেকে অনুসরণ করে আসছিলাম। নিজেদের গুপ্ত রাখার একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল না বলে বেয়ারার পিছু নিয়ে তার মনিবের বাড়িটা লুকিয়ে দেখে আসা তা মোটেই কঠিন হয়নি।

বেয়ারা মনিবের বাড়িতে আমার চিঠিটা দিয়ে আমি ছেড়ে চলে যাবার পর বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করেই গলির বাঁকের পুরানো তেতলা বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নেড়েছি।

বাড়ির আর একজন চাকর এসে দরজা খুলে দেবার পর ভেতরে ঢুকে সত্যি যে বেশ একটু অবাক হয়েছি তা স্বীকার না করে পারব না। পুরানো সরু গলি, বেশীর ভাগ জীর্ণ সব দোতলা একতলা সেকেলে দালানকোঠা। কিন্তু ভেতরে ঢোকবার পর এ বাড়িটা যে একেবারে আলাদা জাতের তা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না। এ যেন ছেঁড়া গায়ের কাপড় মুড়ি দেওয়া রীতিমত দামী চোগা-চাপকান পরা আমীর-টামীর। বাইরের দেওয়ালের নোনা-ধরা ইটের ঘরের অভাব নেই, কিন্তু ভেতরে ঢুকলেই মেঝেতে যেমন দামী রীতিমত ঝকঝকে তকতকে কার্পেট পাতা, ঘরের চারিপাশের আসবাবপত্রও তেমনি খানদানি আর বাহারী। সে ঘরের ভেতরে এসে যে দুটি মানুষকে দেখলাম তাদের চেহারা পোশাকের মিল আর তফাৎও বেশ একটু নজর করবার মতো। বয়স যার কম তার রংটা রীতিমত ময়লা হলেও মানানসই, ঢিলেঢালা পাজামা-পাঞ্জাবিতে তার চেহারাটা যথার্থই সুঠাম সুন্দর। আর তারই পাশে ফতুয়া গায়ে আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে যিনি আমার কেনা বইটিরই আরেকটি কপির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে উত্তেজিত ভাবে কি যেন বলছিলেন তাঁর গায়ের রংটা অনেক ফরসা আর প্রথম জনের সঙ্গে মুখচোখের যথেষ্ট মিল থাকলেও তিনি সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটি ভুষির বস্তা বিশেষ।

আমাদের ঢুকতে দেখে তিনি বেশ একটু চমকেই আরাম-কেদারায় সোজা হয়ে উঠে বসে ভ্রূকুটি ভরে আমাদের দিকে চাইলেন।

চমকে উঠে ভ্রূকুটি ভরে চাওয়ার কারণ শুধু আমাদের আচমকা প্রবেশই নয়, পরাশরের হাতের বইটাও।

পরাশর আমার কেনা বইটাই তার বাড়ানো হাতে এগিয়ে ধরে আমার আগে আগে ঘরে ঢুকেছিল।

আরাম-কেদারার ভদ্রলোক কিছু হয়ত বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তা ওঁর বলা হলো না। তার আগেই তাঁর কাছে পৌঁছে আরাম-কেদারার একটা হাতলের ওপর আমার কেনা বইটা রেখে পরাশর সবিনয়ে জানালে—আমাদের কথা আমরা রেখেছি কিনা দেখুন। বেয়ারার-টেয়ারার হাতে নয়, নিজেরাই আপনার হাতে বইটা তুলে দিলাম।

কিন্তু...আপনারা?—আরাম-কেদারার ভদ্রলোক বেশ একটু সন্দিগ্ধভাবে যা বলতে চাইছিলেন আগেই তা অনুমান করে পরাশর এবার বললে—কেমন করে আপনার এ বাড়িটা খুঁজে বার করলাম তাই ভাবছেন তো! কিন্তু এ ভাবনা তো আগুন জ্বালার পর ধোঁয়া দেখে অবাক হওয়ার মতো। আপনার পাঠানো বেয়ারার পিছু নিয়েই আপনার ডেরার খোঁজ যে আমরা পেতে পারি এই সোজা কথাটাই আপনাদের মাথায় আসেনি দেখেই বুঝছি, এসব গোয়েন্দাগিরি-টিরির ব্যাপারে আপনি একেবারে কচিকাঁচা—অ আ ক খ-র পড়ুয়া। তা হোক। একদিক দিয়ে তাই ভালো বলে আমাদের প্রস্তাবটা এখন আপনাদের জানাচ্ছি।

আপনাদের প্রস্তাব!—আরাম-কেদারার লোকটি এবার একটু সন্দিগ্ধ অসন্তোষের সঙ্গেই আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—আপনাদের আবার কি প্রস্তাব আমায় জানাতে এসেছেন? না, না মশাই—এ বই-এর একটা কপি এনে দিয়েছেন তার জন্যে যা লাভ-টাভ চান নিয়ে যান। আপনাদের ওসব প্রস্তাব-টস্তাব শোনার সময় কি উৎসাহ আমার নেই।

সময় আর উৎসাহ যদি না থাকে শুনবেন না।—এবার আমাকেই একটু ঝাঁঝালো গলায় বলতে হলো—তবে অযাচিত ভাবে কার সাহায্য পাচ্ছিলেন সেইটে একটু জেনে রাখুন। যদি একেবারে ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের বাসিন্দা না হন তাহলে পরাশর বর্মার নামটা বোধ হয় শুনেছেন। ইনি সেই পরাশর বর্মা যিনি নিজে থেকে উৎসাহী হয়ে আপনাদের যা সমস্যা আর রহস্য তার একটা মীমাংসার চেষ্টা করতে চাইছেন।

পরাশর নামটা শুনে প্রতিক্রিয়াটা কি আর কতখানি হলো তা বোঝবার অবকাশ না দিয়ে পরাশর তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—না, না, ওসব নাম-টামের কথা ছাড়ুন মিঃ চক্রবর্তী! আমি...

চক্রবর্তী-পরাশরের কথার মাঝখানে বেশ একটু অবাক হয়ে বাধা দিয়ে আরাম-কেদারার ভদ্রলোক বললেন, আমি যে চক্রবর্তী তা জানলেন কি করে?

না, না—পরাশর হেসে বললেন—ওটা শার্লক হোম্‌স মার্কা বাহাদুরী মনে করবেন না। সেরকম কিছু ক্ষমতা দেখাতেও চাইনি। ওটা নেহাৎ চোখ-কান খোলা রাখা ছাড়া আর কিছু নয়।

চক্রবর্তী এরপর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাতে তাঁকে বাধা দিয়ে পরাশর বললে—আপনার নাম যে অঘোর চক্রবর্তী তা চোখের দৃষ্টির কোনো দোষ না থাকলে দু' মিনিট এখানে থাকলেই জানা যায়। আপনি একেবারে অগোছালো যেমন নন তেমনি খুব গোছালো মানুষও নন। আপনার ওই টেবিলের ওপর বেশ ক'টা চিঠির তাড়া পেপারওয়েট দিয়ে চাপা আছে। সেগুলো খুব গুছিয়ে নয়, একটু এলোমেলো ভাবেই রাখা। দুটো চিঠির নাম-ঠিকানা তাই বেশ পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে। তার একটায় ইংরেজিতে এ গলির ঠিকানার ওপরে এ চক্রবর্তী বলে নামটা লেখা। আরেকটা পোস্টকার্ডে নাম-ঠিকানা বাংলায় লেখা। তাতে স্পষ্ট শ্রীঅঘোর চক্রবর্তী নামটা পড়া যাচ্ছে। কিন্তু এসব ফালতু কথা এখন থাক, আমি যা বলতে যাচ্ছি তা এই যে ঘটনাচক্রে আমার বন্ধু ফুটপাথের

ওপর থেকে একটা পুরনো বই কেনার জন্যে আমরা আপনাদের এরকম একটা রহস্য-জড়ানো সমস্যার সঙ্গে যখন জড়িয়ে পড়েছি তখন সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের খুলে-ই বলুন না। আপনারা যা খুঁজছেন নিজে থেকে আমাদের তা ফেরৎ দিতে আসা থেকে এইটুকু আপনাদের বুঝতে বলি যে এ ব্যাপারে কোনও দাঁও মারবার লোভ-টোভ আমাদের নেই। যা আছে তা এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে কৌতূহল। যোগাযোগ যখন হয়েই গেছে তখন আপনাদের সঠিক পরিচয় দিয়ে ব্যাপারটা ভালো করে খুলেই বলুন না। দেখা যাক্ না তাতে কিছু সাহায্য আপনাদের করতে পারি কিনা।

ঠিক! ঠিক!....এতক্ষণ কোনো কথা না বলে আরাম-কেদারার একপাশে একটি ছোট আলমারির কাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে যিনি মাঝে মাঝে শুধু মিটি-মিটি হাসছিলেন সেই সুদর্শন মানুষটি এবার মুখ খুলে বললেন—ব্যাপারটা গুছিয়ে বলার আগে নিজেদের পরিচয়গুলো ঠিকমত দিয়ে ফেলা দরকার। তা সেদিক দিয়ে আমার বড়দার একটু চক্ষুলজ্জা হতে পারে বলে কাজটা আমিই সেরে দিচ্ছি। আমায় বড়দা বলে সম্বোধন করায় আমাদের সম্বন্ধের কিছুটা আভাস এইমাত্রই পেলেন কিন্তু সেইটেই সব নয়, উনি আমার আপন বড়দা ঠিকই কিন্তু বড়ো দা-র বদলে কাস্তে কাটারি কি খাঁড়া বললেই ঠিক বর্ণনা হয়। ছেলেবেলা থেকে বড় হওয়ার সুবিধের দরুন উনি সব কিছুতে আমায় ঠকিয়েছেন। আমি সাবালক হবার পর, পড়াশুনার জন্যে বিদেশে যাওয়ার পর আমাদের সমস্ত বিষয়-আশয়-সম্পত্তি নানান প্যাঁচে দখল করে...

অঃ অখিল!—আরাম-কেদারা থেকে অঘোর চক্রবর্তী এবার বকুনি দিয়ে বললেন,—এটা হাসি-তামাসার ব্যাপার নয়, তোমার ওই বিলেতি রসিকতা শুনে কেউ কেউ ভুল করে সত্যিও মনে করতে পারেন!

হায়, তাই যদি সত্যি হত!—বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার ভঙ্গি করে অঘোর চক্রবর্তীর ভাই অখিল বললেন—আমার মুখে সত্য কথা যখন তামাসা বলে মনে হয় তখন তুমিই যা বলবার বলো বড়দা।

হ্যাঁ, তাই বলছি, তোর মতো আহাম্মক দুনিয়ায় আর আছে কিনা এঁরাই বিচার করে দেখুন—বলে আরাম-কেদারায় সোজা হয়ে বসে অঘোরবাবু যে বিবরণ আমাদের শোনালেন তা সত্যিই বেশ অদ্ভুত। সংক্ষেপে বিবরণটা হলো এই যে অঘোর আর অখিল চক্রবর্তীর এক অদ্ভুত খেয়ালী মামা ছিলেন। তিনি এখনও আছেন কিনা তা ঠিক বলা যায় না, কারণ গত বারো বছর তিনি ভাগ্নেদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেননি। অঘোর-অখিলের এই খেয়ালী মামা অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। প্রথম-যৌবনেই দেশ ছেড়ে চলে গিয়ে কোথায় না গিয়েছেন আর কি না করেছেন তার সঠিক বিবরণ কেউ জানে না। ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকায় কখনো তিনি সার্কাসের দলে যোগ দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন বাঘ-সিংহ-বশের খেলা দেখিয়ে, কখনো রাশিয়া কি অস্ট্রেলিয়ায় কোনো পরীক্ষাগারে বিজ্ঞান-গবেষণার কাজে কাটিয়ে দিয়েছেন বছরের পর বছর। এই খেয়ালী ভবঘুরে জীবনের মধ্যে ভাগ্নেদের সঙ্গে যোগাযোগ কিন্তু তিনি রেখেই চলতেন। দু-দশ মাস চুপ করে থাকলেও দু-তিন বছরে একবার তিনি ভাগ্নেদের খবর নিতে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে কখনো ভুলতেন না। শেষ এই যোগাযোগের চেষ্টা তিনি করেন প্রায় বারো বছর আগে। তাঁর যোগাযোগ করার চেষ্টার মধ্যে একটা মজার ব্যাপার ছিল, ভাগ্নেদের কাছে কিছু-না-কিছু টাকা পাঠানো, আর সেই সঙ্গে এই বলে আশ্বাস দেওয়া যে তারা যদি যথার্থই সাচ্চা হয় তাহলে তিনি তাদের বড়লোক করে দিয়ে যাবেনই। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে ফাঁকি থাকলে তাদের সব পাওয়া ফক্কিকার হয়ে যাবে।

এসব বুকনি মামার বুড়ো বয়সের মাথা খারাপের লক্ষণ বলেই মনে হয়েছে তাঁর ভাগ্নেদের। কারণ টাকাকড়ি নয়, বারো বছর আগে মামার কাছ থেকে শেষ যা এসেছে তা একই বই-এর

বারোটা কপির একটি সেট। বইটাও অসাধারণ কিছু নয়। বহুকাল আগে সেই চল্লিশের দশকে তোলা একটি ইংরেজি ছবির ছাপানো চিত্র-নাট্য মাত্র। এই বই-এর সেটের সঙ্গে মামার একটা চিঠিও যা এসেছিল তাতে মাথা খারাপের লক্ষণ একেবারে স্পষ্ট। সে চিঠিটা এইভাবে লেখা যে মামাবাবু তাঁর আসল কাজটা সেরে বিলেতে এসে পৌঁছে প্রথমেই যে নতুন বই-এর খোঁজ পেয়েছেন তার বারোটা কপি একসঙ্গে করে কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এ বই-এর কদর যে বুঝবে তার...

ভাগ্নে অখিল মামার মতই ভবঘুরে বলে মামাবাবু তাঁর চিঠিপত্র টাকাকড়ি কলকাতায় ভাগ্নেদের পৈতৃক বাড়ির ঠিকানাতে পাঠাতেন। শেষ চিঠি আর বই-এর সেটও তাই পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটা আর তার সঙ্গে পাঠানো বই-এর পার্সেলসুদ্ধই—মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রমাণ বলে ধরে নিয়ে বইগুলো বাড়ির একটা চোরা কুঠুরির মতো ঘরে বন্ধ করে, প্রলাপ মার্কা চিঠিটা একটা দেরাজের ড্রয়ারে তুলে রেখে তার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন।

এ বই-এর পার্সেল আর চিঠি যখন কলকাতার বাড়িতে আসে তখন অখিল তাঁর স্বভাব অনুযায়ী বিদেশে কোথায় ঘুরছিলেন। তিনি ফিরে আসবার পর অঘোর তাঁকে বই-এর সেটটা দেখিয়ে মামাবাবুর প্রলাপ সে চিঠিটার কথাও বলেছেন। অখিল তাতে কোনও উৎসাহ কিন্তু দেখাননি। তাঁর টনক নড়েছে এতদিন বাদে, কুঠুরি ঘরে অকারণে জমা হয়ে থাকা বইগুলো তাঁর বড়দা অঘোর নেহাৎ ফালতু জঞ্জাল বলে পুরনো বই-এর দোকানদারদের কাছে বিক্রী করে দেবার পর। এই সূত্রে মামাবাবুর চিঠিটার কথাও তাঁর মনে পড়েছে। অঘোরকে দিয়ে চিঠিটা বার করে তার কোনও অর্থ বুঝতে না পারলেও হয়ত দোকানীদের কাছে বিক্রী করে দেওয়া বইগুলোর কোনোটার মধ্যে গুপ্ত কিছু হদিস পাওয়া যেতে পারে মনে করে অস্থির হয়ে তাঁরা বিক্রী করে দেওয়া বইগুলো আবার ফিরে পাবার জন্যে ছোটাছুটি করেছেন ও করছেন।

নিজের বিবরণ শোনাতে শোনাতে অঘোর চক্রবর্তী পরাশরকে জিজ্ঞাসা করেছেন—কি রকম হদিস সেখানে পাওয়া যেতে পারে তা কিছু বুঝতে পারছেন?

না। তা এখনো পারছি না।—বলেছে পরাশর,—কিন্তু আপনার কাছে পাঠানো মামাবাবুর চিঠিটা একবার দেখতে পারলে ভালো হত।

সে আর কি দেখবেন! পাগলের প্রলাপ।—বলে মুখে বিদ্রূপ করলেও অঘোর চক্রবর্তী আরাম-কেদারা ছেড়ে উঠে ভেতরের ঘরের কোনো দেরাজ থেকে চিঠিটা বার করে এনে পরাশরের হাতে দিয়েছেন—

সত্যিই পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু ওকে ভাবা যায় না।

ছোট্ট মাপের চিঠি।

তাতে বারবার শুধু এই লেখা,—

লিন্‌থ গিয়ে পড়,
লিম্মাত আসে বেরিয়ে
কেল্‌টিক হেলভেতি দেয় আদি বসতি
রোম্যানরা শুল্ক-ঘাঁটি বসায়
নাম দেয় টিউরিক্যাম।
সেখানে কুবেরের বন্ধ মুঠো খুলতে
আসুক শুভঙ্করী অঙ্কে দুলতে দুলতে।

এরপর চিঠিতে যা লেখা হয়েছে তা নেহাৎ প্রলাপ ছাড়া আর কিছু কি হতে পারে! সেখানে লেখা—

খুঁজে পেতে প্রকাশনার বছর
তার পেছনে লাগাও

শেষ পাতায় যা আছে ছাপা
সেই গোনা নম্বর।
তবেই দেখবে—
এর পরে আর থাকবে নাকি
আরো কিছু খেল কি?

চিঠিটা দেখাতে দেখাতেই হেসে ফেলে অঘোর চক্রবর্তী বলেছেন, দেখছেন তো স্রেফ বুড়ো হয়ে ভীমরতি ধরার পরে পাগলের প্রলাপ। চিঠিতে কিছু হবে না, তবে যে দু-একটা বই এখনো বাজারে হারিয়ে আছে সেগুলো পেলে হয়তো অন্য হদিস মিলতেও পারে।

সেই আশাই করা যায়—বলে পরাশর আমার সঙ্গে দুই ভাই-এর কাছে বিদায় নিয়ে চলে এসেছে।

রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে একটু বিষণ্ণ মনেই পরাশরকে জিজ্ঞাসা করেছি—আচ্ছা, ওই চক্রবর্তীদের মামার ওই চিঠির কথাগুলো তাহলে নেহাৎ প্রলাপ! সত্যিকার মানে-টানে ওর কিছু হয় না।

কে বললে হয় না—পরাশর-ই হাসিমুখে জোর গলায় বললে—আসবার আগে ছোট ভাই অখিল চক্রবর্তীর মুখটা লক্ষ্য করেছিলে? চোখ দুটো যেন উৎসাহে উত্তেজনায় জ্বলছে। কাল পর্যন্ত ও এদেশে থাকবে কিনা সন্দেহ।

তার মানে? কোথায় যাবে!—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

কোথায় আবার, সোজা সুইজারল্যান্ডের জুরিখ শহরে—উৎফুল্ল মুখ বললে পরাশর।

তার মানে?—বিস্ময় বিহ্বল ভাবে বললাম,—ওই জুরিখ শহরের হদিসই ও-চিঠিতে দেওয়া আছে?

তা ছাড়া কি—বললে পরাশর,—শুধু জুরিখ শহরেরই হদিস নয়, সেখানকার সুইস ব্যাঙ্কের টাকা জমা এবং তা তোলার যা একমাত্র উপায় সেই গুপ্ত সংখ্যাও বলে দেওয়া আছে ছড়ার সঙ্গে। শোনা, লিন্থ যেখানে পড়ে আর লিমাথ নদী যেখান থেকে বার হয় সে হলো জুরিখ হ্রদ। বহু বহুকাল আগে হেলভেতি নামে এক কেল্টিক জাতির শাখা ওখানে বসতি করে। তারপর রোম্যানরা ওখানে শুল্ক আদায়ের এক ঘাঁটি বসায়, যার নাম ছিল ট্যুরিকম্। এরপর সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে ধনী শহর জুরিখ সেখানে গড়ে ওঠে। সেখানকার ব্যাঙ্ক সারা পৃথিবীর তুলনাহীন। অঘোর আর অখিলের মামা সেই ব্যাঙ্কেই তাঁর টাকা রেখে কাগজপত্রের সঙ্গে ব্যাঙ্কের নিজস্ব সিন্দুক খোলার গুপ্ত সংখ্যা পর্যন্ত এই চিঠিতে এমনভাবে জানিয়ে দিয়ে গেছেন যাতে বড় ভাগ্নে অঘোর যাঁকে বরাবর ঠকিয়ে এসেছেন, সেই ছোট ভাগ্নেই যাতে তাঁর গুপ্ত সঞ্চয় পান। বড় ভাগ্নের স্বার্থপরতার কথা জানতেন বলেই এই ব্যবস্থা তিনি করে গেছেন।

অখিলের মুখচোখের ঝলমলানি দেখে বুঝেছি তাঁর মামাবাবুর শেষ ইচ্ছা পূরণের আর খুব দেরী হবে না।

[শারদীয়া ১৩৯৩]

গুপ্তধনের সন্ধানে
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই মেয়ের দল হইহই করে বেরিয়ে পড়ল। শ্রাবণী, অদিতি, মধুছন্দা, সমাপ্তি, মিতালী আর জয়শ্রী—এরা মাঠে গিয়ে গোল হয়ে বসল। সবাই ঝরিয়া কীর্তিচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। সাত ক্লাসে পড়ে। এই ছজন এক প্রাণ, এক মন। স্কুলে সব সময়ে একসঙ্গে।

শ্রাবণী বলল, এই মিতালী, টিফিনের সময় কি বলবি বলেছিলি বল?

মিতালী টিফিন বাক্স খুলে পাঁউরুটির টুকরো বের করে সকলের হাতে দিল। অদিতি সন্দেশ এনেছিল, তাই সবাইকে বিলি করল।

শ্রাবণী বলল, তোদের একটা নতুন জিনিস খাওয়াব। কলকাতায় আমার দিদার বাড়ি থেকে আমের আচার এনেছি। পাঁউরুটি দিয়ে ভালই লাগবে। এই নে।

শ্রাবণী ছোট একটা কাচের শিশি বের করে সকলের সামনে রাখল। আচারের নামে মেয়েরা পাগল। সবাই শিশি খুলে আচার পাঁউরুটিতে মাখিয়ে নিল।

জয়শ্রী আবার মনে করিয়ে দিল।

কিরে মিতালী, কি বলবি বল। এখনই তো ঘণ্টা পড়ে যাবে।

হাতের ওপর গড়িয়ে আসা আচার চাটতে চাটতে মিতালী বলল, বলছি, সে ভারী মজার কথা।

মেয়েরা আরও ঘন হয়ে বসল।

মিতালী বলতে আরম্ভ করল।

কাল রাতে বাবা মাকে যা বলছিল আমি সব শুনতে পেয়েছি। সেই কথাই তোদের বলব। রাজবাড়ির পিছনে টিলার পাশে যে ভাঙা বাড়িটা আছে সেটা আমাদের জানিস তো। মেরামত হয়নি বলে বাড়িটার ওই অবস্থা। কেউ ওখানে থাকে না। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা এই বাড়িটা পেয়েছিল।

মধুছন্দা জিজ্ঞাসা করল, পেয়েছিল মানে?

মিতালী বলল, পেয়েছিল মানে, জানিস তো অনেক আগে ঝরিয়া বাংলাদেশের মধ্যে ছিল। মোগল আমলে একজন মনসবদার ছিল নাজামউদ্দিন। এসব জায়গা সেই দেখাশোনা করত। লোকটা ভীষণ অসৎ ছিল আর মতলববাজ। প্রজাদের কষ্ট দিয়ে অনেক টাকাকড়ি করেছিল। ওই বাড়িতে সেই সব টাকাকড়ি জমিয়ে রাখত। যে সব প্রজারা তার কথা শুনত না, কিংবা গোলমাল করত, তাদের ওই বাড়ির চোরা-কুঠুরিতে পুরে রাখত। না খেতে পেয়ে খিদেয়, তেষ্টায় তারা সব মরে যেত।

দিনকাল বদলাল। মোগলদের কাছ থেকে দেশ ইংরেজদের হাতে চলে এল। ওই বাড়িও ইংরাজরা নিয়ে নিল।

আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা ইংরাজদের কুঠিয়াল ছিলেন। তাদের ব্যবসার অনেক খোঁজখবর দিতেন। ফলে তিনি খুব বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। কানিংহাম সায়েব ওই বাড়িটা আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দাকে উপহার দেয়। আমার বাবার ধারণা খোঁজ করলে ও বাড়িতে এখনও কিছু ধনরত্নের সন্ধান মিলতে পারে।

মধুছন্দা প্রশ্ন করল, তোর বাবা খোঁজ করছেন না কেন?

মিতালী বলল, মাও তো বাবাকে সেই কথাই বলছিল। একদিন লোকজন ডেকে বাড়িটা পরিষ্কার করাও না। যদি কিছু পাওয়া যায়। আজকাল সোনার যা দাম হচ্ছে।

বাবা বলল, লোকজন ডাকলে সব জানাজানি হয়ে যাবে, তার চেয়ে ভাবছি আমি দিন সাতেকের ছুটি নেব, নিয়ে বাড়িটার মধ্যে ঢুকব।

মিতালী একবার সব মেয়েদের মুখের দিকে দেখে নিয়ে বলল, আমি কি ভাবছি জানিস?

কি? কি?

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

বাবা ছুটি নিয়ে বাড়িতে ঢোকার আগে, চল দল বেঁধে আমরাই যাই। কাল থেকে তো স্কুল ছুটি হয়ে যাচ্ছে। প্রচুর অবসর। ধনরত্নের আমাদের খুব দরকার।

শ্রাবণী বলল, ঠিক বলেছিস। দরকারের সময় একটা পয়সা আমরা হাতে পাই না। দেখ না, জন্মদিনে কতগুলো টাকা পেলাম, সব কৌটোর মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম, মা হঠাৎ বলল, শ্রাবণী তোর কৌটো থেকে পয়সা নিচ্ছি, রেডিয়োটা সারাতে হবে। ব্যস, সব পয়সা শেষ। আর একবার বাবাও মাথায় হাত বুলিয়ে ছাতা কেনবার নাম করে আমার পয়সা নিয়েছিল।

দেখা গেল সব মেয়েরই দারুণ অর্থাভাব। মোগল আমলের কিছু ধনরত্ন পেলে খুবই ভাল হয়।

অদিতির একটু সাহসের অভাব। সে এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। এবার বলল, কিন্তু যে সব প্রজাদের না খেতে দিয়ে মেরে ফেলেছিল তাদের অতৃপ্ত আত্মারা ওখানে নেই তো? তারা যদি গোলমাল করে? আমি আবার ভূতপ্রেত একেবারে সহ্য করতে পারি না।

মিতালী ঠোঁট বেঁকাল, শোন অদিতির কথা। ভূতপ্রেত আবার আছে নাকি। মানুষ মারা গেলেই তো শেষ।

সমাপ্তি আর থাকতে পারল না। বলল, যাক, ওসব বাজে কথা, আমরা কবে ওই বাড়িতে যাচ্ছি, তাই বল। এবার কলকাতায় গিয়ে যা চমৎকার গোটা কয়েক ফ্রক দেখে এসেছি। বড্ড দাম, ওই ধনরত্নগুলো পেলে আর ভাবনা নেই।

ঠিক হ'ল কাল থেকে ছুটি। কালকের দিন বাদ দিয়ে পরশু দিনই ওই বাড়ির মধ্যে ঢোকা হবে। ইতিমধ্যে মিতালী বাড়ির সদর দরজার চাবিটা যোগাড় করে রাখবে।

জয়শ্রী বলল, শোন, কিছু টর্চ আর গোটা কয়েক থলে সবাই সঙ্গে নিবি। অন্ধকারে টর্চ খুব কাজে লাগবে আর ধনরত্ন বয়ে আনার জন্য থলেও দরকার।

এও ঠিক হ'ল, দুপুর বেলা সবাই বাড়ির মধ্যে ঢুকবে আর সন্ধ্যার সময় অদিতিদের মোটর টিলার নীচে অপেক্ষা করবে, না হ'লে অত ধনরত্ন বয়ে আনা সম্ভব নয়।

শ্রাবণীদেরও মোটর আছে, কিন্তু মোটর চালায় শ্রাবণীর বাবা। তার বাবা গেলে আর ধনরত্নের একটি টুকরোও মেয়েরা পাবে না।

ঠিক দিনে দুপুর বেলা শ্রাবণীদের উঠানে সবাই এসে জড় হ'ল। শ্রাবণীর বাবা কোর্টে, মা ঘুমে অচেতন। কাজেই কোন অসুবিধা নেই।

জয়শ্রী বলল, আমি পাঁজি দেখেছি। দুপুর একটা বাইশ মিনিটে যাত্রা শুভ। এখন ঠিক একটা, আর বাইশ মিনিট পরে আমরা রওনা হব।

ছজন মেয়ে চারটে টর্চ এনেছে, কিন্তু সকলের হাতেই পাট করা কাপড়ের থলে।

ঠিক একটা বাইশে মেয়েরা যাত্রা শুরু করল।

রাজবাড়ি পিছনে রেখে টিলা পার হয়ে চলল। এখানে রাস্তা নেই, পায়ে চলা সরু পথ। তেঁতুল, বট আর অশথ গাছে দিনের বেলাতেও জায়গাটা অন্ধকার। ঝিঁঝি ডাকছে। গাছের গুঁড়ি বেয়ে কাঠবিড়ালী ওঠা-নামা করছে।

মেয়েরা সন্তর্পণে পা ফেলে এগোতে লাগল।

বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল জরাজীর্ণ একটা বাড়ি। ইটের ফাঁকে ফাঁকে বট-অশথের চারা। সামনের বারান্দাটা ভেঙে মাটিতে পড়ে গেছে। ছাদের কিছুটা নেই। বাড়িটার আদিতে কি রং ছিল বলা মুশকিল, এখন বৃষ্টির প্রকোপে কালো একটা আস্তরণ পড়েছে।

মিতালী হাত তুলে দেখাল, ওই আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার বাড়ি। দেখেই মনে হচ্ছে ভিতরে ধনরত্ন ঠাসা।

শ্রাবণী মনে করিয়ে দিল, চাবিটা এনেছিস তো?

মিতালী নিজের গলার হারটা তুলে ধরল। সবাই দেখল হারের সঙ্গে মস্ত বড় একটা পিতলের চাবি।

মেয়ের দল দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মিতালী আগে, পিছনে আর সব।

বাড়ির তুলনায় দরজার আয়তন খুব ছোট। দরজার ওপর উর্দু ভাষায় কি সব লেখা রয়েছে।

মিতালী বলল, জয় গুরু, তারপর নীচু হয়ে দরজাটা খোলার জন্য চাবি বের করল।

দুটো বিরাট গাছ ডালপালা ছড়িয়ে এদিকে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে জায়গাটা রীতিমত অন্ধকার।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করে মিতালী বলল, কইরে তালা তো খুঁজে পাচ্ছি না। কুঁজো হয়ে আমার পিঠ ব্যথা হয়ে গেল। তোরা কেউ চেষ্টা কর।

এবার শ্রাবণী এগিয়ে গেল। হাতের টর্চ জ্বালিয়ে এদিক-ওদিক দেখে বলল, কই রে তালাই তো নেই। ভাঙা কবজা পড়ে রয়েছে।

জয়শ্রী বলল, সর্বনাশ, তাহলে নিশ্চয় কেউ আগে এসে ধনরত্ন সব নিয়ে গেছে। আমাদের পরিশ্রমই সার হ'ল।

মেয়েরা কেউ কিছু বলল না। শুধু মধুছন্দা গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজাটা কেঁপে উঠল, কিন্তু খুলল না।

তখন সব মেয়েরা একসঙ্গে দরজার ওপর এসে পড়ল, তারপর প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা।

ক্যাঁচ, কোঁচ, ক্যাঁচ। বিকট শব্দ করে দরজার পাল্লা দুটো হঠাৎ খুলে গেল। জয়শ্রী আর মধুছন্দা সামনে ছিল, তারা টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো কালো কালো ছায়া মেয়েদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল।

অদিতি কাঁপতে কাঁপতে বলল, রাম, রাম। নিশ্চয় সেই অতৃপ্ত আত্মা। যে সব প্রজাদের অনাহারে মেরে ফেলেছিল, তারা।

শ্রাবণী বলল, দূর, আত্মাটাত্মা নয়, বাদুড়। ওই দেখ না বাইরে গাছের ডালে সব ঝুলছে।

মেয়েরা কোমর বেঁধে সব ঢুকে পড়ল।

বাড়ির মধ্যে বিশ্রী একটা গন্ধ। নিশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না।

সমাপ্তি সাবধান করে দিল, এখন কেউ ভিতরে যেও না। অনেক বছর বাড়িটা বন্ধ ছিল, ভিতরে গ্যাস হয়েছে। একটু অপেক্ষা কর। বাইরের হাওয়া ভিতরে ঢুকুক।

মেয়েরা সবাই সার বেঁধে দরজার কাছে দাঁড়াল।

কেউ কেউ আবার নাকে কাপড় জড়াল।

একটু পরে একে একে সবাই ভিতরে ঢুকল।

পাশের ঘরটা খুব ছোট। তার ওপর অন্ধকার। অন্ধকারে চোখ একটু অভ্যস্ত হয়ে যেতে সকলে দেখল সার সার অনেকগুলো মাটির জালা।

মিতালী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, এর মধ্যে নিশ্চয় ধনরত্ন আছে। থলেগুলো নিয়ে আয়।

জয়শ্রী যেমনি সামনের মাটির জারে হাত ঢোকাতে গেছে, অমনি গম্ভীর গলায় আওয়াজ হ'ল, হুম্ হুম্ হুম্।

জয়শ্রী লাফিয়ে পিছিয়ে এল।

অদিতি জয়শ্রীর পিছনে ছিল। তার খুব ইচ্ছা, তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে বড় সাইজের মণি-মাণিক্যগুলো তুলে নেবে। সে তার বাবার কাছে শুনেছে, মোগল আমলে খুব দামী দামী হীরা-জহরত পাওয়া যেত। গোটা কয়েক সে রকম পেলেই আর দেখতে হবে না। সারাজীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটাতে পারবে।

হুম্ হুম্ শব্দ শুনে ওপর দিকে চেয়েই অদিতি হাঁউ মাঁউ করে চেঁচিয়ে উঠল, ওরে বাবারে গেলাম রে। আমাকে বাঁচাও।

মধুছন্দা জিজ্ঞাসা করল, তোর কি হ'ল রে? ওরকম করছিস কেন?

কোন কথা না বলে অদিতি আঙুল দিয়ে দেখাল।

সব মেয়েরা মুখ তুলে দেখল।

ঘন অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ। আগুনের ভাঁটার মতন।

মেয়েরা পিছিয়ে এল।

মিতালী বলল, ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। আগের দিনে ধনরত্ন আগলাবার জন্যে লোকেরা একজনকে মেরে যক্ষ বানিয়ে রাখত। সেই সব ধনরত্ন পাহারা দিত। ওটা হচ্ছে সেই যক্ষ।

অদিতি কেঁদে উঠল, আমার ধনরত্নে দরকার নেই ভাই। তোরা আমাকে বাড়ি পৌঁছে দে। আমি একলা যেতে পারব না।

হুম্, হুম্, হুম্।

গম্ভীর শব্দ খালি ঘরে যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। চোখদুটো আরও জ্বলতে লাগল।

অদিতির সেই দিকে চোখ পড়তেই সে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। দাঁতে দাঁতে আটকে গেল। মুখ দিয়ে উঁ উঁ শব্দ করতে লাগল।

অদিতি পড়ে যেতেই পটপট আওয়াজ। মেয়েদের মাথার ওপর দিয়ে সেই জ্বলন্ত চোখ ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গেল।

মিতালী বলল, পেঁচা, পেঁচা, লক্ষ্মীপেঁচা। অদিতি মিছামিছি ভয় পেল।

সমাপ্তি থলে দিয়ে অদিতির মুখে হাওয়া করছিল। সে বলল, লক্ষ্মীপেঁচা যখন আছে তখন নিশ্চয় ধনরত্নও আছে। মা লক্ষ্মীই তো সম্পদের দেবী।

একটু পরেই অদিতি চোখ খুলল। ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, আমি কোথায়?

জয়শ্রী বলল, তুই রাশি রাশি ধনরত্নের পাশে শুয়ে আছিস। কোন ভয় নেই। তুই যাকে যক্ষ ভাবছিলি সেটা যক্ষ নয়, লক্ষ্মীপেঁচা। আমাদের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়ে গেল।

সব শুনে অদিতি উঠে বসল, তারপর বলল, তাহলে আর আমরা দেরি করছি কেন? থলেগুলো বোঝাই করে নিলেই তো পারি।

সমাপ্তি মাটির জালার কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সে প্রথমেই জালার মধ্যে হাত ঢোকাল।

একটু পরেই চেঁচিয়ে উঠল, উঃ মা, কিরে এর মধ্যে।

সমাপ্তি হাতটা টেনে বের করতেই অন্য মেয়েরা হাতের ওপর টর্চের আলো ফেলল।

কনুই পর্যন্ত কালো হয়ে গেছে।

সমাপ্তি নিজের হাতটা নাকের কাছে নিয়ে গিয়েই নাক কোঁচকাল, কি বিশ্রী গন্ধ রে বাবা, অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার দাখিল।

শ্রাবণী এগিয়ে এসে শুঁকে বলল, এ তো পচা গোবর রে। জমিতে সার দেবার জন্য দরকার হয়।

মধুছন্দা বলল, সব জালাগুলোতেই কি গোবর আছে। হাত দিয়ে দেখ না।

কিন্তু দেখবে কে? দুর্গন্ধের জন্য কেউ হাত ঢোকাতে রাজী হ'ল না।

শেষকালে জয়শ্রী সব জালাগুলোর মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখল। সবগুলোতেই এক ব্যাপার। পচা গন্ধ। মনে হল এগুলোতে সার পচিয়ে রেখেছে।

শ্রাবণী বলল, এখানে কিছু নেই। চল পাশের ঘরে দেখা যাক।

সবাই পাশের ঘরে ছুটল।

ঢোকবার মুখেই বাধা। দরজায় পুরু মাকড়সার জাল। মেয়েদের চুলে, চোখে, মুখে জড়িয়ে গেল।

রুমাল দিয়ে মুখ-চোখ মুছে সবাই ভিতরে ঢুকল।

মধুছন্দা বলল, এই হাতের টর্চগুলো জ্বাল। এ ঘরে কি আছে দেখি।

চারজন মেয়ে চারটে টর্চ টিপল। বরাত, তিনটেই জ্বলল না। বোধ হয় ব্যাটারি খতম। শুধু অদিতির টর্চটা জ্বলল।

সেই আলোয় দেখা গেল কোণের দিকে অনেকগুলো বেতের ধামা। মেঝের ওপর টুকরো টুকরো কাঠ ছাড়ানো।

মিতালী বলল, এই অদিতি, তোর টর্চের আলো অত কাঁপছে কেন?

অদিতি কি উত্তর দেবে! তার সারা দেহই ঠকঠক করে কাঁপছে, সেইজন্য টর্চের আলোও কাঁপছে।

সমাপ্তি বলল, তুই এক কাজ কর অদিতি, টর্চটা এই কাঠের টুকরোর ওপর রাখ। তাহলে আলোটা কাঁপবে না। সবাই দেখতে পাবে।

পাশেই চৌকো একটা কাঠের বাক্স ছিল, অদিতি তার ওপর টর্চটা রাখল।

দু-এক মিনিট, তারপরই দারুণ কাণ্ড আরম্ভ হ'ল।

টর্চসুদ্ধ কাঠের বাক্সটা ছুটোছুটি আরম্ভ করল। একবার এদিক, আর একবার ওদিক, তারপর চরকির মতন বোঁ বোঁ করে।

কখনও কোন মেয়ের গায়ের ওপর এসে পড়তে লাগল।

এতক্ষণ কয়েকজন মেয়ে তবু সাহস করে এগোচ্ছিল, কিন্তু টর্চের কাণ্ড দেখে সবাই চেঁচামেচি শুরু করল।

অদিতি তো কাঁদতেই লাগল।

ওরে বাবা, ঘূর্ণীভূতের পাল্লায় পড়েছি। কে কোথায় আছ, বাঁচাও। আমার ধনরত্নে দরকার নেই। আমার যা আছে, সেই ভাল।

ছুটোছুটি করতে করতে জয়শ্রী আর মধুছন্দা নিজেদের মধ্যে ধাক্কা লেগে দুজনে দুদিকে ছিটকে পড়ল।

টর্চের থামবার নাম নেই। প্রচণ্ড বেগে ছুটোছুটি করে চলেছে।

শ্রাবণী বলল, চল, আমরা বেরিয়ে পড়ি। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

শ্রাবণীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের দল ছিটকে এদিকের ঘরে চলে এল।

তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে জয়শ্রী আর অদিতি পায়ে পায়ে জড়িয়ে একটা মাটির জালার ওপর সজোরে গিয়ে পড়ল।

ফটাস করে শব্দ। মাটির জালা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আর ভিতরের পচা সারে জয়শ্রী আর অদিতি স্নান করে উঠল।

আপাদমস্তক কুচকুচে কালো, শুধু চোখের দুটো সাদা অংশ দেখা গেল।

বিপদের ওপর বিপদ।

অদিতির সেই টর্চ মেয়েদের পিছনে এসে আগের মতন ছুটোছুটি শুরু করল।

সেই আলোয় অন্য মেয়েরা অদিতি আর জয়শ্রীর চেহারা দেখেই আঁতকে উঠল।

ওরে বাবা, ও দুটো পেত্নী নাকি রে?

অদিতি আর জয়শ্রী দুজনেরই নাকে কালো কালো সার ঢুকে গিয়েছিল। ভাল করে কেউ কথা বলতে পারছিল না।

মেয়েরা ভয় পাচ্ছে দেখে অদিতি বলল, এঁই আঁমাদের দেঁখে তোঁরা ভঁয় পাঁচ্ছিস কেঁন? আমাদের চিঁনতে পাঁরছিস নাঁ?

তার নাকি সুর শুনে মেয়েরা আরো ভয় পেয়ে গেল।

ঢোকবার সময় ঠেলে দরজা খুলে সবাই ঢুকেছিল, সেই দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেছে। মেয়েরা অনেক চেষ্টা করেও ভিতর থেকে দরজা আর খুলতে পারল না।

সর্বনাশ, সারারাত এই ভুতুড়ে বাড়িতে বন্ধ থাকলে কেউ প্রাণে বাঁচব না। মেয়েরা কান্না শুরু করে দিল।

মেয়েদের কান্না ছাপিয়ে হঠাৎ শোঁ শোঁ আওয়াজ শোনা গেল। মনে হ'ল, ঘরের মধ্যে দুটো দৈত্য বুঝি ঝটাপটি শুরু করেছে।

টর্চটা এখন এক জায়গায় স্থির হয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে বিকট শোঁ শোঁ আওয়াজে চরকি ভূতও বুঝি ভয় পেয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে অদিতি আর জয়শ্রী নিজেদের রুমাল, ফ্রক আর কাপড়ের থলি ঘষে ঘষে গা থেকে পচা সার অনেকটা উঠিয়ে ফেলেছে। তাদের এবার চেনা যাচ্ছে।

সব মেয়েরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণপণ শক্তিতে দরজা ধরে টানল, কিন্তু দরজা এক ইঞ্চি ফাঁক হ'ল না।

মধুছন্দা আর সমাপ্তি দরজার কাছে মুখ রেখে চেঁচাল। কে আছ বাঁচাও। আমরা ছজন মেয়ে এই পোড়ো বাড়িতে আটকে পড়েছি।

কোন সাড়া নেই।

অদিতি বলল, আরও জোরে চেঁচা, রাজবাড়িতে অনেক লোক আছে। তারা যদি শুনতে পায়, ঠিক বাঁচাতে আসবে।

এবার সবাই চেঁচাতে আরম্ভ করল।

বাইরে থেকে সাহায্যের জন্য কেউ তো এলই না, বরং মেয়েদের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে টর্চ আবার ছুটোছুটি শুরু করল। এবার আরও বিদ্যুৎ-বেগে।

প্রথমে মিতালীর চোখে পড়ল।

আলোটা স্থির নয়, অনবরত ঘুরছে, কিন্তু তাতেই দেখা গেল।

ওই দেখ।

মিতালী আঙুল দিয়ে দেখাল।

পিছনের দেয়ালে হাত তিনেক লম্বা একটা সাপ। গাঢ় কালো রং, বেশ মোটা।

এক ভাবে চুপ করে রয়েছে।

মারাত্মক অবস্থা। চারদিক বন্ধ। পালাবার কোন পথ নেই। এই সময় ওই সাপটা যদি লাফিয়ে নীচে পড়ে, তাহলে কাউকে আর বাঁচতে হবে না। সাপের যা আকৃতি, পাহাড়ে সাপ, নিশ্বাসে বিষ।

মেয়ের দল সবাই পিছনের দেয়াল থেকে যতটা সম্ভব সরে এল।

অদিতি কাঁদতে কাঁদতে বলল, কি মুশকিলেই যে পড়েছি। কাকে ডাকি বল তো? রামকে, না মা মনসাকে। কে বাঁচাবে। এদিকে ঘূর্ণীভূত আর ওপরে ফোঁস।

মেয়েরা কোন উত্তর দিল না, কিন্তু সবাই মনে মনে মনসা আর রামনাম জপ করতে লাগল।

হঠাৎ আবার শোঁ শোঁ শব্দ। বিকট শব্দ করে দরজার পাল্লা দুটো খুলে গেল।

বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি নেই। হালকা রোদ উঠেছে।

দরজার পাল্লা দুটো খুলতেই আর এক কাণ্ড। একটা পাল্লা সবেগে টর্চের ওপর গিয়ে পড়তেই, টর্চটা ঠিকরে পড়ল, আর কাঠের বাক্সটা উলটে যেতেই তার মধ্যে থেকে বিরাট সাইজের একটা ইঁদুর ছুটে পালাল।

জয়শ্রী বলল, ওমা, চরকি ভূত নয়, বাক্সের মধ্যে ইঁদুর ঢুকে ছুটোছুটি করছিল। এবার অদিতি সাহস করে পিছনের দেয়ালের দিকে দেখল।

সাপ নয়, আঁকাবাঁকা একটা ফাটল। বাইরের রোদে এবার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

মেয়েদের চেহারা যা হয়েছে দেখবার মতন। কেউ খোঁড়াচ্ছে, কারও ফ্রক ছিঁড়ে গেছে, একজনের মুখ ভরতি মাকড়সার জাল, দুজনে তো পচা সারে স্নান করে উঠেছে।

জয়শ্রী বলল, এই নাক-কান মলছি, আর আমার ধনরত্নে দরকার নেই। ভগবান যা দিয়েছেন তাই ভাল। এখন ভালয় ভালয় বাড়ি পৌঁছতে পারলে বাঁচি।

সকলে ক্লান্ত পায়ে পোড়ো বাড়ি থেকে বেরিয়ে টিলার পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

ওদিকে অদিতিদের মোটর থাকবার কথা। না হলে এ পোশাকে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে সবাই পাগলী বলবে।

একটু পরেই রোদটুকু কমে গেল। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। ঘন অন্ধকার নামল।

বটগাছতলা দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে বাজখাঁই আওয়াজ উঠল।

গোলেমেলে লেলুয়া।

জয়শ্রী আর মধুছন্দা ধার দিয়ে যাচ্ছিল, চিৎকার শুনে তারা ছুটতে শুরু করল।

ওরে বাবারে, ভূত এখনও আমাদের ছাড়েনি। পিছন পিছন এতটা রাস্তা এসেছে।

বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখা গেল, ভূত নয়, বান্টু। শ্রাবণীর ভাই।

থলিতে দেহ ঢেকে শুধু মুখটা বের করে বটগাছ তলায় বসে আছে।

সে বলল, মা আমাকে আর একটা থলি দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিছু বেশী ধনরত্ন নিয়ে যাবার জন্য।

মেয়েরা আর কথাটি বলল না। মুখও তুলল না।

সরু পথ দিয়ে দৌড়তে শুরু করল। থলেগুলো মাথায় দিয়ে।

বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে।

[কার্তিক ১৩৮৩]

শাহাজাদা সুজার সিন্দুক

ধীরেন্দ্রলাল ধর

গোবিন্দ একটি স্যুটকেস হাতে নিয়ে বাস থেমে নামলো। গোপালও তার অনুসরণ করলো।

গোবিন্দ বললো—এবার অনেকখানি পথ হাঁটতে হবে।

গোপাল বললো—কেন, রিকশা পাওয়া যাবে না?

—না। এখানে নগদ পয়সা দিয়ে রোজ রোজ রিকশা ভাড়া করার মতো মানুষ নেই, এত পয়সাও নেই।

দুজনে গ্রামের পথে হাঁটতে শুরু করলো।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। গ্রামের পথ বেশ ফাঁকা হয়ে এসেছে। পথের একদিকে মাঠ আরেক দিকে বাড়িঘর। বেশির ভাগই পাকা বাড়ি, নয়তো টিনের চালা। চাতালে কিছু কিছু বাসিন্দাদের দেখা যাচ্ছে। তারা কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে এই নবাগত পথিকদের পানে তাকাচ্ছে।

শেষে একটা পাঁচিলঘেরা বাড়ির ফটকের সামনে তারা এসে পড়লো। ফটক খোলাই ছিল। পাশেই দরোয়ানের ঘর। গোবিন্দ ডাকলো—দরোয়ান! নকুল!

ঘরের পিছন থেকে একটি মানুষ ছুটে এলো, বারেক অবাক হয়ে তাকালো গোবিন্দর পানে। তারপর বললো—ছোটবাবু? এসেছেন? কত বচ্ছর পরে এলেন!

—তুমি ভাল আছ তো নকুল? দেবুয়া ভাল আছে? দেবুয়া নকুলের ছেলে।

—এই তো দেবুয়া এখানে ছিল বাবু, গেল কোথায়? দেবুয়া—দেবুয়া—

—ঠিক আছে, সে আসুক। তুমি আমাদের থাকার ঘর খুলে দাও। আমরা দুজনে থাকবো। খাবো।

—সব ঠিক আছে বাবু, আগে একটা আলো জ্বেলে নিই।

ঘর থেকে একটা হ্যারিকেন জ্বেলে নিয়ে নকুল এলো।

চওড়া বারান্দা, পাশে সারি সারি কয়েকখানা ঘর। প্রথম ঘরখানাই নকুল খুলে দিলে। বললো—আজ এই ঘরেই থাকুন বাবু, কাল পছন্দ মতো ঘর দেখে নেবেন।

বড় ঘর। অর্ধেকটা জুড়ে তক্তাপোশ পাতা। তার উপর একখানা শতরঞ্জি গুটানো রয়েছে। পাশে একটি টেবিল, একখানা বেতের ইজিচেয়ার আর একটি লম্বা বেঞ্চি। নকুল বললো—ঘরটা একটু ঝাড়মুছ করে দিই, আপনারা বাইরে একটু দাঁড়ান।

দুজনে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। বাইরে তখন অন্ধকারে গ্রামের স্তব্ধতা নেমে এসেছে।

দশ মিনিটের মধ্যে ঘর সাফ হলো। ঘরের মধ্যে ওরা এসে জামাকাপড় বদলাচ্ছে এমন সময় দেবুয়া এসে পড়লো। বছর পঁচিশের এক যুবক। নকুল বললো—দেবুয়া, ছোটবাবু এসেছেন, মুখ ধোয়ার জল তুলে দে—

দেবুয়া অবাক হয়ে তাকালো—ছোটবাবু!

গোবিন্দ বললো—হ্যাঁ। আমি আর আমার সঙ্গী। আমরা এখন এখানে দু-দশ দিন থাকবো।

—বেশ তো বাবু, বেশ!

।। দুই ।।

গোবিন্দ ও গোপাল বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। একসময় নকুল এসে বিস্কুট আর চা দিয়ে গেল। তারপর পাশের ঘরখানা খুলে, অন্ধকারের মধ্যেই দুখানা স্টীলের চেয়ার বের করে এনে পেতে দিলে, বললে—বাবুরা বসুন। আলোটা নিয়ে আসি—

গোবিন্দ বললো—আলোর দরকার নেই। এই অন্ধকারই বেশ লাগছে।

গোপাল বললো—ওদিকে তো গ্রামের ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, আর এই বাড়ি থেকেই ভুতুড়ে অন্ধকার।

নকুল বললো—লোকেও এই বাড়িটাকেই ভূতের বাড়ি বলে ছোটবাবু, পিছন দিকটা সবই তো ভেঙে পড়েছে,—রাবিশের পাহাড় হয়ে আছে, তার পরেই তো জঙ্গল। ওই পোড়ো বাড়িতে রাতবিরেতে মানুষ দেখা যায় বাবু। বড়বাবু কতবার দেখেছেন। সেইজন্যই তো তিনি একা মানুষ, ওদিকটা সব বন্ধ রেখে, এই ঘরখানায় থাকতেন, আমার ঘরের সামনাসামনি। তাছাড়া এই ঘর থেকে আমার ঘর অবধি একটা দড়ি বেঁধে ঘণ্টা ঝুলানো আছে, রাতে দরকার হলে বাবু আমাকে ওই ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকতেন। আপনারাও রাতে ঘর থেকে বেরুতে হলে ঘণ্টা বাজিয়ে আমাদের ডাকবেন। এই যে—

নকুল ওদিকে সরে গিয়ে জানালা থেকে ঝুলানো একটা দড়িতে টান দিল, শোনা গেল দরোয়ানের ঘরে ঠংঠং করে ঘণ্টা বাজছে।

গোবিন্দ বললো—তুমি কি ভয় দেখাচ্ছ নাকি নকুল?

—না বাবু, সাবধানে থাকাটাই ভাল, কর্তাবাবু কত রাতে চাঁদের আলোয় পিছনের পোড়ো বাড়িতে মানুষ দেখেছেন।

গোবিন্দ বললো—বেশ বেশ আমরাও দেখবো। দরকার হলে আলাপ করবো। আমাদের বন্দুক আছে।

—বন্দুক? কই আনেননি তো। কর্তাবাবুর বন্দুক ছিল, কর্তাবাবু মারা যাবার পর পুলিশ নিয়ে গেল।

—আমাদের ছোট বন্দুক, মানে পিস্তল আছে। ভূতকে সামনে এলেই গুলি খেতে হবে।

নকুল আর কিছু বললো না, চা খাওয়া শেষ হওয়া অবধি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর কাপ দুটি নিয়ে গেল।

গোবিন্দ বললো—এক বিঘের উপর এই বাড়ি আর পাঁচ বিঘের বাগান। এককালের একটা বড় জমিদারির এই অবশেষ। এখন কয়েকটা দিন এখানে থেকে সব বিলি-ব্যবস্থা করে যাই। কাজের ভিড় থেকেও ক'দিন ছুটি পাওয়া যাবে।

ঘণ্টাখানেক পরে নকুল খাবার নিয়ে এলো। ভাত, ডিমের ডালনা আর পাঁপড় ভাজা। বললো—বাবুরা আজ এই খান, কাল সকাল থেকে মাছের ব্যবস্থা করবো।

দেবুয়া এলো পিছনে জলের জগ নিয়ে।

খেতে বসে গোপাল সহসা প্রশ্ন করলো—নকুল, তোমরা ভূত দেখেছ?

—রাতে ওসব কথা থাক বাবু, যা শোনবার সকালে দিনে দিনে শুনবেন। তবে রাতে বাবু ঘণ্টা বাজিয়ে আমাকে না ডেকে ঘর থেকে বেরুবেন না।

।। তিন ।।

রাতে ঝড় উঠলো, তারপরেই শুরু হলো ঝমাঝম বৃষ্টি।

বিছানার দিকের জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে দুজনে শুয়ে পড়লো। শুতে-না-শুতেই ঘুম।

কোনো একসময় গোবিন্দের মনে হলো তার গায়ের উপর দিয়ে কে যেন হাত বুলাচ্ছে। ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখলো—সত্যি তার দেহের উপরে বুকের কাছে একখানি সাদা হাত—পাঁচটি আঙুল,

কবজি অবধি সাদা, আলোকিত। বিস্ময়ে ও ভয়ে গোবিন্দ শুধু তাকিয়েই রইলো। হাতখানি একসময় নেমে এলো তার কপালের উপরে—কনকনে বরফের মতো ঠাণ্ডা। গোবিন্দের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো।

পরক্ষণেই তার পিস্তলটার কথা মনে পড়লো। বালিশের তলাতেই তো সেটা আছে। কিন্তু বালিশের তলায় হাত দিয়ে পিস্তল পেলে না। তারপরেই দেখলে সেই সাদা হাতখানি পিস্তলটি ধরে তার পানে তাক্ করেছে—সর্বনাশ, পিস্তলে তো গুলি ভরা আছে!

পরক্ষণেই পিস্তলের মুখ ঘুরে গেল। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের পানে সট্ সট্ করে দুটো গুলি চালিয়ে দিয়ে হাতখানি পিস্তলটাকে টেবিলের উপর ফেলে দিলে, তারপরেই হাসির শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে হাতখানি মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণে গোবিন্দ যেন কিছু সচেতন হলো। টর্চের কথাটা মনে এলো। বালিশের পাশ থেকে টর্চ টেনে নিল, জ্বাললো।

গোপালও তখন উঠে বসেছে, বললো—ব্যাপারটা কি হলো?

টেবিলের উপর হ্যারিকেনটা মিটমিট করে জ্বলছিল, গোবিন্দ এবার সেটাকে বাড়িয়ে দিল। ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ। ওদিকের জানালাগুলো যেমন খোলা ছিল তাই আছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ঝিমঝিমে অন্ধকার রাত। গোবিন্দ বালিশের তলা থেকে হাতঘড়িটা নিয়ে দেখলো রাত বারোটা বেজেছে। এই দুপুর রাতে ঘরে ভুতুড়ে হাত!

গোবিন্দ বললো—হাতখানা আমার কপালে রেখেছিল, ঠাণ্ডা বরফের মতো।

গোপাল বললো—ভূতে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আজ বিশ্বাস করতে হলো।

—কিন্তু ভূত তো ছায়া, সেই ভূত পিস্তল তুলে নিয়ে গুলি চালালো?

—কিন্তু আলোচনা করে এসব ব্যাপারের ফয়সালা করা যায়! হ্যারিকেনটা কমিয়ে দিয়ে দুজনে আবার শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুম তখন আর চোখে নেই।

।। চার ।।

সকালে নকুল যখন চা-বিস্কুট নিয়ে এলো, গোবিন্দ বললো—জানো নকুল, কাল রাতে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। দুপুর রাতে ঘরের মধ্যে একটা কাটা হাত এসে ঢুকেছিল।

নকুল সব শুনলো, তারপর বললো—কর্তাবাবু অনেকবার দেখেছেন। সেইজন্যই তো তিনি ওদিককার শোবার ঘর ছেড়ে আমার সামনাসামনি এই ঘরখানায় চলে এলেন। অমাবস্যার রাতে পিছনে ওই রাবিশের ঢিবির উপর মানুষ ঘুরতে দেখা যায়। বাবুকে কতবার বলেছিলাম মজুর দিয়ে ওদিকটা পরিষ্কার করিয়ে দিতে, তা বাবুর বয়েস হয়েছিল আর কিছু করার সামর্থ্য ছিল না।

—তুমি কিছু দেখেছো কখনো?

—ওই রাবিশের উপর মানুষের ছায়া আমি অনেকবার দেখেছি। রাতে তো আমরা ওদিকে কেউ যাই না।

চা খাওয়া শেষ করে গোবিন্দ বললো—চল গোপাল, পিছন দিকটা একবার দেখে আসি—

বারান্দা পার হয়েই একটা উঠানের মতো তারপর অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা দোতলা বাড়ির ভগ্নাবশেষ। রাবিশের ঢিপি, ভাঙা থামের মাথায় ছাদ ধ্বসে পড়েছে। গোবিন্দ আশপাশ দিয়ে একটু ভিতরে যাবার চেষ্টা করছিল, দেবুয়া এসে পড়লো, বললো—বাবু। একগাছা লাঠি না নিয়ে যাবেন না। মাস দুই আগে একটা সাপুড়ে এসে চারটে গোখরো সাপ এখান থেকে ধরে নিয়ে গেছে।

গোবিন্দ আর এগোলো না।

গোপাল বললো—একটা ভাল সম্পত্তি পেয়েছে—ভূতের বাড়ি, সাপের বাসা।

গোবিন্দ বললো—অনেক জমি। বেচে দিলেই টাকা পাবো। এদেশের আগেকার অনেক জমিদার বাড়িরই এই অবস্থা। চল্ আশপাশটা একবার ঘুরে দেখে নিই—

দেবুয়া বললো—বাগানের ভিতরে ঢুকবেন না বাবু; এখন তো সব জঙ্গল হয়ে আছে। বর্ষা গেল, এবার সব আবার সাফসুফ করবো।

বাইরে থেকেই দুজনে বাড়ির চারিপাশ ঘুরে দেখলো। পাঁচ বিঘের মতো বাগান, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাড়ি ভেঙে পড়ে গেলেও পাঁচিলটা ঠিক আছে। দেবু বললো—কর্তাবাবু পাঁচিলটার তদারক করতেন, বছর বছর সারাতেন, বলতেন পাঁচিল চলে গেলেই জমি বেহাত হয়ে যাবে। গাছের ফল হয়ে যাবে বেওয়ারিশ, যা দু'দশ টাকা আসছে, তাও আর আসবে না।

বড় বড় থামের মাথায় ভেঙে-পড়া টুকরো টুকরো খিলান, ভাঙা ছাদ বাইরে থেকে নজরে আসে। সেই সব ঢিবিঢিবি রাবিশের মধ্যে একটা বিশেষ চাতাল নজরে আসে। তিনতলা অবধি সিঁড়ি উঠে গেছে, সিঁড়ির মাথায় দু'দশজন মানুষ দাঁড়াবার মতো একটা চাতাল। সেকালের দুর্গের একটা পর্যবেক্ষণ তোরণ যেন।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলো—দেবু, ওই চাতালটার উপর ওঠা যায় না?

—কেন যাবে না, আমি তো রোজই বিকালে উঠি, বাগানটার উপর নজর রাখার জন্য। ওদিককার রাস্তাটা আমি পরিষ্কার করে রেখেছি, এখনই যাবেন তো চলুন না?

তখনই দেবু গোবিন্দ ও গোপালকে সঙ্গে নিয়ে সেই পর্যবেক্ষণ তোরণে এসে উঠলো। বললো—আমরা এটাকে বলি—দর্শনী চাতাল, এখান থেকে আপনি এই জমিদার-বাড়ি, বাগান, সারা গ্রামখানাই দেখতে পাবেন। আমার বাবু এখানে বসে থাকতে খুব ভাল লাগে।

চাতালের উপর তিন ফুট পাঁচিল দেওয়া আছে। গোবিন্দ ও গোপাল পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো—আগাগোড়া গ্রামখানা নজরে আসে। পথ, হাটের মাঠ, এদিকে জমিদারের বাগান, তারপর এই ভাঙাবাড়ির যত রাবিশের ঢিবি।

সহসা গোবিন্দের নজরে পড়লো, একটা ঢিবির পাশে একটা মানুষ যেন পড়ে আছে। বলে উঠলো—গোপাল, একটা মানুষ পড়ে আছে না? ওই ঢিবিটার পাশে?

গোপাল দেখে শুনে বললো—তাই তো মনে হচ্ছে। দেবুয়া দেখ তো—

দেবুয়া দেখলো। দেখেই তর তর করে নেমে গেল চাতাল থেকে।

গোবিন্দ এবং গোপালও নেমে এলো তার পিছু পিছু।

দেবু আগেই ঢিবিটার কাছে পৌঁছে গেল, বললো—বাবু, এ তো খুন হয়ে গেছে।

—খুন হয়েছে? কে?

—এখানকার চৌকিদার ধনুয়া।

তখনই দেবুয়া সাইকেল নিয়ে থানায় ছুটলো।

দারোগা এলো। এনকোয়ারী হলো। দারোগা বললো—গুলি করে মেরেছে।

—কিন্তু এই ভাঙা বাড়িতে ধনুয়াকে গুলি করলো কে? কেন?

তারপর দারোগা প্রশ্ন করলো—আপনাদের কোনো বন্দুক বা পিস্তল আছে?

গোবিন্দ বললো—আমার পিস্তল আছে। আমি পুলিশ কোর্টের উকিল। কয়েকটি মামলায় আমি খুনীকে ধরে দিয়েছিলাম, তখন আমাকে খুন করার ভয় দেখানো হয়েছিল, সেই সময় আত্মরক্ষার জন্য লালবাজার থেকে আমাকে পিস্তলের লাইসেন্স দেয়।

—আসামী ধরে দিয়েছিলেন? আপনি কি গোয়েন্দাগিরি করেন বুঝি?

—নির্দোষ মক্কেলকে বাঁচাবার জন্য মাঝে মাঝে গোয়েন্দাগিরি করতে হয়।

—পিস্তলটা একবার দেখান।

গোবিন্দ পিস্তলটা বের করে দেখালো।

দারোগা দেখেশুনে বললো—আপনি কতদিন আগে গুলি চালিয়েছেন?

—কাল রাতে।

—তবে কি আপনার গুলিতেই চৌকিদার মারা গেছে?

—না, গুলি আমি চালাইনি, তবে পিস্তল ছোঁড়া হয়েছে।

—মানে?

—তবে শুনুন—গোবিন্দ গত রাত্রের ঘটনা বললো।

দারোগা হাসলো, বললো—ভুতুড়ে হাত, রাত বারোটায় ঘরে এলো, পিস্তল ছুঁড়ে গেল, এ তো আজগুবি ব্যাপার, এ কথা তো বিশ্বাস করা শক্ত।

—আজগুবি নয়, আমরা দুজনেই দেখেছি, আমরা দুজনেই ওকালতি করি। এখন অবস্থা যা দেখছি এ বাড়িতে কখন কি ঘটবে কিছু ঠিক নেই। আজ রাতে আবার কোনো উৎপাত হলে আমাকেই গুলি চালাতে হবে।

—এই ভাঙা বাড়িতে এসব ব্যাপার কেন ঘটলো, এটাই তো আশ্চর্য। যাক, করোনারের আদালতে আপনি পিস্তলটা নিয়ে যাবেন।

দারোগাবাবু ময়না তদন্তের জন্য লাশ নিয়ে চলে গেলেন।

গোপাল বললো—ভাবলুম তোমার জমিদারিতে বসে কয়েকটা দিন নির্ঝঞ্ঝাটে আরাম করবো, তা আর হলো না দেখছি।

।। পাঁচ ।।

গোপাল ও গোবিন্দ আজ পালা করে খানিক খানিক রাত জাগবে বলে ঠিক করেছিল। গোড়ার দিকটায় গোবিন্দই জেগেছিল। ঘর অন্ধকার করে রাত জেগে বসে থাকা সহজ নয়, অনেক দিনের অভ্যাস থাকা চাই। বসে বসে ঝিমুনি আসেই। গোবিন্দও ঝিমুচ্ছিল।

কোন একসময় গায়ে কে যেন জল ছিটিয়ে দিল। গোলাপ জল। গোবিন্দ চমকে উঠলো। চোখ মেলেই দেখে সামনে মাথার কাছে একখানি সাদা হাত। তর্জনী ও বুড়ো আঙুলটি অর্ধচন্দ্রের মতো কাঁপছে, সাঁড়াশির মতো এগিয়ে আসছে তার গলাটা টিপে ধরার জন্য। ধীরে ধীরে কপাল অবধি নামলো, এবার গলায় এসে নামছে।

গোবিন্দ প্রথমে নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল এবার যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। হাতের পাশেই টর্চ ছিল, তুলে নিয়েই বোতাম টিপলো। প্রথমে আলোর ঝলকানিতে মনে হলো সামনে যেন একখানা কালো পর্দা এসে পড়েছে। পরক্ষণেই হাতে যেন একটা লাঠির ঘা পড়লো। টর্চ ছিটকে পড়লো মেঝেতে, নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো কালো পর্দাখানা যেন চোখের সামনে থেকে সরে গেল, তারপরেই খটাং করে একটা শব্দ।

তখনই আরেকটা টর্চ জ্বলে উঠলো। গোপাল উঠে বসেছে, তার হাতে টর্চ। গোপাল এক লাফে তক্তার উপর থেকে নেমে পড়লো। ছুটে গেল একটা জানালায়, জানালাটা ধরে খানিক টানাটানি করলো, জানালাটার একটা পাশ দরজার মতো খুলে গেল। গোপাল সেখান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

জানালাটা ওইভাবে দরজার মতো খুলে যেতে গোবিন্দ থতিয়ে গিয়েছিল। তারপরেই একহাতে টর্চ আর একহাতে পিস্তল নিয়ে সে গোপালের অনুসরণ করলো।

গোপাল তখন লম্বা বারান্দা পার হয়ে বাড়ির পিছনে রাবিশের স্তূপের উপর গিয়ে নেমেছে।

পরক্ষণেই একখানা ভাঙা ইঁট এসে লাগলো গোপালের মাথায়। গোপাল পড়ে গেল।

গোবিন্দ এসে দেখে গোপালের মাথা কেটেছে, কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে।

গোবিন্দ চারিপাশে টর্চের আলোটা একবার ঘুরিয়ে নিলে—কেউ কোথাও নেই। তখন গোপালের হাত ধরে বললো—উঠে এসো—

ঘরে এসেই সে দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজালো। মিনিটখানেক পরেই সাড়া এলো—যাচ্ছি বাবু—

ফার্স্ট এইড বাক্স তো সঙ্গেই থাকে, রক্ত মুছিয়ে বেনজুইন দিয়ে পটি বাঁধতে বেশি সময় লাগলো না।

জানালাটা দেখে নকুল বললো—জানালা যে এমন হয় তা আমরা জানতাম না, এই জানালা দিয়েই তাহলে এই ঘরে মানুষ ঢুকে কর্তাবাবুকে ভয় দেখাতো। এই ভয় পেয়ে পেয়েই কর্তাবাবু শেষ অবধি মারা গেলেন। আমরা ভাবতাম ভূতের উপদ্রব।

দেবুয়া বললো—এতদিনে বোঝা গেল, মানুষ ভূত।

গোবিন্দ বললো—বড় সমস্যা একটা মিটলো, কিন্তু আর একটা প্রশ্ন তো রয়েছে—কারা এই বাড়িতে দিনের পর দিন, এইভাবে উপদ্রব চালাচ্ছে, এবং কেন? তাদের এখানে কি স্বার্থ আছে?

গোপাল বললো—শুধু ভয় দেখানো নয়, একটা মানুষ অবধি খুন হয়েছে। কিছু বড় স্বার্থ আছে। সেইটা আমাদের জানতে হবে।

সেই ঘরে বাকি রাতটুকু পালা করে পাহারা দিয়েই তারা কাটালো।

পরদিন সকালে তাদের প্রথম কাজ হলো জানালাটার পাল্লায় তালা দেবার ব্যবস্থা করা ও ঘরের আর কোনো জানালা অমন আছে কিনা দেখা।

।। ছয় ।।

সেখানে এলোপ্যাথিক ডাক্তার নেই, প্রবীণ হোমিওপ্যাথ বলাই সামন্তের হাতযশ খুব। সকালে দেবুয়া তাঁকে নিয়ে এলো। তিনি দেখেশুনে ওষুধ দিলেন, বললেন—ভয়ের কিছু নেই। দিন দুই বিশ্রাম নিলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর কথায় কথায় বলাইবাবু বললেন—আপনারাই বুঝি এখন এই বাড়ির মালিক হয়েছেন? তা এই সব রাবিশ পরিষ্কার না করালে এখানে আপনারা থাকবেন কি করে, এ তো ভুতুড়ে বাড়ি—সাপের বাসা। এ সম্পত্তিতে তো মশাই এখন আয়ের চেয়ে ব্যয়ের ব্যাপারটাই বেশি। সদরের এক মাড়োয়ারী ক'দিন আপনার মামার কাছে ঘোরাঘুরি করেছিল, বলেছিল, এখানে একটা কোল্ড স্টোরেজ করবে। তখন বলেছিলাম, বেচে দিন। তা আপনার মামা বললেন, পৈতৃক ভিটে বেচবো না। এ বিশাল ভাঙা বাড়ি থেকে লাভ কি?

গোবিন্দ বললো—আমি ভেবেছি, এই বাড়িঘর বাগান, মাদার টেরেসা বা ভারত সেবাশ্রমে দিয়ে দেব কোনো আশ্রম করার জন্য।

—খুবই ভাল কথা। বেচে টাকাটা তাঁদের দিলেও অনেক কাজ হয়। এই বাড়ি এক বিঘে পাঁচ কাঠা তার সঙ্গে ওদিকে পাঁচ বিঘের বাগান। আপনি দু'লাখ টাকা সহজেই পাবেন। সেই টাকাটাই ওঁদেরকে দিন না।

—ভেবে দেখি।

ডাক্তার চলে যাবার পর নকুল বললো—যদি বাবু এই বাড়ি বিক্রি করেন। তো এখানকারই এক ইস্কুলমাস্টার এটা কিনতে পারে। কর্তাবাবুর কাছে অনেকদিন তিনি ঘোরাঘুরি করেছিলেন। তাঁকে আমি খবর দেব।

—এক ইস্কুলমাস্টার পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে এই বাড়ি কিনবে?

—ইস্কুলমাস্টার অত টাকা কোথায় পাবে বাবু, কিনবে তার শালা, নাকি ভায়রাভাই, সে কারবারী মহাজন।

—ঠিক আছে জানা রইলো, এখন একটু ভেবে মনস্থির করি।

তারপর নির্বিবাদে তিনটি রাত কেটে গেল। কোনো গোলমাল নেই। ভূতের উপদ্রব নেই।

গোবিন্দ নকুলকে বললো—ভূতের আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে আর ঘরে ভূত নেই।

নকুল বললো—কিন্তু বাবু রাতে তো ওই রাবিশের উপর দিয়ে মানুষকে চলাফেরা করতে আমি দেখেছি। আমার ছেলেও দেখেছে।

গোপাল বললো—তারা ভূত নয়, তারা দুষ্টু লোক। ওই রাবিশের ভাঙাচোরা ঢিবিগুলোর মধ্যে তাদের লুকিয়ে থাকার আস্তানা আছে। আমার মাথায় যে লোকটা ইঁট মারলো সে ইঁট মেরে লুকালো কোথায়, সেই আড্ডাটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

পরদিন সদরে চৌকিদারের মৃত্যু সম্পর্কে ময়না তদন্ত হয়ে গেল। গোবিন্দ গোপাল নকুল ও দেবুকে পুলিশ গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছিল। তদন্তে নিষ্পত্তি হলো—চৌকিদারের ধানজমি নিয়ে শরিকানা গোলমাল ছিল। সেই শরিকের কেউ চৌকিদারকে খুন করে রাজবাড়ির পোড়োজমিতে ফেলে গেছে। চৌকিদার খুন হয়েছে দেশী পিস্তলের গুলিতে। এই ধরনের পিস্তল যোগাড় করে মানুষ খুন করা আজকের দিনে হামেশাই ঘটছে। পুলিশকে খুনীর সন্ধান করতে হবে।

সদর থেকে চারজন যখন ফিরলো তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

নকুল আগে নিজের ঘর খুলে হ্যারিকেন জ্বেলে নিয়ে বললো—এবার ঘরে চলুন বাবু।

দরজার চাবি খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে দেবুয়া পিছিয়ে এলো। বললো—বাবু, ঘরের মধ্যে সাপ।

—সাপ! নজর রাখ। আমি লাঠি নিয়ে আসি—নকুল ছুটলো তার ঘরে।

নকুল দু'গাছা লাঠি আনলো। তারপর দেবুয়া হ্যারিকেন লণ্ঠনটা এগিয়ে দিল ঘরের মধ্যে। বাপ ও বেটা খানিকক্ষণ নজর করলো ঘরের মধ্যে। তারপর দেবুয়া বললো—ওই যে খাটের পায়ায় জড়িয়ে আছে।

সাপ যখন একবার নজরে এসে গেছে, তখন সেটাকে মারতে গ্রাম্য মানুষের বিশেষ দেরি হলো না।

হাত তিনেক লম্বা একটা কেউটে সাপ।

নকুল বললো—এত বছর এখানে আছি বাবু, কিন্তু এই ঘরের মধ্যে কোনোদিন সাপ দেখিনি। বাইরে অত রাবিশ জঞ্জাল থাকতে ঘরে সাপ আসবে কেন? কোনো দুষ্টু লোক ঘরে সাপ ছেড়ে দিয়ে গেছে বাবু। আমি কাল এক সাপুড়েকে দেখেছি হরিমুদীর দোকানে, আজ সকালেও সে ছিল। আমি কালই একবার তার খোঁজ নেবো।

কিন্তু পরদিন সকালে গাঁয়ের কেউ আর সাপুড়ের খোঁজ দিতে পারলো না।

সকালবেলা দেবুয়া যখন ভাত দিতে এলো, বললো—বাবু, কাল রাতেও আমি ওই বাড়ির পিছনে ভাঙা থামের আড়ালে, তারপর দর্শনী চাতালে চাঁদের আলোয় মানুষের নড়াচড়া দেখেছি। আজ সারা দুপুরটা আমি ভাঙাচোরা ওই রাবিশের মধ্যে ঘুরে দেখবো।

গোবিন্দ বললো—এতদিন দেখিসনি?

—খেয়াল করিনি বাবু। কর্তাবাবু তো সারাটা গ্রীষ্মকাল মাঝরাত অবধি বারান্দায় বসে থাকতেন। মারা যাবার মাস দুই-তিন আগে ভূতের কথা বলতেন। বুড়ো মানুষের কথা আমরা অত গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু এখন তো দেখছি মানুষ ভূত। এই ভাঙাবাড়ির কোথাও একটা আড্ডা করেছে। এখন দু'চারদিন দুপুরে সব ঘুরে ঘুরে দেখবো।

দুপুরে দেখা গেল দেবুয়া একগাছা লাঠি নিয়ে পিছনে ভাঙা বাড়ির রাবিশের ঢিবিগুলোর উপর দিয়ে ঘুরছে।

ঘোরাফেরা শেষ করে বিকালের দিকে দেবুয়া দর্শনী চাতালের উপর গিয়ে বসলো।

বসেছিল সন্ধ্যা অবধি। তারপর ধীরে ধীরে নেমে এলো।

নিচে একটা টিবির পাশ কাটাচ্ছে এমন সময় কে যেন তার কাঁধে হাত রাখলো। দেবুয়া চমকে উঠলো, মুখ ফিরিয়ে দেখে পাশে দাঁড়িয়ে আছে মুখে রুমাল বাঁধা এক ষণ্ডামার্কা লোক। চোখ আর কপাল ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। ডান হাতে একটা পিস্তল সামনে তুলে ধরেছে।

দেবুয়া ভয়ে কেঁপে উঠলো।

মুখোসধারী বললো—দেখ্ এই ভাঙাবাড়ির মধ্যে বেশি ঘোরাফেরা করবি না, তাহলে ওই চৌকিদারের মতো গুলি খেয়ে মরবি বুঝলি।

—বুঝলাম।

—তুই তো বাবুদের জন্য দু'বেলা রান্না করিস?

—বাবাও করে।

—তোকে একটা আরক দিচ্ছি, বাবুদের ডালে কি ঝোলে রোজ রাতে এক চামচ করে মিশিয়ে দিবি।

—বিষ নাকি বাবু? তাহলে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে।

—বিষ নয়। পেটের অসুখে বাবুরা ক'দিন ভুগবে, এখানকার ওষুধপত্রে সারবে না। দুই বাবু তখন কলকাতায় চলে যাবে। বাবুরা এখান থেকে চলে যাক, এইটাই আমরা চাই।

পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা বোতল বের করে মুখোসধারী বললো—নে ধর। ঠিকমতো কাজ না করলে মরবি—ওই চৌকিদারের মতো মরবি। যা—

দেবুয়া তখন তার এবং পিস্তলের সামনে-থেকে সরে আসতে পারলে বাঁচে। সে তাড়াতাড়ি পা চালালো। একবার পিছু ফিরে দেখলো মুখোসধারী তখনও রাবিশের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

।। সাত ।।

সকালে গোপাল ও গোবিন্দ বারান্দায় বসে আছে, এমন সময় দেবু চা নিয়ে এলো। বললো—বাবু, আজ আমাকে কিছু টাকা-পয়সা দিন। আমি কলকাতায় চলে যাই। সেখানে আমার কাকা আছে, তার কাছে গিয়ে থাকি গে। আজি চলে যাবো।

—কেন রে কি হলো? বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস বুঝি?

—না বাবু, ঝগড়া নয়, আপনার এখানে বাবু নানান হুজ্জৎ। হুজ্জৎ মিটলে আবার আসবো।

—হুজ্জৎ আবার কি হলো?

—হুজ্জতি হয়নি বাবু, কিন্তু হবে।

—চৌকিদার খুন হওয়া নিয়ে বলছিস? সে মামলা তো কাল।

—সে তো জানি বাবু। এ নতুন হুজ্জতি আমাকে নিয়ে।

—তোকে নিয়ে আবার কি হুজ্জতি হলো?

—মানুষ খুনের হুজ্জতি বাবু। কিন্তু আমি তো পারবোনি।

—মানুষ খন?

—হাঁ বাবু। আমাকে দিয়ে খুন করাতে চায়, কিন্তু আমি তো সে কাজ পারবোনি।

—তুই খুন করবি? কাকে? কেন?

—খুন করবো আপনাদেরকে। না হলে আমাকে খুন হতে হবে।

—কি ব্যাপার রে?

—কাল সন্ধ্যাবেলা দর্শনী চাতালে বসেছিলাম। নেমে আসতেই মুখে কালো রুমাল বাঁধা একটা ষণ্ডাগুণ্ডা লোক এসে আমার হাতে এক শিশি আরক দিয়ে বললো—বাবুদের খাবারের সঙ্গে এইটা রোজ এক চামচ করে মিশিয়ে দিবি।

জামার পকেট থেকে দেবু চ্যাপটা শিশিটা বের করে সামনে রাখলো।

গোবিন্দ তুলে নিয়ে দেখলো, সাদা জল। বললো—কিছু বোঝার উপায় নেই।

গোপাল বললো—আর্সেনিক জাতীয় কিছু মেশানো আছে।

দেবু বললো—ওরই এক চামচ আপনাদের খাবার জলে দিতে হবে।

গোবিন্দ বললো—কি আছে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

—তা দেখুন বাবু, কিন্তু পুলিশে খবর দেবেন না। জানাজানি হলে, বলেছে আমাকে খুন করবে। আমি বাবু তাই আগেই সরে পড়তে চাই।

—সে যাবি যা। কিন্তু কোথায় যাবি?

—কলকাতায়। আপনার বাড়ির ঠিকানাটা দিন বাবু, সেখানে গিয়ে ক'দিন থাকিগে—

—কলকাতায় এরা তোকে ধরতে পারবে না?

—সে এত সহজ হবে না বাবু, আমি সেখানে বাড়ি থেকে বেরুবোনি। আমি আজ বিকালেই চলে যাবো বাবু, আমায় টাকা দিন।

—তাই যাস্। নকুল তো থাকবে, একজন থাকলেই আমাদের কাজ চলে যাবে।

।। আট ।।

ঘন্টা দুয়েক পরে নকুল একটি লোককে নিয়ে এলো, বললো—বাবু ইনি এখানকার পঞ্চায়েতের অঞ্চলপ্রধান। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

নকুল ঘর থেকে একখানি চেয়ার এনে তাকে বসতে দিলে।

অঞ্চলপ্রধান বললেন—আমার নাম রাজেশ্বর মাইতি, সংক্ষেপে রাজু মাইতি। ইস্কুলের পাশেই আমার বাড়ি। আমি ইতিমধ্যে দু-তিন দিন এসে আপনার খোঁজ নিয়েছি। আজ দেখা পেলাম।

গোবিন্দ বললো—বলুন কি বলবেন?

—আপনিই তো কর্তাবাবুর ভাগ্নে? আপনিই তো এখন এই বাড়ির মালিক? আপনার নাম গোবিন্দবাবু?

—হ্যাঁ, গোবিন্দলাল মল্লিক।

—ইনি আপনার বন্ধু?

—হ্যাঁ, গোপাল নন্দী।

—আপনার তো কলকাতায় ভাল বাড়ি আছে।

—তা আছে। কেন?

—আপনি তাহলে তো এখানে এসে থাকবেন না, বাড়িটা তাহলে বেচে দিন না? সবই তো ভেঙেচুরে রাবিশের ঢিবি হয়ে গেছে। এই রাবিশ পরিষ্কার করাটাই তো একটা বড় খরচের ব্যাপার। আপনি যখন থাকবেন না, তখন মিছিমিছি সে পয়সা খরচ করবেন কেন?

—আমার এখানে দুজন দরোয়ান আছে। তারা এই রাবিশ রোজ খানিক খানিক নিয়ে দেয়ালের ধারে ফেলবে। জমিটা মোটামুটি কিছুটা চৌরস হলে, আমি তখন এটা একটা আশ্রম করে দেবো।

—আশ্রম চালাতে হলে আপনাকে তো এখানে থাকতে হবে।

—আমি চালাবো কেন? আশ্রম চালাবে ভারত সেবাশ্রমের সন্ন্যাসীরা।

—আমি একটা অন্য কথা বলতে এসেছিলাম। আপনি এটা বিক্রি করে দিন, আমার হাতে খদ্দের আছে। টাকাটা আশ্রমে দিন তারা অনেক কাজে লাগাতে পারবে। এখানে আমার এক আত্মীয় একটা হাসকিং মিল আর কোল্ড স্টোরেজ করতে চায়। সে আপনাকে সেজন্য ভাল দাম দেবে। এমন রাস্তার উপর এতটা জমি এখানে তো আর কারও নেই। আমি তো খতিয়ান দেখেছি, বাড়ি আছে এক বিঘা এবং জমি আছে পাঁচ বিঘা।

—পঁচিশ কাঠা জমি, আর খান পাঁচেক ঘর, এর জন্য কি দাম নেবেন?

—আমি দিতে পারি, জমির দাম সাড়ে বারো হাজার টাকা আর এই পাঁচখানা ঘরের জন্য পঁচিশ হাজার, মোট সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার টাকা।

—ঠিক আছে, আমি যদি বেচি তো আপনাকে খবর দেব।

গোবিন্দ রাজু মাইতিকে বিদায় দিলে।

ঘণ্টাখানেক পরে এক প্রবীণ এলেন। নকুল বললো—ইনি আমাদের ইস্কুলের হেডমাস্টারমশাই। কর্তাবাবুর বন্ধু ছিলেন।

ভদ্রলোক নমস্কার জানিয়ে বললেন—আমার নাম নিবারণ দত্ত। এখানকার ইস্কুলে হেডমাস্টার ছিলাম, বছর পাঁচেক হলো রিটায়ার করেছি। তোমার মামার কাছে রোজ সকালে আসতাম, উনি একখানা খবরের কাগজ নিতেন সেইটা পড়তে। প্রতিদিন সকালে দু'ঘণ্টা এখানে কাটতো। উনি মারা যাবার পর থেকে আমার সকাল আর কাটে না।

গোবিন্দ আপ্যায়ন করে নিবারণবাবুকে চেয়ারে বসালো।

নিবারণবাবু বললেন—কর্তা মারা যাবার পর আমার কাগজ পড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

—কেন, এখানে আর কি কেউ কাগজ কেনে না?

—একখানা কাগজের দাম এক টাকার উপর। গাঁয়ের মানুষের এত পয়সা কোথায়? এখন যা করে রেডিও সংবাদ। তা তুমি কি কাগজ রাখো?

—এখানে কাগজ তো কিনতে পাওয়া যায় না, পেলে কিনতাম। তা কাগজ না থাক্, আপনি আসবেন গল্পগুজব করা যাবে। এখানে তো কথা বলার মতো মানুষ নেই। সকালে আমরা একসঙ্গে চা খাবো।

—তুমি কি এখন এখানে থাকবে?

—আমি তো ওকালতি করি, থাকলে আমার চলবে না। কোর্টে এখন পূজার ছুটি চলছে তাই আসতে পেরেছি। আর ক'দিন কোর্ট বন্ধ আছে এরই মধ্যে এই সম্পত্তিটার একটা সমাধান করে যাবো।

—কি করবে কিছু ঠিক করেছ?

—ভেবেছি ভারত সেবাশ্রম বা মাদার টেরেসাকে দিয়ে দোব। তাঁরা যদি কোনো আশ্রম করেন। ইতিমধ্যে তো খদ্দেরও এসেছে। এখানকার পঞ্চায়েত প্রধান একটু আগে এসেছিলেন, বললেন, আমি কিনবো, আমাদের দিন।

—রাজু কত দাম দেবে বলেছে?

—সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার টাকা।

—রাজু এটা কিনে কি করবে?

—সে কিনবে না। তার আত্মীয় কিনবে, হাস্কিং মেসিন বসাবে। আরো কি সব করবে।

—তুমি কি বেচবে বলে ঠিক করেছ?

—কিছুই ঠিক করিনি।

—না। এ বাড়ি-জমি তুমি বেচবে না। বিক্রি করার হলে তোমার মামাই তো এটা বেচে কলকাতায় তোমার কাছে গিয়ে থাকতে পারতেন, কিন্তু বিক্রি করেননি। কেন তা কি তুমি জান?

—জানি, মামা বলতেন—এই বাড়িতে যখের ধন আছে।

—তিনি মুখেই বলতেন না, তিনি বিশ্বাস করতেন। এর পিছনে একটা ঐতিহাসিক তথ্য ছিল। একসময় তোমার মামার পূর্বপুরুষ এখানে বিশেষ প্রতাপশালী সামন্ত ছিলেন। শাহজাদা সুজা যখন আওরংজীবের ভয়ে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন তখন পথে দু'চারদিন এখানকার জমিদার চক্রধারী সামন্তের এই বাড়িতে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন। এটা ইতিহাসের ঘটনা। এর সঙ্গে আর একটা কথা চলে আসছে যে শাহজাদা যাবার সময় কিছু সোনাদানা এখানে রেখে গেছিলেন। চক্রধারী সামন্ত

শাহজাদার খুব বিশ্বস্ত সামন্ত ছিলেন। চক্রধারী শাহজাদাকে বাংলার সীমা পার করে দিয়ে আসেন। সেই সোনাদানা এখানকার মাটির নিচের কোনো গোপন কুঠরীতে জমা করা আছে। সেই কুঠরীর সন্ধান কেউ জানে না। তারপর উপরের ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়ায় সেই ঘর এখনও আস্ত আছে কিনা সন্দেহ। তোমার মামা বলতেন, আগে এই রাবিশ সরাতে হবে তারপর রোজ কিছু কিছু জমি খুঁড়ে দেখতে হবে নিচে কিছু আছে কি না।

গোবিন্দ হাসলো, বললো—এক বিঘা জমির উপর বাড়ি, তার মধ্যে আটকাঠার মতো তো ভেঙেই পড়ে গেছে। অল্প অল্প রাবিশ সরিয়ে কিছু কিছু খুঁড়ে দেখতে কতদিন লাগবে?

—সেই দীর্ঘসময় লাগবে বলেই তো তোমার মামা এ কাজে হাত দেননি। বলতেন, আমার শরীরের যে অবস্থা, আমার দ্বারা আর কিছু হবে না। গোবিন্দ এলে তাকে আপনি আমার কথা বলবেন। আমি তোমাকে কথাটা বলে আজ দায়মুক্ত হলাম। তোমার মামা বার বার বলে গেছেন গোবিন্দ যেন সবকিছু ভালভাবে দেখেশুনে নেয়। তার আগে যেন এই বাড়ি না বিক্রি করে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে আবার দুটি লোক এলো। বয়স বছর ত্রিশের বেশি হবে না। নকুলের কোনো কথার জবাব না দিয়ে সোজা গবগব করে উঠে এলো একেবারে বারান্দায়, গোবিন্দ ও গোপালের সামনে। একজন বললো—আপনারা দুজনই বুঝি কর্তাবাবুর ভাগ্নে। এখন এই সম্পত্তির মালিক। শুনলাম, আপনারা এই সম্পত্তি বিক্রি করবেন। ওই পঞ্চায়েত প্রধান এসেছিল দরদাম করতে। রাজু মাইতি সকালে এসে কি দাম বলে গেছে?

ঝাঁকড়া চুল, গালপাট্টা দেখে মহিষাসুরের কথা মনে ওঠে। কথাবার্তায় কোনো ভদ্রতার আঁচ নেই। রুক্ষভাবে সে আবার জিজ্ঞসা করলো, রাজু মাইতি কি দাম বলে গেছে?

গোবিন্দ এবার জবাব দিলে—সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার টাকা।

—ও একটা জোচ্চোর। কংগ্রেসকে ভাঙিয়ে অনেক পয়সা করেছে। এই পুরনো জমিদারবাড়ি ওকে আমরা কিনতে দেব না। আমরা আপনাকে চল্লিশ হাজার টাকা দেব।

—আমি বেচবো কিনা, কিছুই ঠিক করিনি।

—কলকাতায় তো আপনার বাড়ি আছে, আপনি ওকালতি করেন, এখানে এই বাড়ি রেখে দিয়ে আপনার কি লাভ আছে?

—বাড়িটা আমি ভারত সেবাশ্রমকে দান করে দেব।

—বাড়িটা বেচে টাকাটা তাদেরকে দিন না, সে তো অনেক ভাল হবে।

—আমি কিছুই এখনও ঠিক করিনি।

—ঠিক আছে। এই বাড়ি আপনাকে বেচতেই হবে। তবে রাজু মাইতিকে বেচা চলবে না।

—বেচতেই হবে?

—হ্যাঁ, আপনি বিক্রি করবেন, এবং আমরাই কিনবো।

—আপনাদের কোনো পরিচয় তো পেলাম না?

—আমরা গ্রামসেবক সমিতি। আমি সেক্রেটারি। আমার নাম বিপ্লব দাস। আর এ হলো এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি দীনবন্ধু দাস। বিক্রি করবো বলে মনস্থ করলেই আমাদেরকে জানাবেন। বারোয়ারীতলায় আমাদের সমিতির আপিস। দিনরাত খোলা থাকে। চললাম, নমস্কার!

—একটু বসবেন না?

—না, আমাদের অনেক কাজ।

দুজনে যেমনভাবে এসেছিল, সেইভাবেই বেরিয়ে গেল।

গোপাল এতক্ষণে কথা বললো—এ তো দেখছি পুরোপুরি মস্তান।

গোবিন্দ বললো—মস্তান হোক্, রাজু মাইতি ভদ্রভাবে যে দাম বলেছিল এরা রুক্ষভাবে তার চেয়ে অনেক বেশি বলে গেল, খদ্দের হিসাবে তো এরাই ভাল।

।। নয় ।।

আহারাদির পর খানিক বিশ্রাম করে দুজনে ঘুরতে বেরুলো। গোবিন্দ বললো—আজ এই ভাঙাবাড়িটা ভাল করে ঘুরে-ফিরে দেখতে হবে।

নকুল সঙ্গে এলো, বললো—চলুন বাবু, আমি সব চিনিয়ে দিচ্ছি। কোথায় সাপের বাসা আছে ঠিক কি?

নকুল হাতে একগাছি লাঠি নিয়েছিল।

সামনের বারান্দার পথ ঠিকই আছে, নকুল বলতে শুরু করলো—এই যে সারি সারি পর পর ঘর দেখছেন, এইটা ছিল কাছারি বাড়ি, এর খান চারেক আস্ত আছে, বাকি সবই ভেঙে পড়েছে। এরই প্রথম ঘরখানায় কর্তাবাবু ছিলেন এখন আপনারা আছেন। এর শেষে দুখানা ঘর ভেঙে পড়েছে, এখানে দুষ্টু প্রজাদের আটকে রাখা হতো—কয়েদ ঘর। তারপর চলুন যাই পিছন দিকে—ওটা অন্দরমহল, এখন ভিতরে যাবার মতো পথ নেই। সব ঘরই ভেঙে পড়ে গেছে। ওইখানেই বাবুরা থাকতেন, মায়েরা থাকতেন। ওই যে দোতলায় যাবার ভাঙা সিঁড়ি দেখছেন, ওরই পাশে একখানা বড় ঘরে ছিল মালখানা, পাইক-বরকন্দাজদের লাঠি-সড়কি, বল্লম, টাঙ্গী সব ওখানে মজুত থাকতো। কয়েকটা গাদা-বন্দুকও ছিল, আমি দেখেছি। তারপর ওই পিছনদিকের সারি সারি ঘর, ওগুলোয় থাকতো কত পাইক। তা আমি তো বাবু একসময় এনাদের পঞ্চাশ-ষাট জন পাইক দেখেছি। পূজার মহাষ্টমীর দিনে, দোলের দিনে তারা রায়বেঁশে ও ঢালীর লড়াই দেখাতো।

গোপাল বললো—তুমি তো পুরনো লোক, তুমি কখনো খেলা দেখাওনি?

—আমি তো বাবু মালী, লাঠি ধরতে জানি তবে ডাকাতে খেলা—হারোয়া খেলা জানি না।

রাবিশের উপর দিয়ে ভিতরে যাবার কোনো পথ নেই, দেখারও কিছু নেই, রাবিশের ঢিবিগুলোকে পাশ কাটিয়ে তারা ঘুরে এলো দর্শনী চাতালের পাশে। গোবিন্দ বললো—এখানেই খানিকক্ষণ বসে থাকি। পোড়োবাড়ির এই চাতালটাই সবার সেরা।

দুজনে চাতালের উপরে উঠে গেল। নকুল বললো—আমি যাই বাবু, আমার তো কাজ রয়েছে।

চাতালে বসে থাকতে ভাল লাগে। এখান থেকে সমস্ত গ্রামটিই চারপাশ থেকে নজরে আসে। জমিদারবাড়ির এইটি ছিল তখন গ্রামের উপর পর্যবেক্ষণ তোরণ। গ্রামের মধ্যে যাই হোক না কেন, এখান থেকে নজরে আসবে। সেকালের জমিদারের এরকম একটা তোরণের খুবই প্রয়োজন ছিল।

গোবিন্দ বললো—এই বাড়ির এই চাতালটাই লোভনীয়।

গোপাল বললো—বাড়িটা তো তুমি বেচে দেওয়াই ঠিক করলে?

—এই পাড়াগাঁয়ে এই রাবিশের ঢিবি আর ক'খানা ভাঙা ঘর রেখে দিয়ে লাভ কি?

—যখের ধন সন্ধান করবে না?

—এই পোড়োবাড়ির রাবিশের মধ্যে কোথায় কি সন্ধান করবে? বেচে টাকাটা নিয়ে নেওয়াই ভাল।

সেই রাবিশের ঢিবির পানে তাকিয়ে গোবিন্দ ও গোপাল নীরবে ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে দিল।

সূর্য অস্ত গেল। এখান থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য মনোরম।

ঠিক সেই সময় দুটি লোককে দেখা গেল ওদিকের পাঁচিলের উপর। ওদিকে ভাঙা পাঁচিলের গায়ে বোধহয় খাঁজ ছিল। তারা সেই খাঁজে পা দিয়ে এদিকে এসে নামলো, তারপর সেই রাবিশের ঢিবির মধ্যে অগ্রসর হলো। খানিকটা দেখা গেল, তারপরেই তারা অদৃশ্য হলো। গোবিন্দ বললো—ভাঙা বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। ওরা কে? ওখানে গেলই বা কোথায়? খানিকক্ষণ দেখি।

বেশিক্ষণ বসে থাকতে হলো না। অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠার পরে দেখা গেল, মানুষ দুটি বেরিয়েছে। ছুটে বেরিয়ে এসেছে বলে মনে হলো। তারপরেই দেখা গেল তাদের পিছনে আরো দুজন। সেই আবছা অন্ধকারে তারা ছুটছে, দুজন আগে, দুজন পিছনে। পিছনের মানুষ দুটি বোধহয় আগের মানুষ দুটিকে তাড়া করেছে।

তারা পাঁচিলের ধারে চলে গেল। তারপর পাঁচিল পার হলো। গোবিন্দ বললো—চলো, এবার নামি, ওইখানটায় গিয়ে দেখতে হবে।

গোপাল বললো—টর্চ নিয়ে বেরোয়নি, অন্ধকারে কি দেখবো? বুঝতেই তো পারলাম আগের দুটি লোককে পিছনের দুজন তাড়া করেছে।

গোবিন্দ বললো—আসতে দেখলাম দুজনকে, কিন্তু বেরুলো চারজন, ওখানে তাহলে নিশ্চয় একটা আস্তানা আছে। ওটা দেখতে হবে।

—আজ রাতে আর দেখতে আসবো না, কাল দিনে দিনে দেখবো।

চাতাল থেকে তারা নেমে এলো।

ঠিক সেই সময় বাইরে বোমা ফাটার শব্দ হলো, পর পর দুবার। ভাঙাবাড়ির ঘরের দেয়াল সেই শব্দে কোথাও কোথাও ভেঙে পড়লো। কোনো কোনো ভাঙা ঘরের ছাদ থেকে কয়েকটা টালি-বরগা খসে পড়লো।

।। দশ ।।

মিনিট দশেক পরে নকুলকে সঙ্গে নিয়ে গোবিন্দ ও গোপাল বাড়ির বাইরে পাঁচিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। টর্চের আলোয় দেখা গেল, দুটি মানুষ সেখানে পড়ে আছে। দুজনেই রক্তাক্ত।

দেখতে দেখতে সাইকেল নিয়ে পল্লীর কয়েকজন যুবকও এসে পড়লো। তারা হেল্‌থ সেন্টার থেকে তখনই কম্‌পাউন্ডারবাবুকে ধরে আনলো। বললো—এখানে পাশ করা ডাক্তার নেই, কমপাউন্ডারবাবুই সব কাজ চালান। তাতে সারলে সারলো, মরলে মরলো।

কমপাউন্ডার বললেন—একজনকে কিছুই করার নেই, সে শেষ হয়ে গেছে। আরেকজনের আমি ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি, তারপর সদর থেকে ডাক্তারবাবু এসে যা হোক কিছু করবেন।

গোবিন্দ বললো—সদর হাসপাতাল তো তিন ক্রোশ, ডাক্তারবাবু এখন আসবেন কি?

একজন বললো—আসতে হবে। ইনি গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান। চাষাভুষা তো নন।

—পঞ্চায়েত প্রধান? রাজু মাইতি? গোবিন্দ টর্চের আলো ফেললো রক্তাক্ত মুখখানির উপর। হ্যাঁ, রাজু মাইতিই তো। ইনিই দুপুরে এসেছিলেন বাড়িটা কিনতে।

যাক সাইকেল নিয়ে ছেলেরা ছুটলো সদর হাসপাতালে।

গোবিন্দ বললো—দুখানা খাটিয়া যোগাড় কর, এই লোক দুটিকে আমার বাড়ির মধ্যে নিয়ে চল।

—একজন তো মারা গেছে।

—সেও যাবে। নাহলে এখানে তো শেয়ালে খেয়ে যাবে।

তখনই দড়ির খাটিয়া এলো। দুজনকে তুলে আনা হলো জমিদারবাড়ির বারান্দায়।

রাজু মাইতির জ্ঞান ছিল, বললো—জল খাবো—

জল পান করে সে গোবিন্দকে কাছে ডাকলো, ধীরে ধীরে বললো—দর্শনী চাতালের নিচে শাহাজাদা—বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠলো।

গোবিন্দ বললো—বুঝেছি, কথা কইবেন না।

রাজু বললো—আমার এখনই শেষ।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে স্কুটারে ডাক্তারবাবু এসে পড়লেন। রাজু মাইতি তখন আর বেঁচে নেই।

।। এগারো ।।

রাতে দুই বন্ধুতে পরামর্শ হলো। রাজু মাইতি মৃত্যুকালে চাতালের নিচে ঘরের কথা বলে গেছে। চাতালের নিচে কোথায় কি ঘর আছে একবার দেখতে হবে। রাতে আর কিছু করার দরকার নেই। কাল দিনে দিনে দেখতে হবে।

কিন্তু দেখতে আর হলো না, সকালে চা-বিস্কুট খেয়ে বেরুবার আগেই আগের দিনের সেই লোক দুটি এসে পড়লো। বললো—আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে এলাম। রাজু মাইতি তো খতম হয়ে গেছে, এখন এই বাড়ির একমাত্র খদ্দের আমরা। কিন্তু সেজন্য এই বাড়ির দর আমরা কমাবো না। চল্লিশ হাজার দেব বলেছি, তাই দোব। আপনি আমাদেরকে দলিল করে দিন। আমরা লিখেপড়ে নিয়ে এসেছি।

দুখানা টাইপ করা কাগজ তারা সামনে ধরলো।

গোবিন্দ বললো—এখনি সই করতে হবে?

—হ্যাঁ, শুভকাজে দেরি করতে নেই।

—টাকা?

—টাকা দিন পনেরোর মধ্যে আপনার কাছে কলকাতায় পৌঁছে দেব।

—টাকা ছাড়াই বাড়ি বিক্রী হয়ে যাবে?

—নিজেদের রক্ষা করার জন্য তাই করতে হবে। নাহলে বোমা খেয়ে মরতে হবে। চোখের সামনে দুজনকে দেখলেন তো? আপনাদেরও ওই অবস্থা হবে।

—ভয় দেখিয়ে বাড়ি কেড়ে নিচ্ছেন?

—না, ঠিক পনেরো দিন পরে আপনাকে আমি চল্লিশ হাজার টাকা নগদ কলকাতায় পৌঁছে দেব। আজ দুপুরে আহারাদি সেরে বারোটার বাসে আপনারা বিদায় হোন। অন্যথা বিপদে পড়বেন।

গোবিন্দ বললো—প্রাণের ভয় বড় ভয়। আপনারা দুটোকে খুন করলেন, আর দুটো খুন করতে কিছু বাধবে না। আমরা চলেই যাবো। এই ভাঙাবাড়ির জন্য খুন হতে রাজী নই। তবে টাকাটা যেন শেষ অবধি পাই।

—নিশ্চয়ই পাবেন, এখন সই করে দিন।

তখনই কাঁচা দলিলে গোবিন্দ সই করে দিল। বললো—কোর্টের স্ট্যাম্প ছাড়া তো পাকা হবে না।

—সে টিকিট আজই লাগিয়ে নেব। আপনার কলকাতার ঠিকানাটা আমাদের দিয়ে যান।

গোবিন্দের কাছে ভিজিটিং কার্ড ছিল, একখানা বের করে দিল।

লোক দুটি ফটক পার হবার আগেই গোবিন্দ হাঁক দিল—নকুল, ভাল করে রান্না কর। আজ এবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরেই আমরা চলে যাবো।

দুপুর দুটোয় গোবিন্দ ও গোপাল বাসে উঠে বসলো। লোকদুটি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিল। গোবিন্দ তাদেরকে শুনিয়ে বললো—হাঙ্গামা-হুজ্জতির মধ্যে কেন যাবো। তার চেয়ে কলকাতায় অনেক আরামে দিন কাটবে। এ বাড়ি তো কোনোদিন আমার ছিল না। এখনও থাকবে না।

।। বারো ।।

গোবিন্দ রেলস্টেশনে এসে নামলো বটে, সামনেই কলকাতার ট্রেন দাঁড়িয়েছিল, গোবিন্দ সেদিকে গেল না। গোপাল ও গোবিন্দ দুজনে গেল বাজারের দিকে। বাজারে ঘণ্টা দুয়েক ঘুরলো, তারপর একটা দোকানে ভালভাবে কচুরি সিঙাড়া সন্দেশ খেয়ে নিল। তারপর ফিরে যাবার শেষ বাস ধরলো।

ঘণ্টা দুয়েক পরে যখন বাস থেকে নামলো, তখন গাঁ জনবিরল হয়ে এসেছে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। গাছের আড়ালে দুজনে দ্রুত পা চালালো।

জমিদারবাড়ির ফটক খোলাই ছিল, একটু ফাঁক করে দুজনে ঢুকল ভিতরে। দরোয়ানের ঘরে নকুল রান্না করছিল। বললো—আমরা ফিরে এসেছি নকুল। তুমি রান্না শেষ করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, তারপর বেরুবো।

দুজনে নকুলের ঘরে ঢুকে বসলো।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নকুলের খাওয়া-দাওয়া শেষ। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে তারা বেরিয়ে পড়লো।

ভাঙাবাড়ির পাশ দিয়ে তারা এলো দর্শনী চাতালে। চাতালের সিঁড়ি দিয়ে তারা উঠলো না, ঘুরে

গেল পিছন দিকে। এতবার এখানে এসেছে কিন্তু এখানটায় কখনো আসেনি। সেখানে দেখলো একটা বড় আকারের খিলান। চোখে পড়লো সেই খিলানের ভিতর দিকে আলো জ্বলছে। কথার আওয়াজ কানে এলো। অন্ধকারে তারা উঁকি মেরে দেখলো। দুটি লোক দাঁড়িয়ে। তারাই কথা বলছে। গোবিন্দ বললো—এখানে নয়, আমরা একটু তফাতে থাকিগে।

সামনেই ভাঙাবাড়ির ঘর ও বারান্দা। তিনজনে সেইখানে উঠে গেল। রুমাল দিয়ে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে সবে একটু বসেছে এমন সময় দুটি লোককে দেখা গেল। তারপরেই চীৎকার শোনা গেল—আবার তোরা এসেছিস? দেখলি দুটো জান গেল, তবু তোদের জানের ভয় নেই?

ভিতরের লোক দুটি চমকে উঠলো, টর্চ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো। তাদের টর্চের আলো এদিকের বারান্দায় এসে পড়লো, গোবিন্দরা তাড়াতাড়ি ভাঙা থামের আড়ালে সরে এলো।

দর্শনী চাতালের নিচে তখন চীৎকার শুরু হয়েছে।

—তোদেরকে এখানে আসতে বারণ করেছিলাম। দুটো জান খতম হয়ে গেল তবু এসেছিস?

—তুই যে জন্য আসছিস, আমরাও সেজন্য আসছি।

—আমি আসছি, এখন এটা আমার বাড়ি, আজ আমি এবাড়ি কিনেছি। আমার পকেটে দলিল আছে, কাল সোমবার রেজিস্ট্রি হবে।

—এই ভাঙাবাড়ির আবার মালিক কি? আমরা যার হদিস পেয়েছি সেটা না নিয়ে আমরা ছাড়বো না।

—সে তোরা কিছুই পাবি না।

—বেশ, মাল তো বের কর, তারপর বোঝাপড়া হবে।

—পরে কেন, এখনি বোঝাপড়া খতম করছি।

লোকটি তখনই পকেট থেকে একটি বোমা বের করে বক্তার বুকের উপর ছুঁড়লো। বোমা ফাটলো। মানুষটি শুয়ে পড়লো। তার পিছনে যে সঙ্গীটি ছিল, সে তখনই পকেট থেকে পিস্তল বের করে সট সট করে দুটি গুলি চালিয়ে দিল। অব্যর্থ লক্ষ্য। এদিকের দুজনেই ধরাশায়ী হলো। এবার লোকটি ছুটলো দেয়ালের দিকে।

গোবিন্দরা তো স্তব্ধ। এক মিনিটে চোখের সামনে তিনটি মানুষ খুন হলো।

গোবিন্দ বললো—চল, ওদের এবার দেখিগে।

ওরা এগিয়ে এলো। গোবিন্দ প্রথম লোকটির পকেটে হাত দিয়ে দেখলো, সত্যি দলিলটা রয়েছে। সেটা নিজের পকেটে রাখলো। তারপর প্রত্যেকের টর্চগুলো নিল। বললো—চল, এখনি হয়তো চৌকিদার এসে পড়বে, আমাদের দেখলে আমাদেরকেই খুনী বলবে।

তিনজনে চলে এলো, এদিকের বাড়ির বারান্দায় নকুল ঘর খুলে দিল। নকুল আলো জ্বাললো, তারপর বললো—বাবু, আজ আমি একলা আর শুতে পারবো না। আজ এই ঘরেই শোব।

—শুবি তো শো, তবে মনে রাখবি, বোমার শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে গেছে। আর কিছুই আমরা জানি না।

সদ্যলব্ধ টর্চ চারটে গোবিন্দ স্যুটকেসে ভরলো। তারপর বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, কিন্তু কেউ এলো না।

গোপাল বললো—মিছামিছি রাত জেগে লাভ নেই, গাঁয়ের মানুষ এখন রাতবিরেতের বোমা আর গুলিগোলার হাঙ্গামায় বেরোয় না। যা করার কাল সকালেই করা যাবে।

।। তেরো ।।

সকালে সূর্যোদয়ের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দর্শনী চাতালের চারিপাশে গাঁয়ের মানুষের ভিড় জমে গেল। তারপর চৌকিদার এলো। ঘণ্টাখানেক পরেই সদর থেকে জীপে চেপে এলো পুলিশ। গোবিন্দ

পুলিশকে বললো—বোমার শব্দ পেয়ে আমরা আর ঘর থেকে সাহস করে বেরোইনি, মিছিমিছি জখম হতে যাবো কেন? জানি, যাই হোক, যা করবার সকালে আপনারা এসে করবেন।

দারোগা সব দেখে শুনে বললো—এ পার্টির দলগত ঝগড়া বলে মনে হচ্ছে।

তারপর পুলিশ তিনটি মৃতদেহ নিয়ে চলে গেল।

দুপুরে গোবিন্দ গিয়ে দেখা করলো পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে, বললো—আমার ভাঙাবাড়ির সব রাবিশ আমি সাফ করবো, আপনাদের পথঘাট খানা ডোবা কোথায় ভরাট করা দরকার আমাকে বলুন। মজুর দিন। আমি মজুরী দেব।

তখনই ব্যবস্থা হয়ে গেল। সাতদিনের মধ্যেই চৌধুরীদের ভাঙাবাড়ির যেখানে যা ভাঙচুর ছিল সব সমতল হয়ে গেল। তারপরেই ফটকের সামনে সাইনবোর্ড ঝুললো—শিবনাথ শিল্পাশ্রম। গোবিন্দ বললো—ব্যাঙ্কে মামার ত্রিশ হাজার টাকা আছে, সেই টাকা দিয়ে একটা সৎকাজ হোক, আমি এক পয়সা চাই না। গাঁয়ের প্রজাদের খাজনার টাকা। প্রজারাই ভোগ করবে।

এবার শুরু হলো কয়েকটা বড় বড় টিনের শেড তৈরি করা ঃ কর্মশালা—কাঠের কাজ, লোহার কাজ, তাঁতের ঘর প্রভৃতি। গোপাল বললো—এ তো বিরাট ব্যাপার, ত্রিশ হাজার কি হবে? লাখ লাখ টাকা চাই।

গোবিন্দ বললো—লাখ টাকাই আসবে।

গোপাল অবাক হয়ে তাকায়, গোবিন্দ হেসে বলে—শাহজাদা সুজার সোনাদানা!

—সে কি তুমি পেয়েছ?

—পাওয়া যাবে।

—কোথায়?

—এইখানে। শুধু একটু খাটতে হবে সবাইকার চোখের আড়ালে। তার আগে তোমাকে একটা ধাঁধার উত্তর বের করতে হবে।

পকেট থেকে একখানি পকেট গীতা বের করে আর শেষ পৃষ্ঠাটি গোপালের সামনে ধরলো, বললো—মামাবাবু এই গীতাখানা নকুলের কাছে রেখে গিয়েছিলেন আমাকে দেবার জন্য। এর এই শেষ পাতায় একটা অঙ্ক আছে, এই অঙ্কটা যদি মেলাতে পার তাহলেই সব সোনাদানার হদিস পেয়ে যাবে।

গোপাল দেখলো বইখানির শেষ মলাটের ভিতর দিকের কাগজে একটা অঙ্ক লেখা আছে ঃ

4.1.18.19.1.14.9.
0.3.8.1.20.1.12.
0.0.7.18.1.22.5.
4.9.7.0.0.0.0.
7.15.12.4.0.0.0.
19.1.8.1.10.1.4.1.
19.21.10.1.19.0.0.0.
7.15.12.4.0.0.0.0.

গোপাল খানিকক্ষণ অঙ্কগুলির পানে তাকিয়ে রইল, তারপর বললো—সময় চাই।

গোবিন্দ বললো—আজ সারা রাত সমাধান কর। কোনো বাধা নেই।

—তুমি সমাধান করেছ?

—আমি করেছি বলেই তো তোমাকে দিলাম। তুমি না পারলে আমি তো আছিই। আমার দু'ঘণ্টা লেগেছে, তোমার কতক্ষণ লাগে দেখি?

গোপাল তখনই পকেটবই বের করে তার সাদাপাতায় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ কষতে শুরু করলো। গোবিন্দ চেয়ারে বসে ঝিমুতে লাগলো।

দেখতে দেখতে দুটি ঘণ্টা পার হয়ে গেল। ইস্কুলবাড়িতে নাইটস্কুলের ছুটি হবার ঘণ্টা বাজলো।

গোবিন্দ চোখ মেলে বললো—কি, সমাধান হলো? যদি না হয়ে থাকে তো থাক, কাল সকালে আমি বুঝিয়ে দেব। এখন রাত সাড়ে আটটা হয়ে গেল, এবার খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ি।

গোবিন্দ নকুলকে ডাকলো খাবারটা দিয়ে যাবার জন্য।

গোপাল বললো—সমাধান না করে আমি কিন্তু ঘুমুবো না।

গোবিন্দ বললো—খাবার পরে আমিই বুঝিয়ে দেব।

বেগুন ভাজা, ডিমের ডালনা আর খান কুড়ি লুচি খেতে আর কতক্ষণ লাগবে? খাওয়া শেষ করে গোবিন্দ বললো—ওটা এমন কিছু সমস্যা নয়। দেখ—ইংরেজিতে এ থেকে জেড অবধি ২৬টি অক্ষর। পরপর এক একটার নম্বর ধর, তারপর অক্ষর সাজাও—নম্বর অনুযায়ী। ৪ হলো ডি, ১ হলো এ, ১৮ হলো আর, ১৯ হলো এস, ১ হলো এ। ১৪ হলো এন্, ৯ হলো আই, তাহলে ৪, ১, ১৮, ১৯, ১, ১৪, ৯ মিলিয়ে হলে DARSANI (দর্শনী) তারপরের শব্দ চাতাল। পরের লাইন GRAVE, তারপরের লাইন DIG, তারপরের লাইন GOLD, তারপর SAHAJADA SUJAS GOLD. এবার ধাঁধা পরিষ্কার হয়ে গেল। দর্শনী চাতালের নিচে কবর, নিচে খোঁড়—নিচে সোনা—শাহাজাদা সুজার সোনা। ওই দর্শনী চাতালের নিচে আমরা যেটাকে কবর ভেবেছি এই বেদীটা ভেঙে ফেলতে হবে? ওইখানে হয় সিন্দুক আছে না হয় কলসী আছে। কিন্তু ওইটা এখন খুঁজে দেখাই খুব মুশকিল। যদি সত্যি কিছু বেরোয় তাহলে সে জিনিস এখন রাখবো কোথায়?

গোপাল বললো—এই অবস্থায় সে তো কোনোদিনই এখান থেকে বের করা যাবে না।

—যাবে, তার ব্যবস্থাই করছি। রাবিশ সাফ হলেই, এখানে যে ঘরগুলি আস্ত আছে সেগুলি সারাবো। আর বাকি জমিতে বড় বড় টিনের শেড করবো। সেখানে শিল্প বিদ্যালয় করবো—ছুতোরের কাজ, কামারের কাজ, পোলট্রি প্রভৃতি শেখানো হবে।

—কিন্তু তার আগে টাকাটা তো তোমার হাতে আসা চাই।

—সব ঠিক হবে তুমি দেখ। কাজ তো শুরু করে দিয়েছি। লাখ লাখ টাকার মোহরের খবর পেলেই সরকারী ইনকাম ট্যাক্সের লোক এসে সবটাই টেনে নিয়ে যাবে, সেটা আমি হতে দেবো না। এখানকার মানুষের টাকা এখানকার লোকের উপকারে খরচ হবে। দেখ না, আমি কাল থেকেই মিস্ত্রী লাগিয়ে দিচ্ছি।

।। চৌদ্দ ।।

কয়েক দিনের মধ্যেই চৌধুরীদের ভাঙাবাড়ির জায়গায় বড় বড় টিনের শেড তৈরি হয়ে গেল। পুরনো যত সব ঘর সারানো হয়ে গেল। চৌধুরী বাড়ির পুরনো নিদর্শন রইল শুধু দর্শনী চাতালটা। গোবিন্দ বললো—পুরনো স্মৃতি একটা থাক।

লোহার ফটক রং-চং করে নতুন হয়ে গেল। তার উপর সাইন বোর্ড লাগানো হলো—মোহনলাল শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র। গোবিন্দের মামার নাম ছিল মোহনলাল। বাড়ির চারিপাশে আট ফুট পাঁচিল উঠে গেল, পুরনো পাঁচিল যা ছিল মেরামত করে উঁচু করা হলো। ভিতরে কি হচ্ছে বাইরে থেকে তা কিছুই বোঝার উপায় রইল না। ইতিমধ্যে শোবার ঘরের পাশে যে বাথরুম করা হয়েছিল সেখানে দুটো চৌবাচ্চা করা হলো। একটায় রইল টিউবওয়েলের জল। আর একটায় দর্শনী চাতাল থেকে বেদী ভেঙে যে দুটি কাঠের সিন্দুক পাওয়া গিয়েছিল, সেই দুটি। ছোট ছোট সিন্দুক, তবে সবই অশরফি ভরা। ব্যাপারটা জানলো শুধু গোবিন্দ ও গোপাল—আর কেউ না। কাঠ দিয়ে চৌবাচ্চার মুখ চাপা দেওয়া হলো। গোবিন্দ বললো—রোজ ক'খানা করে কলকাতায় নিয়ে যাবো, গালাবো বেচবো আর সেই টাকায় এখানে এক একটা ব্যবস্থা করবো। অন্ততঃ দশ লাখ টাকার মোহর পেয়েছি, ওতেই মোহনলাল শিল্পকেন্দ্র এখানকার একটা নামকরা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে।

কিন্তু যত সরলভাবে কাজ করবে বলে গোবিন্দ ভেবেছিল, তা হলো না, প্রথমেই যে বিপত্তি দেখা দিয়েছিল তার জের সহজে মিটলো না।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর দুটি যুবক কোনো কথা না বলে সোজা এসে পড়লো গোবিন্দর ঘরের মধ্যে।

—কে? কি চাই?

—এই বাড়িটা সম্পর্কে আপনার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চাই।

—কি ব্যাপার?

—এই বাড়ি আপনি ক'দিন আগে আমাদের 'চীফের' কাছে বিক্রী করেছেন। চীফ হাংগামার মধ্যে মারা যাওয়ায় সেই দলিল হারিয়ে গেছে। এখন আমাদেরকে আরেকখানা নতুন দলিল করে দিতে হবে। আমরা সব টাইপ করে নিয়ে এসেছি। আপনি একটা সই করে দিন।

—টাকা ছাড়া দলিল হয় না। আগের বারে সাদা কাগজে সই করেছি—সেটার কোনো দাম নেই?

—ওই সাদা কাগজে সই হলেই আমাদের চলবে, টাকা আমরা পরে দেব। এখন আমরা বাড়িটার দখল চাই।

—আমি যে এত ভাঙা-গড়া করলাম, সে কি তোমাদেরকে এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে যাবার জন্য?

—আমাদের কথা না মানলে, আমরা আপনার লাশ ফেলে দেব। আপনার মামার তো একমাত্র উত্তরাধিকারী আপনি। আপনি না থাকলে এই বাড়ির আর কোনো মালিক নেই, আমরা তখন জবর দখল করে নেবো। এ বাড়ি আমাদের হবেই। আপনি জান রাখতে হলে সই করুন, কাল সকালের বাসে দুজনে কলকাতায় চলে যাবেন। আমরা তৈরি হয়েই এসেছি—দুজনেই পকেট থেকে দুটি বোমা বের করলো। তারপর বললো—এ দুটো ছেলে ভোলানো পট্‌কা নয়, একটা ফাটাই দেখুন—

সামনের প্রাঙ্গণে একটা বোমা একজন ছুঁড়ে দিল, সশব্দে সেটা ফাটলো।

—দেখলেন তো? হয় সই করুন না হয় আপনাদের ঘরেই একটা ফেলবো।

—নিশ্চয় ফেলবে—পিস্তল হাতে পুলিশ অফিসার এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে। হাতের বোমা আর ছোঁড়া হলো না। দুই মস্তানকে পুলিশ ধরলো। তারপর আর গল্প নেই। মস্তান দুজন দাগী আসামী, তাদের জেল হলো। এদিকে দিনে দিনে গোবিন্দের শিল্প বিদ্যালয় বিশেষভাবে জমে উঠলো।

[শারদীয়া ১৩৯৯]

চোবাটোকার গুপ্ত রহস্য

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টচার্য

আমাদের পাড়ার চট্টরাজ মশাই যেমন ধনী তেমনি আমুদে। কোম্পানীর আমল থেকে ওঁরা কলকাতার বাসিন্দা। তাঁদেরই কোনো এক পূর্বপুরুষ নাকি সে-যুগে নুন আর সোরার ব্যবসা করে, এত টাকা উপার্জন করে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন যে এখনও ওঁদের কয়ক পুরুষ দিব্যি পায়ের ওপর পা রেখে রাজার হালে দিন কাটিয়ে যেতে পারেন।

তাই বলে চট্টরাজ মশাই পায়ের ওপর পা রেখে আলস্যে দিন কাটাবার পক্ষপাতী নন কোনোদিনই। কলকাতার নামী কলেজে লেখাপড়া শিখেছেন তিনি আর পাঁচটা তুখোড় বুদ্ধি ছেলেদের সঙ্গে, কাজ না করে ঘরের টাকা ভেঙে বাবুয়ানির কথা ভাবতেই পারেন না। তাই আইনের পরীক্ষা-টরীক্ষায় পাশ করে নিয়ে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ শুরু করে দিয়েছেন।

অবশ্য কু-লোকে বলে—প্র্যাকটিস্ না ছাই। হাইকোর্টে যাওয়ার উদ্দেশ্য তাঁর স্রেফ আড্ডা দেওয়া। গত কয়েক বছরে কোন জজের এজলাসে তাঁকে ক'বার হাজির হতে দেখা গেছে তা বোধহয় আঙুলে গুনে বলে দেওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে কোর্ট তিনি কোনোদিনই কামাই করেন না। কোর্টে গেলেই দেখা যাবে চট্টরাজ মশাই তাঁর নির্দিষ্ট টেবিলটিতে বসে বন্ধুদের সঙ্গে সমানে আড্ডা দিয়ে চলেছেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে চা আসছে, সন্দেশ আসছে, আসছে আরও নানা মুখরোচক খাবার। চট্টরাজ মশাই খেতে খুব ভালবাসেন, ভালবাসেন খাওয়াতেও।

আড্ডা ছাড়া আর একটা নেশা আছে তাঁর। সেটা হলো দেশভ্রমণের নেশা। ভারতবর্ষের হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি কোনো-না-কোনো সময়ে গিয়ে বেড়িয়ে আসেননি। এই দেশভ্রমণের জন্য দেদার খরচ করতেও তিনি মুক্তহস্ত।

কিন্তু দেশের বাইরে, ইচ্ছা থাকলেও, এ পর্যন্ত তাঁর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যতবার চেষ্টা করেছেন তাঁর স্ত্রী-ই বাগড়া দিয়েছেন তাতে। কারণ চট্টরাজ মশাইয়ের একটা দোষ, স্ত্রীকে সঙ্গে না নিয়ে কোথাও যাবেন না। প্রায়ই বলেন, ওগো, ইংরেজিতে কথা বলাটা এবার একটু ভালো করে সড়গড় করে নাও—বিদেশে তো তোমার বাংলা আর ভাঙা হিন্দী কোনো কাজে আসবে না। হিন্দী এখানকার রাষ্ট্রভাষা হতে পারে কিন্তু ও-সব দেশে অচল।

কিন্তু সেবার হঠাৎ একটা সুযোগ জুটে গেল।

চট্টরাজ মশাইয়ের বড় জামাই ইঞ্জিনীয়ার। একটা মস্ত বড় কোম্পানীতে কাজ করে। হঠাৎ তাকে কোম্পানী থেকেই পাঠিয়ে দেওয়া হলো জাপানে, কতকগুলি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে আসার ট্রেনিং নেবার জন্য। বছর দুই থাকতে হবে ওখানে। জামাইয়ের সঙ্গে তাঁর মেয়েও চলে গেল জাপানে।

আদুরে মেয়ে, জাপানে দিনকয়েক কাটিয়েই মাকে চিঠি লিখল—মা, তোমাদের ছেড়ে এসে এখানে মন টিকছে না একদম। দেখছি অনেক কিছুই, জাপানী ভাষাও শিখবার চেষ্টা করছি অল্প-স্বল্প, কিন্তু মন খুলে কথা না বলতে পারলে ভালো লাগে কি? তোমার জামাই তো অষ্টপ্রহরই টই-টই করে বেড়াচ্ছে। তাই বলি কি, বাবার তো দেশ বেড়াবার শখ চিরকালের, বাবাকে নিয়ে চলে এস না দিনকয়েকের জন্য। ভারি সুন্দর এই দেশ। দেখলে বাবা ভারি খুশি হবে।

চট্টরাজ-গিন্নী আদরের মেয়ের কথা ঠেলতে পারলেন না। স্বামীকে বললেন, তা হলে চল ঘুরেই আসি দিনকয়েক। খুকু এত করে লিখেছে...

যথাসময়ে চট্টরাজ মশাই সস্ত্রীক টোকিওর এয়ারপোর্টে এসে নামলেন। বিজ্ঞানের দৌলতে পৃথিবীটা এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে। চট্টরাজ মশাইয়ের মনে পড়ল, ছেলেবেলায় মামার বাড়ি পূর্ববঙ্গে যেতে কলকাতা থেকে সময় লাগত পাক্কা দু'দিন অর্থাৎ আটচল্লিশ ঘণ্টা। প্রথমে ট্রেন, তারপর স্টীমার, তারপর নৌকো। কিন্তু জায়গাটার দূরত্ব কলকাতা থেকে দেড়শ' মাইলও হবে না। আর এখন? কলকাতা থেকে সুদূর জাপানে পাড়ি দিতে বারো ঘণ্টাও লাগল না। তাজ্জব ব্যাপার!

এয়ারপোর্টে মেয়ে-জামাই দু'জনেই এসেছিল, আর সঙ্গে এসেছিল তাঁর নাতি টুটু—বছর দশেকের টুকটুকে ছেলে।

খুকু অর্থাৎ চট্টরাজ মশাইয়ের মেয়ে সীতা বলল, টোকিও শহরই এখন পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল শহর। শহরের এই হট্টগোলের মধ্যে থাকতে আমাদের ভালো লাগে না, তাই আমরা কাছেই উকুবাসি নামে শহরতলিতে বাসা নিয়েছি। তিরিশ কিলোমিটারের মতো পথ। গাড়িতে আধঘণ্টার আগেই পৌঁছে যাব।

রাস্তা দিয়ে দ্রুতগামী গাড়িগুলি ছুটছে। কোনো কোনো জায়গায় দোতলা, এমন কি তেতলা রাস্তাও রয়েছে। সেগুলি পার হয়ে ওঁরা ক্রমে শহরের বাইরে এসে পড়লেন। কী সুন্দর ঝকমকে রাস্তা! কোথাও খানাখন্দ নেই, নেই কোনোও আবর্জনা। দু'পাশে এখানে-ওখানে সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সবচেয়ে চোখে পড়ে চেরিফুলের গাছ। চট্টরাজ মশাই অবাক চোখে দেখছেন আর দেখছেন আর দেখছেন।

শ্বশুর-শাশুড়ীর আগমনে জামাতা বাবাজী সুবীর এক সপ্তাহ ছুটি নিয়েছে। মোমো-নো-সোক্কু নাকি ঐ রকম একটা ছোটদের উৎসব উপলক্ষে টুটুরও ইস্কুল ছুটি। তাই ঠিক হলো এ ক'দিন যতটা সম্ভব ঘুরে বেড়িয়ে আশপাশের দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখে নেওয়া হবে।

হলোও তাই। চট্টরাজ মশাই যতই দেখেন ততই মুগ্ধ হন আর গিন্নীকে বলেন, দেখেছ? ঠিক তোমাদের ত্যাঁদড়গঞ্জের মতো, তাই না?

ত্যাঁদড়গঞ্জ চট্টরাজ-গিন্নীর বাপের বাড়ি। নামটা মোটেই সুশ্রাব্য নয়, জায়গাটা আরও বিশ্রী। কিন্তু, তা হলেও, বাপের বাড়ি তো বটে! চট্টরাজ-গিন্নী ফোঁস্ করে উঠলেন।—ঐ জন্যেই তো বেছে বেছে গাঁয়ের সঙ্গে নাম মিলিয়ে ত্যাঁদড় জামাই করা হয়েছে।

সীতা মাকে ধমক দিয়ে বলল, আঃ মা, কী হচ্ছে! সামনে তোমাদের জামাই রয়েছে না?

দাদু-দিদার এই কৌতুক-কলহ দেখে টুটুর ভারি মজা লাগে। সে চেঁচিয়ে উঠে সুর করে বলে,—নুকা সিকি নুকা সিকি! ডাডু ডিডা পুটাবুকি!—এখানে এসে এরই মধ্যে জাপানী ভাষা গড়গড় করে বলতে শিখেছে ও। অবশ্য একটু-আধটু ভুল হয়। তা হলেই বা! এখানে তো আর মহাভারত নেই যে অশুদ্ধ হয়ে যাবে!

দিন তিনেক পরে সীতাই প্রস্তাব করল, চল, লেক চোবাটোকা দেখে আসি। বাবাকে বলল, পাহাড়ের একেবারে মাথার ওপর চূড়ার কাছে মস্ত হ্রদ। কাকচক্ষুর মতো টলটল করছে জল। আর চারদিকে সে কী অপরূপ দৃশ্য! একবার দেখলে কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

সুবীর তার কথায় সায় দিল। টুটুও আনন্দে লাফিয়ে উঠল। তারপরই মাকে বলল, সেবারকার মতো স্যাণ্ডউইচ নিয়ে যেতে হবে কিন্তু। চিকেনের নয়, সুচাকির স্যাণ্ডউইচ।

সুচাকি এখানকার স্থানীয় একরকম পাখি—হাঁস-মুরগীরই স্বজাতি, কিন্তু ওর মাংসটা আরও সুস্বাদু।

হ্যাঁ, নেব। সীতা সংক্ষেপে বলল।

আর সেই সঙ্গে স্ট্রবেরী মাখানো ক্রীম।

সীতা সস্নেহে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা-আচ্ছা, ফুরাসিকা ফুরাসিকা। অর্থাৎ তথাস্তু।

সীতা যে একটু একটু জাপানী ভাষা শিখেছে এটা বোধহয় তার নমুনা, কিন্তু ভুল হয়ে গেল। টুটু হেসে গড়িয়ে পড়ল।—হলো না, হলো না। ফুরাসিকা নয়, ওটা ফুরাসিকু হবে।

পরের দিনই ওরা রওনা হলো লেক চোবাটোকার উদ্দেশে।

সত্যি, দেখবার মতোই বটে। মাটি থেকে একটা বিরাট পাহাড় খাড়া হাজার দেড়েক ফুট ওপরে উঠে গেছে। নীচের দিকটা গোলাকার। দেখতে অনেকটা ফানেলের মতো। তারই মাথার ওপর বিরাট এক হ্রদ। চারদিককার প্রাকৃতিক দৃশ্য এক কথায় অপূর্ব।

পাহাড় বেয়ে হ্রদে পৌঁছতে হলে কষ্ট করে পা ভেঙে উঠতে হয় না। পাহাড়ের ওপর ঘুরে ঘুরে উঠবার জন্য মোটরগাড়ি যাবার রাস্তা। সারি সারি মিনিবাসের মতো গাড়ি রাস্তায়ই অপেক্ষা করছে। চড়ে বসলেই ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে নামিয়ে দেবে। চট্টরাজ মশাইয়ের মনে পড়ল, বিশাখাপত্তনম্-এর কাছে সিমাচলম্ পাহাড়ে উঠতেও তাঁরা এইরকম মিনিবাসে চড়েই চূড়ায় উঠেছিলেন। কিন্তু এখানকার এগুলো আরও আরামদায়ক।

গাড়ি একেবারে হ্রদের পাশে নামিয়ে দিল ওঁদেরকে। নেমেই দেখেন, যে-রকম সব বেড়াবার জায়গাতেই দেখা যায় এখানেও তেমনি ট্যুরিস্ট হোটেল, রেস্তোরাঁ, ফটোগ্রাফীর ও আরও হরেকরকম শৌখিন জিনিসের দোকান। একটা দোকানে লাল টুকটুকে চেরীফল বিক্রি হচ্ছে। দেখলেই মুঠো মুঠো তুলে মুখে দিতে ইচ্ছে করে।

হ্রদের ধার ঘিরে রাস্তা। তাই ধরে বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় দেখা গেল কতকগুলি সুদৃশ্য বোট বাঁধা আছে। এসব বোট ভাড়া পাওয়া যায়। অনেকেই রোইং করার উদ্দেশে সেগুলি ভাড়া করে হ্রদের জলে ভেসে পড়ে।

টুটুও আবদার ধরল, নৌকোয় চড়তে হবে।

চট্টরাজ মশাই হেসে বললেন, বেশ, ফুরাসিকা! না, ভুল বললাম বোধ হয়। ফুরাসিকু, তাই না?

দাদুর মুখেও জাপানী ভাষা শুনে টুটু খিলখিল করে হেসে উঠল।

কিন্তু—দাদু একটু থেমে বললেন, সবাই সাঁতার জান তো? তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, তুমি তো বিয়ের আগে ত্যাঁদড়গঞ্জে মেয়েদের সুইমিং কম্‌পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছিলে, তাই না?

চট্টরাজ-গিন্নী মুখটা বেঁকিয়ে হেসে বললেন, ঢং!

একটা বড়সড় পাঁচ-ছ'জন বসতে পারে এমনিধারা বোট ভাড়া নেওয়া হলো। না, মাঝি লাগবে না। নিজে না চালালে সেটা আবার রোইং হলো নাকি?

সবাই মিলে নৌকোয় গিয়ে উঠলেন। সুবীর আর সীতা দু'দিকে দু'টো বৈঠা নিয়ে বসল। টুকুও নিল একটা। চট্টরাজ মশাই বললেন, আমি হালে বসছি।

তরতর করে স্বচ্ছ জলে ভেসে চলল নৌকো।

ফুরফুরে বাতাস বইছে। একটু একটু শীত শীতও করছে যেন। নৌকোর নীচে ঠাণ্ডা টলটলে জল। হাতটা বাড়িয়ে জলে ডোবালে গা-টা সিরসির করে ওঠে। কিন্তু তাইতেই নৌকোবিহার আরও লোভনীয় হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ টুটু বলল, দেখ দেখ, ঐখানটায় জলের মধ্যে কেমন বুড়বুড়ি উঠছে না!

সত্যিই তো! একটা জায়গায় জলের মধ্যে থেকে ক্রমাগত বুদ্বুদের মতো কি একটা উঠে আসছিল, ঠিক যেমনটা ফোয়ারার জলে প্রথমটা ওঠে। কিন্তু সাধারণ বুড়বুড়ি নয়, তা থেকে বেশ একটু বড় বড় এবং দ্রুত উঠে আসছিল সেগুলি জলের ভিতর থেকে।

কী ব্যাপার? সুবীর বৈঠা বাওয়া বন্ধ করে ভালো করে দেখতে লাগল। সীতা বলল, আরে, এদিকেও যে!

দেখা গেল একটা নয়, দু'টো নয়, অনেকগুলি জায়গায় একসঙ্গে জলের মধ্যে থেকে ঐরকম বুদ্বুদ ভেসে উঠছে এবং তা ক্রমেই আরও দ্রুতবেগে, আরও বড় বড় চেহারা নিয়ে দেখা দিচ্ছে।

একটু পরেই এদিকে-ওদিকে ফোয়ারার মতো ফিনকি দিয়ে জলের ধারা ছিটকে বেরুতে শুরু করল। সমুদ্রে তিমি যখন জলের ওপর দিকে উঠে নিঃশ্বাস ছাড়ে তখন নাকি এইরকম হয়—ফোয়ারার মতো ফিনকি দিয়ে জল উঠে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই হ্রদেও কি তাহলে তিমি এসে জুটেছে নাকি? কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, এ তো লোনা জল নয়, মিষ্টি জলের হ্রদ।

দেখতে দেখতে ফোয়ারার সংখ্যাও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে ক্রমাগত হুস্ হুস্ করে জল উঠছে আর ভেঙে পড়ছে সাদা ফেনায়। অন্যান্য যে-সব ভ্রমণার্থী বোটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তাঁরাও এটা লক্ষ্য করেছিলেন এবং সকলেই দেখা গেল তীরের দিকে নৌকো ঘুরিয়ে দিয়েছেন। চট্টরাজ মশাইও বেশ বিচলিত হয়ে উঠলেন, বললেন, ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন লাগছে। ডাঙার দিকে জোরে বৈঠা চালাও। নিজেও একটা বৈঠা তুলে নিলেন।

তাড়াতাড়িতে জোরে বৈঠা জলে ফেলতেই এক ঝলক হ্রদের জল ছিটকে এসে তাঁর গায়ে লাগল। চট্টরাজ মশাই চমকে উঠে বললেন, এ কি, এ যে গরম জল! বেশ গরম। একটু আগেও তো এরকম ছিল না! বেশ ঠাণ্ডাই ছিল।

তাঁর কথা শুনে সুবীর, সীতা দু'জনেই হ্রদের জলে হাত ঢুকিয়ে দিল এবং পরক্ষণে দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল,—এ কি, এ যে ভীষণ গরম! মনে হচ্ছে একটু পরেই ফুটতে শুরু করবে।

আতঙ্কে সকলেরই মুখ তখন সাদা হয়ে গেছে। যে ভাবেই হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হ্রদের পাড়ে গিয়ে উঠতে হবে। চট্টরাজ-গিন্নীও এবার তাঁর অপটু হাতে আর একটা বৈঠা তুলে নিলেন।

পেছনে তখন কেমন একটা ক্ষীণ অথচ গুম্‌গুম্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। প্রথমে সেটা ছিল অস্ফুট, কিন্তু ক্রমেই তার তীক্ষ্নতা বেড়ে চলেছে।

সহসা টুটু চেঁচিয়ে উঠল, বাবা, দাদু, ঐ দেখ!

সকলেই টুটুর কথা শুনে মুখ ফেরালেন। হ্রদের ওপর থেকে ঘন বাষ্পের মতো কি যেন ওপরে উঠে আসছে, এদিন-ওদিক সব দিকেই। প্রথমে সেটা ছিল সাদা কুয়াশার মতো, কিন্তু ক্রমেই তার রঙ ঘন হয়ে এখন কালো ধোঁয়ার মতো হয়ে উঠেছে। ঠিক যেন কয়লা চালানো রেল ইঞ্জিনের ধোঁয়া।

চট্টরাজ-গিন্নী অনভ্যস্ত হাতে বৈঠা টানতে টানতে বলে উঠলেন, একটা গন্ধও টের পাচ্ছি যেন! গন্ধক পোড়ালে যেমনটা হয় অনেকটা তেমনি। দেখ শুঁকে।

ভয়ে তখন কারুর মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। এ কি বিপদ হলো প্রমোদভবনে এসে! শেষ পর্যন্ত ডাঙায় পৌছনো যাবে তো?

যাওয়া সত্যিই কঠিন। হ্রদের জলও এখন ছলাৎ ছলাৎ করে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। কে বলবে শান্ত হ্রদ? এ যে সমুদ্রের মতোই বড় বড় ঢেউ! নৌকো একবার সেই ঢেউ-এর মাথার ওপর গিয়ে উঠছে, পরক্ষণেই নেমে আসছে নীচে।

চট্টরাজ-গিন্নী বৈঠা ফেলে দিয়ে দুর্গাস্তোত্র শুরু করে দিলেন ঃ

"নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগৎব্যাপিকে বিশ্বরূপে
নমস্তে জগৎবন্দ্য পাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।"...

সীতা একালকার কলেজে-পড়া মেয়ে, ও-সব মন্ত্র তার জানা নেই। কিন্তু বিপদকালে দুর্গানাম করার কথা সে ভোলেনি। প্রাণপণে বৈঠা টানছে—আর মুখে বলে চলেছে—

দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা
দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা...

শুধু টুটু চোখ বুজে রয়েছে, মুখে কোনো কথা নেই তার।

যাই হোক, চট্টরাজ-গিন্নীর আওড়ানো মন্ত্রের জোরেই হোক কিংবা কলেজে-পড়া মেয়ের অস্বাভাবিক কিন্তু আন্তরিক ডাকেই হোক, মা দুর্গার মন হয়তো সামান্য একটু টলল। তিনি তো সর্বত্র আছেন,

জাপানের এই হ্রদের ধারেই বা থাকবেন না কেন? হয়তো তাঁরই সেই আশীর্বাদে ওঁরা একসময়ে ডাঙায় গিয়ে উঠলেন—অক্ষত শরীরেই।

সারি সারি মিনিবাস দাঁড়িয়ে। একটা একটা করে নৌকো এসে তীরে ভিড়ছে আর বাসগুলো তাদের তুলে নিয়ে দ্রুতবেগে নীচে নেমে যাচ্ছে। ওঁরাও একটা মিনিবাস পেয়ে তাড়াতাড়ি তাতে উঠে পড়লেন। ঝড়ের মতো বেগে মিনিবাস ঘুরে ঘুরে পাহাড় বেয়ে নীচে নেমে এল।

বাস থেকে নেমে ওঁরা একবার হ্রদের দিকে তাকালেন। সেখানে তখন ভীষণ অবস্থা, জলের ওপরেই দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, ওপর দিকে ছিটকে ছিটকে পড়ছে কাদার চাপটি, পাথরের টুকরো, আরও কি সব। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে গেছে মেঘের রাজ্যে। সেদিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়।

ততক্ষণে ওপরকার হোটেল, রেস্তোরাঁ, আর অন্যান্য দোকানের লোকেরাও দলে দলে নীচে নেমে আসছে সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে। যারা মিনিবাসে উঠতে পারেনি তারা দুরন্ত বেগে ছুটে ছুটেই নামছে। সেও এক ভয়াবহ দৃশ্য।

যাই হোক, চট্টরাজ মশাই সবাইকে নিয়ে কোনোরকমে ফিরে এলেন উকুবাসিতে সুবীরের কোয়ার্টারে।

এরপর বেশ কিছুদিন কাটল। চোবাটোকার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার পর আর নতুন করে বাইরে বেরুবার ভরসা হচ্ছিল না যেন। কিন্তু জাপানে তো এখনও কত কি দেখবার আছে। দেখা হয়নি কুমাকুরার বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তি, দেখা হয়নি ফুজিয়ামা, দেখা হয়নি কিয়োটো, নাগাসাকি ইত্যাদি আরও কত জায়গা!

হুঁ, ভেবেছেন, সেদিনকার সেই রহস্য উদ্ঘাটিত হলে তবেই। চট্টরাজ মশাই ততদিন না হয় গ্যাঁট হয়েই বসে থাকবেন মেয়ে-জামাই-এর বাড়িতে। জলে পড়েননি তো আর।

রহস্য কিন্তু কিছুদিন পরে সত্যিই উদ্ঘাটিত হলো। উদ্ঘাটন করলেন জাপানী বিজ্ঞানীরা—বিশেষ করে ওখানকার জিওলজিক্যাল সার্ভে অর্থাৎ ভূতাত্ত্বিক সংস্থার বিজ্ঞানীরা।

চট্টরাজ মশাই চলে আসবার পর চোবাটোকা হ্রদে আর কি ঘটেছিল তা তাঁরা চাক্ষুষ দেখতে না পেলেও কাগজে পড়েছিলেন, ছবিও দেখেছিলেন তার।

হ্রদের জল প্রথমে টগবগ করে ফুটতে থাকে, তারপর একসময় ঐ অত বড় হ্রদটার সমস্ত জল বাষ্প হয়ে উবে যায় আকাশে। আকালে উঠে ভাসতে থাকে মাইলের পর মাইল পুরু মেঘের স্তরের মতো। সেই নিবিড় মেঘে সমস্ত জায়গাটা অন্ধকার হয়ে যাবার কথা, কিন্তু তা যায়নি। কেননা ঐ হ্রদের সমস্ত জল চলে যাবার পরও সেখান থেকে বেরুতে থাকে ঝলকে ঝলকে আগুন।

প্রায় সাত দিন ধরে চলে এই কাণ্ড। তারপর সে আগুন স্তিমিত হতে হতে একসময়ে আবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

এরপরই বিজ্ঞানীরা শুরু করে দেন তাঁদের কাজ। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেন চোবাটোকা সাধারণ পাহাড় নয়—আসলে ওটা একটা বিরাট আগ্নেয়গিরি। কোন আদ্যিকালে ওটা সজীব ছিল কেউ জানে না, কেননা পৃথিবীতে হয়তো তখন প্রাণেরই আবির্ভাব হয়নি। ঐ অঞ্চলটি তো এখনও আগ্নেয়গিরির 'বেল্ট' বলে পরিচিত, সে যুগে হয়তো ওরকম আরও ছিল। খোদ ফুজিয়ামাই তো একসময়ে ছিল আগ্নেয়গিরি।

যাই হোক, চোবাটোকার অগ্নি উদ্‌গীরণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে, তারপর একদিন সে আগুন চিরকালের জন্য নিবে যায়। চাঁদের পাহাড়গুলির মতো এও হয়ে দাঁড়ায় একটি মৃত আগ্নেয়গিরি। সেও কতকাল আগেকার কথা কে জানে!

চোবাটোকা নিবে যায় আর তার ওপরকার ক্রেটার অর্থাৎ জ্বালামুখটা একটা যোজন-জোড়া গহ্বরের মতো পড়ে থাকে। তারপর তার মধ্যে জমতে থাকে বৃষ্টির জল। সেও কত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কে জানে! একটু একটু করে জমতে জমতে এক সময়ে গহ্বরটিকে কানায় কানায় ভর্তি করে ফেলে সেই জল, ওটি হয়ে দাঁড়ায় এক বিশাল স্বাদু জলের হ্রদ। লোকে তার নাম রাখে চোবাটোকা।

কিন্তু চোবাটোকা হ্রদটি যে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়েছিল তা কি সত্যি নিবে গিয়েছিল? না, একেবারে নিবে যায়নি। ঘুমন্ত অবস্থায় পড়েছিল বলা চলে। এক-আধদিনের ঘুম নয়, লক্ষ লক্ষ বছরের ঘুম।

কিন্তু পৃথিবীর ভিতরটা তো কোনোদিনই শান্ত নেই। দিনরাত কত কাণ্ড-কারখানা চলছে সেখানে, ভূমিকম্পে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে কত জায়গা! চোবাটোকা পাহাড়ের নীচেও যে এই রকম ভীষণ কাণ্ড চলছিল তা কে জানত? আর কতদিন আগে থেকে তাও তো জানা সম্ভব ছিল না।

তারপর হঠাৎ যেন তার ঘুম ভাঙে। তার ভিতরকার আগুন নতুন উদ্যমে একটু একটু করে আবার বেরিয়ে আসবার পথ খুঁজে নেয়, তারপর সুযোগ বুঝে হঠাৎ একদিন শুরু হয়ে যায় তার অগ্নি-উদ্গীরণ। আর, এমনি মজা, ঠিক যেদিন সে আগুন হ্রদের জল ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে এল সেই দিনই কিনা চট্টরাজ মশাইরা গেলেন হ্রদে নৌবিহারে!

অগ্নি-উদ্গীরণের ফলে কি ঘটল সে কথা তো আগেই বলা হয়েছে। প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে আশপাশের সমস্ত অঞ্চল লণ্ডভণ্ড করে আবার তার আগুন নিবে গেছে। চোবাটোকা এবার আবার ঘুমিয়ে পড়বে। কে জানে এটিই তার শেষ ঘুম কিনা, নাকি কুম্ভকর্ণের মতো আবার একদিন তার ঘুম ভাঙবে?

বিজ্ঞানীরা নানা হিসেবপত্র করে মনে করছেন যদি কোনোদিন সে আবার জাগেও তা হলেও দু'লক্ষ বছরের আগে আর নয়। ততদিনে হয়তো বৃষ্টির জল জমে ওর জ্বালামুখের গহ্বরে তৈরি হবে আর একটি হ্রদ। অবশ্য সেই দূর ভবিষ্যতে সেই হ্রদে নৌকো নিয়ে ভাসবার মতো কোনো মানুষ টিকে থাকবে কি না কে জানে?

[শারদীয়া ১৩৯৩]

প্রেতাত্মার আবাহন

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকে লোকারণ্য! মাঠের মধ্যে বিরাট একটা ভিড় জমে গেছে! বীভৎস দৃশ্য! বারো-চৌদ্দ বছরের এক ছেলে—নাম তার জনেশ—রক্তমাখা শরীরে পড়ে আছে! কোনো হিংস্র জন্তু তার নাক-মুখ খুব্‌লে খেয়ে গেছে!

সুন্দর ছেলে জনেশ, তাকে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠও বলা চলে। গাঁয়ের ইস্কুলে ক্লাশ সেভেনে পড়তো, পড়াশুনায়ও ছিল ভালো ছেলে—তার বিরুদ্ধে মাস্টারদের কখনো কোন অভিযোগ শোনা যায়নি। পাড়ায় বা গাঁয়েও যে তার কোন শত্রু ছিল, এমন কথাও কেউ কোন দিন শোনেনি! খুবই নম্র বিনয়ী ভালো ছেলে ছিল জনেশ। তবু তারই বরাতে হলো এমন মৃত্যু—এমন শোচনীয় ও সাঙঘাতিক মৃত্যু?—একেই বলে নিয়তি!

ভিড়ের মধ্যে কত কথাই হলো এম্‌নি ধারা! এর পর পুলিশ যখন এসে গেলো তখনই ভীড় খানিকটা কমে গেলো; কিন্তু দু'একটি নতুন লোক পুলিশের আবির্ভাব দেখেই কৌতূহলী হয়ে তাদের পিছু নিয়েছিল,—শঙ্কর সেনও ছিল তাদের সঙ্গে।

পুলিশ-ইন্সপেক্টর যোগেনবাবু খুব মন দিয়ে লাশ পরীক্ষা করলেন; লাশ যেখানে পড়ে আছে, সে জায়গাটাও পরীক্ষা করলেন।

লাশের নাক-মুখ নেই; চোখ-কানও প্রায় সবই নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর রক্তমাখা স্থানটায় তখনো কতকগুলো পদচিহ্ন! কিন্তু সে পদচিহ্ন মানুষের নয়, দেখে মনে হয় কুকুব বা বাঘ-শেয়াল-জাতীয় কোন চতুষ্পদ জন্তুর পদচিহ্ন!

যোগেনবাবু হাঁটু গেড়ে বসে লাশ ও সে স্থানটা পরীক্ষা করছিলেন। তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর নিজের মুখের ওপর যেন একরাশ কালি মেখে বললেন, "ও, কি নিয়তি! এতটুকু বাচ্চা ছেলে, কিন্তু কি সাঙঘাতিক অপমৃত্যু! না-জানি কোন্ এক হিংস্র জন্তু, ছেলেটাকে একলা পেয়ে এম্‌নি ভাবে খুব্‌লে খেয়েছে!"

শঙ্কর খানিকটা এগিয়ে এলো যোগেনবাবুর দিকে। তারপর বিনীতভাবে বললো, "আপনি কি এর মৃত্যু কোন হিংস্র জন্তুর কাণ্ড বলে মনে করেন?"

—"নিশ্চয়ই, কিন্তু কেন বলুন তো?"

শঙ্কর বললে, "আমার বিশ্বাস, আপনি যা অনুমান করেছেন, তা ঠিক্ নয়। আমার মনে হচ্ছে, ছেলেটাকে খুন করা হয়েছে।"

যোগেনবাবু চটে উঠলেন, বললেন, "মানুষের পায়ের দাগ কি এম্‌নি হয়? না, মানুষ কখনো এমন করে নাক-মুখ খুব্‌লে খেতে পারে?"

এই বলে তিনি ঘটনাস্থলের পায়ের দাগগুলো ও লাশের বিকৃত মুখের দিকে বক্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

শঙ্কর বললো, "তার হয়তো অন্য কৈফিয়ৎ মিলবে, কিন্তু এর মৃত্যু যে মানুষের হাতে হয়েছে এতে কোন সন্দেহই নেই।"

"হোঃ হোঃ" করে হেসে উঠলেন যোগেনবাবু! হয়তো তিনি আরো কিছুক্ষণ হাসতেন ও দু'একটি তীব্র মন্তব্য করতেন বক্তার বিরুদ্ধে, কিন্তু বক্তা শঙ্কর সেন হঠাৎ তার পকেট থেকে তার নাম লেখা একখানি কার্ড বার করে যোগেনবাবুর হাতে দিতেই, তাঁর বিশাল মুখ-ব্যাদান হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে গেলো—তিনি সংযত হয়ে গেলেন মাঝপথেই, আর বিস্ময়ের সঙ্গে অর্দ্ধস্ফুট ভাবে উচ্চারণ করলেন, "আপনি? আপনি—মিঃ সেন!"

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ডিটেক্টিভ্ মিঃ শঙ্কর সেনের নাম ইন্সপেক্টর যোগেনবাবুর একেবারেই অপরিচিত ছিল না; কিন্তু জানতেন না তিনি যে, শঙ্কর সেনের বাড়ী ছিল সেই গ্রামেই! যাহোক্, নামের কার্ড দেখেই যোগেনবাবু বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন।

প্রথমে মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা একেবারেই প্যাঁচালো কিছু নয়—খুবই সহজ ব্যাপার। হয়তো বাঘ বা শেয়াল-কুকুর জাতীয় কোন প্রাণী জনেশকে খেয়ে থাকবে। অন্ততঃ গ্রামের পুলিশের ধারণা ছিল অনেকটা সেই রকম। কিন্তু গোয়েন্দা শঙ্কর সেন তাতে একটা মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। প্রথমে সেই-ই আবিষ্কার করেছে যে, জনেশের কপালে ছোট্ট একটি রক্তের বিন্দু দেখা গেছে—আর সেই রক্তবিন্দু নাকি বিষাক্ত তীরের ফলায় হয়েছে!

শঙ্কর সেনের এই আবিষ্কারের ফলে পুলিশ-মহলেও একটা হৈ-চৈ পড়ে গেছে! তাদের বুদ্ধিতে যা ছিল খুব সহজ মীমাংসা, তাইই এখন এমন জটিল হয়ে উঠবে, একথা কে কবে ভাবতে পেরেছিল?

যাহোক্, এরপর তদন্তের ভারটা যে শঙ্কর সেনের ওপর পড়বে, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না; কার্য্যতঃ হলোও ঠিক তাই। জনেশের মৃত্যু-রহস্যের একটা কিনারা করবার ভার সম্পূর্ণভাবে শঙ্কর সেনের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো।

কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেও যখন গোয়েন্দা শঙ্কর সেন কোন কূল-কিনারাই করতে পারলে না, তখন জন-সাধারণই যেন ক্ষেপে উঠলো সকলের আগে। তারা ডি. আই. জি., আই. জি. প্রভৃতির কাছে ঘন ঘন চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে, এই ব্যাপারের একটা দ্রুত মীমাংসার জন্য তাঁদের তাগিদ দিতে লাগলো।

এম্‌নি সময় হঠাৎ দেখা গেলো গোটা-কয়েক খবরের কাগজে এক বিচিত্র বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। তাতে লেখা ছিল ঃ—

"এতদ্দ্বারা সর্ব্ব-সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বর্দ্ধমান জেলার দাশপুর গ্রামে আগামী শনিবার রাত্রি দশটার পর প্রকাশ্য রাস্তায় চলাচল করা বিপজ্জনক হইতে পারে। কারণ, মাসাধিক কালই পূর্ব্বে উক্ত গ্রামে জনেশ নামক একটি বালককে কে বা কাহারা হত্যা করায়, উক্ত ব্যাপারের তদন্ত-ভার বিখ্যাত ডিটেক্টিভ্ শ্রীযুক্ত শঙ্কর সেনের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি তাঁহার আধিভৌতিক ক্ষমতায় মৃত জনেশের প্রেতাত্মাকে প্রতি রাত্রিতে তাঁহার গৃহে আনয়নের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি আশা করেন, আগামী শনিবার জনেশের প্রেতাত্মার মুখেই তিনি হত্যাকারীর নাম ও ঠিকানা জানিতে পারিবেন। সেইদিন রাত্রে পরীক্ষা-কার্য্য চূড়ান্ত ভাবে পরিচালিত হইবে। কিন্তু নিহত ব্যক্তির প্রেতাত্মা স্বভাবতঃই প্রতিশোধপরায়ণ ও হিংস্র। সুতরাং জন-সাধারণকে আগামী শনিবার রাত্রি দশটার পর হইতে তাহাদের গৃহমধ্যে থাকিবার অনুরোধ করা যাইতেছে। ইতি—

স্বাক্ষর (অস্পষ্ট)
ম্যাজিস্ট্রেট, বর্দ্ধমান।"

খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপন পড়ে জন-সাধারণের কৌতূহল হলো যতটা, তার চেয়ে বেশী হলো তাদের আতঙ্ক ও ভয়! তারা শনিবারের দু'দিন আগে হাতেই রাত আটটায় দরজা-জানালা বন্ধ করার অভ্যাস করে নিলে।

এর ভেতর শঙ্কর সেন যাইই করুক্ না কেন, পুলিশের দলও একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিল না। তারা সে গ্রামের ও তার আশপাশের তিন-চারখানা গ্রামের সমস্ত বাসিন্দাদের সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খোঁজ-খবর সংগ্রহ করে নিয়ে গেলো।

কার বাড়ীতে ক'টি লোক, গরু বা ছাগল-ভেড়া ক'টি, কুকুর-বেড়াল ক'টি, কার বাড়ীতে কিসের বাগান ও বাগানে কোন্ কোন্ ফুল-ফল বা শাক-সব্‌জি হয়, সে-সব খবরও তারা লিখে নিলে। পুলিশের এই পাগ্‌লামি দেখে কেউ হাসলো, কেউ বা বিদ্রূপ করে বললে, "যত সব গরুর দল এখন পুলিশে ঢুকেছে! তাই গাছপালার খবর না নিলে আর খোঁজ করবে কিসের?"

শনিবার। রাত দশটা বেজে গেছে, বোধহয় মাত্র মিনিট দশেক আগে। সারা গ্রামে একটা থম্‌থমে ভাব ও বিরাট স্তব্ধতা! ভয়ে আজ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায়ও কেউ আলো দিতে আসেনি! ফলে, সমস্ত গ্রামখানি আজ জমাট অন্ধকারে ঢাকা। মনে হয়, একটা অন্ধকার বাদুড় যেন তার বিরাট ডানা মেলে গ্রামের আকাশখানি ছেয়ে রয়েছে।

হঠাৎ, রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে কোথায় উঠলো মেঘমন্দ্র ওঙ্কার-ধ্বনি!—শুধু ওঁং ওঁং—আর নানা মন্ত্রতন্ত্র—প্রেতের আবাহন!

মিনিট দশেক একটানা এম্‌নি ভাবেই চললো—সহসা বালকের কণ্ঠে কোথায় কে আর্ত্তনাদ করে উঠলো,—"উঃ! জ্বালা! জ্বালা! বিষম জ্বালা! ওরে বাপ্! জ্বলে গেলো, জ্বলে গেলো মাথা! জ্বলে গেলো বুক!"

আর্ত্তনাদ থেমে গেলো, কিন্তু তখনো কার কাতর গোঙানি সেই গ্রামের আকাশে ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে-গুঁড়িয়ে পড়ছিল!—চাপা কিন্তু বুক-ফাটা গোঙানি!

একটু পরেই আবার সেই বজ্র আহ্বান!—

"বল্—বল্ কে সেই লোক? কোন্ সে দুর্ব্বৃত্ত? বল্—বল্—ব্রুহি মে প্রেতাত্মন!"—

ডিটেক্‌টিভ্ শঙ্কর সেনের কণ্ঠ হলেও তা এত সতেজ ও এত মর্ম্মভেদী? এ যে কল্পনা করাই কঠিন। বুঝি বা দু'মাইল দূর থেকেও তার সেই কণ্ঠ শোনা যায়—তা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে প্রতিটি বুকের ভেতর!

আবার সেই আর্ত্তনাদ—"ওঃ, জ্বালা! জ্বালা! হ্যাঁ—বলবো—বলবো—সব বলবো—আজই বলবো!"

একটু গোঙানি—তেম্‌নি মর্ম্মভেদী। তারপর আবার সেই বালকের প্রেতাত্মা গর্জ্জন করে উঠলো, "কেমন মজা! শয়তান খুনী! কেমন মজা! কাছে—আরো কাছে! ঐ যে দ্যাখ্—তোর পেছনে কে—আর—"

শঙ্কর সেনের ঘরের মধ্যে আর কিছু শোনা গেলো না, শোনা গেলো ঘরের বাইরে এক পতনের শব্দ! পাশের খোলা ঘর থেকে কে যেন ছুটে বেরিয়ে যেতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো! কিন্তু তখনই চোখের পলকে উঠেই সে আবার ছুটে পালাতে যাচ্ছিল, সহসা তার পেছন থেকে এক সিপাই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো—তাকে মুহূর্ত্তমধ্যে বেঁধে ফেললো।

জনেশকে খুন করেছে গ্রামেরই জমিদার-পুত্র রাজীব। স্বীকার সে করেছে সবই। সে বলেছে, জনেশ তাদের বাগান থেকে এক থোপা 'জিনিয়া' ফুল তুলে নিয়েছিল। রাজীব তা দেখতে পেয়ে চটে যায় ও তার রাগ থামাতে না পেরে, তাকে একটা লাঠি ছুড়ে মারে। কিন্তু সে জানতো না যে, লাঠির ডগায় ছিল বিষাক্ত তীর আঁটা। শেয়ালের অত্যাচার থেকে বাগানটি বাঁচাবার জন্য রাজীবের কাকা যে ও-রকম একটা ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, রাজীবের তা জানা ছিল না। জনেশ চীৎকার করে পড়ে যেতেই রাজীব একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই ভীত হয়ে সে করলো এক চালাকি। সে তার বিরাট শিকারী কুকুরের পিঠে চেপে লাশটাকে নিয়ে গেলো ফাঁকা মাঠে। তারপর কুকুরটাকে লেলিয়ে দিয়ে জনেশের নাক-মুখ খানিকটা খুব্‌লে খাইয়ে দিলে। কিন্তু তবু সে ধরা পড়লো তার ভয়ার্ত্ত পাপী মনের বড্ড বেশী কৌতূহলের ফলে!

শঙ্কর সেনের বাহাদুরী এই যে, জনেশের নাক-মুখ খুব্‌লে নেওয়া হলেও সে সন্দেহ করেছিল

কপালের রক্তবিন্দুটাই তার খুনের সাক্ষ্য। ঘটনাস্থলের রক্ত পরীক্ষা করে একথাও সে বুঝতে পেরেছিল যে, আসলে ওটা কোন মানুষের রক্ত নয়—ওটা রক্তের একটা ভান মাত্র! কারণ, জনেশকে হত্যা করবার অনেক পরে শিকারী কুকুরটাকে দিয়ে তার নাক-মুখ খুব্‌লে খাওয়ানো হয়েছিল; কিন্তু তখন তো আর কোন রক্ত বেরোয়নি! কাজেই পাঁঠার রক্ত ছড়িয়ে তাকেই জনেশের রক্ত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল।

রাজীব ডিটেক্‌টিভ্‌-বই পড়েছিল অনেক। সেই বই-পড়া জ্ঞান হতে সে বুঝে নিয়েছিল, তার নিজের পায়ের ছাপ সম্পর্কেও তার সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। তাই লাশশুদ্ধ সে নিজেও এসেছিল কুকুরের পিঠে চেপে। তার ফলে ছাপগুলো সবই পড়েছিল কুকুরের পায়ের ছাপ, কিন্তু বড্ড বেশী ভারে সেগুলো মাটিতে বসে গিয়েছিল অনেকটা।

শঙ্কর সেন প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিল, স্বাভাবিক অবস্থায় শেয়াল-কুকুর বা বাঘ, এদের কারো পদচিহ্নই এত বেশী গভীর হতে পারে না; কিন্তু গভীর হয়েছে শুধু এই কারণে যে, নিশ্চয়ই সেই প্রাণীর পিঠে অন্য কোন ভার চাপানো ছিল।

এরপর পুলিশ যখন অনুসন্ধান করে খবর দিলে যে, রাজীবদের বাড়ীতে বিরাট একটা শিকারী কুকুর আছে, তখনই সমাধান আরো কিছু সহজ হয়ে এলো!

শুধু তাই নয়। জনেশের পকেটে ছিল তখনো গোটা কয়েক জিনিয়া ফুল! কিন্তু জিনিয়া ফুলের গাছ সে তল্লাটে কেবল ঐ জমিদার-বাড়ী ছাড়া আর কোথাও ছিল না। কাজেই শঙ্করের সন্দেহ ক্রমশঃই রাজীবের বাড়ী লক্ষ্য করেই ঘোরাফেরা করছিল।

কিন্তু বাড়ীটা ঐ বাড়ী হলেও, সে বাড়ীতে লোক তো কতই আছে! তাদের মধ্যে খুনী কে? সে প্রশ্নের মীমাংসা করে দিলে শঙ্করের আধিভৌতিক প্রক্রিয়া।

কলকাতা থেকে সে রেকর্ড করিয়ে আনলো তার নিজের ভাষায় প্রেতাত্মার আবাহন, ও জনেশের সমানবয়সী কোন বাচ্চা ছেলের আর্ত্তনাদ, ও তার গোঙানি প্রভৃতি! সেগুলো অদৃশ্য স্থানে এমপ্লিফায়ারের সাহায্যে বজ্রনাদে বেজে উঠলো! আসল খুনী তাতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো! তারপর অদম্য কৌতূহল নিয়ে সে নিজেই জানতে গিয়েছিল কি বলে সেই মৃতের প্রেতাত্মা। তার নাম যদি সত্যই সে প্রকাশ করে দেয়, তাহলে পালিয়ে যাবে সে তৎক্ষণাৎ—এই ছিল তার উদ্দেশ্য!

কিন্তু সে জানতো না যে, এমনি বন্দোবস্ত করা ছিল সেই দরজা-ভেজানো খোলা ঘরে যে, সে ঘরের সামান্য শব্দটিও তখন খুব বড় হয়ে শঙ্করের কানে বেজে উঠ্‌ছিল। কাজেই রাজীবের প্রবল শ্বাস-প্রশ্বাস শঙ্করের কাছে ধরা পড়ে গেলো মুহূর্ত্তমধ্যেই। আর তারই ফলে হলো তার গ্রেপ্তার!

বলা বাহুল্য, পুলিশ সেজন্য তৈরী হয়ে ছিল বহু আগে হতেই।

[ভাদ্র ১৩৬০]

পল-কাটা হীরে

শৈল চক্রবর্তী

বি. কম পাশ করে দুবার ব্যাঙ্কের পরীক্ষা দিয়ে অবশেষে একটা চাকরি পেয়েছি।

বাঙ্কের চাকরি পেতে বাড়ির সবাই খুবই প্রসন্ন। আমিও নিশ্চিন্ত। মাইনে ভাল, কিছুদিন অন্তর নিজেদের উন্নতির জন্যে ধর্ণা ধর্মঘট শ্লোগান ইত্যাদি করে মাইনে বাড়িয়ে নেওয়া অতি সহজ ব্যাপার।

আমার বন্ধু সমীর, সেও ঢুকেছে অন্য ব্যাঙ্কে। আর এক বন্ধু অনিমেষ ল-লাইনে গেছে। ইচ্ছে ছিল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হবার কিন্তু হলো উকিল, তাও ইনকাম ট্যাক্সের। এখনকার দিনে এর চেয়ে রোজগারের আর ভাল রাস্তা নেই বোধ হয়।

সেদিন হঠাৎ সমীরের ফোন। আপিসে বসেই ধরলুম। সে বললে, শুনেছিস অনিমেষের বিয়ে হচ্ছে যে।

আমি বললুম, বাজে কথা, এ তো আজ নয়, অনেকদিন থেকে কথা চলছে।

না না, ঠিক হয়ে গেছে। আমি চিঠি পেয়েছি আজ সকালের ডাকে।

তাই নাকি? কই আমি পাইনি তো।

পাবি পাবি, আজ বাড়ি গিয়েই হয়ত—

সত্যিই তাই। বাড়িতে গিয়ে চিঠি তো নয়, যেন বাহারে কার্ড একখানা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। খুলে পড়ে দেখি—শান্তনু, কার্ড পাঠালুম, বাড়ির লোক সব ঠিক করে ফেলেছে। কি আর করি বল। রাজী হতে হলো। পারলে এর মধ্যে একবার দেখা করিস।

পরদিন সমীরকে বললুম, অনিমেষের জন্যে একটা Present তো কিনতে হবে—

তাতো হবে—দুজনে এত দূরে থাকি যে একসঙ্গে মোলাকাৎ হওয়া দুঃসাধ্য। কলকাতা এখন আমার কাছে এক দুর্গম অরণ্য মনে হয়। অরণ্য ভেদ করে তবু যাওয়া যায়—কিন্তু এই শহরে জ্যামজট ভেদ করে গতায়াত শুধু অসাধ্য নয়—প্রাণ যাবার রিস্কও আছে।

হঠাৎ অনিমেষের ফোন পেলাম। শান্তনু, বাড়িতে মস্ত বিপদ। একবার যদি আসিস।

কি বিপদটা বল আগে।

তনি মানে, তনুশ্রী কাল থেকে মিসিং। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হয়ত আজকে রাতে T.V. তে ছবি দেখতে পাবি।

তনুশ্রী হলো অনিমেষের বোন। আমরা তনি তনি করে ডাকি। মেয়েটা সত্যি খুব ভাল। বি. এ পড়ছে। দেখতে ডানাকাটা পরী নয়, তবে সুন্দরী। আর খুব স্মার্ট।

পুলিশে খবর দিয়েছিস?

হ্যাঁ, সে তো পরদিনই দিয়েছি। কিন্তু পুলিশের ওপর ভরসা নেই।

হঠাৎ যেন আকাশ থেকে দড়াম করে ভূতলে পড়লাম। তনুশ্রী মিসিং। এ কি করে হবে। অত স্মার্ট মেয়ে। সে কারও খপ্পরে পড়ার পাত্রী তো নয়—তবে অন্য কোনো বিপদও হতে পারে তো।

সন্ধ্যেবেলা সমীর এসে হাজির। আরে না না তনি মিসিং হবার মেয়ে নয়। নিশ্চয়ই কোথাও গেছে, খবর দিতে ভুলে গেছে—

চ—আমরা ওদের বাড়ি যাই, খবরটা ভাল করে জানতে হবে তো। আন্দাজে হাত গুনে জ্যোতিষীর মতো বললেই তো হবে না।

অনিমেষদের বাড়িটা আবার প্রায় নর্থ পোলে, মানে কলকাতার উত্তরে সিঁথি পেরিয়ে। যাই হোক গিয়ে হাজির হলুম।

মাসীমা দু'দিন খাননি, চোখে ঘুম নেই।

তনুশ্রীর ছোট ভাই ছুটে এল আমাদের দেখে, শানুদা এসেছে মা।

কি হয়েছে মাসীমা? ব্যাপারটা কি বলুন তো, সমীর অনিমেষের মাকে জিগ্যেস করল।

সর্বনাশ হয়েছে বাবা, মেয়েটার কোনো হদিস পাচ্ছি না—একে-বা-রে নিরুদ্দেশ! কাঁদতে কাঁদতে বললেন মাসীমা।

কখন বেরিয়েছিল সে?

খেয়েদেয়ে দুপুরে—

আচ্ছা, ওর বন্ধুদের বাড়ি খবর নেওয়া হয়েছে?

সব জায়গায় ফোন করা হয়েছে—কিন্তু, কেউ জানে না—কোথা গেল সে?

আচ্ছা, মাসী পিসী বা দিদি কে আছেন যেখানে যেতে পারে?

ওমা! সে তো সব দূরে দূরে—সেখানেও টেলিগ্রাম করা হয়েছে।

সমীরকে বললুম, জায়গা আর নামগুলো নোট করে নে তো।

সমীর বলল, আমি বলছি সে নিশ্চয়ই কারু বাড়িতে গেছে। হয়ত চিঠি দিয়েছে। সেটা আসেনি। অনিমেষের বিয়ের কতদূর এগুলো বলুন।

মাসীমা চোখ মুছে বললেন, সে তো আর মাসখানেকও বাকি নেই, কিন্তু কি করে বিয়ে হবে বলতে পারিস?

কেন হবে না! আমি বললুম। দেখবেন দু'চার দিনের মধ্যে তনুশ্রী ঠিক এসে যাবে। পুলিশ কি বলছে?

ওরা কিছুই বলতে পারছে না।

একজন ডিটেকটিভ লাগাতে হবে।

সমীর কেবল বলে যাচ্ছে, কিছু করতে হবে না। দেখে নিস এর মধ্যে ঠিক এসে যাবে।

আরও এক সপ্তাহ কাটল। আমি ভাবছি অনিমেষের বিয়ের Present-এর কথা। কিনে তো রাখা যাক। সেদিন মাইনে পেয়ে হাতে অনেকগুলো টাকা রয়েছে। ভাবলুম, আজ একবার বেরিয়ে পড়ি যদি কিছু কেনা যায়। ও আবার যা ফ্যাশানেবল্ ছেলে, একটু নতুন ধরনের কিছু দিতে হবে।

তখন বেলা প্রায় দুটো বাজে। হাঁটতে হাঁটতে একাই যাচ্ছি। সমীর গেছে শেওড়াফুলি তনির মাসীর বাড়ি, তাছাড়া সে আরো ঘুরবে ক'জায়গায়।

একি! সামনে একটা গলি। এটা আবার চীনাপট্টির ভেতর দিয়ে চলে গেছে। যাব ঐ দিকে? ক্ষতি কি? এখানে হয়ত নতুন কিছু একটা পেয়ে যেতে পারি।

বেশ অনেকখানি ঢুকে দেখি একটা চীনা রেস্তোরাঁ। কিছু খেয়ে নিলে হয় না? না দরকার নেই। ওমা, প্রায় সামনেই দেখি একটা দোকান। ছোট্ট সাইনবোর্ডে লেখা 'কিউরিও শপ'। বাহ্, এখানে কোনো একটা মজার নতুন জিনিস পেয়ে যেতে পারি।

দরজার কাছে একজন বিচিত্র-দর্শন লোক দাঁড়িয়ে। এ কি মালিক নাকি? চীনা না তিব্বতী বোঝা ভার। মুখখানা শুঁট্‌কো, দু'দিকে ঝোলা গোঁফ, মাথায় কালো টুপি। গায়ে জোব্বা ডার্ক ব্লু রঙের, তাতে ড্রাগনের ছবি সেলাই করা। চোখের দৃষ্টিটা যেন কেমন, খুব সাধারণ নয়, অনেকটা সাপের চাউনির মতো। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কাম ইন স্যার! বলুন কি চাই?

আমিও যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভেতরে ঢুকলুম। ও হরি, ভেতরের মালপত্র দেখে বেশ ঘাবড়ে গেছি। প্রকাণ্ড চীনে ভাস, অদ্ভুত মূর্তি। কিছু পাথরের, কিছু বা ব্রোঞ্জের। এ তো সবই দামী জিনিস হবে।

আমি একটা জিনিস চাই, বন্ধুর বিয়েতে present দেব।

ভেরি ওয়েল, অনেক আছে, দেখিয়ে লিন, যেটা পছন্দ করেন।

আপনি তো বেশ ভালো বাংলা বলেন। কোথায় বাড়ি আপনার? জিজ্ঞেস করি।

বলল, আগে হংকংয়ে ছিলাম, তারপর জাপানে কেটেছে বারো বছর। তারপর এলাম টিবেটে। অনেক ঘুরেছি মশাই। এ সব সংগ্রহ করা কি সোজা কথা! একটা আইল্যাণ্ডেও ছিলাম।

কি নামটা জানতে পারি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার নাম চিয়াংডলি। দেখুন এবার পসন্দ করুন। একটা জিনিস দেখাব?

দেখান না।

একটা বীভৎস চেহারা, বদখত্ মুখ, মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে থতমত খেয়ে গেছি। এমন সময় সে একটা ছবি এনে আমার সামনে ধরলে, বলল, দেখুন তো এটা।

এটা আর কি এমন! একটা মানুষের মুখের ওপরের অংশ। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে। বললুম, এতে আর কি এমন আছে?

সে বলল, আচ্ছা, এইবার দেখুন তো।

আমি একটা টুলে বসেছিলুম। সে আমাকে বেষ্টন করে একধারে চলে গেল।

এখন লুক অ্যাট ইট্, স্যার!

দেখলুম আশ্চর্য, সেই চোখ দুটো ঠিক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর সে এল আর একপাশে আমার বাঁদিকে। সেখান থেকেও দেখছি ছবির চোখের তারা আমার দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ মাথায় এল, ও হয়ত হাত দিয়ে কোনো কায়দা করছে। বললুম, আর কিছু আছে তো দেখান। এনিথিং মোর?

সে আর একটা ছবি বার করল। পলকপড়া মেয়ের চাউনি তার মধ্যে। সেটাও যেদিক থেকে তাকাই আমার দিকে ঠিক দৃষ্টি। সে বলল, তাইওয়ান মোনালিসা, সার। বলে হেসে ফেলল।

হয়েছে, আমি বলি, আর কিছু? কেননা আমি তো এককালে পাপেট শো করতাম। চোখের তারার নড়াচড়ার রহস্য আমার জানা ছিল।

সে বলল, কাম ইনসাইড, সাবধানে আসবেন কিন্তু। ঐ ড্রাগনটা ভারী পাজি।

আমি কাত হয়ে নানা মূর্তির গা ঘেঁষে ভেতরে ঢুকলুম। একটা ক্যাক্টাস গাছের কাঁটা লেগে প্যাণ্টটা বুঝি ছিঁড়ল। ভিতরে নানারকম জিনিস। একটা টেবিলে লাল ভেলভেটের ঢাকা চাপা কি যেন রয়েছে। আমি বললুম, ওটা কি হে?

ওটা ভেরি ভেরি কস্টলি, অনেক দাম, বুঝলেন?

দেখি না, দাম আমিও তো দিতে পারি।

দেখলুম, চিয়াং-এর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। সে ভেলভেটের ঢাকাটা খুলতে নানা অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল। কিন্তু ভেতরের জিনিসটা যেন দেখাতে চায় না। আমিও ছাড়ব না। ওটা দেখাও— বললুম আমি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঢাকাটা একটু তুলতে, আমি এক পলকের মধ্যে মুগ্ধ হয়ে গেলুম।

এই তো তোমার একটা ভাল জিনিস। এটার দাম কত পড়বে? বলে ফেলি আমি।

টেন থাউজাণ্ড দিলেও আমি ছাড়ব না এটা, আন্দারস্ট্যান্দ? মুখটা প্যাঁচার মতো করে বলল।

আমি বললুম, ওয়ান থাউজ্যাণ্ড দিতে পারি। দিয়ে দাও। আমি ওটা নেব।

জিনিসটা সত্যি আশ্চর্য। একটা ঈষৎ গোল জারের মতো গড়ন কিন্তু ওপরে কী সুন্দর পলকাটা। ওগুলো কি হীরে না অন্য ক্রিস্টাল ভগবান জানেন। Star Wars ছবিতে ঐ রকম একটা গ্রহের চেহারা মনে পড়ছে।

আমি ঐটা চাই, কত নেবে বল, বললুম আমি।

লোকটার বদন যেন বিগড়ে গেছে, বলল, তোমার সাধ্য নেই, এটা নেবার। দেখ তো ভাল করে—বলেই সে আমার চোখের সামনে ওটা তুলে ধরল। ভেতরে যেন নীলাভ রঙ একটা দেখা যাচ্ছে। আর ওপরে দামী হীরের গা থেকে যে আলোর ছটা বেরয় তাই পড়ছে আমার চোখে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি। তার মধ্যে ও কখন যে একটা তীব্র শক্তির টর্চের আলো ফেলেছে ঐটার মধ্যে দিয়ে আমার মুখে। এক মিনিট মাত্র—ব্যাস।

আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। আর মনে হলো যেন আমি কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছি। ছোট হতে হতে পুতুলের মতো একেবারে—বসতে যাচ্ছি সে আমার কলার ধরে শূন্যে তুলল—তারপর—তারপর—সেই জারের মধ্যে পুরে ঢাকা চাপা দিল।

এ কি হলো! সর্বনাশ!—কিন্তু নীলাভ ওটা কি?

কাছে গিয়ে দেখি নীল শাড়ি—একটি মেয়ে—মেয়েটি আর কেউ না—তনুশ্রী। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, শানুদা, তুমি এখানে? আমি বলি, তুই এখানে?

তনির মুখে যে কাহিনী শুনলুম সেও অবিকল আমারই মতো। সেও এসেছিল একটা কিউরিও কিনতে। তারপর ঐ শয়তানটা তাকে পুতুলের মতো বানিয়ে পুরেছে ঐ জারের মধ্যে।

দাদার বিয়ের কি হলো? বলল সে।

আর দাদার বিয়ে! তুই নিরুদ্দেশ! সে আর বোধহয় বিয়েই করবে না।

ছি ছি—এখন কি হবে? তুমি কেন এই ফাঁদে পা দিলে শানুদা? আমাদের বুঝি আর মুক্তি নেই।

অত ভাবিস না, দেখি না এই জারটা যদি ভাঙতে পারি—তাহলে—

পারবে না। পারবে না। যা মোটা কাঁচ আর তোমার আমার গায়ে কতটুকু জোর বল তো—কি হবে?—বলতে বলতে তনুশ্রী কাঁদতে লাগল।

আমরা দেখতে পেলুম এক মেমসায়েব এল দোকানে। সে একটা দশ ইঞ্চি উঁচু 'বনসাই' গাছ কিনে নিয়ে গেল। তারপর শয়তানটা আমাদের জারটার কাছে এসে এক পৈশাচিক হাসি হাসছে। বলছে, একসপেরিমেণ্ট সাকসেসফুল। হো হো হো! সব জিনিসকে ছোত করতে পারব—একটা Bank-কে যদি পারি, তাহলে আমার টাকা পেতে কোনো কষ্ট নেই—দুটোই ভাল কাস্তমার পেয়েছিলাম। দুজনে এখন থাকো বন্দী!

আমি কথাগুলো ওপরের ছোট ছোট ফুটো দিয়ে শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু কি করা যায়? কিছুই মাথায় আসছে না। আমি তো প্রাণপণে ঘুঁষি মেরে লাথি মেরে ঐ কাঁচের দেয়াল ভাঙতে পারব না—আর তনুশ্রী বেচারা কেবল কাঁদছে।

তোর কাছে ভারী কি আছে বল তো? ঘা মারতে চাই। যদি কাঁচটা ফাটাতে পারি।

কি থাকবে, আমার লেডিজ ব্যাগটাই তো আছে। আর কি থাকবে। আর সেও তো এখন এতটুকু—

ওর মধ্যে কি আছে দেখি, খোল তো।

চিরুনি, পাউডার পাফ, লিপস্টিক, হাবিজাবি আর একটা আয়না। সেটা একটু সাইজে বড়। এর কোনোটা দিয়ে ঘা মারা যাবে না।

বিকালের পড়ন্ত রোদ্দুর তখন। পশ্চিমের একটা ভাঙা কাঁচের মধ্যে দিয়ে এসে পড়েছে আমাদের ওপর। আর ঠিক সেই সময় বেটা চিয়াংডলি আমাদের জারটা হাতে তুলে আনন্দে খুশিতে হেসে তাকিয়ে দেখছে আমাদের দিকে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। যেন সোনার খনি পেয়েছে। বলছে, একটা মেয়ে ছোট হলো, ছেলেও তাই হলো—এবার ব্যাংক—

আমার মাথায় একটু বুদ্ধি খেলে গেল। তনুশ্রীর আয়নাটা রোদ্দুরের দিকে এমনভাবে ধরলুম যে সেই প্রতিবিম্বিত আলোটা বেটার ঠিক চোখে সোজা গিয়ে পড়ল।

পলকাটা কাঁচের কী আশ্চর্য ক্ষমতা! চোখে পড়তেই সে একটা বিকট চীৎকার দিয়ে কাঁপতে

লাগল। হাত থেকে খসে পড়ল জারটা মাটিতে। ভেঙে চুরমার। আমরা বেরিয়ে পড়লুম—আর ধীরে ধীরে আমাদের চেহারা বড় হতে হতে স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

চিয়াংডলি তখন ইঁদুরের মতো হয়ে এদিক-ওদিক করছে।

তনুশ্রী বলল, শানুদা, চল এই বেলা আমরা পালাই। দেরী করলে ও আবার—

সে কথা বলতে! বলেই আমি ওকে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ছি এমন সময় এক মহিলা ওর বউ হবে হয়ত। সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, মাস্টার হোয়ার? মিঃ ডংলি?

'হি মে বি ইনসাইড', বলেই তাকে ঠেলে রাস্তায় নামলুম। তনুশ্রী বলল, চল ছুট দিই।

ছুটলে লোক সন্দেহ করবে না?

জোরে পা চালিয়ে চললুম। আমাদের পাশ দিয়ে একটা কালো বেড়াল দোকানটার দিকে গেল। সর্বাঙ্গ ভুসোর মতো কালো, চোখ দুটো সবুজবর্ণ, বীভৎস—

একটা ট্যাক্সি পেলে ভাল হত, কিন্তু ঐ গলিতে সে আশা বৃথা। যাই হোক, কয়েক মিনিট জোরে পা চালিয়ে বড় রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সি ধরলুম।

বাড়ির গেটের কাছে আমাদের দেখে বাচ্চারা চীৎকার শুরু করেছে—দিদি এসেছে, দিদি এসেছে।

মাসীমা শয্যাগত। খবর পেয়ে উঠতে চেষ্টা করে পড়ে গেলেন। অনিমেষ বাড়ি নেই। অনিমেষের বাবা বললেন, সে বিয়ের Caterer-কে অর্ডার দেওয়া ছিল, তাই cancel করতে গেছে—তুমি বোস। তনি, আয় মা, আমার বুকে আয়। ক'দিন কী দুশ্চিন্তায় যে ভুগছি না, কি আর বলব! দেখ না বাবা, শানু, এই যে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে এতক্ষণ নানা পরামর্শ হচ্ছিল। তুমি বল তো, বাবা, ওকে কোথা থেকে উদ্ধার করলে—আহা, রোগা হয়ে গেছে গো—

আমি বললুম, আমি আসছি, অনিমেষকে আমি ফিরিয়ে আনি। বিয়ে তার হবেই—আমি আসছি।

চা-জলখাবারের পর তনি আর আমি একটু যেই ঘটনাটা বলেছি, সমীর চীৎকার করে বলল, যা, গুল মারিস না—যত আজগুবি গল্প!

অনিমেষের বাবা বললেন, না, সব উড়িয়ে দেওয়া যায় না। H.G.Wells-এর একটা গল্প পড়েছ? একটা দেশে সেখানকার সবাই অন্ধ। Gulliver-এর গল্পে লিলিপুটদের কথা আছে। আমি একটা লেখায় পড়েছিলুম, একটা দ্বীপে জাহাজডুবি হয়ে কয়েকজন গিয়ে পড়ে। তারপর একটা crystal পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো লেগে সবাই ছ'ইঞ্চির মতো ছোট হয়ে যায়। তারাই নাকি পরে লিলিপুট হয়ে যায়—

পুলিশ অফিসার বলে উঠলেন, শুনুন শান্তনুবাবু, আপনি সেই দোকানটা আমায় দেখাতে পারেন? তাহলে আমরা ওদের পাকড়াও তো করবোই আর সব জিনিস, মানে, কিউরিও যা কিছু আছে বাজেয়াপ্ত করব।

আমি বললুম, ঠিক আছে, চলুন, সে তো আমার জানা রাস্তা। তনুশ্রীকে সঙ্গে নিলুম। অনেক লক্ষ্য করে আবিষ্কার করলুম সেই রাস্তা। তারপর সেই নোংরা সরু গলির মধ্যে ঢুকলুম।

বাড়িটা খুঁজে পেলুম। কিন্তু দোকানের সাইনবোর্ড কিছু নেই। সেটা হয়ত সরিয়ে ফেলেছে।

কোথায় মশাই, আপনার সেই চিয়াংডলির দোকান? এখানে তো কোনো কিউরিওর দোকানই দেখছি না।

ব্যাপারটা রহস্যজনক। তনুশ্রী বলল, দোকানটা যার, সেই শয়তানকে ইঁদুরের মতো দেখে কালো বেড়ালটা এক গালে নিশ্চয়ই খেয়ে নিয়েছে। আমরা সবাই হেসে উঠলুম।

[শারদীয়া ১৩৯৩]

মেয়ে গোয়েন্দার বাহাদুরি

আশাপূর্ণা দেবী

কী? 'মেয়ে গোয়েন্দা' শুনেই একটু অবজ্ঞার হাসি হাসা হলো মনে হচ্ছে! তা হাসিটা হতেই পারে। গোয়েন্দা গল্পের লেখকরা তো মেয়েদের কখনো তাঁদের আসরে আসতে দেন না বড় একটা। যেন গোয়েন্দা হওয়াটা পুরুষদের একচেটে অধিকার।

অথচ ঘরে সংসারে এদিকে সেদিকে নিরীক্ষণ করলেই দেখতে পাওয়া যায় 'গোয়েন্দাগিরি'তে মেয়েরা ছেলেদের থেকে চতুর্গুণ বুদ্ধি ধরে। মেয়েরা সহজাত ক্ষমতায় অপরাধের গন্ধ পায়। আর ব্যাপারটা তাদের হাতে ছেড়ে দিলে, গন্ধের মূল উৎসটিও আবিষ্কার করে ফেলতে পারে।

তবু 'মেয়ে গোয়েন্দা' যেন একটা কৌতুকের শব্দ।

অথচ চুপি চুপি বলে ফেললে বলা যায় আমাদের ওইসব গোয়েন্দা গল্পলিখিয়েরা অনেকেই একটি অসত্য গোয়েন্দা গল্প লিখিয়ে মহিলার অগাধ গল্পের ভাঁড়ার থেকে দিব্যি টুকে মেরে মৌলিক বলে চালিয়ে দেন।

তা সে যাকগে, এখন এই গল্পটা হোক। এটি কিন্তু নির্ভেজাল মৌলিক। কারণ ঘটনাটা সত্যি।

একে শীতের রাত তায় সারাদিন দারুণ খাটুনি গেছে নার্সিংহোমে একটা বড় অপারেশন নিয়ে। তবু ডাক্তারের অভ্যস্ত কান! টেলিফোনে ক্রীং ক্রীং শব্দেই ঘুমটা ভেঙে গেল!

গা থেকে ভারী রাগখানা ঠেলে পায়ের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে উঠে বসলেন ডাক্তার লাহিড়ী। ভাবলেন, কী হলো? অপারেশন কেসটায় কী কিছু গড়বড় দেখা দিল না কী?

উঠে পড়ে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন ঘরের সামনের হলটায়। যেটাকে ড্রইংরুমই বলা যায়! টেলিফোনটা এখানেই রাখা আছে দেয়ালঘেঁষা একটা ছোট টেবিলে।

ডাক্তার লাহিড়ী চিৎকাররত ফোন-এর রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে গম্ভীর ভারী গলায় বললেন, হ্যালো! হ্যাঁ, আমিই ডাক্তার লাহিড়ী! কোথা থেকে বলছেন?

নিশ্চিত ছিলেন, শুনবেন 'নিরাময় নার্সিংহোম থেকে', কিন্তু তা শুনলেন না। যা শুনলেন, তা শুনে চমকে উঠলেন। বললেন, কী বলছেন? বারুইপুর থানা থেকে বলছেন? কী ব্যাপার? কী বলছেন? একটু আগে আমার বাড়ি থেকে ফোনে থানায় একটা মেসেজ পাঠানো হয়েছে, কিনা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুলিশ পাঠিয়ে দিতে—ভীষণ একটা কাণ্ড ঘটেছে বলে।

ইম্‌পসিবল্‌! মনে হচ্ছে ভুল হয়েছে। আপনি কোন ডাক্তার লাহিড়ীকে চাইছেন?...কী বলছেন? নিউ বারুইপুর আদর্শ উপনগরী?...ফ্ল্যাট নাম্বার টোয়েন্টি টু...ডক্টর অভীক লাহিড়ী। হ্যাঁ এগুলো তো ঠিক হচ্ছে—কিন্তু মেসেজটা? কে দিচ্ছে, নাম বলেছে কিছু? কী বললেন, কাজল! হ্যাঁ, এটা তো আমার বাড়ির মেয়েটার নাম। কিন্তু সে কেন? সে কী করে? না না, অসম্ভব। নিশ্চয় কোনো বাজে লোক এইগুলো জেনে নিয়ে আমাকে অথবা পুলিশকে হ্যারাস করতে—আচ্ছা—দেখছি আমি। ...কাইন্ডলি দু' সেকেন্ড ধরুন তো!

রিসিভারের মুখ চাপা দিলেন।

আর উত্তেজিত ডাক্তার লাহিড়ী হঠাৎ হাতের ওপর একটা কীসের স্পর্শ পেলেন। মানুষের নয়, একটুকরো কাগজের।

কাগজের টুকরোটা যেন পিছন থেকে পড়ল। তাকিয়ে দেখলেন, তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—"ভীষণ কাণ্ড! তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটে বোধহয় একটা মার্ডার হচ্ছে—পুলিশকে আসতে বলুন। জানলা দিয়ে দেখুন—"

দেখলেন কাজল পিছন থেকে সামনে সরে আসছে।

কিন্তু জানলা দিয়ে কোথায় কী দেখবেন? কোন জানলা দিয়ে? টেলিফোন ধরা অবস্থায় ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করে, তেমন কিছু দেখতে না পেলেও ডাক্তার লাহিড়ী সামনে সরে আসা কাজলের মুখের চেহারাটা দেখতে পেলেন। ভয়ার্ত, উত্তেজিত। শরীরটাও যেন কাঁপছে!

কে জানে কাঁপুনিটা ভয়ে না শীতে?

শীতেই বা কেন? বন্ধ ঘর, গায়ে গরম চাদর।

কাজল এবার ডাক্তার লাহিড়ীর ফোন ধরা আঙুলটার ওপর একটা আঙুল ঠেকিয়ে এমন একটা ইশারা করলো যার মানে হতে পারে, পুলিশকে দ্রুত আসতে বলুন। ভীষণ অবস্থা!

ওঃ। আঙুলের ডগাটা কী ঠাণ্ডা! যেন কে এক টুকরো বরফ ঠেকালো ডাক্তার লাহিড়ীর আঙুলে।

সবই এক সেকেন্ডের ব্যাপার। কাজেই ডাক্তার দু' সেকেন্ড পরেই বলে উঠলেন, সরি! ও ইয়েস! ব্যাপারটা সত্যি! পাশের ফ্ল্যাটে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটছে, দয়া করে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন।...হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার জানলা থেকে—

পুরো কথাগুলো যে বলে উঠতে পারলেন তা নয়। বললেন—ছাড়া ছাড়া ভাবে!

কারণ ততক্ষণে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে!

কাজলের ইশারায় তিনি ফোনের দড়িটাকে যতোটা সম্ভব টেনেটুনে জানলার ধারে গিয়ে পড়েছেন, আর সেই তেইশ নম্বর বাড়ির জানলার দিকে তাকিয়ে তাঁর মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে, চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে!

কী দেখতে পেলেন ডাক্তার লাহিড়ী?

মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে উঠে এমন একটা দৃশ্য দেখতে পাবার কল্পনাও কী করেছিলেন তিনি? দৃশ্যটাকে 'মুভি'ও বলা যায়।

দেখছেন!...

দেখে চলেছেন! শরীরের সমস্ত রক্ত দাপাদাপি করছে। মাথার মধ্যে দামামা পিটছে, ভয়ঙ্করভাবে চেঁচিয়ে ওঠবার জন্যে আপ্রাণ প্রেরণা আসছে। কিন্তু নাঃ! কিছু করা যাচ্ছে না। করার উপায় নেই!

এমনকী এমন নিঃশব্দ অবস্থা যে পাশের ঘরে ডাক্তার লাহিড়ীর মা কণামাত্রও টের পাচ্ছেন না। দিব্যি লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন।

মা অবশ্য বুনো মানুষ। কিন্তু ঘুম তো এমনিতে খুবই পাতলা। সারারাতই প্রায় সজাগ থাকেন। একটু খুটখাট শব্দ হলেই বলে ওঠেন, কে র‍্যা?

তবে ক'দিন শীতটা তো বড্ড বেশি জাঁকিয়ে পড়েছে। কম্বলের ওপর আবার লেপ চাপা দিয়ে শুচ্ছেন। তাই কানের ফুটো দুটো প্রায় সিল হয়ে পড়েছে। মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিচ্ছেন তো।

এতো শীত!

তবু ডাক্তার লাহিড়ীর যেন তেষ্টায় গলা শুকিয়ে উঠছে। কপালে ঘাম ঘাম ভাব।

ইশারায় কাজলকে জানান এক গেলাস জল।

হল-এর সংলগ্নই ডাইনিং স্পেস।

সেখানেই ফ্রীজ!

কাজল ফ্রীজ থেকে এক গ্লাস জল বার করে নিয়ে বুদ্ধি করে থার্মোফ্লাস্কে রাখা গরম জল একটু ঢেলে নিয়ে মিশিয়ে দিয়ে হাতে ধরিয়ে দেয়।

এই রাতে ফ্রীজের ঠাণ্ডা জল খেলে আর দেখতে হবে না!

ডাক্তার কাকুর মা তো দিনে-রাতে সবসময় গরম জল মেশানো জল খান! কাজেই এটা কাজলের জানা।

মেয়েটা তো বেশ আন্তরিক আর বুদ্ধিমান। তবে হঠাৎ এমন একটা উৎকট কাজ করে বসলো কেন? তেমন কিছু দেখলে তো ডাক্তার লাহিড়ীকেই জাগিয়ে বলতে পারতো।

কিন্তু সে প্রশ্ন করার সময় এখন নয়। ডাক্তার লাহিড়ী জল খেয়ে আবার তাকালেন। এবং যা দেখলেন তাতে নিঃসন্দেহ হলেন তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটে একটা খুনের ঘটনাই চলছে!

কিন্তু দেখলেনটা কী?

কেউ কাউকে ছুরি উঁচিয়ে তেড়ে আসছে? না কী রিভলবার বাগিয়ে ধরে তাক্ করছে?

নাঃ তা নয়! দেখলেন, কাজটা সমাধাই হয়ে গেছে।

দেখলেন ঘরের মাঝখানে সিলিং ফ্যানের ঠিক নিচেয় যে পালঙ্ক টাইপের খাটখানা পাতা আছে, তার ওপরে দুটো মুশকো মতো লোক ফ্যান-এর সঙ্গে একগাছা দড়ি লটকাচ্ছে ফাঁস লাগাতে। যেভাবে লোকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলে, সেইভাবে কায়দাটা করছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে?

সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘকায় 'লাশ' তুলে ধরে তার গলাটায় ফাঁসটা পরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।

দেহটা যে মৃতদেহ তা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

এ দেহটি আর কারো নয়, তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটের মালিক জগদীশবাবুর। শেয়ার মার্কেটের দালাল জগদীশ তালুকদার, অনেক পয়সা। বেশ উন্নাসিক, পাড়ার কারো সঙ্গে বিশেষ মেশেন না। তবে একবার ওঁর বুড়ো বাবা দেশ থেকে না কোথা থেকে এসে হঠাৎ অসুখে পড়ে গিয়েছিলেন, তাই ডাক্তার লাহিড়ীকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তবে যে ঘরে গিয়ে রুগী দেখেছিলেন ডাক্তার লাহিড়ী, সেটা এ ঘর নয়, অন্য একটা ঘর।

ওই মুশকো লোক দুটো যেভাবে খাটেব ওপর দাঁড়িয়ে কাজ চালাবার চেষ্টা করে চলেছে, তাতে মনে হচ্ছে খাটখানা ভেঙে না পড়ে।

কিন্তু এই সব কী ওরা ঘরে আলো জ্বেলে করছে? তাই এতো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে?

না, আলো জ্বেলে নয়। তবে আরও একটা লোক—টিংটিঙে মতো, মাটিতে দাঁড়িয়ে ক্ষণে ক্ষণে টর্চের বোতাম টিপে যাচ্ছে!

তবে সুবিধে এই জানলার পর্দা নেই। এবং জানলাটা পুরো কাচের।

ডাক্তার লাহিড়ীরও তাই। তবে ওঁর বাড়িতে সব ঘরে ঘরে মোটা কাপড়ের ভারী ভারী পর্দা। বিশেষ করে শীতকালে। এখন তার ফাঁক দিয়েই দেখছেন। তাছাড়া ওই দৃশ্যের দর্শক হওয়া মাত্রই তো নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছিলেন! শোবার ঘরে যে একটা মৃদু নীল আলো জ্বলে, সেটা পর্যন্ত।

কাজল খুব মৃদু গলায় বললো, ঠাকুমার ঘুম ভেঙে গেলে মুশকিল। তবে এ ঘরে এসে দেখতে পারলে আরো সুবিধে হতো।

'এ ঘর' মানে সেই ডাইনিং স্পেসটা। যেখানে ফ্রীজটা আছে। এ ঘর থেকে ডাক্তার লাহিড়ীর মায়ের ঘরের মধ্যে ঢুকে যেতে পারার মতো একটা দরজা আছে। দরজাটা খোলা থাকে।

বৃদ্ধা মহিলার যদি কিছু দরকার হয়, তাহলে ডাকলে সাড়া পাবে। এখন এই কাজলের প্রধান কাজই ওই বুড়িকে দ্যাখ্ভাল করা। কাজল যাকে বলে রীতিমতো বুদ্ধিমতী! সে ঠাকুমাকে সকালে খবরের কাগজ পড়ে শোনায়। আর দুপুরে মার ঘুম না এলে গল্পের বই, পত্রপত্রিকা পড়ে শোনায়।

মহিলার পড়ার নেশাটি চিরকালই দারুণ, কিন্তু এখন দৃষ্টি ক্ষীণ হওয়ায় মুশকিলে পড়েছেন। খবরের কাগজ বা গল্পের বইটইয়ের স্বাদ না পেলে যেন হাঁসফাঁস করেন। তা সে যেমন বইই হোক।

এদিকে কাজলেরও নাকি অল্প বিদ্যেতেও গল্পের বইয়ের নেশা। বিশেষ করে ভূতের, বা ডিটেকটিভ বইয়ের।

কাজেই সোনায় সোহাগা হয়েছে, রতনে রতন চিনেছে। মা 'কাজল' বলতে অজ্ঞান। সন্ধ্যাকালে অবশ্য তিনি ভূতের গল্প শোনা পছন্দ করেন না। তা সন্ধ্যা কাটাতে তো টি.ভি. আছে!

তবে শীতকালটায় বুড়ি একটু কাবু থাকেন। যদিও ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা সবই আছে। ওই মা'টি ছাড়া ডাক্তার লাহিড়ীর তো সংসারে আর কেউ নেই। মায়ের জন্যেই সব ব্যবস্থা।

কাজলের ওপর ডাক্তার লাহিড়ীও বেশ সন্তুষ্ট, কারণ সে মাকে যতটা সম্ভব যত্ন করে, মান্য ভক্তি করে।

এদিকে সব বিষয়ে চৌকস আর বেশ স্মার্ট।

তবু আজকে ওর এই মাঝরাত্তিরে থানায় খবর দেওয়াটা খুব একটা পছন্দ হয়নি ডাক্তার লাহিড়ীর। ভাবছেন, ও বাড়িতে যে একটা কাণ্ড ঘটছে সেটা ও জানলো কী করে? ও কী রাত জেগে জানলায় চোখ ফেলে বসেছিল? যদি তাই থাকে, সেটা কেন?

জেগে বসেছিল সেটা তো নিশ্চিত।

তা হলেও—

এ ঘর থেকে ভাল দেখা যাবে। তবে মার না ঘুম ভেঙে যায় বলায়, ডাক্তার লাহিড়ী খুব নিঃশব্দে এ ঘরে চলেই এলেন। আর দেখে অবাক হলেন, ভাল করে দেখতে পাবার একটা অভাবনীয় কৌশল আবিষ্কার করেছে কাজল।

সত্যিই ভাল করে দেখতে পাওয়া গেল।

দেখা গেল তিনজনে মিলে কোনো মতে সেই মরে যাওয়া দেহটাকে উঁচু করে তুলে ধরে তার মুণ্ডুটাকে ফাঁসের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেললো।...অর্থাৎ তিনি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে থাকলেন। যে জগদীশবাবুকে আজ সকালেই দিব্যি ঘুরতে দেখা গেছে।

কিন্তু ঝুলতেই থাকলেন, দুলতে থাকলেন কী?

পায়ের আগা দুটো যেন বিছানায় ঠেকু ঠেকু!

ওরা তিনজনে খাট থেকে নেমে এল। হাত-মুখ নেড়ে যা বললো, তাতে মনে হলো, ব্যবস্থাটা যেন খুব সঠিক হয়নি। পা দুটো শূন্যে ঝোলা দরকার।

আবার অন্য অ্যাক্‌শান। হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে যেন। তবু এখন তিনজনে মিলে খাটখানাকে ঠেলে ঠেলে একটু সরিয়ে আনলো। এখন মৃতদেহের পা দুটো শূন্যে দোলায়মান হলো!

তার মানে প্রতিপন্ন করতে হবে, লোকটা নিজে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ডাক্তার লাহিড়ী অবাক হয়ে ভাবছেন, লোকটার বাড়ির লোকেরা কিছু টের পাচ্ছে না কেন? আছে তো বৌ-ছেলে কারা যেন সব।

কিন্তু ওঁর মায়ের ঘুম ভেঙে যাবে, এই ভয়ে এমন চুপচাপ দেখে যাবেন, এমন একটা বীভৎস ঘটন? চেঁচামেচি করে ওদের জানাবেন না? পাড়ার লোক জড়ো করবেন না?

আবার ভাবছেন, তাতে কতটুকু লাভ হবে? কে কী করতে পারবে? ওই খুনেদের কী ধরতে পারবে? পাড়ার লোকেরা যে 'খুন! খুন!' বলে চিৎকার শুনলেই ছুটে আসবে তার গ্যারান্টি কী আছে?

পুলিশকে তো খবর দেওয়া হয়েইছে।

কিন্তু সত্যিই কী এখনি এসে পড়বে?

ওদের তো আঠারো মাসে বছর।

'এই যাচ্ছি' বলে হয়তো কাল সকালে ব্রেকফাস্টটি সেরে তবে আসবে!

কিন্তু নাঃ। সব সময় ওদের নামে দোষ দেওয়া ঠিক নয়! কখনো কখনো ওদের ঠিক বারো মাসেই বছর হয়।

ডাক্তার লাহিড়ী যখন ভাবছেন, মরার পর মড়াটাকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিলে কী তার জিভটা বেরিয়ে আসে? ডাক্তারী শাস্ত্র তো তা বলে না।

ওমা! ভাবতে না ভাবতেই হঠাৎ কাজল চাপা আতঙ্কে বলে ওঠে, দেখুন! দেখুন! কী করছে ওরা!

কী করছে?

দেখলেন। দেখে শিউরে উঠলেন।

এ রকম বীভৎস কাণ্ডও করতে পারে মানুষ? কী দেখলেন?

দেখলেন, সেই রোগাপটকা লোকটা আবার খাটের ওপর দাঁড়িয়ে মৃতদেহটার মুখের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে জিভটা ধরে টানাটানি করবার চেষ্টা করছে! যাতে বেরিয়ে আসে!

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠলেন ডাক্তার লাহিড়ী। আর কাজল 'ওরে বাবারে' বলে দু'হাতে মুখ ঢাকলো।

আর ঠিক সেই সময়, হ্যাঁ ঠিক সেই সময় পুলিশের গাড়ি এসে পড়লো।

এলো প্রায় নিঃশব্দেই। দমকলের মতো রাস্তা দাপাতে দাপাতে, পাড়া কাঁপাতে কাঁপাতে আর ঘুমন্ত মানুষকে জাগাতে জাগাতে তো নয়। তবু—দেখতে পেলেন।

জানলার পর্দা সরিয়ে দেখছিলেন কিনা বারে বারে।

দেখতে পেলেন মোড়ের মাথায় রাস্তাব ওপর হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে একটা হেডলাইটের আলো পড়লো। এক সেকেন্ড। তারপর সেই গাড়ি এসে থামলো।

উর্দিপরা এক কনস্টেবল লাফিয়ে নেমে পড়ে একটা পেন্সিল টর্চ হাতে নিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির কম্পাউন্ডের গেট-এর সামনে দাঁড়ালো।

ডাক্তার লাহিড়ী ততক্ষণে নিচের তলায় নেমে এসে গেট-এর মধ্যে থেকে টর্চ বাড়িয়ে আলোর সঙ্কেত করলেন।

তারপর?

তারপর আরো দুজন কনস্টেবল নেমে লাফ মেরে ছুটে এলো। পিছনে আরো একজন অফিসার গোছের।

ব্যস হাতে হাতে ধরা পড়বেন বাছাধনেরা।

ডাক্তার লাহিড়ী আর কাজল দুজনের মধ্যেই একই কথা। শুধু খুন নয়, মৃত মানুষটার জিভ টেনে লম্বা করার চেষ্টা! উঃ' কী নারকীয়! কাজল দেখে, ওরে বাবা, ঠোঁটের পাশে আবার একটা শিশি থেকে কী ঢেলে দিচ্ছে। কোনো রং। আর কী হবে? লালই। বোঝা গেছে, ভাব দেখাতে হবে যেন গলায় দড়ি দেওয়ার ফলে ঠোঁটের পাশে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে!

কাজল তিনতলায়, ডাক্তার নিচের তলায়, দুজনেই অধীর আগ্রহে দেখছে পুলিশরা এসে গেলো মূল কাণ্ডর কাছে।

কিন্তু বদমাইশদের আলাদা ভগবান। তারা ঠিকই পুলিশের হাত ফসকায়। হবি তো হ, ঠিক সেই মুহূর্তেই ওই ব্লকেরই একজন—ঘোষবাবুদের বাড়ি থেকে চিৎকার উঠলো, 'চোর! চোর! চো...র।'

তা চোখের সামনে চো-র চো-র শুনলে তো আর পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। তারা চোর ধরতেই তৎপর হলো!...অথচ নেহাৎই বোধহয় ছিঁচকে চোর। কারণ যেটাকে ধরে গাড়িতে তুললো, তার পিঠে নেহাৎই রাস্তার 'গামছা লুঙ্গি ছিট কাপড়ের' ফেরিওয়ালার মতো দুটো পুঁটুলি! হয়তো কিছু জামাকাপড় কী বাসনপত্র হাতিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল।

তাকে ধরতে গিয়ে 'আসল'রাই হাতছাড়া হলো! মাত্র তিনজন তো পুলিশ!

তা রাতদুপুরে টেলিফোনে কী না কী একটা উড়ো খবর পেয়ে, থানা থেকে তো একটা বিরাট ফোর্স পাঠাতে পারে না?

তা যাই হোক, ওই চোরটাকে গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তুলে একজন পুলিশ তার কাছে পাহারা দিতে বসে থেকে, বাকি দুজন আর অফিসারটি যখন তেইশ নম্বর ফ্লাটে উঠে এলো, তখন তো পাখি উড়ে গেছে।

অবশ্য উড়ে যে গেছে, সেটা বুঝতে বিস্তর সময় লাগলো!

যদিও 'চোর চোর' শুনে ব্লকের আর সব বাসিন্দারা জেগে উঠে পড়লেও ওই তেইশ নম্বর বাড়িটি নিঃসাড়!

'সদর' দরজা বলতে যে দরজা, তাতে বেল বাজিয়ে বাজিয়ে হন্যে হয়েও কেউ খুললো না। স্বয়ংক্রিয় চাবি তো! বাইরে থেকে টেনে দিয়ে গেলেই তো বন্ধ হয়ে যায়।—কাজেই পুরো এলাকাটার জন্যে যে একজন কেয়ারটেকারবাবু আছেন তাঁকে ডেকে সমস্যাটা জানাতে তিনি ব্যস্ত হয়ে তাঁর কাছে থাকা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খুলে দিলেন দরজাটা।

তা সেই ভদ্রলোকের কাছেই জানা গেল তালুকদার পরিবারের সবাই আজ কোনো একটা বিয়ে উপলক্ষে কলকাতার বাইরে নেমন্তন্ন গেছেন। বাড়িতে কর্তা একা রইলেন। শরীরটা তেমন ভালো নেই বলে গেলেন না। ওঁর প্রতি একটু লক্ষ্য করবেন, জগদীশবাবুর ছেলে বলে গেছে কেয়ারটেকারবাবুকে। কাল সকালেই চলে আসবে সবাই।

তা সারাক্ষণ আর কী লক্ষ্য করবেন? বিকেলে একবার এসে দেখা করে গেছেন। দেখে গেছেন ফ্লাস্কে রাখা চা আর হাতের কাছে রাখা বিস্কুট খেয়ে, দিব্যি চাদর মুড়ি দিয়ে বসে সিগারেট খাচ্ছেন। বেশ খোশ গল্প করলেন।

কিন্তু এখন? জগদীশবাবুর সেই ঘরটিও যে ভিতর থেকে বন্ধ!

ঠেলে ঠেলে ধাক্কা মেরে মেরে বিফল হয়ে অগত্যা দরজা ভাঙতেই হলো। এর চাবি তো আর কেয়ারটেকারের কাছে নেই। এ তো ভিতর থেকে ছিটকিনি লাগানো।

অতঃপর?

সেই বন্ধ দরজা ভাঙা মাত্রই 'পুলিশ' হেন জিনিসও ছিটকে দশ পা পিছিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে কেয়ারটেকারবাবুও।

পাখার সিলিঙে দড়ির ফাঁসে ঝুলছেন দশাসই তালুকদার মশাই।

কেমন যেন বাঁকাচোরাভাবে!

তারপর?

তারপর যা ঘটবার তাই ঘটতে থাকে। প্রথমেই ধরে নেওয়া হয় ঘরের দরজা যখন ভিতর থেকে বন্ধ, এবং ঘরে আর কোনো দরজা নেই, তখন অবশ্যই 'আত্মহত্যা'।

তবে পায়ের কাছে তো কোনো টুলফুল উল্টে নেই, ঝুললেন কী করে? খাটখানাকে পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে?

সেটা সম্ভব?

অথচ সরানো যে হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। খাটের পায়ার দাগ দেখে দেখা গেল একটুখানি করে চৌকো জায়গা ফর্সা, তার চারধারে কেমন ময়লা ময়লা।

গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে খাট সরিয়ে দেওয়াও যেমন অবাস্তব, তেমনি অবাস্তব তো আগাগোড়া বন্ধ ঘরে থেকে অন্য কারো দ্বারা নিহত হওয়া।

হত্যাকারী কী দেয়াল ভেদ করে হাওয়া হয়ে যাবে?

পুলিশ যা করবার করলো।

দড়ি কেটে মড়া নামালো। তারপর নিরীক্ষণ করে দেখে বললো, ঠোঁটের পাশ দিয়ে যেটা গড়াচ্ছে, সেটা তো রক্ত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে রং। আর জিভটা মুখের মধ্যেই শক্ত আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। তার মানে—

পুলিশরা তাকাতাকি করে বললো, মনে হচ্ছে আগে হত্যা করে পরে দড়ির ফাঁসে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।...আর হত্যাকারী বা 'কারীরা' খাট ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু—?

হ্যাঁ, ওই 'কিন্তু'টি হচ্ছে—যে বা যারা এসব করলো, তারা বেরিয়ে গেলো কোথা দিয়ে?

অতঃপর?

অতঃপর কাজলের ডাক পড়লো। আর তারপরে জেরা। যার নাম হচ্ছে পুলিশি জেরা।

কী দেখে সে বুঝতে পেরেছিল তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটে একটা কিছু ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে? যা দেখে সে থানায় ফোন করার মতো দুঃসাহসিক একখানা কাজ করে বসেছিল? ডাক্তারবাবুকেই বা জানায়নি কেন?

কোনখান থেকেই বা দেখতে পেয়েছিল? মাঝরাত্তিরে জেগে উঠে পাশের ফ্ল্যাটের দিকে নজর ফেলতে গিয়েছিল কেন?...তাও শীতকাল। লেপ-কম্বল ছেড়ে উঠে!

পুলিশের কাজই তো হচ্ছে সন্দেহ করা।

কাজেই তাদের সন্দেহ, ওই খুনীদের সঙ্গে নিশ্চয় যোগসাজশ আছে কাজলের। তবে এখন হয়তো টাকাপয়সার বখরাঘটিত কোনো ঝগড়াঝাঁটি হয়ে যাওয়ায় প্রতিহিংসার বশে দলের লোককে ধরিয়ে দেবার মতলবে—

মনে হচ্ছিলো কাজল বেচারী বোধহয় ভয়ানকভাবে ভয় পেয়ে 'প্রকৃত তথ্য' কবুল করে বসবে।

আর পুলিশ সাহেবরা নিজেদের ক্যাপাসিটি দেখিয়ে আহ্লাদে ভাসবেন।

তবে পাখি হাতছাড়া হয়ে গেছে, এই যা।

তা কাজল নামের ওই বছর কুড়ি-বাইশের মেয়েটা প্রকৃত তথ্যই বলে গেল বটে, তবে ভয় খেয়ে নয়, নির্ভীকভাবে!

পুলিশের প্রশ্ন—কী দেখে সে বুঝতে পেরেছিল যে কোনো একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে?

উত্তর—কী দেখে আবার? যদি দেখা যায় একটা মানুষ বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে, আর দুটো ধুমসো লোক তার খাটের ধারে দাঁড়িয়ে কিছু বলাবলি করতে করতে হঠাৎ একজন লাফিয়ে খাটের ওপর চড়ে বসে দু'হাতে তার গলাটা টিপে ধরলো, তাহলে কী ভাবতে হবে একটা মজাদার ঘটনা ঘটছে?

কেন কাকুকে জানাতে যায়নি? কাজলের উত্তর—এই ভেবে, উনি আজ সারাদিন খুব খেটে, সবে ফিরে সামান্য কিছু খেয়ে ঘুমিয়েছেন। তাই মমতার বশে! দুঃসম্পর্ক হলেই বা, মায়া-মমতা থাকবে না? নিজের বাবা বা দাদু হলে, এ মায়াটা আসতো না?

তাছাড়াও—ওই ঠাকুমাটির ঘুম ভাঙার ভয়ে। উনি জেগে উঠলে এমন চেঁচামেচি ডাকাডাকি করেন। অপরাধীরা টের পেয়ে সাবধান হয়ে যেতো।

কোনখান থেকে সে দেখেছে?

যে ঘরে শোয় সে, সেই ঘরের জানলা দিয়েই। তবে সরাসরি সম্ভব হতো না। নিজস্ব কৌশলে সম্ভব হয়েছে।

সেই কৌশলটি কী?

পুলিশ সাহেবরা দেখুন এসে।

তা দেখলেন এসে তাঁরা।

জানলার ধারে দু'দুখানা ছোট মাপের আর্শি এমনভাবে তেরছা করে ফিট করে রেখেছে যে ওদের ঘরের মধ্যে যা কিছু আছে, যা কিছু ঘটে, সব দেখা যায়।

সত্যি! সব কিছু দেখা যাচ্ছে ওদের ঘরের। খুঁটিনাটি। অথচ শুধু খোলা জানলা দিয়ে এতো সব দেখতে পাবার কথা নয়।

আর্শি যে কী জিনিস!

দেয়ালের পাশের দৃশ্যটিও দেখা যাচ্ছে।

কাজল কেন হঠাৎ এই কৌশলটি করতে গেল? কী বাবদ?

হঠাৎ নয়। একদিন পড়ন্ত বেলায় ঘরের দেয়ালে টাঙানো আয়নায় ভাল করে মুখ দেখতে না পাওয়ায় একটা ছোট্ট হাত আয়না নিয়ে জানলার ধারে গিয়ে টিপ পরতে পরতে হঠাৎ এই অবাক করা দৃশ্যটি চোখে পড়ায়, থমকে যায় সে। তারপর কৌতূহল থেকে কেবলই দেখে।

তো কী সেই দৃশ্য?

দৃশ্যটা হচ্ছে, এই ব্লকের একদম নিচের তলায় ঘোষবাবুদের ফ্ল্যাটের পাশের দিকে জমাদার যাতায়াতের যে একটা প্যাসেজ আছে, বা গলি মতো আছে—সেই পথ দিয়ে একটা লোক ঢুকে যতসব রেনওয়াটার পাইপ আর বাথরুমের নোংরা জল পড়বার মোটা মোটা পাইপ আছে সারি সারি দেওয়াল ভর্তি, তারই একটা বেয়ে বেয়ে উঠে আসে এই তিনতলার তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটের বাথরুমের জানলার নিচে। আর জানলার নিচের কার্নিশের ওপর দাঁড়িয়ে কি যেন চেষ্টা করে চলে জানালার গ্রীলে।

দেখলে কৌতূহল হয় না? যদি মিস্ত্রীই হয়, তাহলে তো ন্যায্য পথেই আসবে। এমন রাতবিরেতে ঘোরাপথে কেন? তাছাড়া মিস্ত্রী হলে, তার কাজটা সারতে এত দেরি হতো না।

তো এই রাত্রেও কাজল উঠে দেখতে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত লোকটা করল কী?

তা সেই দেখতে গিয়েই ওই গলা টেপার দৃশ্য দেখে আঁৎকে উঠে থানায় ফোন করে বসেছিল।

তারপর?

তারপর তো ডাক্তারবাবু জেগে উঠে নিজেই সব দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন—মরা মানুষটাকে তুলে ধরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

ডাক্তার লাহিড়ী বলে উঠলেন, সেই তো! আমিও তো নিজের চোখেই দেখলাম। তবে আমিও বুঝলাম চেঁচামেচি করে পাড়ার লোককে জাগানোর চেষ্টা না করাই ভাল। থানায় যখন খবর একটা পৌঁছেই গেছে।

জগদীশবাবুর ঘরে কোনও আলমারি নেই। শুধু বড় একটা চাকাওয়ালা ওয়ার্ডরোব। কাজল জানায় ও জগদীশবাবুকে অনেক দিনই ঐ ওয়ার্ডরোবটা ঠেলে তার পিছনে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছে।

একথা শুনেই এঁরা লক্ষ্য করেন এঘর দিয়েই আর একটা ঘরে যাওয়া যায়, বড় ওয়ার্ডরোবটার পিছন দিকে ছোট্ট একটা দরজা দিয়ে। অনেকটা যেন চোরা কুঠুরি।

অ্যাঁ? এটা কী?

ঢুকে পড়েন পুলিশ অফিসারটি। আর ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠেন, মাই গড!

কেন? কী ছিল সেই ঘরে? আরো কোনো মৃতদেহ না কী?

না না। সে রকম কিছু না। দেখা গেল ব্যাঙ্কের 'লকার' ঘরের মতো একটা জানলা-দরজা বিহীন ওই ঘরটার দেয়ালের ধারে ধারে ইয়া ইয়া গডরেজের আলমারি বসানো—সবগুলো হাটপাট খোলা। আর একদম ভোঁ-ভাঁ ফাঁকা।

তবে ঘরের মেঝেয় ছড়ানো রয়েছে কিছু কাগজপত্র, আর কয়েকটা গহনার কেস।

তাড়াতাড়ি খুলেই মুখটা প্যাঁচা হয়ে গেল পুলিশ সাহেবের।

খালি বাক্স। নেকলেস আর ব্রেসলেট এবং মুক্তোর মালা গোছের কিছু ছিল বোধহয়, শুধু তার খাঁজগুলোই দেখা যাচ্ছে। ভিতরের জিনিসগুলি হাওয়া।

অর্থাৎ স্রেফ খুন করে ডাকাতি!

খুন! ডাকাতি!

কিন্তু যে বা যারা এসব করলো তারা পালালো কোথা দিয়ে? তারা কী অদেহী ভূত?

অথচ ঘরের মেঝেয় দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু পোড়া বিড়ির টুকরো।

ভূতেরা কী বিড়ি খায়?

শেষ পর্যন্ত কাজলের বুদ্ধির কাছেই হার মানা।

কাজলই বারবার কর্তার ঘরের অ্যাটাচড্ বাথরুমের দিকে যেতে বলে চলেছে। এনারা গেছলেনও একজন। দেখে বলে উঠেছিলেন, আরে জানালার গ্রীল তো লাগানোই রয়েছে।

তাহলে?

অতঃপর আবারও কাজল। সে নিজেই ঢুকে পড়ে বলে ওঠে, এই দেখুন ব্যাপার।

কী ব্যাপার? ব্যাপার এই সমস্ত স্ক্রুগুলো খোলা, শুধু ওপর-নিচের দুটো স্ক্রু ঢিলে করে লাগানো। যাতে কোনোমতে একটু ঠেকিয়ে রেখে লোক ঠকানো যায়।

কাজল হাত দিয়েই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই স্ক্রু দুটো খুলে ফেলে বলে ওঠে, কেউ ধরুন, ধরুন। ভীষণ ভারী। নিচে পড়ে গেলে বিপদ হবে!

ধরে ফেলে দেখা গেল জানলার বাইরে কার্নিশে স্ক্রু ড্রাইভার। তার মানে মাল পাচার করে ফেলার পর শেষমেশ লোকের চোখকে ধোঁকা দিতে বাইরে থেকেই একটু জুড়ে রেখে আবার পাইপ বেয়ে পগার পার!

পুলিশ সাহেবের পাকা মাথা থেকে কথাটা আবিষ্কার হওয়ার আগেই কাজল বলে ওঠে, এই মতলবেই ক'দিন আগে থেকে জানলার গ্রীল খুলেছে।

আর শেষ রাত্রে ঘোষবাবুদের ফ্ল্যাট থেকে যে 'চোর চোর' হল্লা উঠেছিল, যাদের কাঁধে পুঁটুলি দেখে ছিঁচকে চোর মনে হয়েছিল, তারাই আসল পাপী। তো মোটা মোটা দুটো তো সটকান দিয়েছে, ধরা পড়ে মরেছে সেই রোগা টিঙটিঙেটা।

ঘোষবাবুর বাড়ির চাকর তার পিছু পিছু ধাওয়া করতে করতে, একটা ঢিল ছুঁড়ে মারার ফলে সে উঃ বলে রগটা চেপে ধরে বসে পড়েছিল।

তখন পুলিশ এসে ক্যাঁক।

কিন্তু তার পুঁটুলিটায় ছিল কী?

ছিল কয়েক গোছা একশো টাকার নোট! কিন্তু নোটগুলো যে সব জাল।

পুলিশের পিটুনি খেয়ে স্বীকার পেলো, আগের মোটা দুজন এরকম নোট বস্তা ভর্তি করে নিয়ে গেছে। আর নিয়ে গেছে একগাদা দামী দামী গহনা। সে বেচারী নেহাৎই তুচ্ছ বলে তাকে সামান্য বখরা দিয়ে গেছিলো ওরা।

স্ক্রু খোলা পর্যন্তই তার ক্যাপাসিটি। ওদের দলের কাজকর্ম কী তা সে জানে না।

কিন্তু জানা গেলো।

ধর্মের কল বাতাসে নড়লো।

থানায় টিঙটিঙের পুঁটুলির কাপড়টা দেখে কাজল বললো, এ তো তালুকদারবাবুর বাড়ির জানলার পর্দা। হ্যাঁ, কাজলকেও পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছিল অবশ্য আরও তথ্যের আশায়।

ওইটিই ধরা পড়বার সূত্র।

পর্দা খোলা থাকার ফলেই তো সব কিছু দেখা গেলো। আর টিঙটিঙের সঙ্গে খুনীদের যোগাযোগ।

আর আটক করা কাগজপত্র থেকে জানা গেল জালি নোটের কারবারী তালুকদারবাবুর কীর্তিকলাপ। অবশেষে একটা গ্যাং ধরা পড়লো সেই মুশকো দুটো সমেত।

কাজলের নামে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ থেকে তাকে কিছু পুরস্কার দেবার কথা হলো।

কাজল বললো, অন্য কোনো পুরস্কার চাই না স্যার, শুধু আপনারা যেন একটু স্বীকার করেন, মেয়েরাও গোয়েন্দা হতে পারে। আজ পর্যন্ত তো একটা এমন গোয়েন্দা গল্প পড়তে পাইনি, যার গোয়েন্দাটি মেয়ে। আপনারা প্রচার করলে, লেখকরাও ভাবতে পারেন, মেয়ে গোয়েন্দার গল্পই লিখি দু'একটা।

[শারদীয়া ১৪০৪]

হারানো হীরের আংটি

স্বপনবুড়ো

রাজকন্যার জন্মদিন।

রাজ্যে উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে।

ছেলেরা পাঠশালা থেকে পালিয়ে এসে রাজপুরীতে জড় হয়েছে। পেটুক ব্রাহ্মণের দল ব্রাহ্মণীদের জানিয়ে দিয়েছে সাত দিন আর উনুনে আগুন দিতে হবে না।

রাজা ঘোষণা করে দিয়েছেন, সাত দিন ধরে তাঁর রাজ্যে কোনো জিনিসের দাম লাগবে না। প্রজারা যার যা খুশি দোকানী-পসারীদের কাছ থেকে নিতে পারবে।

রাজকোষ থেকে রাজার কোষাধ্যক্ষ তার দাম মিটিয়ে দেবেন। রাজকন্যা সখীদের সঙ্গে নৃত্যগীতে রত ছিলেন, এমন সময় অতি বৃদ্ধ রাজকবি কবিশেখরের কাছ থেকে সংবাদ এলো রাজকুমারীর জন্মদিন উপলক্ষে তিনি এক অপূর্ব কাব্য রচনা করেছেন এবং রাজকন্যাকে আহ্বান করছেন তাই পাঠ করবার জন্যে।

আনন্দে অধীর হয়ে রাজকন্যা সঙ্গিনীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কবিশেখরের কুঞ্জে উপস্থিত হলেন। তারপর কখন যে কাব্যের পুঁথিতে তন্ময় হয়ে পড়লেন তা তিনি নিজেই জানেন না। দিনের অর্ধেক কেটে গেল তাঁর কাব্যের পাতার ভেতর। সখী মল্লিকা এসে জানালো—নানা দেশ থেকে উপঢৌকন আসছে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে। বাধ্য হয়ে রাজকুমারীকে কাব্যকুঞ্জ থেকে উঠতে হলো। কিন্তু কাব্যের সুমধুর আখ্যান তখনো তাঁর মনে ভরপুর। নিজের হাতে হীরের আংটি দিয়ে যে পর্যন্ত তাঁর পাঠ হয়েছে সেখানে একটি চিহ্ন রেখে তাড়াতাড়ি খেয়ালী রাজকন্যা চলে এলেন মল্লিকার সঙ্গে।

তারপর উপহার ও উৎসবের মাঝখানে রাজকুমারী ভুলে গেলেন সেই কাব্যের কথা। ভুলে গেলেন কোথায় তাঁর হীরের আংটি ফেলে এসেছেন সেকথাও।

এই হীরের আংটি তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে রাজা নিজে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর শূন্য আঙুলের দিকে চোখ পড়তে রাজা বল্লেন, হ্যাঁরে, তোর আংটি কই?

রাজকন্যা চেয়ে দেখলেন তাঁর হাত খালি। কিছুতেই তাঁর মনে পড়লো না কোথায় আংটি ফেলে এসেছেন।

রাজ্যে হুলস্থূল পড়ে গেল—রাজকুমারীর হীরের আংটি চুরি গেছে।

খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। উৎসবের আমেজকে ডুবিয়ে দিয়ে রাজ্যে উঠলো এবার আংটি খোঁজার কোলাহল!

কিন্তু তাতেও কোনো ফল পাওয়া গেল না।

রাজা ডাকলেন মন্ত্রীকে।

মন্ত্রী ডাকলেন সেনাপতিকে।

সেনাপতি ডাকলেন নগররক্ষককে।

নগররক্ষক ডাকলেন শহর কোটালকে।

শহর কোটাল ডাকলেন চৌকিদারকে।

চৌকিদার ডাকলেন পাহারাওয়ালাকে।

কিন্তু আংটির কোনো হদিসই পাওয়া গেল না।

রাজার নিজের হাতে দেওয়া আংটি, তাই গেল চুরি! আর চুরি গেল কিনা রাজকন্যার জন্মদিনে!

শহর কোটাল গুফেশ্বরের বড় দুর্নামের ব্যাপার। লজ্জায় তাঁর গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগলো।

কিন্তু চুপ করে বসে থাকলেই বা চলবে কি করে! গুফেশ্বর তাঁর গোঁফের বোঝা নিয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিলেন।

তাঁর উৎসাহে আর অনুসন্ধানে পাখির দল পর্যন্ত গাছের ওপর বসতে সাহস পায় না...কত শত পাখির ডিম যে গাছের ওপর থেকে ভাঙা হলো তা আর গুনে শেষ করা যায় না।

রাজ্যের সব পুকুরে পড়লো জাল। যত মাছ ছিল জলে, ডাঙায় উঠে এলো। তাদের প্রত্যেকের পেট চিরে দেখা হলো। পচা মাছের দুর্গন্ধে রাজ্যের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো কিন্তু হারানো আংটির কোনো সন্ধানই মিললো না। একজন চৌকিদার এসে বল্লে—শহর কোটাল মশায়, মাছরাঙারা তো মাছ খায়...হয়তো রাজকন্যা নদীতে স্নান করেছেন, মাছের পেটে গেছে সেই হীরের আংটি, আবার মাছরাঙা খেয়েছে সেই মাছকে।

গুফেশ্বর গোঁফ চুমরে বললেন—ঠিক, রাজ্যে যত মাছরাঙা আছে সব ধর। শেষে আর মাছরাঙাও পাওয়া যায় না। শহর কোটাল ঘোষণা করলেন, প্রত্যেকটি মাছরাঙার জন্যে একটি করে মোহর দেওয়া হবে। রাজ্যে মাছরাঙার বাজার বসলো, কিন্তু আংটি মিললো না!

রাজা বিরক্ত হয়ে হুকুম দিলেন, কালকের মধ্যে যদি আংটি না মেলে তো শহর কোটালের প্রাণদণ্ড হবে। শুনে ভয়ে শহর কোটালের কালো গোঁফের গোছা সাদা হয়ে গেল। কিন্তু তা তো গেল—প্রাণ কি করে রক্ষা পায়! শহর কোটাল সারারাত পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন।

হঠাৎ তাঁর মগজে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বুদ্ধি থাকলে আর ভয় কি? শহর কোটাল সেই রাত্রেই স্বর্ণকারকে ডেকে পাঠালেন, যে রাজকন্যার হীরের আংটি তৈরি করেছিল।

সাতটা সেপাই গিয়ে তখনি স্বর্ণকারকে ধরে নিয়ে এলো। ভয়ে স্বর্ণকারের গায়ে এলো জ্বর। সে কাঁপতে লাগলো। শহর কোটাল তাকে নিরালায় নিয়ে বল্লেন, তোর কোনো ভয় নেই, তোকে আমি অনেক পুরস্কার দেব। কিন্তু তার আগে চাই একটি হীরের আংটি। যে রকম আংটি রাজকন্যের জন্যে তৈরি করেছিলি, ঠিক সেই রকম।

স্বর্ণকার শহর কোটালের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বল্লে, আমায় প্রাণে মারবেন না কর্তা!

গুফেশ্বর আর একবার গোঁফ চুমরে হুমকি দিয়ে উঠে বল্লেন, ওসব ন্যাকামি রাখ! যা বল্লাম তাই করবি কিনা বল?

স্বর্ণকার কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, কি করে করব, কর্তা? সে হীরে আমি কোথায় পাব?

গুফেশ্বর ফিসফিস করে বল্লেন, দুর বোকা! সে হীরে তোকে দিতে হবে না, একটা নকল হীরে বসিয়ে দে! কিন্তু আংটি হওয়া চাই ঠিক আগের মতো, রাজা কি আর অত দেখতে যাবেন হীরে আসল কি নকল!

স্বর্ণকারের মুখে এবার হাসি ফুটলো। বল্লে, তা আমি করে দেব, কর্তা। কিন্তু কোটাল মশাই, আমি যেন প্রাণে মারা না যাই।

গুফেশ্বর আর একবার গোঁফে চাড়া দিয়ে বললেন, আমি রইলাম যখন, তখন তোর ভয় কিরে?

পরদিন স্বর্ণকার এসে গোপনে কোটালকে আংটি দিয়ে গেল। অবিকল সেই আগেকার আংটি! কে বলবে নয়?

তখন গুফেশ্বর মশাই মগজ থেকে আর একটা বুদ্ধি বের করলেন। কেননা আংটি পাওয়া যাবে অথচ কোনো চোর ধরা পড়বে না, তা আবার কেমন করে হয়!

তাই তিনি চল্লেন খানাতল্লাশী করতে দাইয়ের বাড়িতে, যে দাই রাজকুমারীকে মানুষ করেছিল।

এটা-ওটা দেখতে দেখতে দাইয়ের বালিশের তলা থেকে বের করে ফেল্লেন সেই আংটি। তারপর প্রকাণ্ড হুঙ্কার দিয়ে গোঁফে দু' বার হাত বুলিয়ে আদেশ দিলেন, বাঁধ ওই দাই বুড়ীকে। সাতশো সেপাই ছুটে এলো দাইকে বাঁধতে। দাইয়ের তখন কি কান্না!

কিন্তু সে কান্না শোনবার সময় তখন গুফেশ্বরের নেই। বিজয়গর্বে তিনি গিয়ে রাজার কাছে হাজির হয়ে আংটি ফিরিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গুফেশ্বর যা চেয়েছিলেন, তাই পেলেন। হলো তাঁর পদোন্নতি। ছিলেন কোটাল, হলেন মন্ত্রী।

আর সেই দাই?

রাজা তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজকন্যা ওকে বড্ড ভালবাসতেন, তাই অনেক করে বলতে তার হলো আজীবন কারাবাস।

নিঃশব্দে চোখের জল মুছে প্রহরীর পিছন পিছন দাই কারাগারে চলে গেল।

এর ভেতর কেমন করে একটি বছর কেটে গেল। গেল গ্রীষ্ম, গেল বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত। আবার এলো সেই ফুল ফোটানো বসন্ত আর সেই সঙ্গে এলো রাজকন্যার জন্মদিন।

রাজকন্যা আবার এলেন সেই কবিশেখরের কুঞ্জে কাব্য আলোচনা করতে।

আনমনে কাব্যের পুঁথি ওল্টাতে ওল্টাতে এলেন সেই পাতায়, যে পর্যন্ত গত বছর জন্মদিনে পড়েছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো সেই আংটি!

তারপর আর কবিশেখর পুঁথিখানি হয়তো খোলেননি। যেমন আংটি তেমনি আছে।

তাঁর মনে পড়ে গেল একসঙ্গে সব কথা। তিনি ছুটে চলে গেলেন রাজার কাছে সেই আংটি নিয়ে, তারপর সব কথা তাঁকে খুলে বললেন।

কিন্তু দুটো আংটি এলো কোথা থেকে? রাজা গোপনে সেই স্বর্ণকারকে ডাকলেন।

তাকে অভয় দিতে সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল, রাজা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে হুকুম দিলেন, মন্ত্রীকে বেঁধে আনো এক্ষুণি।

সেই সাতশো সেপাই আবার ছুটলো মন্ত্রীর বাড়ির দিকে। এতদিন আরামে রাজভোগ খেয়ে খেয়ে গুফেশ্বরের গোঁফের পরিধি আরো বেড়ে গেছে। সেই সাতশো সেপাই তাঁর গোঁফ দিয়েই তাঁকে বেঁধে ফেললে।

আর সেই দাই!

নির্জন কারায় চোখের জল ফেলে ফেলে সে হয়ে গেছে অন্ধ। রাজকন্যা নিজে গিয়ে তাকে বাইরে নিয়ে এলেন। বল্লেন—দাইমা, আজ থেকে আমার চোখ দিয়ে তুমি দেখবে। আমি সর্বক্ষণ তোমার পাশে থাকব।

এদিকে রাজার আজ্ঞা পেয়ে সাতশো সেপাই এক গাছের সঙ্গে গুফেশ্বরকে তাঁর গোঁফ দিয়ে বেঁধে ফেলেছে।

তোমরা যদি সেই রাজ্যে কখনো যাও তো দেখবে গুফেশ্বর এখনো সেই গাছে তাঁরই গোঁফ দিয়ে বাঁধা আছেন...

[আশ্বিন ১৩৯১]

গাঁজাখুরি গল্প নয়

লীলা মজুমদার

এক

গোড়াতেই বলে রাখি গল্পের কোনো সত্যি-মিথ্যা হয় না। সব গল্পই সত্যি তা আমাদের চেনা-দেখার মধ্যে হোক বা না হোক। আজ না হোক, তবু ১০০ বছর কিংবা ১০০০ বছর পরে যে হবে না, তাই বা কে বলবে? মোট কথা দাদু বলতেন এ সবই খাঁটি সত্যি।

তাঁর মুখে আমরা স্বর্গের গল্পও শুনেছি। নিশ্চয় বানানো এবং গাঁজাখুরি। কিন্তু যদি অমন জায়গা এই দুনিয়ার কোথাও থেকে থাকে আর হাতে খানিকটা সময় পাই, তা হলে খুঁজে দেখতে দোষ কি? কাঁহাতক রোজ রোজ শুধু বাড়ি আর স্কুল, আবার স্কুল আর বাড়ি!

বুঝতেই পারছ এ হলো বেশ কিছুদিন আগের কথা, যদিও তারিখটা ঠিক বলতে পারছি না। কোনো একটা ঐতিহাসিক ঘটনার তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে, একটা সমাজোন্নয়ন প্রকল্প থেকে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সেই ঘটনার অকুস্থলে মিনি-মাগ্‌না নিয়ে যাওয়া হবে।

যাত্রীশালায় ১০ দিন থাকা হবে এবং তারি মধ্যে নিজের হাতের তেলোর মতো ঐ জায়গাটাকে চিনে রাখতে হবে। আরো বলা হলো, ঐ জায়গার ইতিহাস, ভূগোল, সেখানকার জীবনযাত্রা, লোক-কথা, অধিবাসীদের মনের কথা, সব জেনে আসতে হবে। তারপর ফিরে এসে প্রত্যেককে একটি করে বিবৃতি লিখতে হবে এবং ছয়জন সেরা লেখককে উপঢৌকন দেওয়া হবে। জান বোধ হয় উপঢৌকন মানে পারিতোষিক+উপহার।

দেখতে দেখতে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। চারুলতা, নন্দিতা, মিনতি আর কাদম্বিনী দিদিদের সঙ্গে যাবে রূপা, চাঁপা, গীতা, সীমা, ডলি, মিলি। ওদিকে হেরম্ব স্যার আর গোবিন্দ স্যারের সঙ্গে থাকবে ভূতো, ট্যাপা, জনি, ডিকি, কালু, নালু।

বসন্তকাল তখন বেশ জাঁকিয়ে বসেছে, শীত চলে গেছে, কিন্তু গরম পড়তে কিছু দেরি আছে। মামুলি পাহাড়-চড়ুয়াদের ভিড় জমতেও কিছু দেরি আছে। তারা যাবে অনেক উঁচুতে এবং অন্য পথে। তাদের হলো গিয়ে বড়লোকি ব্যাপার। আর এরা যাবে তার চাইতে আলাদা পথে, অন্য চুড়োর আড়ালে, কোনো এক রহস্যময় স্থানে, সায়েবসুবোরা যার কথা এখনো শোনেনি, এমন এক স্থানে। গোবিন্দ স্যারের ঠাকুরদা সেখানকার একজন বুড়ো লামার ভক্ত ছিলেন। তাঁর ডাইরিতে সেখানে যাবার পথ আঁকা আছে। সেখানে নাকি শান্তি আছে, শঙ্কা নেই। আরো কথা আছে।

সেখানকার মতো অন্য কোথাও নাকি অমন ঘন নীল আকাশ নেই; অমন ফলের গাছ, ফুলের গাছ গজায় না। সেখানে অন্যজাতের পাখিরা ডাকে। অন্যরকম বড় বড় প্রজাপতিরা ওড়ে। রোগ-শোক টের পায় না কেউ। ডাইরিতে সবুজ কালি দিয়ে ঐ জায়গায় একটা ম্যাপও আঁকা আছে। তার উপর লাল কালি দিয়ে পথটি আঁকা। তবে মাপ-জোক কিছু নেই। ছোট-বড় দিয়ে কি আর ভালো-মন্দর মাপ পাওয়া যায়?

স্যার বলেন—সেকালে লোকে তীর্থযাত্রায় যেত; তারা বলত তাতে নাকি অনেক পুণ্য হয়।

কিন্তু অনেকেই ফিরে এসে আবার আগের মতো নানারকম স্বার্থপর কাজ করত। আজকালও ঐ রকম কথা অনেকে বলে। যে পথ নাকি চাকার মতো ঘুরে আবার আগের জায়গাতেই ফিরে আসে, সে পথে যাসনে বাবা। কোথাও পৌঁছবি না। ঘানিতে জোতা চোখে ঠুলি বাঁধা ষাঁড়ের মতো ঘুরে মরবি।

দুটো সরকারি ট্রাকের একটাতে যে যার নিজের মালপত্র, একটি কাঁধে ঝোলা ব্যাগ আর একটি হাতব্যাগে গুছিয়ে নিয়ে চলেছিল। অদরকারি জিনিস সব বাতিল। ওষুধ-পত্র, কিছু শুকনো খাবার-দাবার, প্যাকেজ করা বিছানাপত্র যাবে। শৌখিন কিছু নয়, সব মামুলি ট্যাঁকসই জিনিস তোলা হলো ট্রাকে।

অন্য ট্রাকে ক্যাম্প করার সামগ্রী আর লোকজন। তাদের মধ্যে পথ চেনাবার গাইড ছিল; তাদের ঘর-বাড়ি এই অঞ্চলে। পাহাড়-পর্বতের গলি-ঘুঁজি নিজেদের হাতের তোলোর মতো ওদের চেনা-জানা।

তা হতে পারে; কিন্তু প্রকৃতি তো আর তাদের আজ্ঞাবহ দাস নয়। তাই অকালে প্রচণ্ড বৃষ্টি নামল। চারদিক মেঘে ঢেকে গেল। বিশ্বাস কর আর না-ই কর, মেঘরা এক সময় আকাশ থেকে নেমে পড়ে পাহাড়ের পায়ের কাছে চরতে লেগে গেল। দুপুর বেলা সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। কুয়াশাগুলো বৃষ্টির ফোঁটার মতো টিপ-টিপ করে পড়তে লাগল।

ট্রাক দুটো পাহাড় চড়ার জন্যেই তৈরি। বড় বড় চাকা—খাঁজ কাটা, খিল লাগানো, তার জড়ানো, যাতে হড়কে না যায়। পথ ক্রমে আরো পিছল হয়ে উঠল। ট্রাকের আরোহীরা বোবা বনে গেল। কতক আশ্চার্য হয়ে, কতক ঘাবড়ে গিয়ে। সুখের বিষয় চালকরা হঠাৎ মিষ্টি সুরে পাহাড়ি গান ধরাতে, বুকের টিপটিপুনি অনেকটা কেটে গেল।

ওরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখল একদল পাহাড়ি ছেলে কোঁকড়া চুল বড় বড় সাদা-কালো ছাগল নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে। তাই দেখে ড্রাইভাররা তাদের কাছে ডেকে, পথের অবস্থা কেমন জানতে চাইল। তারা তো হেসেই কুটোপাটি। বোঝা গেল সামনের বাঁকে পাহাড়ের গায়ে ধস নেমেছে। এ পথে ট্রাক এগুতে পারবে না। তবে সামনের ঘোরা পথে এখনো কিছু হয়নি। ট্রাক হাল্কা করে দিলে এখনো সে পথ ধরে ওপরের শক্ত জমিতে পৌঁছনো যাবে। আবার নাও যেতে পারে। কিছুই বলা যায় না।

এই সব কথা-বার্তার সময়টুকু ছাগলরা নষ্ট করেনি, তারা ঐ পিছলা খাড়াই পথেই ঢুঁসো-ঢুঁসি খেলা লাগিয়ে দিয়েছিল। হাড়-কাঁপুনি বাতাসের তারা তোয়াক্কা করে না। এ তো এখানে হামেশাই হয়। শিং-এর খটাখট শব্দ হচ্ছিল। একটা সুবিধা হয়েছিল যে এই অঞ্চলটা গোবিন্দ স্যারের অচেনা নয়। পাহাড়ি ছেলেদের ভাষা তাঁর মাতৃভাষার মতো। এখন কি করণীয় তা স্থির করে ফেলতে মিনিট পনেরোর বেশি লাগল না। ড্রাইভারদের সঙ্গেও পরামর্শ করা হলো।

শেষ পর্যন্ত যাত্রীরা সবাই ট্রাক থেকে যে যার ঝোলাঝুলি নিয়ে নেমে পড়ল। ছাগল-চরুয়ারা মজা দেখতে কাছে এল।

দুই

ট্রাক দুটোও বাঁক ঘুরে চোখের আড়াল হয়ে যেতেই কেমন একটা থমথমে ভাব জমে আকাশ-বাতাস জুড়ে বসল। কিন্তু লোমশ ভেড়া চরাচ্ছিল যে ছেলেপুলেগুলো, তারা এ-কান থেকে ও-কান জুড়ে হাসতে হাসতে, যাত্রীদের ঘিরে দাঁড়াল। ভাবখানা যেন এক্ষুণি বেজায় মজার একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

তাই দেখে যাত্রীদের হাড়-পিত্তি জ্বলে গেল। ঠিক তখুনি এক টুকরো মেঘ এসে সূর্যটাকে আড়াল

করে দিল। এক ঝলক কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া হাড়ের ভিতর পর্যন্ত জমিয়ে দিল। মেষপালকদের পাণ্ডা যে, তার বয়সটা একটু বেশি। ষোলও হতে পারে, আবার ছাব্বিশও হতে পারে। দাড়ি-গোঁফ নেই, মাথায় লোমের কান ঢাকা টুপি। তার নাম নাকি জ্যেঠা!

বলা বাহুল্য গোবিন্দ স্যার ছাড়া কেউ তাদের কথা বুঝল না। তিনি ঠিক এইখানে আগে না এলেও এদের ভাষা জানতেন। জ্যেঠা তাঁকে বলল যে কাছাকাছি রাত কাটানোর মতো কোনো মন্দির বা আশ্রম নেই। কিন্তু এটা যাযাবরদের এলাকা হলেও, স্থানীয় লোকও আছে। তাদের সামান্য টাকাকড়ি দিলেই আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। ভালো আশ্রয়।

শত্তুরের তাড়া খেয়ে নাকি তিনশো বছর আগে পাহাড়ের নিচের দেশ থেকে এক বাঙালি রাজা তাঁর আপনেওয়ালাদের সঙ্গে এখানে পৌঁছান। সেই ইস্তক তাঁর বংশধররা এখানে বসবাস করছেন। এখন আর তাঁদের আলাদা করে চেনা যায় না। তবে এখনো পাহাড়তলির মানুষ এলেই তাঁরা তাদের মাথায় করে রাখেন। অন্য কাউকে নয়। সন্ধ্যে হতে খুব দেরিও নেই। রাজাবাথানে যেতে হলে এখনি রওনা হতে হয়। সন্ধ্যার আগে কোনো ছাদের তলায় আশ্রয় নিতে হবে। সঙ্গে দিদিরা আছে। রাতে বাইরে নানা বিপদ। চারুলতা দিদিমণি, কাদম্বিনী দিদিমণি সঙ্গে সঙ্গে রাজী। এ তো মামুলি যাত্রীশালায় থাকার চাইতে শতগুণে ভালো হবে। পাহাড়িয়াদের অতিথি হয়ে থাকলে এ অঞ্চলটাকে আরো ভালো করে চেনা যাবে।

নতুন জায়গায় থাকা হবে শুনে ছেলেমেয়েরা নেচে উঠল। হেরম্ব স্যার আর গোবিন্দ স্যার থাকা-খাওয়ার কিঞ্চিৎ অসুবিধার কথা বললেও তারা দমল না। তাছাড়া আলোও কমছে, শীতও বাড়ছে।

কাজেই আর সময় নষ্ট না করে, যে যার নিজের তল্পিতল্পা কাঁধে তুলে রওনা দিল। লোমশ ছাগলদের খুদে রক্ষীরাও হাসতে হাসতে সঙ্গে চলল। হাজার কষ্টের মধ্যে এদের মুখে হাসি লেগে থাকে। কিন্তু পান দোক্তা চুন খেয়ে খেয়ে দাঁতের অবস্থা গয়া!

কাদম্বিনী দিদিমণির বয়স ৫০/৫২ হবে; কানের কাছের চুলে পাক ধরেছে; লম্বা দোহারা চেহারা; বাজখাঁই গলা তুলে একবার হাঁক দিলে চাইকি গোবিন্দ স্যারেরও বুক কাঁপে। কোনো কাজকে ডরান না এই দিদিমণি; গায়ে প্রচণ্ড জোর, বুকেও তেমনি বল। নাকি কম বয়সে সংসারে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। তাতেও দমে যাননি, উল্টে গোটা বিশ্ব জুড়ে সংসার পেতে রেখেছেন। সকলের সুখদুঃখের কথা খুঁচিয়ে বের করেই ক্ষান্ত হন না; সেগুলো দূর করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন; তাঁর পাল্লায় পড়লে সুখী না হয়ে উপায় ছিল না। তাঁর পাশে পাতলা, ফর্সা, বেঁটেখাটো, চুপচাপ মিনতিদিদিকে ছেলেমানুষের মতো দেখায়। অনেক সময়ই তিনি ছাত্রীদের দলে বেমালুম মিশে যান। তবে চেহারা যাই হোক, মনে সাহস না থাকলে তো আর এদের দলে জুটতেন না। এর অনেক ঝামেলা।

পাহাড়ে পথটি বেজায় খাড়াই। এমন পথে হাঁটার নানা ঝামেলা। একটু উঠলেই হাঁপ ধরে; হাঁ করে নিশ্বাস নিতে ইচ্ছা করে; তার ফলে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়; তেষ্টা পায়। তবু মুখ বুজে হাঁটতে হয়। জলের বদলে ল্যাবেঞ্চুষ চুষতে হয়।

তার উপর খাড়াই পথে আবার গোলপানা নুড়ি ছাড়ানো। বর্ষাকালে নাকি পাহাড়-চুড়োয় খুব বৃষ্টি হয়। সেখানকার ঢিল-পাটকেলগুলো জলের তোড়ে ভেসে গড়িয়ে নিচে নামতে থাকে। ঘষা লেগে লেগে নুড়িগুলোর এবড়ো-খেবড়ো গা মোলায়েম আর গোলপানা হয়ে যায়। আর শুধু পাহাড়ের গায়ে কেন, পাহাড়-তলির নদীর ধারের আর দুনিয়ার সমুদ্রতীরের পাথরও সব গোলপানা।

মোট কথা তার উপর হাঁটা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। না মেয়েদের, না পুরুষদের। অবশ্য আমাদের যাত্রীরা কেউই পুরুষদের বেশি গুণী বলে বিশ্বাস করে না। পুরুষরা নিজেরাও না। কাজেই মেয়েরাও নিজের কাঁধে ঝোলা-ব্যাগে, নিজেদের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস নিজেরাই বইছিল।

মাঝে মাঝে পথটাকে একটু স্যাঁতসেঁতে বলে মনে হচ্ছিল। গোবিন্দ স্যার বললেন বর্ষাকালে ওখান দিয়ে ছোট ছোট পাহাড়ে নদী বয়ে যায়। ঘাসের চাবড়া গজায়। জোঁক হয়।

জোঁকের কথা উঠতেই মিনতিদি শিউরে উঠে বললেন, ‘পাহাড় দেশে আমার মামার বাড়ি, বাপের বাড়ি শ্যামবাজারে।’ তারপর বলে চললেন যে সব জায়গার সব খুঁটিনাটি গল্প-গুজব ওঁর নখাগ্রে। কেন জানি আজও সবাই তাদের মনের কথা, ভালোমন্দ সব কিছু ওঁর কাছে ঝেড়ে ফেলে। ফেলে আরাম পায়।

সে যাই হোক একবার নাকি বিকেলে পাহাড়ে বেড়িয়ে, সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে, গরম জলে পা ধুতে গিয়ে মিনতিদি শিউরে উঠেছিলেন। তাঁর ডান পায়ে ছয়টা আঙুল! কি সব্বনাশ! ওঁর মামী হেসে বললেন, ‘ও কিছু নয়! ঘাবড়াসনি।’ বলে পায়ের কড়ে আঙুলের ওপর অনেকখানি নুন ছড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠ আঙুলটা চুপসে একটা রক্তমাখা মরা জোঁক হয়ে গেল!

উপস্থিত দলটি যখন ঐ শীতেও ঘামে নেয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে, পাকদণ্ডীর মাথায় পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। কনকনে হাওয়া বইছে। রাতে আর সামনে এগুনোর কথা ভাবাও যায় না।

গোবিন্দ স্যার ছাগল-চরুয়াদের বললেন, ‘এখানে হোটেল নেই বোধ হয়?’ তারা খিলখিল করে হেসে বলল, ‘হোটেল নেই, কিন্তু ভালো আস্তানা আছে। ভুটিয়া মন্দিরের অতিথিশালাটি খুব ভালো। হাত-রুটি, ডাল, চমরি গাইয়ের শুকনো দুধ, তাকে বলে ছুরপি, এই সব ভালো ভালো খাবারও পাওয়া যায়। গরীবদের সেবার জন্য মাথা পিছু একটা আধুলি দিলেই হবে।’

শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই হলো। মেঘও কাটল, চাঁদও উঠল। ভুটিয়া মন্দিরে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে যেন ওদের আদর করে ডেকে নিল।

তিন

আমাদের যাত্রীদের দলটি ভেবেছিল, রাতটা মন্দিরের যাত্রীশালায় কোনোমতে কাটিয়ে, ভোরে রওনা দিয়ে, বড় রাস্তার বাঁকে গিয়ে নিজেদের ট্রাক ধরবে। যারা সঙ্গে করে যে যার কাপড়চোপড় বিছানাপত্র খাবার-দাবার লাঠি-সোঁটা নিয়ে পথ চলে, চাই কি তাদের উত্তর-মেরু পৌঁছতেও বাধা কিসের?

কিন্তু মানুষ ভাবে এক; হয় আর এক। তবে রাতটি খুব মন্দ কাটল না। ওরা ঐ অতিথিশালায় পৌঁছে একজন বিদেশফেরত, ছ'ফুট লম্বা তিব্বতী অধ্যাপকের দেখা পেল। তিনি ঘণ্টা দুই আগে পৌঁছেছিলেন। আধা-সন্ন্যাসী মানুষটি, বয়স বছর ৫০ হবে। পরম জ্ঞানী বলে মনে হলো। চোখের দৃষ্টি দেখে আরো মনে হচ্ছিল যে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, উনি বোধ হয় তার চাইতেও কিছু বেশি দেখেন।

ছেলেমেয়ের দলটিকে দেখে তিনি মহাখুশি। তার একটা কারণ নিশ্চয়ই যে ওঁর মতো ওদেরো চোখ থেকে স্বপ্নের ঘোর কাটেনি। কি হতে পারে আর কি হতে পারে না সে বিষয়ে তাদেরও মন এখনো খোলা।

বোধ হয় সেই জন্যেই রূপা, চাঁপা, গীতা, সীমা, ডলি, মিলি আর ভুতো, ট্যাঁপা, কালু, নালু, জনি, ডিকি পনেরো-কুড়ি মিনিটেই তাঁর কাছে মনের কথা প্রাণের কথা অনর্গলভাবে বকে যেতে লাগল।

হেরম্ব স্যার অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন; গোবিন্দ স্যার কপালে ভুরু তুলে বললেন, ‘স্যার, আপনি বিদেশী হয়ে এত ভালো বাংলা কোথায় শিখলেন?’

এ কথা শুনে ছেলেমেয়েগুলো হেসেই কুটোপাটি!

‘সে কি! উনি বিদেশী হবেন কেন? ওঁর নাম ডঃ কাশ্যপ। ওঁর বাড়ি তিব্বতে; ধর্ম বৌদ্ধ; কর্ম দুনিয়ার যত সব মানমন্দিরে; এই পাহাড়ের খাঁজে একটা নতুন মানমন্দির হবে, তার অবস্থান ঠিক করতে এসেছেন—’

কাদম্বিনী দিদিমণি অবাক হয়ে বললেন, 'কি করে জানলি?' ভুতো, ট্যাপা বলল, 'যে ভাবে সব কিছু জানতে হয়। ওঁকে জিগ্যেস করে।' কাদম্বিনী দিদিমণি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এতক্ষণ তো সবাই ছিলি কালা-বোবা, এখন যে বড় মুখে খই ফুটছে?'

ডলি, মিলি বলল, 'একেই বলে স্থান-মহাত্ম্য, জায়গার গুণ!' দিদিমণিরা বোবা বনে গেলেন। এরা তো ভারি বাচাল বনে গেছে!

এই সময়ে অতিথিশালার বুড়ো লামা এসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'খাবার দেওয়া হয়েছে। সেবা করতে আজ্ঞা হয়।'

সরু লম্বা বারান্দায় লম্বা লম্বা কাঠের বেঞ্চি পাতা। তার সামনে লম্বা কাঠের টেবিল। টেবিলে চাদর নেই। বড় বড় কাঠের বাটিতে প্রত্যেকের জন্য আলাদা করে চাল ডাল তরকারি গুঁড়ো-মসলা দিয়ে রান্না অতি সুস্বাদু খিচুড়ি ঢালা রয়েছে। চিনে মাটির চামচ দিয়ে খেতে হবে। চিনে মাটির পেয়ালায় চিনি ছাড়া গরম চা।

ডঃ কাশ্যপ বললেন, 'এখানকার লোকে বলে চিনি দিলেই চায়ের স্বাদ নষ্ট হয়।'

অনেকেরই অন্য মত। কিন্তু ক্লান্তিতে, শীতে, কেউ তর্ক করল না। আলাদা ঘরে ছেলেরা মেয়েরা বেড্ ব্যাগ পেতেই ঘুম।

চার

প্রাতঃরাশ শেষ করে গুম্ফার অতিথিরা সবে মাত্র উঠে রোদে ভরা পুবের বারান্দায় দাঁড়িয়েছে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছাগল-চরুয়া ছেলেমেয়ের দল এসে হাজির। তারা যে খবর দিল সেটি খুব আশাপ্রদ নয়।

বড় রাস্তায় নাকি এমনি ধস নেমেছে যে, সেদিন তো নয়ই, পনেরো দিনের আগে কোনো গাড়ি যাতায়াত করতে পারবে কি না সন্দেহ। ট্রাকগুলোও কোনো আঘাটায় আটকাল, নাকি গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পেরেছে, তাই বা কে জানে! আসলে এ সময়ে এই পথে আসাই ভুল।

কাদম্বিনী দিদিমণি উষ্ণকণ্ঠে কাশ্যপকে বললেন, 'আপনিই বা এই পথে এসেছিলেন কেন? আপনি তো বিশেষজ্ঞ। আপনি কিছু টের পাননি?'

ডঃ কাশ্যপ হো হো করে হেসে বললেন, 'সত্যি বলছি, আমার কোনো দোষ নেই। আমি গত দু'দিন ধরেই এই দিকে আছি। ও দিকে এখনো পা দিইনি। আমার কাজ মানমন্দিরের জন্য একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে দেখা। এমন জায়গা যেটা সাধারণত দুর্যোগের হাতের বাইরে থাকে। এই গুম্ফাটি পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে। দুর্যোগ আসে উত্তর থেকে। এই সব গুম্ফার বয়স হাজার বছরের বেশি। এরা এতটুকু টস্কায়নি। মোটরের রাস্তা পাহাড়ের উত্তর ঢাল ঘেঁষে চলেছে, যাতে সারা পথ কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ উপভোগ করা যায়। বাঃ রে! তার দাম দিতে হবে না! আমি একটু বেরসিক মানুষ দিদিমণি!'

সকলে হেসে ফেলল। 'এতও জানেন আপনি!' গোবিন্দ স্যার হেসে ফেললেন, 'ওঁর পৈত্রিক নিবাস এই গুম্ফার ওপাশে। উনি জানবেন না তো কে জানবে? হাজার বছরের বেশি ওঁর পূর্বপুরুষরা এখানকার বাসিন্দা।'

নন্দিতাদি অবাক হয়ে বললেন, 'তার আগে?' 'তার আগে ওঁরা বঙ্গভূমিতেই থাকতেন। হিন্দু রাজারা বৌদ্ধদের উপর খুব সদয় ছিলেন না। তাই রাতারাতি দেশত্যাগী হতে হয়েছিল। এই খুদে অধিত্যকায় ওঁরা নিরাপদে ছিলেন। চারদিকে উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা। ওপার থেকে কিছু মালুম দেয় না। ডঃ কাশ্যপের হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে এ জায়গায় বেশ কিছুদিন বন্দী হয়ে থাকলেও ওঁর আপত্তি নেই। কারণ এটি মানমন্দিরের পক্ষে আদর্শ জায়গা।'

বাস্তবিকই তাই। ছেলেমেয়েরা সবাই বিজ্ঞান পড়ে। নানা মানমন্দির তারা দেখেছে। বাস্তবিকই অদ্ভুত। নিজের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে, দূর-দিগন্তের রহস্য স্পষ্ট করে দেখতে পাবে!

কাদম্বিনী দিদি বললেন, 'ভাগ্যিস দেখা যায়। তা না হলে এই পৃথিবীটার সব গলি-ঘুঁজি আর মাথার উপরকার আকাশটার সব তারা-নক্ষত্র ইত্যাদি নিজের হাতের তেলোর মতো চেনা হয়ে গেলে, জীবনটা ভারি একঘেয়ে ব্যাপার হয়ে উঠবে! এমন কি সব কিছু ঘড়ি ধরে চলে, এতটুকু বৈচিত্র্য নেই। একটা পাঁজি খুলে বসলেই দেখা যায় তাতে সব লেখা আছে! ভেবেও হাঁপ ধরে যায়!'

এ কথা শুনে ডঃ কাশ্যপ খুব হাসলেন। 'কি হলো দিদিমণি? দুনিয়ার সব চেনাজানা হয়ে গেছে মনে করে হতাশ হচ্ছেন বুঝি? ভয় নেই। আরো আছে। বইতে পড়েছি একবার স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা ঐ রকম কোনো মহাপুরুষ হিমালয়ের কোনো পাহাড়চুড়োয় তুমুল বরফ-ঝড়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে যখন প্রাণের আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, ঠিক তখনি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে প্রসন্ন মুখ, ফরসা রং, গেরুয়াধারী একজন সাধু নেমে এসে, তাঁকে হাত ধরে তুলে, প্রায় কোলপাঁজা করে, পথ দেখিয়ে, নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে, মৃদু হেসে, আবার বরফ-ঝড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছিলেন। কই, কোনো বিজ্ঞানের বইতে তো তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় না। এই পুরনো পৃথিবীটাতেই আমাদের এখনো অনেক চিনবার জানবার বাকি আছে।'

ছেলেমেয়েগুলো তখন তাঁকে পেয়ে বসল। 'আরো বলুন, দাদা, আরো রহস্যের কথা বলুন।'

ডঃ কাশ্যপ হাসলেন, 'তোদের বইতে তো অনেক কথা লেখা আছে। এই সুন্দর পৃথিবীটা নাকি আসলে সূর্যের জ্বলন্ত গা থেকে ছিটকে আসা একটা স্ফুলিঙ্গ বই তো নয়। বেরিয়ে এসেও কে জানে কেন সূর্যের আকর্ষণের বাইরে যেতে পারেনি। সেই ইস্তক কেবলই তার চারদিকে ঘুরছে। কখনো একটু কাছে আসছে, আবার নিয়ম ধরে কখনো দূরে সরে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মনে হয় একই বেগে, একই পথে, ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিনে একবার ঘুরে আবার পুরনো জায়গায় ফিরে আসছে। আর শুধু পৃথিবীটাই নয়, রাশি রাশি গ্রহ, শত শত উপগ্রহ সূর্যের চারদিকে কে জানে কবে থেকে দণ্ড পল ব্যতিক্রম না করে কেবলি ঘুরছে, কেন কে জানে।

তোমরা তো বিজ্ঞান পড়। বলতে পার এই সব নিয়ম কে বেঁধে দিয়েছিল, কেন দিয়েছিল? শুধু তাই নয়; নানা রকম গাছ-গাছড়ার কথা পড় তোমরা। তাদের নিরাপত্তার জন্য কে এত রোঁয়া, কাঁটা, বিষের ব্যবস্থা করেছিল? প্রকৃতি? সে আবার কে? তাকে কেউ দেখেছে?

না দেখলেও এটা বোঝা যায় যে সে বড় দয়ালু। তা না হলে পিঁপড়েদের, উই-পোকাদের, মশা-মাছিদের নিরাপত্তার এমন সব সুন্দর ব্যবস্থা করে দিত না। জান, জোর বৃষ্টি পড়বার আগেই মাটির তলার বাসার বাসিন্দা পিঁপড়েরা ডিম মুখে করে দেয়াল বেয়ে, গাছ বেয়ে উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেয়। কে তাদের এ বুদ্ধি দেয়?

একটা মৌচাকে দুটো রানী মৌমাছি জন্মালে, ওরা মানুষদের মতো খ্যাঁচাখেঁচি করে না। একজন দলবল ডিম ইত্যাদি নিয়ে উড়ে গিয়ে অন্য জায়গায় চাক বাঁধে।

যেদিকে তাকাই, দেখি শুধু প্রশ্ন। তার উত্তর সাধারণ বিজ্ঞান দিতে পারে না। পরমাজ্ঞান বলে যদি কিছু থাকে, তাই দিয়ে চেষ্টা করা যায়।' এই অবধি বলে কাশ্যপ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে থামলেন। বড়রা সব চুপ। ছেলেমেয়েগুলো ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল, 'ও দাদা, অমন দুঃখ করবেন না। আমাদের পথ দেখিয়ে দিন, আমরা সব কাজ করে দেব। নিশ্চয় দেব।'

ডঃ কাশ্যপ ম্লান হেসে বললেন, 'আমাদের কাজের জন্য যে অনেক লক্ষ টাকা লাগবে, সে কোথায় পাবি? সরকার তার অর্ধেক দেবে। বাকিটা আমাদের যোগাড় করে নিতে হবে। কোথা থেকে যোগাড় হবে? আমরা কেউ তো বড়লোক নই। একটা মানমন্দির হবে ঐ টিলাটার মাথায়।

পুবমুখী একটা মহাবিদ্যালয় আর ওপাশে একটা যাত্রীনিবাস। স্থানীয় গ্রামের লোকরা আমাদের প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী এনে দেবে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ওদের গাঁ আছে। ঢালের ওপিঠে পায়ে-চলা পথ দিয়ে ওরা পাহাড়তলিতে নেমে যায়। এদিককার লোকরা নিচে চাষবাস করে। সোনেরা নদীর জল শীতকালেও জমে না।

পাথরের চাঁই দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করে দেবে এ-দেশের ঝানু কারিগররা। এখানকার এই গুম্ফাটা ঐ নিয়মেই এদের পূর্বপুরুষরা তৈরি করেছিলেন। হাজার বছরেও ওর গায়ে একটা আঁচড় পড়েনি। চারদিকের পাহাড়ে বরফ জমে শীতকালে। কিন্তু এখানে বরফ পড়ে না। আমাদের ঐ ছোট সোনেরা নদীটার জল বারো মাস একটু গরম মতো থাকে। এ নদীর জল কখনো জমে না। মনে হয় ওর উৎস হলো পৃথিবীর গায়ের একটা খাঁজের মধ্যেকার ছোট একটা ফাটলে। স্রোতের জল ছয় ঘণ্টা ধরে কমতে থাকে; কিন্তু শুকিয়ে যাবার আগে আবার ছয় ঘণ্টা ধরে বাড়তে থাকে। ভাবি নদীটার উৎস যেখানে, সেখানে গিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখি।—'

তাই শুনে ছেলেমেয়েগুলো লাফিয়ে উঠল, 'আমরাও যাব দাদা, আমাদেরও নিয়ে চলুন।' একটু হেসে ডঃ কাশ্যপ বললেন, 'এখনকার গাঁয়ের লোকরা বিদেশীদের হাতে অনেক কষ্ট পেয়ে পেয়ে এখন আর কাউকে সহজে ঢুকতে দেয় না। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ওদের গাঁয়ের পথে বিদেশীদের যাওয়া নিষেধ। বিষাক্ত তীর-ধনুক নিয়ে অব্যর্থ তীরন্দাজরা আড়াল থেকে অষ্ট প্রহর পাহারা দেয়। কোনো বিদেশী পার পায় না। প্রাচীন গুম্ফাটির শুনেছি মেলা ধনদৌলত। ওঁরা নানা জায়গায় অনাথ-আশ্রম, অবৈতনিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদির যাবতীয় খরচ দেন। যতই দেন, ততই নাকি ওঁদের ধন বেড়ে যায়।

গুজব শুনেছি উঁচু শৃঙ্গের আড়ালে ওঁদের লুকনো ঘাঁটি আছে; সেখানে ছোট প্লেন নামে। মন্দিরের পায়ের কাছে গরম জলের উৎস। তাতে কাউকে নামতে দেয় না। কিন্তু পাইপে করে নিয়ে তার জলে অনেকগুলো কুণ্ড ভরা থাকে। সেখান থেকে জল নিয়ে স্নান করে কত রুগী সেরে উঠেছে।'

গোবিন্দ স্যার বললেন, 'এ্যাঁ! কে বলেছে এত কথা?' ডঃ কাশ্যপ বললেন, 'ইউরোপের সব চাইতে নামকরা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি এখানে নিজে এসে দেখে গেছেন।—সে কথা থাক, এখন ছাগল-চরুয়ারা এলে কিঞ্চিৎ পরামর্শ করা যেত।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারা এসে গেল। তাদের দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে কাশ্যপ বললেন, 'কি রে বাপজানরা, আমাদের মানমন্দির আর যাত্রীনিবাস আর মহাবিদ্যালয়ের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা কোথায় পাওয়া যায় জানিস? কাজ আছে, কর্মী আছে, খরচার টাকা নেই!'

ছাগল-চরুয়ারা বলল, 'কেন? সরকার আপনাদের মটর-গাড়ি দেয়, তাহলে টাকা দেবে না কেন?'

কাশ্যপ বললেন, 'ওদের টাকায় কুলোচ্ছে না। বল না একটা উপায় যদি জানিস!'

ছাগল-চরুয়ারা একবাক্যে বলে উঠল, 'পদম্‌বাহাদুর গুরুং জানে, স্যার।'

ডঃ কাশ্যপ আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'পদম্‌বাহাদুর? কে পদম্‌বাহাদুর গুরুং?'

ওদের দল থেকে একজন বেঁটে, ফরসা, হাসিমুখ, ট্যারা-চোখ ছেলে এগিয়ে এসে বলল, 'আমি, স্যার।'

পাঁচ

ডঃ কাশ্যপ এক গাল হেসে পদম্‌বাহাদুরের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'তুই সব জানিস বুঝি? এতটুকু মানুষটি এত কথা শিখবার সময় পেলি কি করে? কোথায় থাকিস? তোর গার্জিয়ান কে?'

পাহাড়ের খাঁজের দিকে ছোট্ট একটা ফরসা আঙুল দেখিয়ে পদম্ হিন্দী ভাষায় বলল, 'শিউমন্দিরের

আশ্রমে থাকি স্যার। আমার বুড়ো-দাদু ওখানকার ঘন্টিদার। ওঁর কাছে গেলে, যা কিছু চাইবেন সব পাবেন। আমি ওঁকে বলে দেব।'

ছেলেটার মিষ্টি কথা শুনে সবাই গলে গেল। গোবিন্দ স্যার সব ছেলেপুলেকে বেজায় ভালোবাসেন। পদম্‌বাহাদুরের পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'মানমন্দিরের জন্য অনেক অনেক টাকা লাগবে যে বাপ। তিনি সাধু মানুষ, কোত্থেকে দেবেন?'

পদম্ এক গাল হেসে বলল, 'কেন? শিউবাবার কাছে চেয়ে নেবেন।'

'সে কি রে? শিউবাবা টাকাকড়ি দেবেন?'

পদম্ জিব কেটে বললে, 'ছি! ছি! না, না, টাকাকড়ি দেওতারা ছোঁন না। ধন-রত্নও না। তাছাড়া টাকা-কড়ি মণি-মাণিক্যের তো তাঁর দরকার নেই। তিনি আপনাদের পাইয়ে দেবেন। ঠিক পথে চললে সবাইকে যেমন পাইয়ে দেন।'

কাদম্বিনী দিদিমণি অবাক হলেন, 'ভালো লোক খারাপ লোক, সবাইকেই দেন। তাঁর কাছে সবাই সমান। তবে নিয়ম মানতে হবে।'

ডঃ কাশ্যপ বললেন, 'তা নিয়মটা তো তিনি বলে দেবেন। তাঁর কাছে আমাদের নিয়ে চল।'

পদম্ গম্ভীরমুখে বলল, 'তা তো হয় না। যারা কিছু চাইতে আসে, বুড়ো-দাদু তাদের সব দেন, কিন্তু দেখা দেন না।'

'তাহলে নিয়মগুলো কি করে জানব?'

পদম্ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কেন, আমি বলে দিচ্ছি। এই আমাদের ঝাউবনের ঝরনার ধারে যে শিউতলা আছে, সেখানে আপনাদের মাত্র একজনকে নিয়ে যেতে পারি। আমার সঙ্গে এই পাহাড়তলির ঝাউবনের মধ্যে দিয়ে ঝরনাতলায় যেতে হবে। সেখানে নালার ধারে একটা মস্ত কালো পাথর আছে। তার উপর চব্বিশ ঘণ্টা উপোস করে বসে কেবলি যার যে নামে খুশি দেবতাকে ডাকতে হবে। তবে তাঁর মন গলবে।

আরো বলি পহরে পহরে একবার করে শিউতলার শিবলিঙ্গের মাথায় আকাশ-গঙ্গার জল নামে— কিছু বললেন, স্যার?'

ডঃ কাশ্যপ বললেন, 'তার মানে ঐ কালো পাথরের উপর পাহাড়চুড়ো থেকে ঢল নামে?'

পদম্ বলল, 'যেমন বুড়ো-দাদু শিখিয়েছেন তেমনি বলছি। তার বেশি জানিও না। শিউতলায় কারো সঙ্গে আমাদের কারোর যাওয়াও বারণ। তাকে একা যেতে হবে। আমি উপর থেকে দেখব।'

ডঃ কাশ্যপ বললেন, 'আমি নিজে যাব। কি কি করতে হবে?'

'ঐ যে বললাম, চব্বিশ ঘণ্টা উপোস করে শিউতলায় বসে কেবলি তাঁকে ডাকতে হবে। পহরে পহরে একবার ঐ চ্যাপ্টা কালো পাথরের উপর আকাশ-গঙ্গার জল নামে। কিন্তু সাবধান—'

'কিসের সাবধান?'

'সৎকাজের জন্য সাধু মানুষরা ডাকলে, জলের সঙ্গে সোনার দানা, মণি-মাণিক্য জলের সঙ্গে পড়ে আর দুষ্ট লোকরা ডাকলে কেউটে সাপ পড়ে। এ আমার নিজের চোখে দেখা, স্যার।'

গোবিন্দ স্যার বললেন, 'কি করে বোঝা যায় কে সাধু আর কে দুশমন?'

এক গাল হেসে পদম্ বললে, 'কেন, মণি পড়লে বুঝব সাধু লোক আর সাপ পড়লে দুশমন। আপনি যাবেন, দাদা?'

গোবিন্দ স্যার ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'ইয়ে আমি যে দরকার হলে মাঝে-মাঝে মিছে কথা বলি আর সাপ দেখলে আমার হিক্কা ওঠে!'

ডঃ কাশ্যপ এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি যাব। এঁদের পনেরো দিনের মধ্যে অভিযান শেষ করে তার বিবরণ লিখে দিতে হবে। নইলে সরকারি সাহায্য পাবে না।'

কাদম্বিনী দিদিমণি রেগে বললেন, 'না দেয় তো আমি নিজে টাকাটা দিয়ে দেব। আমরা অতিথিশালায় অপেক্ষা করব।'

ডঃ কাশ্যপ বললেন, '—ইয়ে তাহলে তো খুব ভালো হয়। কিন্তু আমাদের যদি একটু দেরি হয়, ততক্ষণ কি করবেন?'

কাদম্বিনীদিদি হাসলেন। গোবিন্দ স্যার হেসে বললেন, 'আমাদের শুধু ভ্রমণ করে বেড়ালেই চলবে না। কি দেখলাম, কি শুনলাম, কি শিখলাম, যৌথভাবে তার একটা বিবরণী লিখতে হবে। ভ্রমণের সময় শেষ, এবার খুটিনাটি, দূরত্ব, দৃশ্য, স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন-যাত্রা ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য দিয়ে রিপোর্টটা তৈরি করে ফেলা হবে।

আমাদের জন্য ভাববেন না, দাদা। যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এবার আপনার নিজের কাজটিতে কৃতকার্য হলেই, এ অভিযান সার্থক হবে।'

একটা কথা বলা হয়নি। এ বিবৃতিটি বাংলায় লেখা হলেও, এঁদের সব কথাবার্তা হচ্ছিল হিন্দিতে। সেটাই স্বাভাবিক। হিন্দি ভাষাকে অবশ্য-পাঠ্য করার এই একটা মস্ত সুবিধা। সারা ভারত জুড়ে সব কাজকর্মের সুবিধা হয়েছে। অবিশ্যি আমাদের পশ্চিম-বাংলার দল তাদের বিবৃতি বাংলায় লিখে রাখছিল। পরে নাকি ইংরিজি আর হিন্দিতে নিজেরাই অনুবাদ করে রাখবে।

আড়াই দিনেই এদের কাজ সারা আর তার পরদিনই সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত ক্লান্ত ডঃ কাশ্যপ পাহাড়-চড়ার লাঠিতে ভর দিয়ে, পা দুটোকে যেন টেনে-টেনে পান্থশালায় এসে পৌঁছলেন। চোখে-মুখে সাফল্যের আনন্দ; পিঠের হ্যাভারস্যাকটা মনে হলো ঠাসা।

একবার বললেন, 'ইউরেকা!' তারপরেই কাটা কলাগাছের মতো তক্তাপোশে লম্বা হলেন আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে কাদা। কাদম্বিনীদিদি তাঁর নিজের কম্বলটি এনে তাঁর গা ঢাকা দিয়ে দিলেন। ছেলেদের একজন তাঁর পায়ের জুতো খুলে দিল। আসলে উপস্থিত সকলে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনতে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু কাদম্বিনীদিদি চোখ পাকিয়ে বললেন, 'নিজের থেকে যখন উঠবেন, তখন সব শুনো। মনে রেখো এ কাহিনী কিন্তু আমাদের ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে পড়ছে না।'

হেরম্ব স্যার স্বল্পভাষী মানুষ। তিনি পর্যন্ত প্রসন্নভাবে বললেন, 'এটা আমাদের ফাউ। আমাদের পাওনার উপর বাড়তি লাভ।'

বিশ্বাস কর আর নাই কর, ডঃ কাশ্যপ একটানা আট ঘণ্টা ঘুমোলেন। মাঝে মাঝে মৃদু মৃদু নাক ডাকালেন; বার তিনেক এ-পাশ থেকে ও-পাশ ফিরলেন। পুবের স্কাইলাইট দিয়ে চোখে আলো পড়তেই, তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'কি সর্বনাশ! তোদের না দেরি হয়ে যায়!'

রূপা, চাঁপা, গীতা, সীমা, ডলি, মিলি, ভুতো, ট্যাপা, জনি, ডিকি, কালু ও নালু একবাক্যে বলল, 'হয়নি দেরি। ডাক-জোয়ান আমাদের রিপোর্ট নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। অত ঘুমোও কেন?'

ডঃ কাশ্যপ বললেন, 'সব কথা হয়তো বলা যাবে না; এঁদের কথা দিয়েছি বলব না। কিন্তু আমার জ্ঞাতব্য যা যা দরকার, তার সমাধান হয়ে গেছে। স্নান করে, খেয়ে যতখানি পারি বলব।'

হেরম্ব স্যার, গোবিন্দ স্যারও এমনি হুড়ো দিতে লাগলেন যে ছেলেমেয়েরাও উঠে পড়তে বাধ্য হলো।

সন্ধ্যাবেলা চিমনিতে আগুন জ্বললে, সবাই ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে গল্প শুনল। শুধু তাই নয়। হ্যাভারস্যাক খুলে ডঃ কাশ্যপ তাঁর পাওয়া সোনার গয়না, সোনার শিবলিঙ্গ, নানা রকম দামী রত্ন, মণি, মোহরের থলিটা দেখালেন।

ভাঙা গলায় কাশ্যপ বললেন, 'আর আমাকে হাত পেতে বেড়াতে হবে না। এই দিয়েই মান-মন্দির, পরীক্ষাগার, অতিথিশালা সব হয়ে যাবে। একটা বিশ্ব-সংস্থা সে সমস্ত চালাবার সব খরচ দেবেন।'

মিনতি দিদি বললেন, 'শিবঠাকুর কিংবা অন্য কোনো দেবতা মানুষের হাতে গড়া গয়নাগাঁটি কাউকে এমনি দেন এ কথা বিজ্ঞান মানবে না। ভগবান বুদ্ধি দিতে পারেন। নিজেদের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিকরা বিদ্যা অর্জন করতে পারেন, কিন্তু কাজ চালাবার খরচপত্র এভাবে হাতে তুলে দেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

ডঃ কাশ্যপ হেসে ফেললেন। বললেন, 'ঘণ্টাখানেক হাত জোড় করে ধ্যান করার পর স্পষ্ট দেখলাম, চ্যাপ্টা কালো শিবলিঙ্গের উপর ঝরঝর করে পাহাড়ের গায়ের ফাটল দিয়ে গরম জল পড়ল। ধারাটা কমে এল। তারপর থেমে গেল। তখন চেয়ে দেখি শিবলিঙ্গের উপর এই সব ধন-রত্ন পড়ে আছে। আর নেপথ্য থেকে পদম্ আমাকে ডাকছে। তখন দেবতার দেওয়া ধনরত্ন কুড়িয়ে, পদম্‌কে ধন্যবাদ দিয়ে, ওদের দরিদ্র-ভাণ্ডারের জন্য কিছু টাকা দিয়ে, ঐ পাহাড়ি পথ ধরে চলে এলাম। ওরাও হাসিমুখে বিদায় দিয়ে, ছাগল নিয়ে চলে গেল।'

'তারপর?'

'ওরা চলে গেলে পর, আমি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আরো অনেকটা উঠলাম। জানই তো আমার দেশ-বিদেশের পাহাড় চড়ার ট্রেনিং আছে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ঐ গরম জলের ঝরনা, পাহাড় কুরে কুরে আরো অনেক উঁচু থেকে অদৃশ্যভাবে নেমেছে। হয়তো এই রকম আরো কুণ্ড আছে। কুণ্ড মানেই তীর্থস্থান। তীর্থস্থান মানেই যাত্রী। তাদের মধ্যে অনেক ধনী লোক থাকেন। তাঁরা দেবতাকে সোনা-দানা ঘুষ দিয়ে খুশি করতে চান। সেই দানের জিনিস স্রোতের সঙ্গে নেমে আসে নিচের কুণ্ড অবধি। সেখানে হয়তো কোনো ভক্তের কপাল খুলে যায়। আরো উপরে আরো ফাটল আছে, কুণ্ড আছে। সেখানেও কেউ কেউ আমার মতো ধন পেয়ে যায়। কুণ্ডগুলো অনেকটা দূরে দূরে আর রক্ষীরা এত সাবধান যে কেউ বাইরের লোকের কাছে কিছু প্রকাশ করে না। স্থানীয় লোক নিয়ে তাদের কারবার।

গরম-জলের ধারাটা স্বাভাবিক। দুনিয়াতে এমন আরো আছে। যে শক্তিতে ভূ-গর্ভের তাপে পৃথিবীর বুকের জল বাষ্পে পরিণত হয়ে উপর দিকে ঠেলে বেরুতে চায় আর তার ফলে কোথাও আগ্নেয়গিরি তৈরি হয়; কোথাও বা গরম জলের ঝর্না হয়। কোথাও ভিতরেই আলোড়ন করে, ভূমিকম্প হয়; আর কোথাও এই রকম কিছুক্ষণ পর পর ফোয়ারার মতো ফাটল দিয়ে গরম জল বাইরে বেরিয়ে আসে।

এখানে মনে হয় পাহাড়ের ভিতরে ভিতরে মাটি কুরে কুরে পাহাড়ের চূড়ার কাছের গরম জল অদৃশ্য থেকে নিচে নামতে থাকে আর যেখানে নরম মাটি পায়, খানিকটা জল সেখানে কুণ্ডের মতো বেরিয়ে পড়ে। উপরের জল যতবার খানিকটা জমে ততবার ঐ সব ফাটল দিয়ে ঝরে পড়ে। আর জলের সঙ্গে সঙ্গে আরো উপরের কুণ্ডে যাত্রীদের দেওয়া ধনরত্নের খানিকটা বেরিয়ে আসে।

কুণ্ডের রক্ষীরা ব্যাপারটা গোপন রাখে। কারো সঙ্গে কারো জানাশোনাও নেই তাই রহস্যটা রহস্যই থেকে যায়।

এই ব্যাপার আমার মন বুঝে গেলে, আমি আবার নেমে এলাম। আমার যেটুকু দরকার, বিধাতা সেটুকু পাইয়ে দিয়েছেন।'

তারপর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন ডঃ কাশ্যপ।

বিকেলে ধসের মাটি সরানোর কাজ শেষ হলো। পদম্ খবর দিল ট্রাক এসে গেছে।

[শারদীয়া ১৪০০]

ধোঁয়াটে মুখ

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

তোমরা অনেক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়েছ, ভয়াবহ ভূতের গল্পও তোমাদের অনেক জানা আছে, কিন্তু এখানে আমি এমন একটি ঘটনার কথা বলব, যা একাধারে অলৌকিক, অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর আর ভূতুড়ে সবই। এবং তার উপরে এটি হল সম্পূর্ণ সত্য—এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই। এর সত্যতা প্রমাণের জন্যে কোন চেষ্টাই করতে হয়নি, সবার চোখের উপর ঘটেছে এ ঘটনা। যে জিনিষ দেখা যায় না, বা যা কেবল একজনই দেখে বা বলে, তা নিয়ে মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু এ ঘটনাটি সবাই একসঙ্গে চাক্ষুষ দেখেছে বলে এটিকে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি—মতান্তরের অবকাশই ঘটেনি। বৈজ্ঞানিকরাও হার মেনেছেন এ ঘটনার কাছে। আজও তাঁরা এর সঠিক হদিশ বার করতে পারেননি।

ঘটনাটি ঘটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১০-১১ সালে জার্ম্মানির লাইপজিক সহরতলীর এক লোহার কারখানায়। গ্রামের সীমানা যেখানে প্রায় শেষ হয়েছে, সেখানে এক ছোট নদীর ধারে ছিল এই কারখানা। এখানে ঢালাইয়ের কাজ হত। লোহা গলিয়ে তা থেকে স্ক্রু, বল্টু, কেট্‌লি প্রভৃতি তৈরি হত। আশপাশের শত শত লোক কাজ করত এই কারখানায়। যে ঘরে লোহা গলানো হত সেই ঘরটি ছিল এই কারখানার মধ্যে মারাত্মক জায়গা। রাবণের চিতার মত দিনরাত সেখানে আগুন জ্বলত দাউ দাউ করে। সেই আগুনের লেলিহান শিখার দিকে চাইলে চোখ ঝল্‌সে যেত। বিরাট কড়ার মধ্যে টগ্‌বগ্ করে ফুটত গলন্ত ধাতু। তার রক্তাভায় সারা ঘরের রঙ লাল হয়ে থাকত। সে-চুলি কখনও নিবত না।

কারখানার সেই 'ফার্নেস'-ঘরের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল লস্ ক্রস্ নামে—বুড়ো কারিগর। কাছেই এক গ্রামে তার বাড়ী, কিন্তু বুড়ো কখনও বাড়ী যেত না। এখানেই দিনরাত থাকতে হত তাকে। কারখানার মধ্যে গালাই-ঘরের কাছেই ছোট একটি ঘরে সে থাকত। বুড়োর বয়স প্রায় আশি বছর। কিন্তু এ বয়সেও ছিল যেমন অসুরের মত চেহারা, তেমনি গায়ের জোর। সেজন্যে কারখানার মালিকরা ঐ গালাই-ঘরের হেফাজতেই রেখে দিয়েছিল তাকে। এই ভয়াবহ জায়গার গুরুত্বও খুব বেশী বলে, যে কোন নতুন লোককে সেখানে রাখা যেত না। তাছাড়া কারখানার গোড়া থেকেই সে এখানে কাজ করছিল। এর উপর তার আসক্তি ছিল অসাধারণ। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আর দুর্জ্জয় সাহস নিয়ে দিনের পর দিন আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলত বুড়ো। আগুনের তাপে তার সারা গায়ের রঙ্ ঝল্‌সে খয়েরের মত হয়ে গিয়েছিল।

কারখানার মালিকরা তাকে মাসিক ভাতা দিয়ে অবসর গ্রহণের জন্য বহুবার বলেছিল, কিন্তু লস্ তাতে রাজী হয়নি। সে বলত, এ কাজ না করে বসে থাকলে সে মরে যাবে। অগ্নিদেব তার বন্ধু, আর এই আগুনই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সত্যই সময় সময় আগুনের সঙ্গে যেন খেলা করত বুড়ো! বিড়-বিড় করে কি-সব বকত, হাসত, ভেংচি কাটত 'ফার্নেস'টার দিকে চেয়ে। সবাই বলত, 'এই রে, বুড়োর এবার ভীমরতি ধরেছে! মরবে!'

হলও তাই। যে রক্ষক সেই একদিন ভক্ষক হল! নেশার ঘোরে অসাবধানতাবশতঃ বুড়ো একদিন

লোহা গালাইয়ের জ্বলন্ত ধাতুপাত্রের মধ্যে পড়ে নিমেষে কর্পূরের মত উবে গেল। ছ্যাঁক্ করে একটা শব্দ হল কেবল। আর ফার্নেসের উপর থেকে খানিকটা ধোঁয়া চিম্‌নীর ভেতর দিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। হাঁ হাঁ করে উঠল তার ঘরের অন্যান্য লোকেরা। সারা কারখানায় খবর ছড়িয়ে পড়ল চক্ষের নিমেষে। খবর পেয়ে মালিক নিজেই ছুটে এলো গালাইঘরে, কিন্তু তখন সেখানে লসের আর কোন বাষ্পও নেই!

এতদিনের পুরোনো কর্ম্মচারী বুড়ো লসের এই অপঘাত-মৃত্যুতে সবাই মর্ম্মাহত হল। কারখানায় ছুটির বাঁশি বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। মালিক তার সম্মানে কারখানা তখনি বন্ধ করে দিলে। চারিদিকে নানা গল্প চলতে লাগল লসের সম্বন্ধে। ছুটির পর পথ চলতে চলতে কারিগরদের মধ্যে একজন বললে, 'মৃত্যুই ওর ভাল হয়েছে—যার সঙ্গে ওর সারাজীবনের সম্বন্ধ সেই ফার্নেসের মধ্যেই ও মিশে গেছে!'

একজন বললে, 'এই বেশ, এ বয়সে পেটের অসুখে ভুগে মরার চেয়ে এ মৃত্যু অনেক ভালো—হিরোয়িক্ ডেথ!'

দু'তিন দিন ধরে এমনি সব বলাবলি চলতে লাগল পুরোনো কারিগরদের মধ্যে। বুড়ো লসের জয়গানে সবাই পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো।

আসলে বুড়ো একটু-আধটু নেশা-ভাঙ করলেও মানুষ হিসাবে ছিল খাঁটি। বৌ মরে যাবার পর বুড়ো আর গ্রামের বাড়িতে ফিরে যায়নি, এই কারখানায় ঢুকে কারখানাকেই ঘরবাড়ি করে নিয়েছিল। বাড়িতে যদিও তার এক বোম্বেটে ধরণের ছেলে ছিল,—তার সঙ্গে বুড়োর এক তিল বনত না। অবসর সময় কারখানার ছোক্‌রাদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেই বুড়ো কাটিয়ে দিত, তাদের অনেককেই সে ভালবাসত নিজের ছেলের মত। কিছু কিছু নিজের মাইনে থেকে লুকিয়ে দান-ধ্যানও সে করত। সবসুদ্ধ এখানে লস কাজ করেছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। এইসব কারণে কারখানায় শুধু তার সহকর্ম্মীদের নয়, মালিকের পর্য্যন্ত তার মৃত্যুতে দুঃখের সীমা-পরিসীমা ছিল না।

ক'দিন এইভাবে কাটবার পর শোকের বেগ একটু কমলে কারখানার কারিগররা সকলে মিলে তার মৃত-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য কারখানার ভিতরকার খোলা ময়দানে জড় হলো। এ-সব সভায় সাধারণতঃ যেমন সব হয়, তেমনি এখানেও অনেকে লসের গুণাবলী নিয়ে—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি নিয়ে বক্তৃতা করলে। ক'জনের বক্তৃতা হয়ে যাবার পর কারখানার মালিক যখন বক্তৃতা করতে উঠে তার স্মৃতিরক্ষার জন্যে বেশ কিছু টাকা দিয়ে একটি প্রস্তরমূর্ত্তি তৈরি করাবার কথা ঘোষণা করলে, তখন ঘটল এক বিপদ। উপস্থিত জনতার ভিতর থেকে লসের ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ করে বললে, 'আমার বাবার কোন ছবি বা ফটোগ্রাফ্ নেই, কাজেই প্রস্তরমূর্ত্তি করায় অসুবিধা আছে। এই টাকাটা এভাবে খরচ না করে বরং আমাদের দরিদ্র সংসারে দিলে খুব উপকার করা হবে!'

এ কথায় আশপাশের অনেকেই আপত্তি তুললো, কারণ তারা ছেলের চরিত্র জানত এবং বাপের সঙ্গে ছেলের যে কোন সম্পর্ক ছিল না, তাও অজানা ছিল না তাদের। কাজেই তার হাতে একেবারে এ টাকা তুলে দিতে অনেকে আপত্তি জানালে। কিন্তু তার মধ্যেই অনেকে আবার সায় দিলে ছেলের কথায়। সম্ভবতঃ লসের ছেলের কাছ থেকে ঐ টাকার কিছু অংশ পাবে বলে তারা আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

এই নিয়ে সভায় বেশ বাদানুবাদ এবং গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল। একপক্ষ বললে, 'লসের চেহারা আমরা কল্পনা থেকে আঁকিয়ে তা থেকে তার 'ষ্ট্যাচু' করব। সেই 'ষ্ট্যাচু' এই কারখানার মধ্যে থাকবে, এবং প্রতি বছর তার মৃত্যু-দিবসে সকলে আমরা একসঙ্গে সমবেত হব এখানে।'

অপর পক্ষ বললে, 'যে ক্ষেত্রে ফটো নেই, সে ক্ষেত্রে কল্পনা থেকে যা-তা একটা কিছু করা ঠিক হবে না, তার চেয়ে টাকাটা তার গরীব ছেলেকে দিয়ে সাহায্য করাই ভাল।'

দু'দলের মধ্যে এই বাদানুবাদ যখন বেশ তীব্রতর হয়ে উঠেছে, তখন এক অলৌকিক অভূতপূর্ব্ব ঘটনায় সকলেই বিস্ময়াভিভূত হল। সকলের দৃষ্টি গেল আকাশের দিকে। নির্ম্মল নীলাম্বরের বুকের উপর দিয়ে কারখানার চিম্‌নী থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে যে ধোঁয়া উঠছিল, তারই মধ্যে ভেসে উঠেছে বুড়ো লসের মুখ। হাওয়ার বেগে ধোঁয়ার রাশ যেমন ভেসে ভেসে যাচ্ছে, ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, তেমনি মুখখানাও এক একবার ভেঙে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে হাওয়ার সঙ্গে, আবার জোড়া লাগছে এসে! সে মুখ ঠিক জীবন্ত লসের মুখের মত না হলেও, তা থেকে চেনা যায় লসকে। মাংস পুড়ে জড়িয়ে গেলে যেমন হয়, মুখের চেহারা তেমনি পোড়া বীভৎস ভয়াবহ!

সকলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে আকাশের দিকে—সেই ধূম্রকুণ্ডলীর মধ্যে ধোঁয়াটে মুখের দিকে!

কারখানার মালিক ওয়াগ্‌নার বললে, 'এখনি ঐ মুখের একটা ফটো তুলে নেওয়া হোক, ঐ থেকেই মর্ম্মরমূর্ত্তি তৈরি হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে তাই করা হল। আকাশে আলো ছিল তখনও, ছবি তুলতে অসুবিধা হল না। খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে গ্রামের আশপাশ থেকে লোক এসে হাজির হল সেখানে। সকলেই আকাশের গায়ে ঐ অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ভৌতিক দৃশ্য দেখে একেবারে থ! তারপর রাত্রের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বুড়ো লসের ঐ বিকৃত মুখ!

এরপর প্রতি বছরই তার স্মৃতি-বার্ষিকীর দিনে ঐ মুখ আজও নাকি ভেসে ওঠে আকাশের বুকে ঐ চিম্‌নীর ধোঁয়ার মধ্যে। সেদিন হাজার হাজার লোক দূর-দূরান্ত থেকে দেখতে আসে এই দৃশ্য—আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে তারা! তারপর হঠাৎ একসময় সকলকে আশ্চর্য্য, ভীত, সচকিত করে ভেসে ওঠে লসের মুখ—সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে নিঃসাড়ে চেয়ে থাকে সে মুখের দিকে! ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না সেখানে।

[কার্ত্তিক ১৩৬০]

সার্লক হেবো

নারায়ণ সান্যাল

সার্লক হেবোর পরিচয় দিয়ে এই গল্প শুরু করতে হ'চ্ছে বলে আমি নিজেই লজ্জিত। কিন্তু উপায় কি? এখনও যে হেবো যথেষ্ট বড় হয়নি;—তাই তোমরা তাকে চেন না কেউ। বছর দশেক পরে যে হেবোর সামনে অটোগ্রাফের খাতাখানা মেলে ধরে তোমাদেরই ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকতে হবে—সেই হেবোরই পরিচয় দিতে হ'চ্ছে আজ তোমাদের।

হেবো জন্ম-ডিটেকটিভ! বাঙলার ভবিষ্যৎ সার্লক হোমস্। ওর কাকা মাসিক পত্রিকায় ডিটেকটিভ গল্প লেখেন; তাছাড়া ওর মেসোমশাই পুলিসের একজন বড় অফিসার। সুতরাং ছেলেবেলা থেকেই চোর-ডাকাতের অনেক গল্প শোনা ছিল ওর। এরপর ওর মেজদা যখন লাইব্রেরী থেকে লুকিয়ে ডিটেকটিভ উপন্যাস এনে পড়তো—তখন মেজদাকে লুকিয়ে সেগুলি একের পর এক শেষ করেছিল হেবো। অসংখ্য গোয়েন্দাগিরির গল্প পড়ে পড়ে চোর-ধরা ব্যাপারটা হেবোর কাছে জলবৎ-তরল হ'য়ে গেছে। ছেলেটার মাথা খুব পরিষ্কার;—হেডমাস্টার মশাই বলেন, মন দিয়ে পড়াশুনা করলে ও নিশ্চয়ই ক্লাসে ফার্স্ট হ'ত। কিন্তু হেবোকে যেন ভূতে পেয়েছে। পাস করার জন্য যেটুকু দরকার শুধু সেটুকু সম্পর্কই সে বজায় রেখেছে বইখাতার সঙ্গে। বাকি সময় সে মেতে থাকে তার গোয়েন্দাগিরির মালমসলা নিয়ে। ডিটেকটিভ-সুলভ সব কটি গুণই আছে হেবোর। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি, অনুসন্ধিৎসা, সূক্ষ্ম যুক্তির বিশ্লেষণ, সাহস আর ধৈর্য। এ কাজের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম সে একে একে যোগাড় করেছে। নোট বই, ডায়েরী, মেজদির সেলায়ের কল থেকে উদ্ধার-করা একটি ছেঁড়া মাপবার ফিতে, কার যেন একটি বাতিল-করা চশমার মোটা লেন্স। নোট বইতে হেবো সময়ে-অসময়ে অনেক কিছু টুকে রাখে। কোন সমস্যার "ক্লু" হঠাৎ কিভাবে আবিষ্কার হবে তা কি আগে থেকে কেউ বলতে পারে? মেজদা ঐ নিয়ে কত ঠাট্টা করে হেবোকে। বলে, হেবোর নোট বইতে নাকি সবই আছে, শুধু লেখা নেই—"পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া, কেমন ক'রে ঠেকাব তায়!"

হেবো জবাব দেয় না। সে জানে একদিন না একদিন তারও সুদিন আসবে।

সুযোগ এসে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। হেবোর মেজদির বিয়ে হয়েছিল মাস কয়েক আগে। পূজোর সময় মেজদির শ্বশুরবাড়ি তত্ত্ব যাবে। বাবা আর কাকা বাজার উজাড় করে জিনিসপত্র কিনে আনলেন। গোল বাধলো জুতো জোড়া নিয়ে। মা বলেন, "জুতোটা মনে হ'চ্ছে খুকির পায়ে বড় হবে।"

মেজদা সেটা নেড়ে-চেড়ে বলে, "বড় নয় মা, ছোট হবে—এই দেখ আমার পায়েই ছোট হচ্ছে।"

ক্রমে দেখা গেল আন্দাজে কেনা জুতার মাপ সম্বন্ধে বাবা-কাকা-কাকীমা-মা-মেজদা কেউই স্থির-নিশ্চয় হ'তে পারছেন না। মেজদা হেসে বলে—"সার্লক হেবো কি বলেন?"

এই সুযোগ! হেবো উঠে গেল, একটু পরে ফিরে এল তার নোট বই নিয়ে। তার পাতা খুলে দেখিয়ে দেয়—বিয়ের সময় মেজদির জুতো এসেছিল তার মাপ লেখা আছে নোট বইতে। হেবো বলে, "আমি আন্দাজে কোনও কথা বলি না। আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। জুতো জোড়া মেজদির পায়ে ঠিকই হবে।"

কাকা বলেন—"ভাগ্যিস্ হেবোর নোট বইটা ছিল।"

হেবো গর্বের হাসি হাসল শুধু। মুখে কিছু বলল না।

ক্লাসের ছেলেরা, পাড়ার বন্ধুরা মায় বাড়ির সকলেই মেনে নিয়েছে যে হেবো একটা হবু-গোয়েন্দা। একমাত্র মেজদাই সেটা মেনে নিতে রাজী নয়। মেজদা হেবোর চেয়ে আড়াই বছরের বড়ো—এবার ম্যাট্রিক দেবে। ওর গোয়েন্দাগিরিটা মেজদা দু' চোখে দেখতে পারে না। তার মতে এসব হেবোর নেহাতই ছেলেমানুষী। ঠাট্টা ক'রে মেজদাই ওর নামকরণ করেছে 'সার্লক হেবো'। হেবোর তাতে দুঃখ নেই। সে জানে ঐ বিদ্রূপের নামই সে একদিন সার্থক ক'রে তুলবে। ঐ নামই হবে তার গৌরবের পরিচয়। তাছাড়া মেজদা যে কেন এতটা চটেছে তাও তো অজানা নেই তার। সে একটা ভারি মজার কথা! আচ্ছা, তাহ'লে সেই গল্পটাই করি আগে।

পৌষ-সংক্রান্তির আগের দিন। মা, কাকীমা আর মেজদি মিলে সারা দুপুরটা ধরে নানারকম পিঠে তৈরি করেছেন। হেবোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুই এড়িয়ে যায়নি। গোকুল পিঠে, রসবড়া, পুলি-পিঠে আর সরু-চাকলি। সত্যকে হেবো অস্বীকার করতে চায় না—লোভ তার কিঞ্চিৎ হয়েছিল। কিন্তু তাই ব'লে হ্যাংলার মতো চাইতে তো পারে না। হেবো সেজন্যে অন্য যুক্তির অবতারণা করেছিল, বলেছিল মেজদিকে—"আরে একটির পর একটি তৈরি তো করে যাচ্ছ মেজদি—একটু টেস্ট ক'রে দেখা তো উচিত.......মানে ঠিকমতো রস ঢুকছে কিনা।'

কাকীমা হেসে ফেলেছিলেন। তবু হয়তো দুটো রসবড়া ওকে পরখ করতে তুলে দিতেন, কিন্তু মা-মেজদির ভোটাধিক্যে তার প্রস্তাবটা পাস হ'ল না। মা বলেন, "আর পরখ করতে হবে না—এইমাত্র তো তোর মেজদা চেখে গেল।"

অগত্যা হেবো চুপ ক'রে যায়।

রাত্রে শুয়ে বার বার ঐ পিঠেগুলোর কথাই মনে হয়েছে তার—ঘুম আসার আগে পর্যন্ত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সে স্বপ্ন দেখলো পুলি-পিঠেগুলোর গায়ে লেত্তি জড়িয়ে মেজদা গচ্ছা-গচ্ছি খেলছে! হঠাৎ হেবোর ঘুম ভেঙে গেল। শুনলে, ভাঁড়ার-ঘর থেকে কেমন যেন একটা সন্দেহজনক আওয়াজ উঠছে। মনে হচ্ছে বাসনপত্র সরানোর শব্দ। কিছুদিন আগেই পাড়ায় মিঠুয়াদের বাড়িতে চুরি হ'য়ে গেছে। সে চুরির কিনারা হয়নি। পুলিসে এসে খামোকা মিঠুয়াদের নতুন চাকরটাকে ধরে নিয়ে গেছে—কিন্তু কোনই সুরাহা হয়নি। হবে কোথা থেকে—হেবো নিজেই সে চুরির কোন কূল-কিনারা করতে পারেনি—থানা-পুলিসে কি করবে? বাসন সরানোর আওয়াজ শুনেই ব্যাপারটা বুঝে ফেললে হেবো। জন্ম-ডিটেকটিভ সে! লাফিয়ে নামলো খাট থেকে। ধরতেই হবে বাছাধনকে এবার। পা টিপে টিপে সাহসে ভর ক'রে এগিয়ে গেল সে ভাঁড়ার-ঘরের দিকে।

পাগ্‌লা দাশুদের স্কুলে একবার একজন লোক চোর ধরতে গিয়ে বেড়াল ধরে অপ্রস্তুত হয়েছিল। হেবো সে ভুল করবে না। অতি সন্তর্পণে সে উঁকি দিলে ভাঁড়ার-ঘরের মধ্যে। অন্ধকার ঘর—তবু একটি গোটা মানুষ যে ঘরের ভিতর আছে এটা বোঝা যায়। একটি মোড়ার উপর দাঁড়িয়ে সে যেন কি পাড়ছে উপর থেকে। আর কি? বাসনপত্র নিশ্চয়ই। হেবো সাবধানী; সে জানে চেঁচিয়ে উঠলে অথবা আলো জ্বাললে—চোর তাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাবে। ওদের কাছে মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রও থাকে। ছেলেমানুষকে কাবু করা ওদের পক্ষে মোটেই শক্ত নয়,—কিন্তু বয়সে ছোট হ'লে কি হবে, হেবো যে ওকে কাবু করবে বুদ্ধির জোরে। আর মুহূর্ত দেরী না ক'রে হেবো চট ক'রে তুলে দেয় ভাঁড়ার-ঘরের শিকলটা। তারপরই তার গগন-বিদারী চিৎকার—চোর! চোর! চোর!

ছুটে এলো বাড়িসুদ্ধ সবাই। বাবা, মা, কাকা-কাকীমা—মায় ছট্টু সিং, বামুনদি! লাঠিটা বাগিয়ে ধরে ছট্টু সিং খুলে দিলে ভাঁড়ার-ঘরের শিকল!

বের হ'য়ে এলেন রসবড়ারসাপ্লুত মেজদা!

সে অপমান মেজদা ভুলতে পারেনি। পারবেও না জীবনে। তাই হেবোর উপর তার যত আক্রোশ। হেবো ভ্রূক্ষেপ করে না। চোর সে ঠিক ধরেছিল তো। বাসন চোর না হ'ক্ রসবড়া চোর তো বটেই!

কিন্তু যে ঘটনার পর থেকে হেবো গোয়েন্দা হিসাবে সকলের কাছে স্বীকৃতি পেল এবার সেটাই বলব তোমাদের কাছে।

সেবার পুজোর ছুটিতে হেবোর বাবা সপরিবারে কাশীতে বেড়াতে যাবেন স্থির হ'ল। হেবোর স্ফূর্তি দেখে কে! রেলগাড়ি খোলা প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে হু হু ক'রে ছুটছে—আর জানালায় মাথা দিয়ে বসে আছে হেবো—এটা ভাবলেই একটা শিহরন লাগে। স্থির হ'ল, বাবা-মা-মেজদা আর হেবো যাবে। কাকা, কাকীমাকে নিয়ে যাবেন মালদায়—তাঁর বাপের বাড়ি। ছট্টু সিং থাকবে বাড়ির তদারকে। হেবো তাকে নানারকমভাবে তালিম দিয়ে দিল—খালি বাড়ি কিভাবে পাহারা দিতে হবে।

তারপর স্কুলের ছুটি হ'লে নির্দিষ্ট দিনে ওরা এল একদিন হাওড়া স্টেশনে। আলোয় আলো হাওড়া স্টেশন। দেরাদুন এক্সপ্রেসটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে। অসম্ভব ভিড় হয়েছে পুজোয়। ওদের কামরায় অবশ্য ভিড় মোটেই হয়নি। রিজার্ভ-সীটের কম্পার্টমেন্ট। অর্থাৎ কামরাটায় যতগুলো বসবার সীট আছে ঠিক ততগুলো রিজার্ভেসন টিকিট বিক্রি করা হয়েছে যাত্রীদের। হেবো লক্ষ্য ক'রে দেখে—কামরাটায় লেখা আছে 'বারোজন বসিবেক'। গুণে দেখলো বাস্তবিক বারোজন লোকই আছে ঘরে। কিন্তু তার পরেই লক্ষ্য হ'ল আর একটি বিজ্ঞপ্তি 'চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে'।

আপন মনেই হাসলে হেবো। কী বুদ্ধি রেল কোম্পানির বড় কর্তাদের! আরে বাপু, চোর-জুয়াচোর আর পকেটমারেরা যে নিকটেই আছে, এই সাধারণ কথাটা কি জানে না হেবো? তাহ'লে ওভাবে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দেবার মানেটা কি? যাই হোক সাবধান সে প্রথম থেকেই হ'য়ে আছে। স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে লক্ষ্য করতে থাকে সব যাত্রীদের। সকলেই কিছু চোর-জুয়াচোর নয়,—কিন্তু বিজ্ঞপ্তি যখন দেওয়া হয়েছে তখন নিশ্চয় চোর-জুয়াচোরও আছে ওদের মধ্যে। কে হ'তে পারে? অধিকাংশই পশ্চিমা লোক। ওরা ছাড়া আর একটি মাত্র বাঙালী পরিবার বসেছেন সে গাড়িতে। কর্তা-গিন্নী আর দু'টি ছেলেমেয়ে। ওপাশের দূরের ঐ সাধুবাবার উপর কেমন সন্দেহ হয়। ওর দাড়িটা নকল নয় তো? সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ কখনও আগে থেকে সীট-রিজার্ভ করিয়ে রাখে? ও কেমন জাতের সাধু তাহ'লে? তাছাড়া মাঝের বেঞ্চির ঐ পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি? তিনিই বা এই রাত্রে চোখে গগল্‌স দিয়ে আছেন কোন শুভ উদ্দেশ্যে? এঁরও দাড়ি আছে—তার উপর পাগড়ি।

হেবোরা বসেছিল একেবারে একটি কোনা ঘেঁসে। জানালার ধারে। সেখান থেকে সবকিছুই বেশ নজর করা যায়। বর্ধমানে গাড়ি দাঁড়ালো—এ পাশের মারোয়াড়ী ভদ্রলোক সীতাভোগ কিনলেন। আসানসোলে মধ্যরাত্রে উঠলো অনেক লোক। শিখ ভদ্রলোক 'রিজার্ভ কামরা' বলে হাঁকাহাঁকি করলেন; তা সত্ত্বেও লোকে জোর ক'রে উঠলো। একজন পশ্চিমা চাপদাড়ি মুসলমান ভদ্রলোক উঠলেন। গায়ে ঘুন্টি দেওয়া মেরজাই—মাথায় কাজ-করা সাদা টুপি। মেজদা বসেছিল বেঞ্চির ও প্রান্তে। তাকে ঠেলেঠুলে ভদ্রলোক বসবার উপক্রম করতেই মেজদা তার বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—"একদম জায়গা নেই দেখতে পারতা নেই—মানুষকা গায়ের উপর জোর করকে বসেগা নাকি রে বাপু!"

ভদ্রলোক সবিনয়ে নিবেদন করেন, "জেরা মদৎ তো করো ভাইসা'ব, ঔর এক মুশাফির ইনসান কে লিয়ে কফি জগাহ হো সক্তা।"

এই সময় শিখ ভদ্রলোক চট ক'রে তাঁর সুটকেসটি নিয়ে নেমে গেলেন। ফলে হেবোর মেজদাকে আর 'মদৎ' করতে হ'ল না—চাপদাড়ি ভদ্রলোক মাঝের বেঞ্চির খালি আসনটি দখল করলেন। আরও যারা উঠেছিল এই স্টেশনে তাদের দাঁড়িয়েই থাকতে হ'ল। শুধু একজন ফতুয়া-পরা ভোজপুরী দেহাতি লোক তার বিশাল বপুটি টেনে নিয়ে উঠে গেল বাঙ্কে। গাড়ি আসানসোল ছাড়লো।

আবার বসে বসেই ঢুলতে শুরু করেছে সবাই। কেউ কেউ বই পড়ছে সেই আধা অন্ধকারে। চাপদাড়ি ভদ্রলোক টেনে নিয়েছেন অবিনাশবাবুর আনন্দবাজারখানা। হেবো দেখলো ওর বাবারও চোখ দুটি বোঁজা। ওর ঘুম আসছিল না। তাছাড়া আজ রাত্রে সে ঘুমোবে না—ঘুমোনো উচিতও নয়। এই সুযোগে পকেট থেকে সন্তর্পণে বার ক'রে "হত্যাকারী কে?" পড়তে থাকে একমনে।

বই পড়ছে বটে কিন্তু নজর সে ঠিকই রেখেছে সকলের উপর। শোবার জায়গা বস্তুতঃ কেউই পায়নি; একমাত্র বাঙ্কের উপর ঐ ভোজপুরীটা ছাড়া। অন্য সকলেই বসে বসে ঢুলছে। নাক-ডাকার আওয়াজ আসছে বাঙ্কের উপর থেকে। বারবারই হেবোর নজর যাচ্ছে ঐ বিজ্ঞপ্তিটার উপর 'নিজে টিকিট কেন, মালের উপর নজর রাখ'—'চোর জুয়াচোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।'

জেগেই সে কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছিল রাতটা; কিন্তু ওরই ভিতর কখন ঢুলুনি এসেছে একটু। হঠাৎ একটি বিকট শব্দে চম্‌কে জেগে ওঠে হেবো। গাড়ি তখন একটি টানেলের মধ্য দিয়ে চলেছে। টানেলেরা গুমগুম শব্দেই ওর ঘুম ভেঙে গেছে। নাঃ, ভয়ের কিছু নেই। তাদের মালপত্র সব ঠিকই আছে। ঘুমোচ্ছে সবাই। শুধু বাঙালী ভদ্রলোকটি জেগে আছেন। আর আসানসোল থেকে ওঠা সেই চাপদাড়ি ভদ্রলোকটি—যিনি মেজদাকে স'রে বসতে বলেছিলেন তিনিও জেগে আছেন—খবরের কাগজটা দেখছেন। সাধুবাবাও অবশ্য জেগে আছে—গঞ্জিকা সেবনে ব্যস্ত। এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমালো হেবো।

* * * *

একটা হট্টগোলে ঘুম ভেঙে গেলো হেবোর। গাড়ি তখন দাঁড়িয়ে আছে গয়া স্টেশনে। ভোর হয় হয় আর কি। অবাক চোখে হেবো দেখে কামরাতে উঠেছে দু'জন ইউনিফর্মধারী পুলিস। আরও দু'জন পুলিস অফিসার জাতীয় লোকও উঠেছেন কামরায়। ঐ দিককার বেঞ্চিতে যে বাঙালী ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গে ওঁদের কি যেন কথা কাটাকাটি হচ্ছে।

ভদ্রলোক বলছেন, "কেন মশাই, বাঙালী হ'য়ে জন্মেছি বলেই কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি?"

পুলিস অফিসারটি বলছেন, "আহা আপনি রাগ করছেন কেন? আমি তো শুধু আপনার নামটাই জানতে চেয়েছি। আমাদের খবর হচ্ছে যে আফিং চোর বাঙালী, তাই জিজ্ঞাসা করছি—কই অবিনাশবাবু তো রাগ করেননি।"

হেবো বুঝলো এর আগে তার বাবাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি? একটু চেষ্টা ক'রেই ব্যাপারটা জেনে ফেললে সে। এরা হচ্ছে সব আবগারি পুলিস—মানে মদ, গাঁজা, আফিং ইত্যাদি চোরাকারবার ধরে বেড়ায়। ওরা নাকি খবর পেয়েছে—এই ট্রেনে একজন অফিঙের চোরা-কারবারী এক সুটকেস আফিং নিয়ে পালাচ্ছে। লোকটি বাঙালী—সুটকেস তার সঙ্গেই আছে। দ্বিতীয় অফিসার প্রথম জনকে বললেন—"এঁদের আর মিথ্যে কেন হয়রানি করছ বোস? এঁরা সব ভদ্রলোক—আমার মনে হয় এই কামরা থেকে আসানসোলে যে শিখটি নেমে গেল—সেই যে গগল্‌স পরা ছোকরা হে—সেই হচ্ছে গিয়ে আসল ঘাগী। যেটি শিখ সেজে চোখে ধুলো দিয়ে গেল।"

বোসসাহেব বলেন—"আমারও তাই মনে হয়।"

—"তাহ'লে আর এঁদের মিথ্যা হয়রানি করছ কেন? চল যাই।"

—"চলো।"

দু'জন অফিসারই নেমে এলেন প্ল্যাটফর্মে। হেবো কামরার সকলকে এক নজর দেখে নিল। গণ্ডগোলে সবাই উঠে পড়েছে—একমাত্র ব্যাঙ্কের উপরের ভোজপুরীটা তখনও পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে। মেজদা হেবোকে কনুই-এর একটা গুঁতো মেরে বলে, "সার্লক হেবো একটু এনকোয়ারি ক'রে দেখলে হ'ত না?"

হেবো জবাব দেয় না। সে তখন গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। একমনে কিসের যেন হিসাব করছে চোখ বুঁজে। তারপর একেবারে হঠাৎ জানালা গ'লে লাফ দিলে সে প্ল্যাটফর্মে। হাঁ হাঁ ক'রে উঠলো সবাই। পুলিস অফিসার দু'জন ছুটে এসে ওকে ধরে ফেললেন; বলেন, "পড়ে গেলে কি ক'রে খোকা?"

—"খোকা নয়, আমার নাম হেবো। সার্লক হেবো। আর পড়ে আমি যাইনি। ঝাঁপ দিয়েছি মাত্র। বিপদে ঝাঁপ দেওয়াই আমার স্বভাব। সে যাক্। আপনারা ভুল করেছেন। আফিং চোর এই কামরাতেই আছে। আসুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

হেবোর বাবাও নেমে এসেছেন তখন। পুলিস অফিসার হেবোকে তার বাবার জিম্মায় পৌঁছে দিয়ে বলেন, "আপনার ছেলে? নিন! ছেলেটিকে একটু সাবধানে রাখবেন।"

হেবো চিৎকার ক'রে উঠলো—"আমার কথা বিশ্বাস করছেন না আপনারা?"

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন অবিনাশবাবু—"কী পাগলামি করছিস্ হেবো!"

কিন্তু দ্বিতীয় অফিসারটি হঠাৎ বলে বসেন, "বেশ তো দেখাই যাক্ না ও কি বলতে চায়। কি বলছ খোকা? কে আফিং নিয়ে যাচ্ছে বলতো?"

হেবো গট্‌গট্ ক'রে কামরায় ফিরে এসে বলে, "আফিং নিয়ে পালাচ্ছেন ইনি।"

অম্লান বদনে হেবো দেখিয়ে দিল মাঝের বেঞ্চির সেই আসানসোল থেকে ওঠা মুসলমান ভদ্রলোকটিকে। তাজ্জব কাণ্ড! হেবোর বাবা আর সামলতে পারেন না নিজেকে। হেবোর কানটা ধরে একটা থাপ্পড় বসাতে যাবেন তার আগেই ঘটল একটা কাণ্ড। আবগারি অফিসার ঐ পশ্চিমী চাপদাড়ি ভদ্রলোকটির দিকে এক পা অগ্রসর হ'তেই লাফ দিয়ে বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর চট্ ক'রে সে পকেট থেকে বার ক'রে ফেললে একটা কালো মতন জিনিস। কানে প্রচণ্ড টান পড়েছে—তবু হেবো বুঝতে পারে জিনিসটা কি! রহস্য-লহরী সিরিজের অনেক বইয়ে ছবি দেখা ছিল তার।

মুসলমান ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলায় বলে, "আমাকে ধরবার চেষ্টা করলে খুলি উড়িয়ে দেব আমি। ছ'টা গুলি ভরা আছে এতে—ছ'জনকে না মেরে ধরা আমি দেব না। দরজা ছেড়ে দাঁড়াও সকলে।"

ঘরে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা। নিঃশব্দতার ভিতর একমাত্র শোনা যায় বাঙ্কের ওপর থেকে নিদ্রিত ভোজপুরীর নাসিকাধ্বনি।

ট্রেন হুইসিল দিল। পরমুহূর্তেই লোকটি চেঁচিয়ে ওঠে—"সরে যাও সকলে।"

হ্যাঁচকা টান পড়লো ইঞ্জিনের। গাড়ি ছাড়লো। ঐ ট্রেনের হ্যাঁচকা টানেই বোধহয় বাঙ্কের উপর থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ভোজপুরীর ঘুমন্ত আড়াইমণি দেহখানি একেবারে লোকটির মাথার উপর। দু'জনেই পড়লো উল্টে। আর এই সুযোগে একজন পুলিস টেনে দিয়েছে অ্যালার্ম চেনটা!

বলতে যতক্ষণ লাগলো, তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি ঘটেছে ঘটনাটা। হুম্ড়ি খেয়ে পড়া মানুষটা যখন ফের উঠে দাঁড়ালো তখন পশ্চিমা ভদ্রলোকের হাতে উঠেছে হ্যাণ্ডকাফ, আর রিভলভারটি চলে এসেছে ভোজপুরীর বজ্রমুষ্ঠিতে। এত অতর্কিতে ব্যাপারটা ঘটে গেল যে সামান্য পুলিস অফিসার দু'জন তো বটেই এমন কি হেবো পর্যন্ত তাজ্জব! ভোজপুরী তাঁর পাকা গোঁফ জোড়া খুলে ফেলতেই অফিসার দু'জন একসঙ্গে বলে ওঠেন, "স্যার! আপনি?"

ভোজপুরী-বেশী আবগারি পুলিসের বড়কর্তা বললেন, "হ্যাঁ আমিই। আসানসোল থেকে ওকে ওয়াচ করতে করতে আসছি। আর তুমি বোস,.....তুমি এতবড় ঈডিয়ট যে শুধু বাঙালী ধরে ধরে নাম জিজ্ঞাসা করছিলে?"

বোসসাহেব মাথা চুল্‌কে বলেন, "না স্যার,..... ইয়ে.....এ খোকা শুধু আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে, মানে......"

লাফ দিয়ে ওঠে হেবো। তার কান আগেই বন্ধনমুক্ত হয়েছিল। বলে, "খোকা নয়, বলুন হেবো—সার্লক হেবো! আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার অভ্যাস সার্লক হেবোর নেই। আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

ভোজপুরী-বেশী বড়সাহেব ওর পিঠে একখানা হাত রেখে বলেন, "বলো তো ভাই, কি ক'রে বুঝলে?"

"বলছি!"—হেবো উঠে দাঁড়ালো বেঞ্চির উপর। হাফ প্যান্টের দুই পকেটে দুটো হাত চালিয়ে দেয় (ঠিক ঐ ভঙ্গিতে সার্লক হোমসের একটি ছবি দেখেছিল হেবো, অবশ্য তাঁর মাথায় ছিল চোঙার মত লম্বা টুপি আর মুখে পাইপ)। গম্ভীরভাবে বলে, "রেল কোম্পানির ঐ বিজ্ঞপ্তিটা হাওড়া স্টেশানেই

আমার নজরে পড়ে 'চোর-জুয়াচোর, পকেটমার নিকটেই আছে।' তখন থেকেই আমি সকলকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছি। তারপর লক্ষ্য করি লেখা আছে 'নিকটেই আছে'। আমার প্রথম সন্দেহ হয়েছিল ঐ সাধুবাবার ওপর। কিন্তু ও তো আমার নিকটে নেই—ও আছে অনেক দূরে।"

এবার হো হো ক'রে হেসে ওঠেন সবাই। বোসসাহেব বললেন, "দেখলেন স্যার। খোকার কাণ্ড!"

বড়সাহেব কিন্তু তখনও শুনতে চান, বলেন, "কিন্তু তোমার কাছে তো অনেকই ছিল, হঠাৎ ওকেই বা দেখলে কেন?"

"বলছি। আমি লক্ষ্য করলাম উনি আসানসোলে ওঠেন কামরাতে। উঠেই উনি মেজদার পাশে বসতে গেলেন। যে ভাষায় মেজদাকে সম্বোধন করলেন উনি তার বিন্দু-বিসর্গও বোঝেনি মেজদা; মেজদা যে কিছুই বুঝতে পারেনি তা জানতে পারলাম মেজদার বোকা-বোকা ক্যাবলামার্কা চাহনিতে (এখন অবশ্য মেজদা যেভাবে তাকাচ্ছে তাকে অগ্নিদৃষ্টি বলা উচিত)। তখনও কিন্তু উনি সরল ভাষায় কিছু বললেন না। বাঙলা দেশে পশ্চিমারা মেজদার মতো ছেলেমানুষের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলার চেষ্টা ক'রে সেটা হ'চ্ছে হিন্দি আর বাংলার একটি খিচুড়ি ভাষা। কাবুলীওয়ালার 'খোঁকি তুমি শোশুর বাড়ি যাবিস্?' জাতীয় ভাষা। কিন্তু ইনি বল্লেন খাঁটি হিন্দি অথবা চোস্ত উর্দু। বুঝলাম ইনি বাংলা ভাষা একেবারেই জানেন না। তারপরেই লক্ষ্য করলাম ইনি বাবার আনন্দবাজার পত্রিকাখানা টেনে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। যেহেতু উনি বাংলা ভাষা জানেন না—সুতরাং সিদ্ধান্ত উনি ছবি দেখছিলেন। বেশ কথা। কিন্তু শেষ রাতে গাড়ি যখন টানেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে দেখা গেল তখনও উনি বাংলা খবরের কাগজ দেখছেন। আসানসোল থেকে গ্র্যান্ড-কর্ড-লাইনের টানেল অন্ততঃ দু'তিন ঘণ্টার পথ। এতক্ষণ ধরে কেউ খবরের কাগজে ছবি দেখে না। সিদ্ধান্ত—উনি আনন্দবাজার পত্রিকাখানা পড়ছিলেন। তাহ'লে সবটা মিলিয়ে কি দাঁড়ালো? ইনি বাংলা ভাষা জানেন, কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। ইনি বাংলা খবরের কাগজ পড়তে পারেন অথচ বাঙালী-বাচ্চার সঙ্গে কথা বললেন উর্দুতে। সম্ভবতঃ ইনি বাঙালী অথচ পশ্চিমার বেশে রেলে ভ্রমণ করছেন। এরপর জানতে আর কি বাকি থাকে—আপনিই বলুন স্যার!"

বোসসাহেবের মুখের হাসি ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে। তাঁর দিকে ফিরে বড়সাহেব ইংরেজিতে বলেন—"আমার ইচ্ছে করছে বোস, এই ছেলেটির কাছে তোমাকে ছয় মাসের জন্যে শিক্ষানবিশীতে পাঠাই।"

আর হেবোর দিকে ফিরে বলেন, "সার্লক হোমস্ তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন—আমি আশীর্বাদ করছি—তুমি তাঁর মতো সার্থক সত্যান্বেষী হও। তবে বড় হ'য়ে যখন কোনান ডয়েল পড়বে তখন জানতে পারবে সার্লক হোমস্ শুধু বড় গোয়েন্দাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অগাধ পণ্ডিত। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং তো বটেই—ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সব বিদ্যাই তাঁকে শিখতে হয়েছিল ভালো ক'রে। সুতরাং বড় গোয়েন্দা হ'তে গেলে—তোমাকে খুব ভালো ক'রে লেখাপড়া শিখতে হবে। কাল রাত্রে তুমি যেমন সকলকে লক্ষ্য করেছ—তেমনি আমিও লক্ষ্য করেছি সকলকে। তাই এর সুটকেসের চোরাই আফিংটার কথাও যেমন টের পেয়েছিলাম আমি—তেমনি তোমার ডান পকেটের ঐ 'হত্যাকারী কে?' গল্পের বইটার কথাও আমার অজানা নয়। যদি জীবনে সত্যিই সার্লক হোমসের মতো বড় হ'তে চাও তাহ'লে ঐ সব বাজে বই পড়া তোমাকে ছাড়তে হবে। যাই হোক, আজকের দিনের সাফল্যের জন্য তোমাকে দিলাম এই সামান্য উপহার।"

নিজের মণিবন্ধ থেকে রেডিয়াম-ডায়াল সোনার ঘড়িটা খুলে তিনি পরিয়ে দিলেন হেবোর হাতে।

[কার্তিক ১৩৬৫]

রামপুরের মানুষ-খেকো

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সেই ছোট্ট, অথচ রীতিমতো রোমাঞ্চকর ঘটনাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম এবং ভুলেই থাকতুম, যদি না গত রবিবার আমার বৃদ্ধ বন্ধু প্রকৃতিবিদ কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের হাতে রাইফেলটা দেখতে পেতুম।

রাইফেলটা খুলে উনি লোশন দিয়ে পরিষ্কার করছিলেন। সামরিক জীবনে তো উনি সাংঘাতিক সব আগ্নেয়াস্ত্র ঘেঁটেছেন। কিন্তু অবসর জীবনে একসময় ওঁর শিকারের নেশা ছিল এবং এই রাইফেলটা তারই নিদর্শন। আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর যে-কর্নেলকে দেখেছিলুম, তিনি তখন শিকারী নন। প্রকৃতিবিজ্ঞানী হয়ে উঠছেন। বিরল প্রজাতির পাখি-প্রজাপতি-অর্কিডের খোঁজে বনজঙ্গল পাহাড়-পর্বত—যত রকমের দুর্গম জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তবে—নাঃ! শিকারী নন বলাটা ঠিক হবে না। কর্নেল তখন অপরাধীদের শিকার করার সুযোগ পেলেই তাদের পিছনে ছোটাছুটি করেন।

তো সেদিন কর্নেলকে রাইফেলটা পরিষ্কার করতে দেখে বললুম—কী ব্যাপার? আবার কি বন্যজন্তু শিকার করতে বেরুবেন নাকি? আপনার জানা উচিত, এখন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের আইন খুব কড়া।

কর্নেল হাসলেন।—জয়ন্ত! এই রাইফেলটা দেখে তোমার কি মনে পড়ছে না রামপুরের জঙ্গলে সেই অদ্ভুত মানুষ-খেকো বাঘটার কথা?

অমনি ঘটনাটা আমার মনে পড়ে গেল।

অনেক বছর আগের কথা। সেবার ডিসেম্বর মাসে প্রচণ্ড শীতের সময় কর্নেলের সঙ্গে রামপুরের জঙ্গলে ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছিলুম। তখনই একটা মানুষ-খেকো বাঘের কথা চৌকিদারের মুখে শুনেছিলুম।

পরদিন সকালে হঠাৎ দেখি পুলিশের জিপে চেপে একজন পুলিশ অফিসার কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কর্নেল আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন। ইনি রামপুর এলাকার পুলিশ সুপার। তাঁর নাম রাজাধিরাজ সিংহ।

মিঃ সিংহের কাছে কর্নেল মানুষ-খেকো বাঘটার খবরাখবর নিলেন। মিঃ সিংহ যা জানালেন, তা সংক্ষেপে এরকম ঃ

ক'দিন আগে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যে হাইওয়ে গেছে, তিনজন লোক সাইকেল চেপে আসছিল, একের পর এক—কেউ পাশাপাশি ছিল না। প্রথম সাইকেলটা বাঁকের দশ গজ দূরে যখন, তখন হঠাৎ বাঁদিকের পাথরের পাঁচিলে একটা বাঘ উঠে আসে। ব্রেক কষবার আগেই যে রাস্তার মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে। তার ফলে সাইকেলের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে। অমনি সে গর্জন করে ওঠে। এদিকে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে ছিটকে সরে আসে, সাইকেলটা পড়ে যায় এবং চাকা ঘুরতে থাকে। পিছনের লোকদুটো কিছু লক্ষ্য করেনি। তাই তারাও এসে প্রথম সাইকেলটার ওপর একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং সামনে বাঘ দেখে লাফ দিয়ে সরে আসে। তিনটে সাইকেলের চাকা বোঁ বোঁ করে তখন ঘুরছে এবং একটা বাঘ ক্ষেপে গিয়ে থাবা মারছে একবার এটায়, একবার অন্যটায় আর প্রচণ্ড গর্জাচ্ছে। অন্যদিকে পাথরের গায়ে সেঁটে তিনটে ভয়-পাওয়া মানুষ কাঠ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে! তাদের পালাবার ক্ষমতাও নেই।

বাঘটা কিছুক্ষণ সাইকেল তিনটের সঙ্গে লড়াই করার পর বিরক্ত হয়েই যেন শেষ ডাক ছেড়ে ডান-দিকের পাঁচিলে লাফিয়ে ওঠে এবং অদৃশ্য হয়। তখন লোক তিনটে ধীরে সুস্থে সাইকেলের কাছে আসে। আশ্চর্য, সাইকেলের কোনো ক্ষতিই হয়নি।

তারা এরপর কী করেছিল বোঝাই যায়। ঘণ্টায় কমপক্ষে পঞ্চাশ-ষাট মাইল বেগে পালিয়ে যাওয়া এক্ষেত্রে স্বাভাবিক। প্রথমেই যে বসতিতে তারা পৌঁছয়, সেখানে হুলুস্থুল শুরু হয়েছিল। কারণ লোকেরা দেখে, তিনটে সাইকেলওয়ালা আচমকা ঝড়ের মতো এসে সাইকেল থেকে লাফ দিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। সাইকেলগুলো আবার চারদিকে ছিটকে পড়ে।

জ্ঞান হলে তাদের মুখে সব জানা যায়। কিন্তু ঘটনার শেষ এখানে নয়। পরদিন সকালে দেখা গেল, সেই বসতির এক বুড়ি উঠোনে পড়ে আছে। ক্ষতবিক্ষত শরীর। বোঝা যায় বাঘটা টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল বুড়িকে—পারেনি। কেন পারেনি কে জানে। কিন্তু পায়ের খানিকটা মাংস খুবলে খেয়ে গেছে।

এরপর দ্বিতীয় শিকারের খবর পাওয়া গেল মাঠের ক্ষেতে। একটা বুড়ো ঘাস কাটতে গিয়েছিল বিকেলে। কিন্তু রাতেও সে ফিরল না। ব্যাপারটা অনুমান করে গাঁয়ের লোক পরামর্শে বসল। কিন্তু রাতের বেলায় সাহস করে কেউ খুঁজতে বের হলো না। পরদিন সকালে দেখা গেল একই দৃশ্য। এবারেও বাঘটা বুকের কিছুটা খেয়েছে—টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। পারেনি।

আজ সকালে ঘটেছে আরেক বীভৎস কাণ্ড। সেই গাঁয়ের মোড়লকে বাঘটা একইভাবে মেরে রেখে গেছে। মোড়লের বাড়ির পিছনে জঙ্গল আছে। তার নিচে ধাপবন্দী পাহাড়ী ক্ষেত। মোড়লকে সম্ভবত শেষরাতে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু এবার বাঘটা ঘরে ঢুকেছিল। ঘর থেকে তাকে টেনে উঠোন পার করে ক্ষেতে নিয়ে যায়। তারপর একইভাবে বুকের খানিকটা খেয়ে রেখে যায়। লাশটা এখনও রয়েছে। কাছেই দু'টো গাছে দু'টো মাচান বাঁধা হয়েছে। কর্নেল এবং মিঃ সিংহ সেখানে বাঘটার আশায় বন্দুক হাতে অপেক্ষা করবেন।

কর্নেল আরও জানালেন, প্রথম ঘটনার পরই সরকারী শিকারীর লাশের কাছে ওঁৎ পেতে রাত জাগেন। কিন্তু বাঘটা আর আসেনি। দ্বিতীয় লাশের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। এ থেকে মনে হচ্ছে, মোড়লের লাশের কাছেও সে আসবে কিনা সন্দেহ। তবে.....

ওঁকে চুপ করতে দেখে মিঃ সিংহ বললেন—তবে কী কর্নেল?

কর্নেল কেমন হেসে বললেন—আমার ধারণা এবার বাঘটা আসার চান্স আছে। অন্তত যদি বুদ্ধিমান বাঘ হয়, তাহলে তো আসা একান্ত উচিত। না এলেই যে সে প্রাণে মারা পড়বে!

আমার দু'জনেই হতভম্ব হয়ে গেলুম। বলেন কী! বাঘটা মড়ির কাছে না এলে মারা পড়বে! এ কী উদ্ভট কথা! মড়ির কাছে এলে তবে না গুলি খেয়ে বাঘ মারা পড়ে। মিঃ সিংহ অবাক হয়ে বললেন—এ হেঁয়ালির মানে কী কর্নেল?

হেঁয়ালি? মোটেও না! বলে কর্নেল ঘনঘন মাথা নাড়তে থাকলেন। একটু পরে বললেন—বুঝলেন না? বাঘ মানুষ-খেকো হয় কেন? যখন শিকার ধরবার স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, তখন বাঘ সবচেয়ে সহজে ধরার মতো শিকার মানুষের ওপর হামলরা করে। এই বাঘটার ব্যাপার-স্যাপারগুলো দেখুন। প্রথম ঘটনা সেই সাইকেল পর্ব। ওই অবস্থায় বাঘ বিরক্ত হয়ে ওদের আক্রমণ করাটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা করেনি। বোঝা যায়, বাঘটার মধ্যে সুস্থতার লেশমাত্র নেই। অর্থাৎ সে ভীতু, কিম্বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিজাত ক্ষমতা তার মধ্যে নেই। এ অবস্থা বাঘের কখন হয়? যখন কোনো কারণে সে শারীরিক কিছু দরকারী ক্ষমতা হারায়। এটা নিছক বার্ধক্যের দরুন না হতেও পারে। বরং কোনো শিকারীর গুলিতে সে স্বাভাবিক তৎপরতা হারিয়ে অক্ষম হয়ে গেছে, কিম্বা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী জন্তুর সঙ্গে যুদ্ধে তা হারিয়েছে। এই বাঘটার প্রথম একটা বৈশিষ্ট্য দেখুন—সে তার মড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ জায়গায় লুকোতে পারে না। অর্থাৎ তার শিকার বইবার ক্ষমতা

নেই। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—সে আর মড়ির কাছে ফেরে না। তার মানে, নিশ্চয় কোথাও মড়ির ওপর বসা অবস্থায় গুলি খেয়েছিল।

মিঃ সিংহ বললেন—তাহলে বলছেন কেন সে মোড়লের মড়ির কাছে এবার ফিরবেই?

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন—না এলে যে খিদের জ্বালায় মরতে হবে ওকে! প্রতিবার মড়ি পেট পুরে না খেয়ে পালাবে নাকি? খিদের জ্বালা বড় জ্বালা। এবার হয় তো সে একটা রিস্ক নেবে।

এই ব্যাখ্যায় মিঃ সিংহ সন্তুষ্ট হলেন কিন্তু আমি হলুম না। এই বুড়ো ঘুঘুকে তো হাড়ে হাড়ে চিনি। ওঁর হেঁয়ালি বোঝার ক্ষমতা কারও নেই।

কথা হলো, আমরা ঠিক সূর্যাস্তের আগে সেই গাঁয়ে যাব এবং মড়ির কাছে মাচানে উঠব। তখনও ঘণ্টা দুই দেরি। আমি গড়িয়ে নিতে গেলুম ততক্ষণ। মিঃ সিংহ সেই ফাঁকে তাঁর জরুরি কয়েকটা ফাইল নিয়ে বসলেন—থানা থেকে লোক এসেছিল। আর কর্নেল বেরোলেন। বলে গেলেন—গ্রামেই অপেক্ষা করব আপনাদের জন্যে। আপনারা টাইমলি চলে যাবেন।

রাইফেল হাতে কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। ওটা ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক। সব কাজ ভালভাবে খুঁটিয়ে না দেখে এগোবেন না। গ্রামে গিয়ে হয়তো বাঘটার সম্পর্কে আরও খবর জেনে নেবেন।

সূর্য ডুবতে ডুবতে আমি আর মিঃ সিংহ জিপে করে যথাস্থানে গেলুম। জিপটা গাঁয়ের কাছারির সামনে রেখে পায়ে হেঁটে আমরা ধাপবন্দী পাহাড়ী ক্ষেত ধরে এগোচ্ছি, হঠাৎ দেখি কর্নেল একটা কাঁটাঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন।

কাছে গেলে বললেন—আসুন মিঃ সিংহ। এস জয়ন্ত ডার্লিং। গুড ইভনিং!

মিঃ সিংহ বললেন—এখানে কী করছেন কর্নেল?

কর্নেল ঝোপে আটকানো একটা কাপড় দেখিয়ে বললেন—এটা পরীক্ষা করছিলুম। মোড়লের জামাটা আটকে আছে। চলুন, মাচানে ওঠার সময় হয়ে গেছে।

লাশটা দেখে আমি শিউরে উঠলুম। আর দ্বিতীয়বার তাকাবার সাহস হলো না। দশ গজ চওড়া পনের গজ লম্বা ছোট্ট ক্ষেতের মধ্যিখানে সেটা পড়ে আছে এক পাশে কাত হয়ে। বীভৎস! তার পশ্চিমে একটা মস্ত নিমগাছ—সেখানে বিশ ফুট উঁচুতে মাচান দেখলুম। কর্নেল বললেন—মিঃ সিংহ, আপনি ওই মাচানে উঠুন। একটা কথা বলে রাখি। আমি শিস না দিলে কিন্তু কোনো প্রলোভনেও গুলি করবেন না—প্লীজ, কথা দিন।

মিঃ সিংহ বললেন—অবশ্যই। কথা দিচ্ছি।

কর্নেল আমার দিকে ঘুরে বললেন—ডার্লিং, তোমাকেই গুলি করার সুযোগটা দিতে চাই। এই নাও রাইফেল। এবার দেখব, তোমার হাতের টিপ কেমন! কিন্তু মনে রেখো, আমি শিস না দিলে তুমিও গুলি ছুঁড়বে না। কথা দাও।

এরপরে তাঁর সঙ্গে আমি পুবদিকের একটা গাছের মাচানে উঠলুম।

কোনোরকম নড়াচড়া চলবে না। চুপচাপ বসে রইলুম। দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠল। সময় কাটতেই চায় না। তারপর আমাদের পিছনে চাঁদ উঠলে স্বস্তি পেলুম। হালকা জ্যোৎস্না গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মড়ির ওপর পড়ল।

আরও কিছুক্ষণ পরে মুড়িটা জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু বাঘের কোনো লক্ষণ নেই। ঝিঁঝিঁ ডাকছে একটানা। অনেক দূরে একবার শেয়াল ডাকল। তারপর আবার সব স্তব্ধ হয়ে গেল। গ্রামের দিকে শেষ আলোটিও নিভে গেল। চোখ জ্বালা করতে লাগল—একদৃষ্টে কতক্ষণ আর তাকিয়ে থাকা যায়! আস্তে আস্তে উত্তেজনা থিতিয়ে একটা ঝিমধরা ভাব জাগল শরীরে। রাইফেলটা অসম্ভব ভারী লাগছিল। একবার হাত-পা ছড়াতে পারলে আরাম পাওয়া যেত। কিন্তু নড়াচড়া করা বারণ।

গ্রামের দিকে সেই সময় কুকুরের ডাক শোনা গেল। কুকুরগুলোর বোকামি দেখে রাগ হচ্ছিল—কারণ ওরা ডাকতে ডাকতে এদিকেই আসছে মনে হচ্ছিল—সাবধানে কর্নেলের দিকে ঘুরলুম। দেখি, তাঁর চোখ দুটো যেন জ্বলছে এবং কখন হুমড়ি খেয়ে বসে কিছু দেখছেন, লক্ষ্য করিনি। কুকুরের ডাক থেমে গেলে কর্নেল নড়ে বসলেন। এটা কি ঠিক হলো? বাঘের চোখ খুব তীক্ষ্ণ। বিন্দুমাত্র নড়াচড়া সে টের পেয়ে যায়। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমাকে আরও অবাক করে কর্নেল দেখলুম পা বাড়াচ্ছেন। এক পা নামিয়েছেন, যেন নামতে যাচ্ছেন। ফিসফিস করে ওঠার আগেই উনি আমার হাঁটুতে চাপ দিয়ে চুপ করার ইঙ্গিত দিলেন। তখন হতভম্ব হয়ে বসে ওঁর কাণ্ড দেখতে থাকলুম। কর্নেল নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে গেলেন। তারপর আর ওঁকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও দেখতে পেলুম না। ব্যাপারটা কী? যেচে বিপদের মুখে পড়তে গেলেন কেন?

হঠাৎ আমার চোখ গেল মড়ির দিকে। কী একটা কালো বস্তু নড়াচড়া করছে ওখানে? তাহলে বাঘটা এসে গেছে! কিন্তু কর্নেলের শিস না শুনলে গুলি করা বারণ। হাত নিশপিশ করতে থাকল। কালো জন্তুটা কিন্তু মড়িতে বসল না। আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। তখন মনে হলো, ওটা তাহলে বাঘ নয়—সম্ভবত হায়েনা অথবা ভালুক। তা যদি হয়, তাহলে বোঝা যাচ্ছে বাঘটার আসা এখন অনিশ্চিত হয়ে গেল।

আমার চোখ ছিল জন্তুটার দিকে। একটু পরে সেটা মড়ির কাছে স্থির হয়ে বসতেই দেখলুম, আমাদের মাচানের তলা থেকে আরেকটা জন্তু হামাগুড়ি দেওয়া মানুষের মতো এগোচ্ছে। চাঁদের আলো এই জায়গায় স্পষ্ট নয়—ছায়া আছে। কিন্তু জন্তুটা যে মড়ির দিকে এগোচ্ছে, তা ঠিক। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে দেখতে থাকলুম।

দ্বিতীয় জন্তুটা মড়ির কাছাকাছি যেতেই প্রথম জন্তুটা যেন লাফ দিয়ে উঠল। সে পালিয়ে যাবার তালে—তার ভঙ্গি দেখেই সেটা বোঝা গেল। কিন্তু অমনি দ্বিতীয় জন্তুটা তার ওপর ঝাঁপ দিল। নির্ঘাৎ মড়ি নিয়ে হায়েনা আর ভালুকে লড়াই বাধল।

কিন্তু সেই মুহূর্তে কর্নেলের চিৎকার শুনলাম, আর টর্চও জ্বলে উঠল। কর্নেল ডাকছিলেন—মিঃ সিংহ! জয়ন্ত! চলে এসো! বাঘ ধরেছি!

বাঘ ধরেছেন! আমি মাচান থেকে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নেমে গেলুম। মিঃ সিংহও ততক্ষণে এসে পড়েছেন। হাতে টর্চ। গিয়ে দেখি, যে দুটো কালো জিনিসকে জন্তু ভেবেছিলুম—তা মানুষ এবং প্রথম জন্তুটা একজন অচেনা মানুষ, দ্বিতীয় জন্তুটা স্বয়ং কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। লোকটাকে উনি জাপটে ধরে আছেন—লোকটার হাতে একটা বড় ছোরা। হাতদুটোসুদ্ধ ধরে কর্নেল ওকে বেকায়দায় ফেলেছেন।

মিঃ সিংহ ছোরাটা কেড়ে নিয়ে হুইসেল বাজিয়ে দিলেন। অমনি গাঁয়ের দিক থেকে টর্চ জ্বেলে কারা সব দৌড়ে এল। ধুপধাপ শব্দ শুনে বুঝলুম, সবাই পুলিশ।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কোথায় ম্যান-ইটার? এ যে নিতান্ত মানুষ!

বাংলোয় ফিরতে রাত একটা বেজেছে। ফেরার পর কর্নেল বললেন—জয়ন্ত কী খুব হতাশ হলে? বাঘের বদলে মানুষ! আই অ্যাসিওর ইউ ডার্লিং, এরপর তোমাকে সত্যিকারের মানুষ-খেকো বাঘ মারার চান্স দেব। প্লীজ, রাগ করো না।

আমি গুম হয়ে থেকেছি সারাক্ষণ। এবার বললুম—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

কর্নেল বললেন—সামান্য। এ আমার বরাত জয়ন্ত। যেখানে যাব, খুন আর খুনী এসে আমার ঘাড়ে পড়বেই। এই দেখ না—ম্যান-ইটার মারবো বলে আসর জাঁকিয়ে বসলুম এখানে। অথচ এখানেও সেই খুন আর খুনী!

এই বলে কর্নেল সব হেঁয়ালির সমাধান করলেন। সংক্ষেপে তা বর্ণনা করছি। তিনটি সাইকেলের

সঙ্গে একটা খেয়ালী বাঘের সংঘর্ষ থেকেই এই খুনী লোকটার মাথায় মতলব খেলেছিল। সে হতভাগ্য মোড়লের একজন পুরনো শত্রু। জমিজমা নিয়ে বিবাদ ছিল। মামলায় হেরে সে ভূত হয়েছিল। কিন্তু মোড়লকে খুন করার সুযোগ পাচ্ছিল না। কারণ মোড়ল খুন হলেই তার ওপর স্বাভাবিক দায় পড়বে খুনের। সবাই জানে এই শত্রুতার কথা। অতএব সে সাইকেল ও বাঘের সংঘর্ষ থেকে মতলব আঁটল। কিন্তু প্রথমেই মোড়লকে খুন করলে পাছে কেউ কিছু সন্দেহ করে বসে—তাই সে অন্য রাস্তা নিল। এই ধূর্ততার কোনো তুলনা হয় না।

প্রথমে খুন করল এক নিরীহ বুড়িকে। ঠিক বাঘে ধরার মতো চিহ্ন রাখল। ছুরি দিয়ে এমনভাবে খুনটা করল যে বাঘের নখ ও দাঁতের দাগ বলে সবার মনে হবে। মড়ি টেনে নিয়ে যাবার চিহ্নও রাখল। দ্বিতীয়বার খুন করল একই ভঙ্গিতে। তারপর তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য মোড়লকে খুন করতে আর অসুবিধে হলো না। কারণ ততদিনে মানুষ-খেকো বাঘের খবর রটে গেছে। শিকারীরা এসেছে। মাচানে বসেছে। আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেছে। অতএব মোড়লকে মারতে আর অসুবিধে নেই।

কিন্তু কর্নেলের চোখ তীক্ষ্ণ। প্রথমেই তিনি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে অবাক হলেন। কোনো মড়ির আশেপাশে বাঘের পায়ের দাগ নেই কেন? মোড়লের মড়িটা তিনি হাতেনাতে দেখলেন, অন্য দুটো দেখার সুযোগ পাননি। মড়ি পরীক্ষা করেই ওঁর সন্দেহ বেড়ে গেল। মাথার খুলি দু-ফাঁক হয়েছে। এটা বাঘের থাবায় হতে পারে না। চুলে রক্ত জমাট হয়ে আছে। কিন্তু বুকে বা পেটে যে সব জায়গায় আঘাত আছে, তার কাছে কোথাও রক্ত নেই। আঘাতের মধ্যেও রক্ত নেই। তার মানে মড়ার ওপর ছুরি চালানো হয়েছে। আর জামা বা ধুতি যেভাবে ঝোপে আটকানো আছে, বাঘ টেনে নিয়ে গেলে অমনভাবে থাকতেই পারে না। সবচেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড, মোড়লের লাশের নিচে মাটিতে একটা ফাটল আছে—ফাটলের মধ্যে একটা মোটা হাতুড়ির মাথা কর্নেলের চোখে পড়েছিল। হাতল থেকে খুলেই গিয়েছিল মাথাটা। সম্ভবত খুনীর হাতে হাতুড়িটা ছিল। ওই অবস্থায় টেনে এনেছিল মড়িটা—তারপর কীভাবে খুলে ওখানে ঢুকে যায়। বাঘের মড়ি বলে লাশ কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। তাই চোখে পড়েনি। কিন্তু কর্নেল তা দেখেছিলেন। তারপর কৌশলে গাঁয়ে রটিয়ে দিয়েছিলেন যে গাঁয়ের কারও একটা হাতুড়ির মাথা হারিয়ে গেছে কিনা। এর ফলে খুনী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং ফাঁদে পা দেয়। সে এসেছিল হাতুড়ির মাথাটা নিয়ে যেতে।.........

———

[বৈশাখ ১৪০৮]

স্পাই গাই

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

এ বছর স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট অ্যানাউন্স করার সঙ্গে সঙ্গে নাম আর নম্বর সমেত গেজেট ছেপে বেরোয়নি কেন?

কেনই বা মেকসিকোয় ফুটবলের বিশ্বকাপ ফাইনালের খেলা দূরদর্শনে দেখাবার জন্যে ইণ্ডিয়া গোড়ায় রেডি ছিল না?

এটা কি সত্যি—বিশ্বকাপ ফাইনালের আগেই স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট বেরিয়ে যেতো?

এসব কোশ্চেনের ভেতরে ঢোকার আগে জানা দরকার সাধু কালাচাঁদকে আমরা শেষ কোথায় দেখেছি।

রামনগরে ব্যাঙ্কের টেম্পোরারি ক্যাশিয়ারের পোস্টে কালাচাঁদকে নিয়ে গিয়েছিল তার নৃসিংহ মেসো। সেখানে তিনি ম্যানেজার। কালাচাঁদ দেশে ফিরেছে ছুটি নিয়ে। যদি গোপনে দিয়ে স্কুল ফাইনালটা টপকানো যায় তো ক্যাশিয়ারির পোস্টে সে পারমানেণ্ট হয়ে যেতে পারে। সে আসলে এখন একজন প্রবীণ স্কুল ফাইনালী। তার দেশের কচি স্কুল ফাইনালীরা কিন্তু জানে—কালাচাঁদ একজন প্রবীণ টিচার। বি টি পরীক্ষা দেবে বলেই প্রিপারেশন করতে এসেছেন। সব সময় গম্ভীর হয়ে একা একা সন্ধ্যেবেলা হাঁটেন।

কালাচাঁদ এই আনকোরা স্কুল ফাইনালীদের বলল, সে আসলে একজন রাইটার বা অথর। লাস্ট মিনিট সাজেশন—বাই অ্যান এক্সপিরিয়েন্সড্ টিউটর বইখানার সেই টিউটর—আসলে সে নিজেই। লাস্ট মিনিট সাজেশন তো এখন ছাপা হচ্ছে। সাতশো টাকা পেলে সে লিক্ করতে পারে। কিছু খরচ-খরচা আছে তো। কিন্তু পাবলিশারের স্পাই চারদিকে ছড়ানো। তারা কালাচাঁদকে সব সময় নজরে নজরে রেখেছে। এমনকি মাঠে যেসব গরু চরছে—তাদের ভেতরেই পাবলিশারের ছড়ানো স্পাই গাইও থাকতে পারে। কিছুই বিশ্বাস নেই।

কালচাঁদের দেশ মানে কলকাতা থেকে ট্রেনে ঘণ্টা দেড়েক। ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, গম ভাঙানোর কল, একটা খোয়া-ওঠা বাসরুট, সারের দোকান, সর্ষের খোলের দোকান আর বাড়ি বাড়ি ছাদে কিছু অ্যাণ্টেনা—থাকার বড় ঘরে কাপড়ের ঘোমটায় ঢাকা একটি করে টি. ভি। মাঠ থেকে ফিরে দেশগাঁয়ের লোক খালি গা হয়ে যায়, ঘোমটা খুলে সামনে বসে যায়—ছবি দেখবে বলে।

বলা দরকার জায়গাটা বারাসাত আর দেগঙ্গার মাঝামাঝি।

তা কালাচাঁদ যখন কচি স্কুল ফাইনালীদের বোঝাচ্ছিল—সে আসলে একজন এক্সপিরিয়েন্সড টিউটর—সে নিজেই লাস্ট মিনিট সাজেশন বইখানার অথর—বইখানা বেরোবে বেরোবে—এখন লিক্ করতে সাতশো টাকার মতো খরচ-খরচা পড়বে—তোমরা সাতজন আছো যখন—মাথাপিছু একশো টাকা করে যোগাড় করে ফেল—ব্যাপারটা খুব সাবধানে করতে হবে—পাবলিশার সবসময় স্পাই লাগিয়ে তাকে নজরে নজরে রেখেছে।

ঠিক তখন সন্ধ্যের মুখে মাঠ থেকে খুটো তুলে কালাচাঁদের বাবা অঘোরবাবু তাঁর কালো গাইটা

নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর কেমন সন্দেহ হয়। তিনি পরিষ্কার কালাচাঁদকে বলেন, ওরা সব কাঁচা স্কুল ফাইনালী, ওদের সঙ্গে তুমি আবার নতুন কোন্ খেলা খেলতে যাচ্ছো বাবা! তুমি ছুটিতে এসেছো।

সেই সাত স্কুল ফাইনালী অঘোরবাবুকে পাবলিশারের স্পাই ভেবে চোঁ-চাঁ দৌড়। কালাচাঁদও চেঁচিয়ে বলে, দেখেছো—আমার বাবার ছদ্মবেশে স্পাই পাঠিয়েছে! আমি সামলাচ্ছি।

তখন কালো গাইটা অঘোরবাবুর হাতের দড়ি ছাড়িয়ে ওদের তাড়া করে যায়। ছেলেগুলো চেঁচাতে ছোটে—স্পাই গাই! স্পাই গাই!!

ঘোর সন্ধ্যেবেলা কালাচাঁদকে নিয়ে অঘোরবাবু বাড়ি ফিরলেন। ও কালাচাঁদের মা—

কালাচাঁদের মা তখন ঘটকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ছেলে আমার ব্যাঙ্কের চাকুরে—সময় মিলিয়ে অফিসে যেতে হয়—সময় মিলিয়ে বেরোতে হয়। বউমার বাবাকে বলবেন—একটা সোনার হাতঘড়ি দিতে হবে ছেলেকে—একই তো ছেলে আমার! তায় আবার এত্ত অল্প বয়সে অফিসের বাবু।

কোন্ ভদ্রলোকের সব্বোনাশ করছো দ্যাখো—বলতে বলতে অঘোরবাবু বারান্দায় উঠলেন। উঠে ঘটকের দিকে কটমট করে তাকালেন। বলেছি না—এখন আসার দরকার নেই। আমি ছেলের বাপ। সময় হলেই খবর পাবেন—

ঘটক ছাতা হাতে উঠে দাঁড়ালে। কোনো তাড়া নেই তেমন।

তবে সন্ধ্যেবেলা দেখে আসা কেন?

ঘটক একলাফে রাস্তায় পড়ল।

কালাচাঁদের মা ফোঁস করে উঠলেন। তবে কি কালাচাঁদ আমার সন্ন্যেসী হয়ে যাবে? সারাটা জীবন দূরদেশে বসে শুধু চাকরি করে যাবে?

থামো। চাকরি এখনো কাঁচা। তারপর এখানে এসেই সে আবার লেজে খেলতে শুরু করেছে। শেষে চাকরিটা না খোয়ায়—

তোমার যত্ত অলুক্ষণে কথা। গুরুদেব বলে গেছেন না—

থামো তুমি। রামনগর যাবার আগের দিন অব্দি ও বাড়ি থেকে বেরোবে না।

সে কি বাবা! আমার তো এখনো মাসখানেক ছুটি।

সারাটা ছুটি তুমি বাড়িতেই কাটাও। বিশ্রাম নাও। বেরোবার দরকার নেই। আমি তোমার বাবার ছদ্মবেশে মাঠে ঘাপটি মেরে ছিলাম? তাহলে তোর বাবা কে আগে বল?

আহা! অত বড় ছেলের গায়ে হাত তুলো না—বলতে বলতে দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়াল কালাচাঁদের মা।

এতদিন কালাচাঁদ বস্তা বস্তা ভিজে নোট ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে বঙ্গোপসাগরের তীরে শুকোতে যেতো। শুকিয়ে ভাজা ভাজা হলে নোটগুলোকে আবার বস্তাবন্দী করে সে সন্ধ্যে সন্ধ্যে ব্যাঙ্কে ফিরে যেতো শরৎ গাড়োয়ানের গোগাড়িতে চড়ে। খোলা হাওয়ায় চলাফেরা তার অভ্যেস হয়ে গেছে।

আর এখন সে গৃহবন্দী। যাকে বলে অন্তরীণ। নজরবন্দী। দাড়ি কাটা ছেড়ে দিল কালাচাঁদ।

তার মা বলল, শেষে কি সন্ন্যেসী হয়ে যাবি বাবা?

না। আমি ছাদে বসে ঘুড়ি ওড়াবো। তুমি বাবাকে বল।

অঘোরবাবু সন্ধ্যেবেলা মাঠ থেকে ফিরে সব শুনে বললেন, আমি নতুন কোনো ফাঁদে পা দিচ্ছি না। লাটাই বা সুতো কিছুই কিনে দিতে পারবো না। ছাদে যেতে হয় যাও। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোনো নয়। বেরোলে একদম সেই রামনগরে গিয়ে কাজে জয়েন করবে।

অগত্যা।

কালাচাঁদ তার বাবার আনা সিনথেটিক সারের বস্তা থেকে সুতোলির পাতলা ফিতে খুলে খুলে বিরাট এক পাঁক হালকা সুতোলি বানিয়ে ফেলল।

কচি স্কুল ফাইনালীরা একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সারামুখ দাড়িভর্তি কালাচাঁদকে দেখে ফেলল রাস্তার দিককার জানলায়।

স্যার! আপনি আর বেরোচ্ছেন না?

কালাচাঁদ মুচকি হাসল। চারদিকে স্পাই। আমি তো প্রায় নজরবন্দী।

লাস্ট মিনিট সাজেশন বেরিয়েছে?

নাঃ! বেরোবার সময় হয়ে এল। টাকার কি করলে তোমরা?

কিছুটা যোগাড় হয়েছে—

কত?

সওয়া তিনশো স্যার।

তাই নিয়েই চলে এসো কাল দুপুরে।

আবার যদি স্পাই বেরোয় স্যার—

দুপুরটা দেখছি ফাঁকাই থাকে। আসবে কিন্তু। আসবার সময় হাফ ডজন ঘুড়ি কিনে আনবে।

ঘুড়ি? স্যার?

এসোই না। দেখবে'খন।

পরদিন দুপুরে অঘোরবাবু যখন মাঠে—কালাচাঁদ তার কচি স্কুল ফাইনালীদের নিয়ে ছাদে উঠল। সঙ্গে সিনথেটিক সারের বস্তার সুতো খুলে নিয়ে হালকা সুতোলির আণ্ডিল আর খানকয়েক ঘুড়ি।

বিকেলের ফার্স্ট ক্লাশ বাতাসে ঘুড়ি দিব্যি আকাশে উঠে গেল। কচি স্কুল ফাইনালীরা সারাদিন বাড়িতে পড়ে পড়ে হদ্দ। তারা ঘুড়ি-ওড়ানো এমন একস্‌পিরিয়েন্সড্ টিউটর কোনোদিন পায়নি। একজন তো আনন্দের চোটে কালাচাঁদকে বলেই ফেলল, আপনিই আমাদের এ যাত্রা তরাবেন। আপনি আমাদের কোশ্চেন-টোশ্চেন যা হয় এবার বলুন—

সদ্য পাওয়া সওয়া তিনশো টাকার নোট তখন কালাচাঁদের বুকপকেটে। সে গম্ভীর গলায় বলল, অল ওয়ার্ক অ্যাণ্ড নো প্লে মেকস্ জ্যাক্ এ—

ডাল বয়!

তাহলে আর কথা নয়। এখন আমরা ঘুড়ি ওড়াবো।

এক কচি স্কুল ফাইনালী বলল, স্যার আপনিই আমাদের ভরসা। আপনিই আমাদের অথর বাবা!

সে কথায় বাকি ক'জন বলে উঠল, ঠিক বলেছিস তো। স্যারই তো আমাদের অথর বাবা। তাঁরই লেখা সাজেশন—তিনি নিজেই লিক্ করবেন।

ঘুড়ি তখন অনেক উঁচুতে উড়ে গিয়ে এক গোত্তায় গাছপালার আড়ালে আটকে গেল। পুরনো বোম লাটাই গুটিয়েও ঘুড়ি ফের আকাশে তুলতে পারলো না কালাচাঁদ।

একজন বলল, ওখানেই তো অথর বাবা টি ভি রিলে সেণ্টারের বুস্টার—

তাতেই লটকে গেল নাকি?

নিশ্চয় ওখানে আটকে গেছে অথর বাবা, ওখানেই তো রিলে টাওয়ার। ওখান থেকেই তো গাইঘাটা, দেগঙ্গা, বারাসাত—চাদ্দিক কলকাতা টিভি-র ছবি রিলে হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

শনিবারের বিকেল। কালাচাঁদের কাছে-পিঠের ঘরবাড়ি থেকে সব লোক হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এল।

কালাচাঁদ টানাটানি করেও ঘুড়ি ওড়াতে পারল না। টানাটানিতে সুতোলি ছিঁড়ে বেরিয়ে এল।

অথর বাবা? সবাই ঘুড়ি ওড়াবে নাকি?

তা তো জানিনে। কিন্তু সব বাড়ির লোক যে ছাদে দেখছি। অ্যাণ্টেনা নাড়ছে যেন সবাই—

কালাচাঁদ গম্ভীর গলায় বলল, মাই বয়েজ। তোমরা এবার চারদিক ছড়িয়ে পড়ো তো।

কেন? কেন অথর বাবা?

এইসব সময় কালাচাঁদের ভেতর থেকে তার নিজের আদি পাণ্ডা ভাবটা জেগে ওঠে। সে বলল, আমি যেন কিসের গন্ধ পাচ্ছি। তোমরা সাবধানে মুদিখানা, নিতাই হোমোপ্যাথের চেম্বার, জগেন মিস্ত্রির মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান ঘুরে এসো তো একবারটি। পাবলিশার যদি স্পাই লাগায় তো আমরাই বা কম কিসে? জেনে এসো তো—সবাই ছাদে উঠে অ্যান্টেনা নাড়ছে কেন? সেই ফাঁকে আমি লাটাইটা গোটাই।

আর ঘুড়ি ওড়াবেন না অথর বাবা?

আগে তোমরা ঘুরে তো এসো।

ওরা দশ মিনিটের ভেতর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুরে এসে একই কথা বলল। বড় বড় চোখ করে।

অথর বাবা—আজ টি ভি-তে লর্ডস-এর ইণ্ডিয়া-ইংল্যাণ্ড ক্রিকেট দেখানো হচ্ছিল। তখন নাকি ঘচ করে একখানা বড় মুখ ভেসে ওঠে। তারপর টি ভি থেকে অজানা ভাষায় খালি ভেসে আসছিল—আদুলিমুদালিয়র, জাফনা, জয়বর্ধনে, টুলফ্—এইসব কথা।

বড় মতো মুখখানা কার?

লোকে বলছে—জয়বর্ধনের—

তাহলে তো শ্রীলঙ্কা স্টেশন আসছে টি ভি-তে।

তাই তো অথর বাবা। যেখানে কলকাতাই পরিষ্কার আসতে চায় না—সেখানে শ্রীলঙ্কা আসে কি করে?

আজ ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ থাকলো। তোমরা এখন আসতে পার।

কালাচাঁদ যা জানতে পারলো না—তা হলো—সেই রাতেই লোকাল থানার বড়বাবু তড়িঘড়ি কলকাতার ট্রেন ধরতে চলে গেলেন। সাদা পোশাকেই।

সন্ধ্যে সন্ধ্যে অঘোরবাবু মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে মহা শোরগোল তুললেন। সারাদিন বাড়ি থাকিস। একগাল দাড়ি। গাইগরুগুলোর শিং জুড়ে নালি হয়ে গেল—একবার খালে নামিয়ে রগড়ে চান করিয়ে দিবি ওদের—

কালাচাঁদ একগাল দাড়ি নিয়ে নিজের বাড়িতেই অন্তরীণ। সে আজকাল বিশেষ কথা বলে না। একরকম মৌনীই থাকে। তবু বলল, কি দিয়ে রগড়াবো?

সারের খালি বস্তাগুলো রয়েছে কি করতে?

যেমন কথা তেমন কাজ। পরদিনই সারের কয়েকটা ছেঁড়া ফাটা খালি বস্তা নিয়ে গাইগরুদের কালাচাঁদ খালে নামালো।

তারপর খসখসে সিনথেটিক বস্তা দিয়ে ওদের শিংয়ের গোড়া আচ্ছা করে রগড়ে দিল।

কালাচাঁদকে খালে নামতে দেখে সেই কচি স্কুল ফাইনালীদের দু'জন পাড়ে এগিয়ে এল। অথর বাবা? আমাদের পরীক্ষা তো এগিয়ে এল। সাজেশন?

আসতে দে না। আমার তো শেষ রাতের মার! একেবারে লাস্ট মিনিটে এমন সাজেশনই দেবো—দেখবি—

দেখবেন কিন্তু অথর বাবা—আমাদের সর্বস্ব আপনার কাছে—

কালাচাঁদের মনে পড়লো, সে ওদের সওয়া তিনশো টাকা নিয়ে রেখেছে। আলতো করে হেসে বলল, বাকি টাকার কতদূর?

হয়ে এসেছে অথর বাবা—

আচ্ছা তোরা আমায় অথর বাবা ডাকিস কেন? আমি তো একজন এক্সপিরিয়েন্সড্ টিউটর মাত্র।

আপনি তো একজন লেখক। রাইটার। আপনার লেখা লাস্ট মিনিটের সাজেশন তো সবাইকে টেক্কা দিয়ে—সব নোট বইকে পেছনে ফেলে শেষ রাতের মার দেয় অথর বাবা! আপনি তাই অথরদেরও বাবা—

ওঃ! হোঃ! হোঃ!!—বলতে বলতে কালাচাঁদ গরুদের তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোলো। তখনই বলল, এই তো এখন কোশ্চেন লিক্ করার সময় হয়ে এল। তোমরা আমায় ক'টা টাকা দিয়ে যেন ধৈর্যহারা হয়ো না। এ যে লাস্ট মিনিটের কারিকুরি। বুঝলে না? বাকি টাকাটা জোগাড় করে ফেল।

কালাচাঁদের একথায় সেই দুই স্কুল ফাইনালী গভীর বিস্ময়ে কালাচাঁদের দিকে তাকালো। এ যে চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না। পৃথিবীর অত বড় পরীক্ষা—স্কুল ফাইনাল—লাস্ট মিনিটে সেই এগজামিনের কোশ্চেনের সাজেশন দিয়ে আইদার—অর—সব কোশ্চেন মিলিয়ে দেন যে মহান অথর—সেই অথরদের বাবা কি সিম্পিল! সেই অথর বাবা একটা অর্ডিনারি খাল থেকে এইমাত্র গাইগরু চান করিয়ে নিয়ে উঠলেন। তাদেরই চোখের সামনে। বিশ্বাস হয়? পরে বললে লোকে বিশ্বাস করবে? কখনো করে! ওই তিনি চলেছেন—ভিজে কাপড়ে। ওদের চোখ গোল্লা গোল্লা হয়ে উঠলো।

বাকি স্কুল ফাইনালীদের সবার এতটা ধৈর্য ছিল না। ফিরতি পথে কালাচাঁদকে পিওন একখানা পোস্টকার্ড দিল। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—

মান্যবরেষু ইথারবাবা,

আপনিই আমাদের ভরসা। সময় তো আসিয়া গেল। এখন আপনি যা করিবেন তাই হইবে। আমরা কিছু দিয়াছি—বাকিটাও দিবার কোনো অন্যথা হইবে না। এখন যাহা করিবার আপনিই করিবেন। আমরা আপনার পথের দিকে তাকাইয়া আছি। একেবারে লাস্ট মিনিটে পাইলে তৈরি হওয়া অসম্ভব। অন্যে যাহা লাস্ট মিনিটে পাইবে—আমাদের যে তাহা কিছু আগে দরকার। প্রণামান্তে—

ডট! ডট! ডট!!!—আপনারই ফাইনালীরা।

তাড়াতাড়িতে অথরের জায়গায় ইথার লিখে বসে আছে। হাসলো একটু কালাচাঁদ।

গাইগরু রগড়ে চান করিয়ে কালাচাঁদ আজ কিছু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দুপুরে কাটোয়ার ডাঁটার সঙ্গে মেমারির কুমড়ো আর কুচো চিংড়ি দিয়ে কাঁচালঙ্কা ঘষে সাপটে ভাত খেয়েই সে ঘুমিয়ে পড়ল অঘোর ঘুমে। গরুরা তখন শহরের শেষে কেষ্টনগর রোডের গায়ে পেল্লায় এক মাঠে চরে বেড়াচ্ছিল। কাছেই কলকাতার টি ভি প্রোগ্রাম রিলে করার বুস্টার টাওয়ার। তার ডগায় তখনো কালাচাঁদের লটকে যাওয়া লাল ঘুড়িখানা বাতাসে লটকাচ্ছিল।

বারাসাত কোর্টে কাজ সেরে তিনখানা ডেমিকাগজ নিয়ে সন্ধ্যের মুখে মুখে ফিরলেন কালাচাঁদের বাবা অঘোরবাবু। গালের ডানদিক দাঁতের ব্যথায় ফুলে গেছে। যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কালাচাঁদের মাকে বললেন, একটু জল ফুটিয়ে তাতে নুন দিয়ে দাও—কুলকুচো করে দেখি—যদি কমে—

অসময়ে চুলোয় আর আঁচ দেবেন না বলে কালাচাঁদের মা শুকনো পাটকাঠি নিতে গোহালে ঢুকেছিলেন। বেরিয়ে এলেন হাসতে হাসতে। তোমার কালো গাই চরতে বেরিয়ে আপনাআপনি ফিরে এসেছে। আর বাঁট থেকে আপনাআপনি দুধ পড়ছে—

বল কি?—সেই ব্যথা নিয়েই উঠে দাঁড়ালেন অঘোরবাবু।

হ্যাঁ। আমি বাটি এনে ধরেছি। তোমার কালাচাঁদ ভাল করে আজ শিং রগড়ে চান করিয়ে দিয়েছে ওদের।

খালে নামিয়েছিল?

নয়তো কি!—বলতে বলতে কালাচাঁদের মা বাঁটে বাটি ধরলো। দুধে ফুলে ওঠা বাঁট ধরে টান দিতেই দুধ বেরোতে লাগল। কালাচাঁদের মা দুধ দুইতে দুইতেই বলতে লাগল, কতদিন চান করে না—নইলে এমন দুধই তো দেওয়ার কথা! সবে তিন মাস গাভিন। কালাচাঁদ আমার সাধু প্রকৃতির লোক। সাধুর হাতে চান করেই তো দুধ ফিরে পেলো বাঁটে।

দেখো—বেশি বাখিয়ো না!

এ কথায় কান না দিয়ে কালাচাঁদের মা বলল, নুন জলে আর দরকার নেই। গরম গরম দুধ খাও তো। ঠিক কমে যাবে—

এই—না না করেও অঘোরবাবু তাকে থামাতে পারলেন না। অগত্যা অনিচ্ছায় ভর সন্ধ্যেবেলা একবাটি গরম দুধ খেতে হলো।

খাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন ম্যাজিক ঘটে গেল। কোথায় ব্যথা! অঘোর নিজেই অবাক হয়ে বললেন, দাঁতের ব্যথায় দুধের দাওয়াই—আগে তো কোনোদিন শুনিনি!

একগাল হেসে কালাচাঁদের মা বলল, সবই তোমার সাধুর কেরামতি! এমন রগড়ে চান করিয়েছে কালাচাঁদ—

অঘোরবাবু কিছু না বলে অন্ধকার বারান্দায় এসে বসলেন। তিন মাস গাভিন গাই কিছুটা দুধ দিচ্ছিল ঠিকই—কিন্তু কালাচাঁদের রগড়ানি খেয়ে এতটা দুধ দেয় কোত্থেকে? ভেবে ভেবেও কোনো কূলকিনারা করতে পারলেন না তিনি। মনে মনে বললেন, হবেও বা—

সন্ধ্যের মুখে ঘুম ভেঙে চোখ লাল করে বিছানায় উঠে বসলো কালাচাঁদ। জানলার বাইরে তখন বাড়ি বাড়ি আলোর ফুটকি।

এতক্ষণ বাড়ির বাইরে কি ঘটছে তার কিছুই জানে না কালাচাঁদ। জানেন না অঘোরবাবুও। কিংবা কালাচাঁদের মা। গরুরাও চরে ঘুরে নিজের মতো সার দিয়ে গোহালে ফিরে এসেছে বিকেল বিকেল। একজনের পর একজন। এখন জাবনা দিয়ে তাদের ডিনার চলছে।

ইণ্ডিয়া-চায়না বর্ডারে মাউন্টেন ডিভিশনের সোলজারদের খাবার সাপ্লাই, এনিমি বম্বার প্লেনের মহড়া দিতে নর্থ বেঙ্গলের হাসিমারায় জঙ্গলের ভেতর বিমানঘাঁটি। সেখান থেকে দুপুরের দিকে এয়ার ফোর্সের একখানা প্লেন উঠেছিল আকাশে। তিব্বত বর্ডারে একটা চক্কর খেয়ে ফিরে আসার কথা। আকাশে উঠেই পাইলট তো ঘাবড়ে গেল।

প্লেনের রেডিওতে শুধু চীনে ভাষায় মেসেজ ভেসে আসছে। হোয়াইকু ঝিয়াও। ঝান ঝিয়াও হোয়াইকু। হোয়াইকু ঝিয়াও—

কি ব্যাপার? বর্ডারের ওপারে কোনো চীনা প্লেন হয়তো চক্কর দিতে আকাশে উঠেছে। কিন্তু তাদের কথা তো এখানে ধরা পড়ার কথা নয়। ইথার তরঙ্গে জট পাকালো নাকি?

কোনো ঝুঁকি না নিয়ে পাইলট প্লেন নিয়ে হাসিমারায় ফিরে গেল। ঘাবড়ে গিয়ে আরেকটু হলেই পাইলট অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলেছিল আর কি! ডান দিকের ডানা ডাবগাছে গিয়ে ধাক্কা মারছিল প্রায়।

খবরটা ওয়ারলেসে দিল্লিতে এয়ার হেড কোয়ার্টার সুব্রত হাউসে গিয়ে পৌঁছালো মুহূর্তে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারির চাইনিজ ল্যাঙ্গোয়েজ এক্সপার্টরা শলা-পরামর্শে বসে গেল। হোয়াইকু ঝিয়াও। ঝান ঝিয়াও হোয়াইকু। কোডে পাঠানো এই সাংকেতিক কথা কটির মানে কি হতে পারে?

এয়ার ইণ্ডিয়ার যে বিমান টোকিও যাচ্ছিল—ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের যে বিমান রেঙ্গুন হয়ে আন্দামান যাচ্ছিল—তাদের পাইলটরা আকাশেই অর্ডার পেল—ফিরে এসো। প্রসিড নো ফারদার।

আসলে সারা ইণ্ডিয়ার একটি মোটে থানায় টি ভি খুললেই শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনের সেই বিখ্যাত ঝোলা মুখ ফুটে উঠছে—এই কাণ্ডে কলকাতা দিল্লি একই সঙ্গে চিন্তিত হয়ে পড়ে। লোকাল থানার বড়বাবু কলকাতায় পৌঁছেই সিধে পুলিশের আই জি-র বাড়িতে চলে যায়।

রাত তখন প্রায় বারোটা। মাথার কাছে ওয়ারলেস সেট নিয়ে তিনি ঘুমিয়ে। হঠাৎ কানের কাছে ধস্তাধস্তির গোলমাল শুনে আই জি উঠে বসলেন। নাঃ! ওয়ারলেস সেটে তো কোনো আওয়াজ নেই। দোতলার জানলা দিয়ে দেখলেন—বাড়ির গেটে পাহারার সঙ্গে কার যেন তুমুল ধস্তাধস্তি হচ্ছে।

তিনি মাথার বালিশের তলা থেকে ছ'ঘড়া রিভলবার বের করে চেঁচিয়ে বললেন, এক্ষুনি থামো তোমরা—নয়তো আমি গুলি করবো।

এতক্ষণ গেটের পাহারাদার কালাচাঁদদের থানার বড়বাবুকে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। দু'জনে প্রায় কুস্তি হচ্ছিল। আই জি-র গলা চিনতে পেরেই বড়বাবু প্রায় কেঁদে উঠলেন। আপনাকে খবরটা দিতে এসেই এই বিপত্তি—

কোন্ থানা?

বড়বাবু চেঁচিয়ে থানার নাম বললেন—

তা এখানে এসেছেন কেন? এস পি-র কাছে যান।

তিনি হসপিটালে স্যার—

তাহলে অ্যাডিশনাল এস পি-র কাছে যান।

তিনি স্যার বসিরহাটে বিয়ে করতে গেছেন। ভীষণ খবর স্যার—

অসময়ে এসে ঘুম ভাঙালেন। যান। আমি এখন ঘুমোবো।

খবরটা শুনে ঘুমোতে পারবেন না স্যার—

কি খবর? ওখান থেকেই বলুন—

জোরে বলা যাবে না স্যার। ইন্টারন্যাশনাল ব্যাপার—আমি ওপরে উঠে আপনাকে বলেই চলে যাবো।

অগত্যা—

দোতলায় বসার ঘরে বসে আই জি বড়বাবুর মুখে সব শুনলেন। শুনে বললেন, আপনি নিজে দেখেছেন?

হ্যাঁ স্যার। সেই জয়বর্ধনের মুখ। আমাদের ওখানে অনেকেই দেখেছে। মুখের পাশে সিংহলী ভাষায় জড়িয়ে জড়িয়ে কী সব লেখা।

হুম্। আপনি যান এখন। কারও কাছে মুখ খুলবেন না।

ইয়েস স্যার।

আপনি যেতে পারেন এবার।

বড়বাবু চলে যেতেই আই জি চিফ মিনিস্টারের বাড়িতে ফোন করে তাঁকে তুললেন। চিফ মিনিস্টার সব শুনে বললেন, কী বলছেন? এটা তাহলে জয়বর্ধনের ইজরায়েলি ইনটেলিজেন্সের কাজ। আমাদের ইথার তরঙ্গ জ্যাম করতে চাইছে।

তাই তো মনে হয় স্যার। কিংবা সি আই এ স্বয়ং সব চালাচ্ছে। অবিশ্যি আমরাও অ্যালার্ট আছি।

তাই থাকবেন। আমায় প্রাইম মিনিস্টারের হট লাইন দিতে বলুন।

বলছি স্যার।

প্রধানমন্ত্রীকে সারাদিন পাহারায় পাহারায় থাকতে হয়। ছেলেমেয়েদের নিয়ে সময় কাটাবার একদম সময় পান না। আজ অনেকদিন পরে খাবার টেবিলে বোর্ড পেতে প্রিয়াংকার সঙ্গে ক্যারাম খেলছিলেন। রাহুলকে নিয়ে সোনিয়া তখন গভীর ঘুমে। ঠিক এই সময় কালকাতা থেকে ফোনটা পেলেন।

সব শুনে প্রাইম মিনিস্টার বললেন, বেটার টক উইথ অরুণ।

অরুণ নেহরু বললেন, ডোণ্ট ওয়ারি। সব কুছ করায়ত্ত হো জায়েগা। আপ নিশ্চিন্তমে নিদ্ যাইয়ে—

এর পরে কি আর নিশ্চিন্তে ঘুমানো যায়! তবু চিফ মিনিস্টার এসে তাঁর বিছানায় শুয়ে পড়লেন—পাশবালিশ জড়িয়ে।

অরুণ নেহরুর ঘর থেকে একটা ফোন গেল কমাণ্ডো হেড কোয়ার্টারে। অরেকটা গেল এয়ার হেড কোয়ার্টারে।

রাত তিনটের ভেতর দমদম এয়ারপোর্টে এয়ারফোর্সের বিরাট এ এন-১২ ট্রান্সপোর্ট প্লেন এসে নামলো। এইসব বিমান থেকেই পাহাড়ি এলাকায় সোলজারদের খাবার হিসেবে আকাশ থেকে প্যারাসুটে বেঁধে ডজন ডজন খাসি নামিয়ে দেওয়া হয়।

এখন সেই বিমান থেকে নামলো—ইস্পাতের পাতের মতো চেহারা—কয়েকজন কমাণ্ডো। সঙ্গে তাদের নানা রকমের যন্ত্রপাতি। নেমেই তারা কাছে দাঁড় করানো ঢউস ঢাউস হেলিকপ্টারে গিয়ে চড়ে বসলো। কপ্টারগুলো চালু করাই ছিল। তাদের মাথার ওপরের ডানা শব্দ করে চক্কর খাচ্ছিল। ওরা বসতেই বাজপাখিগুলো হুস্ করে আকাশে উঠলো।

আধঘণ্টার ভেতর দেগঙ্গার কাছাকাছি জুবিলি স্কুলের ছাদে একখানা কপ্টার নেমে পড়লো। অরেকখানা নামলো পুরনো জমিদার চৌধুরীদের পেল্লাই ছাদে। শেষ রাতের দিকে কালাচাঁদের ঘুম ভেঙে গেল।

সারা এলাকার দিশী কুকুর একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে চলেছে। দিনের আলো ফুটতেই অঘোরবাবুর চক্ষু চড়কগাছ। মিলিটারি মিলিটারি দেখতে—কিন্তু আসলে মিলিটারি নয়। কোমরে কি সব যন্ত্রপাতি। কানে হেডফোন। কারো কারো মুখে আবার ঝুলন্ত শুঁড় বসানো মুখোশ। গত মহাযুদ্ধের পর এরকম গ্যাসমুখোশ খুব বিক্রি হত বাজারে।

শ'খানেক লোক সারা এলাকা চষে বেড়াচ্ছে। গোড়াতেই অর্ডার হয়ে গেল—কেউ কারও বাড়ি ছেড়ে বেরোতে পারবে না। যে যেখানে যেমন আছো থাকো। অঘোরবাবু অনেক বলে কয়ে তার গাইগুলো চরাতে দিয়ে এল মাঠে।

প্রথম দিনেই কমাণ্ডোরা সারাটা এলাকা তছনছ করে দিল। কার পিসিমা বারান্দার রোদে কাঁথা মেলে দিয়েছিল শুকোতে। তিন কমাণ্ডো এসে কাঁথার সব সুতো খুলে নিয়ে পাকিয়ে আণ্ডিল করলো। তারপর সেই সুতো কাঁটাওয়ালা একটা যন্ত্রের ভেতর দিয়ে পাশ করালো।

কালাচাঁদের মা বড়ি মেলে দিয়েছিল কুয়োতলার ঢিবিতে। কমাণ্ডোরা এসে বড়িগুলো গুঁড়ো করে মিহি পাউডার বানালো। তারপর সেই গুঁড়ো কী সব কেমিকালে মিশিয়ে কাচের স্লাইডে ঢেলে দেখলো।

জনা ছয় কমাণ্ডো গরু চরার মাঠের ঘাসের স্যাম্পেল নিল খুব সাবধানে। কেউ নিল পুকুরের জলের স্যাম্পেল। কমাণ্ডোদের কমাণ্ডার—জাঁদরেল গোঁপ—কোমরের বেল্টে বিরাট পিস্তল—সে হাঁটু গেড়ে বসে লোকাল ছাগলের শুকনো নাদির স্যাম্পেল কালেক্ট করলো মন দিয়ে।

তাই দেখে কালাচাঁদের বাবা অঘোরবাবু বিড়বিড় করে বলল—আস্ত পাগল!

কালাচাঁদের মা বলল, আস্তে। বেশি কথা বোলো না।

পরদিন কমাণ্ডোরা যেন ক্ষেপে উঠলো। কেননা—ততক্ষণে তাদের কাছে এয়ার হেড কোয়ার্টার থেকে খবর এসে গেছে—হোয়াইকু ঝিয়াও ঝান—

কমাণ্ডোরা সবার গলায় স্বর রেকর্ড করতে লাগলো। রেকর্ড করে টেপের পাশে গলার স্বর যার তার নাম, তার বাপের নাম, মৌজা, থানা, গাঁয়ের নাম লিখে রাখতে লাগলো।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা কালাচাঁদের গাইগুলো চরে ঘুরে নিজেরাই যে যার মতো সার দিয়ে গোহালে ফিরে ডিনারে বসলো।

বোর্ড অব সেকেণ্ডারি এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট মঞ্জুগোপাল বাঁড়ুজ্যে বাগবাজারের মানুষ। বাগবাজারেই বড় হয়েছেন। কিছুদিন হলো কলকাতার বাইরে বিরাটির কাছাকাছি বাঁদু রোডে নতুন বাড়ি করে এসেছেন। সাবধানী লোক। স্কুল ফাইনালের সব কোশ্চেন তাঁর কাছে। তিনি সেগুলো সিঙ্গিল মিছিল করে রাখতে অফিসের ভল্টে কমপিউটরে চড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যে সন্ধ্যে বাড়ি ফিরেছেন। ফিরেই টি ভি খুলে দিয়ে ইজিচেয়ারে বসলেন।

বসেই তাঁকে স্প্রিংয়ের মতো লাফ দিয়ে উঠতে হলো।

এ কি সর্বনাশ! অফিসে কমপিউটরে চাপানো কোশ্চেনের গোছা থেকে কয়েকখানা কোশ্চেনের ময়লা পাতার ছবি এই মাত্র স্ক্রিনে ফুটে উঠলো। হিস্ট্রি কি লাইফ সায়ান্স—ঠিক বোঝা গেল না। পুরো এক মিনিটও ছিল না ছবিটা। আইদার অর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

বসার ঘর থেকেই ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বললেন বাঁড়ুজ্যেমশাই। রাত ন'টা নাগাদ তিনি বাদুড়বাগানে উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর বাড়ি এসে হাজির।

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বাড়ি ছিলেন। বললেন, বসুন। সি এম-কে জানাই।

সি এম-এর সঙ্গে কি কথা হলো—বাঁড়ুজ্যেমশাই জানতে পারলেন না। ফোন নামিয়ে—উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বললেন, চলুন। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ডাকছেন।

মুখ্যমন্ত্রী রীতিমত চিন্তিত হয়ে ঘরে বসে আছেন। ঘরে তখন অন্য কেউ আর নেই। মঞ্জুগোপালের মুখে সব শুনলেন। শুনে চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন—হুম! আপনাদের আসতে বলে আমি ডটলাইনে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলে নিলাম। এ যা অবস্থা—তাতে তো দেখছি কোনো খবরই আর সিক্রেট রাখা যাবে না। সব ফাঁস হয়ে যাবে। সে দুর্দিনের কথা ভাবলে আমার মাথা ঘোরে।

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বললেন, স্যার—স্টেট এমপ্লয়িদের শেষ দুই কিস্তি মহার্ঘ ভাতার ফাইলটা কোথায়?

ওটার তো ক্যাবিনেট ডিসিশান হয়ে গেছে। এখন লিক্ হলে কেলেঙ্কারি। সামনে ইলেকশান। আচ্ছা কারা করছে বলুন তো? এর পেছনে খালিস্তানীরা নেই তো?

তাদের লাভ! বরং আমার মনে হয়—এর পেছনে ইজরায়েল, চায়না আর খোদ সি আই এ রয়েছে।

পি এম তাই বললেন একটু আগে হট লাইনে।

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বললেন, ওরা কি চায় স্যার?

এটাও বুঝলেন না! ওরা চায়—ইণ্ডিয়া তামিল রেফিউজির চাপে ভেসে যাক। ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্স ভুল রেডিও মেসেজে দিশেহারা হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ুক। আর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাটা ভণ্ডুল হোক।

তাতে ওদের লাভ স্যার?

একটা খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হোক ইণ্ডিয়ায়—তাই ওরা চায়। দেশের তরুণ আর কিশোররা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা না দিতে পেরে ক্ষেপে উঠুক। এরোপ্লেনগুলো আছাড় খাক। তামিল উগ্রপন্থীদের বান ডাকুক ইণ্ডিয়ায়। বলছিলাম কি—

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বললেন, বলুন না স্যার—

ডি এ নিয়ে ডিসিশনের ফাইলটা একটা বাক্সে ভরে এখনকার মতো লালদীঘির পাড়ে কোথাও কবর দিয়ে রাখুন। সময় হলে আনা যাবে।

বেশ তো।

মঞ্জুগোপাল বাঁড়ুজ্যে বললেন, তাহলে যে দুই পেপার কোশ্চেন টি ভি স্ক্রিনে ভেসে উঠেছিল—তা কি বাতিল হবে স্যার?

আলবৎ বাতিল হবে। ফিরে কোশ্চেন করুন। ফিরে ছাপুন। আমি তো প্রাইম মিনিস্টারকে বললাম—এবার বিশ্বকাপ টি ভি-তে দেখানো বন্ধ রাখুন। দেখাবার সময় ওরা যদি কোনো বড় স্টেট সিক্রেট টি ভি স্ক্রিনে ফাঁস করে দেয়—তখন? তখন কি মুখ থাকবে?

টি ভি-তে এই কোশ্চেন ভেসে ওঠার খবরটা চাউর হতে বিশেষ দেরি হলো না। কমাণ্ডোরা মরীয়া হয়ে উঠলো। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে আবার তোশক, লেপ, ঘুঁটের গাদি, পুরনো চিঠির বস্তা, কেরোসিনের টিন নেড়ে ঘেঁটে দেখতে শুরু করলো।

সন্ধ্যে এলেই সবাই তটস্থ। না জানি আজ আবার কী ভেসে ওঠে স্ক্রিনে। কিন্তু অঘোরবাবুর

গাইগুলোর কোনো হ্যাৎ ক্যাৎ নেই। তারা চরে ঘুরে নিজেদের মতো সার দিয়ে গোহালে ফিরেই জাবনার ডিনারে মুখ নামিয়ে দেয়। পথে-ঘাটে এত যে কমাণ্ডো—জুবিলি স্কুলের ছাদে যে এই হেলিকপ্টার নামছে—এই হেলিকপ্টার উঠছে—সেদিকে ওদের ভ্রূক্ষেপও নেই।

বোর্ড অব সেকেণ্ডারি এডুকেশনের প্রেসিডেণ্ট মঞ্জুগোপাল বাঁড়ুজ্যে তাঁর বাঁদু রোডের বাংলোয় বসে বাতিল কোশ্চেন পেপারের জায়গায় ছাপিয়ে আসা নতুন কোশ্চেন পেপার দেখছিলেন। টি ভি-তে ওয়ার্লড্ অব স্পোর্টসে মোটর র‍্যালি দেখাচ্ছিল। এমন সময় স্ক্রিনে তাকিয়ে মঞ্জুগোপালের চোখ গোল গোল হয়ে গেল।

তাঁরই হাতে লাইফ সায়ান্সের নতুন ছাপা কোশ্চেন। সেই কোশ্চেনের পয়লা পাতার ছবি টি ভি-তে। একটু মন দিয়ে তাকালে কোশ্চেনগুলোও চেনা যায়। মঞ্জুগোপাল সঙ্গে সঙ্গে নিজের টি ভি-টা বন্ধ করে দিলেন। দিয়ে তক্ষুণি কলকাতা পাড়ি।

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বাড়ি ছিলেন না। মঞ্জুগোপাল সাহস করে একাই চিফ মিনিস্টারের বাড়ি গিয়ে হাজির।

মুখ্যমন্ত্রী বললেন, কী ব্যাপার?

মঞ্জুগোপাল কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আবার স্যার—

হুঁ। আমিও দেখেছি। এ নিশ্চয় ইন্টারন্যাশানাল টেররিজম। আমাদের স্টুডেণ্ট উইংগুলোকে কোশ্চেন লিক্ করে নীতিহীনতার দিকে—গণটোকাটুকির দিকে ঠেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র।

এখন তো দেখছি হুড়হুড় করে সব কোশ্চেনই লিক্ হয়ে যাবে স্যার।

টি ভি-টা বন্ধ রাখা যায় না?

কি করে বন্ধ হবে! সামনে যে বিশ্বকাপ ফাইনাল—

স্কুল ফাইনালের আগে না পরে?

অনেক পরে স্যার।

আপনি আজই বেশি রাতে—নয়তো কাল ভোরের ফ্লাইটে দিল্লি যান। প্রাইম মিনিস্টারকে গিয়ে সব বলুন।

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী?

তিনি তো এখন শ্রীনগরে—এডুকেশন কনফারেন্সে আছেন। এখন না হয় কোশ্চেন লিক্ করছে। পরে হয়তো রেজাল্ট লিক্ করে দেবে। এ নিশ্চয় ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্টদের কাণ্ড—আপনি কালই ভোরে দিল্লি চলে যান।

এদিকে কমাণ্ডোদের কমাণ্ডারের সকাল-সন্ধ্যে এক কাপ করে চা খাওয়া অভ্যেস। অঘোরবাবু গাই দুয়ে এবেলা আড়াইশো—ওবেলা আড়াইশো দুধ দিয়ে আসেন। কমাণ্ডারের তাঁবুতে দু'বেলা দুধের যোগান।

সেই দুধের চা খেয়ে কমাণ্ডার তো অবাক। হাঁটুতে তার এতদিনকার বাতের ব্যথা কোথায় মিলিয়ে গেল।

দিল্লি থেকে ঘন ঘন ধাতানি আসছে। কি হলো? কি হলো? এ ভাবে কাজ এগোলে দেশের সব সিক্রেট ফাঁস হয়ে যাবে। পাবলিক তো জানবেই। চাই কি শত্রুর হাতে গিয়েও পড়তে পারে। এতদিনে কিছু কিছু নিশ্চয় বর্ডার পেরিয়ে চলেও গেছে। নয়তো ইথার তরঙ্গে আড়ি পেতে চাইনিজ অর্ডার কি করে আমাদের ফাইটার প্লেনের রেডিও চ্যানেলে ঢুকে পড়ে?

রাত এগারোটা। দেগঙ্গার বিখ্যাত মশা উর্দির মোটা কাপড় ফুঁড়ে কমাণ্ডোরের হাঁটুতে, কোমরে কামড়াচ্ছিল। ঘুমের দফা রফা। কমাণ্ডার এর আগের পোস্টিংয়ে ছিলেন টিবেট বর্ডারে—ম্যাকমোহন লাইনের এপাশে। চোখে ঘুম এলেই সেখানকার ছবি ভেসে ওঠে।

ইণ্ডিয়ান আর্মি বর্ডারে মাইন পুঁতে রেখেছে। চীনা চাষী সেপাইরা প্রথমে সেই মাইন পোঁতা জায়গার ওপর দিয়ে গাইগরুর পাল চালিয়ে দেয়। তাদের পেছনে থাকে চাষী সেপাই। মাইন ফেটে কিছু গাইগরু উড়ে যায়। জায়গাটা নিরাপদ হয়ে যায়। তখন সেপাইরা এগিয়ে আসে। তাদের পেছনে থাকে আসল সোলজার। হাতে স্টেনগান। মেশিনগান। এভাবে ওরা সেবারে সেলা অব্দি নেমে এসেছিল।

সেই সব চীনা গরুর চেহারা বেঁটে বেঁটে। টান টান পিঠ। ওদের দুধ দিয়ে কোনোদিন চা খাওয়া হয়নি। খেলে কি বাতের ব্যথা—হাঁটুর রস টেনে যেতো?

কী মনে হওয়ায় বিছানায় উঠে বসলেন। মাথার কাছে সিগনাল টেলিফোন তুলে সরেজমিনে তদন্তের রিপোর্ট চাইলেন।

ঘাস পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে? কিছু পাওয়া গেল?

হ্যাঁ স্যার। না স্যার।

কোনটা হ্যাঁ? কোনটা না?

আগেরটা হ্যাঁ স্যার। পরেরটা না সার।

ঘুঁটের ছাই?

না স্যার।

ভয়েস টেস্ট?

না স্যার।

এনিথিং মোর?

কয়েকখানা চিঠির ভেতর একখানা চিঠি—

কালই দেখাবে সকালে। না। সকালে নয়। সকালে আমি একটা গরুকে চেক করতে চাই—বেলা দশটায় আসবে।

দড়াম করে ফোন রেখে দিয়ে শুয়ে পড়লেন কমাণ্ডার। তারপর নিজের গালেই চড় মেরে একসঙ্গে দুটো মশাকে মারলেন।

দিল্লিতে সাউথ ব্লকে গিয়ে মঞ্জুগোপাল তাঁর কার্ডের পেছনে লিখে দিলেন—'দি স্ট্রেঞ্জ কেস অব লিক্ থ্রু টি ভি।'

বেশিক্ষণ বসতে হলো না। প্রধানমন্ত্রী ডাকলেন। তাঁর সামনে মিলিটারি পোশাকে একজন—বুকের কাছে অনেকগুলো তারা। আরেকজন এমনি কোট-প্যান্ট পরে বসে আছেন। তাঁকে দেখেই মঞ্জুগোপাল বাঁড়ুজ্যে চিনতে পারলেন। পরমাণু কর্তা ডঃ রামান্না। মিলিটারি মানুষটি ঘুরে তাকাতে তাকেও চিনলেন মঞ্জুগোপাল। জেনারেল সুন্দররাজ। প্রধান সেনাপতি।

প্রাইম মিনিস্টার শুনলেন সব। শুনে বললেন, তাহলে এবার বিশ্বকাপ আমরা দেখাবো না টি ভি-তে। তখন সারা দেশ হুমড়ি খেয়ে টি ভি-র সামনে বসবে। তখন যদি বড় কোনো সিক্রেট ফাঁস হয়ে যায়—

জেনারেল বললেন, আমরাও খবরটা পেয়েছি। নর্থ ইস্টার্নে আমাদের দশটা মাউন্টেন ডিভিশন রয়েছে। এনিমি যদি কোনো সিক্রেট পায়—

ডক্টর রামান্না বললেন, আমাদেরও খবর এসেছে। একটা টিম কাল দেগঙ্গা গিয়ে পৌঁছাবে। আই বিলিভ দেগঙ্গা ইজ নিয়ার বারাসাট—

মঞ্জুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রেসিডেণ্ট—তিন লাখ স্কুল ফাইনালীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, ভেরি নিয়ার স্যার।

প্রাইম মিনিস্টার বললেন, আমাদেরও একটা ভুল হয়ে গেছে—ওখানেই আমরা এশিয়ার টলেস্ট বুস্টার টাওয়ার বসিয়েছি। সায়েদ ডরনা নেহি।

শেষে না সব কোশ্চেন আবার লিক্ হয়—এই ভয়ে মঞ্জুগোপাল বললেন, ওটাকে মাঝখান থেকে ভেঙে আধখানা করে দেওয়া যায় না স্যার?

প্রাইম মিনিস্টার এবারও বললেন, সায়েদ ডরনা নেহি। উই উইল ডু—হোয়াট উই ক্যান ডু—

অঘোরবাবু ভোরবেলা উঠে তাঁর কালো গাই দুইছিলেন। হঠাৎ দেখেন—সামনে দাঁড়িয়ে কমাণ্ডোদের কমাণ্ডার। কি ব্যাপার?

দুধটা দেখি।

অঘোরবাবু এগিয়ে দিয়ে বললেন, একদম বটের আঠা। এ গাই আমার সাক্ষাৎ ভগবতী। নয়তো চার মাস গাভিন—এখনো এতটা দুধ দেয়?

কতটা দুধ?

অঘোরবাবু দেখলেন, কমাণ্ডারের মুখখানা গম্ভীর—গোল চালতার পারা। তা এবেলা-ওবেলা নিয়ে চার কিলো। এই দুধ খেয়েই আমার দাঁতের ব্যথা সেরে গেল—

তাই নাকি? আজ আমি সবটা দুধই নেব।

ঘেরো ভর্তি দুধ নিয়ে কমাণ্ডার তাঁর তাঁবুতে ফিরলেন। এসে দেখেন কীসব যন্ত্রপাতি হাতে জনা তিনেক বসে।

তারা বলল, আমরা অ্যাটমিক—

আর বলতে হবে না। এই দুধটা একবার দেখা দরকার।

ওরা ঘেরো ভর্তি দুধ নিয়ে চলে গেল। তারপর এল চিঠির ঝাঁপি নিয়ে তিন কমাণ্ডো। এই চিঠিখানা স্যার—বিশেষ করে ঠিকানাটা দেখুন—

ঠিকানা দেখে তো কমাণ্ডার চেয়ারে বসে পড়লেন ধপ করে। ইথারবাবা—!

সন্ধ্যের মুখে মুখে গাইগরুরা চরে ঘুরে গোহালে ফিরতেই প্রথমে অ্যারেস্ট হলো কালাচাঁদ। তার পেছনে পেছন গরুদেরও অ্যারেস্ট করলো কমাণ্ডোরা।

অ্যারেস্ট করেই গাইগরু সমেত কালাচাঁদকে চালান দিল তাঁবুতে।

দুধের রিপোর্টও এসে গেল সন্ধ্যে সন্ধ্যে। হাইলি রেডিয়েটেড্। দুধের ভেতর পরমাণু কিলবিল করছে।

তাঁবুর ভেতরেই কালাচাঁদের ইন্টারোগেশন শুরু হয়ে গেল। গরুদের তো ইন্টারোগেট করা যায় না। পরমাণুর লোকজন ওদের শিংয়ে যেই না গাইগারোমিটার বসিয়েছে—অমনি সারাটা তাঁবুর ভেতর বিপ বিপ আওয়াজ হতে লাগল। লাল কাঁটা খটাক্ করে সবটা ঘুরে গেল।

কমাণ্ডার বললেন, এ তো সিগনাল পাঠাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটমিকের লোকেরা ফ্লানেলের পটি দিয়ে ওদের শিং ভাল করে মুড়ে দিল। দিয়ে বলল, বলা যায় না—আবার কোন্ সিক্রেট ইথারে পাঠিয়ে রেডিও চ্যানেল, টি ভি চ্যানেল দখল করে রিলে করতে থাকে।

দেশলাই ভিজে। কমাণ্ডোদের কমাণ্ডার হেরিকেন কাৎ করে সিগারেট ধরালেন। সুখটান দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা কালাচাঁদকে বললেন, তারপর ইথারবাবা! কাদের হয়ে এসব কাজ চালানো হচ্ছিল।

কালাচাঁদ কিছু না বলে নিজের আকাটা দাড়ি চুলকালো।

কমাণ্ডোরা বলল, আগে স্যার বুস্টার টাওয়ারটা দেখা দরকার। নিশ্চয় ওখান থেকে সিগন্যাল রিলে করা হচ্ছিল।

টাওয়ারে উঠে যাও দু'জন। এক্ষুণি।

ঘণ্টাখানেকের ভেতর দুই কমাণ্ডো খানিক সুতোলি সমেত একটা রঙচটা ঘুড়ি দিয়ে টাওয়ার থেকে নেমে এল। সন্ধ্যেরাতের অন্ধকারে।

কমাণ্ডার ধমকে উঠলেন কালাচাঁদকে। গাইগরুগুলোকে এরকম রেডিও অ্যাকটিভ করার মানে?

তখনো কালাচাঁদ না-কামানো গাল চুলকোচ্ছিল।

কমাণ্ডার দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, দিল্লিতে রেডিও মেসেজ পাঠাচ্ছি। দেখি কি রিপ্লাই আসে। তারপর তোমার মেরামতি হবে—ভাল চাও তো এক্ষুণি মুখ খোলো।

কালাচাঁদ বলল, আমি কিছুই জানি না স্যার। বাবা বলায়—আমি ওদের রগড়ে ভাল করে চান করিয়েছি খালে—

অ্যাটমিকের লোকরা জানতে চাইল, কোন্ খালে?

ইরিগেশন ক্যানেলে—সবাই যেখানে গরু-মোষ ধোলাই করে।

কমাণ্ডার জানতে চাইলেন, কি দিয়ে রগড়ালে?

কেন? সারের বস্তা দিয়ে স্যার।

কমাণ্ডার চোখ টিপলেন। অমনি দু'জন কমাণ্ডো নিয়ে অ্যাটমিকের লোকজন ছুটলো অঘোরবাবুর গোয়ালে। খানিক বাদে তারা ফিরে এল, কয়েকটা ছেঁড়া সারের বস্তা হাতে।

আলোয় একটা বস্তা তুলে ধরলেন কমাণ্ডার। তাতে লেখা—সি সি সি পি। তিনি বললেন, হুম। এ যে দেখছি সিনথেটিক বস্তা—রাশিয়া থেকে ইমপোর্ট করানো।

কালাচাঁদ বলল, বাবা আস্ত বস্তা ধরে সার কেনে-

শাট আপ। ধমক দিয়ে কমাণ্ডার ওয়ারলেস সেটের সামনে বসলেন। সেট চালু করার আগে অ্যাটমিকের লোকদের বললেন, বস্তা, ঘুড়ি, ঘুড়ির সুতো টেস্ট করে দেখুন—

ওরা স্যাম্পেল নিয়ে চলে গেল।

এমন সময় দুই কমাণ্ডো খটাক্ করে পা ঠুকে একসঙ্গে স্যালুট করে দাঁড়ালো।

কি ব্যাপার? এখন আমি দিল্লির সঙ্গে কথা বলবো। কোনোরকম ডিস্টারব্যান্স টলারেট করবো না।

গাইগরুগুলো তাঁবু ছিঁড়ে ফেলছে ঢুঁসিয়ে। গোবরে চোনায় রসাতল দশা। টেলিফোনের তার চিবিয়ে চিবিয়ে কেটে ফেলেছে।

তবু তোয়াজ করে যাও। শিং থেকে ফ্লানেলের পটি যেন খসে না পড়ে। কারও গায়ে হাত দেওয়া চলবে না—

এক কমাণ্ডো বলল, কারও কথা শুনছে না। এখন ওদের ডিনার টাইম স্যার।

এখানে জাবনা পাবে কোথায়? কিচেন থেকে আলু-পটল যা আছে—দিয়ে যেতে থাকো। ওরা যে রেডিও অ্যাকটিভ গাই। ওরাই এ কেসে প্রাইম এভিডেন্স।

কমাণ্ডো দু'জন মনমরা হয়ে ফিরে গেল। কালাচাঁদ দাড়ি চুলকোতে লাগলো। কমাণ্ডার ওয়ারলেস সেট খুলে নিজের সাংকেতিক নাম বলতে লাগলো—

পিকক্ স্পিকিং। পিকক্ স্পিকিং। হ্যালো দিল্লি। পিকক্ স্পিকিং—

অ্যাটমিকের লোকজন হুড়মুড় করে ছুটে এসে তাঁবুতে ঢুকলো। তারা উত্তেজিত। ঘুড়ি, সুতলি, বস্তা—সবই রেডিও অ্যাকটিভ স্যার—

দাঁত চেপে কমাণ্ডার বললেন, সায়লেন্স!

খানিকবাদে ওয়ারলেসে কথাবার্তা শেষ হলে চারদিকে সাজো সাজো রব পড়ে গেল। হেলিকপ্টারগুলো গর্জে উঠলো। তাঁবু খুলে ফেলা হতে লাগলো।

আশপাশের লোকজন ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই নিশুতি রাতে স্কুলমাঠ ফর্সা হয়ে গেল। গরুদের ভাগ ভাগ করে তিন হেলিকপ্টারে তোলা হলো। গাই পিছু একজন কমাণ্ডো আর একজন করে অ্যাটমিকের লোক। গরুদের শিং ফ্যানেলের পটি পেঁচিয়ে লিউকোপ্লাস্টার দিয়ে আটকানো। বড় হেলিকপ্টারটায় কালাচাঁদের পাশে বসলেন খোদ কমান্ডার। নিজে পাশে না বসলে যেন ইথারবাবা উড়ে যেতে পারে।

প্রথমে দমদম। তারপর সেখানে সেই এ এন-১২ মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট প্লেনের পেটে তাঁবু, গাইগরু সমেত সবাই দিব্যি ঢুকে গেল।

তখনো আকাশ অন্ধকার। প্লেন এসে নামলো—দিল্লির নতুন ইন্দিরা গান্ধী ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে।

প্লেন থেকে নামিয়ে গাইগরুদের তোলা হলো ওয়েপন ক্যারিয়ারে। কালাচাঁদদের চড়তে হলো জিপে। সবটাই ঘটলো শেষ রাতের অন্ধকারে।

আর্মি হেড কোয়ার্টারে জিজ্ঞাসাবাদের টেবিলে ইণ্টারোগেশন অফিসারের পাশে সাত সকালে খোদ জেনারেল সুন্দররাজকে দেখতে পেয়ে কমাণ্ডোদের কমাণ্ডার তো অবাক। স্বয়ং প্রধান সেনাপতি। না জানি কত বড় কেস। চাই কি প্রমোশন নাচছে তার কপালে এ যাত্রায়।

জেনারেল প্রথমেই বললেন, প্রিজনারের হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিন।

কমাণ্ডার ছুটে গিয়ে কালাচাঁদের হাতকড়া খুলে দিলেন।

এবার ওঁকে ভাল করে বসতে দিন।

কমাণ্ডার অবাক। ভয়ে কালাচাঁদের গলা শুকিয়ে কাঠ।

অনেক হয়রানি গেল আপনার।

কমাণ্ডার তো হতভম্ব। ঘরের বাইরে গরুগুলো ছাড়া পেয়ে প্রায় একসঙ্গে হাম্বা হাম্বা করে ডেকে উঠলো। একজন দেশদ্রোহীকে নিয়ে আর্মি চিফ এ কি আদিখ্যেতা জুড়ে দিলেন?

আশ্চর্য!

অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল কমাণ্ডারের।

জেনারেল বললেন, চা? না, কফি?

কালাচাঁদ কোনোক্রমে বলল, ভোরে আমরা দুধ খাই।

জেনারেল বললেন, আশা করি বুঝতে পারবেন—এই গাইদের দুধ কেন আপনাকে দেওয়া যাবে না!—আপনার অজানা কিছুই নেই তা আমরা জানি।—বলেই অর্ডারলিকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন জেনারেল।

এক কিলো দুধ ধরে এমন এক গ্লাসে দুধ এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কালাচাঁদ চোঁ চোঁ করে দুধটা মেরে দিল।

তখন জেনারেল বলে চলেছেন, কেটলিতে ফুটন্ত জল দেখে একদিন বাষ্পের শক্তির আন্দাজ করেছিলেন একজন মহান বিজ্ঞানী। তার ফলে আমরা পেলাম স্টিম ইনজিন। এ ভাবে গ্রাহাম বেল, টমাস এডিসন আলভাদের মতো বিজ্ঞানীদেরও নাম করা যায়। আপনি জানেন না—আপনার অজান্তে আপনি আপনার দেশের মাউণ্টেন ওয়ারফেয়ারে কত বড় নোহাউ আবিষ্কার করে বসে আছেন। প্রাইম মিনিস্টার কাল গভীর রাতে আমায় ডেকে পাঠান। এতক্ষণে নিশ্চয় অর্ডার সই করেছেন তিনি। আজ থেকে আপনি ইণ্ডিয়ান আর্মির অনারারি লেফটেনাণ্ট কর্নেল।

কমাণ্ডারের চেয়েও বেশি অবাক স্বয়ং কালাচাঁদ। সে একদম বোবা হয়ে গেল।

তখনো জেনারেল সুন্দররাজ হেসে হেসে বলে চলেছেন—ক'মাস আগে রাশিয়ার চেরনোবিলে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটে। তার কাছাকাছি কৃষ্ণ সাগরের বন্দর ইলিয়েভিচে দু'খানা ইণ্ডিয়ান জাহাজ চা আর গম নামিয়ে দিতে যায়। ফেরার পথে ওরা চেরনোবিলের স্ল্যাগ থেকে বানানো সারভর্তি বস্তা বোঝাই নিয়ে ফিরেছিল। এই সার ইণ্ডিয়ার যেখানে যেখানে গেছে—তার ভেতর দেগঙ্গাও ছিল। অ্যাটমিক এনার্জির তদন্ত রিপোর্ট, বুস্টার টাওয়ারে লটকানো ভোকাটা ঘুড়ি আর সুতোলি—এমনকি গাইগরুদের শিং ওই সারের বস্তা দিয়ে রগড়ে চান করানোর স্টোরিও আমাদের সিচুয়েশন রুমে এসে যায় রাত এগারোটার ভেতর। তখনই আমরা রেডিও অ্যাকটিভ শিং, সুতোলি, ঘুড়ি আর বস্তার রহস্য ভেদ করি।

শুনতে শুনতে কালাচাঁদের মাথা গুলিয়ে গেল।

জেনারেল বললেন, র, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স—সবাই ভেবে ভেবে মাথা খাটিয়ে খেলছিল। বাই জোভ! গাই কি করে স্পাই হয়! ক্লুটা আমার মাথায় এসে গেল রাত যখন প্রায় বারোটা। আর তখনই বুঝলাম—এবার বর্ডারে এনিমির বিরুদ্ধে আমরা যদি হিউম্যান ওয়েভের পর ওয়েভ পাঠাই তো—এনিমির মতো সবচেয়ে আগে যাবে বড় শিংয়ের গাইগরু—আর সে গাইগরুর শিং থাকবে রেডিও অ্যাকটিভ—যা কিনা এনিমির রেডিও ওয়েভ ভুলভাল, আনতাবড়ি সিগন্যাল পাঠিয়ে বানচাল করে দেবে—ওরা ঘাবড়ে যাবে। আপনার জন্যেই আমরা এখানে টেক্কা দিতে পারবো। এনিমিকে ঘাবড়ানো সম্ভব হবে।

ক্লুটা মাথায় আসতেই আমি নিজে পি এম-কে সব জানিয়ে ফোন করি। আধঘণ্টা পরে পি এম নিজে আমায় ডেকে পাঠান।

এখন পাঠকদের আশা করি বুঝতে অসুবিধে হবে না—কেন গোড়ায় টি ভি-তে বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখানো স্থির ছিল না। কেনই বা এবার গোড়াতেই নম্বর সমেত স্কুল ফাইনালের গেজেট বের করা হয়নি। কেনই বা বিশ্বকাপ ফাইনালের পর স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট বের করা হলো।

সব কিছু গোপন জিনিস ঘন ঘন টি ভি-তে লিক্ হয়ে যাচ্ছিল দেখে বোর্ড অব সেকেণ্ডারি এডুকেশনের প্রেসিডেণ্ট মঞ্জুগোপাল বাঁড়ুজ্যে ভয়ঙ্কর আতঙ্কে ভুগছিলেন। ভয় থেকে এত সব ভণ্ডুল।

এবার স্বাধীনতা দিবসে টি ভি-তে সবাই নিশ্চয় দেখেছেন- প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে কালাচাঁদ পি ভি এস এম পদক নিচ্ছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কালাচাঁদের বুকে পরম বিশিষ্ট সেবা মেডেল লটকে দিচ্ছেন। মিলিটারির এক নম্বর মেডেল। টি ভি-র স্ক্রিন জুড়ে লেফটেনাণ্ট কর্নেল কালাচাঁদ পি ভি এস এম-এর বুকে মেডেলখানা ঝক্‌ঝক্ করে উঠছিল। পরদিন কাগজেও বেরিয়েছিল—র‍্যানডম রেডিও ওয়েভ চ্যানেল আবিষ্কর্তার বিশেষ সম্মান।

[শারদীয়া ১৩৯৩]

তিনটি ছবির রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মধুপুরে আমার মামাবাড়ির পাশেই ছিল একটা শুকনো নদী। আমি কোনোদিন সে নদীতে এক ফোঁটাও জল দেখিনি। কিন্তু একসময় নাকি সে নদীতে সারা বছরই জল থাকতো। কুলুকুলু করে স্রোতের শব্দও হত।

এখন নদীটা একেবারে মজে গেছে।

শুধু দু'দিকের উঁচু পাড়ের মাঝখানে খাতটা বোঝা যায়।

যখন এ নদী জ্যান্ত ছিল, তখন এর নাম ছিল মধুবংশী। নামটা শুনতে সুন্দর, কিন্তু কেন এরকম নাম তা এখন আর কেউ জানে না।

ছোটবেলায় আমরা ঐ শুকনো নদীর খাতে নেমে লুকোচুরি খেলতাম। একটু বড় হবার পর আমি ওখানে একটা শিমুল গাছের তলায় বসে ছবি আঁকতাম রোজ।

আর্ট কলেজে ভর্তি হবার পর আমাদের মাস্টারমশাই অশোকদা বলে দিয়েছিলেন, যখনই সময় পাবে একটা বড় খাতায় স্কেচ করবে। চোখের সামনে যা দেখবে, তাই-ই এঁকে ফেলবে। যা চোখের সামনে নেই, এমন কিছুও মন থেকে আঁকতে পারো। ভালো হোক, খারাপ হোক, এঁকে যাবে। ভালো আঁকা শেখার এই একমাত্র উপায়।

অশোকদার সেই কথা শুনে আমার নেশা ধরে গিয়েছিল। বড় খাতাটা নিয়ে ঘুরতাম সব সময়, যেখানে-সেখানে বসে শুরু করতাম আঁকা। হাওড়া স্টেশনে এসে একদিন জানা গেল, ট্রেন দু'ঘণ্টা লেট, অপেক্ষা করতে হবে। অমনি আমি প্ল্যাটফর্মে বসে পড়ে স্কেচবুকটা খুলে শুরু করে দিয়েছি আঁকতে।

বছরে দু'বার আমরা যেতাম মধুপুর। গরমের ছুটিতে, আর পুজোর সময়।

আমার দাদু খুব শখ করে এই বাড়িটা বানিয়েছিলেন। বাড়িটা তেমন বড় নয়, কিন্তু অনেকখানি বাগান। আর একপাশে তো একটা নদী ছিলই।

এখন দুই মামাই থাকেন বিদেশে। একমাত্র বড়মামা যান মধুপুরে। কিন্তু তাঁর শরীর ভালো নয়, তিনি ভাবছেন বাড়িটা বিক্রি করে দেবেন। সেটা শুনলে আমাদের খারাপ লাগে, কিন্তু কী আর করা যাবে। বাড়িটা বিক্রি হয়ে যাবার আগে আমার বারবার যেতে ইচ্ছে হয়। কলকাতা থেকে আর কেউ না গেলে আমি একাই চলে যাই।

সে বাড়িটা পাহারা দেয় মঙ্গল সিং, বাগানের একধারে তার কোয়ার্টার। তার বউ, দুই ছেলে, এক ছেলের বউও থাকে সেখানে। বড়মামা অবশ্য বলে রেখেছেন, বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলেও তিনি মঙ্গল সিংকে বাগানের খানিকটা অংশের জমি লিখে দেবেন।

আমি একা মধুপুরে হাজির হলে মঙ্গল সিং-এর বাড়ি থেকেই আমার জন্য খাবার-টাবার আসে। ওরাই আমার দেখাশুনো করে।

শিমুল গাছতলায় ওরা আমার জন্য চেয়ার-টেবিল পেতে দেয়। আমি বসে বসে ছবি আঁকি সারা দিন।

আগে মামাতো ভাই-বোনেরা অনেকে আসতো, সব সময় হাসি, মজা, গল্পে সরগরম থাকতো জায়গাটা। এখন প্রায় নিঝুম। কাছাকাছি আর বাড়ি নেই। অন্য লোকজনও এদিকে বিশেষ আসে না।

আমার খাতাখানা ছবিতে প্রায় ভরে গেছে। অবশ্য আরও একটা খাতাও আছে, সেটা বেশ বড়। দশ দিন থাকবো, দুটো খাতাই ভর্তি করে নিয়ে যেতে পারলে বেশ হয়।

দু'জনেব সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা আছে। আর্ট কলেজে আমার ঠিক পাশেই বসে অতীশ আর সঙঘমিত্রা। যদিও বসে একেবারে সামনের দিকে, তবুও মাঝে মাঝেই আমরা মিলিয়ে দেখি, কে কতটা স্কেচ করেছে। অতীশ সব সময়েই আমার থেকে এগিয়ে থাকে, যে-কোনো জিনিস দেখেই ও স্কেচ করে ফেলতে পারে ঝটাপট। আর সঙঘমিত্রা অত তাড়াতাড়ি আঁকতে পারে না, সে ধরে ধরে আঁকে, সংখ্যায় কম হলেও তার ছবিগুলোই বেশি ভালো হয়।

আমি বেশির ভাগ ছবিই দেখে দেখে আঁকি। অতীশ সবই আঁকে মন থেকে। ও গাছপালার ছবি একেবারে পছন্দ করে না। নানা রকমের মানুষ আর জীবজন্তুর ছবিই বেশি আঁকে।

আমাদের মাস্টারমশাই অশোকদা অবশ্য বলেছেন, কিছু একটা দেখে দেখে আঁকাও দরকার। একটা গাছকেও ঠিক মতন আঁকা মোটেই সহজ নয়।

শিমুল গাছতলায় বসে, চতুর্দিকে যা দেখা যায়, তা প্রায় সবই আমার আঁকা হয়ে গেছে। একই জিনিস বারবারও আঁকা যায়। এখান থেকে দেখা যায় মাঠের শেষ প্রান্তে দুটো ছোট ছোট পাহাড়ের রেখা। বৃষ্টির সময় কিংবা মেঘলা দিনে সেই পাহাড় অন্যরকম দেখায়। তিন-চারখানা ছবি এঁকেছি সেই পাহাড়ের।

সঙঘমিত্রা পাহাড় আঁকতে ভালোবাসে। আমার কাছে মধুপুরের এই বাড়িটার গল্প শুনে ও আমাকে অনেকবার বলেছে, একবার আমাকে নিয়ে চল না, আমিও তোর পাশে বসে ছবি আঁকবো।

আমি বলেছি, যখই ইচ্ছে যেতে পারিস। অনেক ঘর খালি পড়ে আছে। খাওয়া-দাওয়ারও কোনো অসুবিধে নেই।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর ওর আসা হয় না। একটা না একটা কারণে আটকে যায়। এইবারেই তো আমার সঙ্গে আসবে বলে সব ঠিকঠাক, হঠাৎ ওর জামাইবাবুর সঙ্গে চলে গেল দেরাদুন। সেখানে অবশ্য অনেক বড় বড় পাহাড় দেখতে পাবে।

অতীশ কলকাতার বাইরে বিশেষ যেতে পারে না। ও একটা টিউশানি করে।

সেদিন বিকেলে আমি হঠাৎ একটা বাঘ আঁকতে শুরু করলাম। কেন হঠাৎ বাঘ আঁকার কথা মনে এলো, তা জানি না। চিড়িয়াখানার বাইরে আমি কখনো বাঘ দেখিনি। মনে যখন এসেছে, তখন আঁকতে ক্ষতি কী? সত্যিকারের বাঘ কিংবা বাঘের ছবিও না দেখে মন থেকে ঠিকঠাক আঁকা মোটেই সহজ নয়।

আঁকতে আঁকতে সন্ধে হয়ে গেল।

কিন্তু আঁকার নেশা একবাব ধরে গেলে আর ছাড়া যায় না। এখানে আলো নেই, তাই বাড়ির মধ্যে ঢুকে ছবিটা শেষ করতে বসলাম। মনে হল, ভালোই হয়েছে, ঠিক বাঘ বাঘ দেখাচ্ছে।

তারপর মনে হল, শুধু স্কেচ করার বদলে এটার গায়ে রং দিলে আরও বিশ্বাসযোগ্য হবে।

হলদে, কালো, আরও সব রঙই আছে। রং দেওয়া যখন শেষ হল, তখন আমি হঠাৎ একটা তীব্র গন্ধ পেলাম। এটা কিসের গন্ধ? ইঁদুর মরে পচে গেছে নাকি? না তো, এ গন্ধ অন্যরকম। মনে পড়লো, চিড়িয়াখানায় গিয়ে এই গন্ধ পেয়েছি বাঘের খাঁচার সামনে!

প্রথমে একটু ভয় পেলেও একটু পরে মজাই লাগলো। এখানে তো বাঘ আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আমি বাঘের ছবি আঁকছি, অমনি বাঘের গন্ধ পেলাম, এ তো সবই মনের ব্যাপার।

আসল মজাটা হল পরদিন সকালে।

ঘুম ভাঙলো মঙ্গল সিং আর তার ছেলেদের চেঁচামেচিতে। তারা উত্তেজিত ভাবে কী যেন বলাবলি করছে।

বাইরে এসে দেখি, মঙ্গল সিংয়ের দু'হাতে ধরা রয়েছে একটা বেশ বড় সাইজের বেড়াল। সেটা ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করছে।

মঙ্গল সিং বললো, দেখো খোকাবাবু, একঠো শের আয়া। শের!

মঙ্গল সিং আমার জন্মের আগে থেকেই এ বাড়িতে আছে। সেই জন্য আমাকে খোকাবাবু বলে।

শের, মানে বাঘ? যাঃ, তা কখনো হয়? মধুপুরে বাঘ আসবে কোথা থেকে? কাছাকাছি জঙ্গল-টঙ্গল কিছু নেই। নিশ্চয়ই একটা বিড়ালকে ধরে মজা করছে আমার সঙ্গে।

কাছে গিয়ে দেখি, বেড়াল তো নয়। গায়ে গোল গোল ছাপ। মুখটাও একটু অন্যরকম। একটা চিতাবাঘের বাচ্চা! এগুলোকে বলে লেপার্ড।

কিন্তু আমি কাল রাত্তিরে একটা বাঘ আঁকলাম, আর অমনি আজ সকালে একটা বাঘ এসে গেল? একেই বলে কাকতালীয়!

মঙ্গল সিং বললো, এই বাচ্চা শেরটা শুকনো নদীর খাতে খেলা করছিল।

কী করে যে বাঘের বাচ্চাটা এলো সেখানে, তার কোনো কারণই খুঁজে পাওয়া গেল না। আমি বাঘের ছবি এঁকেছি বলেই একটা জ্যান্ত বাঘ এসেছে, একথা বললে সবাই হাসতো নিশ্চয়ই।

একজন রিকশাওয়ালা বললো, বাচ্চাটাকে আমায় দিয়ে দাও, আমি পুষবো!

হৈ হৈ করে আপত্তি জানালো মঙ্গল সিং-এর দুই ছেলে।

কারুকে দেওয়া হবে না, তারাই বাঘটা পুষবে।

একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হল বাচ্চাটাকে।

কী করে যে রটে গেল খবর, দুপুরের দিকে অনেকেই এসে পড়লো বাঘ দেখতে।

বাঘ অতি হিংস্র প্রাণী, কিন্তু বাচ্চা বয়সে ভারি সুন্দর দেখায়। এর গায়ের চামড়াটা যেন মলমলের মতন। চোখ দুটো দারুণ ধারালো।

পরদিন দুপুরবেলা আমি আবার শিমুল গাছতলায় আঁকতে বসেছি, হঠাৎ একসময় চোখ তুলে দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। খুব মন দিয়ে আঁকছিলাম, তাই লোকটির পায়ের আওয়াজ শুনতে পাইনি।

লোকটির যেমন বিচিত্র পোশাক, তেমনই অদ্ভুত চেহারা।

মাথার চুলে সন্ন্যাসীদের মতন জটা, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, একটা চশমা পরা, তার একটি ডাঁটি ভাঙা। তার গায়ের লম্বা আলখাল্লাটাও অনেক রঙের। তার মানে নানা রকম টুকরো টুকরো কাপড় সেলাই করা। তার কাঁধ থেকে ঝুলছে তিন-চারটে থলে, সেগুলোও নানা রঙের। তার মধ্যে একটা থলের মধ্যে জ্যান্ত কিছু আছে, সেটা নড়ছে।

তার ডান হাতে একটা বর্শা।

লোকটিকে দেখে আমার বুকটা একবার কেঁপে উঠলো। অবশ্য, দুপুরবেলা একজন জলজ্যান্ত মানুষকে দেখে ভয় পাবার কী আছে? তবু, দু'একজন মানুষকে দেখলে এমনিই একটু ভয় ভয় করে।

লোকটি হঠাৎ এলো কোথা থেকে?

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে গম্ভীরভাবে বললে, জয় মহাদেব! মেরা বাচ্চা কিধার হায়?

আমি বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করলাম, আপনার ছেলে? এখানো কোনো বাচ্চা ছেলেকে তো কোথাও দেখিনি।

লোকটি হিন্দিতে বললে, বাচ্চা ছেলে নয়। বাঘের বাচ্চা। সেটা আমার। সেটা এখানে এসেছে আমি জানি। আমি গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এখানে এসেছি।

আমি বললাম, একটা বাঘের বাচ্চা এখানে এসেছে ঠিকই। কিন্তু সেটা আপনার কী করে হল?

লোকটি বললো, আমি বাঘ পুষি। আমার ঝোলায় সব সময় সাপ থাকে, বেজি থাকে, শিয়াল থাকে। আমি এদের নিয়ে ঘুরে বেড়াই।

আমি জিগ্যেস করলাম, কোথায় ঘুরে বেড়ান?

লোকটি বললো, কখনো স্বর্গে, কখনো নরকে। সে তুমি বুঝবে না। আমার বাচ্চা ফেরত দাও।

মঙ্গল সিংদের বাড়ির সামনে দড়ি দিয়ে বাঁধা লেপার্ডের বাচ্চাটা খুব জোরে জোরে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শুরু করেছে।

সেখানে মঙ্গল সিং-এর এক ছেলেকে দেখে আমি জোরে বললাম, বুধন সিং, বাচ্চাটাকে এখানে নিয়ে এসো তো?

বুধন সিং বাচ্চাটাকে নিয়ে এলো।

সেই লোকটির কাছে আসতেই বাচ্চাটা জোরাজুরি করে এক লাফ দিয়ে বুধন সিং-এর কোল থেকে নেমে সেই লোকটার পায়ে মাথা ঘষতে লাগলো। ঠিক পোষা কুকুরের মতন।

লোকটি বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে বললো, আহা-হা, এর গলা কে বেঁধেছে? এর দুখ্ লাগছে। আহা হা! ঠিক হ্যায়, ব্যচ্চু, তোর আর দুখ্ লাগবে না।

সে বাচ্চটার গলা থেকে দড়িটা খুলে দিল।

এ বাচ্চাটা যে ঐ লোকটিরই পোষা, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। সুতরাং ওকে ফেরত দিতেই হবে।

লোকটি বুধনের দিকে তাকিয়ে বললো, এক গিলাস পানি পিলাওগে?

বুধন দৌড়ে গেল জল আনতে।

আমি আমাদের বাড়িতে দেখেছি, বাইরের কোনো লোক জল চাইলে, তাকে শুধু জল দিতে নেই। মা-মাসিরা জলের সঙ্গে কিছু না কিছু মিষ্টিও দিতেন। এখানে এখন মিষ্টি কোথায় পাবো?

তাই জিগ্যেস করলাম, আমাদের এই বাগানে ভালো আম হয়েছে, আপনি আম খাবেন?

লোকটি এক হাত নেড়ে বললো, আমি কারুর বাড়িতে জল ছাড়া অন্য কিছু খাই না।

এবারে আমি ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলাম, তা হলে আপনি খিদের সময় খাবার খান কোথায়?

লোকটি বর্শাটা ওপরের দিকে তুলে বললো, ঐখানে থেকে খসে খসে পড়ে!

এমন অদ্ভুত লোকও আমি দেখিনি। এমন অদ্ভুত কথাও আগে শুনিনি। আকাশ থেকে খসে খসে পড়ে খাবার?

লোকটি চলে গেল জল খেয়েই। বাঘের বাচ্চাটা দৌড়তে লাগল তার পায়ে পায়ে।

বুধনের বেশ মন খারাপ হয়ে গেল। সে বাচ্চাটা পুষবে ঠিক করেছিল। তবে সে নিজেই বললো, জানো তো নীলুবাবু, এই সব মুসাফিররা খুব রাগী হয়। ওদের কথা না শুনলে এমন অভিশাপ দেয় যে পাথরেও আগুন জ্বলে যায়।

এরপর আমি সেই লোকটির ছবি আঁকার চেষ্টা করলাম। দু'তিন বার চেষ্টাতেও ঠিক হল না। ওকে সামনে দাঁড় করিয়ে আঁকতে পারলে তবু হয়তো কিছু হত।

আমি ফিরে আসার ঠিক আগের দিন একটা সত্যিকারের আনন্দের ঘটনা ঘটলো। অনেকটা অবিশ্বাস্যও বটে।

সকালবেলা বসে আছি শিমুল গাছের তলায়। এখন ছবি আঁকতে শুরু করিনি। এখানে বসে চা-জলখাবার খেতেও ভালো লাগে।

একটু পরে শুনতে পেলাম অনেক দূরে একটা হৈ হৈ শব্দ হচ্ছে। একসঙ্গে অনেক লোক চ্যাঁচাচ্ছে, কিন্তু কোনো কথা বোঝা যাচ্ছে না।

এরকম গণ্ডগোল শুনলে প্রথমেই মনে হয়, কোথাও মারামারি শুরু হয়েছে বুঝি।

আমাকে খাবার দিতে এসে মঙ্গল সিং বললো, খোকাবাবু, তুমি কোঠির ভিতর গিয়ে বসো। দিনকাল ভালো নয়।

আমি বললাম, গণ্ডগোল তো হচ্ছে অনেক দূরে। এখানে ভয় পাবার কী আছে?

মঙ্গল সিং বললো, বুধনকে সাইকেল নিয়ে দেখে আসতে বলছি। কিন্তু তুমি সাবধানে থাকবে।

আমি বসে রইলাম সেখানেই। দূরে হৈচৈ চলতেই থাকলো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মনে হল, লোকজনের চিৎকার কিছুটা কাছে চলে আসছে। এখন আর শুধু চিৎকার নয়, তার মধ্যে শাঁখ বাজছে, মেয়েরা উলু দিচ্ছে।

শুকনো নদীটার দু'ধার দিয়ে কিছু লোক ছুটে আসছে এদিকেই।

তারপর দেখলাম, সেই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য।

শুধু মানুষ নয়, নদীর খাত দিয়ে ধেয়ে আসছে জল। ঘোলা জল, যেন টগবগ করে ফুটছে।

নদীর পাড়ে কিছু কিছু ছোট গাছ গজিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো ডুবে যাচ্ছে। ওদিক থেকে কিছু কিছু মাছ ভেসে আসছে, তাও দেখা যাচ্ছে। জল যেন আনন্দে লাফাচ্ছে। আমাদের বাড়ির খুব কাছেই বালি জমে জমে খাতটা একেবারে বুজে গিয়েছিল, সেখানে এসে থমকে গেল জলের স্রোত।

কিছু লোক কোদাল আর শাবল নিয়ে লাফিয়ে পড়লো। সেই বালির বাঁধ ভেঙে দিতে বেশি সময় লাগলো না। আবার জলের তোড় চলে এলো এদিকে। দেখতে দেখতে আমাদেব বাড়ির পাশটায় জেগে উঠলো সেই পুরোনো নদী।

এত জল আসছে কোথা থেকে? এখন তো বর্ষাকালও নয়। বর্ষা আসতে আরও দু'সপ্তাহ দেরি আছে। তা হলে একটা মরা নদী বেঁচে উঠলো কোন মন্ত্রে?

বুধন ফিরে আসার আগেই আমরা উত্তরটা জেনে গেলাম দৌড়ে আসা লোকজনের কাছ থেকে।

এখান থেকে এগারো মাইল দূরে একটা বড় নদী আছে। অনেক বছর আগে সেই নদীব একদিকে একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছিল বন্যা আটকাবার জন্য। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। প্রত্যেক বছর সেই নদীর উল্টোদিক বন্যায় ডুবে যায়। আর এদিকের নদীগুলো গেল একেবারে শুকিয়ে।

এরকমই চলছিল বছরের পর বছর। এ বছর আর মানুষ বন্যায় ডুবতে রাজি নয়। কাল সারাদিন ধরে কয়েকশো মানুষ সেই বাঁধটা কেটে দিয়েছে। বড় নদীর জল ঢুকে পড়েছে ছোট নদীতে। প্রাণ ফিরে পেয়েছে মধুবংশী নদী।

বাড়ির ঠিক পাশেই একটা জ্যান্ত নদী থাকলে সে বাড়ির চেহারাই অন্যরকম হয়ে যায়। এতদিন ঐ নদীব খাতে গরু চরতো, এখন আবার নৌকো ভাসছে। ডুব দিচ্ছে মাছরাঙা পাখি। পাড়ে বসে আছে বক। সব দৃশ্যটাই অন্যরকম।

আমার কলেজ খুলে যাবে, তাই আর বেশিদিন থাকা গেল না। এখন ওখানে ছবি আঁকার অনেক নতুন বিষয় এসে গেছে।

ফিরে আসার পর নদীটার কথা শুনে সবচেয়ে বেশি খুশি হলেন বড়মামা। তিনি বললেন, তা হলে ভাবছি বাড়িটা বিক্রি না করলেও হয়। শেষ জীবনে ওখানেই গিয়ে থাকবো।

বাঘের বাচ্চার কথাটা অবশ্য বাড়ির কেউই বিশ্বাস করলো না। সকলেরই ধারণা, ওটা আমার বানানো গল্প।

আসল দুটো চমক কিন্তু এর পরেও বাকি ছিল।

আমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবি নিয়ে একটি প্রদর্শনী হবে, তা আগেই ঠিক ছিল। প্রত্যেকের একটা করে ছবি। বড় বড় শিল্পীরা এসে দেখে বিচার করবেন, কোন ছবিতে কী দোষ আছে বা গুণ আছে।

আমি ঠিক করলাম, আমার ঐ বাঘের ছবিটাই দেব। রংটা ঠিক করতে হবে, আর ভালো করে ফ্রেমে বাঁধাতে হবে।

অতীশ কী ছবি দিচ্ছে, জানবার জন্য গেলাম ওর বাড়িতে।

অতীশের নিজস্ব কোনো আঁকার জায়গা নেই, দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাটে থাকে সাতজন। ছাদে ওঠার সিঁড়িতে ও আঁকার জিনিসপত্র রাখে, ওখানেই বসে কাজ করে। একবার বৃষ্টিতে ওর অনেক ছবি ভিজে গিয়েছিল।

অতীশ তিন-চারখানা ছবি বেছে রেখেছে। সবই মানুষের ছবি। তার মধ্যে থেকে একটা ছবি তুলে ধরে বললো, ভাবছি, এটাই দেব।

ছবিটা দেখে আমার চোখ দুটো গোল হয়ে গেল।

এ তো সেই মধুপুরের মুসাফির, যে বাঘের বাচ্চা পোষে, অবিকল সেই চেহারা, সেই পোশাক, কাঁধে ঝুলছে কয়েকটা থলে, এমনকি চোখে ডাঁটিভাঙা চশমা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই লোকটির সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হল?

অতীশ একটু অবাক হয়ে বললো, কোথায় মানে? কোনো জায়গাতেই দেখা হয়নি। মন থেকে এঁকেছি।

আমি বললাম, একদম মন থেকে? এরকম একটা অদ্ভুত চেহারার লোকের চেহারা তোর মনে এল কী করে?

অতীশ বললো, আমি ভাবলুম, ঠিক সাধুও নয়, সাধারণ পথিকও নয়, এমন একজনকে আঁকবো, যে শুধু পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, এই থলেগুলোর মধ্যেই যার পুরো সংসার।

আমি জিগ্যেস করলাম, অতীশ, তুই চশমা পরা মুসাফিরও দেখিসনি কখনো?

অতীশ হেসে বললো, না, দেখিনি। চশমাটা আগে ছিলও না। আজই সকালে ফাইনাল টাচ দেবার সময় কী খেয়াল হল, চশমাটা বসিয়ে দিলাম।

অতীশ কি মিথ্যে কথা বলছে? একবারও না দেখলে হুবহু এরকম একটা মানুষ আঁকা কী করে সম্ভব?

শুধু শুধু মিথ্যে কথাই বা বলবে কেন? ওর স্বভাব সেরকম নয়। বরং মুখের ওপর অনেক সত্যি কথা বলে দেবার সাহস ওর আছে।

এখন যদি আমি বলি, ঐ ছবির মানুষটিকে আমি জলজ্যান্ত দেখেছি, তা কি অতীশ বিশ্বাস করবে?

বলা হল না।

অতীশই বললো, চল সঙ্ঘমিত্রার বাড়িতে যাই। ও দেরাদুন থেকে আজই ফিরেছে। ওর বাড়িতে গেলে সিঙাড়া-সন্দেশ সাঁটানো যাবে, আর ওর নতুন ছবিও দেখা হবে।

সঙ্ঘমিত্রারা বেশ বড় বাড়িতে থাকে। ওর বাবা ওকে আঁকার জন্য দোতলায় একটা স্টুডিও বানিয়ে দিয়েছেন। সেই ছবির ঘরেই সে রাত্তিরে ঘুমোয়।

সে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অতীশ বললো, কী রে সঙ্ঘমিত্রা, বাইরে বসে কী সব ছবি-টবি আঁকলি দেখাবি না? আমরা তাই দেখতে এলাম।

সঙ্ঘমিত্রা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, চায়ের সময় হয়ে গেছে, তাই না? চা খেতে এসেছিস, না ছবি দেখতে?

আমি বললাম, চা তো খাবোই। শুধু চা নয়। আর কী খাওয়াবি?

সঙ্ঘমিত্রা বললো, আগে কিছুই খাওয়াবো না। যদি ছবি দেখতে চাস, আগে দেখতে হবে। খাওয়ার পর ছবি দেখার মুড থাকে না।

অতীশ বললো, তা হলে আজ ভালোই খাওয়া হবে মনে হচ্ছে। দেখি, আগেই ছবি দেখি।

সঙ্ঘমিত্রা পাঁচখানা ছবি দেখালো। সবই ক্যানভাসে তেল রঙে আঁকা। চারখানা ছবিই পাহাড়ের। আর পাঁচ নং ছবিটা আমাদের চোখের সামনে ধরে বললো, এটাই এবার একজিবিশানে দেব ভাবছি। এটাই আমার বেশি পছন্দ।

সে ছবিটার তলায় নাম লেখা, বার্থ অফ আ রিভার। একটি নদীর জন্ম।

আমি নিঃশব্দে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দূরে অস্পষ্ট পাহাড়ের রেখা, সামনের দিকে একটা ছোট নদী। ক্যানভাসের অর্ধেকটায় সে নদী জলে ভরা, অর্ধেকটা শুকনো। শুকনো দিকটায় একটা ছেলে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে।

অতীশ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললো, হ্যাঁ, বেশ ভালো হয়েছে। অর্ধেকটা জল বলে মনে হচ্ছে, নদীটা যেন একটু বাদেই ভরে যাবে। বেশ গতি আছে। বাঁশি বাজাচ্ছে, এই ছেলেটা কে রে? কেষ্ট ঠাকুর নাকি?

সঙ্ঘমিত্রা বললো, যাঃ দেখছিস না, হাফপ্যান্ট পরা। শ্রীকৃষ্ণ কখনো হাফপ্যান্ট পরে নাকি? যাতে ভুল না হয়, তাই হাফপ্যান্ট পরিয়েছি।

অতীশ বললো, ওর মাথায় একটা গামছা বেঁধে দিলে পারিস।

সঙ্ঘমিত্রা আমাকে জিগ্যেস করলো, কী রে নীলু, তুই কিছু বলছিস না যে।

আমি বললাম, খুবই ভালো হয়েছে। তবে এই নদীটা আমি চিনি। এর নাম মধুবংশী। মধু নামে একজন লোক এই নদীর ধারে বসে, একসময় বাঁশি বাজাতো!

সঙ্ঘমিত্রা জিগ্যেস করলো এই নদীটা তুই চিনিস? কোথায় দেখেছিস?

আমি বললাম, মধুপুরে।

সঙ্ঘমিত্রা একটু অবাক হয়ে বললো, তোর সেই মামার বাড়ির কাছে? সেখানে তো আমার যাওয়াই হল না এ পর্যন্ত। সে নদী তো আমি দেখিনি।

আমি বললাম, না গিয়েও অনেক কিছু দেখা যায়। এই নদীটা তুই কবে এঁকেছিস রে? ঠিক কত তারিখ?

সঙ্ঘমিত্রা হিসেব করে বললো, জুন মাসের দু'তারিখে।

আমার মনে পড়লো, মধুপুরের সেই নদীতে জল আসতে শুরু করে তিন তারিখ সকালে। নদীটা প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠার আগেই সঙ্ঘমিত্রা ওকে এঁকেছে। শিমুল গাছটা পর্যন্ত রয়েছে ঠিক জায়গায়।

সেবারে আমাদের প্রদর্শনীতে পাশাপাশি ছবি ছিল তিনটে। একটা বাঘ, একজন অদ্ভুত মুসাফির, আর একটি নদীর পুনর্জীবন। এই তিনটে ছবির পেছনে যে কী রহস্য আছে, তা অন্য কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না।

প্রদর্শনীর অন্য ছবিগুলোর পেছনেও এরকম রহস্য আছে কিনা, তা তো আমিও জানি না!

[শারদীয়া ১৪১৩]

দুই বন্ধুর কীর্তি

প্রফুল্ল রায়

যদিও সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, এখনও ভাল করে সকাল হয়নি। বম্বে, যার নতুন নাম মুম্বাই, দেশের পশ্চিম প্রান্তে বলে এখানে সূর্যোদয় হয় অনেক দেরিতে। এই মুহূর্তে চারদিকে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে ঠিকই, আকাশের গায়ে আবছা আবছা আলোর ছোপও ধরেছে। কিন্তু পঞ্চাশ ফুট দূরের কোনও কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না।

ছেলেবেলা থেকে সঞ্জুর খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস। পাঁচটা বাজলে সে আর শুয়ে থাকতে পারে না। হোটেলে তাদের ডবল-বেড রুমে অন্য একটা খাটে বাবা তখনও ঘুমোচ্ছেন। সে মেঝের কার্পেটের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে একটা বাইনোকুলার নিয়ে ঘরের লাগোয় ব্যালকনিতে চলে এসেছিল। ক'দিন ধরে ভোরের একটা দৃশ্য তাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলছে। এই নিয়ে তার নতুন বন্ধু রাজুর সঙ্গে মানে যার ভাল নাম রজত মেনন, অনেক কথাও হয়েছে। সঞ্জু একবার ডান পাশের একটা রুমের ব্যালকনির দিকে তাকাল। অন্য দিন এই সময় রাজুও ওখানে এসে দাঁড়ায়। আজ তাকে দেখা গেল না। নিশ্চয়ই ওর ঘুম এখনও ভাঙেনি।

সঞ্জুদের হোটেলের সামনে দিয়ে ঝকঝকে রাস্তা চলে গেছে। তার ওধারে লাইন দিয়ে উঁচু উঁচু নারকেল গাছ। তারপর সোনালি বালির জুহু বীচ, সারা পৃথিবী যার নাম জানে। বীচের গা থেকে আরব সাগর ধুধু দিগন্তে গিয়ে মিশেছে।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই অন্যদিনের মতো বীচে কিছু লোকজন চোখে পড়ছে। তবে কেমন যেন ঝাপসা মতো। সবাই এসেছে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য। কেউ জগিং করছে, কেউ দৌড়চ্ছে, কেউ বালির উপর শুয়ে বা বসে যোগাসন প্র্যাকটিস করছে। বয়স যাদের বেশি, তারা ধীরে ধীরে হাঁটাহাঁটি করছে।

বীচের দিকে লক্ষ্য ছিল না সঞ্জুর। কোনাকুনি রাস্তার ওপারে যে বিরাট দশতলা বাড়িটা— সেইদিকে সে তাকিয়ে আছে। রাস্তায় মানুষজন নেই। মুম্বাই শহরের ঘুম এত ভোরে কখনও ভাঙে না। অবশ্য স্বাস্থ্য নিয়ে যারা ভাবে কিংবা যাদের জরুরি কাজ থাকে তারা ছাড়া এসময় কেউ বিছানা ছেড়ে ওঠে না।

বিরাট বাড়িটার একতলা জুড়ে একটা ব্যাঙ্ক এবং ছোটখাট দু'চারটে অফিস। ওপরের তলাগুলোতে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের নানা জাতের মানুষ থাকে।

ক'দিন ধরে ভোরবেলার অস্পষ্ট আলোয় ক'টা লোককে দেখতে পাচ্ছিল সঞ্জু। নিজেদের মধ্যে কী পরামর্শ করে তারা ব্যাঙ্কটার তিন দিক ঘুরে ঘুরে দেখে চলে যাচ্ছিল। মিনিট পনের-কুড়ির বেশি তারা কোনও দিনই থাকেনি। একটা লম্বা জিপে করে ওরা আসত; আবার ওই গাড়িটাতেই চলে যেত।

আজ কিন্তু লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। এত দেরি করে তারা কখনও আসে না। সঞ্জু এবং রাজু, দু'জনেরই ধারণা হয়েছিল, লোকগুলোর মাথায় খারাপ কোনও মতলব আছে। ওরা যদি আর না আসে, ধরে নিতে হবে, তারা যা ভেবেছে সেটা পুরোপুরি ভুল।

সঞ্জুর বয়স চোদ্দ। এ বছর সে ক্লাস নাইনে উঠেছে। ডিটেকটিভ বইয়ের সে পোকা। তার

স্বপ্ন শার্লক হোমস বা হারকুল পয়রোর মতো দারুণ দারুণ কাণ্ডকারখানার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে রহস্যের সমাধান করা। মা-বাবা বলেন, আগে বড় হও, পড়াশোনা শেষ হোক, তারপর ওসব ভাবা যাবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! রহস্যের গন্ধ পেলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ নিয়ে মা-বাবাকে মাঝে মাঝে কম ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না। বড় বড় ডিটেকটিভদের মতো সঞ্জু বাইনোকুলার, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, অপরাধীদের খোঁজে উঁচু উঁচু বাড়িতে ওঠার জন্য হুক-লাগানো মজবুত দড়ি—পয়সা জমিয়ে জমিয়ে এমন অনেক কিছু কিনে ফেলেছে।

মা, বাবা, এক দিদি আর সঞ্জু—সব মিলিয়ে ওরা চারজন। বাবা অরিন্দম বসু একটা বিরাট কোম্পানির মস্ত অফিসার। হঠাৎ তাঁকে কলকাতা থেকে মুম্বাইতে বদলি করা হয়েছে। বাড়ির সবাইকে নিয়ে দিন দশেক আগে তিনি এখানে চলে এসেছেন। তাঁদের জন্য কোম্পানি পালি হিলে একটা ফ্ল্যাট দেবে। আপাতত সেটা রং করে, ফার্নিচার দিয়ে সাজানো হচ্ছে। যতদিন কাজটা শেষ না হয় সঞ্জুরা হোটেলে থাকবে।

সঞ্জুর বাবা যে কোম্পানিতে কাজ করেন, রাজুর বাবা রাধাকৃষ্ণ মেনন সেই একই কোম্পানির বড় অফিসার। উনি ছিলেন তিরুবন্তপুরমের অফিসে। সেখান থেকে অরিন্দম বসুর মতো তাঁকেও মুম্বাইতে ট্রান্সফার করে আনা হয়েছে। তিনিও সঙ্গে করে বাড়ির সবাইকে নিয়ে এসেছেন। একই হোটেলে তাঁদেরও রাখা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ মেননরা সব মিলিয়ে তিনজন। তিনি, তাঁর স্ত্রী জানকী মেনন এবং তাঁদের একমাত্র ছেলে রাজু। পালি হিলে সঞ্জুরা যে ফ্ল্যাটটায় গিয়ে উঠবে, তার পাশের ফ্ল্যাটটা দেওয়া হবে রাজুদের। সেটা এখন ঝেড়েপুঁছে ফিটফাট করা হচ্ছে।

রাজু সঞ্জুরই বয়সী। সেও এ বছর ক্লাস নাইনে উঠেছে। মুম্বাই আসার পর দু'জনকে একই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। সঞ্জুর দিদি লেডি ব্রাবোর্নে বি. এ. ফার্স্ট ইয়ারে পড়ত। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট এনে তারও এখানকার কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

ক'দিনই বা সঞ্জুরা মুম্বাইয়ে এসেছে! কিন্তু এর মধ্যেই রাজুর সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেছে। সারাদিন গল্প। হোটেলে আর কতক্ষণ থাকে! সামনের জুহু বীচে তো যায়ই। মুম্বাইতে বেড়াবার কি মোটে একটা জায়গা! আরও দূরে দূরে তারা চলে যায়। এয়ার-ইন্ডিয়া পার্ক, এসেল ওয়ার্ল্ড থেকে শুরু করে মেরিন ড্রাইভ, মালাবার হিলসের হ্যাঙ্গিং গার্ডেন, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া পর্যন্ত দেখে এসেছে। কাউকে না জানিয়েই গেছে। জানাতে গেলে মা-বাবারা একেবারেই রাজী হতেন না।

সঞ্জুর মতো রাজুও ডিটেকটিভ গল্প পড়তে ভীষণ ভালবাসে কিন্তু সত্যিকারের ডিটেকটিভ হবার কথা কখনও ভেবে দেখেনি। সঞ্জু যখন বলল, সে কলকাতায় দু'চারটে রহস্যের জট ছাড়িয়েছে এবং মুম্বাইতে এসে আরও একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে তখন রাজুর চোখ উৎসাহে চকচক করে উঠেছিল। মুম্বাইয়ের রহস্যটা কী, রাজু জানতে চাইলে ভোরবেলায় সেই লোকগুলোর কথা বলেছিল সঞ্জু। রাজু প্রায় লাফিয়ে উঠে বলেছে, সে-ও পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে ব্যালকনিতে এসে সন্দেহজনক লোকগুলোকে লক্ষ্য করবে। তাকে বাদ দিয়ে সঞ্জু যেন কিছু না করে। সঞ্জু একজন সহকারী পেয়ে খুশি হয়েছিল।...

যে দশতলা বাড়িটার তলায় ব্যাঙ্ক সেদিকে তাকিয়েই ছিল সঞ্জু। সে বেশ দমেই গেছে। একটা রহস্য হাতের মুঠোয় চলে আসতে আসতে হঠাৎ যেন ফসকে গেল।

লোকগুলো যখন আসবেই না তখন আর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। তার চেয়ে বরং রাজুকে ডেকে নিয়ে এক পাক নীচে ঘুরে আসা যাক। সে ঘরের দিকে পা বাড়াতে যাবে, হঠাৎ ডানদিক থেকে রাজুর চাপা গলা ভেসে এল, 'ওই দেখ, সেই জিপটা আসছে—'

কখন ঘুম ভাঙার পর রাজু পাশের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে, জানতে পারেনি সঞ্জু। একটু চমকে উঠে সে লক্ষ্য করল, সত্যিই চেনা জিপটা ডানদিকের একটা বাঁক ঘুরে এধারে আসছে। বলল, 'এখন আর কোনো কথা বলো না। চুপচাপ দেখে যাও ওরা কী করে। আমরা যে ওদের ওপর নজর রাখছি, একদম যাতে টের না পায়।'

রোজই এই কথাগুলো বলে সাবধান করে দেয় সঞ্জু। রাজু মাথা নেড়ে জানাল—আচ্ছা।

অন্যদিনের মতো লোকগুলো আজও ব্যাঙ্ক থেকে খানিকটা দূরে জিপ থামিয়ে নেমে পড়ল। আগে পাঁচজনের বেশি কখনও আসেনি। আজ দেখা গেল—সাতজন। সংখ্যাটা বেড়ে গেছে।

লোকগুলো নেমে ব্যাঙ্কের সামনে ভাগে ভাগে এমনভাবে দাঁড়াল যাতে মনে মনে অদৃশ্য লাইন টেনে ওদের জুড়ে দিলে একটা রেক্টেঙ্গল বা আয়তক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সেটা বোধহয় পছন্দ হলো না। আবার অন্যভাবে দাঁড়াল। এবার লাইন টানলে ত্রিভুজের আকার নেবে। কিন্তু সেটাও বোধহয় ভাল লাগল না। নিজেদের মধ্যে কী আলোচনার পর শেষপর্যন্ত পাঁচটা কোণ তৈরি করে দাঁড়ায়। তিন জায়গায় একজন করে, বাকি দু'জায়গায় দু'জন দু'জন। এবার কল্পিত লাইন টানলে পেন্টাগন বা পঞ্চভুজ হবে। খুব সম্ভব এই নকশাটাই লোকগুলোর মনে ধরল। তারা আর দাঁড়াল না। পায়ে পায়ে জিপটার দিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে অন্ধকার প্রায় কেটে গিয়ে আরও একটু আলো ফুটেছে। রাস্তায় দু'একটা অটো, ট্যাক্সি বেরিয়ে পড়েছে। বীচ ছাড়াও এধারে-ওধারে কিছু মানুষজন দেখা যাচ্ছে।

সেই লোকগুলো যখন জিপে উঠতে যাবে, রাজু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে সেই লোকটা না?' তার গলায় প্রবল উত্তেজনা।

রাজু যে লোকটার কথা বলল তাকে আগেও দেখেছে সঞ্জুরা। বার তিনেক জুহু বীচে। তা ছাড়া তাদের হোটেলের গায়ে যে পান-সিগারেট আর কোল্ড ড্রিংকসের দোকানটা আছে সেখানেও বেশ কয়েকবার। লোকটাকে মনে করে রাখার কারণ, যখনই পাশের দোকানটায় সে আসে, পর পর পাঁচ-ছ'বোতল কোল্ড ড্রিংকস খায়, তারপর দুটো সিগারেট ধরিয়ে অদ্ভুত কায়দায় আঙুলের ফাঁকে রেখে টানতে থাকে। একসঙ্গে এত কোল্ড ড্রিংক আর দুটো সিগারেট খেতে আগে আর কাউকে দেখেনি সঞ্জুরা। মনে রাখার আরও একটা কারণ, তার নাকের পাশে একটা বড়, কালো, বেঢপ সাইজের জড়ুল রয়েছে।

যারা রোজ ভোরে ব্যাঙ্কটার সামনে এসে পরামর্শ করে কী সব দেখে যায় তাদের দলে এই লোকটাকে আগে দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না সঞ্জু। দেখলেও চিনতে পারেনি। কেননা অন্য দিন ওরা যখন আসে তখন বেশ অন্ধকার থাকে।

আজ লোকটাকে দেখে রাজুর মতো সঞ্জুরও ভীষণ উত্তেজনা হচ্ছিল। সে কিন্তু রাজুর মতো চেঁচাল না, নিচু গলায় বলল, 'এখন কোনও কথা নয়।'

রাজু আর কিছু বলল না।

লোকগুলো যেদিক থেকে এসেছিল, জিপে উঠে সেদিকে চলে গেল।

জিপটা রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হবার পর রাজু জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কী করবে?'

সঞ্জু বলল, 'ভাবতে হবে। ব্রেকফাস্ট করে তুমি আর আমি নীচে যাব। হোটেলে বসে হবে না। কেউ শুনে ফেলবে। ফাঁকা জায়গায় ব্যাপারটা নিয়ে ভাল করে ডিসকাস করা দরকার।'

'ঠিক আছে।'

সকালের খাবার খেয়ে সাড়ে আটটায় দু'জনে জুহু বীচে চলে এল। এই সময়টা এখানে ভিড় কম থাকে। যারা স্বাস্থ্যের জন্য সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বীচে এসেছিল তাদের বেশির ভাগই ফিরে গেছে। বিশাল সমুদ্রতীর এখন প্রায় ফাঁকাই।

সঞ্জু আর রাজু জলের ধার ঘেঁষে বালির ওপর বসে পড়ল।

বর্ষাকাল বাদ দিলে আরব সাগর বছরের বাকি সময়টা বেশ শান্ত থাকে। এখন ছোট ছোট ঢেউ সকালের সোনালি আলো গায়ে মেখে বীচটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তবে সমুদ্রের দিক থেকে খুব জোরালো হাওয়া বইছে।

রাজু বলল, 'আমার কি মনে হয় জানো?'

সঞ্জু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিল; মুখ না ফিরিয়ে সে বলল, 'কী?'

'ওরা ওই বড় বিল্ডিংটার কাছে কিছু একটা করতে চায়।'

'কী করতে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সঞ্জু বলল, 'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।'

রাজু জিজ্ঞেস করল, 'কিসের আইডিয়া?'

'ওই জড়ুলওলা লোকটাকে খুঁজে বার করে যদি ওর ওপর নজর রাখি, বুঝতে পারব ওদের দলটা কী মতলব আঁটছে।'

'কিন্তু তাকে আমরা পাচ্ছি কোথায়?'

সঞ্জু বলল, 'আমার মনে হয়, লোকটা এদিকেই কোথাও থাকে।'

রাজু বলল, 'এটা মনে হলো কেন?'

'তিন দিন আগে বিকেলবেলায় লোকটা আমাদের হোটেলের পাশের সেই পান-সিগারেটের দোকানে কোল্ড ড্রিংক খাচ্ছিল। আমরা তখন বেড়াতে বেরুচ্ছিলাম।' বলে সঞ্জু জিজ্ঞেস করল, 'ওর পরনে কী ছিল মনে পড়ছে?'

অনেকক্ষণ চিন্তা করে রাজু জানাল, মনে নেই। কারণ সে ভাল করে লক্ষ্য করেনি।

সঞ্জু বলল, 'একটা সিল্কের লুঙ্গি আর গেঞ্জি। কাছাকাছি না থাকলে ওরকম পোশাকে কেউ বাইরে বেরোয় না।'

রাজু বলল, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু—'

'কী?'

'এখানে এত হোটেল আর এত হাই-রাইজ বিল্ডিং; এ সবের ভেতর থেকে খুঁজে বার করবে কী করে?'

'আরে বাবা, সারাক্ষণ কি আর লোকটা ঘরে বসে থাকবে? আমরা এখন অন্য কোনও দিকে বেড়াতে যাব না। বীচে আর এখানকার রাস্তায় ঘুরে বেড়াব। হোটেলগুলোতে গিয়ে ওর ডেসক্রিপশান দিয়ে খোঁজ করব। মনে হয় ওকে ঠিক পেয়ে যাব।'

'ধর, পেয়ে গেলে। তখন কী করবে?'

'সেটা এখনও ভাবিনি। আগে তো লোকটাকে পাই। তারপর দেখা যাবে।'

আলোচনা শেষ করে সঞ্জুরা কিছুক্ষণ বীচে ঘোরাঘুরি করল কিন্তু লোকটাকে দেখা গেল না। বীচ থেকে রাস্তায় যখন ওরা উঠে এল তখন মুম্বাই শহরের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে অজস্র মানুষ। অগুনতি গাড়ি স্রোতের মতো ছুটে চলেছে। এর ভেতরে থেকে বিশেষ একটা লোককে খুঁজে বার করা অসম্ভব ব্যাপার। তবু সঞ্জুরা চারদিকে নজর রাখতে লাগল।

দুপুরে হোটেলে এসে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ফের বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। এবার ওরা হানা দিল হোটেলগুলোতে। সন্ধ্যে পর্যন্ত একটার পর একটা হোটেলে গিয়ে রিসেপশানে লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইল, এরকম কেউ আছে কিনা। সব জায়গাতেই ওদের বলা হলো—নেই। রোজই হোটেলে নানা ধরনের লোক আসছে। তাদের সবার চেহারা রিসেপশানের লোকেদের পক্ষে মনে করে রাখা সম্ভব নয়। তবে কারও মুখে একটা বিশ্রী জড়ুল থাকলে নিশ্চয়ই ওদের চোখে পড়ত।

এরপর দুটো দিন সকাল থেকে রাত আটটা-ন'টা পর্যন্ত বীচ থেকে শুরু করে সামনের রাস্তা এবং সারি সারি দোকানগুলোতে গিয়ে দেখতে লাগল সঞ্জুরা। কিন্তু না, লোকটা একেবারে হাওয়ায়

মিলিয়ে গেছে। এমন কি, ভোরের দিকে যে দলটা সেই ব্যাঙ্কটার সামনে এসে কী পরামর্শ করে, তারাও এই দু'দিন আসছে না।

রাজু হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'নাঃ, ওদের আর পাওয়া যাবে না।'

সঞ্জু বলল, 'আর দু'একদিন দেখা যাক। তারপর এ নিয়ে আর ভাবব না।'

আশ্চর্য, সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় লোকটাকে আবার দেখা গেল। সেই পান-সিগারেটের দোকানে কোল্ড ড্রিংক খেতে এসেছে।

সঞ্জুরা বীচের দিক থেকে হোটেলে ফিরে আসছিল, দূর থেকে লোকটাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। রাজু কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে সঞ্জু বলে, 'এখন একটা কথাও নয়। একদম চুপ।'

লোকটা অন্যদিনের মতো পাঁচ বোতল কোল্ড ড্রিংক খেয়ে, জোড়া সিগারেট ধরিয়ে জুত করে টানতে টানতে ডান পাশের ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলল।

সঞ্জু চাপা গলায় বলল, 'ওকে ফলো করতে হবে। এসো আমার সঙ্গে।'

রাজু বলল, 'আমার বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছে।'

সঞ্জু বলল, 'অত ভয় থাকলে আসতে হবে না। হোটেলে ফিরে যাও।'

'আরে না না, তোমাকে একা যেতে দেব না। যা হবার হবে। আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

দু'জনে লোকটাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে পেছন পেছন চলল। তাদের মাঝখানে পঞ্চাশ ফুটের মতো দূরত্ব।

মিনিট চারেক হাঁটার পর একটু মাঝারি হোটেলের পাশ দিয়ে অন্য একটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল লোকটা। রাস্তাটা বড় নয়; সেটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে পাশাপাশি একই রকম দেখতে দুটো চব্বিশতলা বাড়ি। বাঁ দিকেরটার নাম 'আকাশগঙ্গা', ডান দিকেরটা 'পাতালগঙ্গা'।

সঞ্জুরা লক্ষ্য করল, লোকটা 'আকাশগঙ্গা'য় ঢুকেছে। ওরা জোরে পা চালিয়ে দিল। কিন্তু লোকটার কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই সে একটা লিফটে ঢুকে পড়ল।

পাশে আরও দুটো লিফট রয়েছে। দুটোই ওপর থেকে নীচে নামছে। রাজু বলল, 'যেটা আগে নামবে সেটায় উঠে লোকটাকে খুঁজতে হবে।'

সঞ্জু বলল, 'এই বিরাট হাই-রাইজে কোথায় হাতড়ে বেড়াবে! আগে জানতে হবে লোকটা ঠিক কোন ফ্লোরে গেল।'

রাজু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী করে জানবে?'

'এদিকে এসো—'

লোকটা যে লিফটায় ঢুকেছিল, রাজুকে সঙ্গে করে সঞ্জু তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লিফটের মাথায় লাল ইনডিকেটরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'ওটা ভাল করে দেখ।'

এক, দুই, তিন—এইভাবে সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। কিন্তু পনের নম্বরের লাল আলোটা কয়েক সেকেন্ডের মতো জ্বলে রইল। তারপর সেটা নিভে ষোল-সতের পেরিয়ে আঠার নম্বরটা জ্বলে উঠল। এবং জ্বলতেই লাগল। মিনিট তিনেক পর অলোটা নিভে সতেরো, ষোল—এইভাবে সংখ্যা কমতে লাগল।

সঞ্জু জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বুঝতে পারলে?'

রাজু বলল, 'না।'

'লিফটটা ওপরে উঠে পনের আর আঠার, মানে ফিফটিনথ আর এইটিনথ ফ্লোরে থেমেছিল। তারপর এখন নেমে আসছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

সঞ্জু বলতে লাগল, 'ওই লোকটা যখন ওপরে উঠছিল তখন সে একা ছিল না। লিফটে আরও

কেউ কেউ থাকতে পারে যাদের আমরা দেখতে পাইনি। লিফটটা দু' জায়গায় যে থেমেছিল সেটা অবশ্য জানতে পেরেছি। লোকটা হয় ফিফটিনথ, নইলে এইটিনথ ফ্লোরে নেমে গেছে। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল?'

রাজু বলল, 'ঢুকেছে। এখন কী করতে চাও?'

'দেখ কী করি—'

লিফটটা নিচে এসে থামতেই দু'জন বেঢপ চেহারার মোটা মহিলা বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে রাজুকে নিয়ে সঞ্জু ভেতরে ঢুকে পনের নম্বর বাটনটা টিপে দিল। লিফটটা অটোমেটিক। আপনা থেকে দরজা বন্ধ হয়ে সেটা ওপরে উঠতে লাগল।

ফিফটিনথ ফ্লোরে এসে লিফটটা থামলে বাইরে বেরিয়ে সঞ্জুরা দেখল এখানে সবসুদ্ধ চারটে ফ্ল্যাট। প্রতিটি ফ্ল্যাটের সামনের দরজার গায়ে পেতলের ফ্ল্যাট-নম্বর লাগানো রয়েছে।

প্রতিটি ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে কলিং বেল টিপল সঞ্জু। কেউ দরজা খুললেই জিজ্ঞেস করল, এখানে অমিতাভ সেন নামে কেউ থাকে কিনা। সবাই জানাল, ওই নামের কাউকে তারা চেনে না।

সঞ্জু রাজুকে বলল, 'না, এখানে নয়। চল এইটিনথ ফ্লোরে যাওয়া যাক।'

লিফটটায় চড়ে কখন অন্য কেউ নিচে নেমে গিয়েছিল, ওরা টের পায়নি। ওটার আশায় থাকলে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে। মোটে তিনটে তো ফ্লোর। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে সঞ্জুরা ওপরে উঠতে লাগল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সিঁড়ি ভাঙার পর রাজু হঠাৎ বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, এভাবে খোঁজ পাওয়া যাবে না।'

সঞ্জু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে গিয়ে বেল বাজালে সেই লোকটাই যে দরজা খুলে দেবে, সেটা নাও হতে পারে। হয়তো সে ভেতরের কোনও ঘরে বসে আছে; অন্য লোক দরজা খুলল।'

একটু চিন্তা করে সঞ্জু বলল, 'রাইট। তা হলেও চেষ্টা তো করতে হবে।'

রাজু এবার কিছু বলল না।

সঞ্জু বলল, 'এইটিনথ ফ্লোরটা দেখি। তখনও যদি না পাওয়া যায়, অন্যরকম প্ল্যান করতে হবে।'

'অন্যরকম বলতে?'

'লোকটা এ বাড়িতে যে আছে তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। তাকে কখনও না কখনও বাইরে বেরুতে হবেই। যতক্ষণ না বেরুচ্ছে, আমরা গেটের কাছে ওয়েট করব।'

এইটিনথ ফ্লোরে, মানে বাংলার উনিশ তলায় এসে দেখা গেল এখানেও চারটে ফ্ল্যাট। সব ফ্লোরেই বোধহয় একই রকম ব্যবস্থা।

প্রথম দুটো ফ্ল্যাটে কোনও হদিস পাওয়া গেল না। কিন্তু তিন নম্বর ফ্ল্যাটের বেল বাজাতেই দরজা খুলে যে সামনে দাঁড়াল তার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল সঞ্জুর। পা দুটো ভীষণ কাঁপছে। আজ ক'দিন ধরে এই লোকটাকেই পাগলের মতো তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নিজেকে সামলে নিতে খানিকটা সময় লাগল সঞ্জুর। লোকটা একদৃষ্টে তাকে লক্ষ্য করছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

অন্য ফ্ল্যাটগুলোতে সঞ্জু যা বলেছিল, এখানেও তাই বলল।

লোকটা একটু ভেবে বলল, 'অমিতাভ সেন কত নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন?'

'সেটা বলতে পারব না। তবে এই 'আকাশগঙ্গা'তেই থাকেন।'

'এই বাড়িতে সবসুদ্ধ বিরানব্বইটা ফ্ল্যাট। কে কোন ফ্ল্যাটে থাকে বলা মুশকিল।'

যেন লোকটার পরামর্শ চাইছে, এমন একটা ভাব করে সঞ্জু জিজ্ঞেস করল, 'কী করা যায় বলুন তো আঙ্কল?'

লোকটাকে যতটা ভীতিকর ভাবা গিয়েছিল, সামনাসামনি দেখে তেমনটা মনে হলো না। সে বলল, 'এক কাজ কর, গ্রাউন্ড ফ্লোরে বিল্ডিংয়ের কেয়ারটেকারের অফিস আছে সেখানে যাও; ওরা বলতে পারবে।'

কথা বলতে বলতে খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ফ্ল্যাটের ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করছিল সঞ্জু। একটা সাজানো-গোছানো বিরাট ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল চোখে পড়ল। কিন্তু অন্য কাউকে দেখা গেল না। লোকটা একাই কি এখানে থাকে? না, আরও লোকজন আছে? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সঞ্জু বলল, 'থ্যাঙ্ক য়ু আঙ্কেল।'

লোকটা কিছু বলল না, অল্প হেসে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কিছুক্ষণ পর লিফটে করে নামতে নামতে রাজু জিজ্ঞেস করল, 'অমিতাভ সেন বলে সত্যি সত্যিই কেউ আছে নাকি?'

সঞ্জু বলল, 'জানি না।'

'ওটা তা হলে তোমার বানানো?'

'একজ্যাক্টলি।'

'অ্যাকটিংটা এমন করেছ যে লোকটা ধরতেই পারেনি।'

রাজুর কথা যেন শুনতে পায়নি, এমনভাবে সঞ্জু বলল, 'লোকটা যে ফ্ল্যাটে থাকে তার নাম্বারটা দেখেছিলে?'

রাজু বলল, 'হ্যাঁ। এইটিন বাই থ্রি।'

'গুড। ওটা ভুলো না।'

'লোকটাকে দেখে কিন্তু খারাপ মনে হলো না।'

'মুখ দেখে কি কার মাথায় কি ঘুরছে সবসময় বোঝা যায়!'

রাজু আস্তে মাথা নাড়ল। বলল, 'ঠিক।'

সঞ্জু বলল, 'এখন আমাদের কাজ হলো, সারাক্ষণ লোকটাকে চোখে চোখে রাখা।'

কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, তাই পরদিন সকালে এলিফ্যান্টা কেভ দেখতে যেতে হলো সঞ্জুদের। বাবা এবং রাধাকৃষ্ণ আঙ্কল, মানে রাজুর বাবা ওঁদের অফিস থেকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজু এবং সঞ্জুর যাবার ইচ্ছা ছিল না। মুম্বাইতে যখন থাকা হবে তখন পরে একবার কেন দশবার যাওয়া যাবে। এলিফ্যান্টা কেভ পালিয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু ওই লোকটার ওপর নজর না রাখলে দারুণ একটা রহস্য হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

বাবা বা আঙ্কলকে বলা গেল না, কী কারণে তাদের এলিফ্যান্টায় যাওয়া উচিত নয়। নিরুপায় হয়ে অন্য সবার সঙ্গে গাড়িতে উঠতে হলো সঞ্জুদের।

জুহু থেকে গাড়িতে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া। সেখান থেকে মোটর বোটে আরব সাগরের ওপর দিয়ে এলিফ্যান্টা কেভে পৌঁছুতে ঘণ্টাখানেক লাগে। আদিগন্ত সমুদ্র, দূরে মুম্বাই হারবারে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি সুবিশাল জাহাজ—এই সব দৃশ্য দেখতে খুব ভাল লাগছিল।

এলিফ্যান্টায় পৌঁছে পাহাড়-কাটা সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে গুহার ভেতর বহুকালের পুরনো সব শিবমূর্তি দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যায় সঞ্জুরা। শত শত বছর আগে আমাদের দেশ শিল্পে-ভাস্কর্যে কিরকম উন্নতি করেছিল, এগুলো তারই প্রমাণ।

সবই দেখছিল সঞ্জুরা, কিন্তু সেই লোকটাকে কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না। ওদের দু'জনের মাথায়

তার চিন্তাটা ঘুরে ঘুরে হানা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে লোকটা সম্পর্কে ওরা এমন চাপা গলায় কথা বলছে যাতে মা-বাবা আঙ্কল-আন্টিরা শুনতে না পান।

এলিফ্যান্টা দেখে ওরা যখন গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়াতে ফিরে এল, তিনটে বেজে গেছে। সবার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। ঠিক হলো, কাছাকাছি কোনও একটা ভাল রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেওয়া হবে। সঞ্জুদের গাড়িটা রয়েছে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার ওধারে বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল হোটেলের সামনে কার পার্কিংয়ের জায়গায়। খাওয়া হলে গাড়িতে করে তারা জুহুতে ফিরে যাবে।

মুম্বাইতে দুপুরে এবং সন্ধেয় বেশ ক'টা খবরের কাগজ বেরোয়। একটা কাগজওয়ালা চিৎকার করে বলছিল, 'ব্যাঙ্ক ডাকাইতি। দশ আদমি মার্ডার হো গিয়া—তাজা খবর—'

লোকটার সামনে একটা নিচু টুলের ওপর প্রচুর কাগজ থাক দিয়ে সাজানো। তাকে ঘিরে রীতিমতো ভিড় জমেছে। সবাই কাগজ কিনছে আর উত্তেজিতভাবে কী যেন বলছে।

ক'দিনের মধ্যে সঞ্জুর বাবার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ আঙ্কলের দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ওঁরা গিয়ে একটা কাগজ কিনে আনলেন। প্রথম পাতাতেই বড় বড় হরফে ইংরেজিতে যা লেখা রয়েছে তার বাংলা মানে করলে এরকম দাঁড়ায়। জুহুর একটা ব্যাঙ্কে আজ বেলা এগারোটার সময় বিরাট ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা সবাই মুখোশ পরে এসেছিল, হাতে ছিল লাইট মেশিনগান। ওরা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে দশজনকে খুন করে। নিহতদের মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ্কের ক'জন কর্মী। যারা টাকা তুলতে এসেছিল তাদের মধ্যেও দু'জন মারা যায়। আহত হয়েছে পনের-ষোল জন। ডাকাতদের একজনকেও ধরা যায়নি। একটা জিপে করে তারা এসেছিল। নগদ তিরিশ লাখ টাকা আর ব্যাঙ্কের লকার ভেঙে প্রচুর গয়না লুট করে সেই জিপেই উধাও হয়ে যায়। খবরের সঙ্গে যে ব্যাঙ্কে ঘট- ঘটেছে সেটার এবং মৃত লোকগুলির ছবিও ছাপা হয়েছে। এমন ভয়ঙ্কর, দুঃসাহসিক ব্যাঙ্ক ডাকাতি এর আগে নাকি মুম্বাইতে আর কখনও হয়নি।

রাধাকৃষ্ণ আঙ্কল বললেন, 'কী সাংঘাতিক ব্যাপার!'

সঞ্জুর বাবা কাগজের ছবিটা দেখিয়ে বললেন, 'আরে, ব্যাঙ্কটা তো আমাদের হোটেলের কাছে সেই দশতলা বাড়িটায়!'

উত্তেজনায় সঞ্জুর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, হৃৎপিণ্ডটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। রাজুর কানে মুখ ঠেকিয়ে সে বলল, 'আমরা আজ এলিফ্যান্টা এলাম আর আজই ব্যাপারটা ঘটে গেল! এখন ওই জড়ুলওলা লোকটাকে পেলে হয়।'

রাজু কিছু বলল না। সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর জুহুতে ফিরতে ফিরতে সাড়ে চারটে বেজে গেল। গাড়ি থেকে নেমে সঞ্জু আর রাজু হোটেলের ভিতর গেল না, বাবা আর মায়েদের বুঝতে না দিয়ে ব্যাঙ্কটার কাছে চলে এল। চারদিকে প্রচুর পুলিশ রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে। এখনও রাস্তার নানা জায়গায় রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। এধারে-ওধারে মানুষের জটলা। ঘটনাটা ঘটেছে বেলা এগারোটায় কিন্তু এখনও সবার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ।

রাজু জিজ্ঞেস করল, 'সেই লোকটার কি খোঁজ করবে?'

সঞ্জু বলল, 'না। আমাদের আবার দেখলে সন্দেহ করবে।'

'তা হলে কী করতে চাও?'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে সঞ্জু বলল, 'চল পুলিশ স্টেশনে যাই।'

রাজু চমকে উঠল, 'পুলিশ স্টেশনে! কেন?'

'আমরা ওই লোকগুলোর ব্যাপারে যা করেছি তার বেশি আর কিছু করা যাবে না। এখন যা করার পুলিশকেই করতে হবে। আমরা শুধু ক্লু দিয়ে ওদের সাহায্য করব। তা ছাড়া—'

'কী?'

'আমরা এরপর কিছু করতে গেলে বাবা-মা আঙ্কল-আন্টি টের পেয়ে যাবেন। তখন ডিটেকটিভ হবার মজাটা টের পাইয়ে ছাড়বেন।'

লোকজনকে জিজ্ঞেস করে ওরা থানায় পৌঁছে গেল। সেখানে ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতি এবং দশ দশটা খুন নিয়ে কিছু একটা চলছে। আবহাওয়া ভীষণ থমথমে। তার মধ্যে কনস্টেবলরা এধারে-ওধারে ছোটাছুটি করছে।

গেটের মুখে সঞ্জুদের আটকে একজন আর্মড গার্ড বলল, 'অন্দর যানা মানা হ্যায়।'

সঞ্জু হিন্দীতে বুঝিয়ে দিল, অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে তাদের দেখা করতে হবে। বিশেষ দরকার।

আর্মড গার্ড জানাল, এখন ভেতরে মিটিং চলছে। দরকার থাকলে সঞ্জুরা যেন পরে আসে।

সঞ্জুরা নাছোড়বান্দা। তারা ভেতরে যাবেই, আর্মড গার্ড কিছুতেই যেতে দেবে না। চেঁচামেচি শুনে একটি মধ্যবয়সী, পুলিশের ইউনিফর্ম পরা, গম্ভীর চেহারার অফিসার বেরিয়ে এলেন। বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে? এত হৈচৈ কিসের?'

সঞ্জু লক্ষ্য করল, বুকে মেটালের লম্বা ব্যাজে লেখা: ইন্সপেক্টর চাপেকার। তিনি মারাঠি। আর্মড গার্ড মুখ খোলার আগেই সঞ্জু বলল, 'স্যার, আমরা অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, তিনিই অফিসার-ইন-চার্জ। ভীষণ ব্যস্ত আছেন, কথা বলার সময় নেই।

সঞ্জু বলল, 'যে কারণে আপনারা ব্যস্ত সেই ব্যাপারেই আমাদের কিছু বলার আছে।'

ধমক দিতে গিয়ে থমকে গেলেন ইন্সপেক্টর চাপেকার। দু'টি অল্প বয়সের ছেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন, 'আমরা কী ব্যাপারে ব্যস্ত তা জানো?'

'হ্যাঁ। ব্যাঙ্ক ডাকাতি আর—'

সঞ্জুকে থামিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে—'

সঞ্জু বলল, 'আমাদের যা বলার, শুধু আপনাকেই বলব।'

একটু ভেবে ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'ঠিক আছে।' সঞ্জুদের সঙ্গে করে একটা ফাঁকা ঘরে নিয়ে এলেন। তাদের বসিয়ে বললেন, 'বল—'

তারা ক'দিন আগে মুম্বাইতে এসেছে, জুহুর হোটেলে আছে, তাদের নাম সঞ্জয় বসু এবং রজত মেনন, ইত্যাদি জানিয়ে সেই লোকটা এবং তার সঙ্গীদের সম্বন্ধে যাবতীয় খবর দিয়ে সঞ্জু বলল, 'লোকটা কোথায় থাকে তাও আমরা জানি।'

শুনতে শুনতে মেরুদণ্ড টান টান হয়ে গিয়েছিল ইন্সপেক্টরের। চোখ দুটো চকচক করছে। বললেন, 'কোথায়?'

'জুহুর 'আকাশগঙ্গা' বিল্ডিংয়ে। ফ্ল্যাট এইটিন বাই থ্রি।' বলে কীভাবে ঠিকানাটা যোগাড় করেছে তাও জানিয়ে দিল সঞ্জু।

মুখোমুখি বসে ছিলেন ইন্সপেক্টর চাপেকার। সঞ্জু আর রাজুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'ভেরি গুড ওয়ার্ক ইয়াং শার্লক হোমস। একসেলেন্ট অবজারভেশন। তোমাদের এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের খুব সাহায্য করবে।'

সঞ্জু বলল, 'স্যার, একটা রিকোয়েস্ট আছে—'

'বল—বল—'

'আমরা যে ওই লোকগুলোর ওপর নজর রেখে, ফলো করে এই সব খবর যোগাড় করেছি, আমাদের মা-বাবারা জানতে পারলে একেবারে কেটে ফেলবেন। মানে এ সব—'

'বুঝেছি, বুঝেছি। কোনও মা-বাবাই চান না তাঁদের ছেলেরা খুনী-ডাকাতদের পেছনে ঘুরে বেড়াক। তোমাদের কথা মনে থাকবে।'

সপ্তাহ দুই কেটে গেল। সঞ্জু আর রাজুদের পালি হিলের ফ্ল্যাট রেডি হয়ে গেছে। ওরা যেদিন হোটেল থেকে সেখানে চলে যাবে, তার আগের দিন সকালে খবরের কাগজে দেখা গেল, ব্যাঙ্ক ডাকাতরা সবাই মুম্বাই থেকে নব্বই মাইল দূরে পুনে শহরে ধরা পড়েছে এবং তাদের লুট-করা টাকা আর গয়নার বেশির ভাগটাই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

সেদিনই সন্ধ্যের পর ইন্সপেক্টর চাপেকার সঞ্জুদের হোটেলে এসে হাজির। অফিস থেকে তার কিছুক্ষণ আগেই অরিন্দম আর রাধাকৃষ্ণ চলে এসেছেন।

ইন্সপেক্টর চাপেকার দুই ফ্যামিলিব সবাইকে নিয়ে বেশ আসর জমিয়ে বসলেন। কফি খেতে খেতে বললেন, 'হঠাৎ পুলিশের লোক কেন হানা দিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনাদের কৌতূহল হচ্ছে।'

রাধাকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ, মানে—'

সঞ্জু আর রাজু মাথা হেঁট কবে বসে ছিল। সব ব্যাপারটা এবার জানাজানি হয়ে যাবে, ভাবতেই তাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয় যাচ্ছিল।

ইন্সপেক্টর চাপেকার সঞ্জুদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'আমার এই দুই ইয়ং ফ্রেন্ড আর তাদের মা-বাবাকে কনগ্র্যাচুলেট করতে এসেছি। ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পারছেন না?'

রাধাকৃষ্ণ, অরিন্দম, জানকী, সঞ্জুর মা মণিমালা আর তার দিদি রিনি—সকলেই মাথা নেড়ে জানালেন, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

ইন্সপেক্টর চাপেকার এবার বললেন, 'আজকের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছেন, জুহুর ব্যাঙ্কে যারা ডাকাতি করেছে তারা দলবলসুদ্ধ ধরা পড়েছে। এই দুই ক্ষুদে শার্লক হোমসের সাহায্য না পেলে কিছুতেই ওদের অ্যারেস্ট করা সম্ভব হতো না।' তারপর কীভাবে সঞ্জুরা ডাকাতদের সম্পর্কে খবর যোগাড় করে তাঁকে গোপনে জানিয়ে এসেছে, তা তো বললেনই। আরও বললেন, ওদের দেওয়া সূত্র ধরে 'আকাশগঙ্গা'য় তাঁরা ফাঁদ পেতেছিলেন। সেখানে ডাকাতদের কাউকেই পাওয়া যায়নি। তবে ওদের ওই ফ্ল্যাটটা দেখাশোনা করার জন্য একটা লোক ছিল। তাকে থানায় ধরে এনে বেদম পেটাতেই ডাকাতদের পুনের ঠিকানা পাওয়া যায়।

রাধাকৃষ্ণ এবং অরিন্দম ছেলেদের ওপর রেগে উঠতে যাচ্ছিলেন, তাঁদের থামিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'ওদের বকবেন না। যে কাজ ওরা করেছে সে জন্যে আপনাদের গর্ব বোধ করা উচিত।'

অরিন্দম বললেন, 'ডাকাতগুলো টের পেলে কী হতো বলুন তো? কত বড় রিস্ক! সঞ্জু কলকাতাতেও এমন অনেক কাণ্ড করেছে—'

ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'ভেবে দেখুন ওরা না সাহায্য করলে ডাকাতেরা ভবিষ্যতে আরও কত ক্ষতি করত!'

অরিন্দম চুপ করে রইলেন।

ইন্সপেক্টর চাপেকার বলতে লাগলেন, 'আমার ইয়ং ফ্রেন্ডদের মোটামুটি কথা দিয়েছিলাম, আপনাদের জানাবো না। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি এত বড় একটা ব্যাপার লুকিয়ে রাখা অন্যায়। এবার একটা সুখবর দিচ্ছি।'

সবাই উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্ট সঞ্জয় আর রজতকে বড় অনুষ্ঠান করে খুব বড় একটা পুরস্কার দেবে। যে ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে, তারাও বিরাট কিছু দেবার কথা ভাবছে। খুব শীগগিরই আপনাদের কাছে এসে ওরা তা জানিয়ে যাবে। আজ তাহলে চলি—'

ইন্সপেক্টর চাপেকার উঠে দাঁড়ালেন।

সুপ্রিয়া পিসির হারানো হীরে

হিমানীশ গোস্বামী

কিট্টু লাহিড়ি গোয়েন্দাগিরিতে হাত পাকাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু খুব বড় কিছুতে বেশ কিছুদিন হাত দিতে পারেনি। সে সারাদিন লেখাপড়া করে, খবরের কাগজ পড়ে আর মাঝে মাঝে খুড়তুতো ভাই প্রকৃতিপ্রসাদের সঙ্গে দাবা খেলে। অবশ্য তার অভিভাবক, প্রায় অভিভাবক এবং কাজের লোক সর্ব কর্মদক্ষ বাঘাকাকাও দাবা দারুণ খেলেন, তবে প্রায় প্রত্যেকবারই কিট্টু হেরে যায় বলে তাঁর সঙ্গে বিশেষ খেলতে চায় না। কিট্টু বলে দাবা খেলে হেরে গেলে মজা হয় কখনও? ওর বন্ধু খবরের কাগজের রিপোর্টার আফজল হোসেন বলে, এ তোর একটা বিশ্রী মনের ভাব! যার সঙ্গে খেলে হারিস তার সঙ্গে খেললেই তো খেলা শিখতে পারবি! কিন্তু কথাটা সত্যি হলেও কিট্টুর মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে। যাই হোক সে সম্প্রতি একটা কমপিউটার দাবা উপহার পেয়েছে—তার বাবা টোকিও থেকে এক বন্ধুর মারফত উপহার পাঠিয়েছেন। দারুণ কমপিউটার দাবা। এই দাবায় কমপিউটারই প্রতিপক্ষের চাল দেখিয়ে দেয়, অর্থাৎ কিট্টু প্রথম চাল দেওয়ার পর কমপিউটার প্রথমে আলো জ্বেলে বুঝিয়ে দেয় কোন ঘুঁটিটা চালবে, তারপর সেই ঘুঁটিটায় চাপ দিলে আবার আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেয় সেটি কোন ঘরে চালতে হবে। ছোট্ট এই কমপিউটার চাল দিতে খুব বেশি সময় নষ্ট করে না।

এটি কিট্টুর ভারি প্রিয় খেলনা! এর একটা সুবিধে হলো এই কম্পিউটারটা খুব একটা বেশি কিছু জটিলতা বোঝে না। দুম-দাম খেলে, আর প্রায়ই হেরে যায়। হেরে গেলে 'মেট' অর্থাৎ 'মাত', লেখা জায়গার দুটো খুদে খুদে লাল আলো জ্বলে ওঠে। কিস্তি দিলে 'চেক' বা কিস্তি লেখা জায়গার আলো জ্বলে ওঠে। এ এক চমৎকার ব্যাপার—। আরও সুবিধে এই কিট্টু হেরে গেলেও কেউ বুঝতে পারে না। ওর বাবা লিখেছেন এটা সবচেয়ে কম দামের কম্পিউটার দাবা, এ ছাড়া আরও প্রায় দশ-বারো রকম উন্নত কম্পিউটার দাবা পাওয়া যায়, সেগুলোর দামও বেশি আর ক্ষমতাও বেশি। তারা অবশ্য গ্র্যান্ড মাস্টারদের হারাতে পারবে না, তবে কিট্টুকে নিশ্চয় প্রতিবারই হারিয়ে দিতে পারবে। কেবল কিট্টুকে নয়, অনেক সময় সেই সব কম্পিউটার দাবা আঞ্চলিক চ্যামপিয়নদেরও হারাতে পারবে। একদিন সকালে কিট্টু ব্রেকফাস্ট করার পর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে দাবা খেলছে আর দু-এক চালেই কিট্টু মাত হয়ে যাবে এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল। কিট্টু এক মিনিট টেলিফোনটা না ধরে দাবার চালের কথা ভাবল, তারপর রিসিভারটা তুলে বলল, হ্যালো! অপরপ্রান্ত থেকে মিহিরের মিহি কণ্ঠ শোনা গেল।

আমার দাদা কিট্টুবাবু
দাবায় হলেন মত্ত
কম্পু-দাবা হারলে পরে
খুশি যে হন কত্ত!
তোমার বাবা আমার মামা
থাকেন তিনি ইয়কোহামা।

—শাট্আপ! কিট্টু বলল, খুব ইয়ার্কি শিখেছিস না?

মিহির গম্ভীরভাবে বলল, খুব আর কোথায় শিখলুম দাদা, সবে তো শুরু করেছি। ছড়াটা কেমন লাগল বল্ তো?

—রাবিশ!

—জানতাম তুই রাবিশ বলবি। মিহির বলল, খুনজখমের কথা ভেবে ভেবে মাথায় ভাল জিনিসের জায়গা কমে গেছে।

—কেন ফোন করছিস রে? কিট্টু বলল, কিছু দরকার আছে?

—আমার কোনও দরকার নেই। মা ফোন ধরে দিতে বললেন, ঐ যে মা আসছেন। আমি চলি—।

কিট্টু একটু আতঙ্কিত হয়েই ফোন ধরলো। সাধারণত কিট্টুর এই সুপ্রিয়া পিসি টেলিফোন একবার ধরলে আর ছাড়তে চান না।

—শোন্ কিট্টু, বড় বিপদ। বড় সর্বনাশ। সুপ্রিয়া পিসি বললেন, তোর বাড়িতে ঐ শুয়োরকাকা এখনও আছে তো, নাকি বাড়ির সব জিনিসপত্র নিয়ে সরেটরে পড়েছে?

—শুয়োরকাকা? কিট্টু বলল, বাঘাকাকা তো আমাদের বাড়িতে আছেন।

—ঐ হলো! পিসি বললেন, নামটা মনে পড়ছিল না। তা জন্তু একটা কেবল এইটুকুই মনে ছিল। তোদের অনেক দিন খবর নিইনি, ভাল আছিস তো সব?

—ভালই আছি। কিট্টু বলল, কিন্তু কেন, বিশেষ দরকার আছে?

—দারুণ দরকার। পিসি বললেন, তবে সে-সব কথা টেলিফোনে বলা যাবে না, শত্রুপক্ষ সব টেলিফোন ট্যাপ্ করে জানিস তো। সেদিন কাগজে পড়ছিলাম কোন কাগজে যেন মনে পড়ছে না—আজকাল এমন হয়েছে, অনেক কিছু ভুলে ভুলে যাচ্ছি। তা তোদের ঐ জিরাফকাকা—

—বাঘাকাকা। কিট্টু বলল।

—ঐ হলো। বাঘ বলিস, জিরাফ বলিস ওকে একটু জিজ্ঞেস করিস তো স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর কিছু উপায় জানা আছে কি না। হয়তো কোনও বিশেষ খাদ্যে স্মৃতিশক্তি বাড়ে। অবশ্য সে যদি সরে পড়ে না থাকে।

—তা এত সরে পড়ার কথা বলছ কেন? কিট্টু বলল, সরে পড়বেন কেন উনি?

—না বাবা, জেলখাটা লোক। কত চুরিটুরি করেছে—বাবা, একবার জেলখানার স্বাদ যে পেয়েছে তার নাকি আর সংসার ভাল লাগে না। বার বার জেলে ফিরে যায়। দেখিস বাবা, সাবধানে থাকিস। আর কে যেন তোর বাড়ির সামনে ইস্তিরি করে, কি যেন তার নাম, কি হাতি যেন তার নাম, তোর যত সব জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কারবার।

—হাতি কেন হবে? কিট্টু বলল, ওর নাম তো সুরসাথী।

—হ্যাঁ কিট্টু। সুপ্রিয়া পিসি বললেন, ওর উপরও একটু নজর রাখিস। কবে ইস্তিরি করার নামে জামাটামা নিয়ে সরে না পড়ে। আজকালকার বাজারে কাউকে বিশ্বাস নেই। সেদিন এক জলের কলওয়ালা এল—রাস্তা থেকেই ধরেছিলাম, ঐ আমার ভুল হয়েছিল, তা সে খানিকক্ষণ খুটখাট করে বলে কি ষাটটা টাকা দিন তো মা দু-একটা জিনিস কিনতে হবে। তা সে ষাট টাকা নিয়ে সেই যে সরেছে আর আসেনি। সে তো আর গাড়ি চাপা পড়েনি কিংবা গায়ে জলবসন্ত বেরোয়নি, আসলে সে একজন পাকা চোর। বোঝা যায় না, কে চোর কে চোর নয়।—তা তুই আসবি, না আমি যাব। ভয়ঙ্কর দরকার।

—বললে আমিই যেতে পারি। কিট্টু বলল।

—তাহলে সন্ধ্যেবেলা চলে আয়। রান্নাবান্না করতে আর হবে না তোদের—ফেরার সময় ভালুককাকার জন্যও কিছু খাবার নিয়ে যাস।

—ভালুককাকা নয়, বাঘাকাকা।

—যাক্‌গে খুব বেশি ভুল হয়নি, দুইই সাংঘাতিক।

সুপ্রিয়া পিসি সন্ধ্যেবেলা কিট্টুকে দরজা খুলে দিয়ে বললেন, সোজা চলে যা রান্নাঘরে। আগে কথা, তারপর অন্য ব্যাপার। তোর পিসেকে খবর্দার বলবি না, আমি তোকে যা বলব। এ একেবারে খাঁটি গোপন কথা। শোন তোর পিসের ভাই হেমন্তকে দেখেছিস তো, সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়েছিল হিমালয়ে। হিমালয়ে তার যা তপস্যা করার ছিল শেষ করে এখন সে কলকাতায় এই আমাদের পাড়াতেই রয়েছে। জানিস তো সাধুদের কত রকম শক্তি থাকে, এখন সে মেঝেতে তপস্যা করতে করতে প্রায় দেড় ফুট শূন্যে উঠতে পারে। ভেবে দ্যাখ কি বিরাট ক্ষমতা!

কিট্টু বলল, আমি বিশ্বাস করি না।

—জানি তুই বিশ্বাস করবি না। তোর পিসেমশাইও বিশ্বাস করেন না। নাস্তিকে দেশ ভরে গেল। তবে ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তাহলেও বিশ্বাস করবি না?

—সত্যি হলে বিশ্বাস করব না, তা কি বলেছি নাকি আমি? কিট্টু বলল, তবে এ-রকম ব্যাপার সত্যি হতেই পারে না।

—আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কি ভাল করলি? সুপ্রিয়া পিসি বললেন, তোদের বিজ্ঞানে কি বলে, আগে দেখতে হয়, বুঝতে হয়, তবেই না সিদ্ধান্ত নিতে হয়? মানুষের কত রকম ক্ষমতা থাকতে পারে, সব কি আমরা জানি?

—তা আসল কথাটা কি বলবে?

আস্তে আস্তেই কথা বলছিলেন সুপ্রিয়া পিসি, এবারে আওয়াজ আরও কমিয়ে এনে বললেন, শোন, সে কাল একজনকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে তার ঠিকানা জানিয়েছে। এখন সে কাল রাত এগারোটা একুশ মিনিটের সময় তপস্যা করতে করতে শূন্যে উঠবে। বছরে মাত্র তিন কি চারবার তার এই-রকম ক্ষমতা হয়। কেবল অতি নিকটজনদের এবং ভক্তদের সামনে সে এটা করে।

—হাজার টাকার কমে তো এরকম একটা দৃশ্য দেখা যায় না—তা উনি কত চেয়েছেন?

—ওমা! সুপ্রিয়া পিসি বললেন, তা তুই কেমন করে জানলি? কথাটা ঠিকই। হাজার টাকাই উনি প্রণামী নিয়ে থাকেন। নিজের জন্য নয়, হিমালয়ের এক নির্জন জায়গায় বড় একটা মন্দির করবার জন্য প্রত্যাদেশ দিয়েছেন ভগবান, সেজন্যই তিনি হাজার টাকা নিয়ে থাকেন, তবে আমরা ওঁর নেহাত পরিচিত, সে জন্য আমাদের মাত্র আড়াইশো টাকা দিতে হবে। তা আমি ওখানে যাব শুনলে তোর পিসের হয়তো হার্ট অ্যাটাকই হয়ে যাবে। আমি গোপনে ওর কাছে যেতে চাই। এই জন্যই তোকে আমার দরকার। ভয় নেই, তোর টাকাটা আমিই দিয়ে দেব।

কিট্টু বলল, না পিসি। তুমি এরকম কাণ্ড করতে যেও না। আমার পিসের ভাইই হোক আর যেই হোক আমি এইসব দুর্নীতি পছন্দ করি না। তাছাড়া শাস্তরেও বলে পিসের ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই!

—এর মধ্যে দুর্নীতি কোথায় দেখলি তুই? দাঁড়া, আগে তোকে আলু আর পমফ্রেট মাছ ভাজা দিই, টুমাটো সস্‌ আর লেবু দিয়ে যা চমৎকার লাগবে তা তোর বনবেড়ালকাকা কখনও বানাতে পারবে?

কিট্টু পমফ্রেট ভাজা আলু দিয়ে খেতে খেতে বলল, পমফ্রেটই দাও আর আলুভাজাই দাও, আমি বুজরুকি বিশ্বাস করি না, আর বুজরুকদের সমর্থনও করব না।

—এরপর রাত্রে কি আছে জানিস, মাংসের কিমা দিয়ে পটলের দোলমা, আর ঘিয়ে ভাজা লুচি। অবশ্য পোলাও এবং চিলি চিকেনও রান্না হচ্ছে।

—তাতেও আমি রাজী নই। কিট্টু বলল।

—আসলে ব্যাপার কি জানিস কিট্টু? পিসি আরও আস্তে আস্তে বললেন, এইসব সাধু-সন্নেসীর নানারকম অলৌকিক ক্ষমতা থাকে।

—আচ্ছা পিসি! কিট্টু বলল, একজন লোক শূন্যে দেড় ফুট উঠতে পারলে—যদিও কেউ কেবল মনের জোরে তা পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না—তাতে তোমার কি, আর তাতে আমারও বা কি? ওতে জগতের কী উপকার হয়?

—না না, ওসব কথা বলিসনে কিট্টু! পিসি বললেন, আমার আসল উদ্দেশ্য একটু অন্যরকম। তুই জানিস কিনা জানি না, অনেক দিনের কথা—জানতেও পারিস, ঐ নিয়ে কম তো হৈচৈ হয়নি এককালে? তোর পিসের কাছে একটা বড় হীরে ছিল—পারিবারিক সম্পত্তি—তার সাইজ ছিল একটা বড় সুপুরির মতো। বাজারের দাম কত জানি না, তবে শুনেছি ওরকম একটা হীরের সন্ধান পেলে বড় বড় রাজা-মহারাজাও খেপে গিয়ে মানুষ খুন করতে শুরু করতে পারে। টাকা দিয়ে তার দাম ঠিক করা যায় না। অথচ সেটা আমাদের বাড়ির সিন্দুক থেকে কবে যে কে সেটাকে উধাও করে দিয়েছিল তা বোঝা যায়নি। তোর পিসে বড্ড শক পেয়েছিলেন সেটা অদৃশ্য হওয়ায়। নানা কাণ্ড করা হলো, কিন্তু সেটা কখনই আর পাওয়া গেল না। না এদেশে, না অন্য দেশে! পুলিস অনেক চেষ্টা করেছিল, ঐ সময় যিনি পুলিস কমিশনার ছিলেন তিনি আবার তোর পিসের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এসব তো তুই জানিস?

—এ আর জানব না? কিট্টু বলল, এত বড় একটা খবর, তবে তখন আমি ছোট। পরে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। বুঝলে পিসি, অনেক ভেবে একটা সিদ্ধান্তও করেছি। কিন্তু সে কথা থাক। তা তুমি যে সন্নেসীকে দেখতে যাচ্ছ তার আসল উদ্দেশ্যটা কি?

—শোন্ এইসব সত্যদ্রষ্টা সন্নেসীরা অলৌকিকভাবে অনেক কিছু জানতে পারে। ওকে আমি জিজ্ঞেস করব সেই হীরেটা কোথায় আছে।

—জানলে কী হবে?

—জানলে উদ্ধারের চেষ্টা করব। হয়ত হীরেটা আমাদের বাড়িতেই কোথাও রয়েছে, কেউ হয়তো চুরি করেনি, হয়তো কোথাও কোনও কোণেটোণে বইয়ের মধ্যে বা কোথাও রয়ে গেছে।

কিট্টু একটু হাসল। বলল, কত বছর হয়ে গেল এখন আর কোনও আশা নেই পিসি!

—আশা কেন করব না বল? পিসি বললেন। ওই হীরের কোনও খবর কোথাও নেই—অত বড় হীরে কোথাও প্রকাশ্যভাবে থাকলে খবর পাওয়া যেতই।

—ও সব তোমার বাজে ধারণা। আজকাল নানারকম হীরে চোরের বিশেষজ্ঞ দল হয়েছে, তারা হীরে বদলে দিতে পারে—কেটেকুটে। দেখলে আর চেনা যাবে না।

—তবু একবার শেষ চেষ্টা করা যেত। পিসি বললেন, যদি তোর হেমন্তকাকা, যদিও সে নাম আর তার নেই, এখন গৃহাশ্রমের নাম স্মরণে আনাও তাদের পাপ—এখন ওর নাম হয়েছে গগনানন্দ। এখন গগনানন্দ যদি বলে দিতে পারে....।

—তা বেশ। কিট্টু বলল, তা এর মধ্যে আমার ভূমিকা কি হতে পারে?

পিসি বললেন, রাত এগারোটা একুশে উনি শূন্যে উঠবেন। অন্তত রাত দশটা থেকে ওখানে উপস্থিত থাকতে হবে। তুই সঙ্গে থাকবি। বাড়িতে বলে যাব আমি আজ তোর ওখানে থাকব।

—আমার ওখানে? কিট্টু বলল, তাহলে তো বিছানা-টিছানাগুলো একটু গুছিয়ে রাখতে হবে।

—কেন ঐ তোর কুমিরকাকা ওসব করতে পারে না?

—করতে তো চান, আমিই করতে দিই না। দারুণ গুণী লোক তো—সত্যি উনি না থাকলে আমার চলত কেমন করে মাঝে মাঝে ভাবি। কিট্টু আর পিসির ভ্রম সংশোধন করল না। পিসি কিছুতেই বাঘাকাকার নাম মনে রাখতে পারেন না, কি আর করা যায়!

—ও বিছানা আমিই ঠিক করে নেব। বললেন পিসি।

পরদিন পিসি সন্ধ্যেবেলাতেই এসে হাজির। বাঘাকাকাকে কিট্টু আগেই বলে রেখেছিল দু-তিন রকম এমন রান্না করতে যা খেয়ে পিসি মুগ্ধ হন। বাঘাকাকাকে তা না বললেও পারত। বাঘাকাকা মেটুলি আর পেঁয়াজের একটা এমন তরকারি রেঁধেছিল আর তা থেকে যা সুবাস বেরিয়েছিল তাতে পিসি দারুণ, দারুণ খুশি হয়েছিলেন, এ ছাড়াও দুটো অন্য রান্নাও ছিল, একটা হলো লালশাকের টক, আর অন্যটা মেওনেইজ আর এঁচোড়-এর পুর দিয়ে ক্যাপসিকাম ভাজা। এ ছাড়া মিহি সুগন্ধ চালের ভাত।

রাত্তির দশটায় গগনানন্দের দেওয়া ঠিকানায় কিট্টু পিসিকে নিয়ে পৌঁছে গেল। সেখানে দেখা গেল লোক মন্দ হয়নি, অন্তত একশো জন। একটা হলঘর, তার দেয়ালের কাছে কাছে ফুলের টব, টবের মাটিতে প্রচুর ধূপ, তা থেকে ধোঁয়ার মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে আর চোখ জ্বালা করছে। এক কোণে দু-তিনজন বসে মৃদুভাবে তবলা আর হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে। কিট্টু মনে মনে হিসেব করল কম করেও আজ ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা আয় হচ্ছে পরিচালকবর্গের! একজন লোক সাধনা করে শূন্যে উঠতে পারে না সঙ্গে অন্য লৌকিক যোগাড়যন্ত্র চাই, এটা আমাদের দেশের বুদ্ধিমানেরাও বুঝতে চান না। কিট্টু ভাবল এই বুজরুকির খেলা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে দিতে হবে। তবে এখনই নয়। তার কৌতূহলও হয়েছিল মন্দ নয়, তাই সে মেঝের উপর বসে পড়ল অন্যদের সঙ্গে। একটু পর মানব-মানবী কণ্ঠে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল। আলোগুলো অতি ধীরে কমে আসতে লাগল। ক্রমশ ঘর আরও সুগন্ধে, আরও ধোঁয়ায় ভরে গেল। চোখে কেমন যেন একটা অবসাদ আসতে লাগল। ঘুমও পেতে লাগল। কিট্টু তবু জোর করে চেয়ে রইল সবটা দেখবে বলে। সে দেখল পাশে বসে থাকা পিসির চোখে ঢুলুনি এসেছে। ঘড়িতে আলো জ্বালিয়ে দেখল এগারোটা বেজে দশ মিনিট। ঠিক এই সময় সামনে দেয়ালের পাশের একটা বড় আসনের উপর নীল আলো এসে পড়ল। তারপর মেরুন রঙের একটা হালকা সিল্কের পোশাক পরা এক ব্যক্তি যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সেই আসনে এসে বসলেন। হঠাৎ বাজনা খুব জোরে বেজে উঠল। যাদের ঘুম আসছিল তারা একটু নড়েচড়ে বসল। টুং টুং করে একটা একটানা ঘণ্টা বাজতে লাগল। সম্ভবত টেপ রেকর্ড থেকে জোর মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল। এগারোটা বেজে ঠিক একুশ মিনিটের সময় সকলে বিস্মিত হয়ে দেখল গগনানন্দ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে আছেন, এবং তিনি আসনের উপর রাখা মোটা পিঁড়ি সমেত ধীরে ধীরে উপরে উঠছেন। প্রায় পনের সেকেন্ড পর বারো-তেরো ইঞ্চি উপরে উঠে গেলেন গগনানন্দ। একজন শিষ্য একটা বড় লাঠি আসনের তলাটায় ঘুরিয়ে দিলেন একবার, তাতে বোঝা গেল পিঁড়ির তলায় কোনও কিছু নেই, অর্থাৎ সত্যিই পিঁড়ি সমেত গগনানন্দ ঠিক গগনে না হলেও শূন্যে বিচরণ করছেন। আর সেই লাঠিটা গগনানন্দের মাথার উপরও বাঁই করে দু'বার ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে কোনোও সূক্ষ্ম তার দিয়েও পিঁড়িটা বাঁধা নয়!

পনের সেকেন্ড পর আরও জোর বাজনা বাজতে লাগল। লোকেরা ধুনি দিতে লাগল জয় গগনানন্দকি জয়! তারপর আস্তে আস্তে আবার মোটা কাঠের পিঁড়িটা নেমে এল আসনের উপর। সমবেত ব্যক্তিরা ভাবলেন তাঁদের টাকা সার্থক হলো। কিট্টুরও মনে হলো, না এঁর শক্তি আছে বটে। তবে মনের গহনে সে কেবলই ভাবতে লাগল এখানে এমন কিছু করা হয়েছে যা বিজ্ঞানসম্মত নয়, অথচ ফাঁকিটা যে কি হতে পারে তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না। কিট্টু অভিভূত হয়ে গেল, বলাই বাহুল্য।

এর পর আধঘণ্টা ভক্তরা নানা প্রশ্ন করতে লাগল, এবং গগনানন্দ কাউকে বলতে লাগলেন, চোপ্ বদমাশ, কাউকে বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ', কাউকে 'না', কাউকে আবার কোনও উত্তরই নয়! বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে কেউ জোরে কথাই বলতে পারল না, কারুর হয়তো কোনও উত্তর শোনার পরও অন্য প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু গগনানন্দর নাটকীয় ভাবভঙ্গী এবং গালাগালের বহর

দেখে তারা আর বিশেষ প্রশ্ন করল না। সমস্ত ভক্ত চলে গেলেও সুপ্রিয়া পিসি বসে রইলেন, সঙ্গে কিট্টু। একজন শিষ্য এসে বললেন, আপনারা বসে আছেন যে? আপনারা চলে যান। আবার আগামী অমাবস্যার দিন এই রকম সমাবেশ হবে। দরকার হলে তখন আসবেন। কিন্তু এই সময় গগনানন্দ এসে তাঁর শিষ্যদের বললেন, যা যা তোরা সব যে যার চলে যা, আমি এঁর সঙ্গে দশ মিনিট কথা বলব।

কিট্টুরও তখন দারুণ ভক্তি হয়েছে। নিজের চোখে সে দেখেছে একজন জলজ্যান্ত মানুষ সত্যি সত্যি মাধ্যাকর্ষণের আইন অমান্য করে প্রায় দেড় ফুট শূন্যে ভেসে রইলেন। এ অতি অসামান্য ক্ষমতা, সে মনে মনে স্বীকার করল। গগনানন্দ বললেন, কী খবর—সব ভাল তো? দাদা ভাল আছেন?

খুবই ভক্তি গদগদ কণ্ঠে সুপ্রিয়া পিসি বললেন, হ্যাঁরে ভাই, সব ভাল আছেন। তা তুই সংসারে ফিরবি না রে?

গগনানন্দ এ-কথার উত্তর না দিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। পিসি বললেন, বেশ বেশ এমন প্রশ্ন করব না। একটা কথা বলবি তুই আমাকে, একটিই প্রশ্ন আমার—যে জন্য আমি এসেছি।

গগনানন্দ কিট্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা আবার কে?

—আমার ভাইয়ের ছেলে কিট্টু। তুই ওকে ছোট দেখেছিস, আজকাল গোয়েন্দা হয়েছে।

যেন চমকে উঠলেন গগনানন্দ। পুলিসের? তিনি প্রশ্ন করলেন।

—না। পিসি বললেন, এই এমনি একটু-আধটু গোয়েন্দাগিরি করে।

—কিট্টু? তা তোমার দাদার একটি ছেলে ছিল মনে পড়ছে, এইটুকু একটা ছেলে, তা তার নাম তো ছিল কার্তিক।

—ওই সেই কার্তিক। ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় নাম বদলে কিট্টু করেছে।

—তা বেশ, তা বেশ। গগনানন্দ বললেন। তা তোমার প্রশ্নটা কি বৌদি? বলেই কিট্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কার্তিক তুমি একটু দূরে গিয়ে বসো।

কিট্টু দেখতে পেল দুজনের মধ্যে কি সব কথা হচ্ছে। কথা শেষ হলে পিসি বললেন, চল ফিরে যাই, ওরে বাবা—প্রায় বারোটা বাজে যে রে?

কোনোমতে একটা ট্যাক্সি করে ওরা বাড়ি ফিরে এল। সুপ্রিয়া পিসি বললেন, ব্যাপারটা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম, বাড়ির লোকের কাজ।

—হীরের সন্ধান পাওয়া গেল? কিট্টুর প্রশ্ন।

—তা পাওয়া গেছে। কেবল সন্ধান নয়, কালই সেটা আমার হাতে এসে যাচ্ছে!

কিট্টু বলল, তাহলে উনিই চুরি করে সরে পড়েছিলেন?

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, হ্যাঁ উনিই। তা ও বলল কি জানিস? ঐ হীরেটা তার দারুণ পয়া, সেজন্য সে দিতে চায়নি প্রথমে। পরে অবশ্য সে বলে আমি এখন অনেক টাকার মালিক, অনেক ভক্ত আমার। এখন হীরেটা আমি দিতে পারি। কেবল দিতে পারি নয়, ফেরত দেবও এবং কালই তোমার কাছে পৌঁছে দেব।

—তার মানে, কিট্টু বলল, তোমাদের হাতে এসে যাবে কয়েক কোটি টাকার একটা সম্পত্তি?

—না রে না! সুপ্রিয়া পিসি বললেন, ওটা ঝুটো হীরে। ওর দাম বড় জোর দেড়শো-দুশো টাকা। চমৎকার কাঁচের তৈরি একটা জিনিস! ওটাকে আসল হীরে মনে করে হেমন্ত সরিয়ে রেখেছিল বাড়িতেই, তারপর একদিন হঠাৎ সে সরে পড়ে ওটাকে নিয়ে। বাড়ির কেউই জানত না ওটা নকল হীরে। সকলেই ওটাকে আসল হীরে মনে করে রক্ষা করেছে। ও ঐ নকল হীরে নিয়েই সরে পড়েছিল!

—মানে সন্নেসী হয়ে গিয়েছিলেন?

—আরে না, সে সন্নেসী হতে চায়নি কখনও, কিন্তু হতে হয়েছিল ঐ হীরের জন্যই। হীরেটা

যদি সে ভাল দামে বিক্রি করতে পারত তাহলে কি আর সে সন্নেসী হয় নাকি? এদিকে তার বাড়িতে ফিরতেও লজ্জা হচ্ছে—নকল হীরেটা অবশ্য তার কাছে পয়াই হয়ে পড়েছিল। সন্নেসী হয়েই সে কয়েকজন শিষ্য পেয়ে যায়—তারপর আস্তে আস্তে তার ভক্তসংখ্যা বাড়তে বাড়তে বেশ কয়েক হাজারে দাঁড়িয়েছে। গগনানন্দ এখন সাফল্যের তুঙ্গে।

সমস্ত কথা শুনে বাঘাকাকা বললেন, আমাদের দেশে বুজরুকিটা বেশ চলে। একবার আমিও ভেবেছিলাম সন্নেসী হব। একটু ম্যাজিক-ট্যাজিকও শিখেছিলাম ঐ কথা ভেবেই।

—হ্যাঁ, ম্যাজিক আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু এটা ম্যাজিক নয় বাঘাকাকা, একজন লোক একটা লম্বা লাঠি দিয়ে আসনের তলায় এদিক থেকে ওদিক নিয়ে গেল, কিছু থাকলে লাঠিতে বেধে যেত।

—পিঁড়ি সমেত শূন্যে তোলার আরও একটা চমৎকার উপায় আছে কিট্টুবাবু। বাঘাকাকা বললেন, পিঁড়ির চারদিকে কালো সরু তার দিয়ে উপরে পুলির সাহায্যে টেনে তোলা যায়, কেউ টের পাবে না।

—তাও ছিল না। যে লোকটি লাঠি পিঁড়ির তলায় ঢুকিয়েছিল সে পিঁড়ির উপরেও লাঠি ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল কোনও তার বা অন্য কিছু ছিল না।

—তোমার কোনও সন্দেহ হয়নি কিট্টুবাবু?

—সন্দেহ আগে ছিল, কিন্তু সবটা দেখার পর আমার সন্দেহ ঘুচে গিয়েছে।

—আচ্ছা কিট্টুবাবু একজন লোক একটা আসনে বসেছে, সঙ্গে একটা পিঁড়ি কেন? আর শূন্যে যদি উঠবেনই যোগবলে তাহলে পিঁড়ি কেন একটা সঙ্গে উঠবে? গগনানন্দ সোজাসুজি, কিংবা দাঁড়িয়ে শূন্যে উঠতে পারেন না কেন এ প্রশ্ন তোমার মনে আসেনি? উঠতে হলে বসতে হবে কেন?? এ-সব মনে হয়নি?

—কেন মনে আসবে?

—ঠিক কথা! বাঘাকাকা বললেন, কেন মনে আসবে? আসলে লোকেরা প্রশ্ন করে না বলেই তাদের ঠকানো সহজ হয়। পিঁড়ির প্রশ্ন তোমার মাথায় আসা উচিত ছিল! শূন্যে আমিও উঠতে পারি। বুঝলে কিট্টুবাবু—ঘর অন্ধকার করে দাও, ধোঁয়ায় লোকের চোখে জ্বালা ধরিয়ে দাও, আলো ক্রমশ কমিয়ে প্রায় অন্ধকার করে দাও, আর আমাকে দিন তিনেক সময় এবং একটা মোটা পিঁড়ি এনে দাও, বল—আমি দেড় ফুট কেন, সাত ফুট উঠতে পারব শূন্যে।

—অসম্ভব!

—একটা পিঁড়ি এনে দাও আমাকে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সম্ভব কি অসম্ভব!

—বাড়িতে পিঁড়ি নেই।

—একটা মোটা বই এনে দাও!

কিট্টু একটা মোটা বই এনে দিল বাঘাকাকার কাছে। বাঘাকাকা বললেন, ধরো এটা একটা পিঁড়ি। এবার এই পিঁড়ির মধ্যে একধারে দুটো বিরাট ফুটো করা হলো সুড়ঙ্গের মতো—ধরো, পনের ইঞ্চি। পিঁড়িটা ধরো চওড়ায় কুড়ি ইঞ্চি। এই ফুটোর মধ্যে মোটা মোটা দুটো লোহার শিক ঢুকিয়ে দাও। এবার দেয়ালের পাশে রাখো পিঁড়ি। দেয়ালে দুটো অবশ্য ফাঁক রাখতে হবে লম্বালম্বি। উঁচুর দিকে দু' ফুট রাখতে পারো ফাঁক, চার ফুট রাখতে পারো, তুমি কত বড় মহাপুরুষ হতে চাও তার উপর সেটা নির্ভর করবে। এখন দেয়াল থেকে ঝুলুক সাটিনের পরদা—একটানা পরদা নয়, ছোট ছোট লম্বা লম্বা পরদা। দেয়ালের পেছনে অবশ্য থাকবে বিশেষ বন্দোবস্ত। কারখানায় ভারি জিনিস তোলার একরকম জ্যাক পাওয়া যায় যা নিঃশব্দে এক টনের উপর মাল তুলতে পারে। এখন পিঁড়ির ভেতর ঢোকানো দুটো লম্বা শিক দেয়ালের বাইরের জ্যাকের সঙ্গে যুক্ত হলে সুইচ টিপলে দুটো শিকও উঠবে শূন্যে, আর তার সঙ্গে পিঁড়িও উঠবে, পিঁড়ির সঙ্গে উঠবে মহাপুরুষ!

কিট্টু মুগ্ধভাবে বাঘাকাকার কথা শুনে বলল, সত্যি, আমি এত বোকা! এতো সহজ ব্যাপার—আর কিনা আমি গাধা বনে গেলাম? আমি কালই পুলিসকে বলে....।

বাঘাকাকা বললেন, কী দরকার বাপু হাঙ্গামায় যাওয়ার! ওদের পুলিসের সঙ্গে ব্যবস্থাও থাকতে পারে! তাছাড়া, পৃথিবীতে যেমন ঠকবাজ লোক আছে, তেমনি ঠকতে চায় এমন লোকও রয়েছে ভূরি ভূরি! তুমি যদি প্রমাণও করতে পারো যে গগনানন্দ লোক ঠকিয়ে বেড়ায়, তাহলেও বহু লোকই তা বিশ্বাস করবে না। কেননা, যারা বিশ্বাস করবার জন্য মরিয়া হয়ে রয়েছে তাদের সে বিশ্বাস থেকে সরিয়ে আনা ভারি কঠিন।

—তাহলে আমাদের কি কোনও কর্তব্য নেই?

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, কী দরকার রে কিট্টু, তোর এইসব হাঙ্গামায় যাওয়া? ও এখন এমন নাম করেছে যে তুই যাই করিস না কেন ওর বিরুদ্ধে, তাতে ওর নামই বাড়বে। তা-ছাড়া ভেবে দেখ কত লোকে ডাক্তার হয়ে কত লোককে ভুল ওষুধ দিয়ে ভুল চিকিৎসায় মেরে ফেলছে, তাদের তো বিচার হচ্ছে না, কত লোক খাবারে ভেজাল দিয়ে কত লোককে খুন করছে তাদেরই বা কি শাস্তিটা হচ্ছে? তাছাড়া, ধরেই নিলাম ও লোক ঠকিয়ে বেড়ায়, কিন্তু লোকেরা তো সর্বস্বান্ত হচ্ছে না, তারা টাকা দিয়ে একটু আত্মিক তৃপ্তিলাভ করছে তো! আরও একটা কথা—আমার দিক থেকে আমি যে কত শান্তি পেলাম তা আর কি বলব। বিয়ের পর থেকে হীরেটার কথা শুনছি আর আপসোস করেছি যে সেটা থাকলে আমাদের কোটি কোটি টাকা না হলেও লাখ লাখ টাকা হতো। রাগ হতো সেই চোরের উপর যে ওটিকে চুরি করেছে! এখন, যদিও দেরি হয়ে গেল অনেক, আর যা পাব তা কাঁচের একটা সামান্য খেলনা, তবু যা তৃপ্তি পাচ্ছি তার দাম যে অনেক! তাছাড়া হেমন্ত বলেছে এই হীরেটা পয়া। যার কাছে থাকে তার দারুণ সৌভাগ্যলাভ হয়। কাঁচের হীরে হলে কি হবে ওর মধ্যেও রয়েছে এক শক্তি, যে শক্তি আমাদের এনে দেবে অতুল ঐশ্বর্য!

পরদিন সকালে উঠে সুপ্রিয়া পিসি বললেন, এ-সব কথা কাউকে বলার দরকার নেই। তোর পিসে শুনলে আমাকে খেয়ে ফেলবেন, কিংবা পিষে মারবেন! বাবা, এমন নাস্তিক মানুষ আমি দেখিনি। আর উনি যদি শোনেন ওঁরই ভাই এসে লোক ঠকাচ্ছে; তাহলে উনি খেপে গিয়ে কি যে না করবেন সেটা ভেবেও আমার আতঙ্ক হয়।

এর মধ্যে টেলিফোনের আওয়াজ। মিহির ফোন করে বলছে, মা একটা দারুণ সংবাদ আছে। সেই যে তুমি লটারির টিকিট কিনেছিলে না, গুরুপদর দোকান থেকে? যার প্রথম পুরস্কার কুড়ি লাখ টাকা?

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ কিনেছিলাম, তার কি হয়েছে?

মিহির বলল, পেয়েছ মা, পেয়েছ, এক্ষুণি গুরুপদ এসে বলে গেল খবরের কাগজে নম্বর মিলিয়ে দেখেছে, তুমি পেয়েছ।

—প্রথম পুরস্কার? আগ্রহের সঙ্গে সুপ্রিয়া পিসি বললেন।

—না মা! দশম পুরস্কার, একশো জন পেয়েছে, তা তোমার নম্বরে উঠেছে, সাতশো পঞ্চাশ টাকা!

সুপ্রিয়া পিসি টেলিফোন রেখে বললেন, পাব না লটারিতে প্রাইজ? আমার হাতে যে এখন পয়া হীরে এসেই গেয়ে প্রায়? হয়তো এত তাড়াতাড়ি কুড়ি লাখ টাকা হবে না, হীরেটা সত্যি সত্যি হাতে এলে এর পর কত পয়া ব্যাপার ঘটবে দেখে নিস কিট্টু। আপাতত আমার খর্চা বাদ দিয়েও আড়াইশো টাকা লাভ রইল, কম কি?

খুশিতে সুপ্রিয়া পিসির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কেবল কিট্টু মনে মনে বলল, কাঁচ আবার হীরে, তার আবার পয়া-অপয়া! কিন্তু মুখে কিছু বলল না। কেবল ম্লান একটা হাসি হাসল। তার একটু পরে একটি ছোকরা এসে সুপ্রিয়া পিসির হাতে একটা ছোট্ট কাগজের বাক্স দিল। সুপ্রিয়া পিসি সেই বাক্সটা নিয়ে কপালে ঠেকালেন। এর মধ্যেই রয়েছে সুপ্রিয়া পিসিদের সেই হারানো হীরে!

[শারদীয়া ১৩৯৬]

রহস্য

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বাস এসে গেছে টার্মিনাসে। সবাই নেমে যাচ্ছেন! আমি আর আমার বন্ধু একেবারে পেছনের সিটে জায়গা পেয়েছিলুম। আমি নামার জন্যে হুড়োহুড়ি করছিলুম, আমার বন্ধু বলাই বললে, 'চুপ করে বোস, অত হুটোপাটির কি আছে! সবাই নেমে গেলে ধীরেসুস্থে নামব।' আমরা দু' প্যাকেট চিনেবাদাম কিনেছিলুম! এখনো কিছুটা আছে! তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছি! মেজাজ খুব ভাল! সবে পরীক্ষা শেষ হয়েছে! পরীক্ষা ভালই দিয়েছি! বলাই একটু বেশি ভাল দিয়েছে, আমি একটু কম ভাল!

করুণাময়ীতে বলাইয়ের পিসিমা থাকেন, আমরা সেইখানে যাচ্ছি কয়েকদিন ছুটি কাটাতে! বড় পুকুর আছে, মাছ কিলবিল। বাগান বিশাল। আম, জাম, পেয়ারা, কাঁঠাল! ফুল! সে দেখার মতো। এত বড় ছাত যে ফুটবল খেলা যায়, ধাঁই ধাঁই। তিনখানা পিস্তুতো ভাই। ঘুড়ি-লাটাই আছে। একেবারে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি একটা বাড়ি। পিসেমশাইয়ের জবরদস্ত একটা লাইব্রেরি আছে, ডিটেকটিভ বইয়ে ঠাসা। আমরা খাব, বেড়াব, খেলব, পড়ব, গল্প করব, ঘুড়ি ওড়াব। আমরা রাজা হয়ে যাব ক'দিনের জন্যে।

সবাই নেমে গেছে। বাস একেবারে ফাঁকা।

বলাই বললে, 'চল এইবার, আমরা নামি। গুঁতোগুঁতি করবি কেন, আমরা ছাগল না গরু! আমরা মানুষ। তোকে বলেছি, মানুষের তিন গুণ, স্থৈর্য, বীর্য, ধৈর্য। একথা আমাকে আমার দাদু বলেছেন। আমি সেই মতো চলার চেষ্টা করি।'

যেই আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি, কি দেখছি, সামনের সিটের জানলার দিকে সুন্দর দেখতে একটা হাতব্যাগ পড়ে আছে। আমরা থমকে গেলুম।

বলাই বললে, 'কি হবে? ব্যাগ ফেলে মালিক নেমে গেছে।'

আমি বললুম, 'কি হবে? আমাকে আমার দাদু বলেছেন, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।'

'মানেটা করে দে?'

'পরের জিনিসকে ইটপাটকেল জ্ঞান করবে।'

বলাই খপ করে ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললে, 'চল।'

বাসস্ট্যান্ড থেকে পিসিমার বাড়ি অনেকটা। আমরা একটা সাইকেল রিকশায় উঠে বসলুম। বদ্রীবাবুর বাড়ি যাব শুনে রিকশাচালক দু' হাত তুলে নমস্কার করে বললে, 'মানুষ তো নয়, নরনারায়ণ। ভাড়াটা আগে ঠিক করে নেওয়া ভাল। তোমরা সব একালের ছেলে, বিশ্বাস নেই, ভাড়া দেবার সময় ঝগড়া করবে।'

বলাই বললে, 'ভাড়া কত?'

'পাক্কা পাঁচ টাকা।'

'এ কি গত মাসের আগের মাসে চার টাকায় গেছি!'

'কতা একটা বললে বটে! পেট্রল আর ডিজেলের দামটা যে ঝট করে বেড়ে গেল! কাগজ-টাগজ পড় না, না কি! দেবতা গৌরাঙ্গ সব বাড়িয়ে দিয়েছে। সব জিনিসের দাম বেড়ে গেল। মানুষের দাম কমে গেল।'

বলাই বললে, 'দেবতা গৌরাঙ্গ নয়, দেবেগৌড়া।'

'ওই হলো।'

রিকশা চলতে শুরু করল। কিছু দূর গিয়ে বললে, 'অনেক খেয়েছি, আর খাব না।'

'কি খাবে না?'

'বদ্রীবাবুদের অনেক খেয়েছি, পালপার্বণে, উৎসবে, আর খাব না।'

'কেন খাবে না, পেটে সহ্য হবে না?'

'তোমরা আমার কথাটা বুঝলে না। লুচি-মণ্ডার কথা হচ্ছে না। সে যদি না খাই তাহলে বাঁচব কি করে! এই তো গুরু-পূর্ণিমা আসছে। উৎসবটা কেমন জমবে একবার ভাব।'

'সেই জন্যেই তো এলুম আমরা।'

'সে এসো, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমার কথা হলো, তোমাদের কাছ থেকে ভাড়া নোবো না। ও তরফে অনেক খেয়েছি, এখনো খাবো, এ তরফে চার টাকা ভাড়া নিয়ে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করব না।'

'সে বললে আমরা শুনব কেন! তুমি এতটা পথ কিনা পয়সায় আনবে কেন? যা ভাড়া তা দোবোই। চার টাকা। পাঁচ টাকা কিছুতেই না।'

'সে যদি রোক কর তাহলে আমাকে নিতেই হবে। তোমরাও তো ভগবান। ভগবানের দান না নিলে ভগবান রাগ করবেন। আমি মানুষকে ভয় পাই না, ভয় ভগবানকে। ভগবানের মার দুনিয়ার বার।'

রিকশা চলেছে। উঁচু-নিচু পথ। মাঝে মাঝে পেছন দিকটা সিট থেকে উঠে পড়ছে।

বলাই আমার কানে কানে ফিসফিস করে বললে, 'ব্যাগটায় মালকড়ি বেশ মোটা রকম আছে।'

'কি করে বুঝলি?'

'টিপে টিপে দেখছিলুম এতক্ষণ।'

'চট্ করে একবার খুলে দেখে নে না।'

'না, দেখলেই লোভ হবে।'

'তাহলে কি করবি? ধরে বসে থাকবি?'

'তিন রকম ভেবেছি, বাসগুমটির অফিসে জমা দোবো, থানায় জমা দোবো, গরিবকে দান করব।'

'তাহলে এই রিকশাচালককে দিয়ে দে।'

'না, তিনটেই ক্যানসেল।'

'কেন?'

'গুমটি, পুলিশ, মালিক পাবে না, এ লোকটা গরিব হলেও ধার্মিক, নেবে না।'

'তাহলে?'

'চতুর্থ পথ শ্রেষ্ঠ পথ।'

'সেটা কি?'

'লোষ্ট্রবৎ জলে ফেলে দোবো। কেউ পাবে না।'

জোড়া পুকুরের ধারে রিকশা থেকে নামলুম। মাঝখান দিয়ে পায়ে চলা পথ এগিয়ে গেছে বদ্রীভবনে। বাঁকা খেজুরের মোড়। এসব নাম আমরা রেখেছি। বাঁকা খেজুর মানে, একটা খেজুর গাছ বেঁকে পুকুরের জল ছুঁয়ে সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে।

আমরা সেই জায়গাটায় পরামর্শ করার জন্যে থেমে পড়লুম। বাঁক ঘুরলেই পিসিমার বাড়ি। জায়গাটা বেশ নির্জন। পরামর্শটা জমবে ভাল। বাঁকা খেজুর গাছটায় বসতে গিয়েও বসলুম না।

বলাই বললে, 'আমার মামা বলেছেন, খেজুরে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সাপ থাকে।'

আমরা তখন শীতলা মন্দিরের চাতাল পেরিয়ে, পেছনের পুকুরধারের বাঁধানো ঘাটে বসলুম। কেউ কোথাও নেই। পরিষ্কার জল। টুপুর-টাপুর গোটা কতক পাতিহাঁস সাঁতার কাটছে। মাথা ডুবিয়ে ডুবিয়ে চান করছে। অকারণে প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে উঠছে, যেন কেউ পেটে চাপ মারছে।

বলাই বললে, 'দেখ সন্তু, ভীষণ লোভ হচ্ছে, তোর হচ্ছে না?'

'হচ্ছে না মানে, ভীষণ হচ্ছে। কত কি কেনা যায় বল, পেন, স্পোর্টস শার্ট, ফুটবল খেলার বুট, ঘুড়ি-লাটাই, রিস্টওয়াচ, একটা এফ. এম. রেডিও।'

'এই লোভ খুব খারাপ। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।'

'আমি ইংরিজিটা বলি, অ্যাভারিস বিগেটস সিন, সিন বিগেটস ডেথ।'

'তাহলে দেখছিস, বাংলাতেও যা বলছে, ইংরিজিতেও তাই বলছে। আমার বাবা সেই কারণে শিক্ষা দিয়েছিলেন, রাস্তায় ঘাটে কিছু পড়ে থাকলে একেবারে তাকাবে না। তাকালেই তুলতে ইচ্ছে করবে, মনে করবে, তুমি দেখতেই পাওনি।'

'আমার বাবাও সেই কথা বলেছেন।'

'তাহলে এটাকে এই পুণ্যিপুকুরে বিসর্জন দি।'

'একবার খুলে দেখবি না?'

'দেখলেই লোভ হবে।'

আমি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই মাঝপুকুরে ঝপাং। গোল গোল ঢেউ উঠল। হাঁসগুলো দোল খেল। আমরা পা বাড়ালুম পিসিমার বাড়ির দিকে।

বলাই বললে, 'এখন বেশ হালকা লাগছে না?'

'বেশ শান্তি?'

পিসিমার বাড়ির উঠনে পা দিয়েই শুনলুম, একতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে পিসেমশাই এক মধ্যবয়সী মহিলাকে বলছেন, 'ব্যাগটা তুমি বাসেই ফেলেছ বুঝলে কি করে? কত টাকা ছিল?'

'হাজার টাকা। একশোটা দশ টাকার নোটের একটা বান্ডিল। ব্যাঙ্ক থেকে তুলে বাসে উঠলুম।'

'ব্যাগ তো মেজদি, লোকের হাতে থাকে।'

'হাতেই ছিল। একটুক্ষণের জন্যে পাশে রেখে পানমশলা খাচ্ছিলুম, তারপর ভুলে গেছি তো ভুলেই গেছি। বেমালুম ভুল। জানিস তো আমার ভুলো মন। এখন কি হবে ভাই, অতগুলো টাকা।'

'চলো একবার বাসগুমটিতে গিয়ে দেখি।'

আমি আর বলাই বাড়ির ভেতরে না গিয়ে পেছনের বাগানে চলে গেলুম। বেশ কিছুটা হেঁটে পুকুরপাড়ে। আবার পরামর্শ।

বলাই বললে, 'এইবার কি হবে?'

'চল, সোজাসুজি বলে দি, ব্যাগ পুণ্যিপুকুরে।'

'পাগল হয়েছিস! বলবে আমরা পকেটমার।'

'বলতে পারে। তাই না!'

'বলবেই। আর ও ব্যাগ তো জাল ফেললে উঠবে না, ডুবুরি নামাতে হবে।'

'তাহলে?'

'তুই তো ডুবসাঁতার জানিস।'

'সে জানি, ভালই জানি।'

'তাহলে চল ব্যাগটাকে উদ্ধার করি।'

'করে?'

'করে, গুমটিতে জমা দিয়ে বাড়ি ফিরে যাই।'

'এইবার ওরা যদি বলে, এতক্ষণ ছিলে কোথায়, ব্যাগটা ভিজে কেন?'

'সেটা একটা কথা বটে। তাহলে ব্যাপারটা ভুলে যা।'

আমরা গরম লুচি আর আলুভাজা খাচ্ছি, বারান্দায় বেতের চেয়ার-টেবিলে বসে। মনটা বিষণ্ণ এমন সময় পিসেমশাই মেজদিকে নিয়ে হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে ফিরলেন, ব্যাগ পাওয়া গেছে টাকা সমেত। বলাই আর আমি হাঁ করে গেছি। ওটা তাহলে কার ব্যাগ!

[শারদীয়া ১৪০৩]

নয়নচাঁদ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

গভীর রাতে একটা শব্দ শুনে নয়নচাঁদবাবুর ঘুম ভেঙে গেল।

এমনিতেই নয়নচাঁদের ঘুম খুব পাতলা। টাকা থাকলেই দুশ্চিন্তা। আর দুশ্চিন্তা থাকলেই অনিদ্রা। অনিদ্রা থেকেই আবার অগ্নিমান্দ্য হয়। অগ্নিমান্দ্য থেকে ঘটে উদরাময়। সুতরাং টাকা থেকেও নয়নচাঁদের সুখ নেই। সারা বছর কবরেজি পাঁচন, হোমিওপ্যাথি গুলি আর অ্যালোপ্যাথির নানা বিদঘুটে ওষুধ খেয়ে বেঁচে আছেন কোনও মতে।

ঘুম ভাঙতেই নয়নচাঁদ চারদিকে চেয়ে দেখলেন। রাত্রিবেলা এমনিতেই নানা রকমের শব্দ হয়। ইঁদুর দৌড়োয়, আরশোলা খরখর করে, কাঠের জোড় পটপট করে ছাড়ে, হাওয়ায় কাগজ ওড়ে, আরও কত কী? তাই নয়নচাঁদ তেমন ভয় পেলেন না। তবে আধো ঘুমের মধ্যে তাঁর মনে হয়েছিল, শব্দটা হলো জানালায়। জানালার শিক-এ যেন টুং করে কেউ একটা ঢিল মেরেছিল।

বিছানার মাথার দিকেই জানালা, জানালার পাশেই একটা টেবিল। তাতে ঢাকা দেওয়া জলের গেলাস। নয়নচাঁদ টর্চ জ্বেলে জলের গেলাসটার দিকে হাত বাড়িয়েই থমকে গেলেন। টেবিলের ওপর একটা কাগজের মোড়ক পড়ে আছে।

নয়নচাঁদ উঠে বড় বাতি জ্বেলে মোড়কটা খুললেন। যা ভেবেছেন তাই। ঢিলে জড়িয়ে কে একখানা চিঠি পাঠিয়েছে তাঁকে, সাদামাটা একখানা কাগজে লাল অক্ষরে লেখা ঃ নয়নচাঁদ, আমাকে মনে আছে? সামান্য দেনার দায়ে আমার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়েছিলে। শেষ অবধি গলায় গামছা বেঁধে আমাকে আত্মহত্যা করতে হয়। আমার বউ আর বাচ্চারা ভিখিরি হয়ে সেই থেকে পথে পথে ঘুরছে। অনেক সহ্য করেছি, আর না। আগামী অমাবস্যায় তোমার ঘাড় মটকাবো। ততদিনে ভাল-মন্দ খেয়ে নাও। ফুর্তি করো, গাও, নাচো, হাসো। বেশী দিন তো আর নয়। ইতি তোমার যম জনার্দন।

নয়নচাঁদ ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর শিথিল হাত থেকে চিঠিটা পড়ে গেল। চাকরবাকর, বউ, ছেলেমেয়েদের ডাকার চেষ্টা করলেন। গলা দিয়ে স্বর বেরোলো না।

জনার্দনকে খুব মনে আছে নয়নচাঁদের। নিরীহ গোছের মানুষ। তবে বেশ খরচের হাত ছিল। প্রায়ই হ্যান্ডনোট লিখে নয়নচাঁদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করত। কখনও টাকা শোধ দিতে পারেনি। নয়নচাঁদ মামলায় জিতে লোকটার বাড়িঘর সব দখল করে নেয়। জনার্দন সেই দুঃখে বিবাগী হয়ে কোথায় চলে যায়। মাসখানেক বাদে নদীর ওপাড়ে এক জঙ্গলের মধ্যে একটা আমড়া গাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তার পচাগলা লাশটা পাওয়া যায়। তার বউ ছেলেপিলেদের কী হয়েছে তা অবশ্য নয়নচাঁদ জানেন না। সেই ঘটনার পর বছর তিন-চার কেটে গেছে।

নয়নচাঁদের ভূতের ভয় আছে। তাছাড়া অপঘাতকেও তিনি খুবই ভয় পান। খানিকক্ষণ বাদে শরীরের কাঁপুনিটা একটু কমলে তিনি জল খেলেন এবং বাড়ির লোকজনকে ডাকলেন। রাত্রে আর কেউ ঘুমোতে পারল না! এই রহস্যময় চিঠি নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা গবেষণা হতে লাগল।

পরদিন সকালে গোয়েন্দা বরদাচরণকে ডেকে পাঠানো হলো। গোয়েন্দা বরদাচরণ পাড়ারই লোক।

বরদাচরণ লোকটা একটু অদ্ভুত। স্বাভাবিক নিয়মে কোনও কাজ করতে তিনি ভালবাসেন না। তাঁর সব কাজেই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই যেমন কোনও বাড়িতে গেলে তিনি কখন সদর দরজা

দিয়ে সেই বাড়িতে ঢুকবেন না। এমন কি খিড়কি দরজা দিয়েও না। তিনি হয় পাঁচিল টপকাবেন, নয়তো গাছ বেয়ে উঠে ছাদ বেয়ে নামবেন। এমন কি জানালা ভেঙেও তাঁকে ঢুকতে দেখা গেছে।

নয়নচাঁদের বাড়িতে বরদা ঢুকলেন টারজানের কায়দায়। বাড়ির কাছেই একটা মস্ত বটগাছ আছে। সেই বটের একটা ঝুরি ধরে কষে খানিকটা ঝুল খেয়ে বরদা পাশের একটা জাম গাছের ডাল ধরলেন। সেটা থেকে লাফিয়ে পড়লেন একটা চালতা গাছে। সেখান থেকে নয়নচাঁদের বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে অবশেষে একটা রেইন পাইপ ধরে তিনতলার জানালায় উঁকি দিয়ে হাসিমুখে বললেন, "এই যে নয়নবাবু, কী হয়েছে বলুন তো?"

জানালায় আচমকা বরদাচরণকে দেখে নয়নচাঁদ ভিড়মি খেয়ে প্রথমটায় গোঁ গোঁ করতে লাগলেন। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তাঁকে ফের সামাল দেওয়া হলো। বরদাচরণ ততক্ষণে ধৈর্যের সঙ্গে জানালার বাইরে পাইপ ধরে ঝুলে রইলেন।

অবশেষে যখন ঘটনাটা বরদাচরণকে বলতে পারলেন নয়নচাঁদ তখন বরদা খুব গম্ভীর মুখে বললেন, "তাহলে এ জানালাটাই! এটা দিয়েই ঢিলে বাঁধা চিঠিটা ছোঁড়া হয়েছিল তো?"

"হ্যাঁ বাবা বরদা।"

জানালাটা খুব নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা করে বরদা বললেন, "হুম, অনেকদিন জানালাটা রং করাননি দেখছি।"

"না। খামোখা পয়সা খরচ করে কী হবে? জানালা রং করালেও আলো-হাওয়া আসবে, না করালেও আসবে। ঝুটমুট খরচ করতে যাবো কেন?"

"তার মানে আপনি খুব কৃপণ লোক, তাই না?"

"কৃপণ নই বাবা, লোকে বাড়িয়ে বলে। তবে হিসেবী বলতে পারো।"

"কাল রাতে আপনি কী খেয়েছিলেন?"

"কেন বাবা বরদা, রোজ যা খাই তাই খেয়েছি। দুখানা রুটি আর কুমড়োর ছেঁচকি।"

বরদাচরণ গম্ভীর হয়ে বললেন, "আপনি খুবই কৃপণ। ভীষণ কৃপণ।"

"না বাবা, কৃপণ নই। হিসেবী বলতে পারো।"

"আমার ফিস কত জানেন? পাঁচশো টাকা, আর খরচপাতি যা লাগে।"

নয়নচাঁদ ফের ভিরমি খেলেন। এবার জ্ঞান ফিরতে তাঁর বেশ সময়ও লাগল।

বরদা বিরক্ত হয়ে বললেন, "কৃপণ বা হিসেবী বললে আপনাকে কিছুই বলা হয় না। আপনি যাচ্ছেতাই রকমের কৃপণ। বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে কৃপণ লোক আপনিই।"

নয়নচাঁদ মুখখানা ব্যাজার করে বললেন, "পাড়ার লোক হয়ে তুমি পাঁচশো টাকা চাইতে পারলে? তোমার ধর্মে সইল?"

"আপনার প্রাণের দাম কি তার চেয়ে বেশী নয়?"

"কিছু কমই হবে বাবা। হিসেব করে দেখেছি আমার প্রাণের দাম আড়াইশ টাকার বেশী নয়।"

"তবে আমি চললুম, ভিজিট বাবদ কুড়িটা টাকা আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন।"

নয়নচাঁদ আঁতকে উঠে বললেন, "যেও না বাবা বরদা, ওই পাঁচশো টাকাই দেবোখন।"

বরদাচরণ এবার পাইপ বেয়ে নেমে সিঁড়ি বেয়ে ঘরে এসে উঠলেন। হাত বাড়িয়ে বললেন, "চিঠিটা দেখি।"

চিঠিটা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবটা পড়লেন। কালিটা পরীক্ষা করলেন। কাগজটা পরীক্ষা করলেন। আতসকাচ দিয়ে অক্ষরগুলো দেখলেন ভাল করে। তারপর নয়নচাঁদের দিকে চেয়ে বললেন, "এটা কি জনার্দনেরই হাতের লেখা?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। জনার্দন কয়েকটা হ্যান্ডনোট আমাকে লিখে দিয়েছিল। সেই লেখার সঙ্গে অনেকটা মিল আছে।"

বরদা বললেন, "হুঁ মনে হচ্ছে গামছাটা তেমন টেঁকসই ছিল না।"

"তার মানে কী বাবা? এখানে গামছার কথা ওঠে কেন?"

"গামছাই আসল। জনার্দন গলায় গামছা বেঁধে ফাঁসে লটকেছিল তো! মনে হচ্ছে গামছা ছিঁড়ে

সে পড়ে যায় এবং বেঁচেও যায়। এ চিঠি যদি তারই লেখা হয়ে থাকে তো বিপদের কথা। আপনি বরং ক'টা দিন একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া করুন। আমোদ-আহ্লাদও করে নিন প্রাণভরে।"

"তার অর্থ কী বাবা! কী বলছো সব? আমি জীবনে কখনও ফুর্তি করিনি। তা জানো?"

"জানি বলেই বলছি। টাকার পাহাড়ের ওপর শকুনের মতো বসে থাকা কি ভাল? অমাবস্যার তো আর দেরীও নেই।"

নয়নচাঁদ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "জনার্দন যে মরেছে তার সাক্ষীবাবুদ আছে। লাশটা সনাক্ত করেছিল তার আত্মীয়রাই।"

"তবে তো আরও বিপদের কথা। এ যদি ভূতের চিঠি হয়ে থাকে তবে আমাদের তো কিছুই করার নেই।"

নয়নচাঁদ এবার ভ্যাক করে কেঁদে উঠে বললেন, "প্রাণটা বাঁচাও বাবা বরদা, যা বলো তাই করি।"

বরদা এবার একটু ভাবলেন। তারপর মাথাটা নেড়ে বললেন, "ঠিক আছে, দেখছি।"

এই বলে বরদাচরণ বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন তিন দিন পর। মাথার চুল উসকোখুসকো, গায়ে ধুলো, চোখ লাল। বললেন, "পেয়েছি।"

নয়নচাঁদ আশান্বিত হয়ে বললেন, "পেয়েছো ব্যাটাকে ধরতে? যাক বাঁচা গেল।"

বরদা মাথা নেড়ে বললেন, "তাকে ধরা অত সহজ নয়। তবে জনার্দনের বউ-ছেলে-মেয়ের খোঁজ পেয়েছি। এই শহরেরই একটা নোংরা বস্তিতে থাকে, ভিক্ষে-সিক্ষে করে পরের বাড়িতে ঝি-চাকর খেটে কোনও রকমে বেঁচে আছে।"

"অ, কিন্তু সে খবরে আমাদের কাজ কী?"

বরদা কটমট করে চেয়ে থেকে বললেন, "চিঠিটা যদি ভাল করে পড়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, ভূতটার কেন আপনার ওপর রাগ! তার বউ-ছেলে-মেয়ে ভিখিরি হয়ে যাওয়াটা সে সহ্য করতে পারছে না।"

"তা বটে।"

"যদি বাঁচতে চান তো তাদের আগে ব্যবস্থা করুন।"

"কী ব্যবস্থা বাবা বরদা?"

"তাদের বাড়িঘর ফিরিয়ে দিন। আর যা সব ক্রোক করেছিলেন তাও।"

"ওরে বাবা! তার চেয়ে যে মরাই ভাল।"

"আপনি চ্যাম্পিয়ন।"

"কিসে বাবা বরদা।"

"কিপটেমিতে। আচ্ছা আসি, আমার কিছু করার নেই কিন্তু।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও। অত চটো কেন? জনার্দনের পরিবারকে সব ফিরিয়ে দিলে কিছু হবে?"

"মনে হয় হবে। তারপর আমি তো আছিই।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নয়নচাঁদ বললেন, "তাহলে তাই হবে বাবা।"

অমাবস্যার আর দেরী নেই। মাঝখানে মোটে সাতটা দিন। নয়নচাঁদ জনার্দনের ঘরবাড়ি, জমিজমা, ঘটিবাটি এবং সোনাদানা সবই তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। জনার্দনের বউ আনন্দে কেঁদে ফেলল। ছেলেমেয়েগুলো বিহ্বল হয়ে গেল।

বরদা নয়নচাঁদকে বললেন, "আজ রাতে রুটির বদলে ভাল করে পরোটা খাবেন। সঙ্গে ছানার ডালনা আর পায়েস।"

"বলো কী?"

"যা বলছি তাই করতে হবে। আপনার প্রেশার খুব লো। শক-টক খেলে মরে যাবেন।"

"তাই হবে বাবা বরদা। যা বলবে করব। শুধু প্রাণটা দেখো।"

নয়নচাঁদ পরোটা খেয়ে দেখলেন, বেশ লাগে। কোনোদিন খাননি। ছানার ডালনা খেয়ে আনন্দে

তাঁর চোখে জল এসে গেল। আর পায়েস খেতে খেতে পূর্বজন্মের কথাই মনে পড়ে গেল তাঁর। না, পৃথিবী জায়গাটা বেশ ভালই।

সকালবেলাতেই বরদা জানালা দিয়ে উঁকি মারলেন।

"এই যে নয়নচাঁদবাবু, কেমন লাগছে?"

"গায়ে বেশ বল পাচ্ছি বাবা। পেটটাও ভুটভাট করছে না তেমন।"

"আপনার কাছারিঘরে বসে কাগজপত্র সব দেখলাম। আরও দশটা পরিবার আপনার জন্য পথে বসেছে। তাদের সব সম্পত্তি ফিরিয়ে না দিলে কেসটা হাতে রাখতে পারব না।"

"বলো কী বাবা বরদা? এরপর যে আমিই পথে বসব।"

"প্রাণটা তো আগে।"

কী আর করেন, নয়নচাঁদ বাকি দশটা পরিবারের যা কিছু দেনার দায়ে দখল করেছিলেন তা সবই ফিরিয়ে দিলেন। মনটা একটু দমে গেল বটে, কিন্তু ঘুমটা হলো রাত্রে।

অমাবস্যা এসে পড়ল প্রায়। আজ রাত কাটলেই কাল অমাবস্যা লাগবে।

সন্ধেবেলা বরদা এসে বললেন, "কেমন লাগছে নয়নচাঁদবাবু, ভয় পাচ্ছেন না তো!"

"ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছি বাবা।"

"ভয় পাবেন না। আজ রাত্রে আরও দুখানা পরোটা বেশী খাবেন। কাল সকালে যত ভিখিরি আসবে কাউকে ফেরাবেন না। মনে থাকবে?"

নয়নচাঁদ হাঁপ-ছাড়া গলায় বললেন, "তাই হবে বাবা, তাই হবে। সব বিলিয়ে দিয়ে লেংটি পরে হিমালয়ে চলে যাব, যদি তাতে তোমার সাধ মেটে।"

পরদিন সকালে উঠে নয়নচাঁদের চক্ষু চড়কগাছ। ভিক্ষে দেওয়া হয় না বলে এ বাড়িতে কখনও ভিখিরি আসে না। কিন্তু সকালে নয়নচাঁদ দেখেন, বাড়ির সামনে শয়ে শয়ে ভিখিরি জুটেছে। দেখে নয়নচাঁদ মূর্ছা গেলেন। মূর্ছা ভাঙার পর বেজার মুখে উঠলেন। সিন্দুক খুলে টাকা বের করে চাকরকে দিয়ে ভাঙিয়ে আনালেন। ভিখিরিরা যখন বিদেয় নিল তখন নয়নচাঁদের হাজার খানেক টাকা খসে গেছে।

নয়নচাঁদ মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। হাজার টাকা যে অনেক টাকা!

দুপুরে একরকম উপোস করেই কাটালেন নয়নচাঁদ। টাকার শোক তো কম নয়।

নিজের ঘরে শুয়ে থেকে একটু তন্দ্রাও এসে গিয়েছিল। যখন তন্দ্রা ভাঙল তখন চারদিকে অমাবস্যার অন্ধকার। ঘরে কেউ আলোও দিয়ে যায়নি।

আতঙ্কে অস্থির হয়ে নয়নচাঁদ চেঁচালেন, "ওরে কে আছিস?"

কেউ জবাব দিল না।

ঘাড়টা কেমন সুড়সুড় করছিল নয়নচাঁদের। বুকটা ছমছম। চারদিকে কিসের যেন একটা ষড়যন্ত্র চলছে অদৃশ্য। ফিসফাস কথাও শুনতে পাচ্ছেন।

নয়নচাঁদ সভয়ে কাঠ হয়ে জানালাটার দিকে চেয়ে রইলেন।

হঠাৎ সেই অন্ধকার জানালায় একটা ছায়ামূর্তি উঠে এল।

নয়নচাঁদ আর সহ্য করতে পারলেন না। হঠাৎ তেড়ে উঠে জানালার কাছে ধেয়ে গিয়ে বললেন, "কেন রে ভূতের পো, আর কোন্ পাপটা আছে আমার শুনি? আর কোন্ কর্মফল বাকি আছে? থোড়াই পরোয়া করি তোর?"

একটা টর্চের আলোয় ঘরটা ভরে গেল হঠাৎ। জানালার বাইরে থেকে বরদাচরণ বললেন, "ঠিকই বলেছেন নয়নবাবু। আপনার আর পাপ-টাপ নেই। ঘাড়ও কেউ মটকাবে না। অমাবস্যা একটু আগেই ছেড়ে গেছে।"

"বটে?"

"তবে ফের অমাবস্যা আসতে আর কতক্ষণ? এবার থেকে যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চালিয়ে যান। সকালে ভিখিরি বিদেয়, দুপুরে ভরপেট খাওয়া, বিকেলে দানধ্যান সৎচিন্তা, রাত্রে পরোটা, মনে থাকবে?"

নয়নচাঁদ একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "থাকবে বাবা থাকবে।"

[শারদীয়া ১৩৯৩]

হুলের গল্প

মহাশ্বেতা দেবী

আজকের কথা নয়, সে অনেক দিনের কথা। আজ থেকে একশো চৌত্রিশ বছর আগেকার কথা। আজকের মানচিত্রে বিহার রাজ্যে যে সব জায়গার নাম গোড্ডা, দুমকা, দেওঘর, সেদিন সবই ছিল সাঁওতালদের থাকার জায়গা। ছোট ছোট ঢেউখেলানো পাহাড়, নিবিড় বনজঙ্গল, মাঝে মাঝে সবুজ শস্যক্ষেত্র আর সাঁওতালদের গ্রাম। তেমনি একটি গ্রাম বুরুডিহিতে জন্মেছিল রাতা মাণ্ডি নামে একটি সাঁওতাল ছেলে।

রাতার বাবার মতো শিকারী পাঁচটা গ্রামে ছিল না। শিকার উৎসবের কয়েকদিন সে যে কত শিকার করত তার ঠিক নেই। রাতার মায়ের মতো কাজ করতে কম মেয়েই পারত। রাতার দুটো দাদাই শিকার করতে, নাচতে, বাঁশি বাজাতে ওস্তাদ।

রাতার বয়স তখন বড়জোর বারো হবে। দাদাদের সঙ্গে ও কাছাকাছি যাবে শিকার করতে এবার, কিন্তু তার আগেই সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

গ্রামে গ্রামে ধমসা মাদল বেজে উঠল। শোনা গেল ভীষণ একটা ঝড় আসছে। সাঁওতালরা দুই সুবা ঠাকুর সিদো মুর্মু, কন্‌হু মুর্মু, তাঁদের দুই ভাই চাঁদ আর ভৈরোর সঙ্গে সায়েবদের সঙ্গে লড়তে যাবে।

রাতার মনে বড় দুঃখ হলো। এতদিন ও পাখিটা, সাপটা, খরগোশটা মেরেছে। কিন্তু বড় শিকার তো করেনি। এবার যাবার কথা ছিল, হলো না।

ও ঠাকুমাকে বলল, কি হবে গো এবার?

—হুল হবে, হুল।

—কেন হবে?

ঠাকুমা কুলোতে কলাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, কে বা তোদের সব পুরনো কথা শেখায়! শোন্, আমাদের সঙ্গে জমিদাররা, বুঝলি তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সিংহবাবু জমিদার। হাতি চেপে শিবমন্দিরে যায়, সঙ্গে কত লোক!

—ওই তো, জমিদাররা আর মহাজনরা যখন আমাদের পিছনে লেগে যায়, সর্ষে-কলাই-লঙ্কা-ধান নিয়ে যায়, আর সাহেবরা যখন ওদের কথা শোনে, আমাদের নালিশ শোনে না, তখন আমরা হুল করি।

—কখন কর?

—কে তোকে বোঝায়? যখন খুব কষ্ট পাই, তখন কষ্ট জমে পাহাড় হয়। পাহাড়ের বুকে আগুন জ্বলে, সেই হলো হুল। বাবা তিলকা মাঝির গল্প তো বলেছি। সেও হুল করেছিল।

রাতা বলল, আমিও হুল করব?

—তা, বনে আগুন লাগে তো বড় জানোয়ার বেরিয়ে আসে, ছোট জানোয়ারও বেরোয়।

রাতার মা বলল, যা! জল নেমেছে ঝোরায়, মাছ লাফাচ্ছে কি! আনতে পারিস তো বুঝি।

—মা, আজ সাঁঝে কি হবে গো?

—মাতন মাঝি হুলের কথা বলবে।

—আমিও যাব?

—যাবি।

ঝোরায় মাছ ধরতে গিয়েই তো রাতা দেখেছিল জ্যোৎস্নার মতো সাদা বুনো হাঁস আর হাঁসী। পাখি দুটি ডানা মেলে বনের ওপর ঘুরে ঘুরে উড়ছিল। রাতা দেখেছিল ওরা আকাশপানে উঠে গেল, যেন সাঁঝতারা আর একফালি চাঁদে মিলিয়ে গেল। মাছ ফেলে দিয়ে ও ঘরের দিকে ছুটতে শুরু করেছিল।

গ্রামের পূজার জায়গা জাহের থানের সামনে মাটিতে মশাল পুঁতে গ্রামের মানুষ বসেছিল। রাতা দাঁড়িয়েছিল।

মাতন মাঝির বুকটা পাথরের মতো, শরীরটা যেন শাল গাছ, আর মাথার চুল সব সাদা। সে সকলের উদ্দেশে বলল, বুঝলে?

—তুমি বলো। তুমি জ্ঞানীমানী লোক।

মাতন মাঝি রাতার মাথায় হাত রেখে বলল, কত চাঁদ হয়ে গেল, বাবা তিলকা মাঝি স্বপ্ন দেখেছিল!

—দেখেছিল।

—গমকাহানীতে যে সব কথা তোমরা শুনেছ। আদিতে ছিল ওই হাঁস আর হাঁসী। তাদের ডিম থেকেই আমাদের জন্ম। বাবা তিলকা মাঝি স্বপ্ন দেখেছিল সেই হাঁস আর হাঁসী উড়ে উড়ে ফিরে, বসার জায়গা পায় না, তখন তার বুকে বসল। বসল তো, সে জানল যে হুলটা না করলে আমাদের জাতি বাঁচবে না।

—জানি।

—আজ ধুরমালের ছেলে রাতাকে হাঁস-হাঁসী দর্শন দিয়ে উড়ে গেল। জানিয়ে দিয়ে গেল, তীর বানাও, ধনুক উঠাও, টাঙ্গি-কুঠার-বল্লম ধরো, ধমসা বাজাও আর আগাও। সুবা ঠাকুররা পথ দেখিয়েছে, সেই পথে চলো হে! জঙ্গল আমাদের, জমি আমাদের, দেশ আমাদের, এখানে বাইরে থেকে এসে যারা জেঁকে বসে গেছে সেই জমিদার আর মহাজন আর ইংরেজের দারোগা পুলিশ, সব হটিয়ে দাও।

রাতার বাবা বলল, আমরা গোদানিতে যাই, কামারদের কাছে। তারাও চলে যাবে?

—না। তারা যাবে কেন? যাবে জোঁকগুলো, আমাদের রক্ত খেয়ে যারা মোটা হয়েছে।

এমনি করেই ছোট্ট বুরুডিহি গ্রাম থেকে মানুষজন, সাঁওতাল গণবিদ্রোহের নেতা সিদো-কন্হ্-চাঁদ-ভৈরোর গ্রাম ভগনাডিহির দিকে রওনা হয়েছিল আষাঢ়ের মেঘ-থমথমে সকালে।

রাতার বাবা, দুই দাদা ওদের সঙ্গেই গিয়েছিল। রাতা বলেছিল, শিকার পরবও হলো না, হুলেও যাব না?

মাতন মাঝি বলেছিল, তোদের মতো ছেলেরা, গ্রাম পাহারা দিবি। গাছে উঠে নজর রাখবি কোন পথে দুশমন আসে। মেয়েদের, বুড়ো-বুড়িদের, বাচ্চাদের নিয়ে জঙ্গলে গুহায় পলাবি। কি বল গো দিদি?

রাতার ঠাকুমা বলল, আমাকে আর বলতে হবে না।

সবাই চলে গেল তো বুড়ি সব মেয়ে বউ বালক বালিকা নিয়ে চলল পাহাড়ে। বড় বড় গুহা, পাশেই ঝোরা। গুহাতে ওরা চাল, লবণ, গমের আটা, গুড় এনে জমা করল। রাতাদের ওপর মহাদায়িত্ব পড়ল। গ্রামের সকলের গরু-ছাগল নিয়ে ওরা চলল তিন পাহাড়ের ওপারে, যেখানে তিনটি নিচু পাহাড়ের পাহারার কোলে আছে এক লুকানো উপত্যকা। সেখানে ঝোরার জল বহে যায়, সবুজ ঘাসের বন জেগে থাকে। সেখানে গাছের ডাল কেটে ঘন ঘন করে পরপর তিন সারি

পুঁতে তৈরি হলো এক শক্ত আর মস্ত খোঁয়াড়। রাতা, ধুরা, পাবন, মংলা, বুধন, ছেলের পাল গাছের ওপর মাচা বাঁধল। গরু, ছাগল পাহারা দেবে, চারদিকে নজর রাখবে। তীব্র চালাতে সবাই জানে।

মেয়েরা গুহাতে নিয়ে গেল মুরগিগুলো। ব্যস্। বুরুডিহি গ্রাম সুনসান। মানুষ নেই, গরু চরে না, কেউ বাঁশি বাজায় না। গুহাতে বসে রাতার ঠাকুমা আর অন্য বুড়িরা আবার বলতে শুরু করল যত কাহানী আর কাথা। বুড়োরা না বললে ছেলেরা জানবে না। তারা না জানলে যত কাহানী কাথা হারিয়ে যাবে। একশো বছর, বারোশত চাঁদ বাদে যে সব সাঁওতালী ছেলেমেয়ে হবে, তারা তো কিছুই জানবে না। মংলার পিসি সব ওষুধপালা গাছগাছড়ার পুঁটলি বেঁধে সকলের পিছনে এল।

মংলা তো বকছে, চল্ পিসি, চল্ পিসি।

পিসি বলল, থাম্ তো। ছেলেপিলে কচিকাঁচা, ওষুধবাকলটা দরকার।

—ওষুধ দেবে কে?

—রাতার ঠাকুরদা ছিল কবিরাজ, রাতার ঠাকুমা দেবে।

রাতার কি আনন্দ, কি আনন্দ। বড়রা যদি লড়াই করতে যেতে পারে, ছোটরাও কাজ করতে পারে। বাঘ-ভালুক তাড়িয়ে বনে বাস করা কি কম কথা? সন্ধ্যে হলেই খোঁয়াড় ঘিরে দূরে দূরে আগুন জ্বালিয়ে দাও, বাঘ আসবে না। সন্ধ্যে হলে গরু-ছাগল গুনে গুনে খোঁয়াড়ে তোলো। বনের কন্দমূল ধুয়ে নাও, পুড়িয়ে নাও। পেটভরে খাও।

কিন্তু দিন তো সুখে গেল না। রাতার দাদা সুকরা একদিন বনের পথে গা ঢাকা দিয়ে এল। খুব লড়াই হয়ে গেছে দিকে দিকে। সিংহবাবু জমিদার, আর গণপতি সাউ মহাজনকে কেটে ফেলেছে বুরুডিহি আর নাকুম গ্রামের সাঁওতালরা। কেটে রেখে চালের বস্তা নিয়ে চলে গেছে, সোনাদানা ছোঁয়নি। এখন মহেশগঞ্জ থেকে নীলকুঠির রবার্ট সাহেব, দারোগা, পুলিশ আর নীলকুঠির লোকদের নিয়ে এদিকে আসছে।

রাতার ঠাকুমা বলল, এদিকে কেন?

সুকরা চোখ নামিয়ে বলল, বাবা, মাধো কাকা, সনা মাঝি তো জখম। তাদের নিয়ে আমরা এখানেই আসছি। তারাই তো আগে ছিল, দারোগা বাবাকে চিনে। সেবার হাটে বাবা দারোগার ঘোড়াকে চাবুক মেরেছিল।

ধুরমাল, মাধো আর সনাকে ওরা পৌঁছে দিয়ে গেল। সুকরা রাতাকে বলল, গাছের উপর থেকে নজর রাখিস।

ধুরমালদের গুহাতে ঢুকিয়ে দিয়ে সুকরা বলল, ইস্! এসে পড়ে যদি, গরু-ছাগল সব নিয়ে যাবে।

—তারা তো আসবে ঘোড়া চেপে, তাই না?

—হ্যাঁ, পথে পথে আসবে।

—তবে পথের দিকেই যেতে হয়।

—তাই যা।

সুকরা ফিসফিস করে রাতাকে বলল, মাকে বলিস না। ভাই কিন্তু নাই। মহেশগঞ্জের ওপারে বড়জুড়ির হাটের মাঠে খুব লড়াই...মহন পেটে গুলি খেল...তারে টানতে টানতে...যখন পিঠে উঠালাম, খুব দৌড়ালাম, মাটিতে নামাতে দেখি সে নাই।

নিশ্বাস ফেলে বলল, আমার মাথার চিরুনিটা আর মহনের বাঁশিটা তুই নিস।

রাতা আর পাবন বলল, এই গামছাটা নিয়ে যা দাদা। গুড় আছে, ছাতু আছে। না, কাউকে বলব না।

—বলিস না।

সুকরা চলে গেল, সবুজ বনে মিলিয়ে গেল।

রাতা বলল, পাবন! আর তো দেরি করা চলে না।

—চল্ তবে।

—সাহেব গুলি চালায় কিন্তু।

—সাহেব গুলি চালায়, আমরা তীর চালাই...কি করিস?

—ওই দেখ!

—কি?

—গাইটা পিছন পিছন এসে গেল যে?

—চলুক, রাঙীটাও লড়াই করবে তবে।

মাঝে মাঝে গরুর ডাক, আর বাঁশির সুর। তাই শুনতে শুনতে রবার্ট সাহেব, দারোগা, ছয়জন সেপাই আর নীলকুঠির বারো লেঠেল "ওই যে!" বলে ঘোড়া ছুটিয়ে আর পায়ে দৌড়ে এসেছিল। পুব দিকে বুরুডিহি গ্রাম, আর সেদিক থেকেই বাঁশির সুর আসছে।

এগোতে তো দেখে সামনে ঝোপজঙ্গল, পথই নেই। বাঁশি এবার আবার বাজল। এবারে উত্তর দিক থেকে। হ্যাঁ, গরুও ডাকছে।

দারোগা বলল, ওদিকে পথ নেই।

সাহেব খাপ্পা।—এদিকে বা পথ কোথায়?

—বাঁশির সুর এমন দিক ঘুরছে কেন?

—চলো, চলো।

উত্তর দিকে বনের মাঝে, পাহাড়ের ঢালে জীবজন্তু চলার পথ। বাঁশির সুরটা যেন দূরে চলে যাচ্ছে।

অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায় ওরা পৌঁছল একটা কাশবনে। সব নিঃশব্দ।

বাঁশির সুর ওদের দক্ষিণে ডাকছে।

—এ কি ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি?

রাতা আর পাবন যে ঘুরে ঘুরে, দৌড়ে পাহাড় ঘিরে, দুজনে দু'দিক থেকে বাঁশি বাজাচ্ছে তা তো সাহেব বোঝেনি। ঘুরতে ঘুরতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে সাহেব যখন বিকেল নাগাদ বলল, পুব দিকে চলো।

তখন দারোগা বলল, সাহেব! এ সব ভূতুড়ে কাণ্ড।

—খবরদার!

—এ সব গ্রামে কেউ নেই সাহেব। গ্রাম বা কোথায়? বুরুডিহি এখনো আট মাইল। আঁধার হয়ে যাবে। আমরা ঘোড়ার পিঠে, ওরা তো হাঁটছে। এখান থেকে ফিরবে কি করে?

—সেই শয়তানগুলোর খবর করবে না?

—সাহেব! আমি এ সব বুনো গ্রামের পথঘাট জানি না। কোন পথে যাব?

সে বাঁশির শব্দ যেন কাছে আসছে।

—দাঁড়াও, দেখো।

—রাতে এই জঙ্গলে....

এখন সেপাইরা আর লেঠেলরা বলল, আমরা বখশিস চাই না হুজুর, চাকরি গেলে যাবে, প্রাণটা বাঁচা দরকার। এ সব বনে-পাহাড়ে দেবতা থাকে, ভূতপ্রেতও থাকে। আমাদের পথ ভুলিয়ে বেপথে এনেছে, আমরা চললাম। হাটের পথ খুঁজে পাই কিনা কে জানে! বাঘের পেটেও যেতে পারি। আর সাঁওতালদের হাতে পড়লে? ও বাবা!

ওরা ছুট লাগাল।

দারোগা বলল, সাহেব!

রবার্ট বলল, দেখো।

দুটি সাঁওতাল বালক একটা গরু নিয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে আসছে।

সাহেব আর দারোগা ঘোড়া থেকে নামল।

—এই, এই, এই!

ওরাও থমকে দাঁড়াল।

দারোগা সাঁওতালীতে বলল, তোদের নাম কি?

—রাতা আর পাবন।

—থাকিস কোথা?

—কেন, লালপুরে?

—বটে! কোথায় থাকিস?

—ভরতবাবুর গরু চরাই।

—লালপুর ছেড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে কেন?

রাতা বলল, এই গাইটা বাবু, সকাল থেকে নিখোঁজ। ভরতবাবু তো খুব মারল আমাদের। খুঁজতে খুঁজতে পেলাম এতক্ষণে।

—তোরাই কি বাঁশি বাজাচ্ছিলি?

—না বাবু। বাঁশি এখন বাজাচ্ছি। গাইটা খুব পাজি। বাঁশি না শুনলে হাঁটবে না।

—বটে! সারাদিন তোরা এখানে?

—হ্যাঁ বাবু।

—শোন্, এ পথে সাঁওতালদের যেতে দেখেছিস?

—তাই বলো! ওরা তো কখন চলে গেল।

—কোথায় গেল?

—ওই যেদিক পানে দেবতা ঘুমাতে যাচ্ছে। আমরা ভয়ের চোটে গাছে উঠে বসেছিলাম।

—ঠিক দেখেছিস?

—হ্যাঁ বাবু। তোমরা দেখবে?

দারোগা আর সাহেব এ-ওর দিকে চাইল। হ্যাঁ, লালপুরের ভরতবাবু চেনা মানুষ বটে। সাহেব বলল, তোমরা খুব ভালো ছেলে। যদি তাদের দেখিয়ে দিতে পার, তাহলে অনেক বখশিস পাবে।

পশ্চিম দিকে চলো, চলো। তারপরই হঠাৎ খাড়া ঢাল, তারপর ঝোপজঙ্গল, আবার খাড়া ঢাল, তারপর বনকাঁঠালের জঙ্গল, তারপর নেমে গেলে শস্যক্ষেত্র, লালপুর, একটা মন্দির। পূব দিকে যখন বুরুডিহি, পশ্চিমপানেই তো যেতে হবে। মহনদাদার বাঁশি বাজাতে বাজাতে রাতা চলল, পাবন চলল। লড়াই যখন চলছে, রাতার বাবা ধুরমাল, সনা মাঝি আর মাধো টুডুর যখন প্রাণে বাঁচা খুব দরকার, তখন এমন ভয়ানক কাজ তো রাতা আর পাবনকে করতেই হবে।

—ঘোড়া থেকে নামো দারোগাবাবু। এমন আঁধারে ঘোড়া নিয়ে...উঠে যাও, ঝোপ ধরে ধরে উঠ...

সাহেব আর দারোগা উঠছে, উঠছে। এর পরেই তো ঢাল। অন্ধকার পাহাড়, অন্ধকার আকাশ, রাতা আর পাবন গাছের ডাল দিয়ে ঘোড়ার গায়ে ছপটি মেরেছিল, পাথর কুড়িয়ে দারোগা আর সাহেবকে পায়ে মেরেছিল। তারপর দুজনে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিল। ঢাল দিয়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে সাহেব ওদের বাঁশি শুনেছিল।

আর পাহাড়ের নিচ থেকে রাঙীর দড়ি ধরে টেনে একটা গাছে বেঁধে রাতা আর পাবন গাছে উঠে গিয়েছিল। রাঙীকে বাঘে খায় তো খাবে। রাতে তো ওরা ফিরতে পারবে না।

প্রথমে লালপুরের লোকরা একটা ঘোড়াকে দেখতে পায়। তারপর শকুনের ওড়াউড়ি দেখে খুঁজে পায় রবার্ট আর দারোগাকে। সেপাই আর লেঠেলরা বলে, ভূতপ্রেতের ব্যাপার। সাহেব তো কথা শুনল না।

সাঁওতালরা মেরেছে তাও তো নয়। তীরের চিহ্ন নেই। বুরুডিহি আর নাখুম, দুটো গ্রাম পরিত্যক্ত।

ব্যাপারটার ব্যাখ্যা মিলল না।

পরদিন রাঙীকে নিয়ে ফিরল রাতা আর পাবন। বলল, এখানে আর নয়। তিন পাহাড়ের ওপারে চলে যেতে হবে।

এ গুহা আর নিরাপদ নয়।

ধুরমাল, সনা আর মাধো ওদের দিকে চাইল। কি বুঝল ওরা, ওরাই জানে।

সনা বলল, তাই চলো হে। স্কুলের সময় তো অন্যরকম! ছেলেদের কথাও মানতে হবে।

তিন পাহাড়ের ওপারে। আরো পাহাড়, আরো গুহা, আরো বন। স্কুল চলছে, চলবে।

[শারদীয়া ১৩৯৬]

যমের মুখে হোমস্

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

বন্ধু ওয়াটসন বেশী বয়সে বিয়ে করে আলাদা বাড়িতে উঠে গিয়েছেন, বেকার স্ট্রীটের পুরনো বাড়ির দোতলায় এখন একা বাসিন্দা শার্লক হোমস্ই। বাড়িওয়ালী মিসেস হডসন যথাপূর্বং একতলায় বাস করছেন। সঙ্গে সঙ্গে হোমস্-এর ঘর-গেরস্তালির তদারকও করে যাচ্ছেন তিনিই।

হোমস্কে নিয়ে মিসেস হডসনের দিক্দারির অন্ত নেই। চিরদিনই তো খামখেয়ালী একগুঁয়ে মানুষ! একে তো দিনে-রাতে সব সময়েই তাঁর দোতলায় অভ্যাগতের ভিড় লেগেই আছে, তাদের মধ্যে সবাই যে ভদ্রশ্রেণীর, তাও নয়; তার উপরে নিজে হোমস্ হয়ত রাত দুপুরে শুরু করে দিলেন বেহালা বাজাতে। কিংবা সারাদিন কাটিয়ে দিলেন কোন সৃষ্টিছাড়া রাসায়নিক পরীক্ষায়, যার দরুন বাড়িময় ছড়িয়ে রইল একটা বিটকেল দুর্গন্ধ। নাঃ, ভাড়াটে হিসেবে হোমস্ যে একেবারেই অবাঞ্ছনীয়, এ-কথা কেউ অস্বীকার করবে না।

তবু মিসেস হডসন হোমস্-এর ভয়ানক অনুরক্ত। একে তো পয়সাকড়ির ব্যাপারে একেবারে মুক্তহস্ত হোমস্, তায় মাঝবয়সী এই বাড়িওয়ালীর প্রতি হোমস্-এর আচরণও একেবারে নিখুঁত শিষ্টাচার-সম্মত, রীতিমত সম্ভ্রমসূচক বললেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য, শুধু মিসেস হডসনের প্রতিই নয়, যে-কোন নারীর প্রতিই চিরদিন অতিরিক্ত ভদ্র হোমস্, ওটা তাঁর স্বভাব।

হ্যাঁ, হোমস্-এর সম্পর্কে মিসেস হডসনের অন্তরে কোন আত্মীয়াসুলভ কোমলতা যদি থাকেই, তা হলে ওয়াটসন অন্তত তাকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করতে খুব রাজী। তিনি তো বেকার স্ট্রীটের বাড়ির জীবনধারা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল!

তাই, মিসেস হডসন সেদিন যখন এসে ওয়াটসনের কাছে কেঁদে পড়লেন, "তোমার বন্ধু যে মরতে বসেছে ডাক্তার" বলে, তখন, বন্ধুর বিপদের কথা শুনে যখনই চমৎকৃত বা ব্যথিত হোন তিনি, মিসেসের ব্যাকুলতাকে আদিখ্যেতা বলে অগ্রাহ্য করতে তাঁর মন চাইল না। তিনি ব্যস্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন—"কী? কী? হয়েছে কী হোমস্-এর?"

"মরে যাচ্ছেন, অন্য আর কী হবে?"—উত্তর দিলেন মিসেস—"আজ তিন দিন ধরে একটু একটু করে সেঁধিয়ে যাচ্ছেন যমের মুখে। এখন যা দেখে এলাম, তাতে তো তাঁর আজকের দিন কাটবে কিনা, খুব সন্দেহ হচ্ছে আমার। কী গোঁয়ার মানুষ, জানেন তো! ডাক্তার ডাকতে দেবেন না কিছুতেই। সকালে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি, চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়ে আসছে, দুটো চোখ থেকে আগুন ছুটে বেরুচ্ছে যেন। আমি তখন তাঁর মুখের উপরই বললাম—আপনি যতই নিষেধ করুন, আমি আজ ডাক্তার আনবই।"

ওয়াটসন তো থ' একেবারে! ভদ্রলোক তো কিছুই শোনেননি হোমস্-এর এ-অবস্থার কথা! এক সেকেণ্ডের মধ্যে কোটটা গায়ে চাপিয়ে, টুপিটা মাথায় চড়িয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। গাড়ি চলতে শুরু করল যখন, তখন তাঁর সময় হলো জিজ্ঞাসা করার—"ব্যাপারটা হলো কী?"

"কী যে বলব, তা তো বুঝি না"—বললেন মিসেস—"রদারলাইকে একটা তদন্ত করছিলেন কিছুদিন যাবৎ। নদীর ধারে একটা গলি ওটা। সেখান থেকেই অসুখটা বাধিয়ে এসেছেন। বুধবার

বিকেল থেকে শয্যাগত, আজ তিন দিন ওঠেননি বিছানা ছেড়ে। আর এই তিন দিনে খাননি কিছুই, এক ফোঁটা জল পর্যন্ত না।"

আঁতকে উঠলেন ওয়াটসন এ কথা শুনে—"কী সর্বনাশ! তবু ডাক্তার ডাকেননি?"

"ডাকতে না দিলে কেমন করে ডাকি? কার সাধ্যি তাঁর কথা অমান্য করে? নাঃ, তাঁর আয়ু আর বেশীক্ষণ নয়। দেখলেই বুঝতে পারবেন তা।"

দেখলেন ওয়াটসন। শোচনীয় অবস্থা বাস্তবিক হোমস্-এর। নভেম্বরের কুয়াশা-ঢাকা দিন, ঘরের মধ্যে এমনিতেই অন্ধকার। তার মধ্যে ওঁর ঐ চোয়াল বার করা বিবর্ণ মুখ, ওয়াটসনের দিকে নিবদ্ধ নিষ্প্রভ দৃষ্টি দেখেই ওয়াটসনের বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল। চোখ রক্তবর্ণ, দুটো গালে লালচে আভা। দুই ঠোঁটে কালচে কালচে গুটি। কম্বলের উপরে বিশীর্ণ দুটো হাত ক্রমাগত পাক খাচ্ছে, গলাটা করছে ঘড়ঘড়। ওয়াটসনকে দেখেই যেন চোখ দুটো ঝলক দিয়ে উঠল একবার, চিনতে পেরেছেন। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—"এস ওয়াটসন! ভারি বিপদেই পড়েছি।"

ওয়াটসন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলেন বিছানার দিকে, হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে কথা কয়ে উঠলেন হোমস্। গুরুতর সংকটের ক্ষণে ছাড়া এমন স্বর তিনি গলা থেকে যে বার করেন না কখনো, তা ওয়াটসন বিলক্ষণ জানেন।

"পিছিয়ে যাও! এক্ষুণি পিছিয়ে যাও ওয়াটসন! আমার কাছে আসার চেষ্টা করলেই আমি ঘর থেকে বার করে দেব তোমায়—" বলছেন হোমস্।

"কিন্তু কেন? কেন?—আমি তো তোমাকে সাহায্য করতেই এলাম।"

"সাহায্যই করতে এসেছ যখন দূর থেকেই কর তা।"

"তবে তাই—" অগত্যা বললেন ওয়াটসন।

এইবার হাঁপাতে হাঁপাতে হোমস্ জিজ্ঞাসা করলেন—"রাগ করনি তো ভাই?"

হায় রে বেচারা! তাও কি করা যায়? তার এই শোচনীয় অবস্থায়?

"তোমার নিজের ভালোর জন্যই আমি দূরে থাকতে বলেছি তোমায়। আমি তো নিজে জানি কী আমার হয়েছে। এ ব্যারাম যেমন সংক্রামক, তেমনি প্রাণঘাতী। তবে ছোঁয়াছুঁয়ি না হলে সংক্রণের ভয় নেই।"

"আরে, তুমি বল কী, হোমস্? আমি ডাক্তার মানুষ, রাস্তার রোগীর বেলাতেও আমি সংক্রমণের ভয় করি না। আর পুরনো বন্ধুর বেলায় কিনা সেই ভয় করতে যাব? আমি তোমার কোন কথা শুনছি না। তোমায় ভালো করে পরীক্ষা করব আমি, ওষুধ দেব।"

ওয়াটসন আবারও এগুতে যাচ্ছেন বিছানার দিকে, হোমস্ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর দিকে—"ওষুধ যদি খেতেই হয়, সে-ওষুধ খাব কালভার্টন স্মিথের কাছ থেকে। বুঝেছ? ১৩ নং লোয়ার বার্ক স্ট্রীটের কালভার্টন স্মিথ! ডাক্তার না হয়েও যিনি এ রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। সুমাত্রায় তাঁর আবাদ আছে। সেখানে কুলীদের মধ্যেই হয় এ-ব্যারাম। জায়গাটা শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল, যানবাহন নেই। কাজেই ডাক্তারের সাহায্য পায় না সে-সব কুলী। তাই, তাদের চিকিৎসা করার জন্যই স্মিথ এই রোগটা সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। আর এর অব্যর্থ ওষুধ আবিষ্কার করতেও সমর্থ হন। বরাত ভাল আমার বোধ হয়, উপস্থিত সেই কালভার্টন স্মিথ লণ্ডনে আছেন।"

এতখানি কথা ঐ মরণাপন্ন রোগী কী করে বললেন?

বললেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, থেমে থেমে। কাৎরে কাৎরে। মাঝে মাঝে অসংলগ্ন উক্তিও করে করে। যেমন একবার বললেন—"তোমার পকেটে খুচরো রেজগি যদি থাকে তো তা রাখো তোমার ঘড়ির পকেটে, আর বড় মুদ্রা যা আছে, তা রেখে দাও প্যান্টের পকেটে। তাহলে ভারসাম্য বজায় থাকবে পথ চলার সময়।" আর একবার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন ঝিনুকের বংশবৃদ্ধির কথা নিয়ে—"ওদের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা এত বেশী যে একদিন দেখবে গোটা গোটা সমুদ্রগুলো ভরে গিয়েছে শুধু ঝিনুকেই।"

প্রলাপ! ওয়াটসন প্রতি মুহূর্তে বেশী বেশী হতাশ হয়ে পড়ছেন। একবার বললেন—"ছটা পর্যন্ত দেরি করব কেন? আমি এখনই গিয়ে কালভার্টন স্মিথকে নিয়ে আসি না কেন?"

"এ-সময়ে তাকে পাবে না বাড়িতে। মোটে তো বেলা চারটে এখন! ছটার আগে গিয়ে লাভ নেই। দেরি কর, সবুরে মেওয়া ফলে। তাকে যদি আনতে পার, তাহলেই আমি বাঁচব এ-যাত্রা। তা না হলে মৃত্যু অবধারিত। যেমন অবধারিত ঝিনুকে ঝিনুকে সবগুলো সমুদ্র ভরাট হয়ে যাওয়া।"

চিঁ-চিঁ গলার কথা, তার মাঝে মাঝে এই সব প্রলাপ, শোনেন আর নৈরাশ্যে মুষড়ে পড়েন ওয়াটসন। ওরই মধ্যে একবার যেন একটু তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন হোমস্। ওয়াটসন আর কী করেন, ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলেন এধার-ওধার।

ঘুরে ঘুরে একটা তাকের কাছে এসে দাঁড়ালেন ওয়াটসন। চিরদিন যেমন থাকত, এখনও এটা পরিপূর্ণ রয়েছে উনকোটি চৌষট্টি রকম প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় জিনিসে। পাইপ, তামাকের কৌটো, পুরনো বই, ভাঙা পেয়ালা, না কী?

উপরন্তু একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল ওয়াটসনের। একটা সাদা-কালো মেশানো রংয়ের ছোট কৌটো, হাতির দাঁতের বলেই মনে হয় যেন। বেশ সুদৃশ্য। কীসের কৌটো, দেখবার জন্য হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিলেন ওয়াটসন।

আর তখনই ঘরে যেন বাজ পড়ল হঠাৎ। অমন যে শয্যাগত মরণাপন্ন রোগী, সে হঠাৎ উঠে বসেছে বিছানায়। এমন চিৎকার করে উঠেছে, যেন বাঘে ধরেছে তাকে—"রাখো, রাখো, এক্ষুণি রাখো, মোটেই হাত দিও না ওতে। রাখো, রাখো—"

ওয়াটসন হকচকিয়ে গিয়েছেন একেবারে—কৌটো তো রাখলেনই যথাস্থানে, রীতিমত মর্মাহত হয়েছেন তিনি। হোমস্-এর এ কী রকম অভদ্র ব্যবহার? কৌটোটা কী খেয়ে ফেলতেন ওয়াটসন?

পরক্ষণেই হোমস্ বিছানায় নেতিয়ে পড়েছেন আবার। বুকটা তাঁর এই আকস্মিক উত্তেজনা আর পরিশ্রমের দরুন উঠছে পড়ছে ঠিক হাপরের মত। ওয়াটসন আর কী করেন, এক কোণে একটা চেয়ারে বসে মুহুর্মুহু কেবল তাকাতে লাগলেন ঘড়ির দিকে। উঃ, কী কষ্টদায়ক প্রতীক্ষা! পুরো দু' ঘণ্টা!

অবশেষে ছটা হলো। চোখ বুজেই ছিলেন হোমস্। বোজা চোখেই কি ঘড়ি দেখেছেন নাকি? আধবসা অবস্থায় উঁচু হয়ে কাৎরে কাৎরে হোমস্ বলছেন ওয়াটসনকে—"আনাই চাই কালভার্টন স্মিথকে। তার আসা-না-আসার উপরেই নির্ভর করছে আমার জীবন বা মরণ। আনাই চাই। ঠিক যে অবস্থায় দেখে যাচ্ছ আমায়, সেটা বুঝিয়ে বলবে তাকে। তোমায় খুলেই বলি, ভদ্রলোকের সঙ্গে সদ্ভাব তেমন নেই আমার। আসতে হয়ত চাইবেনই না। তবু, যেমন করে হোক, তাকে আনাই চাই।"

ওয়াটসন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সুরে বললেন—"আমি তাকে চ্যাংদোলা করেও গাড়িতে তুলব দরকার হলে।"

"কিন্তু তার সঙ্গে তুমি এসো না। তার আগে তোমার আসা চাই। চাই-ই আগে আসা। অন্তত পাঁচ মিনিট আগে আসা চাই। একসঙ্গে এলে চলবে না। চলবে না। এ-কথা মনে রেখো—"

"তাই হবে, যে-কোন ফিকিরে আগেই আসব আমি"—এই বলে ওয়াটসন বেরিয়ে পড়লেন।

পথে নামতেই সাদা পোশাকের পুলিস একজন এসে দাঁড়াল ওয়াটসনের সমুখে। চিনলেন ওয়াটসন, এ হলো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইনস্পেক্টর মর্টন। সে এসেই চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল—"কেমন আছেন মিস্টার হোমস্?"

ওয়াটসনের কেমন যেন মনে হলো, মর্টনের চোখের কোণে হাসির ঝিলিক একটা। কিন্তু তক্ষুণি মনকে শাসিয়ে দিলেন তিনি—তাও কি হতে পারে কখনো? শার্লক হোমস্-এর মারাত্মক ব্যাধির খবরে উল্লসিত হবে এমন কোন পুলিস কর্মচারী এদেশে আছে বলে তিনি কল্পনাই করতে পারেন না। তিনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন—"খুবই খারাপ—"

মর্টনের চোখের ঝিলিকটা কি আরও উজ্জ্বল হলো না কি? যাকগে, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় এখন নয় ওয়াটসনের। একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল সমুখে। তিনি রওনা হলেন লোয়ার বার্ক স্ট্রীটের উদ্দেশে। মর্টন তখন হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা দূরেই চলে গিয়েছে। যাকগে, ওদের তো রোঁদ দেওয়াই কাজ।

তের নম্বর লোয়ার বার্ক স্ট্রীটে ওয়াটসনের কার্ড নিল এক বাটলার। তারপরেই পাশের ঘর থেকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠের তর্জন শোনা গেল—"কে এ? ডাক্তার ওয়াটসন! কে এই ওয়াটসন? চিনি না আমি। হাঁকিয়ে দাও।"

বাটলারটি ইংলণ্ডেরই বাটলার, সুমাত্রার নয়। সে জানে সভ্য সমাজের রীতিনীতি। মৃদুকণ্ঠে কী যেন বোঝাতে লাগল মনিবকে। তার ফলে কালভার্টন স্মিথ একটুখানি নরম করলেন কথার সুর—"তাহলে কাল সকালে আসতে বল। এখন আমার সময় নেই, দেখছ না, কী রকম ব্যস্ত আমি?"

ওয়াটসন বাইরে থেকে সবই শুনছেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন, মনিবের এ-কথার উপরে বাটলার আর সাহস পাবে না অন্য কথা কইতে। অথচ বাটলারের মুখ থেকে স্মিথের অস্বীকৃতি একবার যদি তাঁর কানে পৌঁছায়, তাহলে আর দ্বিতীয় বার অনুরোধের কোন সুযোগই থাকবে না তাঁর। ওদিকে শার্লক হোমস্ মৃত্যুশয্যায়।

চোখের পলকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে ওয়াটসনের। বাটলার বেরুচ্ছে ও-ঘর থেকে, তাকে পাশে ঠেলে দিয়ে ওয়াটসন ঢুকে পড়লেন ঘরে।

অমনি টেবিলের পাশে উপবিষ্ট লোকটা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। সে কী হিংস্র চেহারা লোকটার! "এর মানে কী? মানে কী এর? আমি কি বলে পাঠাইনি যে এখন কারও সঙ্গে দেখা করার সময় নেই আমার?"

ও তড়পাক, ওয়াটসন ততক্ষণ সমুখের লোকটাকে ভালো করে দেখে নিচ্ছেন। অদ্ভুত চেহারা ওর। মাথাটা পেল্লায় বড়, চোখ দুটো প্রায় গোল। মাথার আন্দাজে দেহটা খুবই ছোট, পিঠ কুঁজো। ছেলেবেলায় রিকেটস রোগে ভুগেছিল বলে সন্দেহ হলো ডাক্তারের।

কিন্তু যা হোক একটা উত্তর দিতে হয়ই ওর তড়পানির। ওয়াটসন অত্যন্ত বিনীত সুরে বললেন—"দোহাই মিস্টার স্মিথ, কথাটা শুনুন। জীবন-মরণের ব্যাপার না হলে আমি এভাবে আপনার ঘরে কখনো ঢুকে পড়তাম না। মিস্টার শার্লক হোমস্ মরণাপন্ন। তিনিই বলেছেন—আপনি ছাড়া অন্য কেউই পারবে না তাঁর জীবন রক্ষা করতে। একবারটি চলুন দয়া করে। যেতেই হবে আপনাকে। মানবতার খাতিরেই যেতে হবে।"

লোকটা ওদিকে হঠাৎই শান্ত হয়ে গিয়েছে। "কী বললেন? শার্লক হোমস্? মরণাপন্ন? খু-উ-ব দুঃখেরই বিষয় তো! হয়েছে কী?"

ওয়াটসন বললেন—"কী যেন মারাত্মক সংক্রামক রোগ। পূর্ব এশিয়ার রোগ নাকি এটা। নদীর ধারে চীনে পাড়ায় কী যেন তদন্ত করছিলেন কিছুদিন, সেইখান থেকেই বাধিয়ে এসেছেন রোগ।"

কালভার্টন স্মিথ হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু ঘোরাবার আগেই ওয়াটসন দেখে ফেলেছেন, একটা কুটিল হাসি সে-মুখে। মুহূর্তমধ্যেই সে অবশ্য আবার চোখোচোখি তাকিয়েছে ওয়াটসনের দিকে—"খুব দুঃখিত হলাম মিস্টার হোমস্-এর অসুখের কথা শুনে। আমার সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই। তবে ডিটেকটিভ হিসাবে তিনি যে অদ্ভুতকর্মা তা আমি শুনেছি। শ্রদ্ধা করি তাঁর ক্ষমতার জন্যে। আমিও আমার নিজের লাইনে একটু নাম-টাম করেছি মশাই। ঐসব রোগজীবাণু নিয়ে আমিও গোয়েন্দাগিরি কম করিনি। ঐ যে বোতলে বোতলে সব জীবাণু দেখছেন, ওর প্রত্যেকটা দূর প্রাচ্যের মারাত্মক মারাত্মক রোগের বাহক। আমি ওদের এনে কয়েদখানায় পুরেছি, যেমন হোমস্ পুরে থাকেন চোর ডাকাত সমাজবিরোধীদের। তা কী বলছেন? মরতে বসেছেন? একা আমিই পারি তাঁর জীবন রক্ষা করতে, এ-কথা তিনিই বলেছেন? তা হলে তো যেতেই হয় একবার। বাঁচাতে পারি বা না-পারি, যেতেই হয় একবার। আপনি একটু বসুন, আমি আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।"

ওয়াটসন যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। কিন্তু হোমস্-এর উপদেশ তিনি ভোলেননি। তাঁকে যেতে হবে স্মিথের আগে। তিনি কাজেই বললেন—"অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু আপনি অনুমতি করলে আমি অন্য একটা কাজ সেরে যেতে চাই মাঝপথে। একুশ নং বেকার স্ট্রীট। ঠিকানা আপনি জানেন বোধহয়?"

"জানি, জানি, আপনি অনায়াসে চলে যেতে পারেন। একা একা যেতে কোনই অসুবিধা হবে না আমার"—বলল কালভার্টন স্মিথ।

ওয়াটসন বেকার স্ট্রীটের বাড়িতে ঢুকলেন ভয়ে ভয়ে। না জানি ইতিমধ্যে সর্বনাশই হয়ে গিয়েছে কি না।

যাক, তা হয়নি। বরং হোমস্-এর অবস্থা এখন যেন কতকটা ভাল। চেহারাটা তেমনি মরা মানুষের মতই রয়েছে বটে, কিন্তু প্রলাপ আর বকছেন না। কণ্ঠস্বর তেমনিই ক্ষীণ এখনো, কিন্তু তাতে জড়তা বা অস্পষ্টতা নেই। জিজ্ঞাসা করলেন—"কী? দেখা হলো?"

"হয়েছে, আসছেন।"

"চমৎকার, ওয়াটসন! বাহবা! দূত হিসাবে অতুলনীয় তুমি।"

"আমার সঙ্গেই আসতে চাইছিলেন—"

"তা হলেই মাটি হত। কী হয়েছে আমার জিজ্ঞাসা করেনি?"

"করেছিলেন। নদীর ধারের চীনে পাড়ার কথা বললাম—"

"ঠিকই বলেছ। এখন তা হলে, তোমার যা করার, তা তো তুমি করেইছ, এইবার তোমার অন্তর্ধানের সময় এসেছে।"

"না, না,"—ওয়াটসন রেগে উঠলেন—"তোমাকে দেখে উনি কী বলেন, তা না শুনেই চলে যাব নাকি?"

"আরে, তাই কি আমি বলেছি নাকি? চলে তুমি নিশ্চয়ই যাবে না। থাকবে তুমি নিশ্চয়ই। কিন্তু থাকতে হবে অন্তর্হিত, অদৃশ্য অবস্থায়। এই যে, আমার খাটের আড়ালে ঠিক ততটুকু জায়গাই আছে, তোমার লুকোবার জন্য যতটুকু দরকার।"

"আরে, বল কী হোমস্?"

"উপায় নেই তা ছাড়া। লুকোবার অন্য জায়গা নেই এ-ঘরে। কিন্তু ঐখানে, ওয়াটসন, ঐ খাটের মাথার দিকে—"

আধশোয়া অবস্থায় কথা কইছিলেন, হঠাৎ সোজা হয়ে শক্ত হয়ে উঠে বসলেন। বিবর্ণ মুখ, কিন্তু চোখের দৃষ্টি একাগ্র। "ঐ যে, গাড়ীর শব্দ! ওয়াটসন! ওয়াটসন! চট করে, চট করে লুকিয়ে পড়। নইলে সব মাটি হবে। লুকিয়ে পড়। নড়বে না। ঘটনা যা কিছু ঘটুক, নড়বে না, রা কাড়বে না। বুঝতে পেরেছ তো? যা ইচ্ছে ঘটুক, তোমার নট নড়ন-চড়ন। কেবল দুই কান সজাগ রেখে শুনে যাবে, গিলবে ওর সব কথা।"

তারপর, ওয়াটসন লুকিয়ে পড়ার আগেই রোগী আবার সটান চিৎ বিছানায়। হাত-পা ছুঁড়ছে এদিকে-ওদিকে, মুখে বিড়বিড় প্রলাপ।

তারপর, খাটের আড়াল থেকেই ওয়াটসন শুনতে পাচ্ছেন সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে, কেউ একজন দরজা খুলল, দরজা বন্ধ করল আবার। তারপর সব চুপ। বেশ কিছুক্ষণ সব চুপ। ঘরের ভিতর একমাত্র শব্দ, রোগীর ভারী ভারী নিশ্বাস আর হিক্কার। স্মিথ বোধহয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোগীকেই দেখছে। অবশেষে এক সময় ভঙ্গ হলো সেই নীরবতা। "হোমস্"—বেশ জোর গলায় ডাকল স্মিথ।

সাড়া দেয় না রোগী। স্মিথ আরও চেঁচিয়ে ডাকল আবার—"হোমস্! ওহে হোমস্! শুনতে পাচ্ছ না আমার কথা?" খাটটা নড়ছে। অর্থাৎ, স্মিথ রোগীর কাঁধ ধরে জোরে জোরে নাড়া দিচ্ছে।

প্রায় ফিসফিস করে কথা কইলেন এবার হোমস্—"মিস্টার স্মিথ নাকি? আমি আশা করিনি যে আপনি আসবেন।"

স্মিথ হাসল—"আশা করার মত কাজ তুমি কিছু করনি। তবে এলাম যে, সে শুধু এই বিশ্বাসে যে শত্রুকে যন্ত্রণা দেওয়ার প্রকৃষ্ট পথ হচ্ছে তাকে দয়া করা।"

"আপনি উদার, আপনি মহৎ"—বলছেন রোগী ক্ষীণকণ্ঠে—"এ ব্যারামের একমাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যে আপনি, তা আমি মানি।"

"মানো? রক্ষে যে সারা লণ্ডনে আর কেউ মানে না, জানেও না এর কথা। কী যে হয়েছে তোমার? সেটা পেরেছ বুঝতে তাহলে?"

"সেই একই ব্যারাম—সেই একই সব লক্ষণ—"

"তা আশ্চর্য কী? হতে তো পারেই। আর হয় যদি তা, তোমার বরাতে কষ্ট আছে। বেচারা ভিক্টর—সে মারা গেল চার দিনের দিন। অথচ কী তাজা সুস্থ সমর্থ ছেলে সে ছিল! তুমিই না বলেছিলে যে লণ্ডনের বুকে বসে ছেলেটা যে দূর প্রাচ্যের একটা অজানা ব্যারামে আক্রান্ত হলো, যে-ব্যারামের আমিই আবার একমাত্র বিশেষজ্ঞ—এটা খুবই আশ্চর্য? তা কোন কোন কাকতালীয় ব্যাপার এমন চমকপ্রদও হয় মাঝে মাঝে। খুবই যে চমকপ্রদ, তা কিন্তু লক্ষ্য করেছিলে একা তুমিই! তা, লক্ষ্য করেছিলে, তাতে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এটা তোমার বলা উচিত হয়নি যে আমি বিশেষজ্ঞ বলেই ঐ ব্যাধিটাই ধরল আমার ভাইপো ভিক্টরকে।"

"আমি তো ধরে ফেলেছিলাম যে ওটা আপনারই কাজ—"

"ধরেছিলে? এ্যাঁ, তাই বুঝি? ধরেছিলে? যা হোক, প্রমাণ তো আর করতে পারনি! কিন্তু সে-কথা থাকুক। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করি—এই সেদিন তুমি বলে বেড়ালে যে, ভিক্টরের হত্যাকারী আমিই, আর আজ তুমি সেই আমারই কাছে কাৎরাচ্ছ 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে, এটা তোমার কী রকম আচরণ হচ্ছে, এ্যাঁ?"

রোগীর কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতেও, কাৎরাচ্ছে, "জল, জল" বলে।

"তা জল দিচ্ছি"—বলছে স্মিথ। "এক্ষুণি তো মরবে তুমি। তার আগে দুই-একটা কথা তোমাকে শোনাতে চাই বলেই দিচ্ছি এটুকু জল। কী বলছি, বুঝতে পারছ তো?"

হোমস্ কাৎরাচ্ছেন—"যা হয়ে গিয়েছে, তা ভুলে যান। দয়া করে বাঁচান আমাকে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ভিক্টরের মৃত্যুর সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলাম, তা একদম ভুলে যাব। শুধু আমায় বাঁচিয়ে দিন আপনি।"

"ভুলে যাবে? কী ভুলে যাবে?"

"ঐ যে! ঐ ভিক্টর স্যাভেজের মৃত্যুটা। আপনি তো বলতে গেলে স্বীকারই করলেন এক্ষুণি যে আপনিই ঘটিয়েছিলেন সেটা। তা আমি সেটা ভুলেই যাব।"

"ভুলে যাও বা না-যাও, সাক্ষী দেবার জন্য কাঠগড়ায় আর তুমি উঠতে পারছ না। তোমার জন্য তৈরি হবে আর এক ধরনের বাক্স, কফিন হে, কফিন। চীনে লস্করদের পাড়াতেই ব্যারামটা বাধিয়েছ, এই তো তোমার বিশ্বাস? যে-লোকটা আমাকে ডাকতে গিয়েছিল, সে যেন এমনি কথাই বলছিল!"

হোমস্ বলছেন—"তা ছাড়া অন্য কী কারণে হতে পারে, তা তো আমার মাথায় আসছে না—"

"মাথা তোমার সাফ, তা স্বীকার করি"—উত্তর দিচ্ছে স্মিথ—"কিন্তু তার চেয়েও সাফ মাথা কারও কারও আছে হে! ভালো করে ভেবে দেখ, অন্য কোন কারণে ওটা ঘটে থাকতে পারে কিনা, চিন্তা করে দেখ—"

"চিন্তা করতে পারছি না যে! মাথা বলে কিছু নেই আর। বাঁচান!"

"বাঁচানোর কথা থাকুক, আমি শুধু এইটি করব যে মরার আগে মৃত্যুর আসল কারণটা তুমি জানতে পারবে।"

"এই যন্ত্রণাটা—উঃ—এইটি অন্তত কমিয়ে দিন—"

"খুব যন্ত্রণা, এ্যাঁ? তা সুমাত্রায় কুলীদের ছটফট করতে দেখেছি অবশ্য যন্ত্রণায়। তা যন্ত্রণা যতই হোক, আমার কথা তো শুনতেও পাচ্ছ, বুঝতেও পারছ। বলি, ব্যারামের লক্ষণগুলো প্রকাশ পাওয়ার আগে কি কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল তোমাকে কেন্দ্র করে? যেমন, ধর, একটা কৌটো, হাতির দাঁতের ছোট বাক্স একটা। পেয়েছিলে তুমি? এই ধর, গত বুধবারে? তুমি সেটা খুললে—মনে পড়ছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি খুলেছিলাম। ভিতরে একটা কাঁটা ছিল। হাতে লেগে রক্ত বেরুলো। এই যে, এই টেবিলেই রয়েছে সেটা।"

"এই তো! আমার জিনিস, আমিই পকেটে করে নিয়ে যাচ্ছি। এক কুটো প্রমাণও আর রইল না যে তোমার মৃত্যু আমিই ঘটিয়েছি। তোমাকে যমের মুখে ঠেলে না দিয়ে উপায় ছিল না আমার। কারণ তুমিই একমাত্র লোক, যে জানতে পেরেছিল ভিক্টর স্যাভেজের মৃত্যুর হেতু। তা, তোমারও সময় হয়ে এল। আমি আছি এখন, তোমার মরণটা চোখে না দেখে যাচ্ছি না।"

শার্লক হোমস্ কী যেন বলছেন। কিন্তু সে একেবারে ফিস-ফিস কথা। ওয়াটসন তা বুঝতে পারছেন না। কিন্তু খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে স্মিথ, সে বোধ হয় পেল শুনতে। বলে উঠল—"কী বলছ? গ্যাস বাড়িয়ে দেব? চোখের সামনে আঁধার ঘনিয়ে আসছে, নয়? হ্যাঁ, দিচ্ছি গ্যাস বাড়িয়ে। তোমার মৃত্যুযন্ত্রণা ভালো করে দেখতে চাই, উপভোগ করতে চাই।"

স্মিথ ওদিককার দেয়াল পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে গ্যাসটা বাড়িয়ে দিল। ঘরটা হেসে উঠল আলোতে। "আর কিছু উপকার তোমার করতে পারি বন্ধু?" বলছে স্মিথ।

"হ্যাঁ। চুরুটগুলো কোথায়, দাও তো!"

আড়ালে লুকিয়ে ওয়াটসন আর একটু হলে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতেন। এই শেষের কথা কয়টি তো হোমস্-এর স্বাভাবিক গলার! একটু দুর্বল হলেও, রোগশীর্ণ কণ্ঠের পরিচয় এতে নেই।

খানিক আবার গভীর নীরবতা ঘরের ভিতর। কালভার্টন স্মিথ গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে শত্রুর পানে। তারপর সে শুকনো গলায় বলে উঠল—"এটা আবার কী হলো, এ্যাঁ?"

হোমস্ বলছেন—"ভাল অভিনয় করতে হলে নিজে সেই চরিত্রের মধ্যে মিশে যেতে হয়। সত্যি বলছি, আমি তিনদিন উপবাসী। ঐ যে তুমি জল দিলে, তিন দিনের মধ্যে ঐ জলটুকু গিয়েছে আমার পেটে। তা, না খাওয়ার জন্য তেমন কষ্ট হয় না আমার। কষ্ট হয় তামাক না পেলে। এই যে পেয়েছি চুরুট। আর ঐ যে! বন্ধুদের পায়ের শব্দও ঐ শোনা যায়।"

সত্যিই পায়ের শব্দ বাইরে। দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন ইনস্পেক্টর মর্টন। হোমস্ বললেন—"সব ঠিক হ্যায়! এই তোমার সেই লোক হে মর্টন!"

মর্টন বললেন—"আমি তোমাকে গ্রেফতার করছি, জনৈক ভিক্টর স্যাভেজের হত্যার অপরাধে।"

হোমস্ হেসে বললেন—"ওর সঙ্গে যোগ করতে পার, জনৈক শার্লক হোমস্‌কে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধেও। ওর পকেটে একটা হাতির দাঁতের কৌটো আছে, বার করে নাও। আমাকে হত্যা করার জন্যই ওটা ডাকে পাঠিয়েছিল। ভাগ্যে আমি পার্শেল-টার্শেল হঠাৎ খুলি না! পার্শেলের ভিতর বোমা থাকে আজকাল, বিষ থাকে, বিষাক্ত স্প্রিং থাকে, না থাকে কী? দেখ, কৌটোটার গায়ে একটা দাঁত বেরিয়ে আছে, সাপের বিষদাঁতের মতই। ওটা যার গায়ে ফুটবে, তাকে আর দেখতে হবে না।"

স্মিথকে ততক্ষণে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে পুলিস। সে দাঁতে দাঁত ঘষে শাসাচ্ছে—"এর জন্যে তুমিই পস্তাবে হোমস্! আমি কী বলেছি আর না বলেছি, সাক্ষী কোথায় তোমার? তুমি বলবে আমি স্বীকার করেছি, আমি বলব আমি করিনি। এদিকে আমার কথা, ওদিকে তোমার কথা। অন্য সাক্ষী যখন নেই—"

স্মিথের কথায় বাধা দিয়ে হোমস্ চেঁচিয়ে উঠলেন—"ঐ যাঃ! ভাই ওয়াটসন। বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস! তোমার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। মর্টন, তুমি ভাই আসামী নিয়ে এগোও। আমি আর ওয়াটসন পিছনে আসছি। আগে সিমসনের হোটেলে একবার যাব। তিন দিন খাইনি।"

[শারদীয়া ১৩৯১]

সোনার চেয়ে দামী

সঙ্কর্ষণ রায়

কানাডার লন্ডন শহর। তবে গ্রেট ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনের মতো অত বড় নয়। খুবই ছোট শহর। তার বিশ্ববিদ্যালয়টি কিন্তু বেশ বিখ্যাত। নাম ওয়েস্ট অন্টেরিও বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে রিসার্চ করছে কলকাতার ভূতাত্ত্বিক শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কি নিয়ে সে রিসার্চ করছে এই প্রশ্নের জবাবে শ্যামাদাস বলে, 'সার্চের পর সার্চ, এই হলো রিসার্চ।'

'সার্চের পর সার্চ! কি সার্চ করছ শুনি?'

'রকমারি ধাতু। পাথরের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তামা, সীসা, দস্তা, নিকেল, কোবাল্ট, সোনা, প্লাটিনাম.......'

অধ্যাপক হাচিনসন-এর তত্ত্বাবধানে শ্যামাদাস তার রিসার্চ চালিয়ে যাচ্ছিল। একদিন অধ্যাপক ছাত্রকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। শ্যামাদাস গিয়ে দেখে একটি বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে সেখানে উপস্থিত। শ্যামাদাসকে দেখে হাচিনসন বললেন, 'আপাতত রিসার্চ রেখে সার্চের কাজে লেগে যাও। আমার বন্ধু গ্রেগরি একটা পরিত্যক্ত খনির মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছে, তাকে খুঁজে বের করে উদ্ধার করতে হবে।'

'কোথায় কিসের পরিত্যক্ত খনি?' শ্যামাদাসের অবাক প্রশ্ন।

'তা তো জানি না।' হ্যাচিনসনের উত্তর, 'তবে মোটামুটি অবস্থানটি বলতে পারি। টিমিনস থেকে বেশি দূর নয়। টিমিনস কোথায় জান তো? উত্তর মেরু অঞ্চলে, হাডসন সাগরের ধারে একটি ছোট্ট শহর।'

হাচিনসন-এর কাছ থেকে শ্যামাদাস যা জানতে পারে তা হলো গ্রেগরি পারমারের একটি করাত কল আছে টিমিনসে। জায়গাটার কাছাকাছি ওয়ালনাট, স্প্রুস, অ্যাশ প্রভৃতি গাছের বন। বনবিভাগের নিয়ন্ত্রণে কিছু কিছু গাছ কাটা হয় সেখানে। সেই সব গাছ থেকে তক্তা তৈরি করা হয় গ্রেগরির করাত-কলে। কিন্তু কাঠের কারবারে গ্রেগরির মন ভরে না। তাঁকে পেয়ে বসেছে খনিজ খোঁজার নেশায়। কুকুর জ্যাকিকে নিয়ে তিনি অনুসন্ধান করে বেড়ান। টিমিনসের চারপাশে ঘাসে ছাওয়া তুন্দ্রাভূমি। তার মধ্যে জায়গায় জায়গায় পাইন, ওয়ালনাট প্রভৃতি গাছের সমাবেশ। টিমিনস থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে ম্যাকইন্টায়ার নামে ছোট আর একটি শহর আছে। এই দুটি শহরের মাঝখানে একটি ঘন বন। কিছুদিন আগে টিমিনসের আর একজন কাঠের কারবারী হারবার্ট হার্ভে গ্রেগরিকে এই বনের মধ্যে একটি ভালুককে অনুসরণ করে ঢুকতে দেখেছিলেন। সঙ্গে ছিল নিত্যসঙ্গী জ্যাকি। কিন্তু খনিজ খুঁজতে খুঁজতে গ্রেগরি হঠাৎ ভালুকের পিছু ধরলেন কেন এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি হারবার্ট।

হাচিনসন চুপ করতে মেয়েটি বলে ওঠে, 'ভালুককে তো সবাই ভয় পায়, বাবা কোন সাহসে তার পিছু নিয়েছিলেন ভেবে পাই না।'

হাচিনসন বললেন, 'আমার মনে হয়, তোমার বাবা ভালুকটির পেছনে পেছনে তার আস্তানায়

পৌঁছতে চেয়েছিলেন। ভালুকরা কোথায় থাকে জানো তো? গুহা কিংবা গহ্বর বা গর্তে। হয়তো একটি খনি ছিল ঐ ভালুকটির আস্তানা। কিন্তু বনের মধ্যে কোথাও কোনো খনি খুঁজে পাইনি আমি, ভালুকের আস্তানারও হদিস পাইনি.....'

'আপনি যার হদিস পাননি, তাকে আমি খুঁজে বের করব কি করে!' শ্যামাদাস মুখ কাঁচুমাচু করে বললে।

'চেষ্টা করতে হবে। আমি সার্চ করে পাইনি, তোমাকে রি-সার্চ করে খুঁজে বের করতে হবে।' বলতে বলতে মৃদুমন্দ হাসতে থাকেন হাচিনসন।

'গ্রেগরি পারমার যে একটি খনির মধ্যে আটক হয়ে আছেন তা জানা গেল কি করে?'

'গ্রেগরির কুকুরটি ঐ খনি থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার গলার বকলসে চিরকুট বাঁধা ছিল। তাতে লেখা গ্রেগরি পারমার একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। নিচে কোনো স্বাক্ষর নেই, কাজেই চিরকুটটি কার লেখা বোঝা যাচ্ছে না।'

'গ্রেগরি পারমারের নিজের লেখা হতে পারে।'

'না, চিরকুটটি গ্রেগরির লেখা নয়, তার হাতের লেখার সঙ্গে চিরকুটটির লেখার কোনো মিলই নেই। আমার মনে হচ্ছে কেউ হয়তো খনির সুড়ঙ্গের মধ্যে গ্রেগরিকে ঢুকতে দেখেছিল। ধস নেমে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাক্ষীও সে। সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ হয়ে গেলেও কোনো একটি ফাটল বা গর্তের ফাঁক দিয়ে জ্যাকি বেরিয়ে এসেছিল। জ্যাকি বেরিয়ে আসতেই সে একটা চিরকুট লিখে তার গলার বকলসের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছিল। জ্যাকি সোজা চলে এসেছে গ্রেগরির বাড়ি। তার গলার বকলস থেকে কাগজটা বের করে পড়ামাত্র গ্রেগরির স্ত্রী জেনেট মেয়ে জেনকে প্লেনে করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। জেনেট চায় অবিলম্বে আমি জেনের সঙ্গে টিমিনস গিয়ে গ্রেগরিকে খুঁজে বের করে তাকে উদ্ধার করি। কিন্তু আমি তো এখন য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষা নিয়ে খুব ব্যস্ত, কাজেই জেনের সঙ্গে তুমিই যাও শ্যাম। জেন, এই হলো আমার ভারতীয় ছাত্র শ্যামাদাস ব্যানার্জী। নামটা ওর ওজনে ভারী, কাজেই কাটছাঁট করে ওকে শ্যাম বা স্যাম বলে ডাকতে পার......'

'স্যাম নয়, শ্যাম!' শ্যামাদাস গম্ভীর মুখে বললে।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ শ্যাম।' মৃদু হেসে হাচিনসন বললেন, 'স্যামুয়েলের স্যাম নয়, শ্যামাদাসের শ্যাম। শ্যাম কার নাম জান তো জেন? শ্রীকৃষ্ণের নাম......'

'হরে কৃষ্ণ হরে রাম।' গুনগুনিয়ে ওঠে জেন, 'আমিও তো ঐ দলে......'

'তা হলে আর কি!' হাচিনসনের মুখে-চোখে চাপা হাসি ফুটে ওঠে। 'বেরিয়ে পড় দুজনে একসঙ্গে। শোন শ্যাম, ঐ অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রাসায়নিক মানচিত্র তো আছে তোমার কাছে, টিমিনসের চারপাশে ভূতাত্ত্বিক পরিক্রমাও গত বছর করেছিলে তুমি......'

'তা করেছিলাম।' শ্যামাদাস বললে। 'কিন্তু টিমিনস ও ম্যাকইন্টায়ারের মাঝখানে বা মিনিসের কাছাকাছি আর কোথাও কোনো পরিত্যক্ত খনি দেখিনি। কোনো খনির সম্ভাবনা ও অঞ্চলে আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য এমন হতে পারে যে ভালুকের তৈরি করা কোনো সুড়ঙ্গের ভেতরে মিস্টার পারমার ঢুকে পড়েছিলেন......'

'তার মানে বাবা ভালুকের পাল্লায় পড়েছেন!' জেন কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে।

'না না, গ্রেগরি ভালুকের পাল্লায় পড়বে কেন!' হাচিনসন সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে জেনের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আত্মরক্ষার জন্য তার সঙ্গে পিস্তল ছাড়া অটোমেটিক ছোট মেশিনগান আছে না! জল্পনা-কল্পনাতে সময় নষ্ট না করে তোমরা বেরিয়ে পড় এখনই। যে প্লেনে জেন এসেছে, সেই প্লেনে করে ঘণ্টাখেনেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

খনি-সুড়ঙ্গের হদিস

প্লেনটা আসলে সী-প্লেন। ওয়েস্ট অন্টেরিও য়ুনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের কাছে একটি হ্রদের মধ্যে

ভাসছিল। ছোট্ট প্লেনটি যেন বড় আকারের ডানা-মেলা পাখি। ডাঙা থেকে একটু তফাতে ছিল বলে মোটর বোটে করে তাতে চাপল জেন ও শ্যামাদাস। চালকের আসনে বসেছিল জেনের বয়সী একটি মেয়ে, জেনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে, 'খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এলে, লুল পাখিদের সঙ্গে আমার আলাপ তো শেষই হলো না......'

'লুল পাখিদের সঙ্গে আলাপ!' শ্যামাদাস অবাক হয়ে তাকাল মেয়েটির মুখের দিকে।

'লুল হলো সুমেরু অঞ্চলের হাঁস।' মেয়েটি বললে। 'তাদের একটি ঝাঁক আছে এই লেকে। আমার প্লেনটিকে ঘিরে কিচিরমিচির করেছে এতক্ষণ, শার্সি ঠুকরে ঠুকরে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে।'

'খুব মজাদার পাখি এই লুল।' জেন বললে। 'নির্দিষ্ট পথ ধরে যায় সুমেরু বৃত্তের দিকে, আবার একই পথ ধরে শীতকালে দক্ষিণে আসে। ওদের যাতায়াতের আকাশপথের ঠিক নিচেই রয়েছে ডাঙার জন্তু-জানোয়ার, অর্থাৎ মেরু-ভালুক, ক্যারিবু ও মুজদের যাতায়াতের রাস্তা।'

প্লেনে স্টার্ট দিতে দিতে বিমানচালিকা বললে, 'এই একই পথ ধরে আমি প্লেন চালাবো, কারণ টিমিনস এই পথের ওপরেই অবস্থিত।'

আকাশে উঠে নিচের দিকে তাকিয়ে শ্যামাদাস যেন একটি মানচিত্র দেখতে পেল। দিগন্তবিস্তৃত তুন্দ্রাভূমিকে মনে হচ্ছে সবুজ ঘাসের সমুদ্র। তার মধ্যে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দ্বীপের মতো জেগে আছে ওয়ালনাট-স্প্রুস প্রভৃতি গাছের বন। টিমিনসের আগে ম্যাকইন্টায়ার। এখান থেকে একটানা বন টিমিনসের দিকে প্রসারিত হয়েছে। বনের গাছপালাগুলোর সবুজ রঙ ঘন সন্নিবেশের জন্য কালো দেখাচ্ছে। যেন ম্যাকইন্টায়ার থেকে একটি কালো দাগ টানা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। নিবিড় কালিমা এক জায়গায় ফিকে হয়ে গিয়েছে। বনের ওই বিশেষ অংশ থেকে গাছপালা সব উধাও হয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু এই অঞ্চলে কোনো খনির খবর নেই, কোথাও খননযোগ্য খনিজের সমাহরণ ঘটেছে বলে মনে হয় না। হাচিনসন যে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রটি দিয়েছেন তার মধ্যে একটানা গ্রানাইট ছাড়া আর কিছুই নেই।

টিমিনস শহরটি হাডসন উপসাগরের ধারে গড়ে উঠেছে। শহরের বন্দরের কাছে প্লেনটিকে সমুদ্রের জলে নামানো হলো। তারপর মোটর বোটে করে জেন শ্যামাদাসকে নিয়ে তাদের বাড়িতে পৌঁছল। সমুদ্রের ধারে সুদৃশ্য বাগানঘেরা বাড়ি। গেট খুলে বাগানের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে জেন বললে, 'আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে মায়ের আগে জ্যাকি ছুটে আসবে। দেখো, কি সুন্দর কুকুরটা!'

কিন্তু জ্যাকি এল না। জেন বললে, 'বাবার জন্য ওর মন খুব খারাপ বলেই বোধ হয় আসেনি। জানো শ্যাম, গলার বকলসে বাঁধা চিরকুটটি নিয়ে জ্যাকি একটানা ছুটতে ছুটতে এসেছিল। বাবাকে এত ভালবাসে যে পথে কোথাও দাঁড়ায়নি।'

'কি করে বুঝলে?' শ্যামাদাস প্রশ্ন করে।

'ও যেরকম হাঁপাচ্ছিল তার থেকে বুঝলাম। অন্ততপক্ষে বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার দৌড়েছে ও।'

'বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার! এখান থেকে জায়গাটির দূরত্বের আভাস মোটামুটি পাওয়া যাচ্ছে। ম্যাপটা বের করি......'

'জ্যাকিকে নিয়ে চলে যাও, সে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় জ্যাকি?'

বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন জেনের মা জেনেট, তাঁর মুখে-চোখে চাপা কান্নার আভাস। অবরুদ্ধ স্বরে তিনি বললেন, 'জ্যাকি নেই; তুই চলে যেতেই সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, পশু-হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই সে মারা যায়। পোস্টমর্টেম করার কথা আছে.......'

'জ্যাকি নেই!' কান্নায় ভেঙে পড়ে জেন।

'কাঁদিস না জেন।' জেনেট কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জ্যাকিকে বিষ খাওয়ানো

হয়েছিল। যে তোর বাবাকে খনি-সুড়ঙ্গের মধ্যে বন্দী করেছে, সে-ই জ্যাকির গলার বকলসের সঙ্গে চিরকুট বেঁধে বিষ খাইয়েছে। তোর বাবা যে খনি-সুড়ঙ্গের মধ্যে বন্দী হয়েছেন তা আমাদের জানালেও সে চায় না যে আমরা তাঁকে উদ্ধার করি।'

'সে না চাইলেও আমরা তাঁকে উদ্ধার করবই।' শ্যামাদাস বললে।

'জ্যাকি তো নেই,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে জেন বললে, 'কে আমাদের ঐ খনির কাছে নিয়ে যাবে?'

'জ্যাকি বেঁচে না থাকলেও তার মৃতদেহটা আছে। এখনই পশু-হাসপাতালে গিয়ে দেহটি পরীক্ষা করব।'

'জ্যাকির মৃতদেহ পরীক্ষা করে লাভ কি শ্যাম? মৃতদেহ কি খনি-সুড়ঙ্গের অবস্থানের হদিস দেবে?'

'তা দিতে পারে। মৃতদেহ পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে কি বিষ খাওয়ানো হয়েছিল জ্যাকিকে। বিষটা শনাক্ত করতে পারলে বিষ খাওয়ানোর সময়টা বোঝা যাবে। বিষের বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন বিশেষ একটি বিষ প্রয়োগের ক'ঘণ্টা বাদে মৃত্যু ঘটতে পারে। বিষ-প্রয়োগের কত ঘণ্টা বাদে জ্যাকির মৃত্যু হয়েছিল নির্ণয় করতে পারলে জ্যাকি বিষ খাওয়ার পর কত কিলোমিটার এসেছে তা বোঝা যাবে। এমনি করে মোটামুটি বোঝা যেতে পারে এখান থেকে কোথায় কতদূরে জ্যাকিকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল।'

'তুমি কি বিষ-বিশেষজ্ঞ?'

'না,' শ্যামাদাস জবাব দিল। 'বিষের ব্যাপারে বিশেষভাবে অজ্ঞ আমি। তবে পশু-হাসপাতালেই বিশেষজ্ঞ পাওয়া যাবে। তাঁর সাহায্য নিতে চাই। জ্যাকির মৃতদেহ তো ওখানেই আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' জেনেট জবাব দিলেন। 'ওখানে যাবার আগে খেয়ে নাও, খাবার তৈরি আছে।'

'অবশ্যই খেয়ে নেব।' শ্যামাদাস বললে, 'কারণ হাংগ্রি সোলজার ক্যান নট মার্চ।'

পশু-হাসপাতালে গিয়ে জেন ও শ্যামাদাস দেখল হাসপাতালের অধিকর্তা খুবই বিচলিত। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি জানালেন, 'আশ্চর্য একটি দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে, যার দরুন জ্যাকির ডেড বডির পোস্টমর্টেম সম্ভব হয়নি।'

অবাক হয়ে অধিকর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জেন বললে, 'ডেড বডি আপনাদের কাছে থাকলেও পোস্টমর্টেম সম্ভব হলো না! কেন ডেড বডিটা ভ্যানিশ করে গেল নাকি!'

'প্রায় সেরকমই ব্যাপার। জ্যাকিকে মৃত অবস্থায় এখানে আনা হয়েছিল। ঘণ্টা কয়েক বাদে ডেড বডিটাকে যখন পোস্টমর্টেমের ঘরের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন হঠাৎ একটি ছোটখাটো বিস্ফোরণ ঘটল ডেড বডির মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রেচার-বেয়ারারা স্ট্রেচারসুদ্ধ ডেড বডিটা মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। বিস্ফোরণের ফলে, আগুন জ্বলে উঠেছিল এবং সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছিল বডিটা। বোধহয় কেউ সময়-নিয়ন্ত্রিত বোমা (টাইম বম্ব) ঢুকিয়ে দিয়েছিল ডেড বডির মধ্যে। এখন বুঝতে পারছেন তো পোস্টমর্টেম করা কেন সম্ভব হয়নি।'

'ডেড বডি তো পুড়ে ছাই হয়েছিল, সেই ছাইয়ের পোস্টমর্টেম করতে পারতেন।' শ্যামাদাস বললে।

'ছাই একটি পাত্রের মধ্যে রাখা আছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে কোনও সময়ে করা যেতে পারে।' অধিকর্তা বললেন।

'কে করেছে এই কাজ?' জেন উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করে। 'মানে জ্যাকির শরীরের মধ্যে কে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ঐ বোমা?'

'জ্যাকিকে যে বিষ খাইয়েছিল, তারই কীর্তি বলে মনে হচ্ছে।' শ্যামাদাস জবাব দিল। 'শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে ঠিক দেয়নি, কারণ জ্যাকি তখন বেঁচে। শরীরের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল। ঘন লোমের আড়ালে ফেবিকল জাতীয় আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছিল বলে আন্দাজ করছি।'

'কই জ্যাকির শরীরে তেমন কিছু তো আমাদের নজরে আসেনি!'

'ক্ষুদে টাইম-বম্ব নজরে না আসা অসম্ভব কিছু নয়। তা ছাড়া জ্যাকি তোমাদের বাড়িতে পৌছতেই এমনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে তার শরীরে কোথায় কি লাগানো আছে তা দেখার চেষ্টাই হয়তো করতে পারনি। এখন বোঝার চেষ্টা কর, কে বা কারা এই সব কাজ করেছে, তাদের উদ্দেশ্য কি। তোমার বাবাকে তারা যে খনি-সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকে রেখেছে তা তোমাদের জানিয়ে দিলেও তারা চায় না যে তাঁকে তোমরা উদ্ধার কর। যেখানে তিনি আছেন, যে জায়গাটির হদিসও যাতে তোমরা না পাও তার জন্য জ্যাকিকে মেরে ফেলা শুধু নয়, তার শরীরটাকেও নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে।'

'বাবাকে উদ্ধার করার কোনো চেষ্টাই তা হলে করতে পারব না আমরা!' ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল জেন। 'খনি-সুড়ঙ্গের হদিস পাওয়ার কোনো আশা নেই......'

'চেষ্টা অবশ্যই করব', শ্যামাদাস বললে। 'কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।'

যেখানে দেখিবে ছাই

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জেন বললে, 'আমি ভেবে পাচ্ছি না কি করে পাওয়া যাবে খনি-সুড়ঙ্গের হদিস। জ্যাকির ছাই ছাড়া কিছুই তো নেই!'

শ্যামাদাস বললে, 'ছাইয়ের সাহায্যেই হদিস পাবার চেষ্টা করব। বাংলায় আর একটি প্রবাদের দিকে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি ঃ যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন.....'

পশু-চিকিৎসালয়ের রসায়নাগারে ছাইটিকে পরীক্ষা করে শ্যামাদাস।

কুকুরের মৃতদেহের ছাইয়ের সঙ্গে কাঠ বা কয়লা পুড়িয়ে তৈরি হওয়া ছাইয়ের কোনো তফাৎ নেই। মানুষের মৃতদেহ পুড়িয়েও একই রকম ছাই পাওয়া যায়। অর্থাৎ দাহ্য যে কোনো জৈব-বস্তুর ভস্মাবশেষ একই ধরনের হতে বাধ্য। কিন্তু তবু কিছু পার্থক্য দেখা যেতে পারে, যদি বাইরের থেকে কোনো অজৈব বস্তু বা ধাতুর সংমিশ্রণ ঘটে। এক্ষেত্রে শ্যামাদাস আশা করে, গ্রেগরি যে খনির মধ্যে আটকা পড়েছেন তার ধুলোবালি বা পাথরের কুচি জ্যাকির গায়ের লোমে লেগেছিল এবং জ্যাকির মৃতদেহ পুড়ে ছাই হতে ছাইয়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। খনির ধুলোবালি বা পাথরের কুচির মধ্যে কোনো ধাতু থাকলে তা ছাইয়ের স্বাভাবিক ধাতুর পরিমাণকে বাড়িয়ে দেবে। অতএব ছাইয়ের সঙ্গে মিশে থাকা ধাতুগুলোকে কোনো এক জোরালো অ্যাসিড দিয়ে গালিয়ে অ্যাসিডে গলে যাওয়া ধাতুগুলোর পরিমাণ নির্ণয় করা দরকার।

অ্যাসিডের মধ্যে সবচেয়ে জোরালো অ্যাসিড হলো অ্যাকুয়া রেজিয়া (aqua regia), যা নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে তৈরি করা হয়। একটি পাত্রের মধ্যে অ্যাকুয়া রেজিয়া রেখে তাতে জ্যাকির ছাইয়ের সবটা ঢেলে দিল শ্যামাদাস। তারপর পাত্রটিকে বার্নারে রেখে গরম করার পালা।

গরম অ্যাকুয়া রেজিয়ার মধ্যে ছাইয়ের প্রচ্ছন্ন যাবতীয় ধাতুর গলে যাওয়ার কথা। এরপর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে অ্যাকুয়া রেজিয়া কর্তৃক আহরিত ধাতুগুলির পরিমাণ নির্ণয় করার চেষ্টা চলে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ করতে করতে একে একে লোহা, তামা, সীসা, দস্তা প্রভৃতি ধাতু শনাক্ত করে শ্যামাদাস! কিন্তু সেগুলি পরিমাণে খুবই নগণ্য। জীবদেহে যতটা থাকা উচিত, তার চেয়ে বেশি নয়। খনির ধুলোমাটি বা পাথর হয়তো তাদের উৎস নয়। রীতিমতো হতাশ হতে চলেছে শ্যামাদাস, এমন সময় সে শনাক্ত করল বিশেষ একটি ধাতু, জীবদেহে যার পরিমাণ সাধারণত শূন্য হয়ে থাকে। কিন্তু জ্যাকির ছাইয়ের মধ্যে রীতিমতো তার সমাহরণ দেখা যাচ্ছে।

ধাতুটি হলো আর্সেনিক। জীবদেহে তার অস্তিত্ব নেই, অতএব শ্যামাদাস ধরে নেয় যে তা খনির ধুলোবালি বা পাথরের কণা থেকে আহরিত হয়েছে।

রাসায়নিক সমীক্ষায় জেন শ্যামাদাসকে সাহায্য করছিল, সে বললে, 'জ্যাকিকে যে বিষ দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে আর্সেনিক ছিল না তো?'

শ্যামাদাস কিছু বলার আগে পশু-চিকিৎসালয়ের অধিকর্তা বললেন, 'আর্সেনিকযুক্ত বিষের ক্রিয়া খুব ধীরে হয়ে থাকে। দেহের নানারকম ক্ষতি ঘটলেও মৃত্যু হতে সময় লাগে। বিষপ্রয়োগের পর যেহেতু ঘণ্টা চার-পাঁচের মধ্যে জ্যাকির মৃত্যু হয়েছিল, এই বিষ আর যাই হোক আর্সেনিক নয়।'

অতএব জ্যাকির শরীরের সঙ্গে মিশে থেকে যা ছাইয়ের মধ্যে অক্ষত ও অবিকৃত অবস্থায় বিরাজ করছে, সেই আর্সেনিক খনির আর্সেনিক।

খনির পাথরের চূর্ণ বা ধুলোবালি থেকে জ্যাকি আসেনিক ছাড়া আর কিছু আহরণ করেনি, এর থেকে কি এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে এই খনি আর্সেনিকের খনি?

না। কারণ আর্সেনিকের কোনো ভাণ্ডার এই অঞ্চলে নেই। আর্সেনিকের খনি এ অঞ্চলের কোথাও থাকা সম্ভব নয়। অতএব এই খনি অন্য কোনো ধাতুর খনি, আর্সেনিক যার সঙ্গে সহাবস্থান করছে।

শ্যামাদাসের হঠাৎ আর্সেনিকের সঙ্গে সোনার সহাবস্থানের কথা মনে পড়ল। উত্তর কানাডায় দুটো সোনার খনি দেখেছে সে। দুটি খনিতেই সোনার সঙ্গে আর্সেনিক আছে। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি আর্সেনিক থাকলে সোনাও থাকে। সোনাকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু আর্সেনিক স্বয়ংপ্রকাশ। উত্তর কানাডার স্বর্ণক্ষেত্রে আর্সেনিক দেখলেই বুঝতে হবে যে সোনা নিকটেই আছে।

আর্সেনিকের কাছাকাছি ও পাশাপাশি সোনা থাকলেও ধুলোমাটি বা পাথরকুচির সঙ্গে তা জ্যাকির শরীরের রোমশ চামড়ায় এসে লাগল না কেন এই প্রশ্ন উঠতে পারে।

এই প্রশ্নের উত্তর টেলিফোনে অধ্যাপক হাচিনসনের কাছ থেকে পাওয়া গেল। তিনি বললেন, 'রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে সোনাকে শনাক্ত করা সহজ নয়। সোনাকে শনাক্ত করতে না পারলেও তার অদৃশ্য উপস্থিতিকে মেনে নেওয়া উচিত, কারণ আর্সেনিক তার অস্তিত্বের নির্দেশ দিচ্ছে।'

গ্রেগরি যেখানে খনি-সুড়ঙ্গের মধ্যে বন্দী হয়ে আছেন, সেই জায়গাটিতে আর্সেনিকের প্রাচুর্যের সম্ভাবনা। প্রফেসার বললেন, 'ম্যাকইন্টায়ার ও টিমিনসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আর্সেনিকের মানচিত্র তৈরি করে ফেল। অর্থাৎ দুশো মিটার অন্তর অন্তর মাটি বা পাথরের নমুনা তুলে অ্যানালিসিস করে আর্সেনিকের পরিমাণ নির্ণয় করে মানচিত্রে বসাও। এমনি করে আর্সেনিকের সমাহরণযুক্ত অঞ্চলটিকে চিহ্নিত করে জায়গাটিকে খুঁজে বের কর। আমার ধারণা সেখানেই রয়েছে খনিটা।'

'এতে অনেক দেরি হয়ে যাবে,' শ্যামাদাস বললে, 'নমুনা তোলা, অ্যানালিসিস, খোঁজাখুঁজি.....'

'হদিস না মিললে কোথায় খুঁজবে?' হাসিনসন প্রশ্ন করলেন।

কোথায় খুঁজবে ভাবতে গিয়ে হঠাৎ শ্যামাদাসের লুলদের আসা-যাওয়ার পথ ধরে সেদিনের আকাশপথে পাড়ি দেওয়ার কথা মনে পড়ে গেল। ম্যাকইন্টায়ার পেরিয়ে যাওয়ার পর একটানা তৃণভূমির মধ্যে একটা ব্যতিক্রম দেখেছিল সে।

হলুদ ফুল

টেলিফোনে প্রফেসার হাচিনসনের সঙ্গে আবার আলাপ।

শ্যামাদাস বললে, 'একটানা ঘাসে ছাওয়া তুন্দ্রাভূমির মধ্যে একটি তৃণহীন জমি দেখেছিলাম জেনের সঙ্গে তার বান্ধবীর প্লেনে চেপে আসতে আসতে। আর্সেনিকের প্রভাবে হয়তো ঘাস ও গাছপালা মরে গিয়েছে।'

'এমনও গাছপালা আছে আর্সেনিক যাদের মারতে পারে না,' হাচিনসন বললেন। 'ঘাস এবং স্থানীয় গাছপালা মরে গেলেও তারা হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বেঁচে থাকে। আর্সেনিক ওদের কাছে বিষ নয় অমৃত। উজ্জ্বল হলুদ তাদের ফুলের রং। কিন্তু আকাশ থেকে যাদের দেখেছ, ডাঙার ওপর দিয়ে তাদের কাছে পৌঁছবে কি করে?'

'আকাশপথে লুল পাখিদের যাতায়াতের পথ ধরে ম্যাকইন্টায়ারের দিকে গেলেই ও জায়গাটি দেখতে পাব। জেনের বান্ধবীকে অনুরোধ করলে ও-পথে হয়তো সে নিয়ে যাবে আমাকে।'

'উপযুক্ত দক্ষিণা দিলে অবশ্যই নিয়ে যাবে। কিন্তু ওখানে সী-প্লেনটাকে নামাতে সে কি রাজী হবে! ম্যাকইন্টায়ার থেকে টিমিনসের মাঝামাঝি অঞ্চলে পর পর কয়েকটি হ্রদ আছে, ঐ জায়গাটির কাছাকাছি কোনো একটি হ্রদে যদি সী-প্লেনটাকে নামানো যায়, ওখানে পৌঁছে যেতে পারবে তুমি। জেনকে বল এ ব্যাপারে তার বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ করার জন্য।'

জেনের বান্ধবীর নাম আইরিন। আইরিন বললে, 'বন-বিভাগের নির্দেশে চোরাশিকারীদের ওপরে নজর রাখার জন্য ও-পথে প্রায়ই যাতায়াত করি। ওয়েস্ট অন্টেরিও য়ুনির্ভার্সিটির ক্যাম্পাস থেকে আসার সময় তোমাদের বলেছিলাম না, লুলদের আসা-যাওয়ার আকাশপথের নিচেই রয়েছে বন্যপ্রাণীদের যাতায়াতের রাস্তা। এই রাস্তার দু'পাশে বন ও ঘাসবনের মধ্যে লুকিয়ে থেকে চোরাশিকারীরা মুজ ও ক্যারিবু শিকার করার চেষ্টা করে। আকাশপথে তাদের খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয় না। খুঁজে পেলেই বেতারবার্তা পাঠিয়ে দিই নিচে বনবিভাগের ঘাঁটিতে। ইচ্ছে করলে তোমরা দু'জনে আমার এই পরিক্রমার সঙ্গী হতে পার। কিন্তু আমি ভেবে পাই না আমার সঙ্গে সী-প্লেনে ঘোরাঘুরি করতে করতে কি করে তোমরা গ্রেগরি আংকলকে খুঁজে বের করতে পারবে?'

'ঘোরাঘুরি করতে করতে বিশেষ একটি জায়গায় নামতে চাই আমরা,' শ্যামাদাস বললে। 'তার কাছাকাছি কোথাও মিস্টার গ্রেগরি বন্দী অবস্থায় রয়েছেন বলে আমাদের ধারণা।'

'আমার প্লেনটি একটি সী-প্লেন,' শ্যামাদাসের মুখের ওপরে তীব্র দৃষ্টি হেনে আইরিন বললে। 'তোমরা যেখানে বলবে সেখানেই তো এটাকে নামানো যাবে না......'

'আমরা যেখানে বলব সেখানকার কাছাকাছি কোনো একটি লেকে নামানো যেতে পারে,' শ্যামাদাস বললে। 'সেখান থেকে যথাস্থানে চলে যাব আমরা।'

আইরিনের মুখের পানে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে অবরুদ্ধ স্বরে জেন বললে, 'হ্যাঁরে আইরিন, তুই তো আমার বাবাকে তোর নিজের বাবার চেয়ে কম ভালোবাসিস না.....'

'আমার নিজের বাবার চেয়েও বেশি ভালোবাসি,' জেনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আইরিন বললে। 'বাবার কাজ-কারবারে আগাগোড়া তিনি আর্থিক সাহায্য করে এসেছেন। বাবার মৃত্যুর পর থেকে তিনি আমার বাবার জায়গা নিয়েছেন। মনে রাখিস জেন, তাঁকে উদ্ধার করার জন্য আমি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি।'

'প্রাণ দিতে পারিস তো শ্যামের নির্দেশ মতো প্লেন নামাতে চাইছিস না কেন?'

'প্রাণ দিতে চাইলেও আমার সী-প্লেনকে তো ডাঙায় নামাতে পারব না।'

'কানাডার সুমেরু অঞ্চলে লেকের তো অভাব নেই,' শ্যামাদাস বললে। 'ম্যাকইন্টায়ার ও টিমিনসের মাঝখানে অন্তত পক্ষে ছ'টা লেক আছে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' আইরিন বললে। 'জায়গাটি দেখিয়ে দিও, কাছাকাছি লেক আমিই খুঁজে বের করব।'

লুলরা সবসময় যাতায়াত করে না, শ্যামাদাস ও জেনকে নিয়ে তার সী-প্লেনে করে যখন আকাশে উঠল আইরিন, তখন আকাশে একটা লুলও ছিল না! তথাপি লুলদের যাতায়াতের আকাশপথটিকে সে চিনে নেয়। আকাশপথের ঠিক নিচে মুজ ও ক্যারিবুদের পায়ে পায়ে তৈরি স্থলপথটিকে মিলিয়ে নিয়ে বোঝে যে বিপথে নয়, ঠিক পথেই চলেছে।

একটানা তুন্দ্রাভূমি যেন সবুজ সমুদ্র, তার মধ্যে দ্বীপের মতো জেগে আছে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি বনভূমি। গাছপালা ও ঘাসের নিরবচ্ছিন্ন বিস্তারের মধ্যে আকস্মিক ব্যতিক্রম উঁচু মালভূমির মতো একটি ডাঙা। এখানে ঘাস নেই, নেই স্থানীয় ওয়ালনাট, বালসম, সেডার, পাইন, আছে শুধু ছোট আকারের কয়েক রকম গাছ। এই গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে লাল রঙের মাটি উঁকিঝুঁকি মারছে।

'আইরিন!' উত্তেজিত স্বরে ডাকল শ্যামাদাস।

'বল।' শান্তভাবে সাড়া দিল আইরিন।

'এই সেই জায়গাটি!'

'তুমি মনে কর এখানে কোথাও গ্রেগরি আংকলকে বন্দী করে রাখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। এখানে খনি-সুড়ঙ্গের মধ্যে, মিস্টার গ্রেগরি আটকা পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে।'

'তোমার মনে হচ্ছে মানে তোমার অনুমান! আমি কিন্তু এখানে কোনো খনি আছে বলে শুনিনি। একদা এখানে একটি গ্রাম ছিল, গ্রাম ছেড়ে লোকেরা চলে গিয়েছে। আর একটা কথা, মুজ ও ক্যারিবুরা এই অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে কখনো যাতায়াত করে না, এর পাশ কাটিয়ে যায়। এখানে নামতে কোনো অসুবিধে নেই, কারণ ছোটখাটো একটা লেক এই অঞ্চলে আছে। তবে সাবধান, লেকের জল বিষাক্ত......'

'আর্সেনিক!' শ্যামাদাস রুদ্ধশ্বাসে বললে।

'আর্সেনিক আছে কি না জানি না', আইরিন বললে। 'শুধু জানি জলে-স্থলে সর্বত্র বিষ আছে। এমনি একটি বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যে গ্রেগরি আংকল আটকে পড়েছেন জেনে খুবই ব্যথিত বোধ করছি। তাঁকে তাড়াতাড়ি এখান থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা কর তোমরা......'

প্লেনটিকে নামিয়ে আনল আইরিন। ছোট একটি হ্রদের জলে ডানা-মেলা পাখির মতো ভাসতে থাকে সী-প্লেনটি। হ্রদের পরিষ্কার স্বচ্ছ জল দেখে বোঝার উপায় নেই যে তা বিষাক্ত! রবারের ডিঙি ছিল প্লেনের মধ্যে, তাতে চেপে বসে শ্যামাদাস, আইরিন ও জেন। ওপর থেকে দেখা গাছপালাগুলোকে হ্রদের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখে তারা। উত্তর দিকে এক জায়গায় জড়াজড়ি করে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে তারা। শ্যামাদাসের অনুরোধে আইরিন ডিঙিটাকে ওদিকে নিয়ে যায়।

ডিঙি থেকে ডাঙায় নেমে গাছপালাগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় শ্যামাদাস। বিশেষ একটি গাছে অজস্র ফুল ফুটেছে। রং তার উজ্জ্বল হলুদ। টেলিফোনে হাচিনসন এই গাছের কথাই বলেছিলেন। এর ফুলের রং সাধারণত সাদা হয়ে থাকে। এই উজ্জ্বল হলুদ রঙের সৃষ্টি নাকি আর্সেনিকের সংমিশ্রণের দরুনই ঘটেছে। মাটিতে আর্সেনিকের প্রাচুর্য আছে বলে ফুলের রং বদলেছে। পাথর ক্ষয় হয়ে মাটির সৃষ্টি, কাজেই মাটির তলায় বিরাজ করছে আর্সেনিকের সমাহরণযুক্ত পাথর। ভূ-রসায়নবিদরা বলেন, আর্সেনিককে অনুসরণ করে সোনার নাগাল পাওয়া যায়। এখানে হয়তো নিকটেই রয়েছে সেই খনি যেখানে ধস নামার দরুন গ্রেগরি সুড়ঙ্গের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েছেন।

সামনে পাহাড়। ঐ পাহাড়ের তলাতেই হয়তো খনি-সুড়ঙ্গের মুখটা রয়েছে। শ্যামাদাস বললে, 'চল ঐ পাহাড়ের দিকে......'

এগিয়ে চলে তারা পাহাড়ের দিকে। হঠাৎ পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে এক পাল ভালুক, তারা ঘিরে ফেলে তাদের তিনজনকে।

ভালুকের আস্তানা

ভালুকদের বেষ্টনীর মধ্যে থরথরিয়ে কাঁপে তিনজনেই।

'রক্ষা নেই।' ফিসফিসিয়ে বললে আইরিন। 'পিষে মেরে ফেলবে আমাদের তিনজনকেই।'

'পকেটে আমার পিস্তল আছে।' শ্যামাদাস চাপা গলায় বললে। 'করব নাকি গুলি?'

'না না!' সমস্বরে বলে উঠল আইরিন ও জেন।

'ও কি বলছ তোমরা? ওরা আমাদের পিষে মারবে, আর আমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে পারব না?'

'আত্মরক্ষার চেষ্টা কর,' আইরিন বললে, 'কিন্তু গুলি করে একটা ভালুকও মারতে পারবে না। এ দেশের আইনে বন্যপ্রাণী মারা নিষেধ।'

'বন্যপ্রাণী যদি আমাকে মারে?' কাঁদো কাঁদো হয়ে প্রশ্ন করে শ্যামাদাস।

'মারলে মরবে, যেমন এখন মরতে চলেছ......'

ঘিরে থাকা ভালুকের দল আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে তাদের দিকে। তিনজনেই নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য.......

এমন সময় একটি পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়ে। সে তার দু'হাত তুলে তালি দিতেই পালিয়ে গেল ভালুকের দল। তারপর আইরিনের মুখের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বলল, 'তোমার কাজ আকাশ থেকে নজর রাখা, এখানে তোমার প্লেনটা নামালে কেন?'

'আমার বন্ধুর বাবা এখানে একটা খনি-সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকা পড়েছেন,' আইরিন জবাব দিল। 'তাঁকে উদ্ধার করতে এসেছি। এই যে আমার বন্ধু জেন, তার পাশে তার বন্ধু শ্যাম......'

'শ্যামকে আমি চিনি,' মুচকি হেসে মেয়েটি বললে। 'শ্যাম, তুমি আমাকে চিনতে পারছ তো?'

'নিশ্চয়ই,' শ্যামাদাস জবাব দিল। 'বন্যপ্রাণীদের রক্ষক মেরী স্মিথ......'

'তোমাদের মতো ভক্ষকদের খপ্পর থেকে বন্যপ্রাণীদের বাঁচাতে গিয়ে আমার দম বেরিয়ে যাচ্ছে। এখানে কি মতলব নিয়ে এসেছ শুনি? মনে রেখ, কোনোরকম খনিটনি করা চলবে না!'

'খনি-সুড়ঙ্গ থেকে গ্রেগরি পারমারকে উদ্ধার করতে চাই, খনির পুনরুদ্ধারে কোনো আগ্রহ নেই আমার......'

'তোমার না থাকলেও মিস্টার গ্রেগরি পারমারের আছে। একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে সোনার খোঁজে খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে আটকা পড়ে গিয়েছেন। তাঁকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে এই সব সুড়ঙ্গ এককালে খনি-সুরঙ্গ হলেও এখন ভালুকের আস্তানা, ওসব জায়গায় ঢুকে খোঁজাখুঁজি বা খোঁড়াখুঁড়ি করাটা খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু আমার কথা তিনি কানেও তোলেননি।'

'ভালুকের পাল্লায় পড়ে গিয়েছেন বুঝি?' কেঁপে ওঠে জেনের গলার স্বর। 'বেঁচে আছেন তো?'

'অবশ্যই বেঁচে আছেন,' মেরী বললে। 'তিনি একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে খোঁড়াখুঁড়ি করতেই ধস নেমে ঢোকার পথটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওখানে যে ভালুক দুটি থাকত তারাই পারছে না ওখানে ঢুকতে।'

'যাক ভালুকের পাল্লায় তিনি পড়েননি, বা পড়বেন না।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জেন। 'কিন্তু ওঁর খাওয়া-দাওয়া চলছে কি করে?'

'ঠিকমতোই চলছে। ধস নেমে ঢোকার পথ বন্ধ করে দিলেও কিছু গর্ত রয়ে গিয়েছে। সেই সব গর্তের মধ্যে দিয়ে খাবার ও জল ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এই গর্তগুলোর একটির মধ্যে দিয়ে তাঁর কুকুরটা বেরিয়ে এসেছিল....'

'আমাদের জ্যাকিকে তুমি বিষ খাওয়ালে কেন মেরী?' কান্না-কাঁপানো কণ্ঠে জেন বললে। 'সে তো কোনো অন্যায় করেনি।'

'ও কি বলছ তুমি জেন!' তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল মেরী। 'জ্যাকিকে আমি বিষ খাইয়েছি! পশু-পাখিদের বাঁচিয়ে রাখা আমার জীবনের ব্রত, জ্যাকির মতো নিষ্পাপ সুন্দর একটি কুকুরকে আমি বিষ খাইয়ে মারব এমন বিশ্রী সন্দেহ তোমার মনে এল কি করে?'

'তুমি নয়তো কে ওকে বিষ খাওয়াবে? টিমিনসে আমাদের বাড়িতে ফিরে আসার কয়েক ঘণ্টা বাদেই বিষক্রিয়ায় ওর মৃত্যু হলো। বিষ খাওয়ানো শুধু নয়, একটা টাইম-বম্বও লাগিয়ে দিয়েছিলে ওর শরীরে.....' বলতে বলতে আটকে আসে জেনের গলার স্বর।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মেরী বললে, 'আমার মনে হচ্ছে এ কাজ তোমার বাবা করেছেন। যে সুড়ঙ্গের মধ্যে তিনি আটকা পড়েছিলেন, সেখানে পাথরের সঙ্গে গাঁথা বড় একটি সোনার নাগেট আছে। তিনি চাননি তার খবর আর কেউ পায়। ধস নামার পর জ্যাকি বন্ধ সুড়ঙ্গের মধ্য থেকে

বেরিয়ে আসার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত যখন তাকে আটকে রাখতে পারলেন না, তখনই তাকে তিনি বিষ খাইয়ে তার শরীরের সঙ্গে টাইম-বম্ব লাগিয়ে দিয়েছিলেন।'

'এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না মেরী। জ্যাকি তো সোনা চেনে না, সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে সোনার খবর আর কারুর কাছে পৌঁছিয়ে দেবে একি কখনো সম্ভব!' বলতে বলতে জেনের গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

'সোনার খবর না দিক, খনি-সুড়ঙ্গের খবর দিতে পারত। মানে তোমাদের নিয়ে আসতে পারত খনি-সুড়ঙ্গের কাছে। তোমার বাবা চাননি তোমরা তাঁকে খনি-সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার কর। তিনি একা ঐ সোনা ভোগ করতে চেয়েছিলেন, তাই জ্যাকিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চেয়েছিলেন.....'

'জ্যাকির বকলসের সঙ্গে চিরকুট ছিল, তাতে বাবা যে খনি-সুড়ঙ্গের মধ্যে বন্দী হয়ে আছেন সে কথা লেখা ছিল।'

'ওটা আমারই লেখা। আমি ভেবেছিলাম ঐ লেখা পড়ে জ্যাকির সঙ্গে চলে আসবে তোমরা। জ্যাকির সঙ্গে নয়, নিজেরাই এলে শেষ পর্যন্ত। কি করে এলে তা পরে বুঝিয়ে দিও। আপাতত মিস্টার গ্রেগরিকে উদ্ধার করার কাজে আমার বন্ধুকে সাহায্য করতে শুরু কর। আমার বন্ধু তার বন্ধুদের সাহায্যে ধসের পাথরগুলো বের করে এনে সুড়ঙ্গ-পথটিকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। এই যে আমার বন্ধু.......'

এগিয়ে এল প্রবীর গুহ। সে শ্যামাদাসেরও বন্ধু, উত্তর মেরু অঞ্চলে এক্সপ্লোরেশান করতে গিয়ে দুজনে বেশ কিছুদিন একসঙ্গে কাজ করেছিল। শ্যামাদাস তার হাতে হাত রেখে বললে, 'চল, তোমাকে আমি সাহায্য করি।'

'না ভাই, তোমার সাহায্য আমি চাই না,' প্রবীর বললে। 'যারা আমাকে সাহায্য করছে, তারা তোমাকে সইতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'কেন পারবে না,' শ্যামাদাস রেগে উঠল। 'আমি কি খারাপ লোক?'

'না না, তুমি খারাপ লোক হবে কেন! কিন্তু তারা তো লোক নয়, মেরু অঞ্চলের ভালুক। তাদের সঙ্গে আমার অবশ্য ভাব হয়ে গিয়েছে, আশা করি আস্তে আস্তে তারা তোমাদেরও বন্ধু বলে মেনে নেবে। কিন্তু আপাতত তাদের কাছাকাছি তোমাদের না যাওয়াই ভালো। জান শ্যাম, তারা ধসে পড়া পাথরগুলো সব একটা একটা করে বের করে নিয়ে এসেছে! তার সঙ্গে কি এনেছে জান! তাল তাল সোনা। একসঙ্গে এত সোনা আগে কখনো চোখে দেখিনি। সুড়ঙ্গ ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসছে, একটু বাদেই বেরিয়ে আসবেন মিস্টার গ্রেগরি পারমার....'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খনি-সুড়ঙ্গের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন গ্রেগরি। জেনকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সোনার নেশা আমার ছুটে গিয়েছে, সোনা আমার চাই না। পর-পর ক'দিন খনি-সুড়ঙ্গের ভেতরে বন্দী থাকার পর বুঝতে পারছি যে সোনার চেয়েও আরো দামী পৃথিবীর মুক্ত আলো-বাতাস.....'

'সোনাও কম দামী নয়,' প্রবীর বললে। 'আমার বন্ধুদের সাহায্যে তাদের উদ্ধার করব আমি। সোনা বের করে এনে আমার বন্ধুরা তাদের আস্তানাটিকে আরও বেশি বাসযোগ্য করে তুলবে।'

'সোনার জন্য আমি আর একটুও মাথা ঘামাব না,' গ্রেগরি আবেগকম্পিত স্বরে বললেন। 'জ্যাকিকে আমি মেরেছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি মেরীকে তার কাজে সাহায্য করে করব। আমাকে তোমার কাজে লাগিয়ে নাও মেরী।'

[ভাদ্র ১৪০৬]

নেইকো খুনীর মাফ
জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

হাজরা মোড়। শরৎ বসু রোড বা ল্যান্সডাউন রোডের দিকে এগিয়ে যেতে বাঁ ধারে পড়বে এক পার্শী ডাক্তারের সুদৃশ্য চেম্বার ও ডিস্পেনসারী। রাস্তাটা বনেদী। যানবাহন থাকলেও হই-হল্লা চাঞ্চল্য কিছুটা কম।

এ তল্লাটে এই পার্শী ডাক্তারবাবুর পশার খুব। নাম-ডাকও ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। শুধুমাত্র পেশাগত দক্ষতাই তার একমাত্র কারণ নয়। কলকাতায়, বিশেষ করে এই এলাকায় অভিজ্ঞ গুণসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ বাঙালী ডাক্তারের অভাব নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও অতি অল্পদিনের মধ্যে, মাত্র বছর তিনেকেই ডাক্তার রুস্তমজী যে এত হাতযশ অর্জন করেছেন, তাঁর মূলে তাঁর সদাশয় শ্মশ্রুমণ্ডিত প্রশান্ত মুখ, অমায়িক হাসি ও সদয় ব্যবহার সবার সঙ্গে। গরিবদের কাছ থেকে তিনি কোন ফী তো নেনেই না, উলটে ওষুধ-পথ্যের দাম, রাহা খরচও বের করে দেন পকেট থেকে অম্লান বদনে। ফী-র ব্যাপারে কখনো মুখ ফুটে কিছু চান না, কে কি দিচ্ছে ফিরেও দেখেন না। এক মনে ব্রত উদ্‌যাপনের মত রোগীর চিকিৎসা ও পরিচর্যা চালিয়ে যান। সাহায্যকারিণী সুদর্শনা বাঙালী নার্স বা অ্যাটেনড্যান্ট মিস রায়ের সঙ্গে তাঁর মধুর ব্যবহার। নিজের ছোট বোন কিংবা মেয়ের মত স্নেহ করেন তাকে। এমনিতে রসিক সদালাপী হলেও কাজের সময় দরকারী ছাড়া একটি কথা নয় কারো সঙ্গে। বেজায় কাজপাগল লোক। হাতুড়ে ডাক্তার যে নয় সেটা বলাই বাহুল্য। নেম-প্লেটে তাঁর নামের পাশে এবং প্রেসক্রিপশানে বেশ কয়েকটা নামী-দামী বিলিতী ডিগ্রি।

দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ। পেশল বলিষ্ঠ শরীর। আয়ত চোখ কিছুটা নীলচে, প্রশস্ত ললাট, তীক্ষ্ণনাসা, বুদ্ধিদীপ্ত অবয়ব। বয়স বড় জোর বছর ছত্রিশ। শোনা যায় অকৃতদার। বিয়ে থা করেন নি, কোনদিন করবারও নাকি অভিপ্রায় নেই। পরের সেবায়ই জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর লম্বাটে ছাঁদের মুখ ও ধারালো চিবুকের সঙ্গে কালো চাপ দাড়ি যা মানিয়েছে, তার উপরে পরনে পাজামা, শিরওয়ানী, মাথায় টার্কী টুপি। খাঁটি আর্যসন্তান যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সবকিছু মিলিয়ে অনন্য ব্যক্তিত্ব, আদর্শ চিকিৎসক। ডাঃ রুস্তমজীর গুণে মুগ্ধ এ অঞ্চলের সকলেই, বাইরেরও বহু লোক, ছেলেমেয়ে বুড়ো শিশু সবাই।

এই অসাধারণ জনপ্রিয়তার খেসারত তাঁর দিতে হয় বাড়তি খাটুনি আর ব্যস্ততার মাশুল দিয়ে। বলতে গেলে চেম্বারে এসে নাকে-চোখে কিছু দেখতে পান না, খালি কাজ আর কাজ ছাড়া। উদয়াস্ত গাধার খাটুনি। উনিও এতে খুশী, এতটুকু ব্যাজার হন না কখনো। রুগ্ন জনগণের এ এক দুর্লভ ভাগ্যই বলতে হবে, এমন এক ধন্বন্তরি সাক্ষাৎ শিয়রে ভগবানরূপ সুচিকিৎসক লাভ।

কিন্তু সেদিন। সেদিন যেন কেন তাল কেটে গিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল সারাক্ষণ। সকাল পেরিয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে ক্রমে বিকেল, শেষটা সন্ধ্যেও হতে চলল, কিন্তু একটিও রোগীর দেখা নেই। কই এমন তো হয় না কোন দিন। এ কোন্ অঘটন?

কাজ-পাগলা ডাক্তার সাহেবের কিছু ভাল লাগছিল না যেন। মনটা গিয়েছিল উদাস হয়ে। আর খানিক দেখে লেডী অ্যাটেনড্যান্ট মিস রায়কে ছুটি দিয়ে দিলেন বাড়ি যাবার জন্য। পেশেন্ট এলে

একাই সামলাবেন। বললেন—সুমনা, তুমি বাড়ি চলে যাও। দেরি করো না আর, যা ওয়েদার। আর হ্যাঁ, ট্রাম-বাস তো পাবে না। মিনিবাস কিংবা ট্যাকসিতে যেও। এই নাও টাকা।

ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেয় নার্স।

ছট্‌ফট্ করছিলেন ডাক্তার। দিনভর যিনি কম করেও পঞ্চাশ-ষাটটি রোগী দেখেন, তাঁর পক্ষে বিনা কাজে বসে বসে পেপার ম্যাগাজিন আর মেডিকেল জার্নাল পড়ে দিন কাটানো যে নিতান্ত দুর্বিষহ ব্যাপার।

শূন্য মনে বসে আছেন ডক্টর রুস্তমজী। চেম্বারের চারধারে জানালাগুলো খোলা। দরজায় খিল এঁটে দিয়েছেন মিস রায় চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকক্ষণ আগে।

এর মধ্যে আবার সোনায় সোহাগা। শুরু হল আচমকা লোডশেডিং। বিদ্যুৎ-বাতি নেই, হ্যাজাক বা হ্যারিকেন যে জ্বালবেন সে প্রবৃত্তিও হচ্ছে না অমন কর্মী মানুষ ডাক্তারসাহেবের আজ।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হয়ে নামল। রাস্তাও অন্ধকার ঐ একই লোডশেডিং-এর দৌলতে। বৃষ্টির বিরাম নেই। অঝোর ধারা ঝরছে তো ঝরছেই। একটু পরে খোদ কলকাতার বুকে শুরু হয়ে গেল ঝিল্লীর ঐকতান এখানে-ওখানে, বাগানে-পার্কে। সেই সঙ্গে ডোবা ও নর্দমার ধারে ব্যাঙের ডাক। সবই সত্যি এই আজব শহরে। জানালা দিয়ে খোলা আকাশ দেখা যাচ্ছে খানিকটা। মেঘমেদূর অশ্রুভারাক্রান্ত যেন। ডক্টর রুস্তমজী আনমনে তাকিয়ে আছেন সেদিকে। দেখছেন অপলকে বৃষ্টির ক্লান্তিহীন কর্মব্যস্ততা। যেন নিজেরই স্বভাবের প্রতিফলন।

কতক্ষণ যে এইভাবে চলে গেছে, সে খেয়ালও ছিল না তাঁর। সহসা চমকে উঠলেন রুস্তমজী। দরজার গায়ে কয়েকটা শব্দ হল ঠক, ঠক, ঠ-ক। কলিংবেল তো বাজবে না, লোডশেডিং যে।

ক্ষণকাল বিরতি। বসে বসে ভ্রূ দুটো কুঁচকে জিগ্যেস করলেন রুস্তমজী—কে—কে?

কোন সাড়া নেই। একটু ভাবনায় পড়লেন তিনি। এমন বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় কে আসতে পারে, কোন পেশেন্ট তো নয় নিশ্চয়ই। তবে নিশ্চয়ই ইম্‌পেশেন্ট কেউ। অর্থাৎ গুণ্ডা বদমাশ উগ্রপন্থী কিংবা ডাকাত—যারা সাধারণতঃ ইম্‌পেশেন্ট বা অধৈর্যই হয়। নিজের রসিকতায় এর মাঝেও নিজেই মনে মনে কৌতুক অনুভব করেন ডাক্তার সাহেব।

পরক্ষণে ভাবেন, না ওরা আসবে কেন আমার কাছে, আমি তো কাউকে ভোগাও দিই না বা কালো টাকার পাহাড়ও গড়ি নি কারো কাছে নিংড়ে ফী আদায় করে। আর তাছাড়া ওরা এসে এখানে পাবেই বা কী, কতকগুলো ওষুধের বোতল, কিছু ফার্নিচার আর দু-একটি পুরোনো যন্ত্রপাতি ছাড়া। উঁহু এ থেকে মজুরী পোষাবে না ওদের। ওসব কিছু নয়।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। এগিয়ে গেলেন দরজার কাছে। হাত দুটো পেছনে নিয়ে কান খাড়া করে বিস্ময়ের মত তাকিয়ে রইলেন দরজার দিকে।

ঠক! ঠক! ঠক!

আবার সেই শব্দ! আশ্চর্য! তবে কি, তবে কি কোন প্রেতাত্মা!

ভাবতেই লোমকূপগুলো শিউরে উঠল। খাড়া হল গায়ের লোম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার লজ্জায় লাল হয়ে গেল তাঁর মুখখানা—ছিঃ ছিঃ, এ কোন্ ছেলেমানুষি আমার? আমি না বিজ্ঞানের ছাত্র? তায় আবার ডাক্তার? প্রেতাত্মার অলীক অস্তিত্বে আমি কেন আস্থাবান হব? কেন বিশ্বাস করব ওসব আজগুবী বুজরুকিতে?

সে যাই হোক। দরজা আমাকে খুলতেই হবে। দেখতে হবে বাইরে থেকে সত্যিই কেউ আমায় ডাকছে কিনা। রোগীও তো হতে পারে, কে জানে? তা না হলেও নিশ্চয়ই কোন প্রাণধারী শরীরী জীব তো বটেই।

আস্তে আস্তে দরজার খিল খুলে দিলেন ডক্টর রুস্তমজী। বসলেন গিয়ে চেয়ারে। তাকিয়ে থাকলেন অপলকে, ভেজানো দরজার পানে।

তখনো বৃষ্টি পড়ছে, যদিও আগের চেয়ে আস্তে। বাতাসের মাতামাতিও সামান্য রয়েছে। রুস্তমজীর গাটা ছমছম করছিল।

দরজাটা ঠেলে একটা মানুষ ঢুকে পড়ল ঘরে। আপাদমস্তক কাপড়ে আবৃত তার। শুধু চোখ দুটি ছাড়া কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না তার। এগিয়ে আসতে লাগল ব্যক্তিটি। বসল একটা বেঞ্চে পেশেন্টদের জন্য রাখা। মুখে কোন কথা নেই। প্রয়োজন মনে করল না আগন্তুক তার জন্য অনুমতি নেয়ার। আপন গতিতে সে খেয়াল মত কাজ করতে লাগল। লোকটির হাতে একটা বোতাম টেপা বৈদ্যুতিক লণ্ঠন।

রুস্তমজী অবাক্। তাঁর কণ্ঠ যেন স্তব্ধ হয়ে যেতে চায়। অনেক চেষ্টা করে সাহস অর্জন করলেন তিনি। জিগ্যেস করলেন, কে—কে আপনি? কৌন আপ, ক্যা মাঙতে হেঁ, কি চান?

কোন জবাব নেই।

—আপনি কী অসুস্থ?

ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব এল বাংলায়—না।

—তবে আপনি কে? কেন এসেছেন এখানে?

আস্তে করে গুণ্ঠন খুলে ফেলল। চমকে উঠলেন রুস্তমজী। আগন্তুক মেয়েছেলে। কিন্তু দেখে যেন মনে হয় নিষ্প্রাণ। দুর্বল, লম্বা লম্বা হাত, শীর্ণ, শুষ্ক। সাধারণ মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী লম্বা। মানুষ তো! না, সত্যিই কোন প্রেতাত্মা!

রুস্তমজী আবার প্রশ্ন করলেন—তবে কি চাই আপনার? কোন রোগী আছে কী? বাংলা বলেন স্বাভাবিক উচ্চারণেই রুস্তমজী। আদিতে যে ছিলেন বোম্বেওয়ালা পার্শী, সে-কথা মনেই হয় না। হয়ত অনেকদিন আছেন এ মুলুকে, সে কারণেই।

মৃদু কণ্ঠে বলতে লাগল স্ত্রীলোকটি।

—রোগী আপাততঃ নেই ডাক্তার সাহেব, রোগী হবে।

—তার মানে?

—আপনাকে কাল সকালে আমার বাড়িতে যেতে হবে।

—কোথায় আপনাদের বাড়ি?

—তা বলে দেবো। আগে কথা দিন আপনি যাবেন?

—কেন যাবো, কী জন্যে যাবো, তা বলবেন তো?

—যাবেন আমার ছেলেকে দেখতে। কাল ভোর চারটেয় তার ফাঁসি হবে। ফাঁসির পরে ডেডবডি দিয়ে যাবে আমাকে। ডক্টর, আপনাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কি ছিল আমার ছেলের মধ্যে। কী সে হতে পারতো?

আশ্চর্য হয়ে যান রুস্তমজী। কী যেন একটা গভীর রহস্যের ইঙ্গিতে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠেন ডক্টর। এই লোডশেডিং-এর অন্ধকারের মধ্যে এমন মুখর বর্ষণের দুর্যোগে কোথা থেকে কেমন করে এলেন ভদ্রমহিলা? এ কে? কেনই বা এসেছেন? আর কি-ই বা বলছেন? পাগল হয়ে যান নি তো? হয় তো পুত্রশোকে মাথার গণ্ডগোল হয়ে গেছে। তা না হলে কে বলে ডেডবডি পরীক্ষা করতে। ডেডবডির কি পরীক্ষা করব আমি?

থই পান না পার্শী ডাক্তার সাহেব। কিছুই যেন আর ভাবতে পারেন না। ধীরে ধীরে তাঁর চিন্তায় ঘনিয়ে আসে ঘোর। মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে।

আবার সেই ক্ষীণ কণ্ঠের কাতর আকুতিঃ কথা দিন, কাল সকালে আপনি গিয়ে দেখবেন আমার ছেলেকে?

রুস্তমজী কথা দিলেন, বেশ, যাবো।

—খুব খুশী হলাম। আমি জানতে পারবো আমার ছেলে কী হতে পারতো। ওকে হারিয়ে ঐ

তৃপ্তিটুকু নিয়েই আমার সারাটা জীবন কেটে যাবে। এখন শুনে নিন, কোন্ পথে কেমন করে যাবেন আমাদের বাড়িতে।

—বেশ, বলুন।

—এখান থেকে যাবেন গোপালনগরের মোড়, চেতলা। সেখান থেকে বাই কার কিংবা একটা রিক্শা নিয়ে সোজা চলে যাবেন আদিগঙ্গার কাছ বরাবর পনেরোর সি দুর্গাপুর লেন; পথের পাশে ছোট একটা বাগানের দক্ষিণ দিকের পুরোনো পাঁচিল ঘেরা একতলা বাড়ি। পারবেন তো যেতে?

—নিশ্চয়ই পারবো।

—ভোর ছ'টার মধ্যে যেতে হবে কিন্তু।

—ঠিক আছে। চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

ভদ্রমহিলা বললেন—না, না, আমাকে এগিয়ে দিতে হবে না। একাই পারবো আমি যেতে।

—বৃষ্টি পড়ছে তো—

—কী হয়েছে তাতে?

—রাস্তা অন্ধকার লোডশেডিং-এর দরুন। কী করে যাবেন আপনি?

—সঙ্গে লণ্ঠন আছে তো, ঠিক যেতে পারবো। কোন চিন্তা করবেন না।

ভদ্রমহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন। ডক্টর রুস্তমজী দরজার একটা পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন পথের পানে তাকিয়ে। ধীরে ধীরে ভদ্রমহিলা দূরের বাড়িগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হলেন।

রাত্রে একটুও ঘুম এল না ডক্টর রুস্তমজীর চোখে। একরকম জেগেই রইলেন। ভোর হল। উঠে পড়লেন তাড়াতাড়ি করে। হাত-মুখ ধুয়ে নিলেন। অন্যান্য কাজগুলো সেরে নিলেন চটপট করে। একটু আগেই বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে গাড়িটা নিয়ে।

অচেনা পথ। হয়তো বাড়ি খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগবে। ঠিক ছ'টার মধ্যে গিয়ে পৌছতে হবে যে আবার।

উৎকণ্ঠার অন্ত নেই ডক্টর রুস্তমজীর। পথে একা ড্রাইভ করে চললেন মন্ত্রমুগ্ধের মত। হাজরা ব্রীজ আদিগঙ্গা পেরিয়ে গোপালনগরের মোড়। তা ছাড়িয়ে এগিয়ে চললেন। দেখতে দেখতে এসে গেলেন সেই বাগানটার ধারে। গাড়ি থামালেন। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। দাঁড়ালেন একটু। তাকালেন চতুর্দিকে। নির্ভুল নির্দেশ।

এতক্ষণে এসে পৌছে গেছেন নির্দিষ্ট বাড়ির সদরে। এই তো নম্বর পনেরোর সি। নক করলেন দরজায়। খুলে দিলেন ভদ্রমহিলা—আসুন! আসুন! এত তাড়াতাড়ি যে আপনি এসে পড়বেন তা কিন্তু আমি ভাবি নি!

—কী বলছেন? কাল সারাটা রাত একটু ঘুমোতে পারি নি।

—তা তো ঘুম আসবেই না। এ রকম একটা সংবাদ পেলে কেউ কী ঘুমোতে পারে?

ভদ্রমহিলা সুশ্রী। মুখশ্রী মন্দ না। কাল রাতে অতটা বোঝা যায় নি। ডক্টরকে নিয়ে বসালেন একটা নির্জন ঘরে।

বললেন—বসুন। এখনই এসে পড়বে আপনার পেশেন্ট। এই বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন ভদ্রমহিলা।

একাকী বসে আছেন ডক্টর। অনেকটা সময় গেল অতিক্রান্ত হয়ে। কেউ নেই। কিছু নেই। নেই কোন সাড়াশব্দ পর্যন্ত। কেমন যেন আচমকা একটা সন্দেহ জাগল তাঁর মনে। অজানা আশঙ্কায় আঁতকে উঠল বুকটা। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। চলেই যাবেন না বলে?

হঠাৎ চমকে উঠলেন ডক্টর। একটা গাড়ির শব্দ ভেসে এল তাঁর কানে। এটা তো তাঁর গাড়ি মনে হচ্ছে না—অন্য অরেকটা কোন গাড়ি। গাড়িটা এসে দাঁড়ায় বাড়ির সামনে। কয়েক জোড়া জুতোর শব্দ হল। ওরা গাড়ি থেকে বোধ হয় নামছে। টেনে বের করল স্ট্রেচার। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন ডক্টর। ক্রমেই

উৎকর্ণ হয়ে উঠছেন তিনি। স্ট্রেচারটা মেঝের উপর রাখবার শব্দটাও স্পষ্ট এল। মনে মনে তৈরি হয়ে নিলেন ডক্টর, এখনই ডাক পড়বে তাঁর। দেখতে হবে ডেডবডি পরীক্ষা করে।

শুনতে পেলেন ডাক্তার একটি চাপা কান্নার করুণ সুর। ব্যথাবিমর্ষ হয়ে গেল ডক্টর রুস্তমজীর মুখটা। বুকের মধ্যে টন্‌টন্ করে উঠল—আহা! মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিল ওরা তাজা তক্‌তকে একটা তরুণকে! ডক্টরের মনের নেপথ্যে তখন বিচিত্র ভাবের অনুভূতি। হয়তো কোন মহান আদর্শের জন্য অকালে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে এই তেজস্বী তরুণকে। নয়তো কোন ভ্রান্তিতে, বিচ্যুতিতে, বিপথে চালিত হয়ে।

পাশের ঘর থেকে ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়ালেন রুস্তমজীর কাছে। চোখে তাঁর জল—আসুন ডাক্তারবাবু, এই মাত্র আপনার পেশেন্ট দিয়ে গেল পুলিস।

উঠে দাঁড়ালেন রুস্তমজী। চললেন ভদ্রমহিলার পেছন পেছন। ঢুকলেন গিয়ে একটা ঘরে। ভদ্রমহিলা বললেন—এই যে আপনার রোগী! কাপড় দিয়ে ঢাকা। আমি ও দৃশ্য দেখতে পারবো না। পাশের ঘরে আছি। আপনি ভাল করে দেখুন।

ত্রস্ত পদসঞ্চারে ভদ্রমহিলা ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ডক্টর রুস্তমজী ফেললেন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস। উঠে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন।

সামনেই পড়ে রয়েছে থান কাপড়ে আবৃত ডেডবডি। রুস্তমজী কাপড়টা তুলতেই যেন সামনে বাজ পড়ল তাঁর। মাথার মধ্যে হাজার হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ।

সারা শরীর যেন শক খেয়ে শিউরে উঠল। আতঙ্কে নীল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোনমতে উচ্চারণ করলেন—একী!

বিমূঢ় হতবাক্ রুস্তমজী। জড়িমা জড়িত অঙ্গ। চলৎশক্তিহীন। বিস্মৃতির অতলান্তে হারিয়ে গিয়েছে তাঁর সজীব সত্তা।

অকস্মাৎ এক সময় উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠলেন রুস্তমজী—তুই বেঁচে আছিস বিরজাব্রত? না না না। তুই বেঁচে থাকতে পারিস না! আমি যে নিজের হাতে তোকে টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দিয়েছি ভাগীরথীর স্রোতে।

পেছন থেকে ততক্ষণে আমার সাঙ্গোপাঙ্গরা ঘিরে ফেলেছে রুস্তমজীকে। গম্ভীর কণ্ঠে আড়াল থেকে বলে উঠলুম, আর কত দিন পার্শী রুস্তমজী সেজে লুকিয়ে থাকবেন খাঁটি বঙ্গসন্তান হয়ে রমাব্রতবাবু? এবারে চাপদাড়ি কামিয়ে খোল-নলচে বদলে পুরোপুরি পুনর্মূষিক হন।

কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে রুস্তমজিবেশী রমাব্রতবাবু বললেন—তা না হয় হল। কিন্তু আমার ভাই বিরজা কি করে বেঁচে থাকে? ওকে যে আমি ঠান্ডা মাথায় নিজের হাতে হত্যা করেছি?

—হা-হা-হা। আমি বিরজাব্রত নই, রমাব্রতবাবু! মৃত সৈনিক—থুড়ি, মৃত বিরজার মেকআপে অভিনেতা মাত্র। স্ট্রেচার থেকে উত্তর দেন আমার সহকারী বিরজাবেশী সাব ইনস্‌পেক্টার পুলকেশ পাল।

উঠে দাঁড়ালেন অফিসার। আড়াল থেকে এগিয়ে এলুম আমি। বললুম, আমি ডি. ডি. ইনস্‌পেক্টর ব্যানার্জী। এই দেখুন আমার আইডেন্টিটি কার্ড। বাঁশী বাজালুম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল উর্দিপরা আরো একদল সশস্ত্র সিপাই। বললুম, বন্ধ করো একে। ওঠাও ভ্যানে। আসুন আমাদের সঙ্গে রমাব্রতবাবু।

পুলিস ভ্যানে ওঠাবার পর বললাম—নিয়ে চল সোজা লালবাজার পুলিস হেড কোয়ার্টার।

পুলকেশ তার জামার তলা থেকে মিনি টেপ রেকর্ডরটা আমার হাতে দিয়ে বলল—নিন স্যার, আপনার জিনিস ফেরত নিন। খুব কাজে লেগেছে আপনার সাজেশান অনুযায়ী এটা সঙ্গে রেখে খুনীর নিজকণ্ঠের স্বীকারোক্তি পেতে। বাব্বা, একে মেকআপ, তায় স্ট্রেচারে কাপড় মুড়ি দিয়ে অতক্ষণ পড়ে থাকা এই গরমে, একদম আলুসেদ্ধ হয়ে গেছি স্যার। যা ভোগান্তিটা দিলেন না এই পার্শী ডাক্তার আমাদের।

আমি বলি, ভোগান্তি দিলেও অসীম কৃতজ্ঞ ওঁর কাছে আমরা, যে দয়া করে কোন সন্দেহ না করে ফাঁদে পা দিয়েছেন আমাদের। অবশ্য লেডী পুলিস সাব ইনস্‌পেকটার মিসেস্ প্রভা গাঙ্গুলীর পুরো ক্রেডিট প্রাপ্য এ ব্যাপারে, তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের দরুন। তিনিই ফাঁসির আসামীর মা সেজে গিয়েছিলেন ডক্টর রুস্তমজীর চেম্বারে আগের দিন সন্ধ্যায়। আজ সকালেও রুস্তমজীবেশী রমাব্রতকে তাঁর বাড়িতে রিসিভ করেন, বসান। তাঁর নিখুঁত অভিনয়ের ফলে কোনই সন্দেহের উদ্রেক হয় নি রমাব্রতর তাঁর বলা গল্পে। পুরোই বিশ্বাস করেছিলেন তিনি আজব কাহিনীটা—আর তাই সহজেই পা দেন আমাদের পাতা ফাঁদে। আর হ্যাঁ, যেটা আগেই বলা উচিত ছিল—অসামান্য বাহাদুরীর দাবি রাখে ডক্টর রুস্তমজীর লেডী অ্যাটেনড্যান্ট-রূপিণী লেডী পুলিস সাব ইনস্‌পেক্টার মিস্ ভারতী ভট্টাচার্য। তিনি যদি সহায়সম্বলহীন শিক্ষিত অভাগী বেকার মেয়ে কুমারী সুমনা রায় সেজে রুস্তমজীর চেম্বারে কায়দা করে চাকরি যোগাড় করে, দিনের পর দিন যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর শাগরেদি করে শেষটা তাঁর অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও নির্ভরতার পাত্রী হয়ে সুকৌশলে তাঁর আসল গুপ্ত পরিচয় ও অতীত ইতিহাস গোপনে সংগ্রহ করে না দিতেন আমার নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, তা হলে আমাদের পক্ষে আজও এই ভোল পালটানো অধুনা ভদ্রপরিচয়ধারী ভণ্ড খুনীকে ফাঁদে ফেলে রঙ্গমঞ্চে টেনে এনে তার মুখোস খুলে দেওয়া অসম্ভব না হলেও নিতান্ত দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াতো। এঁদের দু'জনকে ও অন্য সবাইকে জানাই আমার অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

হ্যাঁ, এই দীর্ঘ দশ বছর ধরে খুনীর সন্ধানে আমাদের যে শ্রম যে সাধনা তা আজ সার্থক।

মূল কৃতিত্ব কিন্তু আপনার—এ কথা মানতেই হবে স্যার। বলল পুলকেশ। গোপন সূত্রে আপনিই সর্বপ্রথম রুস্তমজীকে আবিষ্কার করেন। তারপর থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু সে সবই তো আপনার চেষ্টা ও যত্নে—ও বলল।

আমার একার না, আমাদের সবাইয়ের—পরিকল্পনা সুষ্ঠু ও সার্থক রূপায়ণে যার যার যথাযথ ভূমিকা পালনে। যাকে বলে ওয়ার্কিং টুগেদার ইন এ টিম স্পিরিট—যথার্থ যৌথ চেতনায় একত্রে কাজ করা—তারই ফলশ্রুতিতে—বলি আমি। তাই তো এত দিন বাদে ধরা পড়ল বিরজাব্রতর নৃশংস হত্যাকারী তারই দাদা রমাব্রত। পৈতৃক সম্পত্তির বাড়তি অংশের লোভে যে তার ভাইকে চিরতরে সরিয়ে দিয়েছিল পৃথিবী থেকে। ভেবেছিল এবার থেকে নিষ্কণ্টকে একাই ভোগ-দখল করবে নিজের আর ভাইয়ের ভাগের সম্পত্তি। পারলো কী? পারে নি শেষ পর্যন্ত শেষরক্ষা করতে। এত কষ্ট করে, কাঠখড় পুড়িয়েও বেচারা!

[জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭]

বালি সাগরের ভুতুড়ে আলো

অদ্রীশ বর্ধন

ইন্দ্রনাথ রুদ্র যোগব্যায়াম শেষ করেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাতে বারবেল তুলে দেখছে, হাতের গুলি মাস্‌ল্ ডিমের মতো ফুলে ফুলে উঠছে কিনা। এমন সময় আমি ঘরে ঢুকলাম। আমার পেছনে ঝুকিন্দর সিং। ছ' ফুট লম্বা শিখ জোয়ান। ইন্দ্রনাথকে ওই অবস্থায় দেখেই বললে—"মাফ করনা, মৈঁ তুহাডে কম্ম বিচ রৌড়া অটকায়া।"

আয়নার মধ্যে দিয়ে পেছনের ঝুকিন্দর সিংকে ইন্দ্রনাথ বললে, "মৈঁ এ ভাষা জ্ঞানদাঁ হাঁ।"

আমি তো হাঁ!

বললাম, "এটা কি পাঞ্জাবী ভাষা?"

বারবেল নামিয়ে রেখে ইন্দ্রনাথ বললে, "হ্যাঁ।"

"তুই কবে শিখলি?"

"প্রেমচাঁদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে।"

"প্রেমচাঁদ, ডিটেকটিভ এজেন্সির প্রেমচাঁদ?"

"খাঁটি পঞ্জাবনন্দন প্রেমচাঁদ মালহোত্রা। ভাল ডিটেকটিভ। খাটতে পারে। কিন্তু বুদ্ধি কম।"

ঝুকিন্দর সিং বললে, "সেইজন্যেই তো আপনার কাছে এলাম।"

"বাংলাও জানেন দেখছি। বসুন", বলে নিজে সোফায় বসল ইন্দ্রনাথ। আমরাও বসলাম, "প্রেমচাঁদের কাছে আগে গেছিলেন? বেশ, বেশ, কেসটা কি?"

ঝুকিন্দর সিং বললে, "সেটা বলার আগে আমার নিজের কথা সংক্ষেপে বলে নিই। বাংলাটা আমি অনেক বাঙালির চেয়ে ভাল জানি। বাংলায় গল্প-টল্পও লিখি। মৃগাঙ্ক রায় আপনাকে নিয়ে গল্প লেখেন। সে গল্প আমি পড়ি। তাই আপনাকেও চিনি। যাঁর হাতে আমার এই ভুতুড়ে কেস দিতে যাচ্ছি, তিনি পাঞ্জাবী ভাষা না জানলে অসুবিধে হতে পারে—তাই বাজিয়ে নিলাম।"

"আপনি তো বললেন, মাপ করবেন, আপনাকে বিরক্ত করলাম। ঠিক?"

"ঠিক। আপনি বললেন, আমি এ ভাষা জানি। সঠিক উচ্চারণ শিখলেন প্রেমচাঁদের কাছে?"

"সুন্দর ভাষা বলেই শিখে নিলাম। আপনি ভূতের ঝামেলায় পড়েছেন?"

"কবর থেকে উঠে আসা দানোভূত।"

"এইজন্যেই প্রেমচাঁদের মতো তুখোড় গোয়েন্দা হার মেনেছে। ভূতেদের কারবার ধরার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা মানুষ-গোয়েন্দা।"

"আপনি কিন্তু নিজেই বললেন, প্রেমচাঁদের বুদ্ধি কম।"

"বুদ্ধি থাকলে এ ভূত ধরা যাবে?"

"মনে তো হয়। ধরতে যদি নাও পারেন, থর মরুভূমির হাওয়া খেয়ে আসবেন চলুন। খরচ আমার। দেখে আসবেন, ঝড় উঠলে মরুভূমির বালি থেকে কিভাবে ভুতুড়ে আলো ছিটকে যাচ্ছে। আর দেখবেন চলমান শবদেহদের। রাজী?"

"রাজী", বলে এক টিপ নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

তাই আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি থর মরুভূমির নির্জন এই অঞ্চলে। এখন দিনের আলো। রোদ্দুরে বালি যেন জ্বলছে। উঁচুনিচু বালির পাহাড়। দিগন্ত পর্যন্ত ধু-ধু করছে শুধু বালি আর বালি।

আমরা এসেছি চারজনে। আমি আর ইন্দ্রনাথ। ঝুকিন্দর আর মহিন্দর। ওরা দুই ভাই। দুজনেই তাল-ঢ্যাঙা। দুজনেই বাংলা জানে।

পাশে দাঁড়িয়ে জীপ।

ঝুকিন্দর বললে, "জায়গাটায় তেল পাওয়া যাবে, এই আশা নিয়েই এসেছিলাম। সরকার তো এখন সব দিকেই খরচ কমাচ্ছে। তাই নিজেরা আসেনি। প্রাইভেট পার্টিকে দিয়ে তেল খোঁজাচ্ছে। আমি তেলের খবর রাখি। একসময়ে সরকারী চাকরি করেছি। পেট্রল কোথায় পাওয়া যাবে—তা জানি। এখানে পেট্রল আছে। কিন্তু যন্ত্রপাতি বসাতে পারছি না। দিনের বেলা যা আনি—রাত্রে সব চুরমার হয়ে পড়ে থাকছে।"

বালির পাহাড়গুলোর দিকে চেয়েছিল ইন্দ্রনাথ। বললে, "দূরবীনটা দিন।" মহিন্দর সিং এগিয়ে দিল দূরবীন। ইন্দ্রনাথ চোখে লাগিয়ে রেখে বললে, "অনেকদূরে ভাঙাচোরা লোহালক্কড় দেখতে পাচ্ছি বটে। ভাঙল কি করে?"

"প্রেমচাঁদের ডিটেকটিভরা এসে দেখে গেছে। ডিনামাইট দিয়ে ভাঙা হয়েছে।"

"কে ভেঙেছে?"

"কবর থেকে উঠে আসা মড়ার দল।"

"কে দেখেছে?"

"প্রেমচাঁদের গোয়েন্দারা। রাত্রে ঘাপটি মেরে বসেছিল এমন ক্যামেরা নিয়ে যা দিয়ে রাতের অন্ধকারেও দূরের ছবি তোলা যায়। ঠিক এই সময়ে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। বালি থেকে স্পার্ক ছিটকে ছিটকে যাচ্ছিল আকাশের দিকে। আলোয় আলোয় আলো হয়ে গেছিল চারদিকে। সেই আলোয় দেখা গেছিল একদল লোক ঘুরঘুর করছে যন্ত্রপাতির কাছে। ডিনামাইট ফিট করছে। তারপর তারা দূরে সরে গিয়ে চার্জ দিতেই ফাটল ডিনামাইট।"

"লোকগুলোর ছবি?"

"থানায় দেখানো হয়েছিল। তারা তো হেসেই উড়িয়ে দিলে। প্রত্যেকেই নাকি মারা গেছে। প্রেমচাঁদের গোয়েন্দাদের সঙ্গে আমাকেই নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিল।"

"কি দেখিয়ে দিল?"

"কবরখানা। মাটির তলায় শুয়ে আছে যারা, তাদেরকেই নাকি দেখা গেছে বালি পাহাড়ের ভুতুড়ে আলোয়।"

"প্রেমচাঁদ তা বিশ্বাস করেছিল?"

"যাচাই করেছিল। তারপর ফটোগুলো আমার হাতে তুলে দিয়ে পালিয়ে গেল দিল্লীতে।"

"কোথায় সেই ফটো?"

"এই দেখুন। একজনের ফটোই আগে দেখুন। এটা ওর বেঁচে থাকার সময়ে তোলা ছবি—ফ্যামিলি অ্যালবাম থেকে ফটোকপি করা হয়েছে। আর এইটা.....ওরই ছবি.....তাই না?.......এ ছবি তোলা হয়েছে সেই রাতে দূরপাল্লার ক্যামেরা দিয়ে—এনলার্জ করা শুধু মুখটা দেখুন..... একই লোকের ছবি.....অথচ লোকটাকে কবর দেওয়া হয়েছে বছরখানেক আগে......তার রেকর্ড পর্যন্ত যাচাই করেছে প্রেমচাঁদ। তার পরেই তো বলল, মড়ার দল ডিনামাইট ফাটাচ্ছে, ওদের ধরার ক্ষমতা আমার নেই—বলে দলবল নিয়ে চলে গেল দিল্লী।"

ফটো দুটোর দিকে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। আমিও দেখলাম। মাথার ওপর রোদ ঝলকাচ্ছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দুটো মুখ একই লোকের।

ইন্দ্রনাথ বললে, "কফিন খুলে দেখা হয়েছিল?"

"চুপিসাড়ে তাও করেছে প্রেমচাঁদ। কফিন শূন্য। মড়া উধাও।"

দিনের আলোতেও গা ছমছম করে উঠল আমার।

ইন্দ্রনাথ ফটো দুটো ঝুকিন্দরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে নস্যির ডিবে বের করল। আয়েশ করে এক টিপ নস্যি নিল।

আমাকে বললে, "চ, থরের হাওয়া খেয়ে আসি।" ঝুকিন্দর-মহিন্দরকে বললে, "আপনারা ঘাঁটি আগলান—মড়ার দল তেড়ে এলে জীপ নিয়ে যেন পালাবেন না।"

সূর্যের চেয়ে বালি গরম হয়। কতটা গরম হয়, তা সেদিন হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। জুতোর চামড়া পর্যন্ত তেতে আগুন হয়ে গেছিল। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। ইন্দ্রনাথ কিন্তু হাওয়ায় কোঁচা উড়িয়ে, পাঞ্জাবির কোনা লটপটিয়ে হনহনিয়ে এগিয়ে গেল আমাকে পেছনে ফেলে। শেষকালে দৌড়ে ওর নাগাল পেলাম। বালি পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে বেশ কিছুটা গিয়ে ভাঙাচোরা লোহালক্কড় দেখে থমকে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা খাম বের করল। হেঁট হয়ে এক খামচা সাদাটে বালি তুলে তাতে ভরে নিল। মুড়ে পকেটে রেখে বললে, "চ পালাই, মড়ার দল এসে যেতে পারে।"

হাওয়ায় ওর লম্বা লম্বা চুল উড়ছে। সুন্দর মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে রোদ্দুরে। মুখে কিন্তু ভয়ডরের চিহ্ন নেই, কথায় রয়েছে কৌতুক। চোখে চাপা হাসি।

ভড়কে গিয়ে বললাম, "তুই ভয় পাসনি?"

"না।"

"বালি নিলি কেন?"

"মড়াদের ধরব বলে।"

"সত্যিই মড়া আসে রাত্রে?"

"সত্যি।"

"কি বলছিস?"

"প্রেমচাঁদ অনেকটা কাজ এগিয়ে রেখেছে। মাথামোটা, নাহলে বাকিটুকুও করে ফেলতে পারত। ওঝারা সর্ষে দিয়ে ভূত তাড়ায় জানিস তো? আমি এই বালি দিয়ে ভূত তাড়াবো।"

দিল্লী। প্রেমচাঁদ ডিটেকটিভ এজেন্সির ইন্ডিয়ান হেডকোয়ার্টার। গোটা পৃথিবীতে শাখা অফিস খুলে বসে আছে যে প্রেমচাঁদ তার অফিসঘরে ঢুকছি আমি আর ইন্দ্রনাথ। ঢুকতে ঢুকতেই দেখলাম, মালিক আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে দু'হাত জোড় করে। মুখে বিগলিত হাসি। প্রকাণ্ড চেহারা। রাজপুত্তুর রাজপুত্তুর ভাব। এই নাহলে গোয়েন্দা। চেহারা দেখিয়েই বাজিমাৎ করে দেয়। ইন্দ্রনাথও এদিক দিয়ে কম যায় না। ওর ওই ধুতি-পাঞ্জাবি পরা কবি-কবি চেহারা দেখে কেউ ধরতেও পারে না, মানুষটার পেশীতে বিদ্যুৎ খেলে যায় দরকার হলেই—তখন সে নেউলের মতো ক্ষিপ্র, শেয়ালের মতো ধূর্ত। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই জবর ডিটেকটিভ। যেন দুই রাজপুত্র। ইন্দ্রনাথ বললে, "প্রেম, তুই একটা মূর্খ।"

প্রেমচাঁদ বললে, "স্পষ্ট দেখলাম, কফিন খালি। দুটো ফটো একই লোকের। আর কি ওখানে থাকি?"

"এই নে।" খামে মোড়া বালি এগিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ—"টেস্ট করা।"

"কি টেস্ট?"

"কাগজে লেখা আছে। আর একটা কাজ কর।"

"কি কাজ?"

"খামের পেছনে একজনের নাম লিখে রেখেছি। দেখছিস? মুখটা অতটা হাঁ করিসনি। চব্বিশ ঘণ্টা ওর পেছনে লোক লাগা।"

প্রেমচাঁদ তবুও হাঁ করে রইল। খামে লেখা নামটা অবশ্য আমি আগেই দেখেছি। কি করে নামটা পেয়েছে ইন্দ্রনাথ, তাও জেনেছি। সে ঘটনাটা এই ফাঁকে বলে নিই।

পুরানো দিল্লীর সবজিমণ্ডীতে একটা ভাঙা বাড়ির সামনে গিয়ে কড়া নেড়েছিল ইন্দ্রনাথ। সঙ্গে ছিলাম শুধু আমি। আর কেউ না। আমরা যে এখানে অটোরিকশা নিয়ে চলে এসেছি, তাও কেউ জানত না।

গরিব আর খাটিয়ে লোকের বসতি এখানে। গলি-ঘুঁজিতে জঘন্য ভিড়। ভয়ানক নোংরা। অথচ এই হলো আদি দিল্লী।

ভাঙাবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল কুচকুচে কালো এক বুড়ো। মাথার চুল সব সাদা। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে। পুরু ঠোঁট। থ্যাবড়ানো নাক। জাতে নিগ্রো।

ইন্দ্রনাথ বললে হিন্দি হিন্দি আর উর্দু মেশানো জগাখিচুড়ি ভাষায়—"মহম্মদ গুজরালের সঙ্গে কথা বলছি তো?"

বুড়োর ঘোলাটে চোখে সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে ওঠে, "ঠিকানা পেলেন কোত্থেকে?"

"একসময়ে এই দিল্লীতে 'মোমের হাত' বানাত এক কারিগর, জেনেছি তার কাছ থেকে।"

চেয়ে রইল মহম্মদ গুজরাল, "ভূতের হাতে গড়া মোমের হাত—কারিগর বানায়নি।"

"জানেন তাহলে। এ কারবার আমাকেও করতে হয়। ভেতরে আসতে পারি?"

"আসুন।"

মাথা হেঁট করে ছোট দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলাম দুই বন্ধু। সামনের ছোট্ট ঘরটাকে পায়রার খুপরি বললেও চলে। একধারে তক্তপোশ ইঁটের ওপর বসানো। তার তলায় রান্নার বাসন-কোসন। আর এক দেওয়ালে ঝুলছে মক্কার ছবি। তার নিচে একটা মড়ার খুলি। চারদিকে চারটে ধুনুচি। পুঁতির মালা দিয়ে ঘেরা রয়েছে। ধুনুচি আর করোটি। যেন একটা গণ্ডি।

আমরা মেঝেতে বসলাম। ঘরে জানলা নেই বলে দিনের আলো ঢুকছে না। রাস্তার আলো সামান্যই আসছে। যেন গোরস্থানে বসে রয়েছি।

ইন্দ্রনাথ কোনো ভূমিকা করল না। পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোটের একটা বাণ্ডিল বের করল। মহম্মদের সামনে মেঝের ওপর রেখে বললে, "দশ হাজার দিলাম। দাওয়াইটার জন্যে। একজনকে দানো বানাতে হবে। এক মাসের জন্যে।"

আধো অন্ধকারেও দেখলাম, বুড়োর ঘোলাটে চোখেও যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললে, "আপনি জানেন?"

"বালি পাহাড়ে ডিনামাইট ফাটাচ্ছে কারা, তাদের তো জানি।"

শক্ত চোখে চেয়ে রইল বুড়ো, "আর কি জানেন?"

পাঞ্জাবির আর এক পকেট থেকে আর একটা বাণ্ডিল বের করে নামিয়ে রাখল ইন্দ্রনাথ, "এতেও আছে দশ হাজার। ডিনামাইট ফাটিয়ে যন্ত্রপাতি ভাঙা হচ্ছে—ওখানে পেট্রল বের করার জন্যে বালি খুঁড়তে দেওয়া হবে না বলে। ঠিক?"

হ্যাঁ বা না, কিছুই বলল না বুড়ো।

ইন্দ্রনাথ বললে, "জবাব পেয়ে গেছি। এই দশ হাজার দিলাম আপনার মুখ বন্ধ রাখার জন্যে। দাওয়াই কখন পাব?"

কথা না বলে হামাগুড়ি দিয়ে তক্তপোশের তলায় ঢুকে গেল বুড়ো। বেরিয়ে এল একটা ছোট চওড়া-মুখ বোতল নিয়ে। রবার ব্যান্ড দিয়ে নস্যি তোলার ছোট চামচে লাগানো রয়েছে গায়ে।

বললে, "এই চামচের এক চামচ। সাত দিনে একবার।"

শেষ নাটক। ঝুকিন্দর-মহিন্দরের বাড়ি। পেট ঠেসে খেলাম এখুনি। এখন বসে আছি বসবার ঘরে।

ঘন ঘন নস্যি নিচ্ছে আর ঘড়ি দেখছে ইন্দ্রনাথ। বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে। ঘরে ঢুকল প্রেমচাঁদ। ঘর যেন আলো হয়ে গেল ওর রূপের জুলুসে।

ঝুকিন্দর-মহিন্দর একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল সোফা ছেড়ে। দুজনেই অবাক।

ঝুকিন্দর বললে, "কি খবর? হঠাৎ?"

প্রেমচাঁদ বললে, "বসুন বসুন।" নিজেও বসল সোফায়—"হঠাৎ আসিনি। ইন্দ্রনাথ আনিয়েছে।"

"কেন?"

"মড়াদের সর্দারকে চিনিয়ে দেব বলে।"

"কে সে?"

"মহিন্দর সিং।"

কথাটা মুখ দিয়ে পুরো বেরিয়ে আসার আগেই অবশ্য মহিন্দর সিং ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলভার টেনে এনেছিল। কিন্তু বাঙালি ইন্দ্রনাথ যে চোখের পলকে বাংলার বাঘ হয়ে যেতে পারে, তার আবার একটা প্রমাণ দেখিয়ে চোখের নিমেষে ছিটকে গেল সোফা ছেড়ে। মোক্ষম এক ঘুঁষিতেই মহিন্দরের অতবড় বপুটাকে শূন্যে উড়িয়ে আছড়ে ফেলল পেছনের দেওয়ালে। রিভলভার ছিটকে গেছিল হাত থেকে। কুড়িয়ে নেওয়ার সময় দিল না ইন্দ্রনাথ। বুকের ওপর চেপে বসে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসল।

এক হাতে মহিন্দরের গলা টিপে ধরে, আর এক হাতে পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা হোমিওপ্যাথির শিশি বের করে, আঙুলের টানে ছিপি খুলে ফেলে, ভেতরের গুঁড়ো ঢেলে দিল মহিন্দরের মুখে।

মিনিট কয়েক পরে মারা গেল মহিন্দর।

মহিন্দরের লাশ এখন মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে। ইন্দ্রনাথ হাসিহাসি মুখে একটিপ নস্যি নিয়ে বললে হতভম্ব ঝুকিন্দরকে, "ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বালি খোঁড়ার ঝুঁকি নিয়েই তো গোলমালটা পাকিয়েছেন আপনি।"

ঝুকিন্দর থ। মুখে কথা নেই।

ইন্দ্রনাথ বলছে, "ভূত না কচু। সবই জোম্বি-দের খেলা।"

"জোম্বি!" এতক্ষণে কথা ফোটে ঝুকিন্দরের মুখে।

"ওয়েস্ট ইন্ডিজের হাইতি দ্বীপের বেশির ভাগ মানুষই নিগ্রো-ভুডু ম্যাজিকে বিশ্বাসী, প্রায় সবাই চর্চাও করে। এরা জানে জোম্বি দানো কিভাবে তৈরি করতে হয়। আমি জেনেছি, ১৯৮২-তে ছাপা 'ন্যাশন্যাল এনকোয়ারার' বইটা পড়ে। ক্লেরভিয়াস নারসিস-কে গুঁড়ো খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল, সে মারা গেছে। ডাক্তার যখন ডেথ সার্টিফিকেট লিখছে, তখনও সে সব শুনছে—কিন্তু কথা বলতে পারছে না। তারপর তাকে ঝুরো মাটি চাপা দিয়ে গোর দেওয়া হয়। সেই রাতেই তাকে কফিন থেকে তুলে নিয়ে যায় দুজন লোক। চাষের মাঠে কাজে লাগিয়ে দেয়। মড়াকে জ্যান্ত হতে দেখে কেউ কাছে আসত না। সে বেচারিও জ্যান্ত মানুষের মতো হতে পারত না দাওয়াই-এর জোরে। এরকম অনেকেই জোম্বি দানো হয়ে কাজ করত মাঠে। তারপর একদিন ওষুধ দিতে ভুলে যায় মালিক—টনটনে জ্ঞান ফিরে আসতেই চম্পট দেয় নারসিস।—ঝুকিন্দর সিং আপনার কাজের জায়গাতেও এই জোম্বি মড়াদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল আপনি যাতে বালি খোঁড়াখুঁড়ি ছেড়ে চম্পট দেন—এই মতলবে।"

"কেন? খোঁড়াখুঁড়ি করলে ক্ষতি কি?"

"কারণ মোগল আর রাজপুতদের অনেক লড়াই হয়ে গেছে ওই জায়গায়। মোগল সৈন্যের তাড়া খেয়ে রাজপুতরা চার বাক্স সোনা আর জহরত লুকিয়ে রেখেছিল বালি সাগরের তলায়। তা জানত শুধু আপনার ভাই—মহিন্দর।"

"মহিন্দর!"

"আপনার গুণধর ভাই। কুসঙ্গে পড়ে গোল্লায় যাওয়া সহোদর ভাই। সে আপনার বেশি ক্ষতি করতে চায়নি—কিন্তু সোনাদানার বখরাও আপনাকে দিতে চায়নি। ঠিক কোনখানে সিন্দুক চারটে লুকোনো আছে, তা জানত না বলেই আপনাকে আর আপনার চ্যালা-চামুণ্ডা, এমনকি প্রেমচাঁদের মতো দুঁদে গোয়েন্দাকেও তাড়াতে চেয়েছে ভূতের ভয় দেখিয়ে।"

"কিন্তু ঝড়ের রাতে বালি থেকে আলোর ফুলকি তো ছিটকে গেছে আকাশের দিকে—সাংঘাতিক ভুতুড়ে আলো।"

"আরে মশাই, জিপসাম বালির পাহাড়ে ঝড়-বিদ্যুতের সময়ে স্ট্যাটিক ভোলটেজ তৈরি হয়ে যায়। বাতাস আর বালির ঘষটানির জন্যে তা হয়—এত বেশি পরিমাণে হয় যে স্পার্ক ছিটকে যায় আকাশের দিকে। সাদাটে বালি দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। নমুনা নিয়ে প্রেমচাঁদকে দিয়ে টেস্ট করিয়েছি। জিপসাম-ই বটে।"

"মহিন্দরই যে আমার প্ল্যান গুবলেট করে দিচ্ছে—আপনি জানলেন কি করে?"

"মোমের হাত কেসে এই পুরানো দিল্লীতেই এক প্রেত কারবারিদের ব্যবসা আমি লাটে তুলে দিয়েছিলাম। তাই জানি কে কোথায় মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে লোক ঠকাচ্ছে। জোম্বি বানানোর গুঁড়ো হাইতি থেকে আনিয়ে দিল্লীতে বসে বিক্রি করছে যে বুড়ো, তার কাছে গেছিলাম। প্রেমচাঁদকে বলেছিলাম, বুড়োর ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখতে। ওর লোকই দেখেছে, মহিন্দর সিং চুপিচুপি ঢুকছে ওর ঘরে। পরে, প্রেমচাঁদের গুঁতো খেয়ে এই বুড়োই ফাঁস করে দিয়েছে আপনার ভাইয়ের চক্রান্ত।"

কাতর চোখে তাকালেন ঝুকিন্দর সিং, "মহিন্দরকে সেই গুঁড়ো খাইয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"মরে যাবে না তো?"

"জ্যান্ত মড়া হয়ে থাকবে সাত দিন। সব শুনছে। তারপর সব কবুল করাবো। প্রেমচাঁদ, তোকে একটা জ্ঞান দিই, শুধু ধুমধাড়াক্কা করলেই কি গোয়েন্দা হওয়া যায়? একটু পড়াশোনা কর, আর বুদ্ধি খরচ কর। চলি।"

"আপনার দক্ষিণা?"

"বিশ হাজার প্লাস দশ হাজার।"

[শারদীয়া ১৩৯৯]

হাতে-নাতে

আনন্দ বাগচী

গরমের ছুটি মানেই ইস্কুল ছুটি, কলেজ ছুটি, শুধু অফিসের কোনো ছুটি নেই।

স্নান-খাওয়া সেরে বাবা একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলেন। জামা-কাপড় পরা আগেই হয়ে গিয়েছিল। এখন শুধু গাড়ির অপেক্ষা, অফিসের গাড়ি বাবাকে রোজ নিতে আসে, ফের বিকেলে পৌঁছে দিয়ে যায়। বাইরে হর্ন শুনলেই বাবা বেরিয়ে পড়বেন।

আর দিদিভাই কলেজ বন্ধ হতেই মামাবাড়িতে গিয়ে বসে আছে। কলেজে পড়লে খুব মজা, কেউ বকে না। সে-ও অবিশ্যি একদিন কলেজে পড়বে, কিন্তু তার এখনও বহুৎ দেরি। এখন তো মোটে ন'বছর বয়স বলুর, বন্টি তার থেকে তিন বছরের ছোট।

এখন গরমের ছুটি, কিন্তু গরমের নিজের কোনো ছুটি নেই। গরমটা তাই বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। মসৃণ, তেলতেলে মেঝেটা খুব আরামদায়ক। ইজের ধরনের পাতলা হাফপ্যান্ট পরে খালি গয়ে বলু মেঝের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছিল। থেকে থেকে পাতা ওল্টানোর ফরফর শব্দ।

উলটো দিকে, তার মাথার দিকে মাথা করে বন্টি। একখানা ছবির বইয়ে চিবুক চেপে স্থির। হঠাৎ দেখলে মনে হবে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরে যে দুটো ছটফট করে বেড়ানো ক্ষুদে দুটো প্রাণী মজুত সেটা এই মুহূর্তে মালুমই হচ্ছে না।

ওদের মা এখন রান্নাঘরে, বোধ হয় শেষ ছ্যাঁকা-পোড়ায় ব্যস্ত। তবে একটা কান বাইরের দিকে সজাগ। বাবার গাড়ির হর্ন বাজলেই দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে। বলু আর বন্টিও ছুটবে, হাত নেড়ে বাবাকে টা-টা করে বিদায় জানাবে, মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে।

এমন সময় ফোনটা এল। ক্রিং ক্রিং করে বাজতেই বলু তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। ফোনের মধ্যে 'হ্যালো কে? কাকে চাই?' বলতে তার খুব ভাল লাগে। বন্টিরও খুব ইচ্ছে কিন্তু তার সুযোগ আসে না দাদাকে ডিঙিয়ে। তার ওপর সে ফোকলা, গোটাকতক দাঁত পড়ে যাওয়ায় কথা কেমন আধো-বাধো শোনায়। বন্টি বলল, 'এইদা!'

বলু বলল, 'ধরেছি রে বাবা। হ্যালো, কাকে চাই?'

'কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জি আছেন?' ভরাট, ভারী, খসখসে গলা।

'হ্যাঁ দাঁড়ান, ডেকে দিচ্ছি।'

'শোনো তোমার নামটা কি?'

'বলু।'

'তোমার পাশে আর কে আছে? গলা শুনলাম যেন!'

'ও বন্টির কথা বলছেন তো? আমার ছোটোবোন।'

'এবার ডাকো বাবাকে।'

বলু ছুটে গিয়ে ওর বাবাকে খবর দিল, 'তোমাকে কে একটা লোক ফোনে ডাকছে।'

'আমাকে! আমাকে আবার এখন কে ডাকবে? চল তো দেখি।'

বলুর বাবা এসে নামিয়ে রাখা ফোনটা তাড়াতাড়ি তুলে নিলেন।

'কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জি বলছি। আপনি?'...'অ্যাঁ আপনার নাম জানার কোনো দরকার নেই? বলেন কি!' ও প্রান্ত থেকে কি কথা ভেসে এল শোনা গেল না। বলু ওর বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। মুখের ভাব দেখে যদি কিছু বোঝা যায়। কমিকস পড়ে পড়ে সে যথেষ্ট সেয়ানা হয়েছে এই বয়সেই।

'কি বললেন, আপনার দুটি সমর্থ ছেলে?...হ্যাঁ জানি, ওরা তো নিজের দোষেই মারা গেছে। পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে। এ তরফেও তো ক্ষতি হয়েছে তার বোধ হয় খবর রাখেন না? একজন পুলিশ তৎক্ষণাৎ মারা গেছে...আর দুজন গুরুতর আহত, বাঁচবে না! ওরা পুলিশে কাজ করে বলে কি মানুষ না? হ্যাঁ বলুন, আমি তো শুনছিই। কে কমলেশ? আমার ভাই...হ্যাঁ নিজের ভাই। না, আপনি ভুল করছেন, কমলেশের কিছুই করার ছিল না...ও কি করবে? আচ্ছা রেখে দিচ্ছি...আরও কথা আছে! কি কথা? বলু আর বন্টি...আমার দুই ছেলেমেয়ে। ...বাসি বৈকি, বাচ্চাদের কে না ভালবাসে?...অ্যাঁ বদলা নেবেন? কিভাবে? বাঃ ওদের কি কসুর...খবরদার, আপনার ভালর জন্যেই সাবধান করে দিচ্ছি। দেখুন মশাই, বুঝতে পারছি আপনার সর্বনাশ এবার ঘনিয়ে এসেছে'...বলেই কৃষ্ণেন্দু ঠকাস করে ফোনটা রেখে দিলেন। মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

বলুর মা নন্দিতা রান্নার জায়গা থেকে ছুটে এলেন, 'কী ব্যাপার? কেউ কি তোমাকে শাসাচ্ছিল? বলে কি লোকটা?'

'হ্যাঁ খুবই খারাপ....খুবই সাংঘাতিক কথা!'

'কি এমন কথা যে তুমি এভাবে মুষড়ে পড়েছ?'

'কি বৃত্তান্ত এখন বলার সময় নেই...ফিরে এসে'...কান খাড়া করে বাইরে এসে গাড়ির হর্ন শুনলেন, 'এখন যাই...কাল সকালেই কিন্তু হানা দেবে লোকটা!'

যেতে গিয়েও আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ রাতেই বাইরের দিকের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে রেখো আর ছেলেমেয়ে দুটোকে একদম কাছছাড়া করো না।'

উনি বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে চাপলেন। বলু আর বন্টি হাত নেড়ে টা-টা করল দরজায় মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে।

ফিরে এসে কমলেশ চ্যাটার্জি ডিসি ডিডিকে ফোন করল বলু। ওঁর ফোন নম্বর বলুর মুখস্থ।

'কাকু?'

'ছিরিমান বলুর গলা মনে হচ্ছে!'

'বাব্বাঃ! তুমি চিনবে না তা হয়?'

'কিন্তু কি ব্যাপারে তলব হচ্ছে?'

'ছিছি, তলব বোলো না, কাকু। বলো, স্মরণ করছি—'

কমলেশ খুক্ খুক্ করে হাসছিলেন।

'হাসছো কেন, কাকু?'

'ভাবছি, কমিকস পড়ে পড়ে আমার ভাইপোটি দিব্যি লায়েক হয়ে উঠেছে গো!'

'কি করবো বলো, কথায় বলে অল্প বিদ্যে ভয়ঙ্করী! আমার তাই! তোমারও দোষ আছে। একগাদা কমিকস কিনে দিতে কে বলেছিল!'

'ছেলেবয়সে একটু পাকা ভাল। কমিকস হচ্ছে কারবাইড!'

বলু বরাবরই দেখে আসছে, শত কাজের মধ্যেও ওকে পেলে কমলেশকাকু হাসি ঠাট্টা গপ্পো করতে ছাড়েন না।

'এবার আসল কথাটা বল।'

বলু সব ঘটনা খুলে বলল। ওর বাবার সঙ্গে আর ওর সঙ্গে লোকটার যে কথা হয়েছিল খুলে

বলার পর বলল, 'সব শুনে আর আভাস-ইঙ্গিত থেকে যা বুঝলাম আমাকে আর বন্টিকে কেটে কুচি কুচি করে বাবাকে ভেট পাঠাবে লোকটা। বা ওই রকমই সাংঘাতিক কিছু করবে। মনে হলো কাল সকালেই হানা দেবে লোকটা!'

একটু চুপ করে থেকে কমলেশ বললেন, 'ঠিক আছে, সাবধানে থাকিস। আজ রাত থেকেই বাইরের দরজা-জানালা বন্ধ করে তোরা মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকবি। সব বলে দিয়ে লোকটা ভালই করেছে। এই ওভার কনফিডেন্সই অপরাধীদের কাল হয়। বাকি যা করার আমি করবো।'

'ঠিক আছে, রেখে দিচ্ছি।'

ওর মাথায় তখন অনেক চিন্তা ঘুরছে। লোকটা একা, না দলবল সমেত আসবে কিছু জানা যাচ্ছে না! তবে যে ভাবেই আসুক নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে লোকটাকে ও শায়েস্তা করবেই করবে। নানা মতলব ভাঁজতে থাকে। বাতিল করে, আবার ভাবে।

হঠাৎ মনে পড়ল বাড়িতে কোথায় বড় সাইজের একগাদা পেরেক রাখা আছে। বন্টিকে কিছু বুঝতে না দিয়ে অনেকগুলো পেরেক পকেটে নিয়ে নিঃশব্দে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

তারপর হিসেব মতো নানা জায়গায় একটি একটি করে পেরেক বসিয়ে যেতে থাকল। পেরেকগুলো খাড়া করে বসাচ্ছিল। গোল মাথাটা মাটিতে আর ছুঁচোলো দিকটা ওপর দিকে।

কোনোটার তলায় শক্ত জমি, কোনোটার পাথর কিংবা খালি দেশলাইয়ের বাক্স। গাড়ির সবগুলো চাকাই পাংচার হতে বাধ্য।

বাবার ফেরার সময় হয়ে আসতে বলুর দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। বাবার গাড়িটাকে অনেকটা তফাতে থাকতেই ছুটে গিয়ে আটকাতে হবে। নইলে ওঁর গাড়িই নির্ঘাত ফেঁসে যাবে। তাই চোখ আর কান খুব সজাগ রেখেছিল।

কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্যরকম। অফিসের গাড়িটাকে অন্য পথে ঘুরিয়ে বাড়ির পিছন দিকে নিয়ে গেলেন বলুর বাবা।

যাক খুব বাঁচোয়া। তাকে কিছুই করতে হলো না।

কিন্তু বাবা কি তবে টের পেয়েছেন সে কিছু করে রেখেছে বাড়ির সামনেটায়?

বলু তাড়াতাড়ি ভেতর বাড়ির দিকে রওনা দিল।

শুনতে পেল বাবা মাকে বলছেন, 'দেখ নন্দিতা, এক-চক্ষু হরিণের গল্পটা মনে রেখ। আমরা ভাবছি লোকটা বাড়ির সামনের দিকে আসবে, আর সেই ভাবে তৈরিও রয়েছি কিন্তু হয়তো দেখা যাবে সে চলে এসেছে পিছনের রাস্তায়। তাই সব সম্ভাবনার জন্যেই তৈরি থাকতে হবে। এই পিছন দিকটাও টাইট বন্ধ রেখো।'

মা বললেন, 'তা না হয় রাখবো, কিন্তু তোমার ভাইকে এখন ফোন করে সব কিছু জানিয়ে রাখলে ভাল করতে না?'

'ওঃহো, ভেবেই রেখেছিলাম বাড়ি ফিরেই ফোন করবো। আর খেয়াল নেই, ভুলে গেছি।'

কৃষ্ণেন্দু ডায়াল ঘুরিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভাইকে পেয়ে গেলেন।

'কে কমলেশ নাকি?'

'হ্যাঁ দাদা, বলুন।'

বলু বুঝল এবার সব ফাঁস হয়ে যাবে। আগ বাড়িয়ে ফোন করার কথা জানতে পারলে বাবার কাছে বকা খেতে হবে মায়ের সামনে। তাই একটু আড়ালে সরে গিয়ে সে কান খাড়া করে শুনতে থাকে কাকুর সঙ্গে কি কথা হয়।

'শোন, এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে, একটা বদমাশ লোক সকালে ফোনে আমাকে শাসিয়ে গেছে কাল সকালে নাকি বলু আর বন্টিকে কেটে কুচি কুচি করে আমাকে ভেট পাঠাবে...অ্যাঁ তুই জানিস...এ কথা তোকে কে বলল?' [বলু মনে মনে প্রমাদ গুনল, এই রে এবার যে সাড়ে সর্বনাশ!] 'কী

বললি, খবর রাখাই তোর পেশা? তোর ইনফর্মার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে!' [বলু কাকুর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল, কত সহজে উনি ওকে আড়াল করে দাঁড়ালেন! অবিশ্যি মায়ের জন্যও সুযোগটা এসে গিয়েছে। মাকে শোনানোর জন্যে কাকুর প্রতিটি কথা বাবা রিপিট না করলে কাকুর কথাগুলো তার কানে আসতো না]

'বেশ আমি তা হলে তোর ওপরে নির্ভর করে থাকলাম! রেখে দিচ্ছি?'

ভেতরের ঘরে চলে যেতে যেতে বলু মনে মনে বলে, হে ভগবান, এবার তুমি আমাকে তরিয়ে দাও। বদমাশটা যেন গাড়ি হাঁকিয়ে সামনের দিকেই আসে! আমি ওকে একটু শিক্ষে দিতে চাই।

পরের দিন ভোর সকালেই যেন গাড়ির আওয়াজ কানে এল।

সঙ্গে সঙ্গে বলু ছুটে গেল বাইরের ঘরে। কাচের দরজা-জানলার কাঠের পাল্লা ওপরে-নিচে ছিটকিনি সেঁটে টাইট বন্ধ। জানলার খড়খড়ি একটু তুলে বলু চোখ রাখে বাইরে।

দৃশ্যটা মজার বৈকি! জিপের মতোই একটা খোলা গাড়িতে জনাচারেক বন্দুক হাতে লোক। সকলেরই চোখ কেমন ছানাবড়া হয়ে গেছে। কি থেকে কি হলো কিছুই ঠাওর করতে না পেরে সব চাকাগুলো উঁকিঝুঁকি মেরে দেখছে। চাকাগুলো ফুটো হয়ে যাওয়ায় গাড়িটা মাটিতে বসে যাচ্ছে। গাড়ির আর নড়বার ক্ষমতা নেই!

আসল বদমাশটাকে বলু চেনে না, কখনো দেখার সুযোগ আসেনি। তবে ওদের মধ্যে যে লোকটা মাথায় ঢ্যাঙা আর বন্দুকটা অন্য ধরনের (এই ধরনের বন্দুককেই কি অটোমেটিক রাইফেল বলে?) সে-ই হতে পারে। সে চিৎকার করে কি যেন বলল। বোধহয় গালাগালি দিল। তারপর উন্মাদের মতো এবাড়ির দরজা-জানালা লক্ষ্য করে দমাদ্দম গুলি ছুঁড়তে লাগল। দরজা-জানালা ফুটো হয়ে কাঠের চোকলা ছিটকে আসে, কাচ চুরমার, ঝন ঝন করে ছড়িয়ে পড়ে। বলুর বাবা মহাব্যস্ত হয়ে ছুটে আসেন।

'অ্যাই বলু, দেয়ালের আড়ালে সরে আয়। গুলি লাগলে মরে যাবি!'

বলুর ভয়-ডর একটু কম। বাবা হাত ধরে টানার আগেই লোকটার শেষ দশা দেখে নিল। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামার সময় কোথা থেকে একটা গুলি গিয়ে লোকটার হাঁটুতে লাগল। হাতের বন্দুক তো ছিটকে গেলই, লোকটাও মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

'দাদা, বেরিয়ে আসুন, আর ভয় নেই। সব কটাকে আমরা পাকড়াও করেছি। একজনও পালাতে পারেনি।'

[শারদীয়া ১৪০৬]

রিজার্ভ বাস

শ্রীনীরদচন্দ্র মজুমদার

বি. টি. রোড ছেড়ে বাসখানা পাশের একটা গলিতে ঢুকলো। খোয়া-ছড়ানো, উঁচু-নীচু গলি; চওড়া নয়। শৈলেশ যতদূর জানে, ও-গলির আশেপাশে লোকালয় বলতে কিছু নেই। বড় বড় বাগান আর টুকরো-টুকরো চষা ক্ষেত। ওপথে অত-বড় বাসখানা কোথায় যায়?

সাইকেল নিয়ে শৈলেশ সহরে যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো।

দু'ধারে দুটো কারখানার টানা দেওয়াল, উল্‌টো দিকে লোহার কাঠামো উঠছে চারতলা ফ্ল্যাট বাড়ীর জন্য। না একখানা দোকান, না একখানা বাড়ী। বি. টি. রোডে পায়ে হেঁটে কত লোক চলেছে, কিন্তু গলির মধ্যে জানলা-বন্ধ বাস-গাড়ীর সম্বন্ধে কারও এতটুকু কৌতূহল আছে বলে শৈলেশের মনে হলো না!

লোক খুঁজে জিজ্ঞাসা করতে গেলে বাস ততক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে।

পীচ-বাঁধানো বড় রাস্তা ছেড়ে এবড়ো-খেবড়ো গলিতে ঢুকলো সে।

শৈলেশের সন্দেহ একেবারে অকারণ নয়। মালিপাড়া থানা থেকে বেরুতেই বাসখানা তার নজরে পড়ে, সেই থেকে বরাবর সে ওর পিছনে আস্‌ছে। এই সুদীর্ঘ পথে গাড়ীটা একবার থামে নি, একটা লোক নামায়নি বা ওঠায় নি। তাছাড়া, ঝড় নয়, বাদল নয়, তবু বাসখানার জানলাগুলো সব সেঁটে-বন্ধ। কী আছে ওর ভিতর, যা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখবার জন্য এমন আগ্রহ?

ভাবতে ভাবতে শৈলেশ বাসের একটু বেশী কাছে এসে পড়েছিল বুঝি, হঠাৎ খড়াং করে বাসের পিছন দিককার মাঝের জানলাটা নেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম করে আওয়াজ।

শৈলেশ চমকে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে একটু উৎফুল্লও হলো।

সন্দেহ তার মিথ্যা নয়! সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে বাস গলিতে ঢোকে নি!

কিন্তু এখন নিজের দিকে মনোযোগ দিতে হয়।

মাথার দিকে তাগ করেই ওরা গুলি করেছিল কিন্তু চলতি-বাস থেকে চলতি সাইকেল লক্ষ্য করলে সে-লক্ষ্য ঠিক না হবার কথা। শৈলেশের মাথায় না লেগে গুলি লাগলো সামনের চাকায়। সাইকেল-সমেত শৈলেশ গড়িয়ে পড়লো রাস্তায়। নীরবে পড়লো না; গায়ে তার আঁচড় লাগে নি, গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তবু মর্মভেদী চীৎকার করে উঠলো।

তারপর, রাস্তায় পড়লো বলে রাস্তাতেই থাকবে, এমন কী কথা! ভাঙ্গা সাইকেল নিয়ে শৈলেশ নর্দমার দিকে এগিয়ে চললো উল্‌টি-পাল্‌টি খেতে খেতে! একেবারে মরণ-যাতনা যেন!

রাস্তার পাশে চওড়া নর্দমা, শৈলেশ গড়িয়ে তার মধ্যে পড়লো; সাইকেল রইলো তার মাথার উপর, রাস্তার ধারে।

বাস থেমে পড়েছে ওদিকে।

শৈলেশ যেখানে পড়েছে, সেখানে মাথার উপর একটা ঝাঁকড়া গাছ। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়! কাজেই জায়গাটাতে আলো ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। সেই আধ-আলো গর্তের মধ্যে থেকে অতি সাবধানে মাথা তুললো শৈলেশ।

আসছে! বাস থেকে নেমে একটা লোক দৌড়ে এদিকে আসছে!

শৈলেশ কাত হয়ে শুয়ে পড়লো নর্দমার ঢালুর উপর মাথা রেখে, ডান হাত কোটের পকেটের উপর......, সারা অঙ্গ নিস্পন্দ, কিন্তু চোখ দু'টি পিট পিট করছে,.....তাকিয়ে আছে সমুখ পানে।

পায়ের শব্দ কাছে এসেছে।

মাথার উপর সাইকেল, তার ওধার থেকে লোকটার জোর নিশ্বাস শোনা যায়। ঐখান থেকে ও যদি আর একবার গুলি চালায়, শৈলেশের ভবলীলা শেষ! আপশোষ হলো, সাইকেল থেকে পড়েই যদি উল্‌টো মুখে ভোঁ-দৌড় দিত, তা হলে এতক্ষণে নিরাপদ হতে পারতো হয়তো!

কিন্তু এ-রকম চিন্তা অন্যায়। তার কর্তব্য নেই? বাঁচবার জন্য কর্তব্যে হেলা করবে? কদাপি না।

পিট পিট করে চাইছে শৈলেশ। লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে এক-একবার। সাইকেলের ওধার থেকে গলা বাড়িয়ে ও দেখছে শৈলেশের অবস্থা। শৈলেশ নিশ্চল। নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলছে অতি-ধীরে, একেবারে নিঃশব্দে। শৈলেশ বেঁচে আছে বলে বুঝতে পারলেই ও গুলি করবে আবার!

গলির দু'দিকে কাঁটা তারে-ঘেরা বাগান। জনপ্রাণী কোথাও আছে বলে মনে হয় না।

বনবাদাড়ে ভরা নিরালা জায়গা......সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসছে চোখের সুমুখে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার মতই স্থান-কাল-পাত্র!

সাইকেলের ওধার থেকে ঝুঁকে পড়ে লোকটা অনেকক্ষণ ধরে দেখলো। জীবন যদি-বা থাকে, চেতনা নেই, এ-বিষয়ে বোধ হয় সে নিঃসন্দেহ হলো। তাই সে গর্তের ভিতর নেমে এলো। জামা-কাপড় পরখ করে শৈলেশের পরিচয় নেবার চেষ্টা, ও যে পুলিশের বা শত্রুপক্ষের চর—সেটা স্থির করতে পারলে ভোজালির একটি ঘা!

হাতের ভোজালি......সন্ধ্যার আঁধারেও তার ঝিকিমিকি।

লোকটা এসে হাঁটু গেড়ে বসেছে শৈলেশের সুমুখে, মাত্র এক ফুট তফাতে। ডান হাতে ছোরা, বাঁ-হাত শৈলেশের নাকের কাছে। নিশ্বাস পড়ছে কি না, বুঝতে চায়।

আর দেরী করা চলে না!

ডান-হাতখানা শক্ত হয়ে উঠেছে লোকটার, এখনই ছোরা মারবে। ঠিক সেই মুহূর্তে.....

কুণ্ডলী-পাকানো কেউটে যেমন ফণা তোলে, তেমনি করে তীরবেগে উঠে বসলো শৈলেশ,—তার হাতের পিস্তলের বাঁট এসে লোকটার কানের গোড়ায় সজোরে মারলো চোট।

একটি শব্দ করবার সময় পেলো না। জলে ডুবতে ডুবতে লোক যেমন হাঁই-ফাঁই করে, দু-একবার তেমনি করেই সে উল্‌টে পড়লো শৈলেশের পায়ের তলায়।

এবার পরখ করবার পালা শৈলেশের।

কিন্তু সময় নেই। রাস্তার দিকে গলা বাড়িয়ে দেখলো—ঘন-ঘন টর্চ পড়ছে বাসের জানলা থেকে। দেরী হলে আবার কেউ এসে পড়তে পারে! লোকটার পকেটে কটা জিনিস পাওয়া গেল—টর্চ, ক্লোরোফর্ম, সরু দড়ি—এই সব। জিনিসগুলো সমেত জামাটা ছাড়িয়ে ঐ দড়ি দিয়েই শৈলেশ তার হাত-পা শক্ত করে বেঁধে ফেললো; এবং জামাটা নিজের গায়ে চড়িয়ে হাতে নিলে ভোজালিখানা। তারপর মাথায় রুমাল বাঁধতে বাঁধতে সে এসে দাঁড়ালো রাস্তায়।

রাস্তায় টর্চ পড়ছে মিনিটে-মিনিটে। বাসের ভিতর থেকে কে-একজন মোটা চাপা গলায় বলে উঠলো—কেন যে এত দেরী করছে বেনোয়ারি!

যে টর্চ ফেলছিল, সে ফোড়ন কাটলো—আঠারো মাসে বচ্ছর। অথচ সব কাজে ওর এগিয়ে যাওয়া চাই।

তারপরই সে বলে উঠলো—ঐ যে! এসেছে, বাবু!

মাথা নীচু করে দৌড়ে আসছে বেনোয়ারি, মাথায় একটা রুমাল বাঁধা। বাস থেকে টর্চওয়ালা প্রশ্ন করে,—কাম ফতে?

হুঁ!—জবাব দিলে বেনোয়ারি। সঙ্গে সঙ্গে বাসের পাশ কাটিয়ে সে এসে পাদানিতে উঠে দাঁড়ালো। নীচুগলায় বললে—চলো।

ভিতর থেকে সেই মোটা গলায় প্রশ্ন—কী রে? খতম করে এলি?

—হুঁ!—জবাব দিলে বেনোয়ারি।

—পুলিশ?—আবার প্রশ্ন।

—হুঁ!—জবাব।

টর্চওয়ালা মাঝখান থেকে বলে উঠলো—মাথায় রুমাল বেঁধেছিস্ কেন বেনোয়ারি? জখম হোস্ নি তো?

—হুঁ!—চতুর্থবার বেনোয়ারি এই একই জবাব দিলে।

—দ্যাখো দেখি গেরো!—বাসের ভিতর থেকে চাপা স্বর অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলে উঠলো! মোটে আমরা চারটে লোক—তার মধ্যে একজন হলো জখম। কোথা থেকে যে পুলিশ জুটলো—ওদের টের পাবার কথা নয়! রিজার্ভ বাস্......জানলা বন্ধ—

বাস তখন মোড় ঘুরছে। দুটো হেড-লাইটের একটা বন্ধ আছে, অন্যটার উপর আচ্ছাদন চাপানো আছে বোধ হয়, না হলে তার আলো অত ঢিমে কেন?

সেই ক্ষীণ আলোতেই বেনোয়ারি দেখলো—প্রকাণ্ড লোহার গেট সুমুখে। তাতে মোহনবাগানের শিল্ডের মত মস্ত এক তালা।

চাপা গলা ভিতর থেকে বলে উঠলো... চাবি নে বেনোয়ারি.....গেট খোল্।

অন্ধকারের মধ্যে চাবি ঝন্ঝন্ করে উঠলো। বেনোয়ারি-বেশী শৈলেশ চাবি নিয়ে নেমে গেল গেটের দিকে। হেড-লাইটের আলো পড়েছে তার ঘাড়ে পিঠে পায়ে। ঘাড়ে রুমাল বাঁধা, গায়ে আসল বেনোয়ারির কোট। কিন্তু পায়ে......

যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। কর্তার চাপা গলা থেকে ঘড়-ঘড় করে একটা আওয়াজ, আর তাই শুনে শৈলেশের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই আশ্বস্ত হলো। না, কর্তার ভয় বা রাগের আওয়াজ নয়, হাসির শব্দ। হেসে তিনি বললেন—দেখেছিস্ বেন্দাবন, দেখেছিস্ হেবো, আমাদের বেনোয়ারি বাবুর গোটা পায়ে জুতো উঠেছে আজ! পুলিশ ব্যাটার জুতো-জোড়া ওর নজরে লেগেছে বুঝি। ও বেনোয়ারি, দাঁড়া, দাঁড়া, কাজটা উদ্ধার হোক, তোকে আমি মিলিটারী বুট কিনে দেবো! ঐ মেয়েলি সেলিম-শু কি তোর পায়ে মানায়?

খটখট-খটাং-খট শব্দে লোহার গেট তখন খুলতে সুরু হয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে শৈলেশ ভিতরে ঢুকে কপালের ঘাম মুছে ফেললো। সত্যি, কী মারাত্মক ভুলই সে করেছে! বেনোয়ারির পা খালি ছিল, নিজস্ব সেলিম পরে যে বেনোয়ারি সাজা চলবে না, এ খেয়াল সে করে নি!

ওদিকে বাস থেকে নামতে সুরু করেছে সকলে। গেটের পাশটিতে এমনভাবে দাঁড়িয়েছে শৈলেশ যেন তার মুখ না কেউ দেখতে পায়! তার জীবন একগাছি সরু সূতোয় ঝুলছে! গোয়েন্দা ব্যাটা বেনোয়ারির হাতে খতম হয়েছে শুনে বাসের কেউ একটিবার বলেনি, তাইতো, একটা খুন হয়ে গেল! এখন কী করা যায়? ওদের এই কুছ-পরোয়া-নেই ভাব থেকে মোদ্দা কথাটা শৈলেশ বুঝে নিয়েছে। সে-কথা—বড় কঠিন জায়গায় সে এসে মাথা গলিয়েছে.....বাঘের গত্ত! জীবন নিয়ে বেরুতে পারবে কিনা, সন্দেহ।

শৈলেশ ভাবছে, ওদিকে বেন্দাবন আর হেবো কী একটা ধরাধরি করে নামাচ্ছে বাস থেকে! হেবো হাঁকলো—তুই যে বড় রাজপুত্তুরের মত দাঁড়িয়ে রইলি বেনোয়ারি! ধর। বারো বছরের ছেলে হলে কি হবে, দুধে-ঘিয়ে মানুষ, ভারী আছে।

শৈলেশের সংকটমোচনে এগিয়ে এলেন কর্তা। চাপা গলায় ধমক দিয়ে বললো—নে, নে, ছোঁড়াটাকে মাটিতে ফেলিস নে বাপু! থানে থান ফেরত দিতে না পারলে ওর বাবার ঠেঁয়ে টাকা আদায় হবে না।

ফুটফুটে একটি ছেলে,......বছর বারো বয়স হবে। বাঁধা কাপড় দিয়ে মুখ, হাত-পা বাঁধা দড়ি দিয়ে। তাকে চ্যাং-দোলা করে গেটের ভিতর নিয়ে এলো ওরা। শৈলেশের পাশ দিয়েই তারা গেল। যাবার সময় কর্তাকে শুনিয়ে টিটকারি দিলে—থাক্ বেনোয়ারি তুই মালিকের কাছেই থাক্, একটা পুলিশ মেরে কর্তার পেয়ারের লোক হয়ে পড়েছিস্! এখন মাস-খানেক তোর সব মেহনৎ মাপ্!

শৈলেশ সে-টিটকারির জবাব দিলে না, জবাব দেওয়া চলে না। বাস যতক্ষণ চলছিল 'হুঁ, হাঁ' করেই কাজ চালিয়ে দিয়েছে; তা বলে এখন? বাপ্ রে!

কর্তা তখন বাস-ড্রাইভারকে বলছেন—তুমি ভাই গ্যারেজে ফিরে যাও, হীরা সিং, রাত্তিরের মধ্যেই নিজের জায়গায় হাজির হতে হবে তোমাকে। কাল আমি সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো। সাহেবের পাওনা, তোমার পাওনা সব আমি মিটিয়ে এসেছি; তবু সাহেবকে আর তোমাকে থ্যাংকস্ দিতে যাবো বই কি! এখন থেকে ফ্রেণ্ড হলুম কিনা!

হীরা সিংয়ের মুখের ভাবটা ঠাহর করতে পারলো না শৈলেশ, ড্রাইভারের সীটের কাছে আলো নেই। কিন্তু হীরা সিং যে কর্তার ফ্রেণ্ডশিপের আশ্বাসে খুব উল্লসিত হলো, তা মনে হলো না। বোঝা গেল তাকে চুপ করে থাকতে দেখে। মিষ্টি কথা দূরে থাক্, একটা রাম-রাম জাতীয় বিদায়-সম্ভাষণও তার মুখ থেকে বেরুলো না!

কর্তা এ নীরবতা লক্ষ্য করলেন। একটা অশ্রাব্য গালি তাঁর ঠোঁটের ডগা থেকে মৃদুভাবে পিছলে পড়লো। তিনি মিলিটারী কায়দায় গেটের দিকে পিছন ফিরলেন, তারপর হুকুম করলেন—বেনোয়ারি, তুই গেট বন্ধ করে আয়।

কর্তা ভিতর দিকে চলে গেলেন। শৈলেশ গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালো। বাস তখন ঘুরছে। হীরা সিংয়ের ষোল-আনা মনোযোগ এখন সুমুখে রাস্তার দিকে। এই ফাঁকে শৈলেশ নিঃশব্দে বাসের পিছনে ওঠে হীরা সিং যেন টের না পায়! বি. টি. রোডে বিজলী-আলোর নীচে গিয়ে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে, এই ঝিঁঝি-ডাকা আঁধারে খুনখারাবির স্মৃতিকে মর্মান্তিক দুঃস্বপ্ন ভেবে উড়িয়ে দিতে পারবে!

কিন্তু শৈলেশ তা করতে পারে না, সরকারী শান্তিরক্ষক হিসাবে পারে না.....স্বাধীন দেশের সাধারণ মানুষ হিসাবেও পারে না। ঐ যে হাত-মুখ-বাঁধা ছেলেটিকে ওরা ঐ জঙ্গলে-ঢাকা যক্ষপুরীর মধ্যে নিয়ে গেল, যতক্ষণ না ওকে উদ্ধার করছে ততক্ষণ নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করবার অধিকার তার নেই!

কাজেই নিঃশব্দে গিয়ে বাসের পিছনে সে উঠলো না, বেশ সশব্দেই ডাকলো—সর্দারজী! সঙ্গে সঙ্গে মাথার রুমাল হাতে নিয়ে তাতে পকেটের ক্লোরোফর্মের শিশি উজাড় করে দিলে। না, হীরা সিংকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে না।

—কেঁয়? বলে হীরা সিং ঘাড় ফেরালো।

—মালিকজী আপকো বাস্তে ইয়ে শও রূপেয়া বক্শিষ ভেজা!—বলতে বলতে এগিয়ে গেল শৈলেশ।

—বক্শিষ! শও রূপেয়া!—আঁধারে আলো জ্বলে উঠলো চট্ করে। টাকাটা গুনে নিতে হবে তো!

গাড়ীতে উঠে হীরা সিংয়ের সুমুখে দাঁড়ালো শৈলেশ। তার হাতে সাদা মত কী একটা রয়েছে! নোটের তাড়া হবে! হীরা সিং হাসিমুখে হাত বাড়ালো, বসে বসেই। কিন্তু শৈলেশের হাতের জিনিসটা হীরা সিংয়ের হাতে না এসে মুখের উপর এসে পড়লো। কি বিটকেল গন্ধ! হাত দিয়ে হীরা সিং ভিজে রুমালখানা নাকের উপর থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু বসা-অবস্থায় গায়ের জোর তেমন চলে না, তাতে আবার শৈলেশ নিতান্ত রোগা-পট্কা নয়। ক্লোরোফর্মের নেশায় হীরা সিং ক্রমে আচ্ছন্ন হয়ে এলো।

তখন কোটের পকেট থেকে বেরুলো দড়ি। হীরা সিংকে পিছ-মোড়া করে বেঁধে রেখে বাস থেকে নেমে এলো শৈলেশ। ওর মুখটাও বেঁধে রেখেছে, ওরই নিজের পাগড়ি খুলে।

বেনোয়ারির পকেট-থেকে-পাওয়া এই ক্লোরোফর্ম আর এই দড়ি! যা করেন জগদম্বা। এই দুই অস্ত্রে যদি শত্রুনিপাত না হয়, তবে আর কোনো উপায় নেই! পকেট-পিস্তলটা আছে বটে, কিন্তু গুলিগোলা চালানোতে বিপদ আছে। একটা লোক যদি মরেই যায় দৈবাৎ? না, না! হোক ডাকাত। তারও জীবন নেবার অধিকার কারও নেই, যদি-না একান্ত প্রয়োজন হয়ে ওঠে আত্মরক্ষার জন্য।

একটা আলোর রেখা এসে পড়েছে জঙ্গলে-ঢাকা বাড়ীটার ভিতর থেকে। সেই আলো লক্ষ্য করে খুব সাবধানে এগিয়ে চললো শৈলেশ। পায়ে কাঁটা-ঝোপ বাধছে। কতকাল থেকে বাড়ীটা পড়ো অবস্থায় আছে, কে জানে?

আলোর রেখা বেরুচ্ছে জানলার একটা চিড়-খাওয়া পাখির ফাঁক দিয়ে। তাইতে চোখ দিয়ে দাঁড়ালো শৈলেশ। ঘরের ভিতরটা বেশ দেখতে পাওয়া গেল। মিটমিট করে লণ্ঠন জ্বলছে—কর্তা বসে আছেন সেই বারো বছরের ছেলেটির কাছে। বেন্দাবন আর হেবো বসেছে কর্তার দিকে মুখ করে, একটু তফাতে।

অবাক্ শৈলেশ! কর্তা বেশ সুপুরুষ। লম্বা-চওড়া চেহারা; অর্থাৎ রং, চোখ-মুখ বড়ঘরের ছেলের মত! কিন্তু হলে হবে কী! একটা নিভাঁজ শয়তানির ছাপ এমন সেঁটে বসেছে চোখে-মুখে যে, সে দিকে তাকালে ভয় করে।

ছেলেটির মুখের রুমাল খুলে দেওয়া হয়েছে, পায়ের বাঁধনও। হাত দু'খানি তখনও দড়ি দিয়ে বাঁধা। একটা জিনিস শৈলেশের আশ্চর্য লাগলো। কর্তার সঙ্গে ছেলেটির মুখের চেহারায় মিল আছে।

এক ঠোঙ্গা খাবার হাতে নিয়ে কর্তা বলছেন—খাও প্রতাপ, খাও বাবা! তোমার ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়, খেয়ে নাও। আমার কাছে তোমার ভয় কি? আমার ঝগড়া যা-কিছু, তা তোমার বাবার সঙ্গে। তোমায় ধরে এনেছি শুধু তাঁকে জব্দ করার জন্য। দু' এক দিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে একটা মিটমাট হয়ে যাবে নিশ্চয়। তখন তোমায় আবার বাড়ীতে রেখে আসবো। খাও বাবা, খাও, এই যে আমি নিজে খাইয়ে দিচ্ছি তোমায়!

এই বলে একটা লেডিগেনি প্রতাপের মুখের কাছে তুলে ধরলেন কর্তা। ছেলেটা গোঁয়ার, দড়ি-বাঁধা দু'হাত তুলে কর্তার হাতে সে জোরসে ধাক্কা দিলে। লেডিগেনিটা ছিটকে গিয়ে পড়লো ও পাশে হেবোর নাকের উপর।

কর্তা রীতিমত রেগে গেলেন। আগুন-চোখে একবার প্রতাপের দিকে তাকিয়ে ঠোঙ্গাটা ঠেলে রাখলেন একপাশে। হেবো ততক্ষণে পড়ে-যাওয়া লেডিগেনিটা মুখে পুরেছে। তার দিকে ভ্রুকুটি করে কর্তা হাঁকলেন—যত সব ইয়ে হয়েছে! বেনোয়ারি গেট বন্ধ করতে গিয়ে পুলিপোলাও চালান হলো নাকি? বেরিয়ে দেখ্না হেবো!

হেবো লেডিগেনিটা শেষ করেছে। পাশে ঠেলে-রাখা খাবারের ঠোঙ্গার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে সে বেরিয়ে এলো। শৈলেশ অমনি জানলার কাছ থেকে সরে তফাতে গিয়ে দাঁড়ালো, ঝাঁকড়া গাছের পিছনে।

হেবো গেটের দিকে চলেছে। হঠাৎ কোথা থেকে কে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরলো। ভূত ভেবে যে চীৎকার করবে, চকিতে মুখের উপর এসে পড়লো একখানা ভিজে রুমাল।

এদিকে না আসে বেনোয়ারি, না আসে হেবো!

কর্তা ক্ষেপে উঠেছেন। যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ! উনি মজা দেখাবেন ওদের।—বেন্দা, দেখিস্ তো ছোঁড়াটাকে।—এই বলে তিনি ছুটে বেরুলেন ঘর থেকে। রাস্তার উপরে দুটো মানুষ জড়া-পটলা খাচ্ছে যেন? এ কী আবার? কর্তা ছুটে এসে টর্চ মেলে ধরলেন। সেই মুহূর্তে হেবোকে

বেঁধে রেখে শৈলেশ লাফিয়ে উঠলো, আর কর্তা ব্যাপার ঠাহর করবার আগেই সে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কিন্তু এবারে আর নিঃশব্দে শেষ হলো না ব্যাপার। কর্তা টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন কিন্তু পড়বার আগে 'বেন্দা' বলে আর্ত চীৎকার করে উঠলেন।

কর্তার চীৎকার শুনে বেন্দাবন ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল। কী হচ্ছে ওখানে? পুলিশ? না ডাকাত? না ভূত? ছেলেটাকে রেখে সে যায় বা কী করে? ওদিকে গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে ক্রমাগত। বেন্দা ছুটে বেরুলো ঘর থেকে। সুবিধা বুঝলে লড়াই করবে। প্রয়োজন বুঝলে চম্পট। যা-কিছু করুক, আগে দরকার ঘর থেকে বেরুনো।

বেরিয়ে এসে আরামের নিশ্বাস। না, পুলিশ নয়! ডাকাতও নয়!

ভূতই বা কৈ?

অতএব—সাহস করা যেতে পারে।

দুটো মানুষ মাটিতে জড়াজড়ি করছে। একটার গলা থেকে গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। এর মধ্যে কোন্‌টা কে? তৃতীয় ব্যক্তিই বা কোথায়?

কিন্তু চিন্তার সময় পরে। আপাতত এ লোক দুটোর মারামারি বন্ধ করা দরকার।

কর্তা অজ্ঞান অসাড় হয়ে পড়েছেন, এমন সময় শৈলেশের গলা টিপে ধরলো বেন্দাবন। কে তুমি? শীগ্‌গির বলো! কর্তা? হেবো? বেনোয়ারি?

শৈলেশ উবুড় হয়ে পড়ে ছিল কর্তার উপর। এখন উপর থেকে তার গলা টিপে ধরেছে বেন্দাবন। ওঠবার চেষ্টা করলে বেন্দা গলায় এমন চাপ দেবে যে দম বন্ধ হবার জো। সে-চেষ্টা বন্ধ করলে তবেই বেন্দা তার বজ্র-আঁটুনি শিথিল করছে একটু! এবং কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন—কে তুমি? কর্তা? হেবো? বেনোয়ারি?

মাঝে মাঝে 'হুঁ, হুঁ' করছে শৈলেশ। কিন্তু বেন্দাবন সন্দিগ্ধ, সে বলছে—হুঁ নয়! কথা বল! বল—আমি কর্তা, কি আমি হেবো, কি আমি বেনোয়ারি! নাম বলতে তোমার কি হয়েছে?

তবু নাম বলে না লোকটা।

বেন্দাবনের সন্দেহ বেড়ে উঠলো। বেনোয়ারির পায়ে জুতো দেখা গিয়েছিল তখন, বেনোয়ারির মুখ তারা কেউ দেখতে পায় নি অনেকক্ষণ। বেনোয়ারি ক্রমাগত হুঁ আর হাঁ দিয়ে এসেছে বাসে ফিরে আসবার পর থেকে! এখন আবার এই খুনোখুনি ব্যাপার নিজেদের মধ্যে! তাহলে—

বেনোয়ারি সত্যিকারের বেনোয়ারি বটে তো? না, বেনোয়ারির বেশে পুলিশের চর?

—কথা না বললে আমি মেরে ফেলবো তোকে উল্লুক গোয়েন্দা!—কেউটের মত হিস্‌-হিস্‌ করছে—বেন্দাবন। শরীরে শক্তি তার কম নয়, তার উপর শৈলেশ রয়েছে মুখ থুবড়ে, ও তার পিঠের উপর হাঁটু বসিয়ে দিয়ে প্রাণপণ বলে টিপে ধরেছে গলা।

শৈলেশ ভাবছে আর রক্ষা নেই!

হঠাৎ বেন্দাবন চীৎকার করে উঠলো। পিছন থেকে তার চুল ধরে কে টানছে! দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে টানছে......, মুঠোয় ধরে মাথার সমস্ত চুল উপড়ে নিচ্ছে! যে পরিত্রাহি চীৎকার করে লাফিয়ে উঠলো! শৈলেশকে ছেড়ে দিয়ে হাত ধরলো এই নতুন শত্রুর!

দুর্বল বালক! তার উপর হাত দু'খানা এখনো দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার হাত থেকে মাথার চুল ছাড়িয়ে নেওয়া বেন্দাবনের এক সেকেণ্ডের কাজ। কিন্তু সেই এক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার সর্বনাশ! কানের গোড়ায় প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে সে পড়ে গেল।

কর্তাকে আর বেন্দাবনকে যথারীতি বেঁধে রেখে প্রতাপকে নিয়ে বাসে ফিরে এলো শৈলেশ। প্রতাপের হাতের বাঁধন সে আগেই খুলে দিয়েছে।

এবার হীরা সিংয়ের বাঁধন খুলতে হবে। ওর তখন জ্ঞান হয়েছে। প্রতাপ গিয়ে পিছনে দাঁড়ালো

পিস্তল উঁচিয়ে। প্রতাপকে দিলে বেনোয়ারির কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া ভোজালিটা। সেই ভোজালি দিয়ে হীরা সিংয়ের বাঁধন কেটে দিতে লাগলো প্রতাপ।

—সোজা নর্থ ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনারের অফিসে বাস নিয়ে চলো হীরা সিং। একটু এদিক-ওদিক করেছো কি মাথার খুলি উড়ে যাবে তোমার। এই আমি পিছনে দাঁড়িয়ে আছি—পিস্তল নিয়ে।

রাত এগারোটা,—ডেপুটি কমিশনার তখনো মোহিতবাবুর সঙ্গে বসে চিন্তাকুল মনে। স্কুল থেকে ফেরবার পথে মোহিতবাবুর ছেলে চুরি হয়ে গেছে। দারোয়ান সঙ্গে ছিল, তাকে পাওয়া গেছে কলাবাগানের ভিতর অজ্ঞান অবস্থায়। কলাবাগানের রাস্তা সোজা হয় বলে সে খোকাবাবুকে নিয়ে সেই পথে আসছিল, এমন সময় কোথা থেকে গোটা চারেক লোক হঠাৎ সামনে এসে পড়ে। তাদের একজন কাপড়ের ভিতর থেকে লোহার ডাণ্ডা বার করে তার মাথায় এমন জোরে মারে, তখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

সে খবর পেয়ে মোহিতবাবু ডেপুটির কাছে এসে পড়েছেন। চারিদিকে থানায় থানায় টেলিফোন, শিয়ালদা-হাওড়ার ষ্টেশনে, বড়বাজারের সমস্ত গুণ্ডার আড্ডায় স্পাই পাঠানো—হুলুস্থুল চলেছে সেই থেকে। মোহিতবাবু ধনকুবের, এবং ডেপুটি সাহেবের ব্যক্তিগত বন্ধু।

রাত এগারোটায় ক্লান্ত হয়ে ডেপুটি এসে জানলায় দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ বলে উঠলেন—আরে মলো, একখানা বাস ধরে নিয়ে এলো কে? আবার রিজার্ভ বাস!

চকিতে মোহিতবাবু হারানিধি ফিরে পেলেন। এবং দশ মিনিটের মধ্যে সেই রিজার্ভ বাস ফিরে চললো সেই বাগান-বাড়ীতে। এবার পুলিশ ফোর্সে ভর্তি। রাস্তার নর্দমায় পড়ে আছে বেনোয়ারি, শৈলেশের সাইকেল, এবং বাগানে পড়ে আছেন মোহিতবাবুর ভাই দীনেশ। তাঁর সঙ্গে আছে হেবো বেন্দাবন নামজাদা দুটো গুণ্ডা। সবাইকে আনতে হবে তো!

মোহিত, দীনেশ সহোদর ভাই। পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল দশ বছর আগে। সেই থেকে নানা বদ খেয়ালে দীনেশের সর্বস্ব উড়ে গিয়েছে, ওদিকে হিসাবী মোহিতবাবুর টাকা বেড়ে উঠেছে দশগুণ। ভাইয়ের প্রয়োজন-মত—প্রচুর সাহায্য এযাবৎ মোহিতবাবু করেছেন; কিন্তু কত টাকা লোকে জলে ফেলতে পারে? ইদানীং মোহিতবাবু বলেছিলেন—আর আমার কাছে রেস্ খেলবার টাকা তুমি পাবে না দীনেশ! তার দরুণ এই ছেলে-চুরি। দীনেশকে তাঁর কুসঙ্গীরা বুঝিয়েছিল—ছেলেটাকে এনে গুম্ করে রাখলে দু'এক লাখ টাকা মোহিতবাবুর কাছ থেকে অনায়াসে বেরুতে পারে!

বেরুতো সম্ভবতঃ, যদি না সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সহরের দিকে যেতে যেতে রিজার্ভ বাসখানা শৈলেশের চোখে পড়ে যেতো।

মোহিতবাবু শৈলেশের হাত দু'খানি ধরে বললেন—তুমি যাহোক একটা কিছু জিনিস আমার কাছে চেয়ে নাও বাবা! কী করলে আমি কৃতজ্ঞতা—

শৈলেশ বললে—কৃতজ্ঞতার কথা যদি তোলেন, আমিই ঋণী কম! প্রতাপ এসে বেন্দার চুল ধরে টেনে না তুললে আমি তখনই শেষ হয়ে যেতুম! খুব সাহসী ছেলে আপনার প্রতাপ!

[আষাঢ় ১৩৬০]

সোনার তাল

শ্রীধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

> নরকের শয়তান ধূর্ত্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু তার চেয়ে ধূর্ত্ত মানুষ—চুরি-জোচ্চুরি যাদের ব্যবসা। কিন্তু পুলিশ কি তাদেরও চেয়ে বেশী ধূর্ত্ত বলে স্পর্দ্ধা জানাতে পারে না?

ভোঁ, ভোঁ, ভোঁ! শীতকাল। ভোরের কুয়াসা ঠেলে প্রকাণ্ড বিদেশী জাহাজখানা বন্দরে এসে ভিড়ছে। জলে কি ভস্‌ভসানি! মনে হয় যেন এক অতিকায় দৈত্য সাত সমুদ্র পার হয়ে এসে হাঁফাচ্ছে!

যে-কাঠের পুলটা বেয়ে যাত্রীরা জাহাজ থেকে তীরে আসবে তার ধারে ধারে দাঁড়িয়ে পড়েছে কাষ্টম্‌সের কয়েকজন অফিসার। অফিসারদের মধ্যে একজন ছদ্মবেশী নবীন আড্ডি। পাকা ডিটেকটিভ বলে তার নাম। তাই বিশেষ বিশেষ কাজে তার ডাক পড়ে। আজকের ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে সে।

একটা আন্তর্জ্জাতিক দল কিছুকাল ধরে আফ্রিকা থেকে বেআইনীভাবে ভারতে সোনা আমদানী করে ব্যবসা চালাচ্ছে। এ দলে আছে নানা জাতের লোক—ইংরেজ, চীন, আরব, বাঙ্গালী পর্য্যন্ত। এদের বে-আইনী কাজের কথা জানলেও কাষ্টম্‌স্ শত চেষ্টাতেও এ পর্য্যন্ত হাতে-নাতে কাউকে ধরতে পারেনি। এমনি এদের কারসাজি! সরকারী অফিসাররা কতবার জাল ফেলেছেন, কিন্তু মিথ্যা হয়েছে তাঁদের সব আয়োজন—চালাক মাছের মত সে জাল কেটে বেরিয়ে গেছে দলকে দল—কাজেই অবাধে চলেছে তাদের কারবার!

এবার এডেন থেকে গোপন খবর এসেছে—দলের এক পাণ্ডা কিছু সোনার তাল নিয়ে উঠেছে এই জাহাজে। সে কে, কি করেই বা বে-আইনী সোনা নিয়ে আসছে তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি এখনও। তাই ভারতের বন্দরে শেষ ফাঁদ পাতা হয়েছে বিরাট আয়োজনে। নবীন এবং কাষ্টম্‌সের আর-সব লোক ওৎ পেতে আছে চোখ-কান সজাগ রেখে ফলাফলের প্রতীক্ষায়।

যাত্রীরা একে একে পুল পার হয়ে আসছে কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে। কত দেশের লোক এ যাত্রীর দলে!

গণ্যমান্য এবং স্বনামধন্য লোক ছাড়া আর সব যাত্রীরই লগেজ তল্লাসীর ব্যবস্থা হয়েছে। তার উপর যাদের সন্দেহ হচ্ছে তাদের দেহ-তল্লাসীও হবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। নবীন তাই ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিচ্ছিল কোন্ কোন্ যাত্রীর দেহ-পরীক্ষা হবে।

স্যুট্ গায়ে ওভারকোট চাপানো সুপুরুষ এক যাত্রী চলেছে মন্থরগতিতে। চেহারা দেখে বোঝা কঠিন কোন্ দেশের লোক! দেহের বর্ণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, টানা টানা চোখ, বলিষ্ঠ দেহ। কোলে মাঝারি সাইজের চমৎকার একটি কুকুর, যাকে বলে ল্যাপ-ডগ্। হাল্‌কা বাদামী আর হাল্‌কা হলদে রঙের লোমে ঢাকা, ঠাণ্ডা না লাগে সেজন্য বুকে-পিঠে বাঁধা শ্যাময় লেদারের আচ্ছাদন। ছোট দুটি চোখে চকিত চাহনি যেন নতুন দেশ আর এত লোকজন দেখে ভয় পেয়েছে! দেখলেই বোঝা যায়, মালিকের খুব আদরের কুকুর।

আরও কয়েকজন যাত্রীর দেহ-তল্লাসীর ইঙ্গিত জানিয়ে নবীন ফিরে এলো অফিস-কামরায়। একটু

যেন হতাশ হয়ে পড়েছে। সন্দেহ করার মত যাত্রী খুঁজে পাওয়া গেল না, কার মালপত্রে কিভাবে সোনার তাল লুকোনো আছে কি করে ধরবে?

যেখানে যাত্রীদের দেহ-তল্লাসীর ব্যবস্থা, সে এইবার গেল সেখানে। কিছুক্ষণ রইলো নবীন। তারপর লগেজ-তল্লাসীর কামরায় এসে দেখে বেশ ভীড়! একে অসংখ্য যাত্রী—তায় মালপত্রের বহর! প্রত্যেকটি বাক্স-পেঁট্‌রা, বিছানাপত্তর তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে, কিন্তু পণ্ডশ্রম! অযথা বিলম্বের জন্য কোন কোন যাত্রীর মুখে ফুটে উঠেছে বিরক্তির তপ্ত বচন। কুকুর কোলে সুবেশী লোকটিকেও দেখলো নবীন। বেঞ্চে বসে আছে, কুকুরটাকে কোল-ছাড়া করেনি নিমেষের জন্য। মালিকের বুকে মুখ গুঁজে পড়ে আছে নিরীহ জীব!

নবীন একবার চারিদিক তদারক করে আস্‌তে আস্‌তে লক্ষ্য করলো—লোকটি মালপত্র পরীক্ষার দেরী দেখে হয়তো অধীর হয়ে কুকুরটাকে মাটিতে নামিয়ে এক পা এগিয়ে গেল। নিশ্চল পাথরের মত কুকুরটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে নবীন তার গায়ে হাত বুলোবার লোভ সামলাতে না পেরে হাজির হলো। কিন্তু কুকুরের মালিক তখনি ঘুরে এসে তাকে বুকে তুলে নিল।

গায়ে পড়ে নবীন বললে, "আপনার কুকুরটি ভারী চমৎকার! দেখলেই কোলে তুলে নিতে ইচ্ছা করে।"

একটু চুপ করে থেকে লোকটি বিশুদ্ধ ইংরেজীতে উত্তর দিলে,—"হ্যাঁ, অতি নিরীহ ফরাসী ল্যাপ-ডগ্, এখানকার জল-বাতাস সইবে কি না জানি না। ভারী সাবধানে রাখতে হচ্ছে।"

—"আপনি এক কাজ করুন না—ওকে আমার কাছে দিয়ে আপনার জিনিষের কতদূর কি হলো খোঁজ নিয়ে আসুন চট্ করে। আমি বড্ড কুকুর ভালোবাসি,—ওকে ঠিক রাখতে পারবো।"

—"না, ধন্যবাদ। অন্যের কোলে এ যেতে চায় না। জোর করে নিলে কামড়ে দিতে পারে। আমি না হয় আর একটু অপেক্ষা করি।"

নবীন একটু আহত হয়ে ভীড়ের অপর অংশে জনতার মধ্যে মিলিয়ে গেল। কিন্তু, তার চোখ রইলো সেই দিকেই—সেই সুন্দর কুকুরটির দিকেই।

দূর থেকে নবীন লক্ষ্য করলো, লোকটি এক-একবার নিজের হাত-ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল, আর মুখ ফিরিয়ে কাকে যেন খুঁজছে—এমনি ভাব!

সহসা একটা তীব্র শীষের আওয়াজ শুনে চম্‌কে উঠ্‌লো নবীন! ঘর থেকে যাত্রীদের বাইরে যাবার যে পথ—সে পথের দিকে কোমর-উঁচু রেলিংটার ওপাশে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বেঁটে একটা লোক, ঠোঁটে হাত দিয়ে আবার শীষ দেবার উপক্রম কর্‌ছে!

কুকুরের মালিক হঠাৎ নবীনকে দেখে, নবীনের দৃষ্টি অনুসরণ করে বলে উঠ্‌লো, "আমার নেপালী ড্রাইভার এসে গেছে,—কুকুরটাকে নিয়ে সে গাড়ীতে বসে থাক্‌তে পারবে।"

সঙ্গে সঙ্গে যে কুকুরটাকে সন্তর্পণে নাবিয়ে আঙ্গুল দিয়ে বাইরের সে লোকটাকে দেখিয়ে একটা শব্দ করলো। কুকুরটা যেন নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বে গজেন্দ্র-গমনে এগিয়ে গেল রেলিং-এর ধারে। বেঁটে লোকটাকে দেখে আস্তে আস্তে লোমশ ল্যাজটা নাড়তে লাগ্‌লো, কিন্তু পরিচিত মানুষের কোলে উঠ্‌বার জন্যে যে উৎসাহ স্বাভাবিক, সেরকম কিছু দেখা গেল না। লোকটা নিজেই রেলিং-এর ওপর দিয়ে নুয়ে কুকুরটাকে তুলে নিল তার চার-পা এক করে।

এমন চমৎকার কুকুরের ওপর থেকে নবীনের চোখ যেন ফিরতে চায় না! একটু পরে একজন সহকর্ম্মীর কানে কানে কি বলে সে ঘর থেকে বেরুলো—পিছনে অনুচর নিয়ে। মনে হলো, হঠাৎ সে যেন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে!

কুকুরটিকে বুকে চেপে মালিকের ড্রাইভার গাড়ীতে উঠতে যাবে, এমন সময় দূর থেকে নবীন চেঁচিয়ে তাকে বললো অপেক্ষা করতে। কিন্তু সেকথা গ্রাহ্য না করে সে মোটরে ষ্টার্ট দিল। নবীন অমনি রিভলভার বার করে গুলি ছুঁড়ল টায়ার লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল গাড়ীর কাছে। তারপর মাথা গলিয়ে কুকুরটার গায়ে হাত দিতেই ড্রাইভারটা উঁচিয়ে ধরলো চক্‌চকে একখানা ধারালো

ছোরা। নবীন চট্ করে তার কব্জী ধরে না ফেল্‌লে হয়তো একটা খুনোখুনি হয়ে যেত! অনুচর দুজন সহজেই করায়ত্ত করলো ড্রাইভারকে।

কুকুরটিকে কোলে তুলে তার বুকে, পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে আনন্দে অধীর হলো নবীন। তাড়াতাড়ি ফিরে এলো মালখানায়। নবীনের কোলে কুকুর দেখে বিস্ময়ে তার মনিবের চোখ উঠ্‌লো কপালে। তাকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে নবীনের ইসারায় তার হাতে লাগানো হলো হাত-কড়ি। সকলে অবাক্।

নিমেষে নবীন লোমে-ঢাকা জীবটির চামড়ার জামা খুলে ফেল্‌তেই তার বুকের নীচে থেকে বেরিয়ে পড়্‌লো বাদামী কাগজে জড়ানো কম পক্ষে পাঁচ সেরী, প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের সোনার তাল!

সহকর্ম্মীদের প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে নবীন বলে—কুকুরের মালিকের আচরণে তার সন্দেহ হয়। লোকটির কথায় অসামঞ্জস্য ছিল অনেক। নিতান্ত নিরীহ পোষা জীব অথচ অপরের কোলে গেলে কাম্‌ড়াবে,—ফ্রান্স থেকে সবে নিয়ে-আসা কিন্তু এম্‌নি তার শিক্ষা যে মালিকের ড্রাইভারকে সদ্য এই প্রথমবার দেখেই দিব্যি আশ্রয় নেয় তার কাছে,—ড্রাইভার নাকি নেপালী কিন্তু তার চ্যাপ্টা নাক আর কুত্‌কুতে চোখ দেখে চীনা বলে মনে হয়। লোকটি নিজেও চীনা কিন্তু নিজের স্বরূপ বদ্‌লে ইউরোপীয় নাম লিখিয়েছিল। পরণে সাহেবী পোষাক হলেও নবীনের সজাগ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি! ইংরেজী কথা বলার ভঙ্গিতেই নবীন বুঝেছিল তার আসল পরিচয়। তার উপর কুকুরটার গতিবিধি দেখে নবীনের আরো সন্দেহ হয়। পাঁচ সেরী ওজনের জিনিসের ভারে নুয়ে পড়েছিল জীবটি, অতি কষ্টে যেন সে চলছিল! পোষা কুকুরের মত লাফঝাঁপ দেওয়া দূরের কথা, পরিচিত লোককে দেখেও নড়ে না, এমন কি লাঙ্গুল সঞ্চালনেও তাকে বেগ পেতে হচ্ছিল বেশ!

এ ব্যাপারে নবীনের কেরামতির কি তারিফই না করলো সকলে! কিন্তু নবীন বললে—"কেরামতি ওদের। এ কাজে কুকুরকে এমন তৈরী করেছে যে, বাহাদুর পুরুষ বলে তাকে স্বীকার করতেই হবে!"

[বৈশাখ ১৩৬১]

কিরণ-ভবন

শ্রীসুষমা সেন

জি.টি. রোড থেকে যে রাস্তাটা বেরিয়ে গোবিন্দপুর পাহাড়ের কোলে মোচড় খেয়ে বেকার বাঁধ ঘুরে সোজা ধানবাদ ষ্টেশনে এসে থেমে গেছে, সেই রাস্তার ধারে হীরাপুর অঞ্চলে একটা মস্ত বড় বাড়ী ছিল। বাড়ীর নাম 'কিরণ-ভবন'। সাবেকী আমলের বাড়ী। বহু বৎসরের পুরানো হলেও ইট-চূণ খসে যায়নি। পথচলা পথিক রাস্তা দিয়ে চলে যাবার মুহূর্ত্তে থমকে দাঁড়িয়ে বাড়ীটার অপাঙ্গে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিত। সেই দৃষ্টিতে ছিল অহেতুক কৌতূহল ও অদ্ভুত ভীতি। অথচ মানুষের মনের এই বিহ্বলতার সদুত্তর আজো পাওয়া যায় না।

কেউ কোন দিন কোন লোমহর্ষক মূর্ত্তি দেখেনি ঐ দোতলা বাড়ীর কদাচিৎ উন্মুক্ত জানলার ধারে, কিংবা কার্নিশে-বসা পায়রাগুলোর প্রকৃতি এমন কিছু অনন্যসাধারণ ছিল না, তবুও লোকের ভ্রূ কুঁচকানো চাউনি বার বার আঘাত পেয়ে ফিরে আসতো পথের উপর।

এই কাহিনী কিন্তু কিরণ-ভবনকে নিয়ে নয়। কিরণ-ভবনের অদূরে কেরাণী বাবুদের মেসবাড়ী আছে। কিরণ-ভবন পরোক্ষভাবে মেসের সঙ্গে শুধু জড়িত। তাই আজো ঐ ভবন রহস্যাবৃত বিভীষিকাময়। আরো পাঁচটা রাত্রের মতনই একদিনের একরাত্রে ব্যাপারটা সংঘটিত হোল।

রাত প্রায় দুটো।

কিরণ-ভবনের মালিক ডাঃ সরকার গভীর নিদ্রায় অভিভূত। পারিপার্শ্বিক গাঢ় নিস্তব্ধতার সুযোগে তাঁর নাসিকা গর্জ্জন ক্রমশঃ উঁচু স্তরে উঠছে...এমন সময়ে ফোন বেজে উঠলো ঝনঝন কোরে।

ডাক্তার মানুষ...মুহূর্ত্তে নিদ্রা টুটে গেল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এসে ফোন ধরলেন। ভাবলেন হয়ত দূরের কোন 'হোপলেস্' কেসের জরুরী কল্। ছোট ডাক্তারদের বাতিল হওয়া কোন রুগীর অন্তিম আহ্বান। হয়ত তাই বলা যেতে পারতো কিন্তু কেস্ শুনে তিনি একটু মুষড়ে পড়লেন।

"হ্যালো! ডক্টর সরকার স্পিকিং।"

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে যে স্বর ভেসে এল, সেই স্বরাধিকারী এমন কিছু দূরের লোক নয়। ঐ কেরাণী-মেস থেকেই সুবোধ দাস নামে একজন বোর্ডার ফোনে ডেকে ছিল তাঁকে।

আরো একজন বোর্ডার। নাম কোহিনুর রায়। হঠাৎ একবার বমি করে অজ্ঞান হয়ে যায় কোহিনুর। এখন পেটের যন্ত্রণায় ভয়ানক কাতরাচ্ছে সে। কথা বলতে পারছে না...অবস্থাটা খুব ভাল ঠেকছে না। ডাঃ সরকার অবিলম্বে কোহিনুরকে যেন দেখতে আসেন।

ফোন রেখে দিয়ে ঘুমোবার পোষাক পরিবর্ত্তন করতে করতে ডাঃ সরকার কিছুক্ষণ ভাবলেন...তাইতো এত রাত্রে...কোন দুষ্ট লোকের ছল নয় তো? কারু সাথে শত্রুতা আছে নাকি তাঁর! যদি রাস্তায় একলা পেয়ে গাড়ী আটক করে খুন..........!!

চিন্তা করতেই তাঁর সারা অঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠে।

খুন কথাটা এতই রোমাঞ্চকর! হয়ত কাল সকালে প্রথম পথচারী তাঁর লাশ পড়ে থাকতে দেখে চীৎকার করে লোক জড় করবে।

নাঃ এসব তিনি কি আজে-বাজে ভাবছেন! যতই হোক্ তিনি ডাক্তার। তাঁর কর্ত্তব্য...তাঁকে যেতেই হবে...সে মৃত্যুর গহ্বরেই হোক্ বা কেরাণীকুলের গুহায়ই হোক্।

ডাঃ সরকার হ্যাণ্ডব্যাগে কতকগুলো ওষুধ ভরে নিয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন।

"কঁ্যা-কঁ্যা-চ!"

হঠাৎ কোথায় যেন শব্দ! এক মুহূর্ত্ত...ডাঃ সরকার চকিতে সরে এসে নীচে একটা বড় থামের আড়ালে দাঁড়ালেন। কে? দোতলায় মুখ তুলে চাইলেন। বৈষ্ণবের পড়ার ঘর থেকে আলো বেরুচ্ছে। বৈষ্ণবদাস ডাঃ সরকারের মেজ ভাই। বৈষ্ণব তো এত রাত অবধি পড়ে না। পড়ছে নাকি? তা পড়ুক গে।

আবছা অন্ধকারের আড়ালে ডাঃ সরকার দ্রুতপায়ে গ্যারেজে এলেন। ধীরে ধীরে গাড়ী বার করে নৈশ অন্ধকারের মধ্যে জোর স্পীডে ছুটিয়ে অদৃশ্য হোলেন।

রাত্রির তমসা ভেদ করে ধক্ ধক্ করে ছুটে চল্‌ল B R R *3237*।

দুই

কোহিনুরকে পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ান ডাঃ সরকার। মেসের অন্যান্য বাসিন্দারা বিছানা ত্যাগ করে জড় হয়েছে ততক্ষণে। ডাঃ সরকার গম্ভীর গলায় বললেন, "সুবোধবাবু! আমি ভাল বোধ করছি না, 'পাল্‌স' সিঙ্ক করছে...হাত-পা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, আর তাছাড়া কেস আপাততঃ আমার চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। আমার মতে এঁকে এখুনি সিভিল হসপিটালে সরিয়ে ফেলা উচিত। মারাত্মক তীব্র বিষ এঁর পেটে গেছে কোন প্রকারে।"

পরমুহূর্ত্তেই এ্যাম্বুলেন্সে ফোন করা হোল।

ডাঃ সরকার ঘটনাটা পুরোপুরি সুবোধের মুখ থেকে শুনলেন। কি করে এমন হোল।

রাত তখন সাড়ে এগারোটা। হঠাৎ বমি করার শব্দ পেয়ে সুবোধ বাইরে উঠে আসে। কে বমি করছে এত রাত্রে? বাইরে সিঁড়ির কাছে উবু হয়ে বসেছিল কোহিনুর। তার বিবর্ণ চোখে-মুখে নীল ছাপ। কোন বিষাক্ত দ্রব্যের প্রভাবে সারা দেহ তার কাঁপছিল। আড়ষ্টভাবে কয়েকটি কথা সে সুবোধকে বলেছিল। তারপরই সুবোধ অন্যান্য বোর্ডারদের ডেকে তুলে নিজেরাই একটা কিছু বন্দোবস্ত করবার চেষ্টা করে, যাতে কোহিনুর কিছুক্ষণের জন্যেও আরাম পায়; কিন্তু অবস্থা তার ক্রমশঃ খারাপের দিকে মুখ নেওয়ায় ডাঃ সরকারকে কল দেওয়া হয়।

প্রত্যহ রাত এগারোটা অবধি কোহিনুর বাতি জ্বেলে 'ক্রসওয়ার্ড প্যাজেল' সমাধান করতো। আজ যে কিসে থেকে এমন হোল কোন ধারণাই তারা করতে পারছে না। কোহিনুর নিজেও কিছু বলতে পারলো না।

ডাঃ সরকার থাকতে থাকতেই অন্য আরেকজন ডাক্তার হাজির হোলেন। ইনিও নামকরা স্থানীয় ডাক্তার। কোন বোর্ডার হয়ত ফোন করেছিল এঁকে।

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী দেখে শুনে বললেন, "এযে দেখছি খতম হয়ে এসেছে। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে আর কি হবে? সোজা থানায় নিয়ে যান,—সন্দেহ হয় কেউ বিষ প্রয়োগে এঁকে হত্যা করেছে।"

দুই ডাক্তার পরস্পর আলাপ-আলোচনা করতে করতে নেমে এলেন রাস্তায়। এ্যাম্বুলেন্সের গাড়ী আর হাসপাতালে না গিয়ে সোজা থানায় ছুটলো।

হত্যা? একটিমাত্র শব্দ। কেরাণী-মেস নিথর স্পন্দনহীন হয়ে গেল।

তিন

"কি ব্যাপার মিঃ প্রসাদ! এত সকালে হঠাৎ তলব করেছেন যে?" বে-সরকারী গোয়েন্দা শৈলেন চৌধুরী মৃদু হেসে ধানবাদ থানা অফিসে প্রবেশ করলো।

মুখ তুলে স্বাগত জানিয়ে ইন্সপেক্টর স্মিত হেসে বল্‌লেন, "দায়ে পড়েছি। বসুন। বল্‌ছি।"

মিঃ প্রসাদ কয়েকটি কাজ দ্রুত শেষ করতে লাগলেন। হাতের শেষ ফাইলটা একটা পিয়নের হাতে তুলে দিয়ে বলেন, "ছোটা সাহেব কা কামরামে—"

"রাত প্রায় সাড়ে তিনটের সময়ে এ্যাম্বুলেন্সে করে জন কতক ছোকরা একটা ডেড্ বডি থানায় হাজির করে। তারা বলে কোহিনুর নামে মৃত ব্যক্তিটি সুইসাইড করেছে মনে হয়। ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর কাছে সার্টিফিকেট চেয়েছিল, ডাক্তারের সন্দেহ হওয়ায় তিনি লাশ পুলিসে চালান দিতে বলেছিলেন। খোঁজ-খবর নিয়ে দেখি, কেউ ভাল করে কিছু বলতে পারলো না..."

"কোথায় থাকতো সে?"

"কেরাণী-মেসে!"

"চলুন না লাশটা দেখি একবার।"

"হ্যাঁ! নিশ্চয়ই; আমি মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলাম।" বলে মিঃ প্রসাদ ও শৈলেন দুজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে ঘটনার বিবরণ আদ্যোপান্ত শৈলেন শুনে নিল মিঃ প্রসাদের পাওয়া রিপোর্ট থেকে।

অবশ্য মৃতদেহ পরীক্ষা করে বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। পকেট হাতড়ে পাওয়া গেল একটা লটারীর টিকিট। ক্রশওয়ার্ড পোষ্টাল ওর্ডার গোটা দুয়েক, আর একটি ছোট ডায়েরী। ডায়েরীর ভাষা দুর্ব্বোধ্য। জার্ম্মান ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে কোন কোন জায়গায় বেশ বোঝা গেল। বোধহয় তার জীবনের অত্যন্ত গূঢ় কথা অন্যের জ্ঞাত না হয়—তাই এই কৌশলের আশ্রয় নেওয়া।

শৈলেন ডায়েরীটি চুপিসাড়ে সরিয়ে নিল। মৃতদেহ লাশ-কাটা ঘরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে তাঁরা কেরাণী-মেসে রওনা হোলেন।

আত্মহত্যা বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকাতে মিঃ প্রসাদ ভোর রাত্রে এসে কোহিনুরের রুমে তালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন, দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই 'ছপাৎ' করে শব্দ হোল একটা।

দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন সারা ঘর জলময়। একটা কুঁজো ভেঙ্গে যাওয়ার ফলেই এই কাণ্ডটা হয়েছে। জুতোর জল থেকে কাপড় বাঁচিয়ে ওঁরা রুমের মাঝখানে দাঁড়ালেন।

"অযথা কুঁজোটাকে ভাঙ্গলো কে?" শৈলেনের প্রথম প্রশ্ন। ঘরের সর্ব্বত্র সে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই। সাধারণতঃ চাকুরেদের মেস-জীবনের ব্যবহারিক নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি দ্রব্য। মিঃ প্রসাদ নিজের কাজে লেগে গেলেন। বিছানা উল্টে-পাল্টে একরাশ চিঠি-পত্র বার করে পড়তে থাকেন।

হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে একটা খাম খুলে দেখেন গতানুগতিক ছন্দে লেখা, "আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।" ইতি কোহিনুর রায়।

"দ্যুৎতেরি!" বিরক্তভাবে ঠোঁট উল্টে বললেন মিঃ প্রসাদ, "চলুন ফিরি। আত্মহত্যা করেছে ছোঁড়া। লাশ পোষ্ট মর্টেম করে কি হবে, মেসে ফিরিয়ে দিই। সৎকার করে দিক্।"

"আরেকটু দাঁড়ান!" শৈলেন হঠাৎ ঝুঁকে প'ড়ে একটা টেষ্টটিউবে ভাঙ্গা কুঁজোর বয়ে-যাওয়া খানিকটা জল পূরে নিল। তারপর উঠে এসে টেবিলের ওপর থেকে শূন্য কাঁচের গ্লাসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। পরে গ্লাসটাকে হাতব্যাগে ভরে দিল।

ইতস্ততঃ ছড়ানো টেবিলের বইগুলো থেকে শৈলেন হঠাৎ আবিষ্কার করলো ইন্‌জেকসেন দেবার দশ সি. সি.র সিরিঞ্জ একটা, একটা ডিসটিলড্ ওয়াটারের ভাঙ্গা এম্পুল এবং একটি অক্ষত মর্ফিয়া এম্পুল।

"কোহিনুরবাবু কি রোজ রাত্রে মর্ফিয়া নিতেন?"

"কি জানি, ছোকরারা তো ওসব কিছু বলে নি।"

"একবার ডাকুন বোর্ডারদের।"

ডাকতেই সুবোধ আর দেবেন এল। অফিস যাবার জন্যে তারা তৈরী হচ্ছিল।

শৈলেন বললে, "শুনলাম আপনার সঙ্গেই নাকি কোহিনুরবাবুর খুব বেশী বন্ধুত্ব ছিল?"

এই প্রশ্নে অন্য লোকে হয়ত বল্‌তো, 'আজ্ঞে না।' কারণ আলাপ থাকলেও ব্যাপারটা যখন পুলিশ থানা অবধি গড়িয়ে গেছে, তখন খামকা তাতে জড়িয়ে নিজেকে বিপদাপন্ন করা বোকামী। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। সুবোধ কিন্তু সে ধারই মাড়ালো না, অম্লান বদনে বল্‌লে, "বরঞ্চ বলতে পারেন আমি সর্ব্বাপেক্ষা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।"

"বেশ, তাহলে তো আপনার জানবার কথা, আচ্ছা, এই যে লেখা—'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।' এটা কি কোহিনুরবাবুর লেখা?"

লেখাটা বার পাঁচেক বিড় বিড় করে পড়লো সুবোধ, ভ্রূ-কুঁচকে বললে, "কোহিনুরের লেখা বলে মনে হচ্ছে না তো!"

"তবে তিনি আত্মহত্যা করলেন কেন? আপনারা কি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি সুইসাইড করতে যাচ্ছেন?"

"তাই যদি জানবো তবে আত্মহত্যা করতে দেব কেন মশাই?"

"হুঁ! তাও তো বটে! তিনি কি রাত্রে মর্ফিয়া নিতেন?" শৈলেনের অন্য প্রশ্ন।

অবাক হবার পালা এল সুবোধের। বল্‌লে, "মর্ফিয়া? না, কোনদিন নিতে দেখিনি।"

"কিন্তু এই দেখুন, এইগুলো পাওয়া গেছে।" শৈলেন সিরিঞ্জ ও এম্পুলগুলো দেখালো।

অনেকক্ষণ ধরে সেগুলো নিরীক্ষণ করে সুবোধ বললে, "তাহলে কি কোহিনুর আনাতো? কিংবা বৈষ্ণবের হতে পারে।"

শৈলেন ধাঁ করে কথাটা চেপে ধরলো, "বৈষ্ণব কে? তিনি কি করেন? কোথায় থাকেন?"

সুবোধ বলল, "বৈষ্ণব ডাঃ সরকারের মেজ ভাই। মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। ফাইন্যাল ইয়ার চল্‌ছে তার। আমার মত সেও কোহিনুরের 'ইন্‌টিমেট্‌' বন্ধু ছিল। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস সে কোহিনুরকে এসব দেবে না।"

"কিসে বুঝলেন?"

থতমত খেয়ে গেল সুবোধ, তবু তাড়াতাড়ি বললে, "বোঝাবুঝির কিছু নেই। শরীর খারাপ হলে পয়সা দিয়ে চাইলেও দাদার ডাক্তারখানা থেকে একটা কুটোও দিত না, বরং অন্য ফার্ম্মেসীতে যেতে বলতো।"

"কাল রাত্রে বৈষ্ণববাবু এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ, কাল রাত এগারোটা পর্য্যন্ত আমি, বৈষ্ণব, কোহিনুর, দেবেন আর সুরেশ গল্প করেছি।"

"তখন হয়ত বৈষ্ণববাবু সিরিঞ্জ ফেলে গেছেন এবং তারই সুযোগ নিয়ে কোহিনুরবাবু..."

তীব্রকণ্ঠে বাধা দিয়ে সুবোধ বললে, "না, না মশাই। আমি জানি খালি হাতেই এসেছিল সে, সে আনতেই পারে না।" চাপা বিরক্ত ভাব ফুটে উঠলো সুবোধের মুখে।

শৈলেন প্রসঙ্গ বদলে বললে, "কতদূর পড়াশুনা করেছিলেন কোহিনুরবাবু?"

"এম-এস্‌-সি। ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট ইন্‌ এ্যাপলায়েড কেমেষ্ট্রি।"

"বলেন কি মশাই? এখানে কি সুখে পড়েছিলেন?" শৈলেন বিস্মিত হোল খুব।

"এখানকার 'ডিগয়াড়ী ফুয়েল রিসার্চ্চ ইন্‌স্টিটিউটে' কাজ করতো। সেখানে কোয়ার্টার না পাওয়ায় আমরা থাকার বন্দোবস্ত করে দিই।"

মিঃ প্রসাদ এবার মুখ খুললেন, "কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলি। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে এটা সুইসাইড কেস্‌ দেখা যাচ্ছে, তবুও জিজ্ঞেস করছি এমন কাউকে আপনাদের সন্দেহ হয়, যার দ্বারা হত্যা...না, না হত্যা নয়, সুইসাইড করতে বাধ্য হয়?"

সুবোধ তীব্র দৃষ্টিতে মিঃ প্রসাদকে দেখলো, পরে দৃঢ় অথচ শান্ত কণ্ঠে বললে, "আপনারা ঘুরে ফিরে একই প্রশ্নে আসছেন।"

ওদের কথার মাঝে আরো একজন যুবক প্রবেশ করে। নাম তার সুরেশ। প্রাথমিক পরিচয়ের পর শৈলেনের প্রশ্নের জবাবে সুরেশ বললে, "আমার খেলার সখ আছে। কালরাত্রে হঠাৎ কোহিনুরকে বলি,

সিন্দ্রীতে আমাদের খেলা আছে সে যাবে কিনা। তার উত্তরে বলেছিল কোহিনুর, কাল আর আমি এই বাড়ীতে থাকবো না। আমরা ঠাট্টা ভেবে কথাটা উড়িয়ে দিই।"

"আর তাছাড়া—" সুরেশ এগিয়ে এল একটা পোষ্টকার্ড হাতে, "কালরাত্রে পোষ্ট করবার জন্যে সে আমায় দিয়েছিল, পড়ে দেখতে পারেন সে কি লিখেছে।"

শৈলেন চিঠি গ্রহণ করে, কোহিনুর লিখেছে তার মাকে। অনেক কথার পর লিখেছে, "তোমরা চাওনা তোমাদের এই সন্তান বেঁচে থাকুক, তা না হলে একছত্র লিখে তোমরা আমার খোঁজ নাও না, এবার একদিন জানতে পারবে তোমাদের কোহিনুর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।"

চকিতে শৈলেনের মুখ থেকে একখানা কালো মেঘ সরে যায়, বললে, "কোহিনুরবাবুর হাতের লেখা?"

সকলে তার কথায় সায় দেয়।

শৈলেন বললে, "কুঁজোটা কে ভেঙ্গেছে মশাই।"

"কাল জল খেতে গিয়ে বৈষ্ণব ভেঙ্গে ফেলেছিল। কোহিনুর চেয়েছিল জল..."

শৈলেন ক্ষিপ্র হাতে চিঠি পকেটস্থ করে বললে, "চিঠিটা আমরা নিলুম।"

ঘরে তালা দিয়ে আবার তাঁরা রাস্তায় নামলেন। মিঃ প্রসাদের উদ্যত প্রশ্নের পূর্ব্বেই শৈলেন গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ মিঃ প্রসাদ, একটি সুপরিকল্পিত নিষ্ঠুর হত্যা।"

চার

শৈলেন বললো, "ডাক্তারবাবু, আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম। কিছু যদি মনে না করেন তো কোহিনুর প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা আলোচনা করতে চাই।"

হাসলেন ডাঃ সরকার। অর্থপূর্ণ সেই হাসি।

"আপনি তাকে কেমন অবস্থায় দেখেছিলেন ডাক্তারবাবু?" শৈলেনের প্রথম প্রশ্ন।

"মৃতাবস্থা। বাঁচবার কোন আশা দেখিনি।"

"আপনি কি কোনপ্রকার ওষুধ প্রয়োগ করেছিলেন?"

"করিনি তবে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"আচ্ছা, এগুলি কি আপনার?" শৈলেন পকেট থেকে সিরিঞ্জ ও মর্ফিয়ার এম্পুলগুলো বার করে দেখায়। ডাঃ সরকার সোল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোথায় পেলেন! অথচ সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছিনা। কোথাও ফেলে এসেছি কিনা কিছুতেই মনে করতে পারলুম না।" শৈলেনের হাত থেকে সেগুলো নেবার জন্যে ডাক্তার সাগ্রহে হাত বাড়ালেন।

শৈলেন বাধা দিয়ে লজ্জিত মুখে বলে, "মাপ করবেন ডাক্তারবাবু, এখন আপনাকে এগুলো দিতে পারছিনা। দিন কয়েক দেরী হবে।"

ডাক্তার উচ্চ হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিয়ে বললেন, "না দিলেও ক্ষতি নেই।" কথান্তরে শৈলেন জিজ্ঞাসা করে, "ভালকথা, আপনার ভাই বৈষ্ণববাবু কোথায়? তিনি কোহিনুরের বন্ধু, তিনি কিছু হয়ত জানতে পারেন...তাঁকে একবার..."

বাধা দিয়ে ডাঃ সরকার বল্লেন, "বৈষ্ণব তো নেই। আজ ভোরে আমার গাড়ী নিয়ে কোলকাতা গেছে। কোন্ একটা খেলার ফল বেরিয়েছে, জানতে গেছে, আপনি কাল সকালে আসুন, দেখা হবে তার সঙ্গে।"

পাঁচ

সকাল বেলা।

শৈলেন কিরণ-ভবনে হাজির হোল। সাড়া পেয়ে বৈষ্ণব এল।

নানা কথার পর শৈলেন একটা কাগজ বার করে বৈষ্ণবকে দেখায়, বলে, "কোহিনুরবাবুর ডায়েরী থেকে এই পাতাটা ছিঁড়ে এনেছি। এক বিদেশী ভাষায় কি সব লেখা। আপনি কি পড়তে জানেন? আমার যতদুর মনে হয় এটা জার্ম্মান ভাষা। কেউ পড়তে পারলো না, সুবোধবাবু বললেন, আপনি হয়ত পড়তে জানেন?" সাগ্রহে কাগজটি তুলে নিয়ে বৈষ্ণব গড় গড় করে পড়ে যায়। পড়ার সাথে সাথে তার কপালের শিরাগুলো স্ফীত হয়ে উঠে। বিস্ময় চকিত চাহনি তার দু'চোখে, কিন্তু বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "কি অদ্ভুত! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না এটা তার হাতের লেখা। এমন লেখা তার নয়।"

শৈলেন মৃদু হেসে বললে, "কথাটার কি মানে হচ্ছে জানেন?"

বৈষ্ণব একবার চারিদিকে শঙ্কিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে, "এর অর্থ.......সুবোধ আর দেবেন ব্যাপার জানতে পেরেছে। ওরা হয়ত আমাকে হত্যা করে টাকাটা নেবার চেষ্টা করবে।"

"টাকা? কিসের টাকা?"

"তাতো আমি বলতে পারছি না।"

শৈলেন বললে, "তবে কি কোন গুপ্তধনের লোভে ওরা চক্রান্ত করে কোহিনুরকে হত্যা করেছে?"

বৈষ্ণব অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ভাবে বললো, "আপনি সেই ডায়েরীটা পেলেন কোথায়? আপনার কাছে আছে?"

শৈলেন চিন্তিত মুখে উত্তর দিল, "ডায়েরী নিইনি আমি, শুধু কৌতূহলবশতঃ ঐ পাতাটা ছিঁড়ে নিয়েছিলাম। সেটা আছে কোহিনুরের বিছানার তলায়। তা সে থাক্‌গে, এখন যদি সুবোধ আর দেবেনবাবু এই রহস্যের মূলে থাকেন তবে তাঁদের এক্ষুনি গ্রেপ্তার করতে হয়।"

সেখান থেকে শৈলেন সোজা চলে এল থানায়। মিঃ প্রসাদের সঙ্গে নৈশ অভিযানের কোন গুপ্ত পরামর্শে মেতে গেল।

ছয়

রাত একটা। নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি। কৃষ্ণা তিথির ঘোর তমসায় ঝিম্ ঝিম্ করছে গভীর রাত। কোথাও আলোর এক ফোঁটা চিহ্ন নেই। মেসের প্রতিটি প্রাণী গাঢ় ঘুমে অবলুপ্ত।

চূণের তীব্র গন্ধে নাক ঝাঁঝিয়ে ওঠে। চৌকির তলায় মিঃ প্রসাদ ও শৈলেন মশা তাড়ায়।

খুট! হঠাৎ একটা শব্দ...কে যেন বাইরের তালাটা খুলবার চেষ্টা করছে...মৃদু খসখসে অস্পষ্ট আওয়াজ। শৈলেন উৎকর্ণ হয়ে উঠে।

ধীরে ধীরে রুদ্ধ দ্বার খুলে যায়...খোলা দরজার মুখে কালো পরিচ্ছদে আবৃত একটা মূর্ত্তি।

দুর্ভেদ্য অন্ধকারে তাকে প্রেতলোকের দূত মনে হয়। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে রুমে প্রবেশ করে।

একশেল টর্চ্চের মৃদু আলোয় ছদ্মবেশী মূর্ত্তি সরে আসে তক্তাপোষের কাছে। ক্ষিপ্রহাতে তোষক উল্টে-পাল্টে কি যেন খুঁজতে থাকে। তারপর সতর্ক পায়ে টেবিলের কাছে চলে আসে।

একটা মুহূর্ত্ত...ড্রয়ার টেনে খুলতে যাবে ঠিক এমনি সময়ে মিঃ প্রসাদ উদ্‌গত কাশি চাপতে না পেরে 'খুক্' করে উঠলেন।

তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে রিভলবার বার করে ছুটে বাইরে বেরিয়ে যায়...শৈলেন একটুও অপেক্ষা না করে তার পশ্চাদ্ধাবন করলো...মিঃ প্রসাদ হুইসিলে মারাত্মক ফুঁ দিলেন...চকিতে কেরাণী-মেসে হুলস্থুল বেধে যায়।

গুড়ুম! গুড়ুম! রাত্রির কালো পর্দ্দা ছিঁড়ে এক ঝলক আগুন...পরমুহূর্ত্তেই লালবাতির গায়ে খানিক ধুলো ছিটিয়ে একটা মোটর সহসা অদৃশ্য হোল।

'B R R 32...' ধুলোয় ধোঁয়ায় নম্বর পড়তে পারা গেল না।

সাত

ঘুম ভেঙ্গেই বৈষ্ণব কেরাণী-মেস আক্রান্ত হওয়া এবং সেই সঙ্গে সুবোধ আর দেবেনের গ্রেপ্তার সংবাদ পেল।

তক্ষুনি সে ছুটলো থানায়। শৈলেন চৌধুরীর সঙ্গে তার দেখা হোল না, মিঃ প্রসাদ বললেন,... ভোরের মেলে শৈলেনবাবু কোলকাতা গেছেন। সুবোধ আর দেবেনবাবুর বিরুদ্ধে তিনি কোহিনুর হত্যা সম্পর্কিত বহু প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। তিনি ফিরে এলেই মামলা কোর্টে উঠবে...জামিন অগ্রাহ্য।

* * *

দিন তিনেক পরের কথা। রাত আটটা। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

ঝড়ের বেগে শৈলেন বাংলোয় ঢুকলো, মিঃ প্রসাদ লাফিয়ে উঠলেন।

শৈলেন বললে, "ব্যাপার গুরুতর। ক'টা বাজে বলুন তো? ঘড়ি আনতে ভুলেছি। 'হাওড়া প্যাসেঞ্জার' ধানবাদ থেকে ক'টায় ছাড়ে বলুন তো?"

"এখন সাড়ে আট। ছাড়ে ৮-৪৫ মিনিটে।"

"তবে আর দেরী নয়। গোটা কতক কনষ্টেবল নিয়ে চলুন এক্ষুনি ষ্টেশনে।"

বিস্ফারিত চোখে চাইলেন মিঃ প্রসাদ, "কি মুস্কিল? হত্যাকারী কি পালাচ্ছে?"

"যেতে যেতে বলবো সে কথা..চট্ করে ড্রেস করে নিন্।"

হাওড়া-মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ধীরে ধীরে ধানবাদ প্ল্যাটফর্মে ইন করছে...

মিঃ প্রসাদ ও শৈলেন দলবল সহ এক প্রান্তে সরে দাঁড়ায়। মিঃ প্রসাদ রিভলবার চেপে ধরেন।

একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক...হাতে এ্যাটাচী...গায়ে গরম স্যুট...দ্রুত পায়ে সেকেণ্ডক্লাস কামরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

শৈলেন ছুটে গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালো...চোখের ইশারা পেতেই মিঃ প্রসাদ পাঞ্জাবী যুবকের হাতে লোহার বালা পরিয়ে দিলেন।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোক হতবাক্! পরক্ষণেই বিকট মুখাকৃতি করে উর্দ্দু মেশানো দুর্ব্বোধ্য ভাষায় চীৎকার করতে থাকেন। শৈলেন আর থাকতে না পেরে তাঁর মাথা থেকে পাগড়ী আর গাল থেকে ঝুটো দাড়ি-গোঁফ অপসারিত করে দেয়।

ভূত দেখার মত মিঃ প্রসাদ চমকে উঠেন, "কি সর্ব্বনাশ! শৈলেনবাবু এই লোকটা খুনী...এ যে ডাক্তার..."

কথায় বাধা দিয়ে শৈলেন আসামীকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যেতে বলে।

ধানবাদ প্ল্যাট্ফর্মে প্রতিটি যাত্রী স্তব্ধ বিস্ময়ে বোবা হয়ে যায়...

আট

কিছুদিন পরেই কোহিনুর-হত্যা মামলার শুনানী সুরু হোল। শৈলেনের সওয়ালে বাকী বিবরণটুকু লোকে জান্তে পারে।

"আসামী ও মৃত কোহিনুর দুই বন্ধু। একাত্মা। অন্তত কোহিনুর তাই ভাবতো। হত্যাকারী সেইজন্যে কোহিনুরের জীবনের অলিগলি ভালভাবে জান্তো। বহুদিন ধরে আসামী ও সে যুক্তভাবে কোন লটারীর টিকিট কিনে আসছিল। শেষ খেলায় ভাগ্যক্রমে ওদের যুগ্ম টিকিটে প্রথম পুরস্কার উঠলো দেড় লাখ টাকা। আসামী কোলকাতায় থাক্তো। খবর পেয়েই সে চেপে গেল, সঙ্কল্প করলো কোহিনুরকে এই অর্থের এক কপর্দ্দকও দেওয়া চলবে না।

"এখন না দিতে হলে কোন ব্যবস্থা করতে হয়। ব্যবস্থাটি হোল কিন্তু চরম। আসামী বিষ প্রয়োগে তাকে মেরে ফেল্লো।

"এরপর দ্বিতীয় পর্য্যায়। প্রথমত বিষ এল কোথা থেকে। আপনারা সবাই জানেন বিষ যোগাড় করা আসামীর পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত নয়। শক্ত হলো বিষ খাওয়ানো। আসামী বিষ দেবার সুযোগ খুঁজতে লাগলো। এদিকে টিকিটে লিখিত খেলার তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় কোহিনুর ফলাফল জানবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠে। আসামী যে তাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছে এ ধারণা তার চিন্তার অতীত। হঠাৎ

আসামীর একদিনকার কোন কথায় মৃত ব্যক্তির মনে সন্দেহের ছায়াপাত হোল এবং সে বিষয়টি অর্থাৎ আসামীর অর্থ আত্মসাৎ করবার প্রচেষ্টা লিখে রাখলো তার নিত্যসঙ্গী ডায়েরীতে এবং জার্ম্মান ভাষায় যে সেটা লিখেছিল ডায়েরী দেখেই জানা গেছে পরে।

"কোহিনুর নিজেই লটারী সম্বন্ধে খোঁজ নেবে একথা জানতে পেরে আসামী সেইরাত্রে কোহিনুরের কুঁজোর খাবার জলে প্রচুর পরিমাণে 'কার্ব্বোনিল ক্লোরাইড' মিশিয়ে রাখলো। যার সামান্যতম পেটে গেলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

"হোলও তাই। সেই কুঁজোর জল পান করে কোহিনুর মারা গেল। আসামীও কায়দা করে কুঁজো ভেঙ্গে প্রমাণ লোপ করবার চেষ্টা করলো।

"আসামী ভাবতে পারেনি জার্ম্মান ভাষায় কোহিনুর ডায়েরীতে কিছু লিখে যাবে। আমি একজন জার্ম্মান ভাষাবিদ্ লোকের কাছ থেকে কয়েকটি কথা লিখে এনে আসামীকে পড়তে দিলাম। দেখা গেল সে জার্ম্মান জানে। তার সন্দিগ্ধ মন আরো জটিল হোল যখন সে আমার কাছে শুন্‌লো মৃত ব্যক্তি আরো অনেক কিছুই লিখে গেছে ডায়েরীতে এবং ঐ ভাষাতেই। তাই আর অপেক্ষা না করে সেই রাত্রে সে ডায়েরীর জন্যে কোহিনুরের ঘরে হামলা করলে। সেখানে লুকিয়ে ছিলাম আমি আর মিঃ প্রসাদ। সেই রাত্রে তাকে ধরতে সক্ষম হোতাম যদি না মিঃ প্রসাদ কেশে ফেলতেন। তবুও ঘরের মেঝেতে 'ফুটপ্রিণ্ট' ও তার জুতোর ছাপে দ্বিতীয় বার প্রমাণ হোল আসামীই হত্যাকারী।

"তৃতীয় প্রমাণ আপনারা অবগত আছেন। পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশে আসামীর ঐ টাকা নিয়ে একেবারে বিলাতে পাড়ি দেবার উদ্দেশ্য ছিল। আসামী যে বিলাত যাবার বন্দোবস্ত পূর্ব্ব থেকেই পাকা করে রেখেছিল, তার পাশপোর্ট ইত্যাদি পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে।"

শৈলেন কথা শেষ করে বসে পড়েছিল। গম গম করছে আদালত-কক্ষ।

পিছনের আসন ছেড়ে ঘাম্‌তে ঘাম্‌তে বেরিয়ে এলেন ডাঃ সরকার। কোহিনুর হত্যার রায় কি বেরুবে তিনি জানেন। তবুও টাকার লালসায় মানুষ খুন করতে পারে যে মানুষ, সে মানুষের জন্যে তিনি উকীল লাগাবেন না ঠিক করলেন।

বাইরে এসে আপন মনেই অস্ফুট স্বরে বল্‌লেন, "ছিঃ ছিঃ, তুই মানুষ হত্যা করলি বৈষ্ণব? তাও টাকার জন্যে?" ছোট ছেলের মত ঝরঝর করে তিনি কেঁদে ফেললেন।

[পৌষ ১৩৬২]

বিক্রম বর্মন

শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্তী

আমাদের আড্ডার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু ছিল ভূতের গল্প। প্রত্যেকেরই মনে আগ্রহ—রঙ ফলিয়ে জমজমাটি গল্প বলার। এই ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন হাজারীমশায়। যদিও ভদ্রলোক প্রতিদিনের সভ্য ছিলেন না, কেবল শনিবার সন্ধ্যায় তিনি আসতেন। জাঁদরেল ব্যবসাদার মানুষ, সব সময়ই ব্যতিব্যস্ত থাকেন। সপ্তাহের মধ্যে একটি দিনই তাঁকে আমরা পাই।

আজ সেই শনিবার। সারাদিনের ঝিমঝিমানি জল মাথায় করেই সব কাজ সারতে হয়েছে। আমার বাড়ি যে অঞ্চলে সেখানে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেছে। জল ভেঙে চললাম বর্ষাতিটা গায়ে জড়িয়ে। আমার একটু দেরিই হয়ে গেল সেদিন পৌঁছতে। নিয়মিত সভ্যরা সকলেই, এমন কি হাজারীমশায়ও এসে গেছেন! সকলে উচ্চকণ্ঠে আমায় অভ্যর্থনা করলো :

—'আরে, এসো—এসো, বিরিঞ্চি—'

সলজ্জ হেসে বললাম, 'আমার একটু দেরি—'

—'হবার তো কথাই, সারাদিন যা চলেছে আকাশের অবস্থা।'

এই সময় জলের ঝিমুনিটা কেটে গিয়ে ঝমাঝম বর্ষণ শুরু হ'ল। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা আর গরম পেঁয়াজী-ভর্তি প্লেট নিয়ে কৈলাসচন্দ্রের ভৃত্য রামদীনের প্রবেশ। উল্লসিত একটা মৃদু গুঞ্জনে ঘরটা সুরেলা হয়ে উঠলো।

গরম একটা আস্ত পেঁয়াজী মুখে পুরে ঘনশ্যাম বললে, 'এবার শুরু করুন হাজারীমশায়, আবহাওয়া এবং পরিবেশ রীতিমত প্রস্তুত।'

'তাই নাকি!' হাজারীমশায় ভরাট গলায় হাসলেন : 'আজ যে ঘটনা বলব, আমার জীবনেই ঘটেছিল। নির্ভেজাল সত্য।' বলে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে চুরোট ধরালেন। উগ্র একটা কটু গন্ধ ঘরের শীত-শীত ভেজা হাওয়ায় ভাসতে লাগলো।

হাজারীমশায় শুরু করলেন :

বছর পনের আগের কথা, পর-পর কয়েকটা ব্যাপারে মোটা টাকা লোকসান হয়ে আমার ব্যবসা লালবাতি জ্বালতে বসেছিল। পুরুষানুক্রমিক সুনামের সুদ পাওনাদারদের যদিও শান্ত রেখেছিল, আমার কিন্তু শান্তি ছিল না। মাথায় ঋণের বোঝা নিয়ে কারই বা স্বস্তি থাকে! নতুন করে টাকা আমদানির রাস্তা করতে হলেও চাই টাকা! শুধু ভাবনা নিয়ে বসে থাকা আমার স্বভাব নয়, ওতে কোন কাজ হয় না।

একটা চরম দুঃসাহসের কাজ করে বসলাম দুম্ করে! আমার প্রপিতামহের আমলে প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দের মাথার হীরে-চুনি-মুক্তোর কাজ করা সোনার মুকুট ছিল। দেড় লক্ষ টাকা পাথরগুলোরই দাম। আমার এক বন্ধু বিরাট ধনী ও জমিদার, তার নামটা বাদ থাক—তার কাছে প্রস্তাব করলাম, ওই মুকুটের বিনিময়ে টাকা ধার দিতে। এমনও বললাম, সুদ হিসাবে নয়, ধর তোমারই টাকা খাটছে—তারই একটা লভ্যাংশ তোমায় টাকা শোধ করার সময় ধরে দোব।

বন্ধু বললে, 'আরে ছিঃ! ওই সুদই হ'ল, ওসব কথা ছাড়। জানই তো, আমি হচ্ছি গিয়ে

কুঁড়ের বাদশা জমিদার। বাপ-ঠাকুর্দা কিছু টাকা রেখে গেছেন এবং এখনও বেশ আদায়-পত্তর হচ্ছে। বিপদে তোমায় সাহায্য করব, তার আবার অত শত শর্ত কি!'

শুনে আমার মনটা খুশীই হ'ল। বললাম, 'আমি তোমার টাকা এক বছরের মধ্যে শোধ করব। আমি নেহাত হতভাগা, তাই কুল-দেবতার—' বলতে-বলতে আমার চোখে জল এসে গেল।

মোলায়েম মিষ্টি গলায় বন্ধু সান্ত্বনা দিল, 'সবই ভাগ্য হে! ওই রাধাগোবিন্দেরই ইচ্ছা সব—তিনিই দিচ্ছেন, আবার তিনিই নিচ্ছেন। আমরা তো হাত-পা-বাঁধা!'

'সে তো ঠিকই!' আমি সায় দিলাম।

'তোমার ওই পাথরগুলো কত দামের বলছিলে?'

'দেড় লক্ষ টাকা শুধু পাথরগুলোর দাম—'

'হুঁ। সোনা কত ভরি আছে?'

'চল্লিশ ভরির বেশীই হবে কিছু।'

বন্ধু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'তাহলে, কত টাকা চাও তুমিই বল?'

'এক লাখ টাকা উপস্থিত হলেই চলবে।'

'এ-ক-ল-ক্ষ। বল কি?' বন্ধু আঁতকে ওঠে, 'বন্ধকী কারবার না করি, শুনেছি, নাকি আসলের অর্ধেক মতই বুঝি টাকা মহাজন খাতককে দেয়! তা' আমি তো আর মহাজনও নই, তুমিও খাতক নও। বল কি-না, হে-হে!' সে হাসলো পাকা মহাজনী কায়দায়, 'আশি হাজার টাকা আমি তোমায় দিতে পারি। আর, তুমি নিজে হাতে করে যখন জিনিসটা এনেছ—জহুরী ডেকে যাচাই করবার দরকার মোটেই নেই, কি বল?'

আমার দায়। তাই হাসি টেনে বলতে হ'ল, ' তোমার মত বন্ধুর উপযুক্ত কথাই বলেছ। তোমার বিশ্বাস রাখতে পারব আশা করি। তবে—'

'কি?'

'টাকাটা একটু বেশী যদি—'

'না—না—না, এখন ক'বছরই অজন্মা যাচ্ছে। খাজনা আদায় হচ্ছে না হে!'

আমি আশি হাজার টাকা নিয়ে চলে এলাম, আমার মন খুবই ছোট হয়ে গেল। শেষে কি না ঠাকুরের—। যাই হোক উঠে পড়ে লেগে গেলাম। ঘড়ির কাঁটার যেমন বিশ্রাম নেই, ঠিক তেমনই যদি খাটতে পারতাম, এই কথাই শুধু মনে হ'ত।

হাজারীমশায় থামলেন। চুরোটের আগুন নিভে গেছল, আবার ধরিয়ে নিলেন।

'সেই দিনগুলি আজ মনে হয় যেন স্বপ্ন। তবে, রাধাগোবিন্দের কৃপা আর পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদে দুর্দিনের মেঘ কেটে গেল, সুদিনের সূর্যের মুখ দেখলাম। যেমন কথা দিয়েছিলাম সেই মতন বছর পূর্ণ হওয়ার দিনে আসল আশি হাজারের সঙ্গে আরো পাঁচ যোগ করে নিয়ে বন্ধুর কাছে গেলাম।

সে বললে, 'বাঃ, বাঃ, তুমি এসে গেছ।'

'তুমিও কি তাই আশা কর না আমার সম্বন্ধে?' বললাম।

'আশা? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করি। আমারই তো বন্ধু তুমি।'

বললাম, 'আমার জিনিসটা—'

'সে আর বলতে!' বন্ধু ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠে অন্দরমহলে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এনে দিল সে আমার বাঞ্ছিত বস্তু। টাকা গুনে নিয়ে বললে, 'মাত্র পাঁচ হাজার ধরে দিলে হে! য়্যাঁ!'

'কেন কম হ'ল? আর, তা'ছাড়া ও তো সুদ হিসেবে নয়, তবে তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও—'

'আরে, পাগল নাকি! এমনিই বললাম। যাও, বাড়ি যাও।' বলে হাসলো উচ্চকণ্ঠেঃ 'আরে, তোমায় চা খেতে পর্যন্ত বলিনি, এমন অভদ্র আমি, ছি ছি!'

'কি বলছ যা তা। তাছাড়া আমি অসময়ে চা খাই না। চলি।' উঠে পড়লাম।

তারপর—। আশ্চর্য! শুধু আশ্চর্য নয়, অদ্ভুত! সেইদিনই রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, মিশকালো রঙ—যমদূতের মত ষণ্ডা চেহারার একটা লোক আমার সিন্দুক ভেঙে সেই মুকুটটা চুরি করছে। আর, আর তার—মুখটা—সেই বন্ধুর মত অবিকল! ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলুম। মনটা তখনও ছ্যাঁত-ছ্যাঁত করছে। একি! এমন হ'ল কেন? একটা ভালো দিন দেখে ঠাকুরের মাথায় মুকুট পরাবো, এই ইচ্ছেয় সেটা সিন্দুকে তুলে রেখেছিলুম। তখুনি সিন্দুক খুলে ফেললুম। আঃ, ওই তো—ওই তো রয়েছে মুকুট! হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগলুম। আলো লেগে জ্বলছে পাথরগুলো! চোখ-ঝলসানো ঝিলিক। কিন্তু, একটা কুৎসিত সন্দেহ—অন্ধকার পথে অকস্মাৎ ফোঁস করে ফণা-তোলা সাপের মত। মনের যত খুশী ম্লান ক'রে দিল। পাথর-টাথর আমি মোটেই চিনি না। এগুলো সব আসল তো?

বাকী রাতটুকু আর ঘুম হ'ল না। কি যে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে সময়টুকু কাটলো! সকাল হতেই আমার জুয়েলারকে ফোন করলুম। তিনি এসে দেখে-শুনে ঠিক সেই কথাই বললেন ঃ যা' স্বপ্নাতীত ছিল! পাথরগুলো সব ঝুটো। রঙচঙে কাঁচ। বিলিতি কাঁচ। দেড় লক্ষ টাকার জিনিসটা নাকি, মেরে কেটে আড়াই হাজারের মত এখন মূল্য!

আমি মাথা ঘুরে পড়েই যেতুম, জুয়েলার শিশিরবাবু না যদি ধরতেন।

'আপনি আমায় না জানিয়ে কেন এই লেন-দেন করলেন।' তিনি দুঃখিত-কণ্ঠে বললেন ঃ 'দুনিয়ায় বিশ্বাসের মূল্য কানা-কড়িও নেই হাজারীমশায়! সব কিছুর ওজন এখন টাকার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে!'

পাথর—আমি নিষ্প্রাণ জড়-দেহ প্রাপ্ত হয়েছি। যান্ত্রিক চোখ দুটো কেবল নিষ্পলক। অনেকটা সময় লাগলো ধাক্কা সামলাতে। ভুল আমারই। তার উপযুক্ত শাস্তি তাই পেয়েছি। কিন্তু, এই ভুলের মাশুলটা কেমন ক'রে দোব—মনে মনে স্থির ক'রে নিয়েছি। আমার গোয়েন্দা বন্ধু বিক্রম বর্মনের শরণাপন্ন হতে চললাম। পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের জাঁদরেল মাথা। তাকে সমস্ত কথা সবিস্তারে বললাম তার বাড়িতে হানা দিয়ে।

'আমি কি করতে পারি, বলো?' সে বললে, 'তুমি অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে? যাঁর নাম করলে, বাংলা দেশের ধনী জমিদারদের দলভুক্ত তিনি। বংশগত 'দানবীর' 'ধর্মপ্রাণ' প্রভৃতি অলংকার ধারণ করে বসে আছেন। লোকে শুনলে বিশ্বাস করবে তোমার কথা? বিশেষ করে, কিছু দিন আগে তুমি যে ব্যবসায় লালবাতি জ্বেলে বসেছিলে—এ কথা তো সকলে জানে। লোকে বলবে, হিংসেয় তুমি বদনাম দিচ্ছ মানী জনের।'

'তা হলে কোন প্রতিকার হবে না, বলতে চাও?'

'না, তা' বলি না। বিষয়টা মোটেই সহজ নয়। কিছু করতে হলে আটঘাট বেঁধে তবেই আসরে নামতে হবে। উনি যে নিয়েছেন সেটা প্রমাণ করতে হবে! জিনিসটা আদায় করতে হলে কাঠ-খড় প্রচুর চাই!'

একটু হতাশ হয়ে পড়লাম ঃ 'তুমিই বলো, কি করি? তুমিই বা কি করতে পারো?'

বিক্রম বর্মন চিন্তামগ্ন হ'ল। কিছুক্ষণ কপাল কুঁচকে রইল। একটু পরে জ্বল্‌জ্বলে চোখে তাকালো ঃ 'একটা ফন্দি এসেছে।'

'কি?' উত্তেজনায় আমার গলার আওয়াজ কাঁপছে।

'তোমার হাতের আঙটিটায় কী পাথর? রক্তমুখী নীলা, না? কত দাম হবে পাথরটার?'

বিক্রমের এই কথা শুনে বুঝতে পারি না, হঠাৎ আঙটির পাথরের মূল্য কোন্ কাজে লাগবে ঃ 'ছ'রতি ওজনের পাথর। হাজার পাঁচ দাম হবে।'

'তোমায় দু'চার দিনের জন্যে ওটা কাছছাড়া করতে হবে, পারবে না?'

'না। ওটা কাছছাড়া করতে নেই। আমার একটা হীরের আঙটি আছে এই দামেরই—'

'ঠিক আছে, সেটাতেই হবে।' বিক্রম বললে, 'তোমার সে মহাজন মহাশয়ের কাছে, যা পাও টাকার বিনিময়ে তোমায় হীরার আঙটিটা বাঁধা রাখতে হবে। অভিনয় যেন নিখুঁত হয়। বলবে, আচমকা টাকার দরকার—বেশী না হলেও, যেন, সামান্য হাজার দুই টাকার জন্যে ঠেকে গিয়েছ একান্তই। আরো, এ কথাটা অবশ্যই বলবে, বেশী টাকার দরকার হলে, মুকুটটাই রাখতে হ'ত আবার। এখন সামান্যতেই চলে যাবে।'

'তারপর?'

'তারপর দেখতেই পাবে।' বিক্রম হাসলো।

কথামত সেই মহাজন বন্ধুর কাছে গেলাম আঙটি নিয়ে। হীরাটার উজ্জ্বলতা চোখে লাগে। বেশ কিছুক্ষণ সে আঙটিটার দিকে চেয়ে রইলো। বললে, 'আবার টাকার দরকার?'

অভিনয় ত্রুটিহীন করার চেষ্টা ক'রে বললাম, 'হঠাৎ এমন মুশকিলে পড়ে গেছি ভাই—'

'সে তো বুঝছিই। তোমার তো বেশ চলছিল—'

'তা চলছিল। এখন নগদ টাকা হাতে একেবারে নেই—'

'হুঁ। দু'হাজার চাই?'

'উপস্থিত ওতেই হবে।'

'বেশ, দিচ্ছি।' বলে, বন্ধু একটু উৎসুক ভাব ফুটিয়ে তুললো মুখে ঃ 'তোমার গৃহদেবতার মুকুট পরানো হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই। একটা ভালো দিন দেখে—'

'খুব ভালো, খুব ভালো।'

টাকা নিয়ে চলে এলাম। বিক্রমের সঙ্গে দেখা করে বললাম সাক্ষাৎকারের বিবরণ। সব শুনে সে বললে, 'ঠিক আছে। এবার যা করবার—করছি।'

'কি করবে?'

'পরে বলবো। তুমি আগামী কাল এসো।'

পরদিন গেলাম। আগ্রহভরে বলি, 'কতদূর—বিক্রম?'

বিক্রম বিজয়ীর মত হাসলো ঃ 'জাল পেতেছি।'

'কিছু ধরা পড়লো?'

'নিশ্চয়ই।' বলে, ধোঁয়াটে হাসলো।

অধৈর্য হয়ে পড়লাম ঃ 'তুমি খুলে বলো—'

'ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক—কবি বলেছেন।'

'ভাই, বিক্রম—'

'বুঝেছি। তোমার খুব রাগ হচ্ছে আমার উপর।' বিক্রম উচ্চ হেসে বলে, 'শোন, আমার জালে বিখ্যাত এক জুয়েলার ধরা পড়েছে। এরই মারফত চোরা-বাজারী লেন-দেন তোমার মান্যবর বন্ধু করে থাকেন। তার বাড়িতেই তোমার আঙটির হীরে চলে গিয়েছে। তার বদলে অন্য পাথর লাগানো হয়েছে তোমার আঙটিতে। লোক রেখেছিলুম ওর বাড়িতে নজর রাখবার জন্যে। কেমন ধরনের এবং কে কে সেখানে যায়, তার একটা তালিকা সে আমায় দিয়েছে।'

'এই জেনে কি করবে?' আমি হতাশ হয়ে পড়ি।

'ওই জুয়েলারটিকে ছলে-বলে-কৌশলে দলে আনতে হবে। শুধু চোরাই সোনা-পাথর নয়, মাদকজাতীয় বস্তুও তোমার বন্ধুর ব্যবসার অঙ্গ। এই লোকের মুখোশ খুলতে হলে এমন একজনকে পাকড়ানো দরকার যে তার হাঁড়ির খবর জানে, সাক্ষী দিতে পারবে।'

'যদি জুয়েলার রাজী না হয়?'

'যাতে হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।'

'যদি তোমার কোন বিপদ—'

'তা হবার সম্ভাবনা আছে। তা ব'লে ভয়ে বসে থাকতে নিশ্চয়ই বলো না।' বিক্রম কঠোর কণ্ঠে বলে, 'সমাজের শত্রুদের উচ্ছেদ করার জন্যেই পুলিসে আমার কাজ নেওয়া। শত্রু আমার অনেক। চোর-ছ্যাঁচোড়-খুনে-গুণ্ডাদের চেয়ে এই সব গভীর জলের মাছেরা কত ভয়ানক—'

আমার মহাজন বন্ধুর এই নতুন পরিচয়—যদিও কিছুটা আগে পেয়েছিলাম, এখন বিস্তৃততর ভাবে পেয়ে বেশ কিছুক্ষণ শুধু তলিয়ে বুঝতেই কেটে গেল। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে জাত-সাপের ঘাঁটিতে হাত দিয়েছে বিক্রম। যদিও তার দক্ষতায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তবু বার বার মনে হতে লাগলো তার কোন বিপদ হবে না তো?

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই বুঝি বিক্রম বললে, 'তোমার মুকুটের ঘটনা আমায় বলেছ বলেই তো এত ভীষণ শত্রু-ঘাঁটির সন্ধান পেয়ে গেলাম! নইলে, সকলের চোখের সামনে দিনের পর দিন উনি ফলাও কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন কেমন বংশগত মর্যাদার আড়াল দিয়ে! পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে এরা সমাজের বুকে সসম্মানে ঘুরছে! গোয়েন্দা বিভাগের দু'জন সুদক্ষ অফিসার এদের দলেরই হাতে মারা পড়েছে। আমি এর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব।'

বিক্রমের কাছ থেকে ভাবনা ভারাক্রান্ত মনে বিদায় নিলুম।

তারপর দু'দিন কেটে গেল। বিক্রম শব্দহীন, তার দেখা পর্যন্ত পেলাম না। বাড়িতে খবর নিয়ে শুনলাম ঃ জরুরী কাজে কোথায় গেছে কেউ জানে না! গেল কোথায় মানুষটা? মনে অশান্তির কালো-মেঘটা আরো জমাট হয়ে উঠলো। সেদিন রাত্রে আকাশ ভেঙে জল নামলো।'

হাজারীমশায় থামলেন। একটা নতুন চুরোট ধরালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি জানালা-পথে বাইরের ঝম্-ঝম্ বৃষ্টির মাঝে যেন রহস্যের সন্ধান করছে! আমরা গল্পের গভীরতায় নিঃশেষে হারিয়ে গেছলাম। বক্তার সাময়িক বিরতি আমাদের চেতনা-বস্তুটি ফিরিয়ে দিল। রামদীন আর এক প্রস্থ চা দিয়ে গেল।

হাজারীমশায় আবার শুরু করলেন ঃ

'সেদিন রাত্রেও এমনি দুর্যোগ। অনেক রাত্রে, একটানা দুম্-দুম্ দরজায় কার ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পড়লাম। দরজা না খুলে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে ?' এত রাত্রে কে এলো! হুট্ ক'রে দরজা খুলতে ভরসা হয় না। সাড়া এলো পরিচিত কণ্ঠে ঃ 'আমি, বিক্রম।'

দরজা খুললাম। বারান্দার অন্ধকারে একটা লম্বা-চওড়া ছায়া-মূর্তি। বর্ষাতিতে সর্বাঙ্গ ঢাকা। মাথায় বর্ষারোধক টুপিটা সামনের দিকে হেলানো। কেবল, চোখ দুটো যেন জ্বলছে!

'তোমার ঘুম ভাঙালাম!' বিক্রম হাসলো ঃ 'বেশ ঘুমুচ্ছিলে আরামে, না? তা ঘুমোবার মতই রাত বটে!'

একটু লজ্জিত ভাবে বললাম, 'ভেতরে এসো।'

'না, সময় নেই!' ভরাট, গম্ভীর কণ্ঠ ঃ 'এই নক্সাটা দিচ্ছি। গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর বিরাজবাবুকে নিশ্চয়ই চেন। তাঁর হাতে এখুনি এটা পৌছে দেবে। বলবে, নক্সায় পথের পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া আছে। সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে তাঁর যেতে বিলম্ব না হয়। আমি সেখানেই যাচ্ছি। তুমি অবশ্যই যাবে।'

বুঝতে পারলাম না, বিক্রম আমায় প্রত্যক্ষভাবে এই ঘটনার সঙ্গে কেন জড়াতে চাইছে। মহাজনের শেষ পরিণতি দেখাতে চায়? ছোকরা বাহাদুর বটে! এত শীগ্‌গির বাজিমাত করে বসেছে। বিরাজবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সেপাই সমেত নিজেই তো যেতে পারতো, হয় তো, এত সব করার সময় নেই ওর। বললাম, 'এখুনি যাচ্ছি।'

চাপা হাসির সঙ্গে বিক্রম বললে, 'চললাম। সেখানে আমায় দেখতে পাবে। দেরী করো না।' বলেই, সে হন্-হন্ করে চললো।

বিরাজবাবুর নক্সা দেখে বললেন, 'বিক্রম গত দু'দিন ধরে একেবারে ডুব দিয়ে এই সব করেছে! এই বাদলার রাতে আচ্ছাই ফ্যাসাদে ফেললে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বি. টি. রোড ধরে দু'খানি পুলিসের গাড়ি ছুটে চললো। ডানলপ ব্রিজ পার হয়ে গেল। আকাশের দুর্যোগ আরও ঘনীভূত হচ্ছে! বিরাজবাবু নক্সার নির্দেশমত গাড়ি থামাতে হুকুম দিলেন। সকলে নামলাম, একটা বিরাট আকারের আদ্দিকালের ঝরঝরে পোড়ো বাড়ির সামনে। চারিদিকে ঝোপ-জঙ্গল। কোন ধনী খেয়ালী লোকের শখের সাজানো বাগানের পরিণতি। কিন্তু বিক্রম কই? মরচে ধরা লোহার ফটক খোলাই ছিল। কয়েকজন সিপাহীকে যথাযথ ঠাঁই রক্ষার নির্দেশ দিয়ে জনাকয়েককে সঙ্গী করে বিরাজবাবু এগোলেন ঃ 'আসুন হাজারীমশায়, দেখি ব্যাপারখানা। বিক্রমের সাড়া নেই কেন? এখনো কি পৌছয়নি?'

বললাম, 'চলুন। দেখা যাক। বাড়িটা দেখে, লোক বাস করে বলে তো মনে হয় না।'

হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা হাওয়া শন্-শন্ করে উঠলো মানুষের কথা কওয়ার মত! যেন, পাশ থেকে বিক্রম বলছে ঃ 'আমি এসেছি। তোমরা এগোও।'

চমকে উঠলাম। স্বপ্ন দেখছি! বিক্রম কই? নাঃ, ঘুমের ঘোর এখনো আছে দেখছি। বর্ষা-রাতের কাঁচা-ঘুমের নেশা সহজে কাটে না। বিরাজবাবু খানিকটা এগিয়ে ততক্ষণে সদরে পৌছে গেছেন। চাপা কণ্ঠে বলেন, 'দরজা খোলাই দেখছি!'

'ভেতরে ঢুকবেন?' জিগ্যেস করি।

'নিশ্চয়ই! কেন, আপনার ভয় করছে? তা হলে, গাড়িতে—'

আহত কণ্ঠে বললাম, 'আমায় এত ভীরু মনে করেন।'

'না, না, ছিঃ!' বিরাজবাবু লজ্জিতভাব প্রকাশ করলেন।

ভেতরে ঢুকলাম সকলে। চাপ-চাপ অন্ধকার। ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। বাইরে থেকে যতবড় দেখায় তার চেয়েও মস্ত বড় বাড়ি। একটা বড় চৌকো উঠানকে কেন্দ্র করে সারি সারি ঘর! দরজা-জানালা বন্ধ। চামচিকে উড়ছে ফড়-ফড় করে। টর্চের আলোয় চকিতে সবদিক দেখে নিয়ে বিরাজ বললেন, 'সব ঘরগুলো তল্লাশ করবো?' কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, একটা ভারি কিছুর ডালা বন্ধ করার শব্দ হ'ল।

'স্-স-স্' বিরাজবাবু জিহ্বায় আওয়াজ করলেন সতর্কতার ঃ 'দোতলার দিক থেকে এলো, না?'

'তাই মনে হচ্ছে।'

'চলুন—দেখি—'

চারজন সেপাই নীচে রেখে আমরা দোতলার সিঁড়ির দিকে গেলাম। সিঁড়িতে উঠছি, কানের কাছে চামচিকে ডানা ঝাপটানি দিল......আর মনে হ'ল, যেন স্পষ্ট কেউ বললে 'কোণের ঘরে..... কোণের ঘর দক্ষিণের......' ভয় পেলাম। ভুতুড়ে বাড়ি নিশ্চয়ই। কিছু বললাম না কাউকে। শব্দহীন পদক্ষেপে উপরে উঠলাম। দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটায় যেন কিছু নড়াচড়ার শব্দ, ক্ষীণ আলোর আভাস। বিরাজবাবুর পিছনেই আমি। দরজার পাল্লা ভেজানো। একটুখানি ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, ষণ্ডামার্কা জন চার লোক একটা মস্তবড় কাঠের বাক্স তোলবার চেষ্টা করছে। একজন কেউ বললে, 'বাগানে গর্ত করে পুঁতে দে।' গলার আওয়াজটা......?

হুড়মুড়িয়ে সকলে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

'হাত তুলে দাঁড়া সব শয়তানগুলো।' বিরাজবাবুর কর্কশ কণ্ঠ, হাতে ধরা রিভলভার।

দেখলাম, দূরে দাঁড়িয়ে সেই মহাজন বন্ধু!

'জমাদার দুবে, হাতকড়া লাগাও!' বিরাজবাবুর বজ্র-কণ্ঠের আদেশ ঃ 'সার্জেণ্ট মরিস, কেউ আঙুল নড়ালেই গুলী চালাবে—কুত্তার মত মারবে—'

হাত কড়া-পর্ব শেষ হ'ল। লোকগুলোর সব মড়ার মত ফ্যাকাশে মুখ।

'এখনাকার সন্ধান কে দিল পুলিসকে?' মহাজনের তখনও ফোঁস-ফোঁসানি।

'চোপরাও।' বিরাজবাবু হাঁকলেন, 'জমাদার, বাক্স খোল—'

'হুজোর পিরেক আঁটা—'

'একটা কিছু খোলবার মত— ' বিরাজবাবু ইতস্ততঃ দৃষ্টিচালনা করে বলেন, 'ঐ যে একটা শাবল—ওটা দিয়ে চাড় দাও।'

জমাদার দুবে শাবলের চাড় দিতে মড়-মড় করে ডালাটা খুলে গেল। বিরাজবাবুর জোরালো টর্চের আলো পড়তে শিউরে লাফিয়ে উঠলাম—একটা মুণ্ডহীন দেহ। আর, মুণ্ডটাও রয়েছে বীভৎসতার ভীষণতম এক নমুনার মত! সেটা বিক্রমের! আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম।'

[আশ্বিন ১৩৬৬]

সত্যি খুনের কাহিনী

শিশুপাল

বেশী দিনের কথা নয়।

আমি তখন পতিগ্রাম থানার ভার নিয়ে এসে বসেছি। সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে চায়ের বাটি হাতে টেবিলের কাছে এসে সবে দাঁড়িয়েছি, হন্তদন্ত হয়ে স্থানীয় এক গ্রামের চৌকিদার এসে উপস্থিত।

তাকে অত উদ্বেগাকুল দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি, কি হয়েছে রমাকান্ত? অত ছটফট করছ কেন?

—আজ্ঞে, খুন।

পুলিসে কাজ করি বলে খুনজখমের ঘটনা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কোন উদ্বেগ আসে না মনে। তাই নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিই, লাস কোথায়?

—কাছেই, পতিগ্রামে।

চৌকিদারের কথাটা আর অবহেলা করতে পারি না। তাছাড়া এসব খুনজখম তদন্তের পর অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে বিচারে পাঠান আমার কাজ। কর্তব্য গাফিলতি করেছি এই অভিযোগ যাতে কেউ না করে তাই তাড়াতাড়ি চা-টা খেয়ে নিয়ে উঠে পড়লুম।

পথে যেতে যেতে রমাকান্ত বললে, অন্যদিনের মত কাল রাতেও সে যথারীতি রোঁদে বেরিয়েছিল। সকালের দিকে ফেরার মুখে কামিনীবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, চৌকিদার মশাই, আমার আত্মীয় কমলবাবুকে আজ দু'দিন দেখতে পাইনি। কেবল তিনিই নন তাঁর বাড়ির কেউই আমার চোখে পড়েনি। শুধু তাই নয় আজ দু'দিন বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, কোন সাড়াশব্দও নেই।

সেকথা শুনে বলি, বল কি! তা তুমি কি করলে?

—আজ্ঞে, আমি তখন জনকতক স্থানীয় লোককে সঙ্গে করে কমলবাবুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালুম। দেখি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজায় ধাক্কা দিয়ে কোন সাড়া পেলুম না। তখন ভেতরে প্রবেশ করার আর কোন উপায় না দেখে সকলে মিলে একসঙ্গে ঠেলতেই খিলটা ভেঙে দরজা খুলে গেল।

—কি দেখলে?

—প্রথমটা কিছুই দেখিনি। একটা বিশ্রী তীব্র পচা গন্ধ এসে নাকে লাগে। সারা দেহ গুলিয়ে ওঠে। আমরা যেন সেই গন্ধের ধাক্কায় ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। তারপর বিশুদ্ধ বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে নাকে চাপা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে দেখি, খোলা উঠোনে দুটি চৌকির উপর চারটি লাস পড়ে আছে। মৃতদেহ দেখে মনে হল আততায়ী তাদের দেহের উপর খুবই নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেছে।

কথা বলতে বলতে আমরা ততক্ষণে সেই বাড়ির সামনে এসে পড়েছিলুম। তাই চৌকিদারকে আর কোন প্রশ্ন না করে এই অপরাধের কোন নির্ভুল সূত্র পাওয়া যায় কিনা অনুসন্ধান শুরু করলাম। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তেমন কোন ইঙ্গিত দেখতে পেলাম না। শুধু সেই লাস কটি সেখানে পড়ে ছিল।

যখন হত্যাকারীকে সন্দেহ করবার মত তেমন কিছু নির্ভুল ঘটনা চোখে না পড়ে; আমি করি

কি, যা দেখেছি আর দেখে যা মনে হয়েছে সেটা একটা খাতায় নোট করে নি। এই রকম ক্ষেত্রে নোট করার জন্যে খাতা আমার সঙ্গেই থাকে। খাতায় লিখলাম।

"বাড়ির সামনেটা দোতলা। রাস্তার দিকে বারাণ্ডা আছে। বাড়ির ডান কোণে সিঁড়ি। বাড়ির মাঝখানে উঠোন। বারান্ডার নীচে দেওয়ালে কোন মানুষের পায়ের ছাপ আছে। বাড়ির দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ ছিল। মৃতদেহের আহত স্থানগুলি থ্যাবড়ানো নয়, সোজাসুজি কেটে গেছে। নারীদেহ থেকে অলংকারগুলি টেনে হিঁচড়ে খুলে নেওয়া হয়েছে। মৃতদেহ থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে। হাতের ছাপ নেই। নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে মনে হয়। তাছাড়া হত্যাকারী লাসগুলির আকৃতিও অস্ত্রাঘাতে বিকৃত করে রেখে গেছে।"

ঘটনাগুলি খাতায় লিখে নিয়ে থানায় চলে আসি। চৌকিদারকে বলে আসি লাসগুলো মর্গে পাঠাতে। থানায় এসে হেড অফিসে ঘটনার কথা জানিয়ে রিপোর্ট করে দি।

তারপর থানায় বসে এই ঘটনা নিয়ে ভাবতে থাকি। কোন হাতের ছাপ নেই। তাহলে নিশ্চয়ই যে খুন করেছে সে এসব কাজে অভিজ্ঞ। তাছাড়া তার লুট করাই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হত তাহলে লোকগুলিকে মেরে ফেললেই তো কাজ মিটে যেত। লাসগুলি নিষ্ঠুরভাবে বিকৃত করার দরকার হত না। নিশ্চয়ই আততায়ীর সঙ্গে নিহত ব্যক্তিদের কোন কারণে মনকষাকষি হয় যার ফলে সে প্রতিহিংসা নিয়েছে এইভাবে।

শেষের কারণটাই সব থেকে সমীচীন মনে হতে সেটা ধরেই অনুসন্ধান শুরু করি। কিন্তু কোন হদিস পাই না। টাকাকড়ি বা জমিজমা নিয়ে কমলবাবুর সঙ্গে যে কারো কখন কলহ হয়েছে এও সংবাদ কেউ দিতে পারে না। বরং লোকে উলটোটাই বলতে থাকে। তারা বলে উনি অতি সরল মানুষ। ওঁর কোন শত্রু নেই।

তখন বাধ্য হয়ে ধরে নিই চুরি করার মতলবেই অপরাধী এই কাজ করেছে। তাছাড়া যখন কমলবাবুর টাকাকড়ি দামী জামাকাপড়ের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তখন চুরি করার মতলবও যে খুনীর ছিল সেটাই প্রমাণ হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে চুরি করতে পারে? প্রথমেই মনে হল স্থানীয় বা নিকটবর্তী গ্রামের কোন কুখ্যাত লোকের কর্ম। তার সন্ধান পাওয়া যায় কি করে?

যাহোক হতাশ না হয়ে কাজ শুরু করে দিলুম। ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে। কমলবাবুর বাড়ির উলটোদিকে একটা কামারশালা ছিল। টিপনরাম তার মালিক। যেদিন কমলবাবু নিহত হয়েছেন সেদিন থেকে সে নিখোঁজ। তাই প্রথমে টিপনরামকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করি।

কাজটা যত সোজা মনে হয়েছিল, খোঁজ করতে গিয়ে দেখি তত সোজা নয়। স্থানীয় লোকেরা টিপনরামকে চেনে বটে কিন্তু কেউ তার হদিস দিতে পারে না। অনুসন্ধানের ফলে শেষে টের পাওয়া গেল পতিগ্রাম থেকে আট মাইল দূরে দক্ষিণহাড়ী গ্রামে সে প্রায় আট মাস আগে চলে গেছে। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুল হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের পর টিপনের সংবাদ পাওয়ার মধ্যে অনেক দিন পার হয়ে গেছে। দক্ষিণহাড়ী গ্রামে গিয়ে দেখি সে সেখান থেকেও উধাও হয়েছে। কেউ কোন খবর দিতে পারলে না এখন সে কোথায় আছে।

টিপনের উধাও হওয়ার খবরটা জানবার পরই তার দোকানে এসে উপস্থিত হলুম। এতদিন অপেক্ষা করে ছিলুম টিপনের সামনেই তার দোকান তল্লাশী করব। যখন বুঝলুম তাকে সহজে পাওয়া যাবে না তখন তালা ভেঙে দোকানে প্রবেশ করে দেখি ধুলো আর মাকড়সার জালে চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে আছে। চারদিক তল্লাশী করে দেখতে দেখতে এক কোণে কতকগুলি আধপোড়া কাগজ চোখে পড়ল। আধপোড়া কাগজগুলো তুলে পরীক্ষা করে দেখি সেগুলি কমলবাবুর লেখা রোজনামচার পাতার অংশ। মনে বিশ্বাস এল। অনুসন্ধান ঠিক পথে এগোচ্ছে। এইবার টিপনরামকে খুঁজে পেলে এই হত্যারহস্যের সমাধান হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়।

তখন আমার নির্দেশে টিপনরামের খোঁজ করে বেড়াতে লাগল পুলিস। সংবাদ পাওয়া গেল পতিগ্রামের ছ'মাইল উত্তরে ডোমজা গ্রামে টিপনরামের স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা বাস করে। শুধু টিপনরাম একলা পতিগ্রামে বাস করত। ডোমজা গ্রামে অনুসন্ধান করতে গিয়ে পুলিস টিপনরামের পরিবারের কাউকে খুঁজে পায় না। স্থানীয় লোকের কাছে টের পেলে তারা দিন পনেরো আগে সেখান থেকে চলে গেছে। পুলিস আরো জানতে পারলে টিপনরামের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সে হুগলী জেলার ইছাপুর গ্রামে থাকে। আর টিপনরামও হুগলী জেলার লোক। তারা আগে রাজস্থানে থাকত। আজ কয়েক পুরুষ বাংলাদেশে থেকে বাঙালীর মত হয়ে গেছে!

সে যাহোক হুগলী জেলার কোন্ অঞ্চলে তাদের আদি বাড়ি ছিল তার হদিস পাওয়া গেল না। তাছাড়া কোন্ গ্রামে তার মেয়ের শ্বশুরবাড়ি এ খোঁজও পাওয়া গেল না।

অনেক ভেবে আমি হুগলী জেলার পুলিসকে এক গোপন পত্র লিখে জানতে চাই যে তাদের ফাইলে টিপনরাম সা বলে কোন অপরাধীর নাম আছে কি না। যদি থাকে বিশদ বিবরণ যেন আমার কাছে পাঠান হয়। কারণ কোন এক খুনের কেসে টিপনরামকে আমার প্রয়োজন।

কিছুদিন বাদে হুগলীর পুলিস বিভাগ এক পত্র দিয়ে জানায় যে টিপনরাম সা বলে কোন নাম তাদের রেকর্ডে নেই। কিন্তু জীবনরাম সা বলে একজনের নাম অপরাধীর তালিকায় পাওয়া গেছে। সে বাস করে বড়গেছে গ্রামে।

সংবাদটা পেয়ে তো আমি হতাশ হয়ে পড়লুম। টিপনরামের মত একটা জলজ্যান্ত মানুষ সোজা চোখের সামনে থেকে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল! কি করব বুঝতে পারি না।

ওদিকে জেলা অফিস থেকে তাগিদের পর তাগিদ আসছে। এতদিনেও কেন একটা খুনের কিনারা হল না।

কিন্তু পুরনো ঘটনা অনুসন্ধান করে ঠিক অপরাধীকে ধরা যে কত কঠিন তা আমার মত যারা পুলিসে কাজ করে তারাই জানে!

অনেক ভেবে স্থির করলুম যে শেষ অবধি না দেখে হেড অফিসে আমার বিফলতার কথা লিখে জানাব না।

যখন অনুসন্ধান চালাবার আর দ্বিতীয় পথ কিছু খুঁজে পেলুম না তখন আশা-নিরাশায় ভর করে হুগলীর বড়গেছে গ্রামের দিকে যাত্রা করলুম।

বড়গেছে এসে স্থানীয় পুলিসের সঙ্গে দেখা করতে তারা বললে, টিপনরামকে ধরতে এসে জীবনরামের তল্লাশী চালাবেন। বেশ ভাল! তাদের কথায় সূক্ষ্ম বিদ্রূপের রেশ টের পাওয়া গেল। আমি তাদের কথায় কান না দিয়ে সেখান থেকে জনকতক কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে জীবনরামের বাড়িতে এসে হাজির হলুম।

জীবনরামের বাড়ি খড়ের হলেও বেশ বড়। তাছাড়া বাড়ির চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিল ও বাড়ির মাঝখানে মস্ত উঠোন। চাষী হিসাবে জীবনরামের অবস্থাও খুব ভাল। তার কাছে যে কোন নরহন্তা এসে আশ্রয় নেবে একথা ভাবতেও প্রবৃত্তি হয় না।

যাহোক যখন এসেছি তখন দেখেই যাই শেষ পরিণতি।

বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল।

আমার ইঙ্গিতে একজন কনস্টেবল 'জীবনরাম, জীবনরাম আছ' বলে ডাকতে লাগল। কনস্টেবলের চীৎকারে বাড়ির মধ্যে লোক নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেল। খানিকক্ষণ বাদে একটা মেয়ে দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে বললে, বাবা বাড়ি নেই। সে ভেবেছিল হয়তো অন্য কোন প্রতিবেশী তার বাবাকে ডাকছে। কিন্তু আমাদের দেখে হকচকিয়ে গেল। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে কে যেন ভেতর থেকে বললে, কে ডাকছে রে খেঁদী?

—পুলিস। মেয়েটি চেঁচিয়ে উত্তর দিল।

আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়িতে এখন কে আছে?

মেয়েটি বোকার মত আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝলুম সে ভয় পেয়েছে।

তখন মেয়েটিকে এক পাশে সরে দাঁড়াতে বলি। কারণ পুলিস দেখলে সাধারণ লোকে যেমন ভয় পায়, মেয়েটিও তেমনি ভয় পেয়ে নির্বাক হয়ে গেছল। তার কাছ থেকে সদুত্তর পাওয়া যাবে না ভেবে আমি দুজন পুলিস সঙ্গে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি।

বাড়িতে প্রবেশ করেই সামনে পড়ল মস্ত উঠোন। উঠোনের ওপাশে ঘরের দাওয়া। সেখানে মেয়েটির মা দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখে বলি, আমি পুলিসের লোক। তোমাদের বাড়ি তল্লাশী করতে এসেছি।

আমার কথায় আপত্তি জানিয়ে সে বললে, এখন কর্তা বাড়ি নেই। তিনি আগে আসুন।

আমি তার কথায় কান না দিয়েই কাজ শুরু করি।

বাড়ির ঘরগুলো বাইরে থেকে উঁকি মেরে সন্দেহজনক কিছু দেখতে না পেয়ে নিরাশ মনে উঠোনে নেমে আসি। উঠোনটা বেশ ঝরঝরে তকতকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার আগে আনমনে উঠোনের এক কোণে এসে তাগাড় করে রাখা মাটি চোখে পড়ল। মনে হল সেখানে যেন অন্য কোথা থেকে সব খোঁড়া মাটি এনে জড়ো করে রাখা হয়েছে। তাছাড়া সেখানে টাটকা পায়ের ছাপও দেখতে পেলুম। সন্দেহ হল বাড়ির সামনের ঘরগুলো তো দেখেছি, পেছনে কোন ঘর নেই তো! তাছাড়া এত মাটি এখানে এনে রাখা হল কেন?

বাড়িটা ঘিরে চারদিকেই উঠোন। একপাশ দিয়ে পেছনে এসে উপস্থিত হলাম। এখানেও সন্দেহজনক কিছু নেই।

একজন কনস্টেবল বললে, বাবু, এখানে কিছু নেই। চলুন আর দেরি করে কি হবে!

আমারও মন সে কথায় সায় দিলে। মুখে বললুম বটে তাই চল কিন্তু আমার পাদুটো আমার অজ্ঞাতে আমায় টেনে দাওয়ার উপর তুলেছে। সামনেই একটা ঘর। দরজা খোলা। খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম। দেখি একটা বড় টিনের বাক্স মেঝেতে খোলা পড়ে আছে।

কনস্টেবলদের ডাকলাম। তারা আমার কাজে বিরক্ত হচ্ছিল। কিন্তু আমার আদেশ উপেক্ষা করতে পারলে না, উঠে এল দাওয়ার উপর।

বাক্সটা দেখিয়ে বললুম, ওই বাক্সটা টেনে সরাও তো। আমার কথামত বাক্সটা সরাতেই মনে হল ভাগ্যিস তখন কনস্টেবলটার কথামত চলে যাইনি। আমার সৌভাগ্যই হয়তো আমায় ঠেলে এনেছে।

বাক্সটা সরাতে তার তলায় একটা গর্ত চোখে পড়ল। উঁকি মেরে দেখি কাপড় মুড়ি দিয়ে একটা মানুষ সেখানে লুকিয়ে আছে। মহা উৎসাহে তাকে টেনে তুলি।

টিপনরাম। আমার প্রশ্নে সে স্বীকার করে সেই টিপনরাম। আমার সব পরিশ্রম সার্থক হয়ে উঠল।

টিপনরামকে তখনি গ্রেপ্তার করে সেই গর্তটা ভাল করে অনুসন্ধান করে গোটাকতক গহনা, একটা সোনার ঘড়ি ও একটা ধারাল বিলাতী ছোরা পাওয়া গেল।

টিপনরাম ধারণাই করতে পারেনি যে পুলিস তার সন্ধান পাবে। তাই আচমকা ধরা পড়তে অপরাধ স্বীকার করে। তাছাড়া তার সভীত আচরণও তার কথা সমর্থন করে।

কিন্তু টিপনরাম যদি বিচারের সময়ে তার অপরাধ স্বীকার না করে তখন তাকে কি করে দোষী প্রমাণ করা যাবে? তার দোষ প্রমাণ করার জন্যে সাক্ষী চাই।

এখন যে গহনাগুলো গর্ত থেকে পাওয়া গেল সেগুলি যদি কমলবাবুর বলে সনাক্ত করা যায়, সোনার ঘড়িটা যদি কমলবাবুর বলে প্রমাণ হয়, তাছাড়া আর সব চোরাই মালের হদিস পাওয়া গেলে অস্বীকার করলেও, টিপনরামের সাজা হবে।

তখন আমি কমলবাবুর হিসাবের খাতা পরীক্ষা করতে থাকি। এক জায়গায় কতকগুলি গহনার কথা লেখা ছিল। তাছাড়া যে সেকরা সেগুলি বেচেছিল তার নামও পাওয়া গেল। গহনাগুলি নিয়ে আমি সেকরার কাছে গেলাম। বললাম, দেখ তো এগুলি চিনতে পার কিনা। দেখেই সে বললে, হ্যাঁ এ তো আমার হাতে তৈরী। বলেই সে তার হিসাবের খাতা খুলে দেখালে একই তারিখে সে সেগুলি কমলবাবুকে বেচেছিল।

সোনার ঘড়িটাও কে কমলবাবুকে বেচেছিল তারও সন্ধান পাওয়া গেল হিসাবের খাতা থেকে।

টিপনরামের কাছ থেকে তার পরিবারের ঠিকানা পাওয়া যায়। সেখানে গিয়ে তার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতে বললে, ছুরিটা বাবা এক বছর আগে মেলায় কিনে আমাদের বাড়ি এনেছিল।

বাকী রইল চোরাই কাপড়চোপড় খুঁজে বার করা। মনে হল টিপনরাম এগুলি নিশ্চয়ই তার কোন বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রেখেছে। এই অনুমানের উপর নির্ভর করে তার মেয়ের বাড়ি যাই। মেয়ের ঠিকানা একটা মনিঅর্ডার কুপনে লেখা ছিল। কুপনটা টিপনরামকে তল্লাশী করার সময় পাওয়া যায়।

কাপড়গুলো টিপনের মেয়ের বাড়িতে পাওয়া গেল।

টিপনরামের মেয়ে তো প্রথমে কোন কথাই স্বীকার করতে চায় না। বুঝলুম বাবাকে সে বিপদে ফেলতে অনিচ্ছুক। তাছাড়া কেই বা তার বাবাকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিতে চায়!

তাই তার মনে বিশ্বাস আনবার জন্যে বলি, কাপড়গুলো যদি টিপনরামের দেওয়া হয় তাহলে সে ছাড়া পাবে। কাপড় চুরি করেছে বলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাওয়া গেলে সে ছাড়া পাবে। তখন তার বিরুদ্ধে কাপড় চুরির অভিযোগ টেঁকবে না।

আমার এই আশ্বাসে সে সব কথা বললে। টিপনই তাকে কাপড়গুলো রাখতে দিয়েছে। তার জবানবন্দিতে সই নিয়ে টিপনকে বিচারে চালান দিই।

অপরাধ অস্বীকার সে করেছিল কিন্তু তা টেঁকেনি। অস্বীকার করবে ভেবেই সাক্ষী সব মজুত রেখেছিলাম। বিচারে তার প্রাণদণ্ড হয়।

কিন্তু একটা কথা না-বলা রয়ে গেল। শুধু কি অর্থলোভে সে কমলবাবুর বাড়ির সকলকে খুন করেছিল অমন নিষ্ঠুরভাবে?

না। প্রতিশোধ নেবার জন্যেই সে তা করেছিল। তার কোন গোপন অপরাধ কমলবাবুরা জানতেন। ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে প্রচুর টাকা আদায় করতেন। কমলবাবুদের মুখ বন্ধ করবার জন্যে তাকে মাঝে মাঝে চুরিও করতে হত। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে সে তাদের সকলকেই খুন করে। কিন্তু চুরি করা অভ্যেস থাকায় লোভ সামলাতে পারেনি। কিন্তু এই কাজ করার পরই তার ভয় হয়। তাই সে সেখান থেকে পালায়। যখন টের পেলে পুলিস তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন সে তার এক দেশোয়ালী আত্মীয় জীবনরামের কাছে আশ্রয় নেয়। জীবনরাম জানত না সে খুন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সে জীবনরামকে বুঝিয়েছিল তার এক শত্রু তার প্রাণনাশ করার জন্যে চেষ্টা করছে। জীবন সে কথা বিশ্বাস করে তাকে আশ্রয় দেয়। এইভাবে সে জীবনের আশ্রয়ে এসে পড়ে।

[আশ্বিন ১৩৬৯]

তেল চুরির রহস্য

(সত্য ঘটনা)

পূরবী দেবী

ওয়েস্টার্ন অয়েল কোম্পানির ডাইরেক্টররা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। রক্ষীর কাছে সংবাদ পেয়ে তেলের গুদোমে এসে তাঁদের চোখ ছানাবড়া। বড় বড় তেলভরতি ড্রামের মুখ কাল রাত্তিরে কে এসে সকলের অলক্ষিতে কেটে রেখে গেছে। কাটা মুখ দিয়ে সব তেল ড্রাম থেকে বেরিয়ে গেছে। উঠোনটা তেলে তেলাকার হয়ে ছোট্ট পুকুরের আকার ধারণ করেছে। তাঁরা তো ভেবে উঠতে পারেন না কে তাঁদের এমন শত্রু আছে যে শুধু তাঁদের ক্ষতি করার জন্যে প্রায় দু'লক্ষ টাকার মত তেল নষ্ট করে দিয়েছে।

গুদোমের রক্ষীকে নানারকম প্রশ্ন করেও তাঁরা কোন হদিস পান না। সে যা বলে তাতে অপরাধী যে কে তাও বোঝা যায় না। সে বলছে, গত রাত্রে একটার সময় যখন সে টহল দিয়ে গেছে তখনও কোন ক্ষতি হয়নি। তারপর সে সদরে বসে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে কেউ এসে এই সর্বনাশ করে গেছে। কারণ ভোর চারটের সময় টহল দিতে এসে দেখে ড্রামের মুখ দিয়ে হু হু করে তেল বেরিয়ে যাচ্ছে। বন্ধ করতে গিয়ে দেখে তেল বেরোবার কলের মুখ কাটা। বন্ধ করতে না পেরে সে তার চাচাকে ডেকে আনে। তার চাচা পাশের বার্মা অয়েল কোম্পানির রক্ষী। তার চাচাও তেল বেরোন বন্ধ করতে না পেরে মালিকদের খবর দিতে বলে। চাচার উপদেশ মত সে গিয়ে মালিকদের জানিয়েছে ব্যাপারটা।

ঘটনাটা খুবই ঘোরাল দেখে মালিকরা পুলিসে সংবাদ দেন। থানা থেকে একজন ইনস্‌পেক্টর এলেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনিও কোন সূত্র খুঁজে পেলেন না। তখন অন্য কোথাও কোন হদিস পাওয়া যায় কি না জানবার জন্যে তিনি যে উঠোনে ড্রামগুলো রাখা ছিল সেখানটা পরীক্ষা করতে গেলেন।

সারা উঠোনের চারদিক কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। যেখানে রক্ষী সদরে পাহারা দেয় তার বিপরীতে পেছন দিকে কাঁটাতারের সার সার লাইনে কাঁটাতারগুলো জুড়ে এক করে ফেলে কে বেঁধে দিয়েছে। বুঝতে বাকি রইল না ইন্‌স্‌পেক্টরের যে এখান দিয়েই দুর্বৃত্ত উঠোনে প্রবেশ করেছে।

কিন্তু সে বোঝাও ইন্‌স্‌পেক্টরের কাজে এল না। কারণ দুর্বৃত্ত ধরা না পড়া অবধি কোথা দিয়ে সে এসেছে, কেমন করে তেল বেরোবার কল কেটে দিয়েছে তা জেনে লাভ নেই।

ইন্‌স্‌পেক্টর পড়লেন মহামুশকিলে। এই দুষ্কার্যের নেতাকে ধরতে না পারলে, পাশাপাশি আরো তেলের গুদোম আছে, তাদেরও এই রকম ক্ষতি হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার লোকসান হবে।

কিন্তু ধরার উপায় কি? কোন সূত্রই তো নেই।

তখন ইন্‌স্‌পেক্টর গিয়ে কোম্পানির ডাইরেক্টরদের প্রশ্ন করতে শুরু করলেন।

—আপনাদের ড্রামে কত তেল ছিল বলতে পারেন কি?

—তা প্রায় দু'লক্ষ টাকার মত।

—আপনাদের মাল কি ইনসিওর করা থাকে?

—হ্যাঁ। তেলের ব্যাপার। যদি আগুন লেগে যায়। তাই ফায়ার ইনসিওর করা আছে প্রায় দু'লক্ষ টাকার মত।

—আচ্ছা, আপনাদের কোন শত্রু আছে, যাতে আপনাদের ক্ষতিতে তার আনন্দ হয়?

—না, সে রকম কেউ আছে বলে তো মনে হয় না। আমাদের পাশে যে সব কোম্পানির গুদোম আছে তাদের নাম বার্মা শেল ও স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল। তাদের সঙ্গে আমাদের অবস্থার কোন তুলনাই হয় না। তাছাড়া তেল আমাদের নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে হয়। আমাদের ক্ষতিতে তেলের দাম বাড়িয়ে তাদের লাভের সম্ভাবনা নেই।

এসব প্রশ্ন থেকেও ইন্‌স্‌পেক্টর কোন সূত্র আবিষ্কার করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়লেন কিন্তু হাল ছাড়লেন না। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কেউ এই সর্বনাশ করে গেছে।

কিন্তু কে সে আর কি তার উদ্দেশ্য?

এই কথা ভাবতে ভাবতে ইন্‌স্‌পেক্টর তাঁর অফিসে ফিরে এলেন। তারপর থেকে তিনি সদাই এই কথাই ভাবতে থাকেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হয় যে, সাধারণতঃ বড় একটা দুষ্কার্য করার আগে ছোটখাট দুষ্কার্য করে সফল হলে অপরাধীদের মনে বড়রকমের দুষ্কার্য করার সাহস জাগে। তাহলে ওয়েস্টার্ন কোম্পানির তেল এইভাবে নষ্ট করে দেওয়ার আগে নিশ্চয়ই এই ধরনের ছোটখাট অপরাধ ঘটে গেছে। কথাটায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। তাই এই ধরনের ঘটনা আগে ঘটেছে কি না জানবার জন্যে তিনি ওয়েস্টার্ন অয়েল কোম্পানির এক ডাইরেক্টরকে ফোন করেন।

ডাইরেক্টর বললেন, শুনেছিলুম বার্মা অয়েল কোম্পানির তেলের ড্রামের মুখ একদিন রাত্রে খোলা পড়ে ছিল। তাতে তাদের বেশ খানিকটা তেল নষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু তারা ভেবেছিল এটা তাদের কোন কর্মচারীর অবহেলায় ঘটেছে। তাই এ ব্যাপার নিয়ে কোন অনুসন্ধান হয়নি।

সংবাদটা পেয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর তখনই বার্মা অয়েল কোম্পানির ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর প্রশ্ন শুনে ম্যানেজার বললেন, হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। তবে মোটে সাত-আট হাজার টাকার মত মাল। ঝঞ্ঝাট পোয়াবার ভয়ে আমরা আর তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

—আচ্ছা, এর আগে কি কখনও তেল নষ্ট হয়েছে?

—না, আমাদের গুদোমে হয়নি। তবে.......

—তবে?

—তবে এখান থেকে দু'মাইল দূরে কেলিওয়াদা প্রদেশে পাইপ লাইনের সংযোগের মুখ ঢিলে হয়ে তেল চুঁইয়ে পড়ে।

—তার মানে?

—মানে আর কিছু নয়। বন্দরে জাহাজে করে তেল এলে সেই তেল পাইপ লাইনের মধ্যে দিয়ে ড্রামে এসে ভরতি হয়।

—একটু খুলে বলুন।

—আমাদের এই গুদাম বন্দর থেকে প্রায় আট মাইল দূরে। এই সমস্ত পথটার নীচে পাইপ জুড়ে জুড়ে বসানো আছে। জাহাজ থেকে তেল পাম্প করে ড্রামে পাঠিয়ে দেয়। সেই তেল পাইপের মধ্যে দিয়ে আসে। এই দীর্ঘ পাইপ লাইন কেলিওয়াদা প্রদেশ দিয়ে গেছে। সেখানে দুটো পাইপের জোড়ার মুখ মাঝে মাঝে ঢিলে হয়ে বেশ খানিকটা তেল চুঁইয়ে পড়ে।

—তা সেখানটা সারান না কেন?

—সারানো তো হয়, তবে কেন যে অকারণে ঢিলে হয়ে যায় তা বলতে পারি না।

—কতদিন এরকম ঢিলে হচ্ছে?

—তা প্রায় দু'বছর হবে।

—চুঁইয়ে পড়া তেল যদি জমা হয়ে থাকে তাহলে তো হঠাৎ আগুন ধরে ভীষণ কাণ্ড হতে পারে। তার প্রতিকারের ব্যবস্থা কি করেছেন?

এইবার ম্যানেজার হেসে ফেলে বললেন, সে ভয় নেই। পাইপের নীচে ইটের সিমেণ্টবাঁধানো দীর্ঘ নালা আছে। চুঁইয়ে পড়া তেল নালা দিয়ে গড়িয়ে একটা পাতকুয়ায় জমা হয়। প্রতিবছর ঠিকাদার সে তেল নেবার ঠিকা নেয়।

—তার মানে?

—এই সব ঝড়তি-পড়তি তেলও বিক্রী হয়ে যায়। নষ্ট তেলের পাতকুয়া জমা নেবার জন্যে প্রতিবছর নিলাম ডাকা হয়। নিলামে যে বেশী দর দেয় তাকেই জমা দেওয়া হয়।

—কত টাকায় জমা পড়ে?

—আজ থেকে আট বছর আগে প্রথম যখন জমার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তখন দর উঠেছিল আটশ টাকা। এখন দু'বছর নিলামে জমা নেবার প্রায় ৬৫০০ টাকার ডাক ওঠে।

—এখন কে ঠিকা নিয়েছে?

—গুজরাট কলার কোম্পানি। তারা দু'বছরই ঠিকা নিচ্ছে।

—কত টাকা আন্দাজ লাভ পায় বলতে পারেন?

—না, তা বলা সম্ভব নয়।

—আচ্ছা, আপনার উঠোনে যে ড্রামের মুখ খুলে তেল পড়ে গেল সেই তেলও কি নালা দিয়ে পাতকুয়ায় জমা হয়েছে?

—তাছাড়া আর কোথায় যাবে বলুন।

—আচ্ছা, এই দুষ্কার্য কি ঠিকাদাররা করতে পারে?

—আমার তো তা মনে হয় না। কারণ তারা থাকে বোম্বে শহরে। কেলিওয়াদা অঞ্চল থেকে প্রায় ছ'মাইল দূরে। তারা এ কাজ করলে কেউ না কেউ দেখে ফেলবে।

এইসব জেরাতেও এমন কোন সূত্র পাওয়া গেল না যা থেকে ইন্‌স্‌পেক্টর প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান পান। তখন তিনি ঠিক করলেন, গোপনে কেলিওয়াদা অঞ্চলে তদন্ত চালাবেন—যদি কোন সূত্র পান।

কেলিওয়াদা অঞ্চলে একদিন একজন দালালকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। সে অঞ্চলের লোকেরা খুব দুঃস্থ। কোন রকমে দিন এনে দিন চালান গোছের অবস্থা।

সেই সব লোকেদের মধ্যে লছমন নামে একটা লোককে খুব সচ্ছল বাবুয়ানী চালে চলতে দেখা যায়। লোকটা হঠাৎ সচ্ছল হয়ে ওঠায় তার প্রতিবেশীদেরও দৃষ্টি তার উপর এসে পড়ে।

লোকের ঘরে ঘরে কি জিনিস দরকার খোঁজ নিতে নিতে একদিন সেই দালাল লছমনের সংবাদ পায়। কথায় কথায় তার ঠিকানা জেনে নিয়ে সে তার বাড়ির কাছে এসে অলক্ষ্যে তার ঘরের উপর দৃষ্টি রাখে।

এক দিন দু'দিন কেটে গেল। বিশেষ কিছু ঘটল না। তৃতীয় দিনে একজন লোককে তার বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখা গেল। খানিক বাদে লোকটি উত্তেজিত হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। তাকে বলতে শোনা গেল, আমি সব জানি, যদি আমায় উপযুক্ত টাকা না দাও তো সব কথা পুলিসে ফাঁস করে দেব।

কথাটা দালালবেশী ইন্‌স্‌পেক্টরের কানে যায়। তিনি গোপনে লোকটির অনুসরণ করেন। তার পেছনে পেছনে এসে বন্দরে উপস্থিত হন। সে যখন তার ঘরে ঢুকছিল ইন্‌স্‌পেক্টর কাছে এসে বললেন, একবার শোন।

চমকে উঠে লোকটা পেছন ফিরে তাকাল। ইন্‌স্‌পেক্টর তাকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তোমায় এখুনি আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

সে বললে, সে কি করে হবে। আমি এখানকার রক্ষী। আর কিছুক্ষণ বাদেই আমার ডিউটি পড়বে।

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন, যদি তুমি এখনি না আস তোমায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাব। আর যদি ভালয়-ভালয় আস তাহলে তোমায় গোটাকতক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব। যদি সদুত্তর দাও ছেড়ে দেব।

কোন উপায় না দেখে লোকটি ইন্‌স্‌পেক্টরের সঙ্গে যেতে শুরু করে। লোকটির নাম রসুল।

এই ঘটনার পর তিন দিন বাদে গুজরাট অয়েল কোম্পানির তিনজন অংশীদার—সেঠ সিং, জেটমল ও শুকনরামকে থানায় উপস্থিত থাকতে দেখা গেল। ইন্‌স্‌পেক্টর তাদের বিরুদ্ধে ওয়েস্টার্ন অয়েল কোম্পানির ক্ষতি করার অভিযোগে পুলিস কেস করেছেন। যাতে মামলাটা মিটে যায় সেই উদ্দেশ্যে তারা তিনজনেই আজ থানায় এসেছে।

ইন্‌স্‌পেক্টর যখন তাদের সঙ্গে কথা বলছেন, হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। রিসিভারটা কানে তুলে নিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর শুনতে পেলেন যে লছমন মারাত্মকভাবে আগুনে পুড়ে গেছে। বাঁচবার আশা নেই। সে মারা যাবার আগে কি যেন বলতে চায়। আপনাকে খুঁজছে।

খবরটা শুনেই ইন্‌স্‌পেক্টর চমকে উঠলেন। তিনি তক্ষুনি গুজরাট অয়েল কোম্পানির অংশীদারদের বিদায় দিয়ে লছমনের বাড়ির দিকে দৌড়লেন।

বাড়ি পৌঁছে তার কাছে হাজির হয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর চমকে উঠলেন। সে তখন ধুঁকছে। চোখদুটো পুড়ে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে।

ইন্‌স্‌পেক্টর আসতে যে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বহুকষ্টে বললে, আজ দুপুরে সেঠ সিং, জেটমল ও শুকনরাম এসে তাকে শাসায়। বলে সে যদি মিথ্যে সাক্ষী না দেয় তাকে খুন করবে।

সে রাজী না হওয়ায় তার গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন দিয়ে তারা পালিয়ে গেছে।

এই বলে লছমন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে।

ইন্‌স্‌পেক্টর যদিও তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দি লিখে নিলেন তবুও তার কথা সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারেন না। কারণ সেদিন ঠিক সেই সময়ে তারা তিনজন তাঁর অফিসে বসে ছিল। কিন্তু ঘটনাটার মধ্যে যে খুব রহস্য আছে সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ হয়নি। তাছাড়া লছমনের মৃত্যুতে ইন্‌স্‌পেক্টরও খুব হতাশ হয়ে পড়লেন। কারণ প্রথম যেদিন তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে থানায় এসে জবানবন্দি নেন, লছমন বলেছিল গুজরাট অয়েল কোম্পানির অংশীদার সেঠ সিং প্রায়ই বন্দরে এসে খোঁজ নিত কোন তেলের জাহাজ এসেছে কি না। যদি এসে থাকে তাহলে কবে ও কখন পাইপ লাইনের মধ্যে দিয়ে তেল পাঠাবে।

তাছাড়া সে আরো বলেছিল, যেদিন ওয়েস্টার্ন অয়েল কোম্পানির তেল ড্রাম থেকে বেরিয়ে নষ্ট হয়ে যায় সেদিনই সকালে বন্দর থেকে তেল পাঠিয়ে সেটা ভরতি করা হয়েছিল। এই সংবাদ সেঠ সিং অনুসন্ধান করতে আসার অজুহাতে তার কাছে জেনে গেছে।

এই খবরের উপরে নির্ভর করে গুজরাট অয়েল কোম্পানির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করা যায় না বটে কিন্তু ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যে তারা ভালভাবে লিপ্ত আছে তা বোঝা যায়। তাই এই অংশীদারদের সঙ্গে যারা লিপ্ত আছে তাদের ভয় দেখাবার জন্যে ইন্‌স্‌পেক্টর অংশীদারদের বিরুদ্ধে মামলা করে তাদের প্রথমেই গ্রেপ্তার করেন। জামিনে খালাস হয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবার জন্যে তারা সেদিন থানায় হাজির হয়েছিল। আর তাদের বিরুদ্ধে পাছে সাক্ষী দেয় এই ভয়ে নিজেদের পরিচয়ে ছদ্মবেশী গুণ্ডা পাঠিয়ে লছমনকে সরিয়ে দিলে চিরদিনের মত।

যাক সে কথা।

মামলার শুনানি শুরু হল। কাঠগড়ায় আসামী অংশীদারেরা উপস্থিত। তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে যে উঠল তাকে দেখে তারা আঁৎকে উঠল। সে হল রসুল। কাঠগড়ায় উঠে রসুল বললে, এই অংশীদাররা তাকে প্রলোভন দেখায়, তার ফলে সে প্রথম প্রথম কেলিওয়াদা প্রদেশের পাইপের সংযোগের মুখ ঢিলে করে দিত। এই কাজের জন্যে আসামীরা তাকে প্রতিবার হাজার টাকা করে পারিশ্রমিক দিয়েছে।

সে আরো বলে, আসামীদের প্ররোচনায় ওয়েস্টার্ন অয়েল কোম্পানির ড্রামের মুখ কেটে তেল বার করে দিয়েছিল।

কিন্তু মাত্র একজন লোকের সাক্ষীর উপর নির্ভর করে তো কাউকে সাজা দেওয়া যায় না। তাই ইন্‌স্‌পেক্টর বার্মা অয়েল কোম্পানির ম্যানেজারকেও সমন দিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান।

ম্যানেজার তাঁর সাক্ষীতে বলেন, প্রথমে যখন পাতকুয়া জমা দেওয়া শুরু হয় তখন নিলামে দাম উঠত আটশ-নশ টাকা। কিন্তু সে সময়ে পাইপ ফাঁক হয়ে তেল বেরোত না। যেটুকু নষ্ট হত তা কাজ করতে গেলেই হয়। কিন্তু এই আসামীরা জমা নেবার পর ঘন ঘন তেল নষ্ট হচ্ছে।

সাক্ষীদের জবানবন্দি শুনে বিচারক সব দিক বিচার করে আসামীদের যথাযোগ্য শাস্তি দিলেন।

বিচার শেষ হয়ে যাবার পর ওয়েস্টার্ন অয়েল কোম্পানির অফিসে একদিন ইন্‌স্‌পেক্টরকে বসে থাকতে দেখা গেল। একজন ডিরেকটর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি করে অপরাধীদের আবিষ্কার করলেন?

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন, শুধু চিন্তা করে।

—কি রকম?

—কোন কাজই মানুষ বিনা কারণে করে না। কারণ দু'রকম হয়। একটা হিংসামূলক আর একটা লাভজনক। প্রথম কারণটা বিশ্লেষণ করে বাদ দিই। কারণ আপনাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে পারে আপনাদের প্রতিযোগী কোম্পানি। কিন্তু তারা এত বড় যে এদিকে তাদের নজর পড়বে না।

তখন অনুসন্ধান শুরু করি এ কাজে কাদের লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। যখন জানলাম স্বাভাবিকভাবে নষ্ট হওয়া তেল যে পরিমাণে পাতকুয়ায় জমা হয় তার যা মূল্য, এখনকার জমা নেওয়া মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশী, তখন এই ঠিকাদারদের উপর সন্দেহ পড়ে।

শুধু সন্দেহে কাউকে তো অপরাধী করা যায় না। তাই সাক্ষীর জন্যে কেলিওয়াদা প্রদেশে অনুসন্ধান চালাই। ভাগ্যক্রমে লছমনের নাম জানতে পারি। তার উপর নজর রাখতে গিয়ে রসুলের দেখা পাই। তার কাছে সব শুনে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হয়। বাকী খবর আপনারা জানেন।

এই বলে ইন্‌স্‌পেক্টর উঠে পড়লেন চেয়ার ঠেলে।

[ফাল্গুন ১৩৭১]

ভানুমতীর খেল

প্রফুল্ল সরকার

ডায়মণ্ড হারবার থেকে উজানে আরও আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরে। এখানে গঙ্গার যে অপূর্ব রূপ, তোমরা হয়তো তা' অনেকে দেখোনি। গঙ্গা এখানে লক্ষ ঢেউয়ের হাততালি বাজিয়ে চলেছে বঙ্গোপসাগরে মেলবার জন্যে। এর এক পারে মেদিনীপুর জেলা, অপর পারে চব্বিশ পরগনা। এপার থেকে ওপার ঝাপসা দেখায়।

কলকাতা কাস্টম্‌সের জাঁদরেল অফিসার দীপঙ্কর দত্ত এতক্ষণ তীর ঘেঁষে নোঙ্গর করা তার ছোট লঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে দেখছিল। তার একটু দূরে তার অনুচরেরা আর একটা মাঝারি নৌকোয় অপেক্ষা করছিল। মেদিনীপুরের কূলের দিকেও আর একটা নৌকো ও লঞ্চে বাছা বাছা জন দশ-বারো অফিসার তৈরী হয়ে বসে ছিল।

'ঈস্টার্ন লাইট' নামে জাহাজটি হংকং হয়ে কলকাতা বন্দরে আসছে মালপত্তর নিয়ে। খবর এসেছে ঐ জাহাজে প্রায় লাখ ছয়েক টাকার সোনা বর্মার শান এস্টেট আর হংকং থেকে কলকাতায় চোরাচালান হয়ে আসছে। দীপঙ্কর দত্ত আর তার অনুচরেরা তাই ঘাঁটি আগলে আছে। নিঃশব্দে জাহাজটিকে অনুসরণ করবে, জলপথে কোথাও সোনা নামানোর চেষ্টা করলে ধরে ফেলবে।

তার আগে ব্যাপারটা তোমাদের একটু বুঝিয়ে বলি। আমাদের দেশে সোনার খুব চড়া দাম। অথচ য়ুরোপ বা পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোয় সোনার দাম অনেক কম। আমাদের দেশে সোনার চোরাচালানের তাই খুব ফলাও কারবার। জাহাজে, এরোপ্লেনে, মোটরগাড়িতে সীমান্ত পেরিয়ে এই সব সোনা লুকিয়ে আমদানি করবার জন্যে খুব বড়ো আন্তর্জাতিক দল আছে। তাদের ঘাঁটি য়ুরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্যের রাজধানীতে রাজধানীতে ছড়িয়ে আছে। তোমরা খবরের কাগজে হয়তো মাঝে মাঝে দেখে থাকবে, প্রায় প্রতি মাসেই বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতার বন্দরে, দমদম ও অন্যান্য এরোড্রোমে লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা ধরবার খবর বেরোয়। কাস্টম্‌স্ অফিসারেরা, জল-পুলিসেরা এই সব সোনা-চোরের সন্ধানে থাকে, খবরাখবর যোগাড় করে ও কিছুসংখ্যক লোককে ধরেও ফেলে। কিছু লোক আবার বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিয়ে কাস্টমস্ পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে বেরিয়েও যায়। পূর্বাঞ্চলের জাহাজীরা, যাদের মধ্যে চীনাদের সংখ্যা বেশী, তারা সোনা কলকাতায় আনে, বদলে আফিম নিয়ে যায় সিঙ্গাপুর, হংকং আর বর্মার নানা অঞ্চলে লুকিয়ে চালান দেবার জন্যে। এদের দল যেমন দুর্ধর্ষ আবার তেমনি নিষ্ঠুর। ঘুণাক্ষরে শত্রুর একটু গন্ধ পেলে নিমেষে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে এদের একটুও দ্বিধা নেই।

দীপঙ্কর দত্ত কলকাতা কাস্টম্‌সের নামকরা তীক্ষ্ণবুদ্ধি অফিসার। প্রায় পাঁচ-ছ' কোটি টাকার চোরাই সোনা সে এই কয়েক বছরের মধ্যে ধরে ফেলেছে। ছ'ফুটের ওপর লম্বা, ব্যায়াম-করা শক্ত চেহারা, দুর্জয় সাহস। লড়াইয়ের গন্ধ পেলে বাঘের ডেরায়ও সে একলা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে—এমনি একরোখা।

কলকাতা বন্দরে কড়া পাহারার জন্যে এই সব জাহাজগুলো বন্দরে আসার আগেই এদের দু'তিনটে ঘাঁটির কাছে থেমে পড়ে। দলের লোক সজাগ থাকে, নৌকো নিয়ে জাহাজের কাছে আসে, তারপর পরিচিত সংকেত দেওয়া-নেওয়ার পর সোনা নামিয়ে দেয় গোপনে, সাধারণতঃ রাত্রির অন্ধকারে।

বন্দরে এসে যতোই তল্লাশ করো—ভোঁ ভোঁ। আবার ফিরতিপথে এইভাবেই আফিম তুলে নিয়ে যায়। সন্দেহ হলে কাস্টম্‌সের চোরাচালানরোধকারী বিভাগ থেকে প্রায়ই গোটা জাহাজ তল্লাশ হয়, ইংরেজীতে একে বলে "রামেজিং"।

এই সব চোরাচালানকারীদের দলে আছে নোয়াখালি আর চট্টগ্রামের মাঝি-মাল্লারা, তাদের আড়ালে বড় বড় চোরাকারবারীরা—সব জাতের সব ধর্মের। গঙ্গার কূলে কূলে ছোট ছোট গ্রাম, ছোট ছোট কুঁড়েঘরের জটলা, তীরে বাঁধা জেলেডিঙ্গির বহর। বাইরে থেকে দেখলে কিছু বোঝা যায় না। লোকগুলো মিশকালো, রোগা চনচনে, শালিকপাখির মতো ঘোলা ঘোলা চোখ, দৃষ্টি কিন্তু খুব সজাগ। অচেনা লোক দেখলেই সতর্ক হয়ে যাবে। মিটমিট করে চেয়ে বলবে, কোর্তা, কুত্থন্ আইছেন, যাইবেন কোই? আগন্তুকের একেবারে নাড়ীনক্ষত্রের হদিস না করে ছাড়ান দেবে না, বেগতিক দেখলে গুম করে দিতেও পেছপাও হয় না।

দীপঙ্কর দত্তকে এরা ডরায় যেমন, ঘেন্নাও করে তেমনি। ওদের পথের কাঁটা দীপঙ্কর দত্তকে অনেকবার এ জগৎ থেকে একদম সরিয়ে ফেলবার অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি।

নির্দিষ্ট সময়ের চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেল, তবু জাহাজের দেখা নেই। এমনও হতে পারে জাহাজটা অন্য কোন বন্দরে আটকে পড়েছে, কিংবা কলকবজা হয়তো বিগড়েছে। কয়েকজন অফিসারকে লঞ্চে ও নৌকোয় ওখানে ঘাঁটি হিসেবে রেখে, দীপঙ্কর বাকী দলবল নিয়ে ডায়মণ্ড হারবারের দিকে রওনা দিলে। বজবজের একটু দূরে নোঙ্গর ফেলে দীপঙ্কর অপেক্ষা করতে লাগলো। কানে ছিপির মতো হেডফোন আর সিগারেট লাইটারের সঙ্গে ছোট্ট জোরালো ট্রান্সমিটারের সাহায্যে দুটো ঘাঁটিতে যোগাযোগ রাখা হচ্ছিলো। খাওয়াদাওয়া শোওয়া সব লঞ্চে আর নৌকোয়। কাজের সঙ্গে পিকনিকের খানিকটা আমেজ।

সেদিন খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরের একটু পরে দীপঙ্কর তীরে উঠে পায়চারি করছিল, লঞ্চ থেকে প্রায় মাইল খানেক এগিয়ে এসেছে। দীপঙ্করকে এখন চেনা মুশকিল, মনে হবে জনৈক আধবুড়ো সারেঙ তীরে-বাঁধা সাহেব কোম্পানির লঞ্চ থেকে নেমে ডাঙ্গায় উঠে একটু হাওয়া খেয়ে নিচ্ছে। দীপঙ্কর ছদ্মবেশে খুব পটু। এই সব গোপন পাহারার সময় আসল পরিচয় লুকিয়ে না রাখতে পারলে সব বিফল।

হঠাৎ একটা বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে, কালো পাথরের প্রতিমার মতো নিখুঁত গড়ন, দীপঙ্করের সামনে এসে দাঁড়ালো। তার দু'চোখে জল ঝরছে। দীপঙ্কর নোয়াখালির মাঝিমাল্লার ভাষায় জিজ্ঞেস করলে, কাঁদছো কেন মেয়ে? কি হয়েছে?

মেয়েটি জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, তারপর কান্না একটু থামিয়ে বললে, কাস্টমের বড়বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করবো।

দীপঙ্কর বললে, কেন, কি দরকার?

মেয়েটি বললে, খবর দেব।

দীপঙ্কর উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি খবর দেবে?

মেয়েটি বললে, সোনার খবর। আমি দেখেছি, মাটির নীচে একটা চোরাকুঠরিতে আমার চাচা অনেক সোনা নামিয়ে রেখেছে। কয়েকটা চীনেম্যানও এসে জুটেছে।

দীপঙ্কর সন্দিগ্ধ হয়ে বললে, তুমি এ খবর দিচ্ছ কেন?

মেয়েটি আবার ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, মিথ্যে সন্দো করে আমার ভাইকে ওরা খুন করে জাহাজের ইঞ্জিনঘরে লাশ পুড়িয়ে দিয়েছে, আমি শোধ নিতে চাই।

মেয়েটির চোখে যেন ছুরি ঝলসে উঠলো।

দীপঙ্কর একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি করে জানলে, এখানে কাস্টম্‌সের বড়বাবুর দেখা পাবে?

মেয়েটি বললে, ওরা বলাবলি করছিল, আমি আড়াল থেকে শুনেছি।

—তুমি কে? কোথায় থাক?

—আমার নাম ভানুমতী, পাঁচপাড়ায় আমার চাচার বাড়ি থাকি। আমার চাচার নাম হাবিব।

দীপঙ্কর একটু চিন্তা করে নিলে, তবে কি ঈস্টার্ন লাইটের খবরটা ঠিক নয়! পরশু যে 'ওরিয়েন্ট বীম' জাহাজখানা হংকং থেকে কলকাতার বন্দরে এসেছে, তার থেকে সোনা নামানো হয়েছে! হতেও পারে! আগে এরকম হঠাৎ উড়ো খবরে বড়রকমের মজুত সোনা ধরা পড়েছে। মেয়েটা চীনাম্যানের কথাও বললে। এই মালটাও কলকাতার ওয়াং চাং-এর দলের। দীপঙ্কর গভীরভাবে ভাবতে লাগলো।

মেয়েটি অধীর হয়ে বললে, আমায় নিয়ে চলেন কর্তা, বড়বাবুর কাছে।

দীপঙ্কর অন্যমনস্ক হয়ে বললে, আমাকে বললেই হবে।

কখন অজান্তে তার জিভ থেকে নোয়াখালি মাল্লাই টান সরে গেছে, সাদা বাঙ্গলায় কথা বলছে, দীপঙ্করের খেয়াল ছিল না।

মেয়েটি অবাক্ হয়ে দীপঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে বললে, আপনাকে বললেই হবে?

দীপঙ্কর বললে, হ্যাঁ।

মেয়েটি বললে, তবে চলেন কর্তা। আমার দেরি হলে ওরা আবার সন্দো করবে।

দীপঙ্কর বললে, একটু দাঁড়াও, আমি লঞ্চ থেকে একবার ঘুরে আসি।

মেয়েটি দৃঢ় আপত্তি করে বললে, না কর্তা, তাহলে আমি যাই, আর কেউ জানলে আমি জানে বাঁচবো না, কার মনে কি আছে বলা যায় না, পাঁচকান হলে আমার জান যাবে। আপনি তো শুধু যাবেন আর জায়গাটা দেখে ফিরবেন, তারপর যা ইচ্ছে হয় করুন। আর আপনার একলা যেতে যদি ভয় হয়, তাহলে থাক!

দীপঙ্কর ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, ভয়? আচ্ছা তাহলে চল। একটু দাঁড়াও, একটা সিগারেট ধরিয়ে নিই।

কিছুদূরে একটা ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর সিগারেট ধরালে, আর সেই ফাঁকে লাইটার-ট্রান্সমিটারে লঞ্চে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট সুনীল চৌধুরীকে খবর পাঠালে : সুনীল, আমি হঠাৎ একটা জরুরী খবর পেয়ে একটা জায়গা দেখার জন্যে পাঁচপাড়া যাচ্ছি। আজ রাত্তির বারোটার মধ্যে না ফিরলে হেডকোয়ার্টার্সে খবর পাঠাবে, আর্মড্ পুলিস নিয়ে পাঁচপাড়া ঘেরাও করবে। ওয়াং চাং মনে হয় ওখানে এসেছে। তারপর কাপড়ের ভাঁজের ভেতর গুলিভর্তি রিভলবারটা একবার ওপর থেকে টিপে দেখলো, ঠিক আছে। তারপর বললে, চলো।

দূরে একটা জেলে ডিঙ্গিতে একটি মাঝি বসে ছিল। ভানুমতী দীপঙ্করকে নিয়ে ডিঙ্গিতে উঠলো। দীপঙ্কর জিজ্ঞাসুচোখে একবার মাঝির দিকে তাকালো।

ভানুমতী ফিক্ করে হেসে বললে, ভয় নেই কর্তা, ও বোবা আর কালা। আপনি বরং হালে বসেন, কেউ সন্দো করবে না। ভয় করে তো ফিরে যান, বরং বড়বাবুকে পাঠিয়ে দিন, ওরা বলে, ওঁর ভয়ডর নেই।

প্রতিশোধ নেবার উত্তেজনায় ভানুমতীর চোখের জলের আর কোন চিহ্ন ছিল না। সে দীপঙ্করের দিকে অবজ্ঞাভরা চোখে চেয়ে রইলো।

দীপঙ্কর বললে, ভয়ের কি আছে, চলো।

দীপঙ্কর হাল ধরে বসলো।

সবে সন্ধ্যা হয়েছে। পাঁচপাড়ার কাছাকাছি এক ঘনঝোপ গাছগাছালির জটলার কাছে অন্ধকার যেন দানা বেঁধে চেপে বসছে। এদিকটার ধারেকাছে কোথাও লোকালয় নেই বলে মনে হচ্ছে। ভানুমতী ওখানে থামতে বললে। তড়াক করে লাফ দিয়ে সে তীরে নামলো, চাপা গলায় বললে, কর্তা, একটু বসেন, আমি চারদিক দেখে শুনে আসছি কেউ কোথাও আছে কি না, তারপর—

বলতে বলতে ভানুমতী ঝোপজঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক ঘণ্টা কেটে গেল, ভানুমতী ফেরে না। দীপঙ্কর উসখুস করছে। ভয় নয়, কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে। বোবা-কালা মাঝিটা অন্ধকারে দাঁড় হাতে তার দিকে চেয়ে আছে, এটা সে বুঝতে পারলে। হঠাৎ দীপঙ্কর উঠে দাঁড়ালো, ভাবলো, এখানে চুপচাপ বসে না থেকে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তীরে উঠে ভানুমতীর জন্যে একটু খোঁজ-তল্লাশ করা যাক। হয়তো এধার-ওধার লোকজন আছে বলে ভানুমতী ফিরে আসার সুযোগ পাচ্ছে না। দীপঙ্কর মনে মনে হাসলো, তার এই ছদ্মবেশে তাকে চিনে বের করা একরকম দুঃসাধ্য। ভানুমতী মেয়েটা যেমন বোকা তেমনি সরল। এককথাতেই আমাকে নিয়ে এলো, ভেবেও দেখলে না আমি কাস্টম্‌সের লোক না অন্য কেউ। হঠাৎ ধক্ করে একটা দৃশ্য দীপঙ্করের চোখে ভেসে উঠলো। দিন দুয়েক আগে একটা পাগলী লঞ্চে উঠে সরাসরি তার কেবিনের ভেতর ঢুকে পড়েছিল,—কাঁদছে, হাসছে, ভাত চাইছে, নাচছে, গাইছে। অনেক কষ্টে তাকে লঞ্চ থেকে নামানো হয়েছিল। সেই পাগলীটাই ভানুমতী নয় তো? হঠাৎ দীপঙ্কর নৌকো থেকে লাফ দিয়ে তীরে নামতে যাচ্ছে, এমন সময় অন্ধকারে ঐ বোবা-কালা মাঝিটা তার মাথার ওপর সজোরে দাঁড়ের এক প্রচণ্ড ঘা বসিয়ে দিলে। দীপঙ্করের মাথাটা তীব্র যন্ত্রণায় ঝনঝন করতে লাগলো। কিন্তু পলক পড়তে না পড়তে দীপঙ্কর কাপড়ের ভাঁজ থেকে রিভলবার বের করে আততায়ীকে লক্ষ্য করে অভ্যস্তহাতে পরপর দু'বার গুলি ছুড়লে। তার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, লোকটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলো, তারপর একটা ভারী দেহের জলে পড়বার ঝপ্ করে শব্দ হলো। গুলির শব্দে চারদিকের নিস্তব্ধতা কেঁপে উঠলো। আর আত্মগোপন অসম্ভব। অন্ধকারে এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে রিভলবার বাগিয়ে ধরে ডিঙ্গিতে লাফ দিয়ে পড়ার আগেই তীরের ওপর থেকে তাকে লক্ষ্য করে চার-পাঁচটা রিভলবার গর্জে উঠলো। একটা গুলি তার বাঁ কবজিতে লাগলো, দীপঙ্কর মুহূর্তের মধ্যে সেই গঙ্গার চরের কাদার ওপর সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। একটা গুলি বোধহয় ডিঙ্গিটার দড়িতে লাগলো, সেটা স্রোতের টানে ভেসে চললো। দীপঙ্কর সেই শোয়া অবস্থায় অন্ধকার লক্ষ্য করে বাকি চারটে গুলি পরপর ছুড়লে, কারো লাগলো কি না বুঝতে পারলে না। ওপরের দিকে হঠাৎ আবার সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বাঁ হাত দিয়ে অবিশ্রাম রক্ত পড়ছে, মাথাটাও বোধহয় কেটে গেছে, দীপঙ্কর যন্ত্রণায় অধীর হয়ে পড়লো, তার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। তারপর সে বুঝতে পারলে একদল লোক তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, দু'একটা ভারী জিনিসের ঘা সরাসরি তার মাথায় এসে লাগলো। দীপঙ্কর অজ্ঞান হয়ে গেল।

অল্প অল্প করে যখন দীপঙ্করের জ্ঞান ফিরে এলো, সে আধবোজা চোখে চেয়ে দেখলে, একটা মাটির ঘরের মেঝের ওপর সে পড়ে আছে। একটা কেরোসিনের লণ্ঠন মিটমিট করে জ্বলছে। একটা টুলের ওপর স্বয়ং ওয়াং চাং বসে আছে। তার পাশে সোনাপট্টির ফকিরচাঁদ, পার্ক সার্কাসের ফিরোজ শাহ এবং আরও কে কে, দীপঙ্কর তাদের চিনতে পারলো না। পাঁচপাড়ার নেয়ামৎ সর্দার চাপা গলায় কথা বলছে—আমাদের মরিয়ম বিটী বড়বাবুরে এক্কারে কাৎ কইর‍্যা ফ্যালাইসে, বিটী আমাগোর বাহাদুর বটি সায়েব!

ওয়াং চাং বাংলা বোঝে। একটা দানবের মতো হাসছে। দীপঙ্কর দেখলে, ওয়াং-এর এক হাতে সেই লাইটার-ট্রান্সমিটারটা আর এক হাতে সেই ছোট্ট হেডফোন দুটো। তার রিভলবারটি একটা ছোট্ট চৌকির ওপর রাখা হয়েছে।

ওয়াং চাং বাজের মতো আওয়াজ করে বললে, জলদি করো, দেখো, উসকো উঠাও, আভি উল্লু আচ্ছা হো গিয়া হোগা।

দীপঙ্কর দেখলো ইতিমধ্যে তার হাতে ব্যাণ্ডেজের মতো কাপড় বাঁধা হয়েছে, রক্ত পড়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ক'জন লোক ওকে ধরাধরি করে বসালে। দীপঙ্কর সেই স্বল্প আলোয় চোখ আধবোজা অবস্থায় ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ওয়াং ট্রান্সমিটারটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, এই উল্লু, এঠো লেও, খবর ভেজো, তুম আচ্ছা হায়, হুঁয়াসে ও লোককো কলকাত্তা চলা যানে বোলো—জলদি করো।

দীপঙ্করের ভেতরটা গর্জে উঠলো, কিন্তু সে দুর্বল, ক্ষীণগলায় বললে, নেভার! তোমাকে আমি এমন শিক্ষা দেবো, জীবনে ভুলবে না।

সে হাত তুলতে গেল, কিন্তু যন্ত্রণায় তার সর্বশরীর যেন কুঁচকে গেল।

ওয়াং তার ছোট কুতকুতে চোখ দুটো কুঁচকে হিংস্র বন্য জানোয়ারের মতো হাসতে লাগলো, তারপর হাঁক দিয়ে বললে, ফির দাওয়াই খিলানে হোগা—নেয়ামৎ—

নেয়ামৎ বললে, আপনি গুস্ (ঘুষ) কায়েন না, ঝুটমুট মার খাইবেন ক্যান? সায়েব যা কইচে, কইয়া দেয়ান।

দীপঙ্কর উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললে, কক্ষণো না!

নেয়ামৎ যেন হাল ছাড়ার ভঙ্গিতে বললে, তবে জানে মরবেন—

দীপঙ্কর বললে, কুছ পরোয়া নেই!

এই সময় একজন এক পেয়ালা ধোঁয়া-ওঠা চা নিয়ে ঢুকলো।

নেয়ামৎ বললে, তবে এড্ডু গরম চা খায়েন, পিছে বাৎ অইব। দীপঙ্কর বললে, না। হয়তো ওতে তীব্র বিষ মেশানো, এক চুমুকেই সব শেষ হয়ে যাবে।

দীপঙ্কর এটা বুঝেছে যে এখান থেকে জীবন্ত সে ফিরে যেতে পারবে না, কারণ ওদের পুরো দলটাকে সে দেখে নিয়েছে। ফিরতে পারলে এদের সে একবারে এদেশ-ছাড়া করে দিতে পারবে, এ ভয় এদের আছে। সুতরাং যতক্ষণ পারে সে মরদের মতো যুঝবে, তারপর মা কালী যা করেন তাই হবে।

ওদের কথামতো খবর পাঠাতে দীপঙ্কর যখন কিছুতেই রাজী হলো না, তখন ওয়াং চাং সকলের সঙ্গে একমত হয়ে দীপঙ্করকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ঠিক করলো। এও ঠিক হলো যে, দীপঙ্করকে গুলি করে সহজে মরবার সুবিধে দেওয়া হবে না। বেটা এদেশে-ওদেশে বহুত সরিফ আদমীকে জ্বালিয়েছে, অনেক মেহনত আর লাখ লাখ টাকার মুনাফাতে ছাই দিয়েছে, সুতরাং ওকে একটু একটু করে তিলে তিলে মারবার ষড়যন্ত্র হলো। কেউ বললে, গঙ্গার ধারে যে গাড্ডাটা কাটা হয়েছে সেখানে ফেলে বেটাকে মাটি চাপা দেওয়া হোক; কেউ বললে, মাটির তলায় যে চোরকুঠরি আছে, সেখানে বেটাকে হাত-পা বেঁধে ফেলে বাঁশের চোঙার মধ্যে যে চারটে কেউটে সাপ সদ্য ধরা আছে, ওগুলো ছেড়ে দেওয়া হোক, বেটা বিষের জ্বালায় জ্বলে মরুক।

এমন সময় সেই স্বল্পালোকিত ঘরে ভানুমতী ওরফে মরিয়ম ঢুকলো। সে বোধহয় বাইরে থেকে এদের কথাবার্তা শুনছিল, ওয়াংকে বললে, সায়েব, অনেক কষ্টে পাগলী সেজে, চোখে গ্লিসারিন ঢেলে নকল কান্নাকাটি করে আমি ওনাকে শিকার ধরেছি, ওকে খতম করবার মওকাটাও আমাকে দিন। মনসুর আর আমি কাজ হাঁসিল করবো। দীপঙ্করের দিকে চেয়ে ভানুমতী ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে লাগলো। ঘৃণায় রাগে দীপঙ্কর চোখ বন্ধ করলে।

সোনাপট্টির ঝানু মহাজন ফকিরচাঁদ এদের মধ্যে ভাল বাংলা জানে। সেই ট্রান্সমিটারে খবর পাঠাবে ঠিক হলো। ফকিরচাঁদ ট্রান্সমিটারের চাবি ঘুরিয়ে চালু করে খবর পাঠালে ঃ আমি দীপঙ্কর দত্ত বুলছি। আমি কলকাত্তায় ফিরে যাচ্ছে। তোমরাও সব তাড়াতাড়ি চলে আসো। ভাল খবর আচ্ছে। ওয়াং নিজে হেডফোন লাগিয়ে বসে রইলো, কিন্তু ওদিক থেকে কোন পালটা উত্তর এলো না।

দীপঙ্কর শেষ মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো। ওয়াং হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘৃণায় আক্রোশে মুখ কুঁচকে দীপঙ্করের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিলে, তারপর বুটসুদ্ধ সজোরে এক লাথি মারলো দীপঙ্করের মুখে। দীপঙ্করের কপাল দিয়ে ঠোঁট দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো। দীপঙ্কর শুধু নেয়ামতের গলা শুনতে পেল ঃ এ কী করেন সায়েব, এ কী করেন—ছাড়া বাঘকে খেলিয়ে মারা আদমীর কাম—এ কাম ঠিক নেই—এ ঠিক নেই! বাবু আমাদের দুশমন—ঠিক বাত—লেকিন বাবু বহুত সাঁচ্চা আদমী—বাবু গুস্ কায়েন না।

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে আবার অতল ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগলো।

রাত তখন হয়তো একটা। জলে স্থলে সমগ্র প্রকৃতির সাথে সারা গ্রামও যেন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও আলোর একটি বিন্দুও নেই। গ্রামের কোন্ ঘরে কোথায় কোন্ মাটির চোরাকক্ষে কোন্ গুপ্তহত্যা সংঘটিত হচ্ছে, হয়েছে বা হবে, তার কোন হদিস পাওয়ার উপায় নেই। হঠাৎ সেই অন্ধকারের বুক চিরে জোরালো সার্চলাইটের আলোয় অন্ধকার গঙ্গার তীর ঝকঝক করে উঠলো, তিন দিক্ থেকে সশস্ত্র জল-পুলিসের দল গ্রামখানি বেড় দিয়ে ঘিরে ফেলবার জন্যে পুলিসের লঞ্চ থেকে জোর কদমে দৌড়তে লাগলো। তীরের ওপর থেকে পরপর কয়েকবার রাইফ্ল্ গর্জে উঠলো। তিন-চারজন পুলিস গুলি খেয়ে কেউ জলে কেউ তীরের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। প্রত্যুত্তরে সঙ্গে সঙ্গে সাঁইসাঁই করে পুলিসের রাইফ্ল্ থেকেও ঝাঁক ঝাঁক গুলি ছুটতে লাগলো। আলোকিত পাড়ের ওপর দিয়ে কারা প্রাণপণে দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা রাইফ্ল্ পুলিসকে লক্ষ্য করে তখনও গর্জাচ্ছে, তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল। পাগলা কুকুরের মতো ওয়াং চাং জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই একসঙ্গে প্রায় দশ-দশটা গুলির ঘায়ে ওয়াংয়ের দানবের মতো বিশাল ভারী শরীরটা মুখ গুঁজে গঙ্গার কাদার ওপর পড়ে স্থির হয়ে গেল। বন্দুকের গুলিতে, ভারী বুটের দৌড়োদৌড়ির শব্দে সারা গ্রাম, গঙ্গাতীর তোলপাড় হয়ে যেতে লাগলো।

ঠিক সেই সময় এখান থেকে অনেকটা দূরে গঙ্গার তীরে একটা ছোট্ট ডিঙ্গিতে বিশাল জোয়ান মনসুর কাঁধে করে বয়ে এনে দীপঙ্করের প্রায়-জ্ঞানহীন দেহটাকে শুইয়ে দিলে। দীপঙ্করের কানে শুধু স্রোতের শব্দ, শুধু দু'একটা কথার শব্দ ছাড়া আর কিছুই ঢুকলো না,—আর তার কোন সংবিৎ ছিল না।

মনসুর কোমর থেকে একটা ছোরা বের করে ভানুমতীকে বললে, কি বলিস, মরিয়ম, খতম করে দিই এবার!

ভানুমতী বললে, না।

মনসুর বললে, না, কেন রে?

ভানুমতী বললে, পিছ্লি বাতায়েগা।

মনসুর বললে, আভি বোল, নেহিতো—ছুরি উঁচিয়ে ধরলে সে।

ভানুমতী ধমকে বললে, লে, শুন্ লে গোলিকা আওয়াজ, উনকো ডিঙ্গিমে ছোড় কর জলদি ভাগ হিঁয়াসে।

ডিঙ্গি স্রোতের টানে জ্ঞানহীন দীপঙ্করকে নিয়ে ভেসে চললো ডায়মণ্ড হারবার লক্ষ্য করে সমুদ্রের দিকে। ততক্ষণে ভানুমতী আর মনসুর অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

এস-এস-কে-এম হস্পিটালের স্পেশাল কেবিনে আষ্টেপৃষ্ঠে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় দীপঙ্কর পিঠে বালিশ দিয়ে বসে আছে। এখন সে অনেক সুস্থ। প্রথম যেদিন ডিঙ্গি থেকে পুলিস দীপঙ্করকে উদ্ধার করে, ছত্রিশ ঘণ্টা লেগেছিল তার জ্ঞান ফিরে আসতে। দীপঙ্কর আমাকে আস্তে আস্তে এই কাহিনীটা বলছিল। বললে, এই গল্পের আসল হিরো আমি নই, সুনীল চৌধুরী—বুঝলি! ট্রান্সমিটারে আমার গলা না পেয়ে আর তার বদলে ঐ মারোয়াড়ী-বাংলা শুনে ওর ঘোরতর সন্দেহ হয়। তারপর যা করবার ও সব করেছিল পাক্কা অফিসারের মতো। ঐ রাত্রিতেই ঈস্টার্ন লাইট বন্দরের দিকে রওনা হয়েছিল, আমাদের প্রথম ঘাঁটির লঞ্চ ঠিক ফলো করতে করতে আসছিল। ডায়মণ্ড হারবার ছাড়িয়ে জাহাজটা মাঝরাত্রিতে হঠাৎ থেমে গেল, ওপর থেকে টর্চলাইটের সিগন্যাল পেয়ে চার-পাঁচটা জেলে ডিঙ্গি জাহাজের কাছ ঘেঁষে এলো, নীচে থেকে ওরা লাল কাঁচের হ্যারিকেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সিগন্যাল দিলে। তারপর দড়ি দিয়ে পরপর কয়েকটা বাক্স জাহাজ থেকে কারা ডিঙ্গিতে নামিয়ে দিলে। সব ধরা পড়েছে—সাত লাখ টাকার সোনার বার বাক্সভর্তি। জাহাজও 'রামেজ' করা হচ্ছে। ওয়াং পুলিসের

গুলিতে মরেছে, ওদের গ্যাংকে গ্যাং ধরা পড়েছে। এতো বড়ো সোনা স্মাগলিংয়ের গ্যাং কেস এর আগে আর কলকাতা পোর্টে হয়নি। আমি ভাল হলেই হংকং যাবো—ঐ এশু-এর লোকদের পাকড়াও করতে হবে।

আমি দীপঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে সুনীলের কথা ভাবছিলাম। অল্প বয়েস, কলকাতার চ্যাম্পিয়ন পোলভল্ট লাফিয়ে। শুনেছি কাগজে কলমে তেমন দুরন্ত নয়, বুদ্ধিও খুব সরু নয়, কিন্তু ফিল্ড ওয়ার্কে খুব ওস্তাদ। বাহাদুর ছেলে। দীপঙ্কর সুনীল যে আমাদের এই কলকাতার ছেলে তার জন্যে সত্যিই গর্বে আমার বুক ফুলে উঠলো।

[অগ্রহায়ণ ১৩৭৪]

গোয়েন্দা চূড়ামণি বার্তিলঁ

নারায়ণ চক্রবর্তী

আলফঁস বাতিলঁ অপরাধ বিজ্ঞান জগতে একটি চিরস্মরণীয় নাম। অপরাধ-বিজ্ঞানী হিসেবে তথ্যানুসন্ধানের যে বৈজ্ঞানিক রীতি তিনি প্রবর্তিত করেছিলেন, সারা পৃথিবী আজ সেই রীতিই অনুসরণ করে চলেছে। এমন কি আঙ্গুলের ছাপ দেখে হত্যারহস্যের সমাধান করবার প্রথম কৃতিত্বও তাঁরই।

প্যারীর একজন ডাক্তারের দ্বিতীয় সন্তান আলফঁস বার্তিলঁর জন্ম ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। পড়াশোনায় মোটেই ভালো ছিলেন না বলে বাড়ির লোকেরা তাঁকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছিলেন। বড় হয়ে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা করতে পারছিলেন না মঁশিয়ে বার্তিলঁ।

এই সময়ে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবার আহ্বান এল। সামরিক বাহিনীতে কাজ করবার সময়ে তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মেডিক্যাল স্কুলের সান্ধ্য ক্লাসে ভরতি হন। মানুষের করোটি এবং কঙ্কালের গঠন-বৈচিত্র্য আকর্ষণ করল তাঁকে। ভিন্ন ভিন্ন মানব-কঙ্কালের ২২২টি হাড় মাপজোক করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, একজন মানুষের হাড়ের গঠনের সঙ্গে আর একজনের হাড়ের গঠনে যথেষ্ট অমিল রয়েছে। সামরিক চাকরির মেয়াদ শেষ হলে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীর পুলিস দপ্তরে কেরানীর কাজ পেলেন বার্তিলঁ। সারা দিনে যে সব অপরাধীদের গ্রেফতার করে আনা হত, তাদের দৈহিক বিবরণ কপি করাই ছিল তাঁর কাজ। একই অপরাধী দ্বিতীয়বার গ্রেফতার হলে এই বিবরণ পুলিসের কাছে আসত। কিন্তু সেই সময়ে বিবরণগুলো এতই স্থূল আর সাধারণ ছিল যে অপরাধীরা নাম ভাঁড়ালে বা চেহারার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করলেই ঐ সব সামান্য ও সাধারণ বিবরণের সাহায্যে তাদের সনাক্ত করা সম্ভব হত না। মেডিক্যাল স্কুলে এনাটমির ক্লাস করেছিলেন বলে বার্তিলঁ বেশ ভালোভাবেই জানতেন যে কুড়ি বছরের পর থেকে ষাট বছরের মধ্যে মানুষের কোনো কোনো প্রত্যঙ্গে কোনো পরিবর্তনই আর হয় না। অনেক গবেষণা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে একমাত্র কানেরই কুড়িটি বিভিন্ন অংশের সাহায্যে হাজার হাজার অপরাধীকে নির্ভুলভাবে সনাক্ত করা সম্ভব। কারণ ঐ অংশগুলির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে কিছুতেই বদলানো যায় না।

পুলিসের প্রধান দপ্তরে যোগ দেবার আট মাসের মধ্যেই ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবক আলফঁস বার্তিলঁ তাঁর অ্যানথ্রপোমেট্রি নামে বিখ্যাত চার্ট তৈরি করে ফেললেন। মানুষের শরীরের যে এগারোটি অংশের আর কোনো পরিবর্তন হয় না, তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া ছিল এই চার্টে। অপরাধীদের সনাক্ত করবার ব্যাপারে এই অ্যানথ্রপোমেট্রি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। অনেকখানি উৎসাহ নিয়ে তিনি তাঁর চার্টখানা নিয়ে প্যারীর পুলিস-প্রধান মঁশিয়ে অ্যানড্রিউক্সের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু ফল হল সম্পূর্ণ বিপরীত। কাগজপত্র সব বার্তিলঁর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠলেন পুলিস-প্রধান, "এখন থেকে বুঝি একজন ক্লার্কের কাছেই পুলিসের কাজ শিখতে হবে আমাদের! যত্তো সব।"

মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে নিজের টেবিলে ফিরে গেলেন বার্তিলঁ। তিন বছর পরে নতুন পুলিস-প্রধান এলেন অ্যানড্রিউক্সের জায়গায়। তিনি কিন্তু বার্তিলঁকে সামান্য ক্লার্ক বলে অবজ্ঞা করলেন না, মন দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনলেন। শেষটায় বললেন, "আমি আপনাকে একটা সুযোগ দিতে রাজী আছি মঁশিয়ে বার্তিলঁ। আপনার এই অভিনব সনাক্তকরণ পদ্ধতির সাহায্যে তিন মাসের মধ্যে যদি কোনো অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পারেন তাহলে দেশের সমগ্র পুলিস বিভাগে আমি এটা চালু করব। কিন্তু আপনি যদি তা না করতে পারেন, তাহলে আমি কিন্তু নাচার।"

মাত্র তিন মাস সময়? এত বড় একটা এক্সপেরিমেন্টের পক্ষে সময়টা খুবই কম। তবু পুলিস-প্রধানের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন বার্তিলঁ। সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়লেন। থানায় ধরে আনা প্রত্যেকটি অপরাধীকে একটা ঘূর্ণ্যমান চেয়ারে বসিয়ে নানান অ্যাঙ্গল থেকে অনেকগুলো গ্লাস-প্লেট-ফটো তোলালেন। পাশ থেকে তোলা মুখের ফটোর ওপরেই তিনি জোর দিলেন বেশী। কারণ তা থেকে ভুরু, নাক আর থুতনির গঠন বেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যেত। এ ছাড়া প্রত্যেকের মুখমণ্ডলের বিশিষ্ট অংশের ক্লোজ-আপ ফটোও তুললেন তিনি। ফটো তোলার পর অপরাধীদের দৈহিক মাপগুলো টুকে রাখলেন চার্টে। বিশেষ করে মাথা, ডান কান, বাঁ হাতের মধ্যমা, কনুই থেকে গোটা বাঁ হাত আর বাঁ পায়ের মাপগুলো খুব সাবধানে টুকে রাখলেন। প্রত্যেকের ফটোর সঙ্গে রাখা একটি ইনডেক্স কার্ডে এই মাপগুলো লেখা থাকত, তারপর নামের আদ্যক্ষর অনুসারে সেগুলো ফাইল করে রাখা হত। বার্তিলঁর নিজের হাতে তৈরি সে সব ফাইল আজও প্যারীর পুলিস দপ্তরের আইডেনটিটি বিভাগে রাখা আছে। বর্তমানে সত্তর লক্ষের বেশী ইনডেক্স কার্ড তৈরি হয়ে গেছে।

এদিকে দু' মাস কেটে গেল, কিন্তু বার্তিলঁর সূত্র অনুসারে একজন অপরাধীও ধরা পড়ল না। ভাবনায় পড়লেন বার্তিলঁ,—এত চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম আর অধ্যবসায় কি ব্যর্থ হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত!

শীতজর্জর ফেব্রুয়ারীর বিকেল। একটি লোককে গ্রেফতার করে আনা হল পুলিস দপ্তরে। সে তার নাম বলল, ডুপোঁ। ফ্রান্সে এটা যদু-মধুর মতো খুবই সাধারণ নাম। চুরি করবার অভিযোগে ধরা হয়েছিল তাকে। বার্তিলঁ তাঁর ইনডেক্স ফাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলেন। শেষটায় মার্টিন নামে একটি লোকের ফটোও ইনডেক্স খুঁজে বার করলেন। এই মার্টিনকেও চুরির অপরাধে দু' মাস আগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মার্টিনের শরীরের মাপ থেকে সদ্য ধরে আনা ডুপোঁর শরীরের মাপের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। মার্টিনের ফটোটা ডুপোঁকে দেখিয়ে বার্তিলঁ জোর দিয়ে বলছেন, "দেখ বাপু এই ফটোটা তোমারই। নাম ভাঁড়ালে আর নাকের আকার বদলালে কি হবে! তোমার শরীরের কাঠামোটিকে তো আর বদলাতে পারনি! এই দেখ সেই সব মাপ।"

কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ডুপোঁকে স্বীকার করতেই হল যে তার আসল নাম মার্টিনই এবং এর আগে ধরাও পড়েছিল সে।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে অপরাধীকে নির্ভুল ভাবে সনাক্ত করবার এই নতুন অথচ অভ্রান্ত পদ্ধতি সারা দেশে বিপুল সাড়া জাগাল। বার্তিলঁকে প্রোমোশন দিয়ে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি দিলেন পুলিস-প্রধান। বার্তিলঁর আর নিশ্বাস ফেলবার সময় রইল না। প্রথম বছরেই ৭,৩৩৬ জন অপরাধীর ইনডেক্স কার্ড তৈরি হয়ে গেল। ৪৯ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ইনডেক্স কার্ডের সাহায্যে দ্বিতীয়বার অপরাধ করেছে বলে সনাক্ত করা সম্ভব হল। দ্বিতীয় বছরে সেই সংখ্যা বেড়ে হল ২৪১। ফ্রান্সের পুলিস বিভাগ তখন সরকারীভাবে বার্তিলঁ-সূত্র গ্রহণ করল এবং বার্তিলঁ হলেন সনাক্তকরণ বিভাগের প্রধান।

একবার মার্ন নদী থেকে একটি অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হল। ফুলে পচে তার তখন এমন অবস্থা যে কেউ সেটা সনাক্ত করতে পারল না। তখন বার্তিলঁর সাহায্য চাওয়া হল। তিনি মৃতদেহের করোটির মাপ নিয়ে ইনডেক্স কার্ডের সাহায্যে তার পরিচয় জানলেন। তখন খুনীকে ধরে ফেলা কঠিন হল না। আর একবার রোলিন নামে একজন রাজমিস্ত্রী নিখোঁজ হল। তার স্ত্রী আর বন্ধুরা

মর্গে গিয়ে একটি মৃতদেহকে রোলিন বলে সনাক্ত করল। তাকে কবর দেবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। খবর পেয়ে বার্তিলঁ এলেন, মৃতদেহের বিভিন্ন অংশের মাপজোক নিয়ে ইনডেক্স কার্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন। যার কার্ডের সঙ্গে মাপগুলি মিলে গেল সে লোকটি একজন কুখ্যাত অপরাধী। বেশ কিছুদিন পরে রোলিনকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেল। প্রমাণিত হল যে বার্তিলঁর কথাই ঠিক।

ক্রমে ক্রমে অপরাধী সনাক্তকরণের জন্য বার্তিলঁর উদ্ভাবিত এই ইনডেক্স কার্ড প্রথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিভাগও মেনে নিতে লাগল। রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস বার্তিলঁকে একটি সোনা ও মুক্তা খচিত ঘড়ি উপহার দিলেন। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া দিলেন একটি মেডেল। সুইডেন ও অস্ট্রিয়া সহ চোদ্দটি দেশের সরকার সম্মান জানালো বার্তিলঁকে।

তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতা শুধু ইনডেক্স কার্ড তৈরি করার ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে অনেক জটিল হত্যা-রহস্যেরও সমাধান করেছেন তিনি। ব্যারন জেইডলার নামে একজন বিখ্যাত ধনী ব্যক্তিকে তাঁর আস্তাবলে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর মুখে আর মাথায় অনেকগুলি আঘাতের চিহ্ন ছিল। ডাক্তার দেখে বললেন যে, ওগুলো ঘোড়ার খুরের আঘাতের চিহ্ন এবং ঐ সব আঘাতের ফলেই মৃত্যু হয়েছে ব্যারন জেইডলারের। যে জায়গায় মৃতদেহটি পড়েছিল তার কাছেই বাঁধা ছিল একটি চঞ্চল ছটপটে বেয়াড়া ঘোড়া। সবাই ভাবল যে ঐ ঘোড়াটাকে বশ করতে গিয়েই তার পায়ের চাঁট খেয়ে মারা গেছেন ব্যারন জেইডলার। মৃত্যুর কারণ আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। খবর পেয়ে বার্তিলঁও এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। সব কিছু তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করে মৃতদেহে ঘোড়ার খুরের দাগগুলো খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করলেন তিনি। শেষটায় মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু, এটা দুর্ঘটনায় মৃত্যু নয়।"

"তবে?"

"খুন করা হয়েছে ব্যারন জেইডলারকে। খুনী খুব কৌশলী আর ধূর্ত।"

"খুন!" আঁতকে উঠল সবাই, "কি করে বুঝলেন যে এটা খুনের কেস? স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ব্যারনের সারা শরীর ঘোড়ার খুরের আঘাতের চিহ্নে ভরতি।"

"তা ঠিক।" বার্তিলঁ বললেন, "কিন্তু ওঁর মুখের খুরের আঘাতগুলো ভালো করে দেখুন, চিহ্নগুলো সব উল্টোদিকে। এটা কি করে সম্ভব? তাহলে হয় ঘোড়াটা চিৎ হয়ে মেঝের ওপরে শুয়ে পা ছুঁড়েছিল, নয়তো ব্যারন মহাশয় মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন? তা না হলে উল্টোমুখী খুরের দাগ হয় কী করে? কাজেই এটা নির্ভেজাল খুনের কেস ছাড়া আর কিছুই নয়।"

সত্যিই তাই। কয়েকদিনের মধ্যেই খুনী ধরা পড়ল, অপরাধও স্বীকার করল। বলল যে সে-ই ব্যারনকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঐ আস্তাবলে নিয়ে এসেছিল। তারপর কাঠের মুগুরে ঘোড়ার খুরের ছাঁচ এঁটে নিয়ে তাই দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে খুন করেছিল ব্যারন জেইডলারকে। ঘোড়ার খুরের ছাঁচ উলটোভাবে বসিয়েছিল বলেই তার এমন পাকা পরিকল্পনাটা ভেস্তে গেল।

ফরাসীরা দাবি করেন যে মানুষের পদক্ষেপের দূরত্ব মেপে লোকটির উচ্চতা নির্ণয় করবার পদ্ধতিও বার্তিলঁই আবিষ্কার করেছিলেন। তবে এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু খুন, চুরি বা ডাকাতির পর ঘটনাস্থলের ফটো তোলার নিয়মটি বার্তিলঁই চালু করেছিলেন। এ যুগে এটা একটা রুটিন কাজ। ফটোগ্রাফিকে অপরাধ নির্ণয়ের নানা কাজে লাগাতেন তিনি। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লুভর মিউজিয়াম থেকে পৃথিবীবিখ্যাত "মোনালিসা" ছবিটি চুরি হয়। পরে সেটি উদ্ধার করা গেলেও সেটাই যে আসল ছবি সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত হতে পারছিলেন না। বিতর্ক থামছিলই না। ডাক পড়ল বার্তিলঁর। তিনি উদ্ধারপ্রাপ্ত "মোনালিসার" ফটো তুলে তাকে বিরাট আকারে এনলার্জ করালেন, তারপর শিল্পীর অন্য ছবির ব্রাশ স্ট্রোকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখিয়ে প্রমাণ করলেন যে ওটাই মূল ছবি।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র একষট্টি বছর বয়সে এই গোয়েন্দা চূড়ামণি পরলোকগমন করেন।

[ফাল্গুন ১৩৮০]

পোড়োমন্দিরের রহস্য

মুরারিমোহন বিট

কোলকাতা থেকে আমার কলেজের তিনজন সহপাঠী বন্ধু এসেছিল আমাদের গাঁয়ে বেড়াতে। তাদের নিয়েই আমি সেদিন বৈকালে গিয়েছিলাম গাঁ ছাড়িয়ে মাইল দেড়েক দূরে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে। ওখানকার ময়ূরাক্ষীর দুই তীরের শোভা বড়ই নয়নমুগ্ধকর। ভেবেছিলাম, সন্ধ্যার কোল অব্দি নদীর ধারে বসে গল্প-গুজব করে তারপর বাড়ি ফিরব। অন্ধকারে মাঠের মধ্যে দিয়ে আসতে পথে সাপ-খোপের সম্মুখীন হতে পারি, এই ভয়ে বাবার পাঁচ সেলের টর্চটা সঙ্গে এনেছিলাম।

গরমকাল। সাড়ে ছ'টাতেও তখন অনেক বেলা। প্রায় সাড়ে ছ'টাই হবে তখন। আমরা চারজনে কবিগুরুর একটা গান নিয়ে আলোচনা করছি। আলোচনায় আমরা এতই মশগুল ছিলাম যে, পশ্চিম আকাশ কালো করে কখন যে প্রায় অর্ধেকটা আকাশ মেঘে ঢেকে ফেলেছে খেয়ালই হয়নি। হঠাৎ ঝড় উঠতে খেয়াল হল। আমরা ধড়মড় করে উঠে পড়ে একরকম ছুটতে ছুটতেই বাড়ির পথে হাঁটা দিলাম। আমি জানি, এই দেড়মাইল পথের মধ্যে কোন ঘর-বাড়ি নেই—অর্থাৎ বৃষ্টির হাত থেকে শরীর বাঁচাবার মত কোন আশ্রয় নেই।

বরাত মন্দ। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই দৈত্যের মত কালো মেঘটা সারা আকাশ ছেয়ে ফেলল এবং মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সেই সঙ্গে ঝড়ের সে কি বেগ!

প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম আমরা চারজনে। ছুটতে ছুটতেই আমার খেয়াল হয়ে গেল যে, আর একটু এগোলেই আমাদের ডানপাশে পড়বে একটা পোড়ো কালীমন্দির। সন্ধ্যার পর ঐ মন্দিরের ধারে-কাছে কেউ ঘেঁষে না, আমারও মন চাইছিল না ওদিকে যাবার। গাঁয়ের অন্যান্য সকলের মত ঐ মন্দিরের প্রতি আমার মনেও ভয় আছে। ভয়ের কোন কারণ যদিও আজ পর্যন্ত কিছু ঘটেনি কারো ক্ষেত্রে, ভয়টা কেবল সংস্কারবশেই। তবু আমি যদি একা থাকতাম, তাহলেও অবশ্য ভয় পাবার একটা কারণ থাকত। কিন্তু আমরা রয়েছি চারজন, সঙ্গে রয়েছে পাঁচ সেলের টর্চ। অযথা ভয় পাবার কোন কথাই নয়। তাই মনে সাহস পেয়ে আমি বন্ধুদের নিয়ে আধভেজা হয়ে ঐ পোড়ো মন্দিরটার চাতালে গিয়ে উঠলাম।

বেশ বড়সড় মন্দির। মন্দিরের দুই পাশে ও পিছনে আরও খানচারেক ঘর আছে। এই মন্দির ছিল নাকি একজন তান্ত্রিকের। ঘরগুলির মধ্যে একটাতে নাকি মায়ের ভোগ রান্না হত, অন্য ঘরগুলিতে চেলা-চামুণ্ডাদের নিয়ে তান্ত্রিক বাস করত।

মন্দির ও ঘরগুলির কিছু কিছু অংশ এখন ভেঙে পড়েছে। দেওয়ালে ছাদে গাছপালা গজিয়েছে, মন্দির প্রাঙ্গণ লতাগুল্মের ঝোপঝাড়ে আবৃত। এমন মুষলধারে বৃষ্টি না নামলে আমি কখনই এই পোড়ো মন্দিরে আশ্রয় নিতাম না।

এখন মাত্র সন্ধ্যা-রাত। কিন্তু জায়গাটার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, যেন এখন মাঝরাত।

বন্ধু শ্যামল বলল,—আচ্ছা জায়গায় আমাদের নিয়ে এলি বটে, সাপখোপে কামড়াবে না তো?

আমি টর্চটা জ্বেলে চারিদিকে দেখে নিয়ে বললাম, দেখে তো সেইরকমই মনে হচ্ছে! কি করব ভাই, যা বৃষ্টি নামল, বাড়ি যে এখনো অনেক দূর। এই বৃষ্টিতে এতখানি রাস্তা ভিজলে সবাইকেই জ্বরে পড়তে হত।

আরেক বন্ধু রতন বলল,—সে-কথা সত্যি। কি মন্দির ছিল রে এটা? দেখে তো মনে হচ্ছে এককালে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পুজো-আচ্ছা হত এখানে।

বললাম,—হ্যাঁ, মারাত্মক রকমের জাঁকজমক সহকারেই এখানে কালীপ্রতিমার পুজো হত। সে জাঁকজমক এতই মারাত্মক ছিল যে, কোন লোক পুজো দেখা তো দূরের কথা, কোনদিন প্রতিমা দেখতেও এখানে আসত না।

একথা শুনে শ্যামল, রতন ও অজয় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম,—শোন্ তবে এই মন্দিরের ইতিহাস, যেটুকু আমি জানি। আমার ঠাকুরদার বয়স যখন ছিল চব্বিশ-পঁচিশ, সেই সময় এই মন্দিরে কালীসাধনা করত একজন তান্ত্রিক কাপালিক। শুনেছি, সেই কাপালিকের চেহারা এতই ভয়ংকর ছিল যে, কোন সাধারণ মানুষ তার ধারে-কাছে যেত না। সাত-আটজন চেলা ছিল তার, তাদের চেহারাও ছিল ভয়ংকর। ঐ যে বেদীটা দেখছিস, ঐ বেদীর ওপর থাকত কালীমূর্তি। তখন কেউই জানত না যে, ঐ মূর্তিটা নকল; আসল মূর্তি অর্থাৎ যে মূর্তির সামনে বসে তান্ত্রিক সাধনা করত, সে-মূর্তিটা থাকত মাটির নীচেকার গোপন কক্ষে। মন্দিরের পিছনদিকে একখানা ঘর আছে। সেই ঘরের মেঝের মধ্যে দিয়ে নীচেকার ঘরের যাবার সিঁড়ি আছে। এই ব্যাপারটা আকস্মিকভাবে টের পেয়ে যায় আমাদেরই গাঁয়ের একদল ছেলে। দলে তারা ছ'জন ছিল। সেদিন তারা গিয়েছিল পাশের গাঁয়ে এক বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ খেতে। খেয়েদেয়ে যখন তারা ফিরছিল, রাত তখন এগারোটা।

আমরা আজ যে কারণে মন্দিরে এসে ঢুকলাম, সেদিন তারাও ঠিক একই কারণে এই মন্দিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। আজকের মত সেদিন রাতেও এমন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল। তারা এই মন্দির চাতালে উঠে দেখে, প্রতিমার মন্দিরের দরজা বন্ধ। মানুষের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তারা ভাবল, কাপালিক ও তার চেলা-চামুণ্ডারা সবাই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন সময় তাদের কানে পৌঁছায় পূজার ঘণ্টাধ্বনি। কিন্তু ঘণ্টার যে আওয়াজ তাদের কানে আসছিল, সে আওয়াজটা ছিল খুব চাপা। প্রথমটা তাদের মনে হয়েছিল, খানিকটা দূর থেকে বোধহয় আওয়াজটা আসছে, তাই এমন চাপা মনে হচ্ছে। তারপরই তাদের খেয়াল হল যে, এই মন্দিরের চারিপাশের প্রায় মাইলখানেক জায়গার মধ্যে কোন বাড়িঘর, লোকবসতি নেই। তবে.......তবে ঐ ঘণ্টার শব্দ আসছে কোত্থেকে? পূজার সময় পুরোহিত যে ঘণ্টা বাজায়, সেই ঘণ্টার শব্দ। তাহলে নিশ্চয় এই মন্দিরের মধ্যেই অন্য কোন বন্ধ ঘরে পুজো হচ্ছে। এই কথা মনে হতেই ঐ ছ'জন ছেলে উঠে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে তিনজনের কাছে টর্চ ছিল। একজন বলল,—চল্ না, ভেতরের দিকটা একবার চুপি চুপি ঘুরে দেখে আসি, কোথায় কি পুজো হচ্ছে?

যতগুলো ঘর ঐ মন্দিরের ভেতরে ছিল, সব ঘরের দরজাই তারা বন্ধ দেখল। ছেলেরা প্রত্যেকটি দরজার গায়ে কান দিয়ে বুঝল, না এসব ঘরের মধ্যে কোন আওয়াজ নেই। তবে ঘণ্টার শব্দ আসছে কোত্থেকে? তারপর তারা মন্দিরের পিছন দিকে যেতেই তাদের মনে হল, যেন ঘণ্টার আওয়াজটা ওখানে স্পষ্ট। টর্চের আলোয় দেখল, সেখানে একটা ঘর রয়েছে, এবং ঘরের দরজাটাও আধখোলা অবস্থায় রয়েছে।

ছেলেরা এবার আরও হুঁশিয়ার হল। ঘরটার মধ্যে কোন লোকজন থাকতে পারে বলে তাদের মনে সন্দেহ হওয়ায় তারা অন্ধকারের মধ্যে গা মিশিয়ে নিশ্চুপে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু ঐ ঘরটাও জনশূন্য রয়েছে, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে তারা সকলে ধীরে ধীরে ঐ কক্ষে প্রবেশ করল। ভেতরে কি আছে, এটাই তারা দেখতে চায়। কিন্তু ঘরটার মধ্যে ঢুকতেই ঘণ্টার শব্দ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। এবার তারা বুঝল, ঐ ঘরের মধ্যেই ঘণ্টা-ধ্বনির রহস্য লুকিয়ে আছে। টর্চের আলোয় তারা ঘরের মেঝেতে একটা বিরাট চৌকো ভারি লোহার পাত দেখতে পেল। লোহার পাতটা দেখে তাদের মনে কেমন যেন সন্দেহ জাগল। খুব সন্তর্পণে লোহার পাতটার দিকে এগিয়ে একজন সেটা টেনে সরাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা এত ভারী যে, একজনের পক্ষে সেটা টেনে সরানো সম্ভব নয়। তখন তারা করল কি, চারজনে ধরে সেটাকে এমন সাবধানে টানতে লাগল যাতে কোনরকম শব্দ না হয়। খানিকটা টানতেই একটা গর্তের মুখ তারা দেখতে পেল এবং সেই ঘণ্টার শব্দ একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তারা বুঝল, এই ঘরের নীচেকার কোন চোরা কুঠুরিতে ঘণ্টা বাজছে, এবং সেই ঘরে যাবার এটাই হল গুপ্ত দ্বার।

ছেলেরা রহস্যের গন্ধ পেল। এমন গুপ্ত কক্ষে পূজা-অর্চনা করার কারণ কি? নিগূঢ় কারণ নিশ্চয় কিছু একটা আছে, এবং সে কারণ জানবার জন্য তাদের সকলকার ডানপিটে মন আনচান করে উঠল। তারা সেই লোহার পাতটাকে আরও খানিকটা সরিয়ে গুপ্ত দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে ফেলল। তারা দেখতে পেল, কয়েক ধাপ সিঁড়ি সোজা নীচের দিকে নেমে গিয়ে ডানদিকে বেঁকে গেছে। গুপ্ত কক্ষে যে আলো জ্বলছে, তারই আলোয় আলোকিত হয়ে আছে সিঁড়ির বাঁকের মুখটা। ফলে সমস্ত সিঁড়িটাই মোটামুটিভাবে দেখতে পাচ্ছে তারা।

অতঃপর ছেলেরা মুহূর্তকালের জন্য একবার চুপি চুপি যুক্তি করে স্থির করে নিল যে, তারা নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা নীচে নেমে দেখে আসবে, কি ধরনের পুজো ওখানে হচ্ছে, যে পুজোর জন্যে এত গোপনীয়তার প্রয়োজন!

সিঁড়ির সেই বাঁক অবধি নেমে ছেলেরা সন্তর্পণে ডানদিকে দৃষ্টিপাত করে যা দেখতে পেল, তাতে তারা ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। তারা দেখল, দরজা-জানলাবিহীন মাঝারি আকারের একখানা ঘর। ঘরখানার একপাশে হাত তিনেক লম্বা এক কালীপ্রতিমা। কালীপ্রতিমার সামনে একজন ভয়ংকর-দর্শন তান্ত্রিক কাপালিক পূজায় মগ্ন। তার আশেপাশে কয়েকজন চেলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে দু'জন একটি দশ-বারো বছরের বালককে ধরে আছে, আর একজনের হাতে রয়েছে একটি তীক্ষ্ণধার খড়্গ। এ ছাড়া ঘরখানার একটি কোণে জড়ো করা ছিল কয়েকটি সুতীক্ষ্ণ বর্শা এবং আরও গোটা চারেক খড়্গ।

ছেলেরা বুঝল, এই মন্দিরের আসল পূজা এখানেই হয়, এবং নরবলি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে কাপালিক পূজা শেষ করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং ঘাতকের দিকে চেয়ে ইশারায় বলির নির্দেশ দিল। ইশারা পেয়ে ঘাতক খাঁড়াটাকে শক্ত করে বাগিয়ে ধরল, আর সেই চেলা দু'জন বালকটিকে নিয়ে এগিয়ে গেল প্রতিমার সামনে।

এর পরের অমানুষিক মর্মান্তিক দৃশ্যটি দেখবার জন্যে গাঁয়ের সেই ছেলেরা আর সেখানে অপেক্ষা করেনি। কোন সুস্থ মানুষের পক্ষেই সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভব নয়। ঐ অসহায় বালকটিকে বাঁচাবার জন্য সেসময় ছেলেগুলোর মনে প্রচণ্ড একটা উত্তেজনা জেগে উঠেছিল বটে, কিন্তু তারা বুঝেছিল যে, বাধা দিতে গেলে ঐ সশস্ত্র দুর্ধর্ষ কাপালিকগণের হাতে তাদের মৃত্যুবরণ করতেই হবে। তাই তারা আবার চুপি চুপি ওপরে উঠে এসে লোহার পাতটা আগেকার মতই চাপা দিয়ে রেখে গাঁয়ে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ হিংস্র নরঘাতক কাপালিকদের কথা তারা ভুলতে পারল না। ঐ কাপালিকরা ইতিপূর্বে কত যে শিশুহত্যা, নরহত্যা করেছে, তার হয়ত ইয়ত্তা নেই। তবে ঐসব বলি ওরা আমাদের আশপাশের গাঁ থেকে যোগাড় করত না। তা যদি করত, তাহলে আমাদের গাঁয়ের মধ্যে ভীষণ একটা হৈ-চৈ পড়ে যেত। কিন্তু সেরকম কিছু শোনা যায়নি কোনদিন। ওরা নিশ্চয় কোন দূরদেশ থেকেই বলি যোগাড় করত।

যাই হোক, ভবিষ্যতে আর যাতে তারা কোন মানুষ খুন করতে না পারে, ছেলেরা তার যথাযথ প্রতিকার করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। নির্জনে অনেকক্ষণ ধরে যুক্তি করে তারা স্থির করল যে, ঐ কাপালিক ও তার চেলাদের সকলকে তারা হত্যা করবে। এবং কিভাবে হত্যা করবে, তারও একটা সাংঘাতিক উপায় স্থির করে ফেলল।

দিন ছয়-সাত পরই একদিন রাত দশটা নাগাদ তারা আবার এই মন্দিরের নিকটে এসে পৌছাল। তাদের সঙ্গে ছিল বড় বড় টিনের দু'টিন পেট্রোল। এসব ব্যাপার তখনো পর্যন্ত তারা গাঁয়ের কোন লোককেই জানায়নি। জানিয়েছিল কাপালিকদের হত্যা করার পরে।

মন্দিরের নিকটবর্তী বড় একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারা মন্দিরটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেও কোন জন-মনিষ্যির সাড়াশব্দ পেল না। তখন তারা নিঃশব্দে মন্দিরের চাতালে গিয়ে উঠল। তারপর পিছনদিকের সেই ঘরখানার দিকে যাবার পথেই আচম্বিতে তাদের কানে ঘণ্টার চাপা

আওয়াজ ভেসে এল। এতক্ষণে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারল। যাক, পুজো হচ্ছে এবং কাপালিকেরা তাহলে সেই পুজোর ঘরেই আছে।

অতঃপর তারা এসে হাজির হল সেই গুপ্ত দ্বারের নিকট। তাদের এর পরের কার্যকলাপ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শেষ হল। একজন একটু তফাতে সরে গিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে একটা কাগজ ধরাল, আর একদিকে অন্যান্যরা লোহার পাতটা টেনে সরিয়ে ফেলেই সেই গুপ্ত গহ্বরের মধ্যে দু'টিন পেট্রোল সম্পূর্ণ ঢেলে দিল। তারপর সেই জ্বলন্ত কাগজের টুকরোটা ভেতরে ফেলে দিতেই দপ করে গহ্বরের মধ্যে করাল অগ্নি জ্বলে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত কক্ষের দরজাটাও আবার বন্ধ করে দিল সেই লোহার পাতটা দিয়ে।

ততক্ষণে গুপ্ত কক্ষের মধ্যে কাপালিকদের বীভৎস অন্তিম চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু সে চিৎকার অতি অল্পকালের মধ্যেই থেমে গেল। প্রচণ্ড নিস্তব্ধতা নেমে এল তারপর।

শত্রু ধ্বংস করে ছেলের দল বীরবিক্রমে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে এবার সকলের কাছে প্রকাশ করেছিল তাদের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা। শুনে গাঁয়ের লোক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই মন্দিরের ধারে-কাছে আগেও যেমন কেউ আসত না, কাপালিকদের মৃত্যুর পরও কেউ কোনদিন শখ করে এদিকে আসেনি। সেদিন সেই ছেলেরা যেমন এসেছিল, আমরা আজ যেমন এলাম, তেমনি নিতান্ত দায়ে পড়ে হয়ত কেউ কদাচিৎ এদিকে এসে থাকতে পারে।

গল্প শেষ করে আমি চুপ করতেই অজয় বলল,—এমন কাণ্ড!

অপর দুই বন্ধু নীরব।

হঠাৎ ভয়ে আমার সারা দেহ শিউরে উঠল। সর্বশরীর কুঁকড়ে গেল আমার। হ্যাঁ, বেশ স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছি ঘণ্টার শব্দ! যদিও খুব চাপা তথাপি সাংঘাতিক রকমের স্পষ্ট! সেই বহুকাল আগেও যেমন ছিল, এখনো তেমনি এই মন্দিরের চারিপাশে প্রায় মাইলখানেক জায়গার মধ্যে কোন ঘর, বাড়ি নেই। তবে? তবে কোত্থেকে আসছে ঘণ্টার শব্দ? সেই গোপন কক্ষে আবার কি কোন নতুন কাপালিক আশ্রয় নিয়েছে? উঁহু, মন্দিরের যা পোড়ো অবস্থা তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় এখানে কোন লোক বাস করে না। মন্দিরের সর্বত্র ধুলো-বালি, শুকনো পাতা, কাঠি-কুঠিতে ভর্তি। দেওয়ালের ফাটলে ফাটলে গাছপালা জন্মেছে। লোক বাস করলে মন্দির চাতালে এমন এক ইঞ্চি পুরু ধুলো-বালিও জমে থাকত না—শুকনো কাঠি-কুঠিও পড়ে থাকত না। তবে? এই ঘণ্টার আওয়াজ আসছে কোত্থেকে? এই মন্দিরের মধ্যে থেকেই আসছে, তা ছাড়া আবার কোথা থেকে আসবে?

শ্যামল, অজয় আর রতন এদের কানেও পৌঁচেছে ঘণ্টার শব্দ।

অজয় দুই ভ্রূ কুঁচকে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল,—ঘণ্টার আওয়াজ আসছে না?

আমি বললাম,—হুঁ!

সেই অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেলাম, অপর দুই বন্ধু জ্বলজ্বলে চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

অজয় হচ্ছে পয়লা নম্বরের ডানপিটে ছেলে—অত্যন্ত সাহসী। সে আমাকে শুধাল,—এ ঘণ্টার আওয়াজ কোত্থেকে আসছে বলে মনে হয় তোর? আগে তো কাছাকাছি কোন ঘর-বাড়ি ছিল না শুনলাম, এখন?

—না, এখনো তেমনি আছে। মাইলখানেকের মধ্যে বাড়ি-ঘর কিছু নেই। বললাম।

—তাহলে? ক্ষণকাল ভাবল অজয়। তারপর পুনরায় বলল,—তাহলে কি আবার কেউ বা কারা সেই ঘরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে পুজো করছে? অবশ্য দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে না, বিশ বছরের মধ্যেও এখানে কোন লোক বাস করেছে। যাই হোক, ব্যাপারটা না দেখে ছাড়ছি না। আওয়াজ শুনে তো মনে হচ্ছে, এই মন্দিরের মধ্যে থেকেই আওয়াজটা আসছে। চল তো, সেই ঘরটার মধ্যে নিয়ে চ আমাকে, যে ঘরটায় বলছিলি লোহার পাতে ঢাকা গুপ্ত পথ আছে।

আমার সেদিকে যাবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পাছে শহরের বন্ধুদের কাছে আমি ভীতু কাপুরুষ প্রতিপন্ন হই, সেই ভয়েতেই আমাকে ওদের নিয়ে যেতে হল। মন্দিরের পিছন দিকে পৌঁছাতেই ঘণ্টার আওয়াজ খানিকটা স্পষ্ট হল।

ভয়ে থরথরিয়ে কেঁপে উঠলাম আমি। কম্পিত গলায় বললাম,—হ্যাঁ, সেই ঘরেতেই ঘণ্টা বাজছে, কোন ভুল নেই। আবার কারা এল?

আমি ভীত হয়ে পড়েছি, অজয় বোধহয় তা টের পেয়ে বলল,—কি রে বিপিন, তুই কি ভয় পাচ্ছিস?

—ন ন্ না, ভয় পাব কেন? তবে......তবে ভাবছি আবার কোন নরবলি-টরবলি হচ্ছে না তো?

অজয় বলল,—দেখা যাক না কি হচ্ছে?

আমি বুঝতে পারলাম, রতন বা শ্যামলেরও এসব ব্যাপারে উৎসাহের অভাব রয়েছে। ওরা দু'জনও কেমন যেন মিইয়ে রয়েছে। আমার মতই অবস্থা আর কি! ভীতু কাপুরুষ প্রতিপন্ন হতে চায় না বলেই নিরুত্তরে এগিয়ে চলেছে।

অজয় আমার কাছ থেকে আগেই টর্চটা নিয়েছিল। টর্চের আলোয় দুই পাশ দেখতে দেখতে সে এগিয়ে চলেছিল। যে ক'টা ঘর দেখলাম, কোন ঘরেরই দরজা-জানালা নেই। সব উই-এ নষ্ট করেছে আর ভেঙেচুরে পড়েছে। সর্বত্র ধুলো, বালি, নোংরা ইত্যাদিতে ভরা। এখানে কোন লোকের যাওয়া-আসা থাকলে এই পুরু ধুলোর ওপর পায়ের দাগ নিশ্চয় থাকত। কোন পদচিহ্ন নেই—এমন কি কোন জন্তু-জানোয়ারের পর্যন্ত না। শুধু আমরাই ক'জন সুস্পষ্ট পদচিহ্ন ফেলে এগিয়ে চলেছি।

—অসম্ভব, এখানে কোন মানুষ থাকতে পারে না! কথাটা আচমকা বলল অজয়।

—তবে? আমি আর শ্যামল দু'জনে একই সঙ্গে প্রশ্ন করে বসলাম।

অজয় বলল,—'তবে'টা যে কী, সেটাই তো জানতে যাচ্ছি।

আমরা সেই ঘরটার মধ্যে এসে হাজির হলাম। মুখে-চোখে মাকড়সার জালের স্পর্শ পাওয়া গেল। এ ঘরে লোকের যাওয়া-আসা থাকলে কি এমন মাকড়সার জাল ছড়িয়ে থাকত?

এবার উজ্জ্বল টর্চের আলোয় মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, একটা বিরাট মরচে ধরা লোহার পাত পড়ে রয়েছে। ঘরের মেঝে ও লোহার পাতটার ওপর আধইঞ্চি পুরু ধুলোর আস্তরণ জমে রয়েছে। এখানে ঘণ্টার শব্দ আরও স্পষ্ট। একটানা ঘণ্টা বেজে চলেছে—মনে হচ্ছে যেন আরতি হচ্ছে।

আমরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারলাম যে, এই ঘরের নীচে থেকেই ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। যেখানে লোকজনের কোন অস্তিত্ব নেই, সেখানে ঘণ্টা বাজে কি করে? এ কি অলৌকিক কাণ্ড! আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল! ভীষণ একটা বিপদের ইঙ্গিত পাচ্ছি যেন!

—আশ্চর্য! অদ্ভুত! অজয় নির্নিমেষ দৃষ্টিতে লোহার পাতটার দিকে তাকাতে তাকাতে কথাটা বলল।

শ্যামল বলল,—স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বহুকাল এঘরে কোন মানুষের পদার্পণ হয়নি, অথচ নীচেকার ঘরে ঘণ্টা বাজছে। ঘণ্টাটা আপনা-আপনি বাজছে না নিশ্চয়, মানুষেই বাজাচ্ছে তো! তবে কি সে মানুষ হাওয়ায় মিশে নীচেকার ঘরে গেছে—যার জন্য তার পায়ের ছাপ পড়েনি!

অজয় বলল,—সত্যিই ভাববার কথা! এ রহস্যের কারণ জানতেই হবে।

এবার আমরা সকলে মিলে লোহাটা টেনে সরাতেই গুপ্ত পথ নজরে পড়ল। আর সেই সঙ্গে ঘণ্টার আওয়াজটাও একেবারে কানের কাছে এগিয়ে এল।

কিন্তু কী অন্ধকার গর্তটা! সিঁড়ির একটা ধাপও নজরে পড়ছে না। নীচেকার ঘরে নিশ্চয় কোন আলো জ্বলছে না। ছোট একটা প্রদীপ জ্বললেও তার আলোর রেখা নিশ্চয় আমাদের নজরে পড়ত। এবং সিঁড়ির নীচেকার দিকটাও অন্ততঃ আবছাভাবে আলোকিত হয়ে থাকত। তবে কি পুরোহিত অন্ধকারে বসেই পুজো করছে? এ কি অস্বাভাবিক ঘটনা!

অজয় চুপি চুপি বলল,—আমার পিছু পিছু আয় তোরা। খুব সাবধানে নামবি, টর্চ জ্বালব না! কোনরকম শব্দ-টব্দ হয় না যেন!

দু'পাশের দেওয়াল ধরে ধরে নিঃশব্দে সিঁড়ির বাঁক পর্যন্ত নেমে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার আওয়াজ থেমে গেল। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমরা। অস্বাভাবিক অন্ধকারে আমরা চারজনে যেন অন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এতে নিরেট অন্ধকার জীবনে কোনদিন দেখিনি।

আমরা সকলে গায়ে গা ঠেকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেও কোন মানুষজনের তো দূরের কথা, একটা আরশোলার অস্তিত্ব পর্যন্ত টের পেলাম না।

হঠাৎ অজয়ের হাতের পাঁচসেলের টর্চটা জ্বলে উঠল। টর্চটায় ছিল নতুন ব্যাটারী। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চারিদিক। দেখতে পেলাম, সেই গুপ্ত কক্ষের মেঝের ওপর কতকগুলো নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে। প্রতিমা যেখানে ছিল, সেখানে পোড়া প্রতিমারও কিছু অংশ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরের একটা কোণে সেই বর্শা আর খাঁড়াগুলোও রয়েছে, আর একটা খাঁড়া পড়ে রয়েছে প্রতিমার কাছাকাছি জায়গায়। পূজার ঘণ্টা এবং কয়েকটা থালা কোশাকুশী ইত্যাদি প্রতিমার সামনে পড়ে রয়েছে। এ সমস্ত জিনিস আগুনে পুড়ে এবং তার ওপর ধুলোর আবরণ জমে এমন চেহারা হয়েছে যে, বোঝবার উপায় নেই কোন্‌টা লোহার তৈরী, কোন্‌টা তামার বা কোন্‌টা পিতলের জিনিস।

বেশ কিছুক্ষণ ঘরটা দেখে নিয়ে অজয় গলায় বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল,—অসম্ভব! এ ঘরে কখনই ঘণ্টা বাজছিল না। ঘণ্টার শব্দ অন্য কোথাও থেকে আসছিল। আমাদের সকলকারই শোনার ভুল হয়েছে। আর এখানে নয়—ওপরে যাওয়া যাক।

আমি বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, কথা বলার সময় অজয়ের গলা কাঁপছিল। আর আমার নিজের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কি যেন এক নিদারুণ ভয়ে আমি ঘেমে নেয়ে উঠলাম।

যাই হোক, আমরা ওপরে উঠতে শুরু করলাম। সবার আগে আছি আমি, আর সবার নীচে টর্চ হাতে অজয়।

অকস্মাৎ অজয়ের আর্ত চিৎকারে আমরা ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। আঁ আঁ আঁ করে চিৎকার করতে করতে অজয় বসে পড়ল সিঁড়ির ওপর। তার হাত থেকে টর্চটা খসে পড়েই নিবে গেল। তারপর তার চিৎকার শুনলাম, বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও—

তারপরই চুপ।

আমারা হুড়মুড় করে নেমে গেলাম অজয়ের কাছে। টর্চটা কোথায় পড়েছে কে জানে, আমরা তো সেই অন্ধকারের মধ্যেই অজয়কে ধরাধরি করে কোনরকমে নিয়ে এলাম ওপরে। বুঝলাম, অজয়ের জ্ঞান নেই।

তারপর কিভাবে কত কষ্ট করে যে অচৈতন্য অজয়কে নিয়ে সে রাতে বাড়ি পৌঁচেছিলাম, সে কথা এখানে না বললেও চলবে।

ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছিল। তিনি দেখে-শুনে ওষুধ দিয়ে বলেছিলেন, মনে হচ্ছে ভয়ংকর কিছু একটা দেখে ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছে।

ডাক্তারের কথা সত্য প্রমাণিত হল অজয়ের জ্ঞান ফেরার পর তার মুখ থেকে সব কথা শুনে। জ্ঞান অবশ্য ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই ফিরেছিল—কিন্তু সে মোহাচ্ছন্নের মত ছিল পরদিন বেলা প্রায় আটটা অব্দি। বেলা দশটা নাগাদ তাকে বেশ খানিকটা সুস্থ মনে হতে আমরা গত রাতের ঘটনার কথা তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। উত্তরে সে বলেছিল যে, তার মনে হয়েছিল একজন ভীষণদর্শন কাপালিক এক হাতে তাকে চেপে ধরে অন্য হাতে ধারালো খাঁড়া তুলে তার গলায় একটা কোপ বসিয়ে দিয়েছিল। তাই অমনভাবে সে চিৎকার করে উঠেছিল।

তার মুখে একথা শুনে তখুনি গাঁয়ের প্রায় বিশ-পঁচিশজন যুবক সেই পোড়োমন্দিরের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ল। শ্যামল, রতন আর আমি, আগে আগে চললাম। সকলের মনেই সেই ঘরটা দেখার তীব্র আগ্রহ। দিনের বেলা বেশ ভালভাবেই দেখাশোনা যাবে। এতকাল কারো মনে কোন আগ্রহ জাগেনি—আজ এত বছর পর এমন একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে যাওয়ায় গাঁয়ের আজকালকার তরুণ যুবকেরা কৌতূহল দমন করতে পারল না।

দিনের বেলা হলেও সেই পাতাল কক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে অনুমান করে নিয়ে আমি গোটা চার-পাঁচ টর্চ নিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল প্রায় জনা দশেক টর্চ নিয়ে এসেছে।

গুপ্ত দ্বারের সামনে এসে দেখা গেল, সত্যই ভেতরটা বেশ অন্ধকার। যাই হোক, আমরা টর্চগুলো জ্বেলে একে একে নামতে লাগলাম নীচে।

সিঁড়ির শেষ প্রান্তে নেমে আমার টর্চটা পেয়ে গেলাম। কিন্তু একি! এখানে একটা নরকঙ্কাল এল কি করে? দেখেই শিউরে উঠলাম। বেশ মনে আছে, এখানে সিঁড়ির গোড়ায় তো কোন কঙ্কাল ছিল না। কঙ্কালগুলো তো সবই দেখেছিলাম ঘরের মেঝের ওপর এদিকে-ওদিকে পড়ে ছিল। আরে, পায়ের কাছে বিরাট একখানা খাঁড়াও পড়ে রয়েছে দেখছি। কঙ্কাল, খাঁড়া.......না কক্ষণো না, এসব মোটেই এখানে ছিল না। ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখি, প্রতিমার কাছে যে খাঁড়াটা পড়ে ছিল, সেটা তো সেখানে নেই!

সবগুলো টর্চের আলোয় ঘরখানা প্রায় সাদা হয়ে গেছে। অন্যান্য সকলে অবাক্ চোখে ঘরের মধ্যে যা যা রয়েছে সেই সব লক্ষ্য করছে। কিন্তু আমার নজরে যা পড়ছে তা আশ্চর্য—অতি আশ্চর্য, একেবারে অলৌকিক ব্যাপার! প্রতিমার কাছে যে খাঁড়াটা পড়ে ছিল, সেখানে খাঁড়াটা নেই বটে, কিন্তু সেই জায়গায় খাঁড়ার ছাপটা জ্বলজ্বল করে যেন জ্বলছে! বহুকাল ধরে ঘরের মেঝে ও জিনিসপত্রের ওপর বেশ পুরু একটা ধুলোর আস্তরণ জমেছিল। কাজেই সেখান থেকে খাঁড়াটা উঠে আসার জন্যই অমন সুস্পষ্ট ছাপটা দেখা যাচ্ছে। আর ওখানকার ঐ খাঁড়াটাই যে এখানে এসে পড়েছে, এ বিষয়ে আমার মনে কোনরকম সন্দেহ রইল না। খাঁড়াটাই নয়, ঐ একই রহস্যজনক উপায়ে কঙ্কালটাও যে ঘরের মেঝে থেকে উঠে এসেছে এখানে, সে বিষয়েও আমার মনে স্থির বিশ্বাস জন্মাল। কিন্তু এই অলৌকিক কাণ্ডকারখানার মূলে কোন অলৌকিক রহস্য যে অন্তর্নিহিত রয়েছে, তার মীমাংসায় পৌঁছানর মত বুদ্ধিবৃত্তি আমার নেই!

অত লোকজনের মধ্যে থেকেও কি যেন এক দারুণ ভয়ে আমার সারা দেহ শক্ত, কাঠ হয়ে গেল!

[আষাঢ় ১৩৮১]

নব সাজে শার্লক হোমস

শৈলেশ ভড়

তাঁর আসল নাম ডক্টর কিম সিম্পসন। বিশ্ববিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ফোরেনসিক ল্যাবরেটারীর বিশ্ববিখ্যাত এক্সপার্ট। সবাই বলে বিংশ শতাব্দীর শার্লক্ হোম্স্।

কথাটা কিন্তু একটুও মিথ্যে নয়। তাঁর তদন্ত পদ্ধতি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অনুসন্ধিৎসু মনকে প্রত্যেকটি আসামী রীতিমত সমীহ করে।

'আপনি কি বলছেন ডঃ সিম্পসন?' গোঁপে তা দিয়ে বললেন দুর্দান্ত খুনী জন হেগ—'আমি বিধবা বৃদ্ধা শ্রীমতী ডুরাণ্ড ডিকন্‌কে খুন করেছি। ছি ছি এমন একটা অবিশ্বাস্য কথা আপনার মুখ দিয়ে বেরোলো কী করে?'

'তা জানি না।' রীতিমত গম্ভীরভাবে বললেন ডঃ সিম্পসন, 'আমার বিশ্বাস এ আপনারই কাজ।'

'কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়?' ডানদিকের ঠোঁটটা কুঁচকে তাচ্ছিল্যভাবে হাসলেন জন হেগ, 'মৃতদেহ না পেলে আপনি আমার কিছুই করতে পারবেন না।'

'তা ঠিক, মৃতদেহ আবিষ্কৃত না হলে হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়।'

'অতএব আপনার ঐ কুৎসিত চাউনিটা আমার ওপর থেকে সরিয়ে দয়া করে আর কারোর উপর ফেললে ভাল হয় না কি?'

'হুঁ!' খুনী হেগের চোখে চোখ রেখে বললেন ডঃ সিম্পসন, 'কিন্তু শ্রীমতী ডিকনের মূল্যবান গহনাগুলো আপনি যে সেঁকরাকে বিক্রি করেছেন সেগুলো আমাকে দেখিয়েছে। অতএব আমার কুৎসিত চাউনিটা বর্তমানে আপনার ওপরেই পড়ে থাকবে।'

একটু চমকালেন জন হেগ। বিস্ফারিত হাসিটাও একটু কুঞ্চিত হলো যেন, 'সত্যি আপনার বুদ্ধি আছে ডঃ সিম্পসন। শহরের এতগুলো সেঁকরার মধ্যে থেকে ঠিক আসল লোকটিকেই ধরেছেন। কিন্তু কী করে ধরলেন, বড় জানতে ইচ্ছে করছে।'

'যেমন করে আপনাকে ধরেছি, ঠিক তেমনি ভাবে। আসল কথাটা কি জানেন? ঈশ্বরের পৃথিবীতে দুষ্টু লোকের সংখ্যা খুব কম, তাই তাদের চিনে নিতে খুব একটা অসুবিধে হয় না।'

'কিন্তু গয়না চুরি করে বেচে ধরা পড়লে কয়েক মাস অবশ্য জেল হতে পারে। সেটা এমন কিছু নয়। কিন্তু হত্যাকারী বলে প্রমাণিত হলে নির্ঘাৎ ফাঁসি। ওতে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে।'

'আপত্তি থাকলে তো চলবে না জন হেগ। হত্যাকারীকে ফাঁসিতে লটকাতেই হয়। দেশের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে এ ছাড়া আর উপায় কী?'

'মৃতদেহ না পেলে আপনি আমার কোন ক্ষতি করতে পারবেন না। আর সে মৃতদেহ আপনি জীবনে খুঁজে পাবেন না।'

'হ্যাঁ সেটা আমি জানি। কারণ—' কথাটা বলে থামলেন ডঃ সিম্পসন। চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে হেগের দিকে।

হেগের দৃষ্টিটা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো এবং কপাল ও ভ্রূজোড়া দুইই কুঁচকে উঠলো, 'কারণ?'

খুব ধীরে ধীরে বললেন ডঃ সিম্পসন, 'কারণ আপনি তাকে সালফিউরিক অ্যাসিডে ফেলে একেবারে গলিয়ে ফেলেছেন।'

'কে, কে বলেছে একথা?' চেয়ার ছেড়ে তীরের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন জন হেগ।

'যার কাছ থেকে আপনি অ্যাসিডের ড্রামটা কিনেছেন সেই বলেছে।' এবার ডঃ সিম্পসনের গম্ভীর মুখে ছোট্ট একটু হাসি ফুটে উঠলো, 'এই মারাত্মক অ্যাসিডে লোহাও গলে যায়।'

'তা-তা-তাতে কি হয়েছে?' একটু তোৎলালেন জন হেগ, 'ও অ্যাসিড আমার অন্য কাজে লাগতে পারে না! মৃতদেহ গলিয়ে ফেলবার জন্যে কিনেছি তার কি মানে আছে?'

'মানে কি জানেন মিঃ হেগ?—' ডঃ সিম্পসন কথা দিয়ে চিমটি কাটলেন, 'বুঝতে চাইলে সব কথারই মানে পাওয়া যায়, আর তা না চাইলে—'

'আপনি কী বলতে চান ডঃ সিম্পসন?' পকেটে একটা হাত পুরে একটু এগিয়ে এলেন জন হেগ। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আমি ডিকন্‌কে খুন করেছি!'

'আমি বলবো কেন, আপনি নিজেই বলুন।'

'না, আমি খুন করিনি।'

'আপনার গলার আওয়াজ আগের চেয়ে এখন অনেক নরম হয়ে এসেছে। কিন্তু আমার কাছে আপনার বিরুদ্ধে আরও প্রমাণ আছে। এই দেখুন।'

'কী এ দুটো?' বড় বড় চোখে চেয়ে বললেন জন হেগ, 'মনে হচ্ছে খুব ছোট ছোট দুটি গুলি।'

'সাদা চোখে তাই মনে হচ্ছে বটে কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন এ দুটো মানুষের দেহের গল্‌ড স্টোন। পুরু চর্বিতে ঢাকা আছে বলে অ্যাসিডে গলে নি। মিসেস ডিকনের চিকিৎসক বলেছেন যে তাঁর গল্‌ড স্টোন ছিল।'

'তা থাকতে পারে।' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন জন হেগ, 'কিন্তু এ দুটো যে তাঁরই তার কি প্রমাণ?'

'না, তা অবশ্য নেই।' খুব শান্ত গলায় বললেন ডঃ সিম্পসন। 'কিন্তু এই বাঁধানো দাঁতের পাটিটা যে তাঁর সেটা চিহ্নিত করেছেন তাঁর দাঁতের ডাক্তার। এটা পুরো গলে নি কিন্তু অ্যাসিডের ছাপ পাওয়া গেছে। অতএব—'

গলা ছেড়ে এবার হেসে উঠলেন জন হেগ, 'সত্যি আপনার তদন্তের প্রশংসা না করে পারা যায় না। ঠিক লোককেই আপনি ধরেছেন। হ্যাঁ, আমি তাকে পিছন থেকে গুলি করে মেরে তারপর সালফিউরিক অ্যাসিডের ড্রামে ফেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু না। আপনাকে আর বাঁচতে দেওয়া যায় না।'

হেগ পকেট থেকে পিস্তলটা বার করবার আগেই আর একটি পিস্তল তাঁর কাঁধের কাছে ঠেকিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর বলে উঠলেন, 'হাত তোল শয়তান হেগ।'

আর পকেট থেকে একটি ছোট্ট বাক্স বার করে ডঃ সিম্পসন বললেন, 'এতে ধরা আছে আমাদের কথাবার্তা আর আপনার স্বীকারোক্তি।'

তারপর হেগের কী হল সে কথা বোধ করি আর বলবার দরকার নেই।

আর একটা ঘটনার কথা বলি।

একবার দড়িতে বাঁধা একটি মৃতদেহ পাওয়া গেল সাগরের জলে।

সকলেই বললে এ হত্যা ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না।

কিন্তু ডঃ সিম্পসন মৃতদেহ পরীক্ষা করে তাঁর মত দিলেন, 'এ আত্মহত্যা।'

'হতেই পারে না।' তীব্র প্রতিবাদ করলেন পুলিস সুপার, 'আপনি আরও ভালো করে পরীক্ষা করুন। এটা নিশ্চয়ই হত্যা।'

'না, এটা আত্মহত্যা।'

'কি করে বুঝলেন?'

'লক্ষ্য করে দেখুন। দেহটিতে যেভাবে দড়ি জড়ানো রয়েছে সেটা নিজে ছাড়া অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রন্থির প্রত্যেকটি মুখ উপর দিকে। মুখ দিয়ে সে গেরো বেঁধেছে। ওর দাঁতের ফাঁকে আমি এই দড়ির একটা টুকরো পেয়েছি। এ হত্যা নয়, আত্মহত্যা।'

আরও অনুসন্ধান করে পুলিস জানতে পারলো লোকটি ব্যক্তিগত কোন কারণে আত্মহত্যা করেছে। অন্ততঃ তার হাতের লেখা ডায়েরী সেই কথাই বলছে।

সাধে কি ডঃ সিম্পসনকে বিংশ শতাব্দীর শার্লক হোম্‌স্‌ বলে।

এবার তাঁর প্রথম জীবনের একটা মজার ঘটনার কথা বলে আমার প্রবন্ধ শেষ করবো।

ডঃ সিম্পসন তখন সবে ফোরেনসিক ল্যাবরেটরীতে যোগদান করেছেন।

এমন সময় একটি মহিলার মৃতদেহ এলো তাঁর কাছে পরীক্ষার জন্য।

তিনি বললেন, 'একে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে।'

আরও বললেন, 'যে হত্যা করেছে তার হাতের আঙুলের ডগাগুলো সব কাটা।'

সকলেই বললে, 'এ কাজ নিশ্চয়ই হ্যারল্ড লফ্যানের। আর তার হাতের আঙুলের ডগাগুলো সব কাটা। সেই হত্যা করেছে এই মেয়েটিকে।'

কিন্তু স্যার বার্নার্ড সিম্পসন বেরি একজন অভিজ্ঞ পরীক্ষক। তিনি লফ্যানেব আঙুলগুলি পরীক্ষা করে মত দিলেন, 'এর পক্ষে হত্যা করা একেবারেই সম্ভব নয়, কারণ এর হাতের আঙুলে এমন জোর নেই যা দিয়ে গলা টিপে খুন করা যায়।'

বিচাবে মুক্তি পেলেন হ্যারল্ড লফ্যান।

ডঃ সিম্পসন তখনও বললেন, 'এ নিশ্চয়ই লফ্যানের কাজ।' কিন্তু স্যার বার্নার্ডের কথার ওপর আর কোন কথা চলে না।

ফাঁসির দড়ি লফ্যানের গলার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তারপর আরও কুড়ি বছর কেটে গেছে। লোক ভুলে গেছে সেই হত্যার কথা।

এমন সময় লফ্যানের একটি চিঠি নিয়ে একটি লোক এলো ডঃ সিম্পসনের কাছে।

'কি ব্যাপার।'

'লফ্যান ক্যান্সার হাসপাতালে বর্তমানে শয্যাশায়ী। আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।'

ডঃ সিম্পসন এলেন হাসপাতালে, বসলেন লফ্যানের শয্যাপার্শ্বে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন তাঁর সুস্থদেহ।

শুকনো হাসলেন লফ্যান, বললেন, 'এবার আমার নরকে যাবার সময় হয়েছে। তার আগে আপনাকে একটা কথা জানিয়ে যেতে চাই।'

'বলুন।'

'কুড়ি বছর আগে হোটেলের যে মেয়েটিকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল তার হত্যাকারী এই আমি। সেদিন আপনি ঠিক লোককেই ধরেছিলেন।'

'কিন্তু স্যার বার্নার্ড বলেছিলেন যে আপনার আঙুলে এত জোর নেই যে গলা টিপে হত্যা করতে পারবেন।'

'হ্যাঁ সেটাও ঠিক। আমার হাতে কোন জোর নেই।'

'তাহলে?' ডঃ সিম্পসন যেন একটা বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

হাসলেন লফ্যান, বললেন, 'আচ্ছা, আপনিই বলুন, ধীর স্থিরভাবে চুরি করবার সময় পিছন থেকে যদি কেউ হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে তাহলে কী বিশ্রী লাগে বলুন তো। তাই রেগে গিয়ে— আর রাগলে এই হাত দিয়ে আমি আকাশের বজ্রও চেপে ধরতে পারি। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এই আঙুল দিয়ে আমি একটা পিঁপড়েও মারতে পারি না।'

কথার শেষে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন লফ্যান।

অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ডঃ সিম্পসন হাতটি চেপে ধরে করমর্দন করলেন। বললেন, 'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। কারণ আমার এই দীর্ঘ কর্মজীবনে কোনদিন কোন ভুল হয়নি। কেবল এই ঘটনাতে একটু সন্দেহ ছিল আজ তাও মিটলো। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।'

এবার তোমরাই বলো বিশ্ববিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিশ্ববিখ্যাত ডঃ কিম সিম্পসনকে নবসাজে শালর্ক হোম্‌স্‌ বলবে কিনা।

[চৈত্র ১৩৭৯]

তিনুকাকার অন্তর্ধান রহস্য

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনুকাকাকে নিয়ে আমার বাবা-কাকারা শেষ পর্যন্ত সত্যি ভারি মহাফাঁপরে পড়ে গেলেন। কী যে করা যায়। দুদুকাকার ব্রহ্মতালু জ্বলছে রাগে। ঠাকুমার ভয়ে কিছু বলতেও পারছেন না। বললেই এক কথা, তুই আবার তিনুটার পেছনে লাগলি! দাঁড়া, উপেন বাড়ি আসুক, যদি না বলছি তবে আমার নামে কুকুর পুষিস। উপেন অর্থাৎ আমার সোনা জ্যাঠামশাই—তিনি এলে নালিশ দিলে দুদুকাকাকে ডেকে শাসন করবেন, তোরা কী হলি, মার কথা অবজ্ঞা করিস! আমাদের সামনে দুদুকাকা চান না, তাঁর দাদা এসে তাঁকে ধমকান। তবু মাথা যে ঠিক রাখতে পারছেন না বুঝতে পারছি। ঠাকুমা এ-বাড়ি ও-বাড়ি গেলেই হুংকার, হারামজাদা তোকে ধরে খড়মপেটা না করলে তুই সজুত হবি না! ভেবেছিস কি! সাপের পাঁচ পা দেখেছিস! বাড়িতে কেউ তিষ্ঠোতে পারবে না দেখছি। ছেলেপিলেদের পড়াশোনা পর্যন্ত লাটে তুললি!

ঠাকুমার এখন এক কথা, দেখিস তিনুটা যেন আবার ভেগে না যায়। ভেগে গেলে যে দুদুকাকার রক্ষা থাকবে না, তিনুকাকার সর্বনাশের মূলে দুদুকাকা—এ সব সাত-পাঁচ চিন্তায় কাকা আমার সত্যি অস্থির।

দুদুকাকা দেখলেন, তিনুকাকা গোপাটের দিকে যাচ্ছে। আমরা গুপ্তচর বৃত্তিতে আছি। দুদুকাকা খবর পেলেই দৌড়ে হাজির।—এই কোথায় যাচ্ছিস! এক পা বাড়ি থেকে নড়লে ঠ্যাং ভেঙে দেব। পাজি হতচ্ছাড়া, ভাগার তালে আছে। যা বাড়ি যা, ঘরে গিয়ে বসে থাক। বৌমা না আসা পর্যন্ত তোমার ছুটি নেই।

—বলছি তো তোমাদের বৌমাকে খবর দেবে না। দিলেই ভাগব।

এদিকে কাকীমাকে খবর না দিয়েও উপায় নেই। কাকা তখন নিরুদ্দেশ। ঠাকুমা সারাদিন বারান্দায় ঠ্যাং ছড়িয়ে বিলাপ—আমার দশটা না পাঁচটা না, একটা ভাইপো, বিবাগী হয়ে তুই কোথায় চলে গেলি রে তিনু! তোকে কে আছে রে দেখার! তুই কেন চলে গেলিরে! যাবি তো খবর দিয়ে কেন গেলি না রে! কাকে এখন খুঁজতে পাঠাই রে। বাড়িতে আমার একপাল রাক্ষস কেবল গিলতে জানে রে। তোর খোঁজে আমি কাকে যে পাঠাই রে! আমার বৌমার কি হবে রে!

কাঁহাতক সহ্য করা যায়। বাবা-কাকারা সব প্রবাসে। দুদুকাকা বাড়ি থাকেন। ঠাকুরপুজো, জমি, যজমান সব দেখেন। পঞ্চুকাকা গরু বাছুর গোয়াল। আসলে দুদুকাকা কেন খুঁজতে বের হচ্ছে না, পঞ্চাটা কী করে দিবানিদ্রা দিতে পারে এত বড় দুর্ঘটনার পর ঠাকুমার মাথায় সেটাই আসছে না। ফলে বসিরের কাছ থেকে খবর পেয়েই আমরা রওনা হয়েছিলাম নিখোঁজ বামালের খোঁজে। পেয়েও গেছিলাম।

বিয়ের আগে ঠাকুমার ভাই বেঁচে থাকতেও কাকা আমার মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। তখন কেশব দাদু চিঠি দিত দিদিকে, তিনুটা আবার উধাও। কী যে করি!

কাজেই তিনুকাকার উধাও হওয়া নিয়ে আমাদের কোনো দুশ্চিন্তা হত না। বেরিয়েছে, আবার ফিরে আসবে। কিন্তু মুশকিল হত ঠাকুমাকে নিয়ে।

ঠাকুমা ভারি উচাটনে পড়ে যেতেন তখন। পঞ্চুকাকাকে পাঠাতেন খবর দিয়ে—বিয়ে দিয়ে দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কেশব দাদু আসতেন। একদিনের পথ। তাও চলে আসতেন। এসে বলতেন, বিয়ের কথা তুললেই ভাগছে।

ঠাকুমার এক কথা, আমি পাত্রী ঠিক করে রেখেছি। এবার এলেই পিঁড়িতে বসিয়ে দিতে হবে।

—কিন্তু দিদি!

—আরে কিন্তুটা কী বলবি তো!

—ও যে বলছে, অতি ঝক্কি পোহাতে পারবে না।

—ও বলল, আর তুই শুনলি! অমন বলে থাকে। এবার ফিরে এলেই খবর দিয়ে দিবি। উপেন, জলু, অভিমন্যু সবাই চলে যাবে। আমিও যাচ্ছি। বাড়ি উজাড় করে সব তোর ওখানে তুলে নিয়ে যাব। পায়ে পায়ে লোকজন থাকবে। ভাগেটা কী করে দেখব! বিয়ে দিলেই দেখবি দায়িত্বজ্ঞান বাড়বে। বাউণ্ডুলেপনা মাথায় উঠবে। বাড়ি থেকে নড়তেই চাইবে না। এমন মহৌষধ প্রয়োগে কাকা আরোগ্যলাভ করবেন জেনেই গত বৈশাখে বিবাহ।

মাসখানেক বাদে কেশব দাদুর চিঠি, এবারে আর মরতে ভয় পাই না দিদি, শান্তিতে মরতে পারব। তিনুটার সংসারে মন বসেছে। দাদু সত্যি কিছুদিন যেতে না যেতে সজ্ঞানে মারা গেলেন। আর কাকাও তারপর একদিন সজ্ঞানে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লেন।

আগে আসত দাদুর চিঠি, এবারে কাকীমার চিঠি। ঠাকুমাকে লিখেছে, পিসিমা আপনার ভাইপো, আজ ক'দিন হল বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে। এত জমাজমি গাছপালা বাগান দেখি কী করে! ও যে কোথায় গেল—দীর্ঘ চিঠি। কোথাও কোন রাগ-অভিমানের প্রশ্ন নেই।

তিনুকাকার বের হয়ে পড়াটা আমাদের কত বড় যে সংকট তখন দুদুকাকার চোখ-মুখ দেখলে টের পেতাম।

—আরে গেলি!

ঠাকুমার চিৎকার—যা, বসিরকে খবর দে। পঞ্চারে পাঠা গোপালদি। অচল ভোলা উমাকে পাঠা—এক একদিকে তোরা বের হয়ে পড়।

দুদুকাকা না পারলে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত!—কোথায় খুঁজব! উমা অচলের পড়াশোনা নেই!

ঠাকুমাব এক কথা, পড়াশোনা করার সময় অনেক পাবে—ওটা ভেসে যাবে না। কিন্তু আমার ভাইপোটা ভেসে গেলে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তারপর খুঁজেও পাওয়া গেল। ধরে আনাও গেল। কড়া পাহারা। আমাদের ইস্কুল-ফিস্কুল মাথায়। পড়াশোনা করলেও হয়, না করলেও হয়। দুদুকাকার মেজাজ সপ্তমে, তিনিই আমাদের অভিভাবক। পড়তে বসতে বলতে পারেন না, ইস্কুলে যেতে বলতে পারেন না। কারণ ঠাকুমার কথার উপর কারো কথা নেই। আমাদের জ্যাঠা-কাকারা মিলে ছ'জন, চার পিসি—সবার বড় বেশি মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য—এ-হেন পরিস্থিতিতে দুদুকাকা বড় অসহায়। কিছু বললেই বাবা-কাকারা প্রবাস থেকে এলে নালিশ, আমাকে তোরা কাশী পাঠিয়ে দে। আমি এখন কে! ডালু আমার কথার মর্যাদা দেয় না। তোমাদের এখন সবার পাখা গজিয়েছে, আমি নিমিত্ত মাত্র। কালই বারদী চলে যাব। অপমান আর সহ্য হয় না।

বারদী থেকে স্টিমারে নারানগঞ্জ, তারপর কলকাতা—ঠাকুমার বোন কাশীবাসী, সতীলক্ষ্মী পুণ্যবতী না হলে জীবনে এমন হয় না। মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট জায়গা। সংসারের টানে সেই মোক্ষলাভ পর্যন্ত হচ্ছে না। রেগে গেলেই মোক্ষলাভের জন্য অধীর হয়ে ওঠা তাঁর অভ্যাস। বার্ধক্যে বারাণসী মনে করিয়ে দিয়ে বলবে, সব থাকল, চললাম। এই একটা ভয়ে বাবা জ্যাঠা এবং কাকারা বড়ই জুজু ঠাকুমার কাছে। মার কোন অভিযোগ শুনতেই তাঁরা রাজি না। দুদুকাকা সবার ছোট। বাড়ি

থাকেন, জমিজমা, গৃহদেবতা, যজমান সব সামলানোর দায় তাঁর। আর আছে পঞ্চুকাকা, গোয়াল-ঘর, গরু-বাছুর, চাষ-আবাদের মালিক। তিনি আমাদের সংসারে, দুদুকাকার পরই দ্বিতীয় মনিব। এই মনিবের ঠেলাতেই, তিনুকাকাকে এবারে পাকড়াও করা গেছে। আর আছে একজন, সবাই জানে তাকে চোরা বসির। সেও নানা অঞ্চলের খবর দিয়ে যায়—বাড়ি ঢুকতে অবশ্য ভয় পায়। ভয় দু-কারণে—এক আমার পাগল জ্যাঠামশাই আর এক পঞ্চুকাকা। সেই বলেছিল, আমাদের বাড়িতে এক জোড়া বাস্তু সাপ আছে। দুধগুখরো। ঠাকুরদার খাটের নিচে, মেঝের গর্তে তার নিবাস।

চোরা বসির না থাকলে এবারে আমরা খবর পেতাম না, তিনুকাকা কোথায় ঘাপটি মেরে আছেন। বসিরের মাথায় থাকে মোটা হাঁড়ি, আর এক জোড়া কেউটে। সে আমাদের কেউটে সাপের খেলা দেখিয়ে আকৃষ্ট করে। আমরা ঘর থেকে চাল ডাল সুপারি পান, যা কিছু জ্যাব ভর্তি করে নিয়ে যাই গোপাটে। সে কখনও আমাদের কচ্ছপের ডিম দেয়। সেই খবর দিয়েছিল, অনুমান হয়।

—অনুমান।

অনুমান হয়, তিনু কর্তা দন্দির শ্মশানে আইসা মকুব দিচ্ছেন। এলাহী কাণ্ড।

কথাটা পাঁচকান না হয় সে জন্য চুপি চুপি বসির বলেছিল, আল্লার মর্জি না হলে হয় না। ফকির দরবেশ আউলিয়া সব তাঁর মর্জিতে। আপনার আমার সাধ্য কি! আসলে বসিরের ধারণা, ঈশ্বরের অসীম কৃপা না থাকলে সংসার ছেড়ে বিবাগি হওয়া যায় না।

তখন আমার ঠাকুমার অনশন চলছে। কাকীর চিঠি পেয়েই ঠাকুমা নিরামিষ ঘরের বারান্দায় বিলাপ শুরু করে দিয়েছিলেন, ওরে তিনু রে, তুই কোথায় গেলি রে, বাপ! আমার দাদার কী হবে রে! বৌমা জলে ভেসে গেল রে! আমার বাড়িতে কে আছে রে খোঁজখবর নেয়। সব কটা বৌদের কথায় ওঠে বসে রে! এ-হেন অবস্থা যখন চলছে, গাঁয়ের মানুষজন ঠাকুমার বিলাপে বাড়িতে অষ্ট প্রহর হাজির, বোঝ প্রবোধ দিচ্ছে, কে শোনে কার কথা। দুদুকাকা শিরে সংক্রান্তি ভেবে বের হয়ে পড়েছেন—একদিকে পঞ্চুকাকা গেছে, একদিকে দুদুকাকা, কিন্তু দিনের শেষে ঘর্মাক্ত হয়ে ফিরছেন, খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, তখনই আমরা চার ভাই বাড়ি দৌড়ে গিয়ে পঞ্চুকাকার মারফৎ খবর দিলাম, তিনুকাকা দন্দির শ্মশানে ধুনি জ্বালিয়ে বসে গেছে। খবরটা বসিরই দিয়ে গেছে।

খবর পাওয়া মাত্র ধাওয়া—ঠিক মক্কেল সেখানে। চেনার উপায় নেই, গেরুয়া পরনে, জটাজূটধারী সন্ন্যাসী। গালে লম্বা দাড়ি। বোঝার উপায় নেই তিনুকাকা। পঞ্চুকাকা ঠিক বুঝতে পেরে যেই না সাধুবাবার কুঁড়েঘরে হাজির, তখনই লম্বা দৌড়। এই দৌড় দেখেই বুঝেছিলাম, ঠিক আমার তিনুকাকা না হয়ে যায় না। আমাদের সার্কাস দেখাবার জন্য নিয়ে গিয়ে এ ভাবে একবার দৌড়ে মেলা থেকে পালিয়েছিলেন। যত ডাকি, তিনুকাকা, কোনো ভয় নেই, টিকা দিতে এসেছে, পালাচ্ছ কেন? তিনুকাকা কি একা, মেলাসুদ্ধু লোক দৌড়াচ্ছে। কলেরা বসন্তের প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে সরকারী দায়িত্ব নিয়ে এসেছে যারা, তারা তো হতভম্ব। সবাই দৌড়ায়। মুরগির ঝাঁপি ফেলে দৌড়ায়। কাঁচের চুড়ি চিনেমাটির পুতুল ফেলে দৌড়ায়। জিলিপির কড়াই উল্টে দিয়ে দৌড়ায়। মেলা একেবারে ফাঁকা। আমরা দৌড়াই তিনুকাকাকে ধরার জন্য। পৃথিবীর হেন জায়গা নেই, তিনুকাকা না গেছে—ভ্রমণ তার একমাত্র বিলাস। সেই তিনুকাকা কাকীমার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য বোধহয় আবার ভ্রমণে বের হয়ে পড়েছেন।

পঞ্চুকাকা আমাদের খুবই বলশালী মানুষ। তার সঙ্গে পারবে কেন। দু-লাফে কাকার জটা সাপটে ধরতেই ফসকে গেল। পঞ্চুকাকার হাতে নকল পরচুলা, তিনুকাকা তখনও ছুটছে। দুদুকাকার ধমকে পঞ্চুকাকার চৈতন্য উদয়।—আরে পালাচ্ছে, ধর ধর। পরচুলা ফেলে দৌড়া।

পঞ্চুকাকা এবার দাড়ি সাপটে ঝুলে পড়ল। তিনুকাকা আর যায় কোথায়! দাড়িটা নকল নয়, পঞ্চুকাকা ঝুলে পড়তেই টের পেয়েছিল।

দুদুকাকার হুমকি, আবার তিনু তুই নিরুদ্দেশ। তুই কি আমাদের শান্তিতে বসবাস করতে দিবিনে।

তিনুকাকা চুপ।

—হাঁট। তিনুকাকা হাঁটতে থাকল।

বাড়ি এসে তিনুকাকা আমাদের নিয়ে নাপিত বাড়ি গেল। দাড়ি কামিয়ে বলল, ওম শান্তি! আর দাড়ি রাখছি না। দাড়িটাই কাল হয়েছে!

আমরা বললাম, ওম শান্তি বলছ কেন তিনুকাকা।

—বুঝলি না, বাঁধন আলগা হল। দাড়িটাই যত নষ্টের গোড়া।

সেই থেকে আছেন তিনুকাকা। কাকীমা না আসা পর্যন্ত ছাড়া হবে না। কাকীকে আনতে লোক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা দশ-বার ক্রোশ পথ। একদিনে যাওয়ার উপায় নেই। খাল বিল নদী টিলা ডিঙ্গিয়ে যেতে হয়। কোন সড়ক পথ নেই। কাকীমা ডুলিতে আসবেন। আর গেলেই তো কাকীমা আসতে পারবেন না। সংসারে একা মানুষ। এক বুড়ি মাসি থাকে সঙ্গে। বাড়িতে গৃহদেবতা আছে। চাকর-বাকর আছে। সবাইকে সব বুঝিয়ে তবে না আসা! কাজেই কাকীমা না আসা পর্যন্ত আমাদের কাজ তিনুকাকাকে পাহারা দেওয়া।

তিনুকাকা মাঝে মাঝে খুবই চটে যেতেন—এই তোরা যা। আমি মাঠে যাব।

—আমরাও যাব।

—তোরা কি আমার হাগা মোতা বন্ধ করে দিবি!

দুদুকাকা বলেছে, ও যাই বলুক, সঙ্গে থাকবি। রাতে পাহারার ভার পঞ্চুকাকার। দক্ষিণের ঘরে আমরা চার ভাই। বড়দা মেজদা একপাশে। তিনুকাকা মাঝখানে। আমি আর শান্তি একপাশে। নিচে দরজার পাশে পঞ্চুকাকার বিছানা। দরজায় তালা দেওয়া।

—অ পঞ্চু শুনছ! মধ্যরাতে তিনুকাকার গলা।

—আজ্ঞে।

—কৃপা হোক!

কৃপা হোক মানে দরজার তালা খুলে দাও।

পঞ্চুকাকা দরজার তালা খুলে হ্যারিকেন উসকে সঙ্গে সঙ্গে আছে।

সারা রাত এই চলে। পঞ্চুকাকা শোয়। ঘুম লেগে আসতে না আসতেই, আবার ডাক, পঞ্চু কৃপা হোক!

এ-ভাবে সারারাত চললে কাঁহাতক সয়। সহসা ক্ষেপে গিয়ে পঞ্চুকাকা বলে ফেলল, কৃপা করে হাগা মোতার কাজটা ঘরেই সারুন কর্তা। আর পারি না।

কাকা জামা তুলে পঞ্চুর হাতখানা পেটে চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, বুঝতে পারছ? কাকার বড় কাতর মুখ।

—কী।

—কান পেতে শোন! বলে কাকা দু-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন।

পঞ্চুকাকা কান পেতে শুনতে গিয়ে খটাস করে লাফিয়ে উঠল।—উরে ব্বাস! আল্লার গজব চলতাছে!

—হ্যাঁ গজব। সাধে কি বিবাগী হই পঞ্চু। বড় কষ্ট! পেটে ঐরাবত ডাকছে।

আমরাও ঘুমাতে পারছি না! পেটে আল্লার গজব—কী ব্যাপার, তাজ্জব বনে গেছে পঞ্চুকাকা পেটে এমন দুরমুস চলছে—আর কর্তা এত নির্বিকার! আমরাও হতবাক, পেটে ঐরাবত ডাকে কেন?

বড়দা বলল, পঞ্চুকাকা, কি হয়েছে। ঐরাবত ডাকে কেন?

পঞ্চুকাকা বলল, পেটখানা দেখ, ফেঁপে ঢোল। ভুটভাট—খৈ ফুটছে জালার ভিতর। তোদের তিনুকাকার পেট ফাঁসল বলে!

আমরা আর কান পাততে সাহস পেলাম না। পেট ফেঁসে গেলে ঊর্ধ্বগতি।

বড়দা বলল, দুদুকাকাকে ডাকি!

সহসা তিনুকাকা ধড়ফড় করে উঠে বসলেন, না না, দাদারে ডাকবি না! ঘুমুচ্ছে। উঠলেই ক্ষেপে যাবে।

পঞ্চুকাকা বলল, হজমের বড়ি খান। দিচ্ছি।

—হজমের বড়ির কম্ম নয় ওটা পঞ্চু! সাধে কি গৃহছাড়া হই। একখানা পুঁটুলি আছে আমার জ্যাবে। সর্বক্ষণ পাহারা দেও ভাল। কিন্তু হাগা-মোতা নেশা-ভাঙ দুই মানুষের বড় প্রয়োজনীয় বস্তু। তোমাদের বৌমার সেটা আদপেই মালুম হয় না। আলসেতে টিকা গুঁজে দাও একখানা পঞ্চু! আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোরা বসে থাকলি কেন! ঘুমা। কলকে জ্বালাও, দেখবে ঐরাবতের ডাকাডাকি সব বন্ধ।

আমরা একসঙ্গে সটান শুয়ে পড়লাম। ঘুমের ভান করে পড়ে আছি।

পুঁটুলিটা খুলে কি বের করছেন তিনুকাকা। পঞ্চুকাকা খুবই জব্দ। সারারাত জাগিয়ে রাখলে কে না জব্দ হয়। কানে কানে পঞ্চুকাকার কী যেন বললেন আর তখনই পঞ্চুকাকা তাড়াতাড়ি একখানা ছোট কাঠ, এবং ছুরির বন্দোবস্ত করতেই কাকা ব্যোম শংকর বলে আসন পিঁড়ি করে বসে গেলেন। নিবিষ্ট মনে কাঠে কুচি কুচি করে কী কাটলেন। তারপর তালুতে রেখে ঘষলেন অনেকক্ষণ—তারপর ছোট একখানা নাড়ুর মতো বস্তু কলকেয় বসিয়ে জ্বলন্ত টিকা গুঁজে ফুঁ দিতে থাকলেন। হ্যারিকেন জ্বলছে। পঞ্চুকাকা নিবিষ্ট মনে দেখছে। সত্যি আল্লার মেহেরবানি না থাকলে কর্তার চোখ-মুখ এমন অপার্থিব হবার কথা নয়। আসন পিঁড়ি হয়ে ঘাড় নিচু করে ফুস ফুস ফুস—ফটাস। যেন মাথার খোপড়া উড়ে গেল। তারপর কতক্ষণ একভাবে বসেছিলেন আমরা জানি না। কখন এসে আমাদের মাঝখানে শুয়েছেন জানি না, কখন ঘুমিয়েছেন জানি না—আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেছি, কাকা নাক ডাকাচ্ছেন, কখন ঘুম থেকে উঠবেন তার কোন লক্ষণ নেই।

পঞ্চুকাকা আর দুদুকাকা বাইরের উঠোনে তিনুকাকাকে নিয়ে কী সব বলাবলি করছেন!

দুদুকাকা বললেন, তুই গিয়ে মাকে বুঝিয়ে বল।

পঞ্চুকাকা বলল, না আপনে যান কর্তা।

দুদুকাকা বললেন, না, তুই যা। তুই গিয়ে বুঝিয়ে বললে মা বুঝবে।

পঞ্চুকাকা বলল, আমার বুক কাঁপছে কর্তা।

—কাঁপুক। তবু যা। তুই তো আমার সব কথা রাখিস।

ঠাকুমা আমার খাণ্ডারনি বোঝা যায়। সবার অবস্থা ত্রাহি মধুসূদন করে ছাড়েন। ঠাকুমা মুড়ির ধান বের করে দিচ্ছিলেন তখন। পঞ্চুকে অসময়ে অন্দরে দেখেই বললেন, কি রে এখানে কেন!

—কর্তা মা একখান কথা ছিল! বৌদিমণি আসছেন। বড় সার কথা। বৌদিমণিরে ধরিয়ে দেবেন। না দিলে তিনু কর্তা আবার বিবাগী হবে।

—হতচ্ছাড়া আবার বিবাগী হবে বলছে! কিসের অভাব! দাদা কি কিছু কমতি রেখে গেছে! বৌমা আমার লক্ষ্মী প্রতিমার মতো দেখতে।

—তা কর্তা-মা তবু হয়।

—হয়। হতে দিচ্ছেটা কে! কোন কাম-কাজ নেই তোর! নিজের কাজে মন দে।

পঞ্চুকাকা ফিরে যাচ্ছিল।

দুদুকাকা হাত টেনে ধরলেন।—বললি!

—শুনতে চাইল না। কাম-কাজে ফাঁকি দিচ্ছি ভাবছে।

—সে ভাবুক। তুই আয়। সঙ্গে না হয় আমি থাকছি!

—চলেন তবে। গোমড়া মুখে পঞ্চুকাকা দুদুকাকার পাশে হাঁটছে।

—মা পঞ্চু বলছিল............

—সে তো অনেকক্ষণ থেকেই বলছে।

হঠাৎ দুদুকাকা ক্ষেপে গেল। বলল, ঠিক আছে, আমাদের কী! এবার তোমার ভাইপো বিবাগী হলে, আমরা নেই। বাড়াবাড়ি করলে, বিলাপ জুড়লে, আমি পঞ্চু দুজনেই বিবাগী হয়ে যাব। তখন বুঝবে ঠ্যালা।

আমরা ঠাকুমার চারপাশে ঘিরে আছি। আমরাই একমাত্র ঠাকুমাকে ভয় পাই না। বললাম, কাকারা বিবাগী হয়ে গেলে কী হবে ঠাকুমা! আমরা খুঁজতে যাব কী করে!

—যা হবার হবে। যার কেউ নেই তার কে দেখে!

দুদুকাকা পঞ্চুকাকার দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে, তিনুর বৌকেই বলে দেব।

—কি বলবি!

—তিনুর নেশাভাঙের অভ্যাস আছে। বৌমা নেশা করতে দেয় না। চোখে চোখে রাখে বলে বাড়ি থেকে পলাতক। বৌমাকে বলে দিও, যেন একটু-আধটু নেশাভাঙ করতে দেয়। না দিলে পেট ফেঁপে বাড়িতেই একদিন টেঁসে যাবে।

—তিনু নেশা করে? কি নেশা!

দুদুকাকা মাথা চুলকে বলল, নেশা! মানে গাঁজা খায়!

—হতচ্ছাড়া গাঁজা খায়! ও আমার কি হবে! তারপরই বলল, পালায় নি তো?

—না ঘুমুচ্ছে।

—ঘুমুচ্ছে! ঘুম আমি বের করছি। কখন রোদ উঠে গেছে এখনও ঘুমাচ্ছে! বলেই ঝাঁটা নিয়ে ভাইপোকে জাগাবার জন্য ছুটতে গেলে, পঞ্চুকাকা যে-ভাবে তিনুকাকার দাড়ি ধরে ঝুলে পড়েছিল তেমনি আমরা চারভাই সবাই মিলে ঠাকুমার কোমর ধরে ঝুলে পড়লাম। ঠাকুমা আর এতটুকু নড়তে পারল না। তিনুকাকার নাম করে হাওয়ায় ঝাঁটা ঘোরাতে থাকল। আর বিলাপ, হায় আমার বৌমার কপালে শেষে এই লেখা ছিল রে!

[আশ্বিন ১৩৯২]

সাগর বুকের গুপ্তধন

রবিদাস সাহারায়

রূপকথার গল্পে পড়েছি, সাগরের তলায় রয়েছে অপরূপ রাজপুরী, সোনার তৈরি তার দরজা, রূপো দিয়ে তৈরি তার সিঁড়ি। সেখানে আছে কুঁচবরণ রাজকন্যা, মেঘবরণ তার চুল; রত্ন যে কত আছে, তার শেষ নাই।

তা রাজকন্যা সেখানে নাই থাক, কিন্তু রাজপুরীর সেই ঐশ্বর্য সেখানে লুকিয়ে থাকা আশ্চর্য কিছু নয়।

কোন অতীত থেকে কত জাহাজ অতল সাগরের বুকে তলিয়ে গেছে, আর সেই সঙ্গে কত সোনা রূপা হীরে জহরৎ যে সমুদ্র আত্মসাৎ করেছে—কে তার সঠিক হিসেব রাখে? সেই গুপ্তধনের সন্ধান করতে গিয়ে কত দুঃসাহসী মানুষ যে সমুদ্রের তলায় হারিয়ে গেছে—তার খবরও অনেকে রাখে না।

১৬৮৩ সালে একদল দুঃসাহসী ডুবুরী নেমে পড়লেন স্কটল্যাণ্ডের টোবারমরী উপসাগরে। তাঁরা গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিলেন ওখানে হয়তো মিলতে পারে গুপ্তধন—অগাধ ঐশ্বর্য।

দুঃসাহসী ডুবুরীর দল উঠে এলেন শূন্য হাতে—কিন্তু তাঁদের চোখে-মুখে বিজয়ীর গর্ব। তাঁরা জানালেন-উপসাগরের তলায় আমরা এক জাহাজের সন্ধান পেয়েছি। তাতে সাজানো রয়েছে অনেকগুলো কামান। তাদের মধ্যে কিছু কামান সম্ভবতঃ পিতলের তৈরি। এমন আশ্বাসও তাঁরা দিলেন—ভাল করে সন্ধান চালালে অনেক মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার করা যেতে পারে।

এই সংবাদে বিরাট এক আলোড়নের সৃষ্টি হলো সারা স্কটল্যাণ্ডে। কোথা থেকে এল সমুদ্রের তলায় এ গুপ্তধন?

এই নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা শুরু হলো। সংগ্রহ করা হতে লাগল নানা মহল থেকে নানা তথ্য। এর ফলে আরও একশো বছর আগেকার ইতিহাসের পাতা চোখের সামনে খুলে গেল।

১৫৮৮ সালের ১২ই জুলাই।

স্পেন থেকে ইংলণ্ডের দিকে যাত্রা করল বিশাল এক রণতরী—স্পেনিশ আর্মাডা।

মহা আড়ম্বরে এগিয়ে চলল রণতরীর বহর। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের মনে দুর্বার আকাঙক্ষা—ইংলণ্ড জয় করবেন। ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথকে পরাজিত করে নিজে বসবেন সিংহাসনে।

অন্ধ নেশার আবেগে উন্মাদ রাজা ফিলিপ। ইংলণ্ডের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করবেন এ বিষয়ে যেমন তিনি নিঃসন্দেহ—মহাধুমধাম করে বিজয়োৎসব হবে এ বিষয়েও সকলে নিশ্চিত। তাই উৎসবের সমস্ত উপকরণ চলেছে এই জাহাজে। ধনরত্ন ও জিনিসপত্রের অভাব নেই—প্রায় আট কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলারের পরিমাণ অর্থ মজুত রয়েছে স্পেনিশ আর্মাডায়। তা ছাড়াও রয়েছে একটি স্বর্ণখচিত রাজমুকুট।

এমন আয়োজন যেখানে সেখানে অন্যান্য ব্যবস্থাও যে বিরাট হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুদক্ষ সেনাপতি ডিউক অব পার্মাকে করা হয়েছে এই বিশাল নৌবহরের অধিনায়ক। তাঁর অধীনে আছে ত্রিশ হাজার শিক্ষিত সৈন্য। একশ উনত্রিশখানা জাহাজ নিয়ে সেনাপতি পার্মা মহাসমারোহে ইংলণ্ডের দিকে এগিয়ে চলেছেন। রাজা ফিলিপও তৈরি হয়ে আছেন—বিজয়ের সংবাদ পৌঁছালেই তিনি ইংলণ্ডের দিকে রওনা হয়ে যাবেন।

রাজা ফিলিপ জয়ের স্বপ্নে বিভোর আর স্পেনিশ আর্মাডা যাত্রীরা বিভোর আমোদ-প্রমোদে। আনন্দ-উল্লাসে কোনো ত্রুটি নাই। হাস্য-পরিহাসে উন্মত্ত সেনাদলের উচ্চকোলাহল করে তুলেছে আকাশ-বাতাস চঞ্চল। কেঁপে উঠেছে সাগরের অশান্ত তরঙ্গ। হঠাৎ আনন্দ কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল।

উঠল চারিদিকে চিৎকার ও ক্রন্দনের রোল।

সাত দিন পরে স্পেনে এসে পৌছল সেই দুঃসংবাদ। স্পেনিশ আর্মাডা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। একশ উনত্রিশখানা জাহাজের মধ্যে ছিয়াত্তরখানা জাহাজই গেছে ধ্বংস হয়ে। কিছু ভস্মীভূত হয়েছে, আর কিছু স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে লাভ করেছে সলিলসমাধি। প্রচুর ধনরত্ন সহ রাজা ফিলিপের কোষাগার জাহাজখানিও সাগরতলায় তলিয়ে গেছে।

খবর শুনে কেঁপে উঠল রাজা ফিলিপের বুক। তাঁর আকাশ-ছোঁয়া গর্ব গেল ধূলিসাৎ হয়ে।

অসংখ্য ধনরত্ন বুকে আগলে রেখে রাজা ফিলিপের কোষাগার জাহাজখানি সমুদ্রের অতলে ঘুমিয়ে রইল—আর জাগল না। কালের চাকা ঘুরতে লাগল। ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসলেন প্রথম চার্লস।

সেই সময় থেকে শুরু হলো সাগরতলায় গুপ্তধনের সন্ধান। ১৬৬৬ সালে জেমস মড নামে এক সুদক্ষ ডুবুরী দু'জন সহকর্মী নিয়ে নেমে পড়লেন সেই অতল সাগরের তলায়। খুঁজে পেলেন একটি নিমজ্জিত ভাঙাচোরা জাহাজ। তার ভেতর থেকে দুটো পেতলের এবং একটি লোহার কামান উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। কিন্তু ধনরত্নের সন্ধান কিছু পেলেন না।

দু'বছর পরে আর এক দল ডুবুরী ঝাঁপিয়ে পড়লেন অদম্য উৎসাহ নিয়ে। কিন্তু তাঁদের ভাগ্যেও রত্ন মিলল না। কয়েকটি কামান নিয়েই তাঁরা উপরে উঠে এলেন।

রত্ন না মিললেও রত্নসন্ধানীদের কৌতূহল আর বিস্ময় কিন্তু দিনে দিনেই বাড়তে লাগল। আবার সন্দেহও জাগতে লাগল অনেকের মনে। ওটা কি সেই স্পেনিশ আর্মাডা না অন্য কোনো জাহাজ?

১৬৮৩ সালের গোড়ার দিকে যে ডুবুরী দল মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই সেই বছরের শেষের দিকে আর্চিবল্ড মিলার নামে এক দুঃসাহসী স্কটিশ ডুবুরী অভিযান শুরু করলেন। তিনি উদ্ধার করলেন একটি পিতলের কামান, তিনটি নোঙ্গর, আটাশ ফুট দীর্ঘ একটি হাল ও একটি রূপার ঘণ্টা।

আর্চিবল্ডের মনের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। এত পরিশ্রম করেও রাজা ফিলিপের নিমজ্জিত ধনরত্নের সন্ধান তিনি পেলেন না। কোথায় গেল সেই অভিশপ্ত ধন? আর্চিবল্ড নিরাশ হলেও স্পেনিশ আর্মাডার প্রতি মানুষের কৌতূহল নিভে গেল না। অজানা ধনরত্নের হাতছানি মানুষকে পাগল করে তুলতে লাগল।

১৯৫০ সালে আবার শুরু হলো অভিযান। এ অভিযান আরও ব্যাপক আরও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা সমন্বিত। অভিযানকারীদের পরনে আধুনিক নতুন ধরনের ডুবুরীর পোশাক, সঙ্গে আধুনিক ধরনের অনেক কিছু যন্ত্রপাতি ও শক্তিশালী ক্যামেরা।

এই অভিযাত্রী দল পেলেন অনেক কিছু। কিন্তু মহামূল্য মণিরত্নের কোনো হদিস তাঁরা পেলেন না।

কত কাল কৌতূহলী মানুষকে এমনভাবে প্রতীক্ষা করতে হবে কে জানে? কোকাস দ্বীপে পেরু এবং লীমার গুপ্ত ধনভাণ্ডার যেমন করে লুকিয়ে আছে তেমনি কি লুকিয়ে থাকবে রাজা ফিলিপের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার!

কোকাস দ্বীপ!

অগাধ ঐশ্বর্য নিয়ে আজও রহস্যময় হয়ে আছে এই ক্ষুদ্র পর্বতময় দ্বীপটি। পানামা যোজক থেকে প্রায় পাঁচশো মাইল দূরে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটি বিন্দুর মতো ভেসে আছে কোকাস।

মানচিত্রের দিকে তাকালে সহজে হয়তো চোখেই পড়ে না। মাত্র চৌদ্দ মাইল এলাকা জুড়ে এই দ্বীপ।

চারদিকে গভীর সমুদ্র। কিন্তু এই গভীর সমুদ্র আর দ্বীপটির চারপাশে উঁচু পাহাড়......তাতেই যেন আরও সুরক্ষিত ও নিরাপদ হয়েছে কোকাস।

মনুষ্যবাসের অযোগ্য এই কোকাস দ্বীপ। উত্তর দিকে ওয়েফার ও চ্যাথাম নামে দুটি উপসাগর রয়েছে। উপসাগর দুটির আর্দ্র আবহাওয়াই কোকাস দ্বীপের জলবায়ুকে করে তুলেছে মানুষের পক্ষে অসহনীয়।

তবু এই দ্বীপের প্রতি মানুষের প্রবল আকর্ষণ।

প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে দ্বীপটির পর্বতে বিরাট বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। চারদিক ঘন বৃক্ষলতায় আচ্ছন্ন। সেই বৃক্ষলতার নিভৃত আড়ালে পর্বতগহ্বরে লুক্কায়িত রয়েছে অজস্র ধনরত্ন। সেই বিপুল ধনরাশিই মানুষকে বারেবারে আকর্ষণ করেছে।

কিভাবে এত ধনরত্ন এই নির্জন দ্বীপের পর্বতগহ্বরে এল? সেও প্রায় রূপকথার মতোই এক আশ্চর্য কাহিনী।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে পেরু দেশ। পেরুর সঙ্গে কোকাস দ্বীপের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল অনেক দিন থেকেই। পেরুর অধিবাসীরা সূর্য উপাসক। সোনার তৈরি মন্দিরে সূর্যদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা। সূর্যই তাদের উপাস্য দেবতা। তাদের দেবতা যে পাত্রে ভোজন করতেন বা স্নান করতেন, তাও ছিল সোনার তৈরি।

পেরুর সমৃদ্ধি ছিল এককালে জগদ্বিখ্যাত। পেরুর প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, কোরিকাঞ্চার স্বর্ণমন্দিরে যাবতীয় সামগ্রী স্বর্ণনির্মিত ছিল। ঐ দেশের এমন কোনো বস্তু ছিল না যাতে কিঞ্চিৎ স্বর্ণের সংযোগ না থাকত। পেরুর অধিবাসীরা তাদের স্বদেশকে বলত—স্বর্ণভূমি।

স্পেনীয়রা অধিকার করল পেরু। তাদের অমানুষিক অত্যাচারে দেশের অধিকাংশ অধিবাসী নিহত হলো। যত স্বর্ণমন্দির ছিল স্পেনীয়রা তার সমস্ত মণিমুক্তা সোনা ও ধনরত্ন লুঠ করল। জাহাজ বোঝাই করে পাঠাতে লাগল স্পেনে।

কিন্তু সেই সময়ে জলপথ মোটেই নিরাপদ ছিল না। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তখন জাহাজে করে ঘুরে বেড়াত দুর্দান্ত জলদস্যুরা।

সমুদ্রে কোনো জাহাজ দেখলেই তারা লুঠ করত। পেরু থেকে লুণ্ঠিত ধনরত্নপূর্ণ স্পেনীয় জাহাজগুলিও জলদস্যুদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কিন্তু সেই লুণ্ঠিত ধনরাশি স্বদেশে নিয়ে যাবার সুযোগ ও সময় জলদস্যুরা পেত না। কাজেই বাধ্য হয়ে তারা প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো নির্জন দ্বীপে সেই ধনরাশি লুকিয়ে রাখত।

পেরুর প্রাচীন ইতিহাস-লেখকগণ মনে করেন এই কোকাস দ্বীপেই জলদস্যুরা তাদের লুণ্ঠিত ধনরত্ন লুকিয়ে রাখত। কিন্তু অভিশপ্ত ছিল সেই ধনরত্ন। জলদস্যুরা তাদের লুণ্ঠিত ধন লুকিয়ে রেখে পরে আবার নিজেরাই সব খুঁজে পায়নি। পর্বতের গহ্বরগুলি ছিল প্রায় একই রকমের। তার ওপর গাছ লতাপাতায় ঘিরে সেখানে সৃষ্টি হয়েছিল এক আশ্চর্য গোলকধাঁধা। সেই গোলকধাঁধায় পড়ে জলদস্যুরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই সেই দ্বীপের গুপ্ত ধনরত্নের কথা প্রশান্ত মহাসাগরের নাবিকরা জানতে পেরেছিল। অনেকেই সেই গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু কেউ সফল হয়নি।

কেটে যেতে লাগল দিনের পর দিন। অষ্টাদশ শতাব্দী পার হয়ে এল ঊনবিংশ শতাব্দী। জলদস্যুদের কল্যাণে সেই অভিশপ্ত ধনরাশি দিন দিনই বর্ধিত হতে লাগল। বেড়ে যেতে লাগল হারিয়ে যাওয়া ধনরত্নের পরিমাণ। তাছাড়াও এর সঙ্গে ঘটল এক আশ্চর্য কাহিনীর যোগাযোগ।

লীমা নগরী তখন ঐশ্বর্যের গৌরবে জগতের শীর্ষস্থানীয়। স্পেনের অধিকৃত দক্ষিণ আমেরিকার এই নগরীর অধিবাসীরা সহসা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। একটা অরাজকতার সৃষ্টি হলো লীমা নগরী জুড়ে।

লীমার তৎকালীন শাসকরা বুঝতে পারলেন, দেশের ধনসম্পত্তি নিরাপদ নয়। সাধারণ নাগরিকরাও

শঙ্কিত হয়ে পড়ল। শাসকরা স্থির করলেন, বিভিন্ন দেবমন্দিরে যেসব স্বর্ণ, রৌপ্য আর মণিমুক্তা আছে এবং রাজ্যের কোষাগারে রক্ষিত আছে যে সব ধনরত্ন, সেগুলি কালাও নামক দূর্গে স্থানান্তরিত করবেন। সাধারণ অধিবাসীরাও সঙ্কল্প করল নিজ নিজ ধনরত্ন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবে।

সেই সময় বন্দরে টমসন নামে এক ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতি 'মেরী ডায়ার' জাহাজ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। লীমার অধিবাসীরা ভাবল সেই জাহাজে করেই ধনরত্ন কালাও দূর্গে নিয়ে যাবে।

টমসনের কাছে এই প্রস্তাব করতেই টমসন রাজী হলেন। লীমার অধিবাসীরাও তাঁকে বিশ্বাস করল।

শাসকদলের প্রধানরাও এগিয়ে এলেন। তাঁরাও ভেবে দেখলেন এই অবস্থায় দেশের কোষাগারের ধনরত্ন স্থানান্তরিত করা ছাড়া কোনো উপায় নাই। তাঁরাও যোগ দিলেন সাধারণ অধিবাসীদের সঙ্গে।

ধনরত্ন মেরী ডায়ার জাহাজে বোঝাই হতে লাগল।

অগণিত সেই ধনরাশি।

গীর্জা থেকে তুলে আনা হলো বিশ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং মূল্যের স্বর্ণ, মেরী ও তাঁর পুত্রের পূর্ণ অবয়বের দুটি স্বর্ণমূর্তি, সাত ফুট লম্বা ২৭৩টি সোনার দীপদান, তিন হাজার হীরকখণ্ড, বহু প্রকারের অমূল্য জহরৎ, পান্না, মণিমুক্তা, সাধারণ লোকের ব্যবহার্য বহুমূল্যের অলঙ্কার এবং লীমা নগরীর ধনাগারের বহু স্বর্ণমুদ্রা।

অগণিত এইসব ধনরত্ন নিয়ে মেরী ডায়ার জাহাজ রওনা হলো। সঙ্গে গেল লীমা নগরীর কিছুসংখ্যক অধিবাসী।

নৌ-সেনাপতি টমসনের উপর ছিল লীমার অধিবাসীদের এবং তৎকালীন শাসকদের অগাধ বিশ্বাস। তাই সশস্ত্র সামান্য কয়েকজন প্রহরী ছাড়া বিশেষ কোনো রক্ষীবাহিনী সঙ্গে নেওয়া হলো না।

কিন্তু টমসনের মন যে ক্রমশঃ লোভে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা সহজে কেউ বুঝতে পারেনি। এত ধনসম্পদের লোভ দমন করতে পারলেন না টমসন। কিভাবে ধনরত্ন আত্মসাৎ করবেন তার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। জাহাজের কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকারীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাত্রিবেলা অতর্কিতে লীমার সশস্ত্র রক্ষী ও লোকদের হত্যা করলেন টমসন। শুধু তাই নয়, প্রমাণ লোপের জন্য নিজের জাহাজের কয়েকজন সন্দেহভাজন লোককেও হত্যা করলেন। তাদের দেহ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো সমুদ্রের জলে। তারপর নির্দিষ্ট পথে না গিয়ে জাহাজের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন।

জাহাজ এসে ভিড়ল নির্জন কোকাস দ্বীপে। সমুদ্রের জলরেখার প্রায় ৪০ গজ দূরে একটি গিরিগহ্বরে ঐ ধনরাশি লুকিয়ে রেখে আবার জাহাজ চালিয়ে দিলেন। গোপন রইল রাত্রিবেলার নৃশংস হত্যার কাহিনী আর গোপন রইল পর্বতের গুহায় ধনরত্ন লুকিয়ে রাখার ঘটনা।

কিন্তু চিরদিন সব কিছু গোপন থাকে না। রাত্রিবেলার নৃশংস হত্যার কাহিনী একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ল। শুধু অজানা রয়ে গেল ধনরত্ন লুকিয়ে রাখার কাহিনী।

ঐতিহাসিকরা বলেন—ওয়েফার অথবা চ্যাথাম উপসাগরের কূলেই টমসন ঐ ধনরত্ন পুঁতে রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন, সুযোগ-সুবিধামত এসে জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে যাবেন ধনরত্ন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেই ধনরত্ন নিজের ঘরে তুলবার আর তিনি সময় পাননি। এক অতর্কিত দুর্ঘটনায় টমসনের মৃত্যু ঘটেছিল।

শেষ হয়ে গিয়েছিল মানুষকে প্রবঞ্চিত করে ক্রোড়পতি হবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা!

কোথায় গেল সেই অভিশপ্ত গুপ্তধন?

শুধু যে লীমার ধনভাণ্ডার কোকাস দ্বীপের নির্জন গিরিগুহায় সঞ্চিত রয়েছে তা নয়, পেরু ও তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের বহু ধনরাশি এই দ্বীপে প্রোথিত আছে।

১৮১৮ সাল থেকে শুরু করে কয়েকজন দুর্ধর্ষ জলদস্যু ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে জাহাজ লুঠ করে যে সব ধনরত্ন হস্তগত করেছিল তার অধিকাংশ লুক্কায়িত রয়েছে ঐ রাক্ষসী কোকাস দ্বীপে।

বিখ্যাত জলদস্যু বেনিতো একাই এগার লক্ষ ডলার মূল্যের সোনা ও রূপা এই দ্বীপে লুকিয়ে রাখে।

পেরুর কয়েকটি গীর্জা থেকেই এই ধনরাশি লুণ্ঠিত হয়েছিল। তাছাড়াও লিঁয়ো, গেয়াকুয়েল শহর ও পেরুর বহু দেবমন্দির লুঠ করে বেনিতো যে ধনরত্ন কোকাস দ্বীপে লুকিয়ে রাখে তার পরিমাণ তিনশো পঞ্চাশ টন। তারপর ক্যাপটেন কুক, ডেভিস প্রভৃতি জলদস্যুরা ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল, মেক্সিকো ও পেরু লুঠ করে কোকাসের নির্জন গহ্বরে যে ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছিল তার মধ্যে রূপার ওজন প্রায় ৩১১ হাজার পাউণ্ড, সোনার দণ্ড সাতশো তেত্রিশটি এবং সাতশো থলি ভরতি মুদ্রা। এসব ছাড়াও যে কত ধনরাশি কোকাস দ্বীপে আছে ইতিহাসও তার সঠিক হিসাব দিতে পারে না।

ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ও প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতে পরিবর্তিত হয়েছে পাহাড়ের রূপ ও মাটির স্তর—তার ফলে সর্বগ্রাসী হয়েছে কোকাস দ্বীপ। কয়েকজন জলদস্যু চিহ্নিত স্থানে তাদের লুক্কায়িত ধনরত্ন খুঁজে না পেয়ে উন্মাদ হয়েছে এবং কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছে এমন নজিরও পাওয়া যায়।

আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরবর্তী কালে অনেকেই সেই ধনরাশির উদ্ধারের চেষ্টা করেছে। কিন্তু যে অর্থব্যয়ে ও পরিশ্রমে যত ধনরাশি ও নানাবিধ দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে, তার তুলনায় লাভ হয়েছে কতটুকু? তাই অভিশপ্ত ধন বুকে নিয়ে আজও কুখ্যাত হয়ে আছে কোকাস দ্বীপ।

[ভাদ্র ১৩৯৩]

রুদ্র আর একজন অদ্ভুত সন্ন্যাসী

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সমস্ত কিছুর মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। খুঁজতেও নেই। এ কথাটা আমাদের রুদ্রদমন চক্রবর্তী ওরফে রুদ্র যে জানে না তা নয়। তবু মাঝে মাঝে ওর খুব আশ্চর্য লাগত। ওই বুড়ো পরিব্রাজকের সঙ্গে ওর অমনভাবে কেন বার বার দেখা হতো। খুবই অবাক লাগত।

এই দ্যাখো, তোমরা কিছুই বুঝতে পারছ না তো? গল্পটল্প প্রথম থেকেই শুরু করতে হয়। আমি একদম মধ্যিখান থেকে শুরু করলাম। রুদ্রর সঙ্গে একজন পরিব্রাজকের অসম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় দেখা হয়েছে। তার একটা কারণ অবিশ্যি রুদ্র নিজে। রুদ্রও যে আঘাটায় ঘুরে বেড়ায়। তা সেই প্রথমবারের কথাই ধর। রুদ্র যাচ্ছিল ভাগলপুর। গাড়িটা অনেক লেট। ভোরবেলা পৌছানর কথা ছিল ভাগলপুর। কপাল মন্দ, পাকুড়ের কাছে একটা মালগাড়ি উল্টে গাড়ি অনেকক্ষণ আটকে যায়। তাই গাড়ি যখন সাহেবগঞ্জ এসে পৌছাল, তখন বেলা বেশ হয়েছে। সামনে অতবড় পাহাড় দেখে রুদ্রর দারুণ আনন্দ হলো। ও ঠিক করল ভাগলপুরে না হয় পরেই যাবে। এখন এ পাহাড়টা ওর চড়া প্রয়োজন। যেই ভাবা সেই কাজ, ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। ভাগ্যিস বেশি জিনিসপত্র সঙ্গে ছিল না। সুতরাং কাঁধে ঝোলা নিয়ে হাঁটা দিল পাহাড়ের দিকে।

পাহাড়টা বেশ খাড়াই। তবে বহু লোক বাস করে। তাই পায়ে চলার রাস্তা আছে। ও উঠতে শুরু করল। অনেক গাছ। সামনে যে অত বড় একটা রেলস্টেশন আছে, সে কথা পাহাড়ের ওধারে চলে গেলে আর মনেই হবে না। দিব্যি স্ফূর্তি লাগছিল রুদ্রর। রুদ্রর গলাটা একটু হেঁড়ে বলে একটা বদনাম আছে। তাই যে ওর মা ওকে এত ভালবাসেন তিনিও বলেন—তুই গান গাস না। বরং আবৃত্তি কর। অথচ এই খোলা আকাশের নিচে পাহাড়ের ওপর গান না গেয়ে থাকা যায়? তোমরাই বল? সুতরাং বাবু রুদ্রদমন গান ধরলো। আর সেই সময় একটা পাখি ধুপ করে ওর পায়ের কাছে পড়ল। ওর ভয়ই ধরে গেল। শেষে কি ভীষ্মলোচন শর্মা হয়ে গেল নাকি? তারপর দেখল, না, সেরকম কিছু না। একজন শিকারী একটা তীর মেরে পাখিটাকে নামিয়েছে। লোকটি ওর কাছে এসে বলল, কি কাজে এসেছো? রুদ্র বলল, বেড়াতে। লোকটা বলল, আলো থাকতে থাকতে নেমে যাও। এই পাহাড়ে বাঘ আছে।

রুদ্র বেশ ঘাবড়ে গেল। পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে সেটা ঠিক, তাই বলে বাঘের সঙ্গে মোকাবিলা করার তো কোনো কথা ও ভাবেনি। নামার সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ও যে সব বাঁক দিয়ে উঠেছিল, সেরকম অনেক বাঁক ও দেখতে পেল। সব জায়গাতেই একই গাছ। একই রকম সরু বাঁকা রাস্তা। কিছুক্ষণ নামার চেষ্টার পর ও বুঝল, ও পথ হারিয়েছে। ওর মাথাটা বাঁই বাঁই করে ঘুরতে লাগল। বাঘ যখন কামড় দেবে তখন কেমন লাগবে? পিঠের ওপর হুস্ করে পড়ে ওর ঘাড়টা মটকে দিলে কতটা লাগবে, সেসব কথা ভাবতে লাগল। তারপর ওর মনে হলো এইভাবে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। রুদ্র উঠে যেই পা বাড়াতে যাবে, সেই ও পেছনে একটা গলা শুনলো। বাংলায় বলছে, ওরে ও ছেলে, তুই তো দেখছি নির্ঘাৎ মরবি। রুদ্র ঘাড় ফেরাতেই দেখল একজন সন্ন্যাসী। হাতে একটা লাঠি, গায়ে গেরুয়া রঙের পোশাক। একটু ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তরতর করে নেমে এলেন। বললেন, করছিলি কি? ওটা তো বাঘ ধরার ফাঁদ। রুদ্র এবার তাকিয়ে দেখল, যেটাকে ও সমতল ভূমি ভেবেছিল, সেটা আসলে একটা গর্ত। ওপরে এমন সুন্দরভাবে গাছ-পাতা দিয়ে ঢাকা যে

বোঝাই যায় না ওটা ফাঁদ। সন্ন্যাসী বললেন, তুই যে রাস্তায় যাচ্ছিস, ওটা আরো গভীর বনের দিকে যাচ্ছে। যাবি কোথায়? রুদ্র স্টেশনে যাবে শুনে বললেন, চল আমার সঙ্গে। কিছুটা দূর যেতেই রুদ্র স্টেশনের আলো দেখতে পেল। সন্ন্যাসী বললেন, যা, এবার রাস্তা হারাবি না। এখানে এসেছিলি কেন?

আমার ঘুরতে ভাল লাগে যে?

তোর কপালে দেখছি অনেক দুঃখ আছে রে!

আপনি আমার সঙ্গে আসবেন না?

না রে, এখনও আমার কিছু কাজ বাকী আছে। পরে ফিরব।

পরের বার সন্ন্যাসী কি পরিব্রাজকের সঙ্গে দেখা হলো গিজগিজ করা ভিড়ওয়ালা হাওড়া স্টেশনে। রুদ্র যাচ্ছিল আসামে। কামরূপ এক্সপ্রেসে গিয়ে নিউ জলপাইগুড়িতে নেমে গাড়ি বদলে যাবে তিনসুকিয়া। সন্ন্যাসীও সেই গাড়িতে চলেছেন। বললেন, উনি যাচ্ছেন ফুন্টশিলিঙ পেরিয়ে কোন একটা গ্রামে। সে গ্রামের খুব সুন্দর বর্ণনা দিতে দিতে সারা রাস্তা উনি জমিয়ে রাখলেন। রুদ্রর তো একটু পাগলাটে ভাব আছে জানই। ওর হঠাৎ মনে হলো যে, ওই ফুন্টশিলিঙের কাছের গ্রামে না গেলে ওর জীবনই বৃথা। ও বললো, সন্ন্যাসী ঠাকুর, আমায় আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন?

তোর টিকিটের কি হবে?

সে আমি বদলে নেব।

তবে চল। কিন্তু সে গ্রামে তোর কষ্ট হতে পারে। লোকগুলো গরীব। তোর মতো শহুরেও নয়। তবে কমলার ক্ষেত যা সুন্দর!

নিউ জলপাইগুড়িতে নেমে টিকিটের ঠিকঠাক করে রুদ্র ফিরে এল। ততক্ষণে সন্ন্যাসীঠাকুর হাওয়া হয়ে গেছেন। খুব অবাক হলো রুদ্র। কিন্তু ততক্ষণে রোখ চেপে গেছে ওর। একটা বাসে করে ফুন্টশিলিঙ, তারপর একটা লরীতে সেই গ্রামে এসে হাজির হলো। সেখানেও রুদ্র সন্ন্যাসীঠাকুরের দেখা পেল না। সবচেয়ে মজার কথা, সে গ্রামের কেউ সন্ন্যাসীঠাকুরকে চেনেও না। তবে বাকী যা কিছু বলেছিলেন, সবই ঠিক। তোমরাও কমলালেবুর ক্ষেত দেখে এসো। গ্রামের লোকেরা রুদ্রকে যতটা ভালবেসেছিল, তোমাদের যদি ততটা ভালবাসে তাহলে কমলালেবুর ফুলের মধুও খেতে পাবে।

খবরটা পেল রুদ্র ফুন্টশিলিঙ থেকে ফেরবার সময় বাসে বসে। কেউ একটা খবরের কাগজ ফেলে গিয়েছিল। সেখানে বড় বড় হরফে লেখা, তিনসুকিয়াগামী ট্রেন লাইনচ্যুত, বহু হতাহত। যদি সন্ন্যাসীঠাকুরের সঙ্গে না দেখা হতো, তাহলে রুদ্র নিশ্চয় ওই গাড়িতে থাকত। রুদ্রর মনটা কেমন হয়ে গেল। এই দ্বিতীয়বার এই রহস্যজনক সন্ন্যাসী ওর জীবন বাঁচালেন। রুদ্রর ভালর জন্য এই লোকটির কেন এত আগ্রহ? রুদ্র উত্তর খুঁজে পেল না।

আর একবার মাত্র সন্ন্যাসীর সঙ্গে রুদ্রর দেখা হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছে। দেশের লোক শোকে আচ্ছন্ন কিন্তু কেউ কেউ একদম পাগল হয়ে গেছে। আর ভাইয়ের সঙ্গে ভাই লড়াই করছে। তারা যে মানুষ, সে কথা ভুলে গিয়ে আত্মহননে মেতে উঠেছে। দিল্লী রুদ্রর চেনা হলেও, সেই মুহূর্তে রুদ্র কিছু চিনতে পারছিল না, ও আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় দেখল সব লোক ছুটছে, আর কোথায় যেন আগুন লেগেছে। সবাই পালাচ্ছে।

রুদ্র ভেবেই পাচ্ছে না কি করবে। এমন সময় একটা গাড়ি ওর পাশে এসে দাঁড়াল, পরিচিত গলায় ডাক শুনলো, উঠে আয় গাড়িতে। তখন রুদ্র একদম সমস্তরকম ভাবনা-চিন্তা হারিয়ে ফেলেছে। নির্জীবের মতো গাড়ির একপ্রান্তে ও ঠেসান দিয়ে চোখ বুজে পড়ে রইল। এই ধ্বংসের, এই হানাহানির কোনো অর্থ সে খুঁজে পাচ্ছিল না। সন্ন্যাসী মধুর কণ্ঠে বললেন, কি করে, মুষড়ে পড়লি যে? মনে রাখবি, আমাদের দেশ বিশাল, আর আমাদের ইতিহাসও বহুদিনের। এমন দুর্দিন বহুবার এই মহাভারতে এসেছে, আমরা কাটিয়ে উঠেছি, আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি। মনে রাখিস, কবির ভারতভাগ্য-বিধাতা কল্পনা নয়। তিনি সত্যিই আছেন। নে নেমে পড়, তোর হোটেল এসে গেছে। দুটো দিন একটু সাবধানে

থাকিস। অচেনা পাড়ায় যাস না। বলে যেমন অদ্ভুত ভাবে এসেছিলেন, তেমনই চলে গেলেন। রুদ্রর কত কি প্রশ্ন ছিল, করাই হলো না।

না, আরো একবার সন্ন্যাসীর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। সেটা একটু অন্যরকম। রুদ্রর ঠাকুর্দার বয়স হয়েছে। ঠাকুর্দারা সাধারণত নবীন যুবা হন না। কিন্তু রুদ্রর ঠাকুর্দা সত্যিই বৃদ্ধ। তাঁর চুল ধপধপে সাদা। ভুরু সাদা, বুকের লোম সাদা, এমন কি কানের ওপরের চুলগুলো পর্যন্ত সাদা। এমনিতে ঠাকুর্দাকে নিয়ে মুস্কিল নেই। কিন্তু বৃদ্ধ বর্তমানে কি হচ্ছে তার কোনো খবরই রাখেন না। অথচ উনি যেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন, সে সময় টিফিনে কি খেয়েছিলেন তা পর্যন্ত ওঁর স্পষ্ট মনে আছে। এই এক ব্যাপার। খেতে বসে বলেন, ও বৌমা, আমায় ডাল দিলে না তো? অথচ একটু আগেই বাঁশপাতা মাছ ভাজা আর ডাল দিয়ে ভাত খেতে খেতে ইসলামকাঠিতে ১৯২৩ সালে কেমন সোনাখড়কে মণ মণ পাওয়া যেত, সে গল্প করেছেন।

সেই ঠাকুর্দা, একদিন সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে কি আলোচনা হচ্ছিল, সে সময় বললেন, আমাদের বংশেও সন্ন্যাসী ছিল। আমার ছোট ঠাকুর্দাই তো সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। এম. এ. পরীক্ষার আগে হঠাৎই একদিন বেরিয়ে পড়লেন। সে আমার জন্মের আগের ঘটনা। তারপর একবার বাড়ি এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে ছবি ওঠালেন, কত গল্প করলেন, তারপর চলে গেলেন। ওঁর চেহারার সঙ্গে রুদ্রর একটা মিল আছে।

এবার বুঝতে পারল রুদ্র, কেন ওঁকে দেখে ওর মনে হয়েছিল, এ ভদ্রলোককে আমি চিনি, আগে দেখেছি। আসলে ওর নিজের চেহারার সঙ্গে একটা মিল আছে ওই পরিব্রাজক সন্ন্যাসীটির। রুদ্র বলল, তোমার কাছে সে ছবি আছে? ঠাকুর্দা খুব খুশি হলেন। তাঁর কাছে তো কেউ কোনো জিনিসের জন্য সাধারণত আসে না। তাই আহ্লাদ করে ছবি বার করলেন। কত পুরাতন ছবি। কোনগুলোতে ছবি আবছা হয়ে গেছে, কোনগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। মানুষগুলো সবাই হারিয়ে গেছে। শুধু ঠাকুর্দার কাছেই তারা এখনো জীবিত। সেই ঠাকুর্দার বড় মেসোমশাই, ছোটমামা, মেজদাদুর ছবির গাদা থেকে বেরোল ছোটঠাকুর্দার ছবি। বেশ বড় ছবি। কিন্তু ও হরি! ছবি তো সব সাদা হয়ে গেছে। শুধু কিছু কিছু অংশ এখনো আছে। সেই অংশটাতে একজন সন্ন্যাসীর পাগড়ীটাই শুধু দেখা যাচ্ছে।

চতুর্থবার রুদ্র সেই সন্ন্যাসীর পাগড়ীটাই শুধু দেখেছিল।

[শারদীয়া ১৩৯৪]

বাহাদুর ভাইমণি
নিমাই ভট্টাচার্য

বাগবাজার-শ্যামবাজার-কুমারটুলি-আহিরীটোলা তো দূরের কথা, সারা উত্তর কলকাতার মানুষ অঘোর সরকারের নাম শুনলেই বলবে, উনি যেমন ভাল মানুষ ছিলেন, সেইরকমই ভাল উকিল ছিলেন। দূর-দূরান্তরের মক্কেলরা শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে পৌঁছে ওঁর বাড়ির হদিস জিজ্ঞেস করলেই জবাব পেতেন, বলরাম মন্দিরের গলিতেই ওঁর বাড়ি। বাড়ির দরজায় ইংরেজি-বাংলায় ওঁর নাম লেখা আছে। যাঁরা রাজবল্লভপাড়া দিয়ে ঢুকতেন, তাঁরা বিশাল দত্তবাড়ির গোরাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেই উনি বলতেন, এই তো কোণার বাড়িটা।

অঘোর সরকার এখন আর বেঁচে নেই। বছর দশেক আগেই উনি মারা গিয়েছেন। তবে ওঁর স্ত্রী পঁচাশি বছরের কুসুমকুমারী দেবী বেঁচে আছেন। ওঁদের ছোট মেয়ে পারুল থাকে ভবানীপুরে। অন্য দু'জন বাইরে। বড় ছেলে নগেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিসার। তিনি কর্মজীবনের শুরু থেকেই দিল্লীতে। তবে প্রত্যেক বছর কলকাতায় আসেন। এখানে থাকেন শুধু ছোট ছেলে নৃপেন।

এই তিনতলা বাড়িতে এখন শুধু কুসুমকুমারী দেবী ছাড়া নৃপেনবাবু তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে থাকেন। আর আছে তিনজন কাজের লোক। রাঁধুনী মনোরমা এ বাড়িতে তিরিশ-বত্রিশ বছর আছে। যে লক্ষ্মীর মা বৃদ্ধা কুসুমকুমারীকে দেখাশুনা করে, সে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আছে। তৃতীয়জন হারাধন আছে বছর দশেক।

হারাধনের বাবা ক্ষেত্র মাত্র ষোল বছর বয়সে উকিলবাবুর কাজে লাগে কিন্তু এমন বোকা ছিল যে উঠতে-বসতে বকুনি খেত। সেই ক্ষেত্র কালে কালে অঘোর সরকারের দক্ষিণ হস্ত হয়ে যায়। কথায় কথায় সে মুহুরি বা টাইপবাবুর ভুল ধরতো, আঃ! কী করছেন? এটা পঞ্চাশ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে হবে। আলিপুর কোর্টের কত উকিল ওকে বলতেন, ক্ষেত্র, তুমি স্যারকে একটু বুঝিয়ে এই মামলাটা নিতে রাজী করাও। উনি সাহায্য না করলে আমরা নির্ঘাৎ হেরে যাব। ক্ষেত্র দেশে গেলে অঘোর সরকার চোখে অন্ধকার দেখতেন।

এই উকিলবাবুর কাজ করতে করতেই ক্ষেত্র গ্রামের বাড়িতে পাকা ঘরদোর বানিয়েছে, বিয়ে করেছে; তিনটে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, ছেলেটাকে আট ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়েছে। তারপর দুটো চোখই বড্ড বেশি খারাপ হওয়ায় কাজকর্ম করাই মুশকিল হলো। অঘোর সরকারও বার্ধক্যের জন্য কাজকর্ম বেশ কমিয়ে দেওয়ায় ক্ষেত্র ছেলেকে উকিলবাবুর কাছে রেখে দেশে চলে গেল। মাস তিনেক পরই বৃদ্ধ প্রবীণ উকিল হৃদরোগে হঠাৎ মারা গেলেন। হারাধনকে নৃপেনবাবু এখানেই রেখে দিলেন।

নৃপেনবাবু ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। নিউ আলিপুর ব্রাঞ্চে বেশ ক'বছর কাটাবার পর বদলি হয়েছেন গড়িয়াহাট ব্রাঞ্চে। লকারের একটা চাবি ওঁর কাছে থাকে। অন্য চাবিটি থাকে একাউন্টেন্টের কাছে। এঁরা দু'জনে না গেলে ব্যাঙ্কের কাজকর্মই শুরু হতে পারে না। দু'জনকেই পৌঁছতে হয় পৌনে দশটার মধ্যে। তাই তো সাড়ে আটটার মধ্যেই খেয়েদেয়ে নৃপেনবাবুকে বেরুতে হয়। ওঁর স্ত্রী মাধুরী বেহালার একটা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। ন'টা বাজতে বাজতেই উনিও বেরিয়ে যান। দু'জনেই ফেরেন সন্ধ্যের আগে-পরে।

ওঁদের দুটি ছেলেমেয়ে। মহুয়া বড়, মৃণাল ছোট। মহুয়া সামনের বছরই হায়ার সেকেন্ডারী দেবে। স্কুল আর কোচিং নিয়েই যে সকাল থেকে রাত ন'টা-সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ব্যস্ত। এই পরিবারের একমাত্র

দুঃখের কারণ মৃণাল। সে বোবা। এবং কালা। ডেফ্ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুলে যায় কিন্তু লেখাপড়ায় বিশেষ ভাল না। তবে খুব ভাল ছবি আঁকতে পারে। যখনই সময় পায়, তখনই ছবি আঁকে। বছর দুয়েক আগে আকাদেমীতে যে মূক ও বধিরদের ছবির প্রদর্শনী হলো, তাতে যোগদান করে মৃণাল শুধু রাজ্যপালের বিশেষ পদক পায়নি, ওর তিনটে ছবিই তাজ বেঙ্গল হোটেল পনের হাজার টাকায় কিনে নিয়েছে।

এ বাড়ির বাজার-হাট করা, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, ওষুধ আনা ও হাজার রকমের টুকটাক সব কাজই হারাধন করে। প্রতিটি পয়সা হিসেব করে খরচ করে ও হিসেব রাখে। শনিবার মাধুরী স্কুল থেকে ফিরে হাতের পলিথিনের ব্যাগ ডাইনিং টেবিলের উপর রেখে হাসতে হাসতে স্বামী আর মেয়েকে বললেন, খুব সস্তায় ল্যাংড়া আম পেলাম বলে.....

ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই হারাধন বলে, কাকিমা, কত করে আনলেন?

—দশ টাকা করে।

হারাধন চাপা হাসি হেসে বলে, আমি আট টাকা করে এনেছি।

ও একটু থেমেই বলে, ঠাকুমার ওষুধ কিনে ফেরার সময় দেখলাম, শ্যামবাজারের মোড়ে যেন আমের হাট বসেছে। বুঝলাম, হঠাৎ অনেক আম এসে গেছে। বারো টাকা করে চাইছিল কিন্তু আমি সোজাসুজি বললাম, আট টাকা করে হলে আড়াই কিলো নেব।

মাধুরী সঙ্গে সঙ্গে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বারো টাকা করেই চাইছিল।

নৃপেনবাবু হাসতে হাসতে স্ত্রীকে বলেন, ভুলে যাও কেন, হারাধন হচ্ছে ক্ষেত্রদার ছেলে।

অঘোর সরকার যেমন ক্ষেত্র ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখতেন, হারাধন ছাড়াও নৃপেনবাবুদের সংসার অচল।

সত্যি হারাধনের গুণের শেষ নেই। কোনো কাজেই না বলতে জানে না। ঘরে-বাইরের সব কাজেই সমান উৎসাহ, সমান সততা। পুরো তিনতলা বাড়ি এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখে যে বর্ষার দিনেও কোনো ঘরের কোণায় একটু ঝুল দেখা যাবে না। যেদিন অন্য কাজের বিশেষ চাপ নেই, সেদিন হয়তো ব্লিচিং পাউডার দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করবে। তাই তো বৃদ্ধা কুসুমকুমারী থেকে তাঁর নাতি-নাতনী পর্যন্ত ওকে ভালবাসে।

হারাধনের শুধু একটিই দোষ। দুপুরের দিকে হয় মিত্তিরদের ড্রাইভার-দারোয়ান-চাকরবাকরদের সঙ্গে আড্ডা দিতে ওদের ওখানে যাবে, নয়তো ওদের দু'একজনকে ডেকে এনে নিজের ঘরে বসে গল্পগুজব করবে। মহুয়া ঐসব লোকদের বাড়িতে আসা বিশেষ পছন্দ করে না কিন্তু মাধুরী বলেন, ও কোথায় বা যাবে আর ওদের সঙ্গে ছাড়া কাদের সঙ্গে গল্পগুজব করবে?

অঘোর সরকারের মৃত্যুর পর তাঁর সব বইপত্তর ওঁর জুনিয়র শ্রীনিবাসবাবুকে দেওয়া হয়েছে। এখন ঐ ঘরেই কুসুমকুমারী থাকেন। তার কারণ ঘরখানি বেশ বড় ও সঙ্গে একটা বাথরুম আছে। তাছাড়া দু'দিকে দুটো দরজা। ডাক্তারের আসা-যাওয়ার সময় ছাড়া সামনের দরজা বন্ধ থাকে। ও ঘরের পাশেই খাবার ঘর। ঐ ঘরের লাগোয়া রান্নাঘর। অঘোরবাবু বাবার আমলে যে ঘরে পুজার ভোগ রান্না হতো, সেই ঘরে কাজের মহিলারা থাকেন। পিছন দিকের যে ঘরে অনেক কাল আগে কোচোয়ান থাকতো, সেই ঘরে এখন হারাধন থাকে।

দোতলায় তিনখানার একটা নৃপেনবাবু-মাধুরী দেবীর, একটা ঘরে মহুয়া থাকে; অন্য ঘরখানা রাখা আছে ভাইবোনদের জন্য। তিনতলার দু'খানা ঘরই মৃণালের। তার একখানা ঘর ওর স্টুডিও। অন্য ঘরখানাতে পা দিলেই বোঝা যায়, এটা একজন শিল্পীর ঘর। ভাইয়ের এই ঘরখানা মহুয়া নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, অন্য কাউকে করতে দেয় না। ন'মাসে-ছ'মাসে যদি কোনোদিন মাধুরী এই ঘর পরিষ্কার করেন, তাহলে মৃণাল হাসতে হাসতে বুঝিয়ে দেয়, তুমিও ঠিক দিদির মতো পারো না। স্কুলে যাওয়া-আসা বাদ দিলে শুধু খাওয়ার সময় ছাড়া মৃণাল নিচে নামে না। তবে যদি কোনোদিন দিনের বেলায় ওর ঘুম পায়, ও সোজা ঠাম্মার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

যাই হোক দিনগুলো বেশ কেটে যায়।

সেদিন সকালবেলায় উঠে চা খেতে খেতেই নৃপেনবাবু মেয়েকে বলেন, মামণি, মনে আছে তো আজ সুখেনকাকুর মেয়ের বিয়ে?

মহুয়া একটু হেসে বলে, বলাকাদির বিয়েতে যাব বলে কাল রাত্তিরেই আমি কাপড়-চোপড় ঠিক করে রেখেছি।

মাধুরী স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি ক'টার মধ্যে ফিরবে?

—যেভাবেই হোক নিশ্চয়ই সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ফিরব।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করেন, তুমি কখন ফিরবে?

—আমি টিফিনের সময়ই চলে আসব।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে নৃপেনবাবু বলেন, লকার থেকে তোমার বা মামণির কিছু আনতে হবে কী?

মহুয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে, না, না। আমার কিছু আনতে হবে না।

ও একটু হেসে বলে, ভাইমণির তৈরি কস্টিউম জুয়েলারি পরব।

মাধুরী বললেন, আমারও কিছু লাগবে না। বাড়িতে যা আছে, তাই পরে যাব।

ছেলে কোনো নেমন্তন্ন বাড়ি যায় না। তাই তো অফিস থেকে ফেরার সময় নৃপেনবাবু পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁ থেকে মিক্সড ফ্রয়েড রাইস আর চিলি চিকেন নিয়েই বাড়ি এলেন সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। সাড়ে ছ'টার মধ্যেই সবাই যাবার জন্য প্রায় তৈরি। মাধুরী বললেন, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে আমারও হয়ে যাবে।

নৃপেনবাবু বললেন, আমি মার কাছে যাচ্ছি। তোমার হয়ে গেলে নিচে নেমে এসো।

—হ্যাঁ, যাও।

মহুয়া বলল, মা, আমি একটু ভাইমণির কাছ থেকে আসছি।

—আচ্ছা।

দু'মিনিট পরই মাধুরী চিৎকার করে বলেন, মামণি, চট করে একবার আয়।

মেয়ে নেমে আসতেই উনি বেশ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুই কী আমার গলার চেনটা এর মধ্যে পরেছিলি?

—আমি আবার কোন জন্মে সোনার গহনা পরি?

—আমার চেনটা পাচ্ছি না রে!

—পাচ্ছি না মানে? কোথায় রেখেছিলে?

—কোথায় আবার রাখব? আলমারির এই ড্রয়ারেই ছিল।

—তাহলে যাবে কোথায়?

মহুয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, লকারে রাখার জন্য বাবাকে দাওনি তো?

—না, না; ওটা তো সব সময় এর মধ্যেই থাকে।

ঠিক সেই সময় নৃপেনবাবু এসে হাজির। উনি কিছু বলার আগেই মাধুরী বলেন, গিনির লকেট লাগানো চেনটা পাচ্ছি না।

—সে কী?

উনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, ওটা তো এই ড্রয়ারেই রাখো।

—হ্যাঁ।

—চাবি বাইরে কোথাও রেখে.......

—না, না, বাইরে কেন রাখব? একটা চাবি আমার ব্যাগে থাকে, অন্যটা তো তোমার অফিসে থাকে।

—তাহলে যাবে কোথায়?

নৃপেনবাবু সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, তুমি নিশ্চয়ই তাড়াহুড়োতে আলমারির মধ্যে কোথাও রেখে দিয়েছ বলে এখন মনে পড়ছে না। একটু ভাল করে খুঁজলে ঠিকই পেয়ে যাবে।

মহুয়া বলে, জিনিসটা তো উড়ে যেতে পারে না। নিশ্চয়ই কোথাও আছে।

মাধুরী মুখে কিছু না বললেও মনে মনে ভাবেন, জীবনে কখনও সোনা-দানা টাকাকড়ি দুটো ড্রয়ারের বাইরে রাখিনি। ওটা কী অন্য কোথাও......

ভেবে কোনো কূলকিনারা না পেলেও মনের মধ্যে একটা বিচিত্র অস্বস্তি নিয়েই বিয়ে বাড়ি গেলেন। ফিরতে ফিরতে অনেক রাত্তির হলো।

পরের দিন স্কুল থেকে ফিরেই মাধুরী শুধু পুরো আলমারি না, ঘরের সব জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। না, ঐ হার পাওয়া গেল না। তন্ন তন্ন করে দেখা হলো মহুয়ার ঘর। না, সেখানেও পাওয়া গেল না।

বাড়ির তিনজন কাজের লোককেও জিজ্ঞেস করা হলো, ঐ হার কোথাও দেখেছ? সবারই এক উত্তর, না, দেখিনি। আলমারির ভিতর কি থাকে, তা আমরা জানব কী করে?

এমন ঘটনা যে এই বাড়িতে ঘটতে পারে, তা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

মাসখানেকের মধ্যে নৃপেনবাবু শুধু রিজিওন্যাল অফিসে বদলি হলেন না, প্রমোশনও হলো। উনি হাসতে হাসতে মেয়েকে বলেন, মামণি, এখন আমাকে মাঝে মাঝেই ওয়েস্ট বেঙ্গলের নানা জায়গা ছাড়া সিকিম, মেঘালয়, ত্রিপুরা আর আন্দামান যেতে হবে। যদি ইচ্ছে করে তুইও আমার সঙ্গে যেতে পারিস।

—ভাইমণি যাবে না?

—খোকন বলেছে, ও সিকিম, মেঘালয়, ত্রিপুরা আর আন্দামান যাবে।

—বাবা, আমরা দু'জনেই তোমার সঙ্গে যেতে পারব?

—পারবি না কেন?

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, যেখানেই যাই না কেন, তোদের ভাড়া আমি দেব। তোরা গেলে তো আমার ঘরেই থাকতে পারবি।

—পড়াশুনার খুব চাপ না থাকলে এই সুযোগে কয়েকটা জায়গা ঘুরে আসব।

বর্ধমান, বাঁকুড়া, দুর্গাপুর আর আসানসোল ঘুরে আসার দিন পনের পরই নৃপেনবাবু সপ্তাহখানেকের জন্য খড়গপুর, হলদিয়া, কাঁথি, তমলুক, মেদিনীপুর আর ঝাড়গ্রাম গেলেন। উনি রওনা হবার দু'দিন পরই মাধুরী পে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তিন বছরের বকেয়া প্রাপ্য প্রায় ন'হাজার টাকা নিয়ে স্কুল থেকে ফিরলেন। কাউকে কিছু না জানিয়ে উনি টাকাটা আলমারির ডান দিকের ড্রয়ারে কাগজপত্রের পিছনে রেখে দিলেন। মনে মনে ভাবলেন, স্বামী ফিরলেই পুরো টাকাটা খোকনের একাউন্টে জমা করে দেবেন।

নৃপেনবাবু ফেরার পরদিন ওঁকে টাকাটা দিতে গিয়েই মাধুরী আঁতকে উঠেই চিৎকার করলেন, সর্বনাশ!

সবাই ছুটে এলো। অনেক চেঁচামেচি হৈ-হুল্লোড় খোঁজাখুঁজি জিজ্ঞাসাবাদ হলো কিন্তু টাকার হদিস পাওয়া গেল না। সবাই স্বীকার করলেন, ভূতে তো টাকাটা নিয়ে যায়নি। নিশ্চয়ই অন্য কেউ......

কিন্তু কে সেই অন্য কেউ?

নৃপেনবাবু বললেন, এ তো সত্যিই দুশ্চিন্তার ব্যাপার। আমি থানায় যাচ্ছি।

হ্যাঁ, থানা থেকে পুলিশ এলো। সবকিছু ভালভাবে দেখল। বাড়ির তিনজন কাজের লোককেই জিজ্ঞাসাবাদ করল। ওদের ঘরদোর-বাক্স-বিছানা-বাথরুম তন্ন তন্ন করে দেখল। না, কিছুই পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত হারাধনকে ধরে নিয়ে গেল। পুলিশের হাতে বেদম মারধর খেয়েই ফিরে এলো অনেক রাত্তিরে।

ব্যস! ঐ পর্যন্তই। বেশ ক'দিনের চেষ্টাতেও পুলিশও এই রহস্যের কিনারা করতে পারল না।

সেদিন নৃপেনবাবু আর মাধুরী দেবী বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরই দুই ভাইবোন কতকগুলো ছবি নিয়ে সোজা শ্যামপুকুর থানার বড়বাবুর কাছে হাজির।

মহুয়া বলল, আমার ভাই ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব হলেও খুব ভাল আর্টিস্ট। ওর কিছু ছবি দেখলেই বোধহয় আপনারা আমাদের বাড়ির চুরির হদিস পেয়ে যাবেন।

কৌতুক-মেশানো হাসি হেসে বড়বাবু বললেন, দেখি, ও কী ছবি এঁকেছে।

মৃণাল একটা পেন্সিল স্কেচ দিদির হাতে দেয়। মহুয়া ওটা বড়বাবুর টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বলে, দেখছেন তো এই লোকটা কলকাতার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চাবি তৈরি করে।

—হ্যাঁ, বুঝেছি, কিন্তু এর সঙ্গে তোমাদের বাড়ির চুরির কী সম্পর্ক?

ভাইমণির দ্বিতীয় স্কেচটা দেখিয়ে বলে, ঐ লোকটা চৌধুরীদের বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বা সারাদিন ব্যবসা করে ফেরার সময় ওর হাতে থাকে একটা সুটকেস।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, রাস্তায় রাস্তায় 'চাবি তৈরি করাবে' বলে হেঁকে বেড়াবার সময় বিশাল একটা রিং-এ যে শত খানেক নানা ধরনের চাবি থাকে, তা ঐ সুটকেসের মধ্যে রেখে দেয়।

বড়বাবু আপনমনেই বলেন, তার মানে......

মহুয়া ওঁকে কথাটা শেষ করার সুযোগ না দিয়েই বলে, ও চৌধুরীবাড়ি বা পাড়াতে জানাতে চায় না, যে ও চাবি তৈরি করতে জানে।

বড়বাবু মুখে কিছু বলেন না। ছবির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবেন।

আরো চার-পাঁচটা স্কেচ দেখাবার পর শেষ স্কেচটা দেখিয়েই বলে, দেখুন, ঐ লোকটাই সারা দুপুর ধরে আমাদের হারাধনের সঙ্গে আড্ডা দেয়।

বড়বাবু গলা চড়িয়ে বলেন, রিয়েলি?

—ওরা যখন আড্ডা দেয়, তখন একতলায় ঠাকুমা আর তিনতলায় আমার এই ভাই থাকলেও দোতলায় কেউ থাকে না।

বড়বাবু এবার নিজেই প্রত্যেকটা স্কেচ খুব ভাল করে দেখার পর দু'এক মিনিট অবাক হয়ে মৃণালকে দেখেন। তারপর মহুয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমার ভাই যে ওদের আড্ডখানার বা মুখের স্কেচ করেছে, তাতে ওরা আপত্তি করেনি?

মহুয়া নানারকম ইশারায় ভাইয়ের কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিয়ে একটু হেসে বলে, নিজের স্কেচ দেখে ঐ চাবিওয়ালা লোকটার এত ভাল লেগেছে যে সামনের রবিবার দেশে যাবার সময় ওটা নিয়ে যেতে চেয়েছে।

তারপর?

তারপর আর কি! বড়বাবুর হুকুমে সাব-ইন্সপেক্টর জনার্দনবাবু তিন-চারজন কনস্টেবলকে নিয়ে ছুটলেন চৌধুরীদের বাড়ি। নকুল চৌধুরীর অনুমতি নিয়ে তল্লাশি করলেন দারোয়ানদের ঘর। হ্যাঁ, ওদের গ্রামবাসী ভাইয়ের বাক্সতে শুধু মাধুরী দেবীর টাকার বান্ডিলটাই না, গিনির লকেটওয়ালা হারও পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পর চাবিওয়ালা ফিরতেই পুলিশ তাকে পাকড়াও করল। তারপর হারাধন। দু'জনকে জীপে চড়িয়েই জনার্দনবাবু ফিরে গেলেন থানায়।

সেদিন সন্ধ্যায় মৃণালকে নিয়ে ও বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

দিন তিনেক পরই ও-সি এসে হাজির। এক গাল হাসি হেসে নৃপেনবাবুকে বলেন, একটা আনন্দের খবর আছে।

—কী খবর?

—পুলিশ কমিশনার সাহেব মৃণালকে পাঁচ হাজার টাকা প্রাইজ দেবেন। উনি সবাইকে জানাতে চান, একটা বোবা-কালা ছেলেও সমাজের কত উপকার করতে পারে।

মহুয়া বলল, আমি কি শুধু শুধু ভাইমণিকে নিয়ে গর্ব করি!

 [শারদীয়া ১৪০৪]

তান্ত্রিকের ত্রিশূল

পরেশ ভট্টাচার্য

রেললাইন বরাবর ডিমরা থেকে ফিরছিল ওঁরাও যুবক বুধাই। যাবে বারলাঙ্গায়। সেখানেই তার বাড়ি। ডিমরায় তার দিদির বাড়ি। দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছিল। মাঝে মাঝে আসে।

ট্রেনে ফেরার কথা বুধাই-এর। কিন্তু ট্রেন ধরতে পারেনি। স্টেশনে আসতে পথে ঝড়-বৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আটকে পড়েছিল। ঝড়-বৃষ্টি থামতে হন্তদন্ত হয়ে এসেছিল সোনডিমরা স্টেশনে।

স্টেশনে ঢুকেছে যখন, তখনো ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। কিন্তু টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে ট্রেন ছেড়ে দিল। তাও ছুটে গিয়ে যে কোনো কামরায় উঠতে পারতো, কিন্তু ছুটে যেতেই বাধা। একজন মিশমিশে কালো হোঁত্‌কা গোছের লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগাতেই বিপত্তি। তবু রক্ষে, মেঠাই-এর হাঁড়িটা ভেঙেচুরে যায়নি।

সামান্য সময়। মিনিটের ভগ্নাংশ। তার মধ্যেই যা কিছু হবার হয়ে গেল। বুধাই-এর চোখের সামনে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তবু ছুটে ট্রেন ধরতে চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু পারেনি।

একবার ভেবেছিল দিদির বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু ফিরলো না। বাড়িতে বলা আছে আজ ফিরবে, সুতরাং ফিরতেই হবে।

সোনডিমরা স্টেশন থেকে বারলাঙ্গা স্টেশনের দূরত্ব মাইল পাঁচেক। গ্রাম ওখান থেকে কাছেই।

রেললাইন বরাবর কাঠের স্লিপারে পা ফেলে জোর কদমে হাঁটলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পৌছে যাবে। এই তো সবে সন্ধ্যে হয়েছে, সুতরাং চিন্তা কি। তারপর আকাশও এখন মোটামুটি পরিষ্কার। শুক্লপক্ষের চাঁদও দেখা দিয়েছে।

বুধাই ছোটবেলা থেকে একরোখা স্বভাবের। যা ভাববে তা করবে। বাড়ি ফিরবে বলে হাঁটতে আরম্ভ করেছে রেললাইন ধরে। মেঠাই-এর হাঁড়িটা হাতে নিয়ে দ্রুত চলায় অসুবিধে, তাই হাঁড়িটা গামছায় বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে। হাত দুটো ভাঁজ করে দোলাতে পারলে পথ চলায় সুবিধে।

ডিমরায় আজ নতুন আসেনি বুধাই। প্রায়ই আসে। দিদির শ্বশুরবাড়ি বলে নয়, মাঝে মাঝে ওখানকার হাটেও আসতে হয়। এবং সব সময়ে ট্রেনে যাওয়া-আসা করে এমন নয়, হেঁটেও যাতায়াত করে। পাঁচ-সাত মাইল হাঁটাটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। তবে এ-পথে, যেই হোক, দিনে দিনেই আসা-যাওয়া করে। তবে সঙ্গী-সাথী থাকলে আলাদা কথা। সন্ধ্যের পর এ-পথে সাধারণত কেউ একা চলাফেরা করে না, নেহাৎ বেকায়দায় না পড়লে।

সাহসী জোয়ান বুধাই। ভয় কি, তা ওর জানা নেই। যে কোনো বিপদের মুখোমুখি ও সাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে পারে। তবে হাতে টাঙ্গি কিংবা বল্লম থাকলে সাহসটা আরো বেড়ে যায়। নিদেনপক্ষে একটা কাঠ কাটার কুড়াল।

এই পাহাড়-জঙ্গলের দেশে টাঙ্গি মানুষের পথ চলার সঙ্গী। এসব এলাকায় চিতাবাঘ, নেকড়ের উৎপাত তো আছেই, তার ওপর আছে বিষাক্ত সাপ। মাঝে মাঝে হাজারিবাগ কিংবা পালামৌ-এর জঙ্গল থেকে ডোরাকাটারাও দলছুট হয়ে বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গল মহলে কিছু কিছু মানুষও আছে, যারা জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও হিংস্র।

সাহসে বুক বেঁধে রেললাইন ধরে এগিয়ে চলেছে বুধাই। রেললাইনের একদিকে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়, অন্যদিকে কোথাও ফসলের ক্ষেত, কোথাও টিলা পাহাড়, কোথাও জলাভূমি।

ডিমরার পর গ্রাম বলতে সেই বারলাঙ্গা। মাঝে কোথাও কোনো জনবসতি নেই।

মনের আনন্দে গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলেছে বুধাই। বেশ লাগছে তার। ফালি চাঁদ আকাশের কোণে। ফিকে জ্যোৎস্না চারদিকের পরিবেশে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা, গাছের পাতা এখনো ভিজে। ভিজে পাতার ওপর চাঁদের আলো—ঝিকমিক করছে বন।

কিছু পথ এগিয়ে এসে বুধাই একবার পিছন ফিরে তাকালো। সোনডিমরা স্টেশনের সিগন্যালের লাল আলোর বিন্দুটা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। ডিমরা গ্রাম এখন টিলা পাহাড়ের আড়ালে।

বুধাই একটু দাঁড়িয়ে আবার চলতে আরম্ভ করে।

সামনে রেললাইন বাঁক নিয়েছে। সেখানে ছোট একটা পুল। পুলের নিচে সংকীর্ণ এক জলধারা।

পুল পেরিয়ে আরো একবার পিছন দিকে তাকালো বুধাই। সিগন্যালের লাল আলোকবিন্দুটি আর চোখে পড়ছে না।

চোখ পড়লো ডান দিকের পাহাড়চূড়ায়। সেখানে মেঘের ভাব ভালো নয়, এখনি হয়তো সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়বে।

এখন বৃষ্টি নামলেই মুশকিল। কাছাকাছি মাথা বাঁচাবার মতো আশ্রয় নেই।

হঠাৎ বুধাই-এর মনে হলো হোঁত্‌কা চেহারার লোকটার কথা। তার জন্যেই এই ঝক্কি-ঝামেলা। নয়তো এতক্ষণ সে বারলাঙ্গায় নিজের বাড়ি গিয়ে পৌঁছতে পারতো। লোকটা আর মুখোমুখি ধাক্কা খাওয়ার সময় পেল না।

প্রায় ছুটে চলার ভঙ্গিতে চলতে লাগলো বুধাই। আর মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে দেখে নিচ্ছে মেঘের হালচাল।

কালো মেঘ এখন অর্ধেক আকাশ ঢেকে দিয়েছে। আর একটু এগিয়ে এলেই চাঁদ মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাবে।

চাঁদের আলো থাকতে থাকতে যতখানি এগিয়ে যাওয়া যায় ভেবে রেললাইনের ওপর থেকে নেমে পাশের পায়ে-চলা পথরেখা ধরে দ্রুতগতিতে ছুটতে আরম্ভ করলো বুধাই।

ছুটছে বুধাই। হঠাৎ তার চোখ পড়লো, সামনে বেশ খানিকটা ব্যবধানে আর একজন ছুটছে। বুধাই ভাবলো, এত সময় তো দ্যাখেনি, হঠাৎ লোকটা কোত্থেকে এলো। মনে মনে স্বস্তি পেল সে। এখন এই নির্জন পথে সে একা নয়, একজন সঙ্গী অন্তত পাওয়া গেছে।

সামনের লোকটিকে ধরবার জন্যে বুধাই ছোটার গতি আরো বাড়িয়ে দেয়।

আশ্চর্য, সে যত ছুটছে, লোকটিও তত ছুটছে। কিছুতেই ব্যবধান কমাতে পারছে না।

যে কোনোভাবে লোকটিকে ধরতে হবে মনে করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করলো বুধাই। দেখলো লোকটিও সমান তালে ছুটছে। কিছুতেই দু'জনের মধ্যেকার ব্যবধান কমাতে পারছে না।

চাঁদের আলো নিভে গেল। ফুটফুটে চাঁদ এখন মেঘের আড়ালে। সামনের লোকটি এখন অস্পষ্ট ছায়ার মতো।

একটানা ছুটে হাঁপিয়ে পড়েছে বুধাই। দাঁড়ালো বুকটাকে হালকা করার জন্যে। অবাক হলো সামনে চোখ পড়তে। অস্পষ্ট ছায়ার মতো লোকটাও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বুধাই ভাবলো, লোকটি নিশ্চয়ই তার মতো কেউ। ট্রেন ধরতে না পেরে পায়ে হেঁটেই চলেছে।

লোকটিকে ডাকলে কেমন হয়। বুধাই ভাবলো। বারলাঙ্গা কিংবা আশপাশের গাঁয়ের লোক হলে নিশ্চয়ই তাকে চিনবে। দুরন্ত সাহসী বুধাইকে চেনে না এ তল্লাটে এমন লোক নেই। শুধু চেনা নয়, তাকে সবাই ভালোও বাসে। বুধাই মানুষের দুঃসময়ের বন্ধু।

বুধাই চিৎকার করে ডাকলো, ও ভাই শুনছ?

কোনো সাড়া এলো না বারবার ডাকা সত্ত্বেও।

বুধাই ভাবলো, হয়তো লোকটা তাকে দুশমন কিংবা ভূতটূত ভেবেছে। হয়তো সেই জন্যেই ভয় পেয়ে ছুটছে।

বুধাই এবার চিৎকার করে জানিয়ে দিলে, ভয় নেই, আমি বারলাঙ্গার বুধাই। তুমি দাঁড়াও ভাই, আমরা একসঙ্গে যাবো।

এবারেও ওদিক থেকে কোনো সাড়া এলো না। বুধাই এরপর আর ডাকাডাকি করতে চাইলো না। মনে মনে কিছুটা বিরক্ত হলো সে। যেই হোক, ভদ্রতার খাতিরে একটা কথাও তা বলতে পারতো।

এই মুহূর্তে পিছন থেকে সোঁ সোঁ শব্দ আসছে মনে হলো। ঝড় উঠবে নিশ্চয়ই। বুধাই আবার পড়ি-কি-মরি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করলো।

মেঘ ডাকলো প্রচণ্ড শব্দে। বিদ্যুতের ঝলকানিতে ঝলসে উঠলো চারদিক। সে আলোয় বুধাই পলকের জন্যে দেখলো আগেভাগে সেই মানুষটি ছুটছে।

ঝড় এলো। ঝড়ের সঙ্গে নামলো বৃষ্টি। মুষলধারায়। সেই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বুধাই ছুটছে তো ছুটছেই।

আবার ভয়ংকর শব্দে মেঘ ডাকলো। বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে উঠলো চারদিক। সেই আলোয় বুধাই এবারে সামনের লোকটিকে স্পষ্ট দেখতে পেল। মিশকালো চেহারার একটা হোঁতকা লোক। সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনের সেই লোকটির কথা মনে হলো। যার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল। তবে কি সেই লোকটাও ট্রেন ধরতে পারেনি! নাকি আর কিছু!

আবার মেঘ ডাকলো। বিদ্যুৎ চমকালো। চোখে পড়লো বাঁ দিকে ছোট টিলা পাহাড়। ওই টিলা পাহাড়ের নিচে একটা বড়ো মন্দির আছে। মাকড়া পাথরের তৈরি পুরানো আমলের মন্দির।

এবারে কালো চেহারার লোকটি রেললাইন থেকে নেমে টিলা পাহাড়টার দিকে চললো।

বারবার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে। বুধাই দেখছে লোকটি টিলা পাহাড়ের নিচে মন্দিরের দিকে যাচ্ছে। বুধাই ভাবলো, নিশ্চয়ই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ওখানে আশ্রয় নিতে যাচ্ছে। এ পথে যাওয়া-আসার সময়ে এই পোড়ো মন্দিরটা দেখেছে বুধাই, কিন্তু কখনো কাছে গিয়ে দেখেনি।

এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বারলাঙ্গায় যাওয়া কষ্টকর ব্যাপার। তার চেয়ে মন্দিরে আশ্রয় নেওয়া ভালো। তাছাড়া সেই লোকটিও যখন যাচ্ছে।

বুধাই দেখলো লোকটি ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে মন্দিরে যাচ্ছে। আর ভাবনা-চিন্তা না করে বুধাই তাকে অনুসরণ করলো।

জীর্ণ মন্দির। চারদিকে আগাছার ঝোপঝাড়। মন্দিরের ফাটলেও কয়েকটি অশ্বত্থ গাছ গজিয়ে উঠেছে। মন্দিরে ঢোকার মুখেই বুধাই-এর নাকে এলো বিদঘুটে চামসা গন্ধ। এক দঙ্গল চামচিকে উড়তে উড়তে ওর গায়ে মাথায় ঠোক্কর দিলে। লোকটি আগেভাগেই মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেছে। মন্দিরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বুধাই। ভিতরে ঢুকতে মন চাইছে না। একে ভিতরে ঘুরঘুটি অন্ধকার তার ওপর বিশ্রী চামসা গন্ধ।

কিন্তু লোকটি কোথায় গেল! বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বুধাই লক্ষ্য করেছে মন্দিরের ভিতরটা—লোকটি নেই। অথচ সে দেখেছে লোকটি মন্দিরের মধ্যে ঢুকলো। বুধাই-এর মনটা হঠাৎ কেমন দুলে উঠলো। এতক্ষণ যা দেখেছে, তার সবটাই কি চোখের ভুল! না, যাদের শরীর নেই তাদের কেউ!

পরক্ষণে আবার উল্টো চিন্তা, শরীর নেই তো এতক্ষণ কাকে দেখলো সে? একটি লোক সমানে তার আগেভাগে ছুটতে ছুটতে আসছিল। সবটাই কি মিথ্যে?

ভূত-প্রেতে কোনোদিন বিশ্বাস নেই বুধাই-এর। এই মুহূর্তেও বিশ্বাস করে না। ভাবে, ঘটনা যাই ঘটুক, শেষ না দেখে সে যাবে না।

আবার মেঘ ডাকলো ভয়ংকর শব্দে। কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়েছে হয়তো। বিদ্যুতের আলোয় মন্দিরের অন্ধকার ঝলসে উঠলো। কিন্তু সেই লোকটিকে চোখে পড়লো না। দেখলো মন্দিরের মেঝের ওপর একটা ত্রিশূল পোঁতা রয়েছে।

হঠাৎ কাঁধের ওপর একটা হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করলো বুধাই। শিউরে উঠলো তার সারা শরীর। ফিরে তাকালো। কেউ নেই। এবারে নিঃশ্বাসের শব্দ পেল। পিছনে দাঁড়িয়ে কে যেন নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। নিঃশ্বাসের স্পর্শও অনুভব করলো। শীতল স্পর্শ।

কিন্তু পিছনে তো কেউ নেই। বুধাই ভাবলো, সবটাই কি মনের ভুল! ভাবতে যতটুকু সময়, বুধাই-এর চোখের সামনে এক ভয়ংকর দৃশ্য। মন্দিরের দেয়ালের ফাটলের মুখে একটি বিষধর সাপ ফণা দোলাচ্ছে। হাতের কাছে এমন কিছু নেই যে সাপটাকে মারে। ত্রিশূলটার কথা মনে পড়লো। কিন্তু ওটা তুলে আনা অসম্ভব! সাপটা তো সামনেই।

পায়ে পায়ে পিছিয়ে এলো বুধাই। পায়ের কাছে মন্দিরের বারান্দার পাথর আলগা হয়ে আছে। পাথরের টুকরোটা হাতে নিলে বুধাই। কিন্তু অন্ধকারে সাপটা চোখে পড়ছে না। আবার বিদ্যুৎচমকের অপেক্ষায় রইলো বুধাই। বিদ্যুৎ চমকালো। কিন্তু পাথর ছোঁড়া হলো না। পলকের মধ্যে আবার অন্ধকারে ডুবে গেল সব কিছু।

বুধাই আর দাঁড়াতে চায় না এখানে। ঠিক করলো, ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই সে যাবে বারলাঙ্গায়। এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।

মন্দির থেকে পা বাড়াতেই দেখলো বুধাই, কি যেন একটা জন্তু সামনের ঝোপঝাড় তোলপাড় করতে করতে এগিয়ে আসছে। যদিও অন্ধকার, তবু দেখলো একটা মহিষ শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসছে। এই মহিষের সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই। সাপের ছোবলে মরণ হয় হোক, অন্ধকারের মধ্যেই সে মন্দিরে ঢুকে গেল। বিদ্যুৎচমকের সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলে ত্রিশূলটা।

ত্রিশূলটা হাতে পেয়ে বুধাই-এর সাহস আরো বেড়ে গেল। মনে হলো, এই ত্রিশূল দিয়ে ওই ভয়ংকর মহিষকে সে অনায়াসে খতম করতে পারবে।

মন্দিরের বাইরে এলো বুধাই। কিন্তু কোথায় মহিষ! বারান্দা থেকে নেমে এলো। ত্রিশূলটা হাতের শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছে। বলা যায় না, হয়তো ঝোপঝাড়ের মধ্যে আছে মহিষটা। দু-চার পা এগিয়ে গেল বুধাই। এখনো যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। আর মাঝে মাঝে মেঘগর্জন আর বিদ্যুতের চমক তো আছেই।

এবারে বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখলো একটা ডোরাকাটা বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করছে। পরক্ষণে আবার সবকিছু গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল। বাঘ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু চোখ দুটি জ্বলছে।

জ্বলন্ত চোখ দুটি লক্ষ্য করে ত্রিশূলটা ছুঁড়তে যাবে, কিন্তু পলকের মধ্যে হারিয়ে গেল জ্বলন্ত চোখ। এবারে বিদ্যুৎচমকের সঙ্গে সঙ্গে দেখলো বাঘটা নেই। আজব কাণ্ড, বুধাই ভাবছে যা কিছু ঘটছে এসব স্বপ্ন, না ভোজবাজী!

আবার সেই শীতল স্পর্শ। এবারে সে স্পষ্ট অনুভব করলো, কে যেন হাত রাখলো তার কাঁধে। বরফের মতো ঠাণ্ডা হাত। পিছন ফিরে তাকালো। অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। হঠাৎ কে যেন বাজখাঁই গলায় হেসে উঠলো। ভয়ংকর অট্টহাসি। হাসি কোন দিক থেকে এলো বুঝতে পারলো না। ত্রিশূল বাগিয়ে ধরে এদিক-ওদিক তাকালো। কিছুই দেখতে পেল না। পা বাড়াবে, আবার সেই হাসি। যেন সামনে দাঁড়িয়ে কে হাসছে। ত্রিশূলটা সজোরে ছুঁড়তে গেল বুধাই। পারলো না।

বুধাই পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলো, তুমি কে? যেই হও, আমার সামনে এসে দাঁড়াও।

অনেক দূর থেকে কে যেন উত্তর দিল, আমার নাম বোঙ্গাই বাবা। নাম শুনিসনি আমার?

শিউরে উঠলো বুধাই। বোঙ্গাই বাবার কথা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে সে। যে ছিল একজন ভয়ংকর তান্ত্রিক। বাঘের পিঠে চড়ে জঙ্গল মহল চষে বেড়াতো। ভূত-প্রেত, পিশাচ ছিল তার আজ্ঞাবহ

দাস। কিন্তু বোঙ্গাই বাবা তো অনেককাল আগের মানুষ। তাকে চোখে দেখেছে এমন মানুষ নেই। শুধু লোকমুখে গল্পকথার মতো শোনা যায় তার কথা।

—তুমি কোথায়? চিৎকার করে জানতে চাইলো বুধাই।

—আমি এখন তোর কাছ থেকে অনেক দূরে, উত্তর ভেসে এলো অনেক দূর থেকে। কাঁপা কাঁপা প্রতিধ্বনির মতো শোনালো সেই কণ্ঠস্বর।

বুধাই বিস্ময়ে হতবাক। অচঞ্চল দাঁড়িয়ে সে। আবার সে অনুভব করলো বরফশীতল হাতের স্পর্শ। তারপর স্পর্শ পেল নিঃশ্বাসের, শুনতে পেল কানের কাছে ফিসফিস কণ্ঠস্বর, এই তো আমি, তোর কাছে।

কিন্তু কোথায় কে! কেউ নেই।

—তুই আজ আমাকে মুক্তি দিলি। আবার সেই কণ্ঠস্বর কানের কাছে, এখন থেকে ওই ত্রিশূল তোর হাতেই থাকবে।

বুধাই-এর বিস্ময় আরো বাড়লো।

—আমি একশ সাত বছর ধরে অপেক্ষা করে আছি।

—একশ সাত বছর!

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কেন?

—একজন সৎ আর সাহসী মানুষের অপেক্ষায়। আজ তোকে পেয়ে আমার সে আশা পূর্ণ হলো। যা, এবারে তুই বাড়ি যা। একটি কথা মনে রাখিস, ওই ত্রিশূল কোনো অন্যায় সহ্য করে না। যা, দেরি করিস নে। তোর বাড়ির সবাই ভাবছে।

—একবার দেখা দেবে না?

—শরীর ধরতে বড় কষ্ট হয় রে। এতক্ষণ তো আমাকে নানা রূপে দেখেছিস। আর কেন?

—তবু—

—আবার আমায় কষ্ট দিবি?

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকালো। ক্ষণ বিদ্যুতের আলোয় বুধাই স্পষ্ট দেখলো, বাঘের পিঠে চেপে একজন ভয়ংকর চেহারার মানুষ। পলকের দেখা, তারপরই সব কিছু অন্ধকারে মিশে গেল।

অবাক অনেক দূর থেকে ভেসে এলো সেই কণ্ঠস্বর, আমাকে আর ডাকিস নে। তোর হাতের ওই ত্রিশূলের মধ্যে আমি আছি এবং থাকবো। এখন তুই ফিরে যা।

বুধাই বাড়ি ফিরছে ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। এখন সে অন্য মানুষ।

[শারদীয়া ১৩৯৪]

কনস্টেবলের গোয়েন্দাগিরি

মানবেন্দ্র পাল

কারো সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় জিজ্ঞেস করার আগেই আমি আমার নামটা বলে দিই— হরদেব সিংহ।

এইটুকু বললেই হয় কিন্তু আমি সেইসঙ্গে যোগ করে দিই 'কনস্টেবল'। হরদেব সিংহ কনস্টেবল। এতে নামের সঙ্গে পেশাটাও জানিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া আমি যে একজন কনস্টেবল তা বেশ গর্বের সঙ্গেই ঘোষণা করতে ইচ্ছে করে।

বয়েস খাতায়-কলমে যাই থাক আসলে ষাট ছুঁই ছুঁই। তবু আমাকে কেউ পাত্তা দেয় না।

খুন-খারাপির কেসে প্রায়ই অফিসারের পিছু পিছু যেতে হয়। অফিসাররা লাশ পরীক্ষা করেন, আঙুলের ছাপ খোঁজেন, বাড়ির লোকদের জেরা করেন, আমার এসব দেখতে খুব ভালো লাগে। আমি হয়তো এইসব ব্যাপারে একটু বেশি উৎসাহ দেখিয়ে ফেলি, যেমন—ও. সি. সাহেব লাশ পরীক্ষা করছেন, আমি তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে দেখতে গেলাম, কিংবা জেরা করবার সময়ে একেবারে ও. সি-র পাশে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে জেরা শুনতে লাগলাম। এর ফলে ওসির বকুনি আর অন্য কনস্টেবলদের মুখ-টেপা হাসি সহ্য করতে হয়।

আমি কিন্তু এসবে লজ্জা পাই না। কেননা আমি জানি আর একটু ধৈর্য ধরে এসব লক্ষ্য করতে করতে আমিও একদিন (যদিও এখন আমার বয়েস ষাট) বড়ো না হোক মাঝারি গোছের গোয়েন্দা হয়ে উঠতে পারব। এতটা নিশ্চয়তার কারণ মৃতদেহগুলো লক্ষ্য করে আমার তৎক্ষণাৎ যা মনে হয়েছে, পরে দেখেছি গোয়েন্দারাও সেই সিদ্ধান্তেই পৌঁচেছেন। তফাৎ এই যে, আমি মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি না। কারণ বলার অধিকার আমার নেই। বলতে গেলেই ধমক খেতে হয়। আর অন্য কনস্টেবলরা হাসাহাসি করে। এমনকি তারা বলে আমি নাকি একটা আস্ত পাগল।

তা কেউ বললেই তো সত্যি পাগল হয় না। তাই ওদের হাসি আমি গায়ে মাখি না।

এ ছাড়াও আমার আরও এমন কিছু আচরণ আছে যা দেখে ওই মুখ্যুগুলো খুব উৎসাহের সঙ্গে আমার পাগলামি প্রচার করে বেড়ায়। সেই আচরণ হচ্ছে আমার নিজে হাতে গাঁইতি চালানো।

আপনারা জানেন বোধহয় লাশ খোঁজার জন্যে অনেক সময়ে বাড়ির সংলগ্ন ফাঁকা জমি খুঁড়তে হয়। জনমজুররা মাটি কুপিয়ে কুপিয়ে লাশ খোঁজে। অফিসারেরা যখন অন্য দিকে ব্যস্ত থাকে আমি তখন ওদের কারো হাত থেকে গাঁইতি তুলে নিয়ে মাটি কোপাই। এই দেখে সবাই মজা পায়। আসলে মাটি কোপানোর ব্যাপারে আমার একটা সহজাত ক্ষমতা আছে।

মাটির সঙ্গে আমার ছোটবেলা থেকে সম্পর্ক। জনমজুরের ঘরের ছেলে আমি। সতেরো-আঠারো বছর বয়েস থেকে কত বাড়ির ভিত কাটতে হয়েছে। কাজেই মাটি দেখলেই আমি বুঝতে পারি কোন মাটি কিরকম। এইভাবেই মাটির সঙ্গে আমার বেশ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তারপর যখন পুলিশের কাজ পেলাম তখন মাটি কুপিয়ে লাশ খোঁজা দেখতে দেখতে আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয় কিন্তু আমার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যাপারটা হচ্ছে মাটি আমি চিনি। বললে হয়তো

কেউ বিশ্বাস করবেন না মজুররা যখন কুপিয়ে কুপিয়ে সারা জায়গাটা ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে আমি কিন্তু আমার তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করে ঠিক সেখানেই কোদাল কিংবা গাঁইতির ঘা মারব, মাত্র মিনিট পনেরো পরে যেখান থেকে লাশটি বেরিয়ে আসবে।

এরকম অনেকবার হয়েছে। অবশ্য এর জন্যে কোনো স্বীকৃতি পাইনি। বরঞ্চ একজন উর্দিপরা কনস্টেবল মজুরদের সঙ্গে মাটি কোপাচ্ছে দেখে অফিসার থেকে ক্ষুদে হোমগার্ড পর্যন্ত হাসাহাসি করে।

ফলত এখন আমার একটা অভ্যাসই হয়ে গেছে নিরুদ্দেশের মামলা নিয়ে যখনই আমায় পুলিশকর্তাদের সঙ্গে কোথাও যেতে হয় তখনই আমি আগে দেখে নিই বাড়ির লাগোয়া কোনো খালি জমি আছে কিনা। আর তেমন জমি দেখলেই আমার হাত নিশপিশ করে কোদাল চালাবার জন্যে। কারণ সকলেই জানেন লাশ গুম করার সহজ আর সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বাড়ির লাগোয়া জমিতে কিংবা বনঝোপে ঢাকা পুকুর-পাড়ে পুঁতে ফেলা। গোপনে খুন করা সহজ কিন্তু গোপনে লাশ হাপিস করা চাট্টিখানি কথা নয়। বয়ে বয়ে বয়ে বেশি দূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। নিজের গাড়ি থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। জীবনে যে বেচারি মোটর গাড়ি চাপতে পারেনি, মরে হয়তো সে সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু গ্রামে কতজনের আর গাড়ি আছে? তাই সর্বাপেক্ষা সহজ আর নির্ঝঞ্ঝাট প্রক্রিয়া হচ্ছে খোলা জমিতে গভীর রাতে পুঁতে ফেলা। অবশ্য একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। ফাঁকা জমি বাড়ির গায়ে হলেও লাশটা টেনে নিয়ে যেতে হয়। আর সেক্ষেত্রে মাটিতে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবার চিহ্ন থাকবেই। আর তাই থেকে একটা নিরেট জমাদারও আসামীকে ধরার সূত্র পেয়ে যাবে।

তাছাড়া শেয়াল-কুকুরের টানাটানি থেকে রেহাই পেতে হলে গভীর করে কবরটি খুঁড়তে হবে। সেটা একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অন্তত দুজন লোক দরকার।

তারপরেও একটু কাজ বাকি থাকে। পুলিশকে ধাঁধায় ফেলবার জন্যে কয়েকটা ছোটো ছোটো বুনো ফুলের গাছ উপড়ে এনে কবরটির ওপর পুঁতে দেওয়া। তাহলে কেউ বুঝতে পারবে না ঐ ফুলগাছগুলোর নিচেই একটা টাটকা লাশ পোঁতা আছে।

এসবই আমি পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বুঝে নিয়েছি। তদন্তে গেলে অফিসারদের চোখের আড়ালে আমি বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াই কোথাও চট চাপা দেওয়া কোদাল কিংবা গাঁইতি লুকানো আছে কিনা। আর সেই অভিশপ্ত বাড়ির লাগোয়া খালি জমি দেখলেই—হয়তো সেটা ভালো ভালো ফুল-ফলের বাগান, তবু ইচ্ছে করে কোদাল-গাঁইতি নিয়ে নেমে পড়ি মাটি কোপাতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস খানিকটা মাটি তুলে ফেললেই আমার আকাঙিক্ষত বস্তুটি বেরিয়ে পড়বে।

আপনারা হাসবেন না আমি এমনও মনে করি বাড়ির লাগোয়া জমি পড়ে থাকলে একদিন না একদিন সেখানে লাশ পোঁতা হবেই। কেননা আমার বিশ্বাস বাড়ি-সংলগ্ন জমি শুধু ফুল-ফলের বাগানের জন্যেই নয়, তার আরো কিছু জরুরি প্রয়োজন আছে।

এসব কথা সহকর্মীদের বললে তারা হাহা করে হাসে আর আমাকে পাগল বলে। তাই ঠিক করেছি মনের কথা এবার থেকে মনেই চেপে রাখব। কাউকে বলব না।

আমাদের কাটোয়া থানার বামুনমারি গ্রামের চন্দ্রশেখর রায়ের নাম ও তল্লাটে জানে না এমন কেউ নেই। একালে জমিদারি নেই বটে কিন্তু তাঁর জমিদারি মেজাজটি আছে ষোলো আনা। এখন গ্রামের মধ্যেও রাজনীতি ঢুকে গেছে। আর রায়মশাই রাজনীতিতে একজন জবরদস্ত পাণ্ডা বিশেষ। তিনি করতে পারেন না এমন অপকর্ম নেই। অথচ তাঁর কেশাগ্র কেউ ছুঁতে পারে না।

এ হেন বাবুটির বাড়ি কাজ করত বছর দশেক বয়েসের একটি মেয়ে। দুটো গ্রাম পেরিয়ে তার বাড়ি। হঠাৎ একদিন মেয়েটা বাড়ি থেকে যেন উবে গেল।

এ নিয়ে থানা-পুলিশের কোনো ব্যাপারই থাকত না যদি না পাড়া-প্রতিবেশী যারা চন্দ্রশেখরের শত্রুপক্ষ তারা সাহস করে থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখাত।

থানা প্রথমে কেস নিতেই চায়নি। আমার বস্ ও. সি. সাহেব বললেন, যার বাড়ি থেকে মেয়েটা নিখোঁজ হয়েছে তারাই যখন জানায়নি তখন আমরা কেন গায়ে পড়ে তদন্ত করব?

কিন্তু পাবলিক তখন মারমুখো, একজন বললে, রায়বাবু আর জানাবেন কি? তিনিই তো মেয়েটাকে খতম করে দিয়েছেন।

আমার স্যার পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কি করে জানলেন খতম করে দিয়েছেন? আপনারা কি দেখেছেন?

কী যে বলেন স্যার, সব কি আর চোখের সামনে ঘটে? তাহলে আর পুলিশ তদন্ত করতে যায় কেন? রায়বাবু যে কী চীজ তা কি জানেন না?

তবু অফিসার 'কিন্তু' 'কিন্তু' করছিলেন। শেষ পর্যন্ত জনতার রোষের কাছে নতি স্বীকার করতে হলো। বললেন, তদন্ত করব।

করব-টরব নয়, আজই করতে হবে।

তারপর ও. সি. ফোনে রায়বাবুকে সব বললেন। বললেন, আপনি কিছু মনে করবেন না স্যার, বাধ্য হয়েই—আপনার বাড়ির ব্যাপার। তা ছাড়া নিতান্তই পেটি ম্যাটার। আপনার বাড়ির কাজের মেয়েটা—

.......হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাজ করতে গেলে বকুনি, চড়, থাপ্পড় তো খেতেই হয়। তাই হয়তো রাগ করে চলে গেছে।

......কি বললেন—স্বচ্ছন্দে যাব?

....তাই যাব স্যার। না-না, এখুনি যাবার দরকার কী? বিকেলের দিকে যাব।

আমি সব কথাই দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনলাম। শেষের কথা থেকে বুঝলাম স্যার রায়বাবুকে যথেষ্ট সময় দিলেন প্রমাণ-ট্রমাণ যদি কিছু থাকে তা লোপ করার জন্যে। হুঁ হুঁ বাবা, আমার কানকে ফাঁকি দেওয়া! আমি হচ্ছি হরদেব সিংহ কনস্টেবল।

চন্দ্রশেখরবাবুর বাড়ি গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে সেরা বাড়ি। কিন্তু আমি আশায় আনন্দে চলকে উঠলাম যখন দেখলাম রায়বাবুর বাড়ির পিছনই অনেকখানি খালি জমি যার মধ্যে কচুবন, বন-তুলসী আর কালকাসুন্দির অজস্র ঝোপ রয়েছে। অর্থাৎ প্রায় অব্যবহার্য জমি। আমার ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। আর গাঁইতি-কোদাল নিয়ে মাটি কোপানোর জন্যে হাত নিশপিশ করতে লাগল। আমি নিশ্চিত হলাম যে ঐ নরম মাটির নিচেই হতভাগিনী মেয়েটা শুয়ে আছে।

চন্দ্রশেখর রায় মশাই স্থূলকায় মানুষ। গায়ে লম্বা ঝুলের দামী আদ্দির পাঞ্জাবি। সোনার বোতাম। ধুতির কোঁচা মাটিতে লুটোচ্ছে। আঙুলে একটা হীরে বসানো আংটি জ্বলজ্বল করছে। হাতে মলক্কা বেতের রুপোর মুঠোযুক্ত হালকা ছড়ি।

খুব খাতির করে তিনি ও. সি. সাহেবকে বসালেন। তাঁর খাতিরের বহর দেখে আমার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। আমরা তিনজন কনস্টেবল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাইরে লোক গিজগিজ করছে।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমার চোখ ঘুরছিল ভেতরের সর্বত্র। বাইরের ঘরটা বেশ হাল ফ্যাশানে সাজানো-গোছানো। কিন্তু রায়মশাই যে একটু বনেদী ভাবাপন্ন তা তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ আর দেওয়ালে টাঙানো প্রাচীন কালের রাজা-রাজড়াদের মতো কয়েকটি বড়ো বড়ো অয়েল পেন্টিং দেখলেই বোঝা যায়।

ও. সি. সাহেব ছবিগুলো দেখছেন লক্ষ্য করে রায়সাহেব খুশি হয়ে ছবিগুলোর পরিচয় দিতে লাগলেন।

এই যে বড়ো অয়েল পেন্টিংটা দেখছেন এটি আমার স্বর্গীয় পিতা ঠাকুর সদাশিব রায়ের।

বেশ জাঁদরেল চেহারা।

ও পাশে উনি আমার মাতৃদেবী দুর্গাবতী। খুব ধর্মপরায়ণা ছিলেন। শেষ জীবনে সব ছেড়ে কাশীবাসী হয়েছিলেন। সেখানেই দেহরক্ষা করেন।

আর মাঝের ছবিটা?

বলছি। আমরা দু'ভাই ছিলাম। উনি আমার অগ্রজ রাজশেখর রায়। হাইট দেখেছেন? ছ'ফুটের

ওপর। বাবার মতোই তেজী ছিলেন। আবার মায়ের মতো ধর্মপরায়ণ। বরঞ্চ মায়ের চেয়েও বেশি। মা শেষ বয়েসে কাশীবাসী হয়েছিলেন। তবু ওঁর একটা ঠিকানা ছিল। আর ইনি চল্লিশ বছর বয়েসেই সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেলেন। যাবার আগে আমার ওপর সব কিছুর ভার দিয়ে গেলেন।

একটু থেমে চন্দ্রশেখরবাবু বললেন, আমাদের পরিবারে সন্ন্যাস নেবার একটা ট্র্যাডিশান আছে। আমার পিতামহ সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। আমার এক কাকাও তাই।

আবার একটু থেমে বললেন, আমার দুঃখ দাদা বাবার মতো হতে পারলেন না। মায়ের ধারাই পেয়েছিলেন।

আর আপনি? ও. সি. হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

চন্দ্রশেখরও পুরু গোঁফের ফাঁকে অল্প একটু হেসে বললেন, বাবার উত্তরাধিকার যখন আমার ওপর বর্তেছে তখন বাবার পদাংকই অনুসরণ করে চলেছি। তবে ধর্মকর্ম যে করি না তা নয়। ঐ দেখুন রাসমঞ্চ, ঐ দেখুন আমার রাধাকৃষ্ণের মন্দির। সব দেখাব আপনাকে। তাছাড়া সাধু-সন্ন্যাসী সেবা তো আছেই। আমি একালের মানুষ হলেও সাধু-সন্ন্যাসী সেবায় যে সুফল পাওয়া যায় তাতে বিশ্বাসী।

এই যে স্যার, সামান্য কিছু জলখাবার—

এই সুযোগে আমি চলে এলাম লাগোয়া জমিটায়। প্রথমে এক রাউন্ড ঘুরে দেখলাম। মাঝে মাঝে আমার মান্ধাতার আমলের বন্দুকটার বাঁট দিয়ে মাটিতে ঠুকতে লাগলাম। তারপর যেন মুগ্ধ হয়ে জমিটার চারপাশ দেখছি এমনি ভান করে কতকগুলো বিশেষ জায়গা যেখানে আমার সন্দেহ হচ্ছিল—বিশেষ করে পুকুরের ধারের কচুবনটার মাটি দেখতে লাগলাম। বন্দুকের বাঁট দিয়ে কয়েকবার ঠুকতেই বুঝতে পারলাম মাটিটা একটু ঢিলে। আর কাছাকাছি পিঁপড়ের গর্তও রয়েছে। জায়গাটার অনেকখানি জুড়ে বুনো ফুলগাছ। গাছগুলোও ঘেঁষাঘেঁষি। কেউ যেন কবরস্থানটি গোপন করার জন্যেই ফুলগাছগুলো উপড়ে এনে বসিয়ে দিয়েছে।

বাঃ চমৎকার! সবই মিলে যাচ্ছে। কিন্তু একটা বিষয়ে খটকা লাগল—ফুলগাছগুলো বেশ বড়ো আর তাজা। তুলে এনে বসালে এত বড়ো হতো না, এমন তাজাও থাকত না।

তা হলে?

এমনি সময়ে ও. সি. সাহেব হাঁকলেন, কই হে সিংহী?

যাই স্যার। বলে ছুটে গিয়ে স্যালুট ঠুকলাম।

ওখানে কি করছিলে?

জায়গাটা দেখছিলাম স্যার। ভারি চমৎকার।

এ কথা শুনে রায়বাবু খুশি হলেন। বললেন, জমিটা আর ফেলে রাখব না। ভালো ভালো ফলের চাষ করব ভাবছি।

বাড়ির সামনে ভিড় ক্রমশই বাড়ছে। তাদের আশা পুলিশ নিশ্চয় রায়বাবুকে গ্রেপ্তার করছে। কেননা তারা আমারই মতো নিশ্চিত মেয়েটাকে মেরে ফেলে লাশ সরিয়ে ফেলেছে।

ও. সি.-র সঙ্গে রায়বাবুকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসতে দেখে তারা অবাক। একজন সাহস করে এগিয়ে এসে ও. সি.-কে জিজ্ঞেস করল, কি হলো স্যার?

ও. সি. বললেন, কি আবার হবে? পেটি ম্যাটার। হ্যাঁ, মেয়েটাকে রায়বাবু দুটো চড় মেরেছিলেন। তাতেই মেয়েটার রাগ হয়। সেদিন ওর এক মাসি আসে। মাসির সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে রাত্রে পালায়। আমি সিওর যে মেয়েটা ওর মাসির বাড়ি আছে।

লোকে বিশ্বাস করল না। বলল, তাই নাকি, তাহলে মেয়েটাকে এনে দেখান।

ঠিক আছে দেখাব। বলেই জিপে উঠলেন। জিপ ছুটে বেরিয়ে গেল।

জিপে যেতে যেতে সাহস করে বললাম, স্যার, কি বুঝলেন?

যা বুঝেছি তা তো বললাম শুনলে।

তবু স্যার—

কী? তুমি বুঝি মনে করে নিয়েছ মেয়েটাকে মেরে পাশের জমিতে পুঁতে দিয়েছে? আর মাটি খোঁড়বার জন্যে তোমার হাত নিশপিশ করছে?

অন্য কনস্টেবলরা হেসে উঠল। একজন তো স্যারের অলক্ষ্যে আমার মাথায় চাঁটি মেরে দিল।

তবু আমি বললাম, স্যার, পাড়ার লোকেরা বলছিল আগের দিন মার খেতে খেতে পরিত্রাহি চিৎকার করছিল।

শত্রুপক্ষ ওরকম বানিয়ে বানিয়ে বলেই থাকে। দু'দিনের মধ্যে মেয়েটাকে এনে এদের দেখিয়ে দেব।

ও. সি. সাহেব যাই বলুন আমি কিন্তু নিশ্চিত মেয়েটা ওখানকার মাটির নিচেই আছে। চন্দ্রশেখর রায়ের চেহারা থেকেই মালুম হয় লোকটার দয়ামায়া বলে কিছু নেই।

জিপে যেতে যেতেই ঠিক করলাম আজ রাত্তির থেকে আমি একাই গোপনে কাজটি শুরু করে দেব। খুব একটা অসুবিধে হবে না। প্লেন ড্রেসে গভীর রাতে সাইকেলে করে আসব কোদাল-গাঁইতি নিয়ে। পুকুরপাড়টা রায়বাবুর বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে। মাটিটাও নরম। কাজেই শব্দ হবে না।

সেই মতো আমি তিন রাত্তির জেগে মাটি কোপালাম। হাতে বেজায় ব্যথা। তবু আমি লক্ষ্যে অবিচল। যখন বুকভোর গর্ত কাটা হয়েছে তখন টর্চের আলোয় কিছু যেন দেখতে পেলাম। খোঁড়া বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি গর্তে নেমে পড়লাম।

সব সন্দেহ সংশয় ঘুচিয়ে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সেদিন ও. সি. স্বয়ং মেয়েটাকে মাসির বাড়ি থেকে নিয়ে এসে রায়বাবুর হাতে তুলে দিলেন। রায়বাবু হাসতে হাসতে তাঁর থাবার মতো হাতটা ও. সি-র দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

খবরটা শুনে থমকে গেলাম। কী করে সম্ভব? আমার এত চিন্তা ভাবনা পরিশ্রম সব ভুল? তবে কি মেয়েটা আসল নয়? দু' নম্বর? জাল?

অফিসে বসে ও. সি. সাহেব যখন মেয়েটাকে মাসির বাড়ি থেকে এনে দেওয়ার কথা চা খেতে খেতে সবিস্তারে বলছেন তখন আমি কুণ্ঠিতভাবে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কি চাই সিংহী? মেয়েটাকে এনে দিয়েছি জানো তো?

হ্যাঁ স্যার।

তোমার কথামতো ভদ্রলোকের জমি চাষ করলে হতো আর কি। মানহানির মামলা ঠুকে দিত। রায়বাবুকে তো চেন না।

স্যার, আমি একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি আপনার পারমিশন ছাড়াই।

ও. সি. চমকে উঠলেন। কী করেছ? কিছু পাগলামি করনি তো?

স্যার, এ ক'দিন রোজ রাত্তিরে লুকিয়ে লুকিয়ে রায়বাবুর জমিতে গিয়ে নিজে হাতে মাটি কুপিয়েছি।

কী সর্বনাশ! পুলিশের লোক হয়ে উইদাউট পারমিশান....তোমার তো চাকরি চলে যাবে।

তা যায় তো কি করব স্যার, আপনিই মা-বাপ। তবে স্যার শুধু শুধু খুঁড়িনি। এক কোমর খুঁড়তেই এইগুলো পেলাম।

দেখি দেখি। এ যে জামার টুকরো—ইস্ তোশকের পচা তুলো। আর কিছু পেয়েছ?

আর খুঁড়িনি। এবার আপনি চলুন। নিজে দেখুন।

চলো, এখুনি যাচ্ছি।

লোকে লোকারণ্য। ও. সি. জনমজুরদের দিয়ে মাটি কোপাচ্ছেন। আরও হাত দেড়েক খুঁড়তেই পাওয়া গেল ছেঁড়া, ফাটা, মাটিমাখা তোশকে জড়ানো দীর্ঘ একটা কংকাল। কংকালটা ছ'ফুটেরও বেশি।

এ আবার কে?

স্যার রায়বাবুকেই জিজ্ঞেস করুন। উনি ঠিক চিনতে পারবেন। যদি চিনতে না পারেন তাহলে ওঁর দাদার ছবিটা মিলিয়ে দেখতে বলবেন। অন্তত হাইটটা—

বলেই আমি ভেতরে লাফিয়ে পড়লাম। একটা আংটি।

দেখুন স্যার, আংটিতে R অক্ষর খোদাই করা। ওটা যে রাজশেখর রায়েরই আংটি তাতে কি সন্দেহ আছে?

কিন্তু উনি যে সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন?

বাড়ি ছেড়েছিলেন, নিজে থেকে নয়। কবরে পাঠানো হয়েছিল। বিষয়-সম্পত্তির এমনই লোভ।

[শারদীয়া ১৪০৮]

ডাইনীর জঙ্গল

পরেশ দত্ত

সকালে ঘুম থেকে উঠে সুন্দরগড় ফরেস্ট বাংলোর হাতায় দাঁড়িয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল আনন্দর। দিগন্তসীমায় গাছপালার ফাঁকে মধ্যপ্রদেশের নীল শৈলমালা। বাগানঘেরা বাংলো। অ্যাসবেসটসের ছাউনির ওপর লতিয়ে উঠেছে বোগনভেলিয়া।

গত রাত্রে বাংলোতে ছেলে আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে উঠেছেন জি. এস. আইয়ের ফিল্ড অফিসার অভিষেক গোস্বামী। আনন্দ জিজ্ঞেস করল, 'বাংলোতে আমাদের ক'দিনের বুকিং বাবা?'

'দশ দিনের।'

'আর কিছুদিন বেশি থাকা যায় না? সুন্দরগড় ভারি সুন্দর জায়গা। এখান থেকে আর যেতে ইচ্ছে করে না।'

অভিষেক বললেন, 'কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের টিমের আরও লোকজন এসে পড়বে। ইনভেসটিগেশনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে।'

ব্রেকফাস্টের পর বাংলোর ভেতর থেকে ক্যামেরা নিয়ে এলো আনন্দ। অভিষেক গোস্বামী বাইনোকুলার নিয়ে চারদিকের পাহাড়-বন দেখতে লাগলেন।

বাংলোর সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। মাথায় মালপত্র। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন তিনজন মধ্যবয়স্ক লোক। একজনের মুখে দাড়িগোঁফ। আর একজনের চোখে চশমা। শেষোক্ত জনের দাড়িগোঁফ কামানো।

চশমা পরা লোকটি এগিয়ে এসে হাত তুলে নমস্কার করলেন, 'আমি লক্ষ্মীকান্ত শুক্লা, থামের পাশে কিশোর মেহতা, আর গেটেরে কাছে দাঁড়িয়ে উনি রামপ্রসাদ লোটানিয়া। আমরা টিম্বার মার্চেন্ট। রায়পুরে আমাদের বিজনেস।'

নমস্কার বিনিময়ের পর অভিষেক গোস্বামী নিজের পরিচয় দিলেন। আনন্দর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলেন ওঁদের।

শুক্লা জিজ্ঞেস করলেন, 'বেড়াতে আসলেন কী?'

'ঠিক বেড়াতে নয়।' অভিষেক জানালেন, 'সুন্দরগড়ে জি. এস. আইয়ের একটা রিসার্চ ক্যাম্প পড়বে। জায়গাটা অ্যাডভান্স দেখতে এসেছি।'

'জি. এস. আইয়ের ক্যাম্প!' কিশোর মেহতা চমকে উঠলেন, 'বোলেন কী! এখানে জি. এস. আইয়ের ক্যাম্প পড়বে! জঙ্গল কেটে পাহাড় ভেঙে তছনছ করবে সরকার? এমন বড়িয়া সুন্দরগড়ে আর কোনো সিনিক বিউটি থাকবে না!' প্রায় হাহাকার করে উঠলেন কিশোর মেহতা।

'আরে—না—না', অভিষেক আশ্বাস দিলেন, 'শুধু যেখানে বিশেষ দরকার সেখানেই খোঁড়াখুঁড়ি করা হবে।'

'এখানে কিসের মাইন আছে?' জিজ্ঞেস করলেন লক্ষ্মীকান্ত শুক্লা।

'একটা ভাস্ট কোলবেল্ট আছে। আমাদের ধারণা, গ্রাফাইটস মাইনও থাকতে পারে।'

'আই সি', লক্ষ্মীকান্ত শুক্লা হেসে বললেন, 'আপনার কথা শুনে ভাবলাম, সুন্দরগড়ে সুন্দর সুন্দর ডায়মন্ডভি আছে।'

অভিষেক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ডায়মন্ড মাইন থাকা অসম্ভব নয় মিঃ শুক্লা। কোল মাইনসের কাছাকাছি ডায়মন্ডও পাওয়া যায়। আসলে কোল আর ডায়মন্ডের সম্পর্ক খুব কাছাকাছি।'

'বোলেন কী মিঃ গোস্বামী!' রামপ্রসাদ লোটানিয়া হেসে উঠলেন, 'তা হলে তো কয়লার মধ্যে হীরেও পাওয়া যায়।'

লোটানিয়ার রসিকতার জের না টেনে অভিষেক বললেন, 'আগে কী আপনারা সুন্দরগড়ে এসেছেন?'

'হাঁ-হাঁ অনেকবার, সুন্দরগড় খুব হেলদি জায়গা। সময় পেলেই বেড়াতে চলে আসি।'

পাহাড়ের সানুতে বাংলো। আশপাশে লোকজন খুবই কম। ফরেস্ট বাংলোতে সরকারি লোকজনই বেশি আসে।

বাংলোর হাতায় বেতের টেবিল-চেয়ার পেতে বসলেন সকলে। কেয়ারটেকার রামলাল ট্রেতে সকলের জন্যে চা নিয়ে এলো।

'আচ্ছা রামলাল', চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অভিষেক গোস্বামী জিজ্ঞেস করলেন, 'বুনো জানোয়ার এদিকে আসে?'

'আসে বই কি বাবুজী। বাংলোর বাইরে ভালুক, হরিণের পায়ের ছাপ দেখবেন।'

'বাঘ আসে?' বড় বড় চোখ করে জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

'আসে খোকাবাবু। হায়না, চিতাভি আসে। ভারী রাতে বাংলোর দরজার বাইরে যাবেন না।'

দেখা গেল বাংলোর নিচের পথ দিয়ে কিছু আদিবাসী মেয়ে-পুরুষ মাথার ঝুড়িতে আনাজপাতি ও অন্য পসরা নিয়ে গ্রাম থেকে শহরের দিকে যাচ্ছে। যাবার সময় তারাও টুরিস্টদের কৌতূহলী চোখে দেখছে।

অভিষেক গোস্বামী জিজ্ঞেস করলেন, 'সুন্দরগড়ে কী কী টুরিস্ট স্পট আছে?'

শুক্লা জবাব দিলেন, 'একটা খুব ভালো টুরিস্ট স্পট আছে।' জঙ্গলের মাথায় উঁকি দেওয়া একটা বিরাট নীল পাহাড়ের দিকে তর্জনী তুলে বললেন, 'ওই পাহাড়ের নিচে একটা ফ্যান্টাস্টিক ঝরনা আছে। খুব মিঠা পানি, নিচে একটা ছোট নালা।'

আনন্দ উল্লসিত হয়ে বলল, 'এখান থেকে কতদূরে আঙ্কেল?'

'বাই রোড সাত মাইল তো হবেই।'

অভিষেক বললেন, 'কিন্তু পাহাড়টা এখান থেকে তিন মাইলের বেশি তো মনে হয় না।'

শুক্লা বললেন, 'সড়ক দিয়ে ঘুরে যেতে হবে। এখান থেকে পাহাড়ে যাবার কোনো শর্টকাট নেই।'

ট্রে নিয়ে ঢুকল রামলাল। পেছনে তার বৌ দ্রৌপদী।

শুক্লা বললেন, 'টুরিস্ট লজ থেকে সোজা ঝরনা যেতে গেলে একটা বড় জঙ্গল পড়বে। খুব ডেঞ্জারাস জায়গা। বিষাক্ত সাপ, আরও অনেক কিছু হিংস্র জন্তুর আস্তানা। ওই জঙ্গলে গিয়ে কেউ ফিরতে পারে না। ওর নাম ডাইনীর জঙ্গল।'

কিশোর মেহতা বললেন, 'রামলালকে জিজ্ঞেস করুন না, ও ভালো জানে ওই ডাইনীর জঙ্গলের কথা।'

'ডাইনীর জঙ্গলের কথা পুছছেন বাবুজী?' রামলাল বলল, 'বড় খতরনাক জায়গা। আমার ঠাকুরদার কাছে শুনেছি, বহুত সাল পহলে ওই জঙ্গলে ডাইনীর একটা আগুন বাণ এসে পড়েছিল। জঙ্গলের সব গাছপালা পুড়ে ছাই হয়ে গেছিল। তারপর ফের ওখানে জঙ্গল হয়েছে। তবে কোনো বড় গাছ নেই। শুধু ঝোপ আর আগাছা। সাপ বিচ্ছু নেকড়ে চিতার আস্তানা।'

অভিষেক হেসে বললেন, 'ডাইনীর জঙ্গলে তাহলে তো একবার যেতেই হচ্ছে।'

কিশোর মেহতা বললেন, 'সুন্দরগড়ে আমরা অনেকবার এসেছি। লেকিন ডাইনীর জঙ্গলের ধারেকাছে যাইনি।'

অভিষেক জিজ্ঞেস করলেন, 'টুরিস্ট লজে আপনারা কতদিন থাকবেন?'

'দশ দিনের বুকিং আছে আমাদের, আপনাদের?'

'কিছুদিন থাকার ইচ্ছে আছে।' ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে অভিষেক বললেন, 'চলুন না, আমরা একসঙ্গে ডাইনীর জঙ্গলে ঘুরে আসি।'

'সিয়ারাম, সিয়ারাম', দু' কানের লতিতে হাত দিলেন কিশোর মেহতা ও লক্ষ্মীকান্ত শুক্লা। রামপ্রসাদ লোটানিয়া বললেন, 'ঘরে আমাদের বালবাচ্চা আছে মিঃ গোস্বামী।'

অভিষেক গোস্বামী বললেন, 'ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে একবার যেতেই হবে ডাইনীর জঙ্গলে।'

'যেতে হয় আপনি একাই যান বাবুজী', আনন্দর পিঠে হাত রেখে দ্রৌপদী বলল, 'লেকিন খোকাবাবুকে আমার কাছে রেখে যান।'

অভিষেক বললেন, 'জঙ্গলে গিয়ে তোমাদের ওই ডাইনীর সঙ্গে আমাকে একবার মোলাকাৎ করতেই হবে। আর দেখতেই হবে জঙ্গলের কোথায় তার আগুন বাণ পড়েছে।'

শুক্লা শিউরে উঠে বললেন, 'এসব কাম করবেন না মিঃ গোস্বামী।'

রামলালের দিকে তাকিয়ে অভিষেক বললেন, 'জঙ্গলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একজন লোক ঠিক করে দিও।'

রামলাল সভয়ে বলল, 'ওদিকে কেউ যেতে রাজী হবে না বাবুজী।'

অভিষেক বললেন, 'আর কেউ রাজী না হলে তোমাকেই যেতে হবে রামলাল।'

দ্রৌপদী জোর গলায় বলল, 'না বাবুজী, আমার মরদকে ওই খতরনাক জায়গায় যেতে দেব না।'

অভিষেক হেসে বললেন, 'তোমার মরদের জানের জিম্মাদার আমি। ডাইনীর জঙ্গল থেকে আমি যদি ফিরে আসি, তোমার মরদও আসবে।' প্যান্টের পকেট থেকে রিভলবার বার করে দেখালেন অভিষেক। বললেন, 'এটার সামনে ডাইনী কেন, কোনো দৈত্যদানোও দাঁড়াতে সাহস করবে না।'

'ঠিক আছে বাবুজী', রামলাল হেসে বলল, 'আমি আপনাদের ডাইনীর জঙ্গলে নিয়ে যাব। কবে যাবেন বলুন?'

অভিষেক বললেন, 'কাল সকালেই। আজ বিকেলে কিছু কেনাকাটা করব।'

ট্রেতে খালি কাপ-প্লেট তুলে নিয়ে রামলাল চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, 'লেকিন আমার দোস্ত সুখিয়াকেও সঙ্গে নেব বাবুজী।'

দুপুরে খেয়ে উঠে আনন্দকে নিয়ে টাউনে গেছিলেন অভিষেক গোস্বামী। ফেরার সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো।

বাংলোর সামনে একটা মোটর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন ওঁরা। গাড়ির মাথায় ভারী ভারী লাগেজ তোলা হয়েছে। শুক্লা, মেহতারা তিনজনেই গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তদারকি করছেন।

অভিষেক গোস্বামী ওঁদের দিকে এগিয়ে গিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় চললেন আপনারা?'

'আমাদের এখনি রায়পুর ফিরে যেতে হবে মিঃ গোস্বামী।' জবাব দিলেন মিঃ শুক্লা।

'সেকি! বাংলোতে আপনাদের বুকিং তো দশ দিনের।'

'দুপুরে মিঃ মেহতার কোঠি থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, ওঁর ওয়াইফ ক্রিটিকালি ইল।'

'ভেরি স্যাড!' সান্ত্বনা জানালেন অভিষেক গোস্বামী। 'ক'দিন রেস্ট নেবেন বলে এসেছিলেন।'

'জানেন তো', মেহতা ম্লান হাসলেন, 'ম্যান প্রপোজেস গড ডিসপোজেস।'

রাত্রে খেতে বসে অভিষেক গোস্বামী রামলালকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দুপুরে কখন টেলিগ্রাম এসেছিল?'

'জানি না বাবুজী।' রামলাল বলল, 'আমি তো সারাদিন বাংলোতে ছিলাম, পিওনকে তো আসতে দেখিনি।'

পরদিন অভিষেক গোস্বামী ও আনন্দর ডাইনীর জঙ্গলে যাবার কথা ছিল। কিন্তু সকালে এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে অভিষেক মত পাল্টাতে বাধ্য হলেন। বিকেলে তিনি আনন্দকে বললেন, 'তুই বাংলোতে থাক, আমি একবার টাউনে যাব আর থানাতেও একবার ঘুরে আসব।'

আনন্দ জিজ্ঞেস করল, 'থানায় কেন বাবা?'

অভিষেক জানালেন, 'আউট স্টেশনে এলে আমাদের থানায় রিপোর্ট করতে হয়।'

সন্ধ্যার আগেই অভিষেক পৌঁছে গেলেন মাইল দুয়েক দূরের থানায়।

পুলিশ স্টেশনের বাইরে প্রকাণ্ড সাইন বোর্ড, হলুদের ওপর কালো অক্ষরে লেখা : SUNDARGARH POLICE STATION. নিচে হিন্দীতেও লেখা।

থানার ভেতরের একটা বড় ঘরের পাশে ছোট বোর্ডে লেখা : OFFICER-IN-CHARGE, RAMESHWAR THAKUR।

নেমকার্ড পাঠিয়ে ডাক আসতে দারোগা সাহেবের ঘরে ঢুকলেন অভিষেক গোস্বামী।

'আসুন আসুন মিঃ গোস্বামী', দারোগা সাহেব হাত বাড়িয়ে দিলেন।

করমর্দনের পর রামেশ্বর ঠাকুর হেসে বললেন, 'কলকাতা থেকে টেলেক্সে খবর পাঠিয়েছে জি. এস. আইয়ের একজন ফিল্ড অফিসার সুন্দরগড়ে আসছেন।'

'ধন্যবাদ', মিঃ ঠাকুরের টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে ধন্যবাদ জানালেন অভিষেক।

'কোথায় উঠেছেন?' জানতে চাইলেন মিঃ ঠাকুর।

'ফরেস্ট বাংলোতে।'

'সঙ্গে আর কে আছেন?'

'আমার ছেলে আনন্দ।'

'কোনো দরকার হলে জানাবেন।'

অভিষেক বললেন, 'আপনার কাছে একটা ইনফরমেশন চাই।'

'বলুন কি জানতে চান?' সাগ্রহে বললেন মিঃ ঠাকুর।

অভিষেক বললেন, 'ফরেস্ট বাংলো থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা গভীর জঙ্গল আছে?'

মিঃ ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ, এখানকার লোকেরা ওটাকে ডাইনীর জঙ্গল বলে।'

অভিষেক জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানকার লোকেরা জঙ্গলে ঢুকতে সাহস করে না কেন জানেন?'

মিঃ ঠাকুর বললেন, 'শুনেছি বহু বছর আগে এক রাতে আকাশ থেকে জঙ্গলে একটা আগুনের বাণ এসে পড়েছিল।'

অভিষেক অবাক হয়ে বললেন, 'বাণ!'

'হ্যাঁ, সেটা নাকি ডাইনীর ছোঁড়া বাণ।'

অভিষেক হেসে বললেন, 'ডাইনী আকাশ থেকে বাণ ছুঁড়েছিল?'

মিঃ ঠাকুর আরো বললেন, 'বাণটা জঙ্গলে পড়ার আগে প্রচণ্ড আওয়াজ হয়েছিল। তখন গরমকাল।'

অভিষেক বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ!'

'দশ-বারো মাইল দূরের লোকেরাও এই আওয়াজ শুনেছিল। আলোয় চোখ ঝলসে গেছিল।'

'বজ্রপাত নয় তো?'

'না, সে রাত্রে আকাশে মেঘ ছিল না।'

'তারপর?'

'জঙ্গলের অনেকটা জায়গায় আগুন ধরে গেছিল। অনেক গাছপালা পুড়ে ছাই হয়ে গেছিল।'

মিঃ ঠাকুরকে সিগারেট অফার করে নিজেও ধরালেন অভিষেক। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'ইন্সপেক্টর ঠাকুর, আমরা ঠিক করেছি কাল ওই ডাইনীর জঙ্গলে যাব।'

'বলেন কি মিঃ গোস্বামী!' দারুণ ভয় পেয়ে মিঃ ঠাকুর বললেন, 'ওই জঙ্গলে কেউ ঢোকে না। নাম শুনলেও ভয় পায়।'

অভিষেক বললেন, 'ঠিক সেই জন্যেই আমাদের একবার ওই জঙ্গলে ঢুকতেই হবে।'

'আপনারা মানে, আপনি আর কে?'

'আমার ছেলে আনন্দও সঙ্গে যাবে।'

মিঃ ঠাকুর প্রায় আঁতকে উঠলেন, 'বলেন কী! ছোট ছেলেকে নিয়ে ওই ফরবিডন্ জাঙ্গেলে ঢুকবেন?'

'ভাববেন না, আমার সার্ভিস রিভলবার আছে। আর আমার ছেলে আনন্দ ভালো ক্যারাটে জানে।'

'বিপদের সময় রিভলবার কাজে নাও লাগতে পারে।'

'আপনার অ্যাডভাইস মনে রাখব', অভিষেক বললেন, 'তবে একটা ব্যাপার কিছুটা মিস্টিরিয়াস মনে হচ্ছে।'

ইন্সপেক্টর ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'বিপজ্জনক কিছু?'

'ফরেস্ট বাংলোতে আমরা এসেছি পরশু রাতে। কাল সকালে তিনজন টুরিস্ট এসেছিলেন। লজে ওঁদের দশ দিনের বুকিং ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় হঠাৎ চলে গেলেন।'

'কি নাম ওঁদের জানেন?'

'কিশোর মেহতা, লক্ষ্মীকান্ত শুক্লা, রামপ্রসাদ লোটানিয়া।'

'কি করেন ওঁরা?'

'রায়পুরের টিম্বার মার্চেন্ট।'

'ওঁরা আসার পর কোনো ব্যাপার ঘটেছিল?'

'ওঁদের জানিয়েছিলাম আমরা ডাইনীর জঙ্গলে যাব।'

'ওঁদের কী আপনাদের সঙ্গে যেতে বলেছিলেন?'

'বলেছিলাম, তবে ওঁরা রাজী হননি। আমাদেরও যেতে নিষেধ করেছিলেন।'

'আপনারা শোনেননি।'

'রাইট।'

ইন্সপেক্টর ঠাকুর এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'হঠাৎ রায়পুর ফিরে যাবার কারণ কিছু জানিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, বললেন রায়পুরে মিঃ মেহতার স্ত্রীর নাকি খুব অসুখ। টেলিগ্রাম এসেছে। অথচ কেয়ারটেকারের কাছে জানলাম কাল বাংলোতে কোনো পোস্টাল পিওন আসেনি।'

'স্ট্রেঞ্জ!' চিন্তিতভাবে বললেন ইন্সপেক্টর ঠাকুর।

অভিষেক বললেন, 'আমরা ডাইনীর জঙ্গলে যাচ্ছি শুনেই হয়তো ওঁরা সতর্ক হয়ে গেছেন।'

'আই সী।' ইন্সপেক্টর ঠাকুর বললেন, 'ওঁদের কোনো ফোটো আপনার কাছে আছে?'

অভিষেক পকেট থেকে একটা রঙিন ফোটো দেখিয়ে বললেন, 'কাল সকালে বাংলোর বাগানে আমার ছেলে সকলের একটা গ্রুপ ফোটো তুলেছিল। আসার সময় টাউনে ডেভেলপ করিয়ে এনেছি।'

ফোটোটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ভালো করে দেখলেন ইন্সপেক্টর ঠাকুর। তারপর বললেন, 'না, কাউকেই চিনতে পারছি না। ফোটোটা আমাদের হেডকোয়ার্টারে পাঠাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ। আর একটা কথা, চৌকিদার রামলাল আমাদের ডাইনীর জঙ্গলে নিয়ে যেতে রাজী হয়েছিল। আজই ও বাজারের রাস্তায় মোটর চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে।'

'ডু ইউ সাসপেক্ট এনি ফাউল প্লে?'

'ইয়েস।' অভিষেক বললেন, রামলাল বলল, 'মোটরটা ওকে চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা করছিল। পাশে ছুটে গিয়ে কোনোরকমে প্রাণ বাঁচায়। আমার গভীর সন্দেহ ও আমাদের ডাইনীর জঙ্গলে নিয়ে যেতে রাজী হয়েছিল বলেই ওকে মারার চেষ্টা হয়েছে।'

ইন্সপেক্টর এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'রামলাল যে আপনাদের জঙ্গলে নিয়ে যাবে তা আপনি ছাড়া আর কে জানত?'

'মিঃ মেহতারা জানতেন।'

অভিষেক গোস্বামী থানা থেকে চলে যাবার আগে ইন্সপেক্টর ঠাকুর বললেন, 'আপনাকে ফের রিকোয়েস্ট করছি মিঃ গোস্বামী, ওই ফরবিডন্ জাঙ্গলে যাবেন না।'

অভিষেক হেসে বললেন, 'সরকারি কাজে আমাদের কোথাও যেতে ভয় পেলে চলে না ইন্সপেক্টর ঠাকুর।'

ফরেস্ট বাংলোতে ফিরে অভিষেক আনন্দর খোঁজ নিলেন। রামলাল বলল, 'খোকাবাবু তো থানায় গেছে।'

'সেকি!' অভিষেক দারুণ অবাক হয়ে বললেন, 'কখন থানায় গেল?'

রামলাল জানাল, 'এক ঘণ্টা আগে। একজন খাকি উর্দিপরা সিপাই থানা থেকে খোকাবাবুকে ডাকতে এলো।'

'সিপাই ডাকতে এলো?'

'হ্যাঁ বাবুজী, সিপাই বলল, আপনি থানায় বসে রয়েছেন। খোকাবাবুর সঙ্গে কী জরুরি দরকার।'

'খোকাবাবুকে আমি থানায় যেতে বলিনি।'

'বোলেন কী বাবুজী!' রামলাল দারুণ ভয় পেয়ে বলল, 'খোকাবাবু তাহলে কোথায় গেল?'

অভিষেক চিন্তিতভাবে বললেন, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, আনন্দকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে।'

'খোকাবাবুকে কেন ধরে নিয়ে যাবে বাবুজী?'

অভিষেক দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'জানি না, আমাকে এখনি আবার থানায় যেতে হবে।'

উত্তেজিতভাবে থানায় আসতে ইন্সপেক্টর ঠাকুর অবাক হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার মিঃ গোস্বামী?'

অভিষেক বললেন, 'আমি থানায় আসার পর সেপাইয়ের ছদ্মবেশে বাংলোতে গিয়ে একজন আনন্দকে মিথ্যে করে বলে আমি তাকে থানায় ডেকেছি।'

'স্ট্রেঞ্জ! বুঝতে পারছি না সুন্দরগড়ে কারা আপনার শত্রু? আপনার ছেলেকে কিডন্যাপ করবেই বা কেন? কী তাদের মোটিভ?'

অভিষেক ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আমার ছেলেকে রেসকিউ করার চেষ্টা করুন ইন্সপেক্টর ঠাকুর।'

ইন্সপেক্টর ঠাকুর বললেন, 'আমরা এখনি অ্যাকশন নিচ্ছি।'

দুজন সেপাই, একজন সাব ইন্সপেক্টর ও অভিষেককে সঙ্গে নিয়ে ইন্সপেক্টর ঠাকুর পুলিশ জীপে উঠে বসলেন, কিন্তু কয়েক গজ গিয়েই জীপ থামাতে হলো। দেখা গেল একজন সেপাইয়ের সঙ্গে আনন্দ থানার দিকেই এগিয়ে আসছে।

অভিষেক চিৎকার করে উঠলেন, 'ওই যে আনন্দ!' জীপ থেকে নেমে ছুটে গিয়ে আনন্দকে জড়িয়ে ধরলেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি বাবা?'

আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে সকলে থানায় ফিরে এলেন। ইন্সপেক্টর ঠাকুর আনন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার খোকাবাবু, কোথায় গেছিলে?'

আনন্দ বলল, 'খাকি পোশাকপরা একজন লোক বাংলোতে গিয়ে আমায় থানায় যেতে বলল।'

'তুমি কী তাকে পুলিশের লোক ভেবেছিলে?'

'হ্যাঁ। আমাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে মুখ বেঁধে সীটের নিচে ফেলে রাখে। তারপর একটা খালি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলল। বাঁধন খুলে দরজায় তালা বন্ধ করে দেয়।'

ইন্সপেক্টর ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'জায়গাটা কোথায় বুঝতে পেরেছিলে?'

'না। আশপাশে লোকজনের সাড়াশব্দ পাইনি। গুণ্ডার মতো একজন লোক আমাকে ভয় দেখায়, চেঁচামেচি করলে গলা টিপে মেরে ফেলবে।'

'লোকগুলোকে চিনতে পেরেছিলে?'

'না, আগে কখনও দেখিনি। ভয়ে আমার বুক টিপটিপ করতে লাগল।'

'ক'জন সে বাড়িতে ছিল?'

'একজনকে রেখে বাকি সবাই চলে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।'

'তোমাকে কিছু খেতে দিয়েছিল?'

'না, দারুণ তেষ্টা পেয়েছে বলে চিৎকার করতে এক গ্লাস জল নিয়ে একজন ঘরে ঢুকল। তাগড়াই চেহারা, মিশমিশে কালো, রাঙা চোখ।'

'জল দিয়ে কী লোকটা চলে গেল?'

'চলে যাবার আগেই জলের গ্লাসটা সাঁ করে তার মুখে ছুঁড়ে দিলাম। লোকটা হকচকিয়ে যেতেই ছুটে গিয়ে ক্যারাটের প্যাঁচ দিতেই লোকটা উল্টে পড়ে গেল।'

অভিষেক হেসে বললেন, 'তারপর তুমি দরজা দিয়ে ছুটে পালালে?'

'হ্যাঁ, রাস্তায় বেরিয়ে প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে বড় রাস্তার মোড়ে একজন পুলিশের লোককে দেখে তাকে সব কথা খুলে বললাম।'

আনন্দর সঙ্গে আসা পুলিশের লোকটি বলল, 'হ্যাঁ স্যার, খোকাবাবু আমার কাছেই ছুটে এসেছিল।'

ইন্সপেক্টর ঠাকুর বললেন, 'মিঃ গোস্বামী, এখন বুঝতে পারছি আপনার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। খুব সাবধানে থাকবেন।'

রাতে বাংলোতে ফিরে আনন্দ বলল, 'বাবা, তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে ভুলে গেছি।' কষ্টিপাথরের মতো কালো, ভেতরে অভ্রের গুঁড়োর মতো কী যেন চিকচিক করছে, দুটো পাথর দেখিয়ে আনন্দ বলল, 'এ দুটো বেশ ভালো পেপার ওয়েট হবে, না বাবা?'

পাথর দুটো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে অভিষেক জিজ্ঞেস করলেন, 'এই পাথর দুটো কোথায় পেলি?'

আনন্দ বলল, 'বিকেলে দুজন আদিবাসী ছেলে বিক্রি করতে এসেছিল। এক টাকায় কিনেছি।'

অভিষেক জিজ্ঞেস করলেন, 'এই পাথর ওরা কোথা থেকে পায় জিজ্ঞেস করেছিস?'

'জিজ্ঞেস করেছিলুম, বলতে চায় না। এর আগেও ওরা বাংলোতে এসেছিল। মেহতা আঙ্কেলদের ওরা চেনে। ওঁদের কাছেও অনেক পাথর বিক্রি করেছে।'

অভিষেক চিন্তা করে বললেন, 'জানতেই হবে, এই পাথর ওরা কোথা থেকে পায়?'

সকালে ডাইনীর জঙ্গলে যাবার জন্যে আনন্দকে নিয়ে তৈরি হলেন অভিষেক। রামলাল ও তার দোস্ত সুখিয়াও সঙ্গে যাবে। দুজনের কাঁধে তীর-ধনুক, সঙ্গে ড্রাইফুড, চায়ের ফ্লাস্ক।

অভিষেক জিজ্ঞেস করলেন সুখিয়াকে, 'তুমি আমাদের ডাইনীর জঙ্গলে নিয়ে যেতে পারবে তো?'

সুখিয়া হেসে বলল, 'জঙ্গলের সব রাস্তা আমি খুব ভালো চিনি বাবুজী। মগর ডাইনীর জঙ্গলে আমরা ঢুকি না। দূর থেকে দেখিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে', অভিষেক পা বাড়িয়ে বললেন, 'চল বেরিয়ে পড়ি।'

বাংলো থেকে রাস্তায় নামার আগে গেটের মুখে শালগাছের গায়ে একটা লাল তীর বিঁধে আছে দেখে সকলে থমকে দাঁড়ালেন। বিঁধে থাকা তীরের সঙ্গে একটা কাগজ জড়ানো। কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে অভিষেক দেখলেন, লেখা রয়েছে—CAUTION—DO NOT PROCEED TO FORBIDDEN JUNGLE—DANGER AHEAD.

আনন্দ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, 'কী লিখেছে বাবা?'

'কিছু না।' বলে অভিষেক থমথমে মুখে কাগজটা দলা পাকিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, 'লেট আস স্টার্ট।'

লোকালয় ছেড়ে ওঁরা চারজন এগিয়ে চললেন পাহাড়-অরণ্যের দিকে। অরণ্য গভীর হতে লাগল।

জঙ্গলে কত বড় বড় গাছ মাথা তুলেছে। ক্রমে ওঁরা ঢুকলেন গা-ছমছম করা নিস্তব্ধ অরণ্যের মধ্যে। নিচে সূর্যের আলো নামেনি।

দুটো পাহাড়ের মাঝামাঝি খাড়াই পথ। সামনের দিকে ঝুঁকে সকলে চড়াই ভাঙতে লাগলেন। পাহাড়ের সানুতে বিচিত্র বর্ণের পুষ্পসম্ভার। একদিকের গিরিখাদে কুল কুল করে বয়ে যাচ্ছে একটা নালা।

সুখিয়া বলল, 'বাবুজী, এই নালাটা হলদি ঝরনা থেকে নেমে আসছে। বহুত মিঠা পানি।'

আনন্দ আঙুল তুলে দেখাল, 'ওই দেখ বাবা নীল জলে কত রঙিন ছোট-বড় মাছ খেলা করছে।'

পাহাড়ের পর শুরু হলো সমতল। শিলাখণ্ড ছড়ানো ঢেউখেলানো প্রান্তর। দূরে দূরে কুয়াশার ঘোমটা জড়ানো আবছা নীল শৈলমালা। পথের দু'পাশে চাষের ক্ষেত। ছোট ছোট দরিদ্র গ্রাম, আকাশে টিয়া পাখির ঝাঁক। দরিদ্র, আদিবাসী কৃষক পরিবার ওদের দিকে তাকিয়ে রইল।

মাঠে কাজ করতে করতে এক চাষী মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'এই সুখিয়া, কোথায় যাচ্ছিস?'

সুখিয়া চলতে চলতেই জবাব দিল, 'ডাইনীর জঙ্গলের দিকে।'

চাষী গালে হাত দিয়ে বলল, 'আই বাপ! তোরা ডাইনীর জঙ্গলে যাচ্ছিস। জান নিয়ে ফিরতে পারবি?'

রামলাল জবাব দিল, 'নারে আমরা জঙ্গলের ভিতর যাচ্ছি না, বাবুজীদের পথ দেখিয়ে ফিরে আসব।'

প্রান্তর ছাড়িয়ে ফের জঙ্গলের ভেতর ঢুকলেন ওঁরা। সুখিয়া বলল, 'এদিকে খুব ভালুকের ভয় আছে বাবুজী।'

রামলাল বলল, 'ভালুকেরা এই সময় মহুয়া খেতে বেরোয়। ওই দেখুন জঙ্গলের নিচে সাদা সাদা মহুয়া পড়ে রয়েছে।'

সুখিয়া বলল, 'এদিকে বুনো হাতিরা দল বেঁধে আসে।'

আবার চড়াই পথ। সামনেই উঁচু পাহাড়। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। সারা শরীরে ঘাম ঝরতে লাগল।

পাহাড়ের মাথায় অনেকটা প্রায় সমতল জায়গা। এখানে বড় গাছের সংখ্যা কম। কাঁটা গাছ বেশি। নিচের গভীর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে আনন্দ বলল, 'একটা স্ন্যাপ নিচ্ছি।'

পাহাড়ের এক জয়াগায় দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখে অভিষেক বললেন, 'বাংলো থেকে বেরিয়েছি দু' ঘণ্টা হয়ে গেছে। রামলাল সকলকে চা-খাবার দাও।'

ফ্লাস্ক খুলে কাগজের কাপে চা ও প্লেটে খাবার পরিবেশন করল রামলাল।

চা-খাবার খেয়ে আনন্দ পাহাড়ের কাছাকাছি এদিক-ওদিক ঘোরার সময় ঝরা পাতার ভেতর একটা সিগারেটের প্যাকেট পেয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'সিগারেটের প্যাকেট এখানে এলো কী করে বাবা?'

সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে অভিষেক দারুণ অবাক হয়ে বললেন, 'এদিকে তাহলে শহরের মানুষের যাতায়াত আছে।'

আনন্দ বলল, 'এই ব্র্যান্ডের সিগারেট আঙ্কেল মেহতাকে খেতে দেখেছি।'

প্যাকেটটা ভালো করে দেখে অভিষেক বললেন, 'নতুন প্যাকেট। দু'একদিন আগে এখানে কেউ ফেলে গেছে।'

ফের সকলে চলতে শুরু করলেন। এবার উৎরাই। পাহাড়ী পথ ক্রমে নিচের দিকে নামছে। পাহাড়ের নিচের জঙ্গল বেশ গভীর। বড় বড় গাছ ঠেলাঠেলি করে আকাশের দিকে মাথা তুলেছে। জঙ্গলের নিচে ছায়াঘন, স্যাঁতসেঁতে, আগাছার জটলা। বড় বড় গাছের ডাল বেয়ে মোটা মোটা লতা উঠেছে। এখানে যে কোনো সময়, যে কোনো জানোয়ার আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে রামলাল হঠাৎ চাপা গলায় বলে উঠল, 'হুঁশিয়ার বাবুজী, সাপ!'

অভিষেক টর্চ জ্বেলে দেখলেন কয়েক ফুট দূরেই জলার কাছে একটা প্রকাণ্ড অজগর নিচু ডাল থেকে মুখ ঝুলিয়ে দুলছে। ডালপাতার মধ্যে ময়ালটাকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। দুলতে দুলতে অভিষেক গোস্বামীর দিকে তাক করছে। আনন্দ ভয় পেয়ে পেছন থেকে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরল। ঝট করে অভিষেক পকেট থেকে রিভলবার বার করে ঝুলন্ত ময়ালটাকে তাক করলেন। রামলাল বাধা দিয়ে বলল, 'না বাবুজী, গুলি করবেন না। সাপটা কিছু করবে না।' দেখা গেল গাছ থেকে সড়সড় করে নেমে সাপটা জঙ্গলের ভেতর সেঁধিয়ে গেল।

ফের চলতে শুরু করলেন সকলে। জঙ্গল পাতলা হয়ে সামনের দিকে অনেকটা জায়গা দেখা গেল। গাছপালা খুব কম। বড় গাছ নেই।

সুখিয়া হঠাৎ আঙুল তুলে বলল, 'বাবুজী, ওই নিচু জমিটা ডাইনীর জঙ্গল।'

রামলাল সভয়ে বলল, 'ওখানে আমরা যাব না। গাঁবুড়োর মানা আছে।'

আচমকা রিভলবারের গুলির টিসুম শব্দে কেঁপে উঠল নিস্তব্ধ জঙ্গল। সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা মরণার্ত কণ্ঠ। ওঁরা চারজন চমকে সভয়ে এদিকে-ওদিকে তাকালেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন না কে গুলি করল আর কেই বা জখম হলো।

অভিষেক বললেন, 'কী ব্যাপার রামলাল?'

রামলাল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'কী জানি বাবুজী!'

অভিষেক বললেন, 'বেশিক্ষণ এখানে থাকা ঠিক হবে না। আমরা ছাড়াও এখানে অন্য লোক আছে।'

সুখিয়া বলল, 'আপনারা জলদি ঘুরে আসুন বাবুজী। রামলালকে সঙ্গে নিয়ে এখানে দাঁড়াচ্ছি।'

এবার জমি আরও নিচের দিকে নেমে গেছে। সামনে একটা প্রকাণ্ড খাদের মতো নিচু জায়গা। শিবলিঙ্গের মতো একটা বিশাল তামাটে কালচে শিলা মাটির ওপর গেঁথে রয়েছে। নিচু জায়গাটা বর্ষায় জলে ডুবে যায়। এখন শুকনো। চারদিকে অসংখ্য শিলাখণ্ড ছড়িয়ে রয়েছে।

একটা পাথর হাতে তুলে আনন্দ বলল, 'বাবা, এইরকম কালো পাথরই কাল আদিবাসীদের কাছ থেকে কিনেছি।'

কয়েকটা পাথর নিয়ে পরীক্ষা করে অভিষেক বললেন, 'এখানকার নাম কেন ডাইনীর জঙ্গল, এবার বুঝেছি।'

আনন্দ বলল, 'এখানে ডাইনী কোথায় বাবা?'

অভিষেক বললেন, 'ডাইনীকেই তো খুঁজছি।'

আনন্দকে নিয়ে আরও নিচের দিকে নেমে গেলেন। অভিষেক কালো পাথরটার এবড়ো-খেবড়ো গায়ে হাত বুলিয়ে বললে, 'এইটাই আসলে ডাইনীর বাণ।'

আনন্দ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পাথর ডাইনীর বাণ?'

অভিষেক বললেন, 'এইটার ভয়েই মানুষজন এদিকে আসে না।'

প্রকাণ্ড শিলার আশপাশের মাটি-পাথর হাতে তুলে পরীক্ষা করে অভিষেক বললেন, 'ডাইনীর জঙ্গলের রহস্য এখন জলের মতো পরিষ্কার।'

আনন্দ জিজ্ঞেস করল, 'কী রহস্য বাবা?' কিন্তু জবাব দেবার আগেই ওঁরা শুনলেন, 'হ্যান্ডস আপ মিঃ গোস্বামী।'

এদিক-ওদিক তাকিয়েও কারুকে দেখতে পেলেন না অভিষেক। আনন্দও হতবাক। এবার গাছের আড়াল থেকে উদ্যত রিভলবার হাতে বেরিয়ে এলেন মেহতা, পেছনে শুক্লা।

অভিষেক মাথার ওপর হাত তুলে বললেন, 'কী ব্যাপার মিঃ মেহতা, কী অপরাধ করেছি আমরা?'

মেহতা ধমকে উঠলেন, 'ডাইনীর জঙ্গলে এসেছেন কেন?'

অভিষেক বললেন, 'ডাইনীর সঙ্গে দেখা করতে।'

শুক্লা বললেন, 'ডাইনীর দেখা পেয়েছেন?'

অভিষেক বললেন, 'না, শয়তানের দেখা পেয়েছি।' কড়া গলায় তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা আমার ছেলেকে কিডন্যাপ করেছিলেন?'

মেহতা বললেন, 'এবার আপনাদের দুজনকে খতম করে দেব। এখানে কেউ আপনাদের বাঁচাতে পারবে না।'

অভিষেক বললেন, 'আমরা কারুর সাহায্য চাই না।'

'তাহলে মরার জন্যে তৈরি হোন।'

'কেন জানতে পারি?'

'আপনারা অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন।'

অভিষেক বললেন, 'হ্যাঁ জেনেছি, ডাইনীর জঙ্গল আসলে হীরের খনি।'

শুক্লা বললেন, 'তারপর?'

অভিষেক বললেন, 'আপনারা গোপনে এখান থেকে হীরে পাচার করছেন।'

মেহতা বললেন, 'যদি বাঁচতে চান, একটা শর্তে ছেড়ে দিতে পারি।'

'শর্ত! কী শর্ত শুনি?'

'হীরের খনির কথা একমাস সরকারকে জানাতে পারবেন না। আপনাকে দু' লাখ টাকাও দেওয়া হবে।'

অভিষেক হেসে বললেন, 'আর এই সময়ের মধ্যে এখান থেকে আপনারা কোটি কোটি টাকার হীরে তুলে নিয়ে যাবেন। তাই তো?'

মেহতা বললেন, 'রাইট, আপনি খুব বুদ্ধিমান।'

অভিষেক ফের হাসলেন, 'অন্তত আপনার মতো বোকা নই।'

'শাট আপ!' শুক্লা ফের গর্জে উঠলেন, 'আপনাদের মুখ বন্ধ করতে দুটোর বেশি বুলেট খরচ হবে না।'

মিঃ মেহতা বললেন, 'আমাদের কথায় রাজী হলে প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে পারবেন, টাকাও পাবেন।'

অভিষেক হেসে বললেন, 'ও দুটো জিনিসকে খুব বড় মনে করি না।'

শুক্লার দিকে তাকিয়ে মেহতা বললেন, 'মিঃ গোস্বামীর পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে নাও।'

শুক্লা এগিয়ে গিয়ে অভিষেকের পকেট থেকে রিভলবারটা টেনে বার করতেই আনন্দ একটা লাথি মেরে সেটাকে দূরে ছুঁড়ে দিল। শুক্লা অনন্দর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মেহতা ভয় দেখাবার জন্যে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করলেও ওদের দিকে গুলি ছুঁড়তে পারলেন না। কারণ ধস্তাধস্তির সময় গুলি কার গায়ে লাগবে ঠিক নেই। আনন্দ ক্যারাটের প্যাঁচে শুক্লাকে মাটিতে ফেলে দিল। দুজনেই উল্টেপাল্টে লড়াই করলেন। রিভলবার হাতে থেকেও মেহতা কিছু করতে পারলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনন্দ রিভলবারটা পেল না। শুক্লা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে অস্ত্রটা আনন্দর পিঠে চেপে ধরে বললেন, 'মিঃ গোস্বামী, আপনি নিজের জানের পরোয়া করেন না, কিন্তু ছেলের জান?'

আনন্দর ঘাড় চেপে ধরে শুক্লা বললেন, 'একটু নড়লেই খতম করে দেব।'

মেহতা বললেন, 'ব্যাটা বিচ্চু বদমাশ।'

শুক্লা বললেন, 'মিঃ গোস্বামী এবার বলুন, আমাদের প্রপোজালে রাজী কিনা?'

অভিষেক অবিচল গলায় বললেন, 'না।'

মেহতা বললেন, 'দেন ইউ মাস্ট ডাই।'

শুক্লা বললেন, 'বোথ অফ ইউ।'

মেহতা বললেন, 'জাস্ট সে ইওর লাস্ট প্রেয়ার। ওয়ান-টু...'

আড়াল থেকে অজ্ঞাত কণ্ঠে শোনা গেল, 'থ্রী।' শুক্লা, মেহতা দুজনেই চারদিকে তাকালেন, 'কে?' তিনজন বন্দুকধারী সেপাইকে সঙ্গে নিয়ে আড়াল থেকে এগিয়ে এলেন ইন্সপেক্টর ঠাকুর। 'ইউ স্কাউন্ড্রেলস, ইওর গেম ইজ আপ।'

রিভলবারের নল আনন্দর মাথার পেছনে ঠেকিয়ে মিঃ শুক্লা গর্জে উঠলেন, 'ইন্সপেক্টর, আর এক পা এগোলেই রিভলবারের ট্রিগার টিপে দেব।'

ইন্সপেক্টর ঠাকুর বললেন, 'কী চান আপনারা?'

মেহতা বললেন, 'জঙ্গলের বাইরে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের গাড়ি পর্যন্ত যেতে দিতে হবে।'

শুক্লা বললেন, 'মিঃ গোস্বামীর ছেলেকে আমাদের সঙ্গে জামিন নিয়ে যাব। পথে আমাদের কোনো ট্রাবল দিলে ছেলের লাশ দেখবেন।'

মেহতা বললেন, 'জঙ্গলে আপনারা আগে যাবেন। আমরা পেছনে।'

জঙ্গলের ভেতর অভিষেক, চারজন পুলিশ সামনে এগিয়ে চললেন। পেছনে আনন্দকে টানতে টানতে নিয়ে চললেন মেহতা, শুক্লা। কিন্তু কিছুটা দূর গিয়েই হঠাৎ 'আঁ-আঁ' করে চিৎকার করে মাটিতে ঢলে পড়লেন মেহতা আর শুক্লা। দেখা গেল দুজনের পায়ের পেছনে বিঁধে রয়েছে দুটো তীরের ফলা।

ওঁদের দুজনের চিৎকার শুনে, মাটিতে পড়ে যাচ্ছে দেখে পুলিশের লোকের সঙ্গে অভিষেকও ছুটে গেলেন। কাছে গিয়ে আনন্দকে জড়িয়ে ধরলেন। ইন্সপেক্টর ঠাকুর দুজনার পা থেকে তীরের ফলা খুলে গ্রেপ্তার করলেন মেহতা ও শুক্লাকে।

তীর-ধনুক হাতে রামলাল ও সুখিয়া হাসিমুখে কাছে এসে দাঁড়াল। ইন্সপেক্টর ঠাকুর হাত বাড়িয়ে ওদের দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

মেহতা ও শুক্লার কোমরে দড়ি বেঁধে, পুলিশের গাড়ির দিকে টানতে টানতে নিয়ে চলল সেপাইরা।

অভিষেক বললেন, 'এদের দলের আর একজনকে দেখতে পাচ্ছি না ইন্সপেক্টর ঠাকুর। তার নাম লোটানিয়া।'

ইন্সপেক্টর ঠাকুর বললেন, 'জঙ্গলে ঢোকার সময় একজনের লাশ দেখতে পেলাম। ওই দেখুন গাছের নিচে।'

অভিষেক এগিয়ে গিয়ে লাশ দেখে বললেন, 'এই তো মিঃ লোটানিয়া। বুকে গুলির ক্ষত। কিছুক্ষণ আগে গুলির শব্দ শুনেছিলাম, কিন্তু উনি খুন হলেন কেন?'

ইন্সপেক্টর ঠাকুর বললেন, 'হেড কোয়ার্টার থেকে জেনেছি জুয়েলারী স্টোন কেনাবেচার কারবারী, বোধহয় স্টোন চেনার জন্য এদের সঙ্গে জঙ্গলে এসেছিলেন। টাকাপয়সার বখরা নিয়ে গোলমাল হয়ে থাকতে পারে। তাই খতম করে দিয়েছে।'

অভিষেক হেসে বললেন, 'ইন্সপেক্টর, আপনারা কখন জঙ্গলে এসেছিলেন?'

ইন্সপেক্টর ঠাকুর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনি একজন সরকারি অফিসার, জঙ্গলে বিপদে পড়তে পারেন। আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। ইট ইজ আওয়ার ডিউটি।'

'ধন্যবাদ।' অভিষেক গোস্বামী বললেন, 'আপনারা আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন।'

ইন্সপেক্টর ঠাকুর বললেন, 'বুঝতে পারছি না ক্রিমিন্যালরা জঙ্গলে কী করতে এসেছিল?'

অভিষেক বললেন, 'এরা হীরের খনি থেকে হীরে চুরি করতে আসে।'

'জঙ্গলে হীরের খনি?' ইন্সপেক্টর ঠাকুর দারুণ অবাক। 'কী বলছেন?'

'ঠিকই বলছি', ডাইনীর জঙ্গলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অভিষেক গোস্বামী বুঝিয়ে বললেন, 'আপনারা

জানেন না, বহু বছর আগে এই জঙ্গলে একটা উল্কাপাত হয়। বিশাল উল্কাটা শিবলিঙ্গের মতো মাটিতে গেঁথে যায়। ওই যে প্রকাণ্ড পাথরটা দেখছেন, ওইটাই সেই উল্কা। এখানকার মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করলেই সেই খনির সন্ধান মিলবে। এতদিন যে এদিকটায় অনুসন্ধান করা হয়নি সেটা ওই উল্কাপাতের কারণে। আমার ধারণা এখানে একটা গ্রাফাইটের খনিও ছিল। উল্কা পড়ার পর গ্রাফাইট ক্রমে হীরেতে পরিণত হয়। জঙ্গলে আগুন ধরে যায়। অলৌকিক ব্যাপার মনে করে অশিক্ষিত আদিবাসীরা বহুকাল এদিকের জঙ্গলে ঢোকেনি। হীরে মাটির নিচে জমেছিল, তবে কিছু দুঃসাহসী আদিবাসী তরুণ এদিকে এসে আশপাশে চকচকে সুন্দর পাথর দেখে তুলে নিয়ে যায়। বিক্রি করে ফরেস্ট বাংলোর লোকজনের কাছে। তারই কয়েকটা মেহতা ও শুক্লাদের হাতে গিয়ে পড়ে। এবার আসার সময় জুয়েলার লোটানিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আসে, এখানে আরও কতটা হীরে আছে জানার জন্য। কিন্তু খবরটা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তাই শুক্লারা ওঁকে খুন করে।'

ইন্সপেক্টর ঠাকুর বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ মিঃ গোস্বামী, আপনি ক্রিমিন্যালদের চিনতে আমাদের সাহায্য করেছেন।' আনন্দর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'ব্রেভো বয়, আমাদের দেশ তোমার মতো আরও সাহসী ছেলে চায়।'

[জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫]

গণেশ হালদারের হেঁয়ালি

রাধারমণ রায়

সে নেই, তাতে কী? দেখবে তাকে ভাই?
ভূত হয়ে আসবে সে, উড়িয়ে দিলে ছাই।

পুতুল-রহস্য উদঘাটনের একেবারে শেষ পর্যায়ে গণেশকাকু (অর্থাৎ প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ গণেশ হালদার) এই হেঁয়ালিটা বলেছিলেন। তবে শেষের কথা এখন না, গোড়ার কথা দিয়েই শুরু করা যাক।

বছর দুয়েক হলো আমরা দক্ষিণ কলকাতার সর্দার শঙ্কর রোডের পাঁচ নম্বর বাড়ির একতলার একটা ফ্ল্যাটে উঠে এসেছি। একতলারই আর-একটা ফ্ল্যাটে থাকেন গণেশ হালদার, যিনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে খুবই নাম করেছেন। আমি আর আমার বোন দু-জনেই ওঁর ক্ষুদে সহকারী।

এখানে সংক্ষেপে বলে রাখি, আমার ডাকনাম জিৎ, ভাল নাম প্রণোজিৎ। আমার বোনের ডাকনাম বুড়ি, ভাল নাম সোমা। আমার বয়েস বারো, বোনের দশ। আমি পড়ি ক্লাস সেভেন-এ, আমার বোন পড়ে ফাইভ-এ। আমরা দু-জনেই ডিটেকটিভ গল্প ভালবাসি। আমরা গণেশকাকুর একান্ত ভক্ত। উনি আমাদের আপন কাকা নন, বাবার বন্ধু বলে আমরা ওঁকে 'কাকু' বলি। তবে উনি আমাদের আপনের থেকেও বেশি। উনি বিয়ে-থা করেননি, আত্মীয়-স্বজনও নেই। আগে বাসুদেব পাল নামে ওঁর একজন বন্ধু ওঁরই সঙ্গে থাকতেন আর মৌলানা আজাদ কলেজে পড়াতেন। বছর কয়েক হলো তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে বদলি হয়ে গিয়েছেন। এখন সেখানেই থাকেন। তিনি গণেশকাকুর কয়েকটা কেস-হিস্ট্রি নিয়ে বই লিখেছেন। আরও একটা কথা এই সুযোগে বলে নিই, মিতুল নামে একটা মেয়ে গণেশকাকুকে কয়েকটা মামলায় সাহায্য করলেও এখন থেকে আমি আর আমার বোনই হচ্ছি ওঁর স্থায়ী সহকারী। আমাদের পোষা বাঁদর সুন্দরকেও একজন সহকারী বলা চলে, কেন না তদন্তের সময় সে-ও আমাদের সঙ্গে থাকে।

২ এপ্রিল। শনিবার। সন্ধ্যে।

আমি আর বুড়ি গণেশকাকুর বসবার ঘরে গিয়ে দেখি গণেশকাকু একজন মক্কেলের সঙ্গে কথা বলছেন। গণেশকাকু পরিচয় করিয়ে দিলে জানতে পারলাম ওঁর নাম গোপাল জোয়ার্দার। ওঁর বাড়ি উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দ রোডে। পেশা অধ্যাপনা। উনি ওঁর ভাইঝি পুতুলের মৃত্যুরহস্য উদঘাটনের জন্য গণেশকাকুর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছেন।

ভদ্রলোকের বয়স আটাশ-তিরিশ। গায়ের রঙ কালো। উচ্চতা প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট। স্বাস্থ্য মোটামুটি। মুখশ্রী সুন্দর। চশমা থাকলেও বোঝা যাচ্ছে ওঁর চোখ দুটো বড়ো। পরনে ধুতি। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি। মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা। বাঁ দিকে সিঁথি। পায়ে চামড়ার চটি, চকচকে পালিশ করা। ধুতি-পাঞ্জাবিও পাট-ভাঙা। দু-হাতের কোনো আঙুলেই আংটি নেই। উনি যে ট্রামে-বাসে আসেননি, ওঁর পোশাক-আশাকই তা বলে দিচ্ছে।

আমি আর বুড়ি গণেশকাকুর দু-পাশে দুটো চেয়ার দখল করে বসে পড়লাম।

গণেশকাকু বললেন, 'এদের সামনে আপনার সংকোচ করার কারণ নেই। এরা আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।' বলেই উনি দু-টিপ নস্যি নাকের ভেতর গুঁজে দিয়ে রুমাল দিয়ে নাক মুছলেন।

গোপালবাবু শুরু করলেন ঃ 'আমরা তিন ভাই। আমি ছোটো। বড়দার নাম নেপাল জোয়াদ্দার। মেজদার নাম ভূপাল। আর আমার নাম আগেই বলেছি।' একটু থেমে উনি ফের বললেন, 'বড়দা আর মেজদা দু-জনেই ম্যারেড। আমি বিয়ে করিনি। আমাদের একটা প্লাস্টিক কারখানা আছে। ধরতে গেলে আমার বড়দা নিজের চেষ্টাতেই কারখানাটাকে দাঁড় করিয়েছেন। এখন তার পুঁজি এক কোটির কাছাকাছি। ব্যবসার কাজে বড়দার ডান হাত ছিলেন মেজদা। আমার আবার ও-দিকটায় একেবারেই ঝোঁক নেই। লেখাপড়া ভালবাসি। ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি থেকে এম. এ পাস করে বছর পাঁচেক আগে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে জয়েন করি। এখনও সেখানেই প্রফেসারি করছি।'

বুড়ি এ-সময় বোকার মতন বলে উঠল, 'আপনি প্রফেসর! ছেলেমেয়েরা আপনাকে ভয় পায়?'

গোপালবাবু বললেন, 'তারা ভয় পায় কিনা জানিনে, তবে তুমি যে মাস্টারদের ভয় পাও না, সেটা তোমার কথা শুনেই বুঝে নিয়েছি। যাক গে, যা বলছিলাম, আমার বড়দা আর বড়োবৌদি মারা যান গেল বছর পুজোর সময়। দীঘা থেকে মোটরে ফিরছিলেন। কোলাঘাট ব্রিজের ওপর আসতেই একটা ট্রাক সামনের দিক থেকে এসে গাড়িটাকে ধাক্কা মারে। বড়দা-বড়োবৌদি ছিলেন সামনের সিটে। তাঁরা তক্ষুণি মারা যান। বড়দা নিজেই গাড়িটাকে ড্রাইভ করছিলেন। আমার ভাইঝি পুতুল বসেছিল পেছনের সিটে। সে বেঁচে যায়।'

গণেশকাকু বললেন, 'সে চোট পায়নি?'

'চোট একটু পেয়েছিল, কিন্তু যে রকম আশঙ্কা করা হয়েছিল, সেই তুলনায় কিছু না। খবর পেয়ে তার মামা বাগনান হসপিট্যালে যান। আমি আর মেজদাও যাই। বড়দা, বড়োবৌদি আর পুতুলকে এই হসপিট্যালে নিয়ে আসা হয়। এখানেই বড়দা-বড়োবৌদিকে ডেড বলে ডিক্লেয়ার করা হয় আর পুতুলকে ফার্স্ট এইড দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখান থেকেই পুতুলের মামা তাকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। তাঁর বাড়ি ভবানীপুরে বলরাম বসু ঘাট রোডে।'

গণেশকাকু বললেন, 'তারপর কী হলো?'

গোপালবাবু বললেন, 'গত ২৭ মার্চ পূজনবাবু পুতুলকে নিয়ে মোটরে চড়ে কৃষ্ণনগর বেড়াতে গিয়েছিলেন।'

'পূজনবাবু কে?' গণেশকাকু জানতে চাইলেন।

'পূজনবাবু হচ্ছেন পুতুলের মামা। তাঁর পদবি পাত্র।' একটু থেমে গোপালবাবু আবার বলতে লাগলেন, 'কৃষ্ণনগর থেকে ফেরার সময় রানাঘাটের কাছে চূর্ণীনদীর ব্রিজের পশ্চিমদিকে গাড়ি থামিয়ে পূজনবাবু পুতুলকে নিয়ে ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে নদীর শোভা দেখছিলেন। এমন সময় একটা ট্রাক এসে পুতুলকে চাপা দিয়ে চলে যায়। পূজনবাবু একচুলের জন্যে বেঁচে গেলেও পুতুলের ছোট্ট শরীরটা ট্রাকের চাকায় থেঁতলে যায়। সেই অবস্থায় পূজনবাবু পুতুলকে নিয়ে ছোটেন আনুলিয়া হসপিট্যালে। সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পোস্ট মর্টেমের পর পুতুলের ডেড-বডি রানাঘাটের স্বর্গদ্বার শ্মশানে সে-দিনই সৎকার করা হয়।' এ-পর্যন্ত বলে গোপালবাবু থামলেন।

গণেশকাকু শুধোলেন, 'ট্রাকটার কোনোও হদিস পাওয়া যায়নি?'

'তা গিয়েছে। ট্রাকের নম্বরটা পূজনবাবু দেখে নিয়েছিলেন। পুলিস ট্রাকটাকে খুঁজে পায় ফুলিয়া স্টেশনের কাছে পরিত্যক্ত অবস্থায়। তবে ড্রাইভারকে এখনও পর্যন্ত পুলিস অ্যারেস্ট করতে পারেনি। তার কোনো ট্রেস-ই পায়নি।'

'তার নামধাম জানা যায়নি?'

'ড্রাইভারটার নাম বিদ্যাধর প্রসাদ। আদি নিবাস বিহারের মুঙ্গের। এখনকার ঠিকানা ৩৯/৫ বিডন স্ট্রিট। ২৭ মার্চ সে ট্রাকভর্তি মাল নিয়ে করিমপুর যাচ্ছিল। রওনা হয়েছিল কলকাতার বড়োবাজার থেকে।' এ-পর্যন্ত বলে গোপালবাবু পকেট থেকে নিজের নাম-ঠিকানা লেখা একটা কার্ড গণেশকাকুর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'এতেই আমার বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম পাবেন। আমার ধারণা বড়দা-

বড়োবৌদি আর পুতুলকে কেউ ইচ্ছা করে ওইসব ট্রাকওয়ালাদের দিয়ে খুন করিয়েছে। তাই আমার একান্ত ইচ্ছে আপনি নতুন করে তদন্ত শুরু করুন। আসল খুনীকে খুঁজে বের করে আপনি যদি তার শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন, আমি আপনাকে আপনার ফিজ আর রাহাখরচের সঙ্গে আরও দশ হাজার টাকা বাড়তি দেব।'

গণেশকাকু বললেন, 'আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?' বলতে বলতে গোপালবাবুর হাত থেকে উনি কার্ডটা নিলেন।

'সন্দেহ অনেককেই করি। কিন্তু আমার হতে কোনো প্রমাণ নেই। কাজেই কারোর নাম আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। আপনি যদি দয়া করে কেসটা নেন—'

'ঠিক আছে, কেসটা নিলাম। আমার ফিজ হচ্ছে পাঁচ হাজার। কেসটা হাতে নেওয়ার সময় অর্ধেক নিই। বাকি অর্ধেক নিই তদন্তের কাজ শেষ হলে। রাহাখরচ আলাদা। সেটা অ্যাডভান্স নিই।'

গোপালবাবু রেডি হয়েই এসেছিলেন। একশ টাকার নোটে মোট পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। আড়াই হাজার অর্ধেক ফিজ বাবদ আর আড়াই হাজার মিসেলেনিয়াস বাবদ পেমেন্ট করলেন। তারপর গণেশকাকুকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। একটু পরেই একটা গাড়ির স্টার্ট নেওয়ার আওয়াজ পেলাম। ভদ্রলোক নিজস্ব গাড়িতে চড়েই এসেছিলেন। পরে জেনেছিলাম সেটা মারুতি।

৩ এপ্রিল। রবিবার। সকাল ৯টা।

আমি আর বুড়ি গণেশকাকুর সঙ্গে এলাম ২৮৯/২১ বলরাম বসু ঘাট রোডে। পুতুলের মামা পূজন পাত্র এখানেই থাকেন।

গণেশকাকু আগেই পূজনবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলেন। আমাদের আসার ব্যাপারটা গণেশকাকু ওঁকে তখনই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

পূজনবাবুর বাড়িটা দোতলা হলেও ছোটো। আমরা একতলায় বসার ঘরে বসলাম। আমাদের আসাটাকে যে উনি পছন্দ করছেন না, তা ওঁর হাবভাবেই বেরিয়ে পড়ছে।

আমরা তিনজনে বসতেই পূজনবাবু গণেশকাকুকে বললেন, 'চা চলবে?'

গণেশকাকু বললেন, 'না, থাক। যে-জন্যে এসেছি, সেটা আগে সেরে নিই। পুতুল তো আপনার ভাগনী। সে কবে কী ভাবে মারা যায় সেটা আমার জানা দরকার।'

পূজনবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে তাতে একটা লম্বা টান দিলেন। তারপর কায়দা করে ধোঁয়া ছেড়ে চাঁছা গলায় বললেন, 'যা বলার পুলিসকেই বলেছি। নতুন কথা কিছু বলার নেই।'

'ঠিক আছে, যে-কথা পুলিসকে বলেছেন, সেই কথাটাই যদি আমাকে বলেন, তাতেই চলে যাবে।'

'যদি না বলি?'

'তাতে আমার কাজটা একটু কঠিন হবে, কিন্তু সত্য চাপা থাকবে না। আপনি আর পুতুল দু-জনেই ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে চূর্ণীনদীর শোভা দেখছিলেন, অথচ ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে কেবল পুতুলই মারা গেল, আপনার গায়ে একটু আঁচড় পর্যন্ত লাগল না, এটা রীতিমতন রহস্যজনক ব্যাপার।'

'আমি তখন ব্রিজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকে মুখ করে একটা পালতোলা নৌকো দেখছিলাম। পুতুল যে কখন আমার পাশ থেকে সরে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, খেয়াল করিনি। খেয়াল হলো ট্রাকটা ওকে চাপা দিয়ে অস্বাভাবিক জোরে পশ্চিম দিকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়। তখনই দেখলাম রাস্তার ওপর পড়ে রয়েছে পুতুলের খেঁতলে যাওয়া শরীরটা। ট্রাকটার নম্বরটাও অবিশ্যি দেখে নিয়েছিলাম।'

'এমনও তো হতে পারে, ট্রাকটা যখন আপনাদের কাছে এসে পড়েছিল, তখন আপনি ইচ্ছা করে পুতুলকে ধাক্কা দিয়ে ট্রাকটার সামনে ফেলে দিয়েছিলেন?'

'কী বলছেন আপনি? আমি আমার ভাগনীকে চলন্ত ট্রাকের সামনে ফেলে দিয়ে খুন করেছি?'

'আপনি যে ফেলে দেননি, তার কোনো সাক্ষী আছে?'

'তা অবিশ্যি নেই।'

'ট্রাকটা যখন চাপা দিয়ে যায়, তখন ব্রিজের ওপর আর কেউ ছিল না?'

'কেউ ছিল না।'

'আপনি তখন কী করলেন?'

'পুতুলের থেঁতলে যাওয়া শরীরটা গাড়িতে তুলে নিয়ে আনুলিয়া হাসপাতালে গেলাম।'

'তারপর কী হলো?'

'পরীক্ষা করার পর ডাক্তাররা তাকে ডেড ডিক্লেয়ার করল।'

'এরপর কী হলো?'

'পোস্টমর্টেম হলো। তারপর রানাঘাট স্বর্গদ্বার শ্মশানে তার বডি দাহ করা হলো।'

'দাহ করার সময় পুতুলের আত্মীয়-স্বজনদের কে কে সেখানে উপস্থিত ছিল?'

'আমি একা।'

'পুতুলের কাকাদের খবর দেননি কেন?'

'দরকার মনে করিনি।'

'কত তারিখে পুতুল মারা যায়?'

'গত ২৭ মার্চ।'

'দাহ করা হয় কবে?'

'ওই ২৭ মার্চ তারিখেই রাত ১১টার সময় দাহ করা হয়।'

'আপনি কলকাতায় ফেরেন কবে?'

'২৮ মার্চ রাত ৮টার সময় বাড়ি পৌঁছই।'

'ধন্যবাদ।' এই বলে গণেশকাকু উঠে দাঁড়ালেন। আমি আর বুড়িও উঠে পড়লাম।

বাস-স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করার সময় গণেশকাকু মন্তব্য করলেন, 'কেস জন্ডিস।' বলেই উনি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

৪ এপ্রিল। সোমবার। বেলা ১টা।

পুতুলের ছোটোকাকার মারুতি গাড়িতে চড়ে আমি আর বুড়ি গণেশকাকুর সঙ্গে রানাঘাটের কাছেই আনুলিয়া হসপিট্যালে এলাম। পুতুলের ছোটোকাকাও এলেন। তিনিই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে এলেন। আমাদের পোষা বাঁদর সুন্দরও আমাদের সঙ্গে আছে।

যে ডাক্তার পুতুলকে দেখেছিলেন, গণেশকাকু প্রথমে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। তারপর কথা বললেন সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে। এরপর কিছুক্ষণ দারোয়ানের সঙ্গেও একান্তে কথা বললেন।

হসপিট্যাল থেকে আমরা এলাম চূর্ণীনদীর ব্রিজের কাছে। রানাঘাট শহরের দিক থেকে ব্রিজে ওঠার আগেই বাঁ-হাতে পড়ে একটা সিনেমা-হল আর কয়েকটা চায়ের দোকান। গণেশকাকু কয়েকজন দোকানদারের সঙ্গেও কথা বললেন। তারপর গাড়িটা রাস্তার একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা ব্রিজের ওপর চলে এলাম হাঁটতে হাঁটতে।

ব্রিজের দক্ষিণ দিকে রেলিং-এর কাছ ঘেঁষে আমরা চারজনেই দাঁড়ালাম। নদীর ফুরফুরে হাওয়ায় রোদের তেজ যেন উড়ে যাচ্ছে। নদীর ওপর দিয়ে কয়েকটা নৌকো ভেসে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একটা পালতোলা নৌকোও আছে। নৌকোটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দূরের একটা বাঁকে।

এমন সময় একটা ট্রাক পশ্চিম দিক থেকে পুবদিকে চলে গেল। ব্রিজটা সামান্য দুলে উঠল। লক্ষ্য করলাম ব্রিজটার দু'পাশেই আছে মানুষ চলাচলের পথ। মাঝখান দিয়ে গাড়ি যায়। মানুষ চলার পথ দুটো মূল রাস্তা থেকে প্রায় দেড় ফুট উঁচু। কোনো ট্রাকের পক্ষে এই উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা কোনো

মানুষকে চাপা দিয়ে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। চাপা দিতে গেলেই রেলিং-এ ধাক্কা লাগবে। সে-ক্ষেত্রে ট্রাকটার নদীর জলে পড়ে যাওয়াও অসম্ভব না।

গণেশকাকু বললেন, 'এখান থেকে কাউকে ধাক্কা দিয়ে চলন্ত ট্রাকের সামনে ফেলে না দিলে তার পক্ষে ট্রাকে চাপা পড়া সম্ভব না। আর যদি—না, থাক।'

ব্রিজের পশ্চিম দিকের মাথায় রাস্তার ওপর কয়েকটা ছোটো ছেলেমেয়ে কী একটা জিনিস নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করছিল। পুব দিক থেকে একটা গাড়ি হর্ন দিতেই ছেলেমেয়েরা রেলিং-এর ধারে ফুটপাথের ওপর উঠে গেল। ছেলেমেয়েগুলোর পোশাক-আশাকই বলে দিচ্ছে তারা বাপ-মাহারা অনাথ ভিখিরী। গণেশকাকু তাদের কাছে গিয়ে কী সব কথা বললেন, দূর থেকে বুঝতে পারলাম না। কিন্তু দেখতে পেলাম তাদের মারামারি থেমে গিয়েছে। গণেশকাকুর কথার উত্তরে তারা কী যেন বলছে।

আমাদের পোষা বাঁদর সুন্দর হঠাৎ বুড়ির কোল থেকে লাফ মেরে রেলিং-এর ওপর উঠে বসল। বুড়ি বলল, 'এই সুন্দর, নেমে আয়। নদীতে পড়ে গেলে আর বাঁচতে হবে না।'

পুতুলের ছোটোকাকা গোপাল জোয়াদ্দার বললেন, 'বাঁদরটার নাম সুন্দর বুঝি?'

সুন্দর হঠাৎ ব্রিজের নিচে নদীর পুব পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোকের দিকে তাকিয়ে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠল। লোকটাকে আমার চেনা-চেনা মনে হলো। গণেশকাকুরও নজর পড়ল লোকটার ওপর। উনি লম্বা পা চালিয়ে ব্রিজটার পশ্চিম মাথা থেকে পুব মাথার দিকে এগোতে লাগলেন। বুঝে নিলাম লোকটাকে ধরাই ওঁর উদ্দেশ্য। আমরাও তাঁর সঙ্গ নিলাম।

লোকটার মাথায় কাপড়ের টুপি। গায়ে রঙিন শার্ট। পরনে প্যান্ট। চোখে কালো চশমা। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। স্বাস্থ্য ভাল। সে যখন দেখল আমরা তাকে ধরার জন্য এগোচ্ছি, অমনি নদীর পাড় ধরে দক্ষিণ দিকে, যেদিকে শ্মশান আছে, ছুটতে লাগল।

আমরাও ছুটতে লাগলাম। সুন্দর ছোটার দিক থেকে আমাদের সবার সেরা। ও কয়েকটা লাফ মেরে লোকটার কাছে চলে যেতেই লোকটার স্বরূপ বেরিয়ে পড়ল। সে পকেট থেকে রিভলভার বের করে সুন্দরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। অল্পের জন্য গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। সুন্দর অমনি এক লাফে তার কাঁধে চেপে বসে হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

লোকটাকে কব্জা করে ফেলেই সুন্দর তার দু-গালে চটাপট চড়-চাপড় মারতে লাগল। লোকটা অনেক চেষ্টা করল সুন্দরকে কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলার। তাতে ফল হলো উল্টো। সুন্দরের হাতে সে মার খেল এক-তরফা। অবশেষে গণেশকাকু এগিয়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করলেন।

জেরা করে জানা গেল, তার নাম শিউপ্রসাদ। সে থাকে কলকাতায়। পেশায় ট্রাক-ড্রাইভার।

গোপালবাবুর পরনে ছিল ধুতি-পাঞ্জাবি। ওই বেশে ছুটতে অসুবিধা হওয়ায় তিনি সবার পিছনে পড়ে গিয়েছিলেন। হাঁফাতে হাঁফাতে আমাদের ধরে ফেলে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'আরে, এ যে আমাদের কোম্পানির লোক!'

চমকে উঠলেন গণেশকাকু। তিনি আবার পড়লেন শিউপ্রসাদকে নিয়ে। জেরার জবাবে শিউপ্রসাদ বলল, কলকাতা থেকে ট্রাক চালিয়ে মারুতির পেছন পেছন সে এখানে এসেছে। শুধু এটুকুই নয়, তার মুখ থেকে আরও এমন তথ্য পাওয়া গেল যার ফলে তাকে ছেড়ে দেওয়া গেল না।

এরপর আমরা এলাম শ্মশানঘাটে। গণেশকাকু শ্মশানের একজন লোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন। ২৭ মার্চ তারিখে পুতুলকে যেখানে সৎকার করা হয়েছিল, সেই জায়গাটাও উনি দেখে নিলেন। তারপর সেখান থেকে অল্প একটু ছাই তুলে নিয়ে কাগজে মোড়ক করে পকেটে রেখে দিলেন।

রানাঘাট থানার ও.সি. তাপস ব্যানার্জী গণেশকাকুর চেনা। তাঁর হাতে রিভলভার সমেত শিউপ্রসাদকে জিম্মা করে দিয়ে আমরা থানা পাড়াতেই সাহিত্যিক প্রবোধ বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়ে বসলাম। প্রবোধবাবু গণেশকাকুর পুরনো বন্ধু। ওঁর ছেলে ক্যাপটেন আর মেয়ে মৌও আমাদের বন্ধু হয়ে গেল।

গণেশকাকু প্রবোধবাবুর বাড়িতে আমাদের বসিয়ে রেখে ঘণ্টা-দুয়েকের জন্য বেরোলেন।

৬ এপ্রিল। বুধবার। সন্ধ্যে ৬টা।

জোয়াদ্দার-বাড়ি। ২২/এম, বিবেকানন্দ রোড। উত্তর কলকাতা।

পুতুল-রহস্য উদঘাটনের জন্য একতলার বৈঠকখানা-ঘরে বৈঠক বসেছে। সেখানে উপস্থিত আছেন পুতুলের বড়োকাকা ভূপাল জোয়াদ্দার, ছোটোকাকা গোপাল জোয়াদ্দার, মামা পূজন পাত্র, ডি. সি. ডি. ডি. সন্তোষ বিশ্বাস, লোকাল থানার বড়োবাবু অমল রায়চৌধুরী আর রানাঘাট থানার বড়োবাবু তাপস ব্যানার্জী। তা ছাড়া উপস্থিত আছি আমি, বুড়ি আর গণেশকাকু। গণেশকাকুই রহস্য উদঘাটন করলেন। তাঁরই পরামর্শে ডি. সি. ডি. ডি. সন্তোষ বিশ্বাস এই বৈঠকের ব্যবস্থা করেছেন।

সন্তোষ বিশ্বাসের অনুমতি নিয়ে গণেশকাকু উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, 'আপনারা সবাই নিশ্চয়ই জানেন, আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি পুতুল-রহস্য উদঘাটনের জন্যে। পুতুল কে? পুতুল হচ্ছে প্রয়াত নেপাল জোয়াদ্দারের একমাত্র মেয়ে—একমাত্র সন্তান।' একটু থেমে উনি ফের বললেন, 'পুতুল-মামলার তদন্ত করতে গিয়ে রানাঘাটের শ্মশানঘাট থেকে আমি একটু ছাই সংগ্রহ করেছি। পুতুলের স্মৃতি হচ্ছে এই ছাই, তবে একটা কথা আছে।'

ভূপালবাবু বললেন, 'কী কথা?'

গণেশকাকু বললেন, 'যেখানে পুতুলের বডি দাহ করা হয়েছিল, সেখান থেকেই এই ছাই আমি কুড়িয়ে এনেছি ঠিকই, কিন্তু এ-ছাই অন্যের ছাইও হতে পারে। তাতে অবিশ্যি রহস্য-উদঘাটনে কোনো অসুবিধে হবে না। এই ছাইয়ের সাহায্যেই আমি সত্যকে দেখাতে চাই।' এরপর উনি হেঁয়ালি করে বললেন—

'সে নেই, তাতে কী? দেখবে তাকে ভাই?
ভূত হয়ে আসবে সে উড়িয়ে দিলে ছাই।'

পূজনবাবু এ-সময় রীতিমতন রুষ্ট গলায় প্রশ্ন করলেন, 'তার মানে?'

'মানেটা বুঝতে গেলে জটিল, কিন্তু দেখতে গেলে সোজা।' গণেশকাকু বললেন। ওঁর গলায় হেঁয়ালিব সুর।

পুতুলের বড়োকাকা গুরুগম্ভীর মানুষ। তিনি বললেন, 'আমরা যাঁরা এখানে বসে আছি, তাঁরা সবাই কাজের মানুষ। কাজ ফেলে আমরা এখানে আপনার হেঁয়ালি শোনার জন্যে আসিনি। যা বলতে চান, স্পষ্ট করে বলুন।'

গণেশকাকু বললেন, 'দুঃখিত, আমি আপনাদের সামনে বক্তৃতা দিতে আসিনি। যা সত্যি, সেটাকেই দেখানোর জন্যে এসেছি।'

'সত্যিটা কী, সেটা আগে জানতে চাই।'

গণেশকাকু দু-টিপ নস্যি নাকের ভেতর গুঁজে দিলেন। তারপর বললেন, 'দেখলেই জানতে পারবেন। যাকে নিয়ে রহস্য, সে নিজেই এসে বলে দেবে।'

ভূপালবাবু বললেন, 'সে কে? পুতুল? তাকে কোথায় পেলেন?'

পূজনবাবু বললেন, 'তাকে তো ২৭ মার্চ তারিখে রানাঘাট শ্মশানে দাহ করা হয়েছে। আমি নিজে তার ডেড-বডি শনাক্ত করেছি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সৎকার করেছি।'

'বেশ তো, দেখাই যাক না পরীক্ষা করে। আপনারা অনুমতি দিলে মোড়কের ছাইটা আমি জানলা দিয়ে উড়িয়ে দেব।' বলতে বলতে গণেশকাকু কাগজের একটা মোড়ক পকেট থেকে বের করলেন।

ডি. সি. ডি. ডি. সন্তোষ বিশ্বাস বললেন, 'ছাই উড়িয়ে দিয়ে পুতুলকে তুমি এখানে আনতে পারবে? যদি পারো, উড়িয়ে দাও।'

'একটু চেষ্টা করে দেখি।' বলেই গণেশকাকু রাস্তার দিকের জানলাটার ধারে গিয়ে কয়েক সেকেন্ড

দাঁড়ালেন। তারপর মোড়কটা খুলে তার ভেতরের ছাই বাইরে উড়িয়ে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে বললেন, 'তিন-চার মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।'

সারা ঘরটা থমথম করতে লাগল। বুড়ি আমার কানে কানে বলল, 'গণেশকাকু যদি পুতুলকে আনতে না পারেন?'

আমি ওকে মৃদু ধমক দিয়ে বললাম, 'চুপ করে দেখে যা।'

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই একজন মাঝবয়েসী মহিলা বছর দশেকের একটা ফুটফুটে মেয়েকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। মেয়েটাকে দেখেই গোপালবাবু 'আমার পুতুল-মা' বলে চিৎকার করে ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলেন। তাই দেখে পূজনবাবুর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল আর ভূপালবাবুর মুখের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল।

ভূপালবাবু আগন্তুক মহিলার দিকে তাকিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'এর মানে কী? আপনি কে?'

মহিলাটি বললেন, 'আমি হচ্ছি রানাঘাট স্বর্ণময়ী বোর্ডিং গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস বাসন্তী বিশ্বাস। আর এই মেয়েটির নাম পুতুল জোয়াদ্দার। গত ২৮ মার্চ তারিখে পূজন পাত্র, মানে এই ভদ্রলোক (পূজনবাবুকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) পুতুলকে আমার স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আসেন। উনি বলেছিলেন মেয়েটির মা-বাবা নেই। উনিই এর গার্জেন। সম্পর্কে উনি এর মামা বলে জানিয়েছিলেন।'

গণেশকাকু ওঁকে একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'আপনি বসুন।'

বাসন্তীদেবী চেয়ারে বসার পর ফের বললেন, 'গত সোমবার গণেশবাবু আমার ওখানে গিয়ে পুতুলের সঙ্গে কথা বলেন। সেদিনই উনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন আজ এই ঠিকানায় আসতে। আমি পুতুলকে নিয়ে বাড়ির বাইরে ট্যাক্সির মধ্যে বসেছিলাম। ওঁর সংকেত পেয়ে তবেই ঢুকেছি।'

এরপর পুতুলের মুখ থেকে জানা গেল, যেদিন সে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হয়, তার আগের দিন তার মামা পূজন পাত্রের সঙ্গে তাঁরই গাড়িতে চড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। তারা কৃষ্ণনগর পর্যন্ত যায়। ও-সময় একটা ট্রাক তাদের গাড়িটাকে তাড়া করে। এর আগেও, সে কলকাতায় মামার বাড়িতে থাকতেই একটা ট্রাক বেশ কয়েকবার তাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। প্রত্যেকবারই অল্পের জন্যে সে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। মামাকে ব্যাপারটা জানাতে তিনি বলেছিলেন, ট্রাক চাপা দিয়ে তাকে খুন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার বাবা-মাকেও নাকি ট্রাকের ধাক্কায় খুন করা হয়েছিল। তাই বাঁচতে হলে তাকে কলকাতার বাইরে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে আর সেখানে থেকে লেখাপড়া শিখতে হবে। গত ২৭ মার্চ যখন সেই খুনে ট্রাকটা তাদের তাড়া করে, সেদিনও মামা-ভাগনীতে গাড়িতে বসে এরকম আলোচনা হয়েছিল।

পুতুল বলে চলল, 'রানাঘাটে চূর্ণীনদীর ব্রিজের ওপর রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে আমি আর মামা যখন নদীর শোভা দেখছিলাম, তখন একটা ট্রাক প্রায় আমারই বয়েসী একটা ভিখিরী মেয়েকে চাপা দিয়ে পশ্চিম দিকে পালিয়ে গেল। তখনই মামা বললেন সেই মেয়েটাকে পুতুল জোয়াদ্দার বলে চালিয়ে দিয়ে আমাকে কোনো বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। তাহলেই আমি বেঁচে যাব। মামার কথায় আমি রাজী হয়ে যাই। হাসপাতালের দারোয়ান আমাকে দেখে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। আমি গাড়ি থেকে তখন নামিনি। ভিখিরী মেয়েটাকে যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় আমি তখন গাড়ির মধ্যে বসেছিলাম। সেই রাত্তিরটা রানাঘাটের আদর্শ হিন্দু হোটেলে থাকি। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া করি। পরদিন সকাল এগারোটা নাগাদ স্বর্ণময়ী বোর্ডিং গার্লস স্কুলে গিয়ে ভর্তি হই। তারপর আজ বড়দির সঙ্গে ট্রেনে চড়ে প্রথম শিয়ালদা আসি। তারপর সেখান থেকে ট্যাক্সিতে চেপে বাড়িতে আসি। আমার মামা যা করেছেন, আমাকে বাঁচানোর জন্যেই করেছেন। ওঁর কোনো দোষ নেই।' ক্লাসের পড়া বলার মতন পুতুল গড়গড় করে কথাগুলো বলে গেল।

'যে ট্রাকটা তোমাকে কয়েকবার চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তুমি তার নাম্বার দেখেছ?' ডি. সি. ডি. ডি. সন্তোষবাবু জানতে চাইলেন।

পুতুল বলল, 'দেখেছি। তবে গাড়িটা একই থাকলেও নাম্বার সব সময় এক থাকত না।'

'তার ড্রাইভারকে দেখেছ?'

'দেখেছি। তার মাথায় কখনও থাকত পাগড়ি, কখনও টুপি। একবার খালি মাথায় ছিল, তখন দেখেছিলাম বিরাট টাক, আর চোখ দুটো খুব বড়ো বড়ো।'

গণেশকাকু এ-সময় বললেন, 'তুমি যদি ড্রাইভারটাকে আবার দেখো, চিনতে পারবে?'

পুতুল বলল, 'পারব।'

গণেশকাকু ইশারায় লোকাল থানার বড়োবাবুকে কী একটা বলতেই তিনি দরজার কাছে গিয়ে কাউকে ভেতরে আসার জন্য বললেন। অমনি দেখা গেল একজন কনস্টেবল ড্রাইভার শিউপ্রসাদকে হাতকড়া পরানো অবস্থায় ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন। শিউপ্রসাদের মাথায় সত্যিই বিরাট টাক।

জেরার মুখে শিউপ্রসাদ স্বীকার করল পুজোর সময় ট্রাক নিয়ে দীঘার পথে নেপাল জোয়াদ্দারের অ্যামবাসাডারটাকে সে তাড়া করে। গাড়িতে নেপালবাবু, তাঁর স্ত্রী আরতি দেবী আর মেয়ে পুতুল ছিল। সে শিখ-পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশে ছিল বলে নেপালবাবুরা তাকে চিনতে পারেননি। দীঘায় যাওয়ার পথে শিউপ্রসাদ সুবিধে করতে না পারলেও ফেরার পথে কোলাঘাট ব্রিজের ওপর সে ওত পেতে দাঁড়িয়েছিল। অ্যামবাসাডারটাকে ধাক্কা মেরে উল্টে ফেলে দিয়ে কলকাতা পালিয়ে আসে। এ-সময় তার ট্রাকে ঝুটো নাম্বার প্লেট বসানো ছিল। সে আরও স্বীকার করল, পুতুলকে ট্রাকে চাপা দেওয়ার অনেকবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু একবারও সুবিধে করতে পারেনি। গত ২৭ মার্চ যে ট্রাকটা রানাঘাটের কাছে চূর্ণীনদীর ব্রিজের ওপর ভিখিরী মেয়েটাকে চাপা দিয়েছিল, তার ড্রাইভার সে ছিল না, অন্য কেউ ছিল। তাকে শিউপ্রসাদ চেনে না।

গণেশকাকু বললেন, 'সবই তো বললে, কিন্তু কার হুকুমে তুমি পুতুলের বাবা-মাকে খুন করেছ আর পুতুলকে একাধিকবার খুন করার চেষ্টা করেছ, তা তো বললে না?'

এমন সময় ভূপাল জোয়াদ্দার বলে উঠলেন, 'কার হুকুমে আবার, ও এসব করেছে আমাদের ছোটোবাবু গোপালবাবুর হুকুমে। গোপাল চাইছিল আমাদের সবাইকে মেরে ফেলে একা জোয়াদ্দার পরিবারের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হতে।'

গোপালবাবু কিছু বলতে গেলেন। কিন্তু তার আগেই শিউপ্রসাদ উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'মিথ্যে কথা। ছোটোবাবু খুবই ভাল লোক। বড়োবাবুও ভাল লোক ছিলেন। বদমায়েশ হচ্ছেন আপনি। আপনিই তো আমাকে টাকা দিয়ে এ-সব করিয়েছেন।'

ভূপালবাবুও চিৎকার করে উঠলেন, 'কোনো প্রমাণ আছে?'

শিউপ্রসাদ বলল, 'আছে। আমি পাপকাজে নামার আগে আটঘাট বেঁধে নেমেছিলাম। প্রমাণ যে কোনোদিন দরকার হতে পারে সেটা অনুমান করেই ছিলাম। মরতে যদি হয়, আপনাকে নিয়েই মরব। হুজুর, এই যে সে-ই প্রমাণ।' বলেই শিউপ্রসাদ কাগজে প্যাক করা একটা জিনিস গণেশ হালদারের হাতে তুলে দিল।

ডি. সি. ডি. ডি. সন্তোষ বিশ্বাস জানতে চাইলেন, 'কী ওটা?'

শিউপ্রসাদ বলল, 'ক্যাসেট। ওতেই আমার আর মেজোবাবুর কথাবার্তা সব টেপ করা আছে।' একটু থেমে সে ফের বলল, 'আরও একটা কথা—সেদিন আমার হাতে যে রিভলভারটা দেখেছিলেন, সেটাও ওই মেজোবাবু আমাকে দিয়েছিলেন আপনাদের ভয় দেখানোর জন্যে।'

সবাই শিউপ্রসাদের কথা শুনছেন, এই ফাঁকে ভূপাল জোয়াদ্দার উঠে ঘর থেকে পালানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু পালাতে তিনি পারলেন না। তার আগেই সন্তোষ বিশ্বাসের নির্দেশে লোকাল থানার বড়োবাবু অমল রায়চৌধুরী এগিয়ে গিয়ে ভূপালবাবুর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

পরে গণেশকাকু আমাকে আর বুড়িকে বলেছিলেন, গত সোমবার রানাঘাটে সাহিত্যিক প্রবোধ বিশ্বাসের বাড়িতে আমাদের বসিয়ে রেখে উনি স্বর্ণময়ী বোর্ডিং স্কুলে গিয়েছিলেন পুতুলের খোঁজ নিতে। আনুলিয়া হসপিট্যালের দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলেই উনি বুঝতে পেরেছিলেন পুতুল বেঁচে আছে, তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

[ফাল্গুন ১৪০১]

অর্কর গোয়েন্দাগিরি

মঞ্জিল সেন

দেশপ্রিয় পার্ক থেকে খেলে ফেরার পথে অর্ক আর বালচন্দ্রনের মধ্যে তর্ক বেধে গেল, এড্‌গার অ্যালান পো'র দুঁদে বড় গোয়েন্দা, না কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস। ডিটেকটিভ বই দু'জনেরই বিস্তর পড়া, কেউই পিছু হঠতে রাজী নয়। হঠাৎ তর্কের মাঝখানে অর্ক থেমে গেল, ওর কপালে ফুটে উঠল কয়েকটা রেখা। দু'জন লোক পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, খুব যেন তাড়া আছে এমন ভাবে হাঁটছে। একজনের কোলে বছর তিনেকের একটি ফুটফুটে মেয়ে। মেয়েটির হাতে একটা ফাইভ স্টার ক্যাড্‌বেরি, সেটা সে পরম আনন্দে চুষছে।

পার্কে খেলতে আসবার সময় অর্ক ওই মেয়েটিকে কয়েকবারই দেখেছে। পার্কের কাছেই একটা মস্ত বড় বাড়ি থেকে মেয়েটি তার বারো-তেরো বছরের দাদা আর দশ-এগারো বছরের দিদির সঙ্গে পার্কে আসে। একদিন শিশু-উদ্যানেও ওদের দেখেছে অর্ক, বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে ওর দিদি দোলনায় বসেছিল, আর দাদা দোল দিচ্ছিল। ওরা যে বাচ্চাটির দাদা-দিদি তা চেহারা থেকেই বোঝা যায়। তিনজনেই খুব ফর্সা আর সুন্দর দেখতে। কিছুদিন হলো ওদের বাড়িটায় রঙ করা হয়েছে। দোতলার বারান্দা অর্কিড আর গোলাপের টব দিয়ে সাজানো।

লোক দুটি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কেমন যেন সন্দেহজনক আচরণ। ওদের আগে কখনও দেখেনি অর্ক। বাচ্চার দাদা-দিদিই বা সঙ্গে নেই কেন? লোক দুটি রাস্তা পেরিয়ে ওপারে গেল, একটা চলন্ত ট্যাক্সির দিকে হাত তুলে থামতে বলল। ট্যাক্সিটা কিন্তু থামল না। লোক দুটো যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। ট্যাক্সির জন্য ছুটোছুটি করছে। তখুনি অর্কের মাথায় জেগে উঠল একটা ভয়ানক সম্ভাবনা। ওরা কি মেয়েটিকে নিয়ে পালাচ্ছে! শিশু-উদ্যানে ভিড়ের মধ্যে ওর দাদা-দিদি যখন অন্যমনস্ক তখন মেয়েটিকে সরিয়ে ফেলেছে! যাতে না কাঁদে তাই ক্যাড্‌বেরি ধরিয়ে দিয়েছে হাতে!

অর্ক হঠাৎ চুপ করে যাওয়াতে বালচন্দ্রন একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, তারপর ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে লোক দুটিকে দেখে বুঝতে পারল কিছু একটা ঘটেছে।

'হোয়াটস দ্য প্রবলেম?' ও জিগ্যেস করল।

'লোক দুটো নিশ্চয়ই ওই বাচ্চাটাকে কিড্‌ন্যাপ করছে', অর্ক বলল।

লোক দুটি ততক্ষণে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে ভেতরে উঠে বসেছে। ট্যাক্সি রাসবিহারী মোড়ের দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু ট্র্যাফিক সিগন্যালের জন্য থেমে গেছে। অর্ক বালচন্দ্রনের একটা হাত ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'কাম্ অন্।'

একটা খালি ট্যাক্সি ওদের সামনেই থেমেছিল, সামনে ট্র্যাফিক সিগন্যালের জন্য পর পর গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে গিয়ে নিচু গলায় অর্ক বলল, 'ওই ট্যাক্সিতে দু'জন লোক একটা বাচ্চা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, আমরা ওদের ফলো করতে চাই। যাবেন?'

'বাচ্চা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে!' ট্যাক্সি ড্রাইভারের দু'চোখে একটা অনিশ্চয়তার ছায়া খেলে গেল। 'কি করে বুঝলে?'

'আমি মেয়েটিকে চিনি,' অর্ক জরুরী গলায় বলল, 'ওর দাদা আর দিদির সঙ্গে পার্কে বেড়াতে আসে। ওই লোক দুটিকে আগে কখনও দেখিনি। মনে হচ্ছে দাদা-দিদির চোখ এড়িয়ে ওরা ওকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।'

ততক্ষণে সিগন্যাল পেয়ে সব গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

'উঠে পড়' ড্রাইভার বলল। একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশা তাকেও যেন পেয়ে বসেছে।

'আপনি ভাড়ার জন্য ভাববেন না,' গাড়িতে উঠতে উঠতে অর্ক বলল, 'আমরা এই ট্যাক্সি করেই বাড়ি ফিরব, তখন ভাড়া দিয়ে দেব। আর ওদের যদি ধরতে পারি তবে তো কথাই নেই—'

'ঠিক আছে,' ড্রাইভার বলল, 'ও নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না...আমি ট্যাক্সিটার পিছু নিচ্ছি, তোমরাও নজর রাখ, যাতে ভিড়ের মধ্যে চোখের আড়াল না হয়ে যায়।'

'ওরা জানে না যে আমরা ওদের ফলো করেছি,' অর্ক বলল, 'সেই সুবিধেটুকু আমাদের পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে।'

আগের ট্যাক্সিটা চেতলা ব্রিজ পেরিয়ে সোজা গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরল। দুর্গাপুর ব্রিজ হয়ে, নিউ আলিপুরের ভেতর দিয়ে, ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে পড়ল বেহালায়। ট্রাম ডিপোকে বাঁ পাশে রেখে ট্যাক্সিটা চলেছে ব্রাহ্মসমাজ রোড ধরে।

ওরা লক্ষ্য করছিল সামনের ট্যাক্সির আরোহী দু'জন মাঝে মাঝেই পেছনের কাচ দিয়ে দেখছিল। অর্কদের ট্যাক্সির ড্রাইভারও সেটা লক্ষ্য করেছিল, তাই সে যতদূর সম্ভব দু'একটা গাড়ির পেছনে নিজের গাড়িকে রাখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু একবার কিছুক্ষণের জন্য আগের ট্যাক্সির পেছনে আর কোনো গাড়ি না থাকায় ওদেরটা একা হয়ে পড়ল। একটা দারুণ উৎকণ্ঠায় মন ভরে গেল অর্কদের। দুষ্টু লোক দু'জন কি বুঝতে পেরেছে যে ওদের অনুসরণ করা হচ্ছে!

হঠাৎ সামনের ট্যাক্সিটা ডান দিকের একটা গলিতে ঢুকল। অর্কদের ড্রাইভারও পিছু নিল। এবার আর ফাঁকি দেবার উপায় নেই, লোক দুটো পেছন ফিরে ওদের গাড়িটা লক্ষ্য করে কি যেন বলাবলি করল, অন্তত তাই মনে হলো অর্কদের। ওদের ড্রাইভার গাড়ির গতি একটু কমিয়ে দিয়ে পিছিয়ে পড়ল, বেশি কাছাকাছি না যাওয়াই ভাল। ওদের কাছে বোমাটোমাও থাকতে পারে। খানিকটা গিয়ে সামনের গাড়িটা বাঁ দিক ঘেঁষে থামল।

'আপনি গাড়ি থামাবেন না,' অর্ক ড্রাইভারকে বলল, 'মনে হয় ওরা সন্দেহ করেছে। আমরা এগিয়ে সুবিধেমতো একটা জায়গায় থামব যাতে ওদের ওপর নজর রাখতে পারি।'

'ঠিক আছে,' ড্রাইভার জবাব দিল।

ওরা যখন ওই ট্যাক্সিটার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, অর্ক আর বালচন্দ্রন আড়চোখে তাকিয়ে দেখল একজন পেছনের সীটের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওদের গাড়ির ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করছে, আরেকজন বাচ্চাকে আঁকড়ে ধরে আছে। বাচ্চাটার কান্নার শব্দ ওদের কানে এল।

খানিকটা এগিয়েই রাস্তাটা আবার ডান দিকে মোড় নিয়েছে। অর্কর নির্দেশমতো গাড়িটা সেই গলিতে ঢুকল! তারপর একটা বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে অর্ক ড্রাইভারকে বলল, 'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমরা দু'জন গিয়ে দেখি ওরা কোন দিকে যায়।'

'উঁহু, তোমরা ছেলেমানুষ,' ট্যাক্সি থেকে নামতে নামতে ড্রাইভার বলল, 'চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই।'

ওরা হেঁটে ফিরে চলল। যেখানে আগের ট্যাক্সিটা থেমেছিল, এখন সেখানে ওটা নেই, সেই লোক দু'জনকেও চোখে পড়ল না। ওরা খুব হতাশ হয়ে পড়ল। এদিক-ওদিক তাকিয়েও দুষ্টু লোকদের কোনো হদিস পাওয়া গেল না। ট্যাক্সি যেখানে থেমেছিল তার বাঁ দিকে একটা সরু গলি দক্ষিণ বরাবর চলে গেছে। লোক দুটো নিশ্চয়ই ওই পথে পালিয়েছে।

ওই গলির মুখ একটু ছাড়িয়ে উল্টোদিকে একটা বাড়ির রকে সাত-আটজন তরুণ আড্ডা দিচ্ছিল। পনেরো থেকে সতেরো-আঠারো সব বয়সের ছেলেই আছে সেই দলে। অর্ক তাদের দিকে এগিয়ে গেল, একজনকে লক্ষ্য করে বলল, 'দাদা, একটু আগে এখানে একটা ট্যাক্সি থেমেছিল, আপনারা কেউ দেখেছিলেন?'

'কেন, তা দিয়ে তোমার কি দরকার?' একজন রুক্ষ গলায় পাল্টা প্রশ্ন করল।

'কি মতলব তোমার?' আরেকজন বলল, 'কি নাম তোমার, থাক কোথায়?'

'আমার নাম অর্ক চৌধুরী, আমি থাকি বালিগঞ্জের দিকে,' অর্ক একটু থতমত খেয়ে জবাব দিল।

'বালিগঞ্জ! তা কি মতলবে এসেছ চাঁদু,' আরেকজন বলল, 'কোথায় পা ফেলেছ জান?'

আসলে ওরা এ পাড়ার মাতব্বর, নিজেদের ক্ষমতা জাহির করবার সুযোগ ছাড়বে কেন!

'যে ট্যাক্সিটার কথা আমি বলছি', অর্ক এবার গুছিয়ে বলল 'সেটায় দু'জন গুণ্ডা এক বাচ্চা মেয়েকে দেশপ্রিয় পার্ক থেকে চুরি করে এনেছে। আমরা ট্যাক্সিটাকে ফলো করে এসেছি...ওরা বুঝতে পেরেছিল তাই আমরা আমাদের ট্যাক্সি এখানে থামাইনি, ওই মোড়ের কাছে গিয়ে থামিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে এসে সেই ট্যাক্সিটাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'অর্ক!' হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন কিশোর বলে উঠল, 'মানে, গোয়েন্দা অর্ক! কাগজে যার কাহিনী ছাপা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ,' একটু লাজুক মুখে জবাব দিল অর্ক।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য গেল বদলে। তরুণের দল অর্ককে সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল, একজন বলল, 'হ্যাঁ, একটা ট্যাক্সিকে থামতে দেখেছি। দু'জন লোক গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে ওই গলির মধ্যে ঢুকেছিল। ভাড়া নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে একটু যেন কথা কাটাকাটি হয়েছিল, বাচ্চাটা কাঁদছিল। তারপর ট্যাক্সিটা চলে গিয়েছিল। ওটার নম্বরটা খেয়াল করিনি।'

'ডব্লু. বি. টি. ৮৭০৫,' অর্ক বলল।

ইতিমধ্যে বালচন্দ্রন আর ওদের ট্যাক্সির ড্রাইভার ওখানে এসে গেছে, অর্ক ওদের পরিচয় করিয়ে দিল।

ছেলেরাই ওদের নিয়ে ওই গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল, যার সঙ্গেই দেখা হলো তাকেই জিগ্যেস করল এক বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে দু'জন লোককে যেতে দেখেছে কিনা। গলিটায় আলো তেমন নেই, সন্ধ্যেও হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, লোক চলাচল তেমন ছিল না, বিশেষ সুবিধে হলো না। তবে গলিটা ওধারে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে মোড়ের মাথায় একটা চায়ের দোকানের মালিক বলল দু'জন লোককে একটা বাচ্চা নিয়ে যেতে দেখেছে। তারা হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছিল। বাচ্চাটা একটা লালিপপ্ চুষছিল। দোকানের মালিক আর লক্ষ্য করেনি। অনেক চেষ্টা করেও লোক দুটির সম্বন্ধে আর কিছু জানা গেল না, কোনদিকে গেছে তাও না।

তরুণ দলের কাছে বাচ্চার এবং লোক দু'জনের চেহারার বর্ণনা দিয়ে আর খোঁজখবর করতে অনুরোধ করে অর্ক আর বালচন্দ্রন ফিরে চলল। একটা হতাশায় অর্কর মন ভরে গেছে। চোখের সামনে থেকেই গুণ্ডারা মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে গেল!

বালচন্দ্রন ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, 'ডোন্ট ওরি, উই শ্যাল ক্যাচ দেম।'

এদিকে আটটা বেজে গেছে, বাড়িতে নিশ্চয়ই চিন্তা করছে। ওরা প্রথমে বাড়ি গেল। দু'জনের বাড়িতেই খোঁজ খোঁজ পড়ে গিয়েছিল, আরেকটু দেরি হলেই থানায় গিয়ে রিপোর্ট করতেন অর্ক আর বালচন্দ্রনের বাবা। অর্ক বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রথমেই ট্যাক্সি ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিল। সে বলল, 'আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারলাম না, ভাড়া নিতে খারাপ লাগছে। কিন্তু ট্যাক্সির মালিক আমাকে ছাড়বে না, তাই নিতে হচ্ছে। তবে যদি কখনও ট্যাক্সির দরকার

হয়, যে সময়েই হোক, এই ঠিকানায় খোঁজ করবে, যত অসুবিধেই হোক গাড়ি নিয়ে আমি ঠিক হাজির হবো।'

অর্ক ওর বাবাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। তিনি তক্ষুনি গাড়ি করে অর্ককে নিয়ে মেয়েটির বাড়ি রওনা হলেন।

বাড়ির সামনে মানুষের জটলা, একটা পুলিশের গাড়িও চোখে পড়ল। অর্ক ওর বাবাকে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। সামনের ঘরেই একটা সোফায় এক মাঝবয়সী মহিলা মুখে আঁচল দিয়ে কাঁদছেন, একজন ভদ্রলোক বিমর্ষ মুখে তাঁর পাশে বসে আছেন। তাঁদের পাশে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চা মেয়েটির দাদা আর দিদি। রোজকার মতো ছোট বোনকে নিয়ে ওরা পার্কে গিয়েছিল, একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল, তারপরই দেখে পাশে বোন নেই। অনেক খুঁজেছে কিন্তু বোনকে পায়নি।

টালিগঞ্জ থানার ও. সি. কি সব নোট করেছিলেন। অর্ক আর ওর বাবাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'এ কি আপনারা!'

অর্ক আর ওর বাবার সঙ্গে ও. সি.-র এতদিনে একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে, বিশেষ করে অর্ককে তিনি স্নেহের চোখে দেখেন। এই কিশোর ছেলেটির বুদ্ধি আর সাহস তাঁর মনেও দাগ কেটেছে।

'এ বাড়ির যে বাচ্চা মেয়েটি চুরি হয়েছে', অর্ক ও. সি.-র মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সে সম্বন্ধে আমি কিছু খবর দিতে চাই।'

'সে কি!' ও. সি. যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'এ ব্যাপারে তুমি কি জান?'

অর্ক তখন গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

'সাব্বাশ!' ও. সি. ওর পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন, 'তুমি তো আমাদের পরিশ্রমের অনেকটাই বাঁচিয়ে দিলে। এই না হলে গোয়েন্দা অর্ক!'

বেহালা থানার ও. সি.-র সঙ্গে তিনি তখুনি যোগাযোগ করলেন, লোক দুটির চেহারার বর্ণনাও দিলেন। যেখানে ওদের শেষবার দেখা গিয়েছিল তার ধারে-কাছে ওদের আস্তানা হতে পারে বলে জানালেন। ট্যাক্সির নম্বরটাও অর্ক জানিয়ে দিল।

মেয়েটির বাবাকে আশ্বাস দিয়ে পুলিশ বিদায় নিল, অর্ক আর ওর বাবাও ফিরে গেলেন।

পরদিনই মেয়েটির বাবা ফোন পেলেন। এক লাখ টাকার বদলে মেয়েটিকে মুক্তি দেওয়া হবে। আর তা না হলে মেয়ের মরা মুখ দেখবেন বাবা। কোথায় কখন টাকা দিতে হবে তা পরে জানানো হবে। পুলিশের শরণাপন্ন হলে মেয়েকে আর ফিরে পাবেন না।

পুলিশ অবশ্য তৎপর হয়ে উঠল। বেহালা থানার ও. সি. ওই জায়গায় চর পাঠিয়ে লোক দু'জনের খোঁজ করতে লাগলেন।

ওদিকে অর্কর মাথায় তখন কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছে। বালচন্দ্রনকে নিয়ে ও টালিগঞ্জ থানার ও. সি.-র সঙ্গে দেখা করল। তিনি ওদের দেখে বললেন, 'এসো গোয়েন্দা কোম্পানি, তোমাদের কথাই ভাবছিলাম। কোনো খবর আছে নাকি? শুনেছ তো মিঃ বোস (বাচ্চা মেয়েটির বাবা) লাখ টাকার পরোয়ানা পেয়েছেন। উনি এক কোম্পানির ডিরেক্টার, পয়সাওলা লোক, এসব খবর চোররা রাখে দেখা যাচ্ছে।'

'আমরা সেই বিষয়েই আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি,' অর্ক বলল, 'লোক দুটো থাকে বেহালায়। সেখান থেকে এতদূরে বেছে বেছে ওই বাড়ির মেয়েকেই তারা চুরি করল, তাই মনে হয় বেশ ভেবে-চিন্তে প্ল্যান করে এ কাজ করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে,' ও. সি. সপ্রশংস কণ্ঠে বললেন।

'আমার ধারণা ও বাড়িরই কেউ ওদের খবর যুগিয়েছে।'

'রাইট ইউ আর,' ও. সি. প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'এ সম্ভাবনাটা আমার আগেই ভাবা উচিত

ছিল। এখন আমাদের দেখতে হবে ও বাড়ির কারও বেহালায় কোনো আত্মীয় বা জানাশোনা কেউ আছে কিনা।'

'আমারও মনে হয়ে সেদিক দিয়ে খোঁজখবর করলে ওই দুষ্টু লোকদের হদিস পাওয়া যাবে,' অর্ক বলল।

'গুড্ আইডিয়া', ও. সি. বললেন, 'চল দেখি বোস সাহেবের বাড়ি যাওয়া যাক।'

মিঃ বোস আপিস যাননি, বাড়িতেই ছিলেন। সমস্ত বাড়িতে যেন একটা শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ও. সি.-র বক্তব্য শুনে মিঃ বোস একটু চিন্তা করে বললেন, 'বেহালায় আমাদের কেউ নেই।'

'আপনার বাড়িতে যারা কাজ করে তাদের কেউ কি বেহালায় থাকে?' ও. সি. জানতে চাইলেন।

'যারা কাজ করে তাদের মধ্যে আছে একজন ওড়িয়া ঠাকুর, সে দু'বেলা রান্না করে চলে যায়, ভবানীপুরে দেশের লোকজনের সঙ্গে থাকে, বেহালায় তার কেউ আছে বলে জানি না। আর আছে কাত্যায়নী। বাংলাদেশের এক উদ্বাস্তু বিধবা, সংসারে তার আর কেউ নেই। আমাদের বাড়ি প্রায় কুড়ি বছর আছে, বেহালায় তার কেউ আছে বলে শুনিনি। তা ছাড়া একজন ঠিকে কাজের মেয়ে আছে। সে একবেলাই আসে, ঘর ঝাড়-মোছ করে। ও, হ্যাঁ, আমার ড্রাইভার রামকিষেণের নাম বলতে ভুলে গেছি। ছাপরা জেলায় বাড়ি, দশ বছরের উপর আমার গাড়ি চালাচ্ছে। এখানেই থাকে। বেহালায় তারও কেউ নেই।'

'আপনার ঠাকুর কত বছর কাজ করছে?'

'তা বছর পাঁচেকের বেশিই হবে, এর আগে ওর কাকা রান্নার কাজ করত, সে-ই ওকে দিয়ে দেশে চলে গেছে।'

'হুঁ। আর ঠিকে কাজ করার মেয়েটি?'

'সে অবিশ্যি অল্পদিন হলো ঢুকেছে, দু'মাসের বেশি হবে না। তবে সে আমাদের পাশের বাড়িতে এক বুড়ি কাজ করে, তার ভাইঝি—ওই বুড়ি অনেকদিন ধরে ও বাড়িতে কাজ করছে। ভাইঝিকে দেশ থেকে আনিয়েছে।'

'তার আগে যে ছিল, সে কি কাজ ছেড়ে দিয়েছে?' ও. সি. একটু ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন।

'না, তা ঠিক নয়,' মিঃ বোস জবাব দিলেন, 'আসলে সেই মেয়েটির হাতটান ছিল, এটা-ওটা সরাচ্ছিল। তা ছাড়া মাঝে মাঝেই ওর কাছে লোকজন দেখা করতে আসত, কাজের সময় এখানে তাদের আসাটা আমার স্ত্রীর পছন্দ ছিল না।'

'আই সী', ও. সি. আপন মনেই বললেন।

'যারা ওর কাছে আসত তাদের চেহারা বলতে পারেন?' অর্ক হঠাৎ প্রশ্ন করল!

মিঃ বোস ওর মুখের দিকে এক পলক তাকালেন, তারপর বললেন, 'একদিন একজনকে আমি যখন-তখন বাড়িতে আসার জন্য ধমকেছিলাম। তার গায়ের রঙ ময়লা, গাট্টাগোট্টা চেহারা, চুলের সামনেটা সাপের মতো ফণা আর বাঁ হাতে একটা লোহার বালা ছিল। লোকটাকে আমার ভাল লাগেনি, যাবার সময় কটমট করে তাকাচ্ছিল।'

'আপনি বলছেন সেই লোকটার চুল সাপের হুডের (hood) মতো ছিল', বালচন্দ্রন উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'যে দু'জন আপনার মেয়েকে চুরি করেছে তাদের একজনের মাথার চুল অমন ছিল, আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

'হ্যাঁ,' অর্ক সায় দিল, 'আমারও মনে পড়ছে, তার বাঁ হাতে একটা লোহার বালা ছিল।'

'সেই মেয়েটি কোথায় থাকে জানেন?' ও. সি. জিগ্যেস করলেন, 'না, সে খবরও রাখেন না?'

'না', ম্লান মুখে ঘাড় নাড়লেন মিঃ বোস।

'কি মুস্কিল!' ও. সি. মন্তব্য করলেন, তারপর বললেন, 'আপনাদের কাত্যায়নীকে একবার ডাকুন তো, তার কাছে মেয়েটি ঘরের কথা কিছু বলে-টলে থাকতে পারে।'

কাত্যায়নীর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। শক্ত কাঠির মতো চেহারা, মাথায় কদমছাঁট চুল। বাংলাদেশে সবকিছু হারিয়ে আসার পর এ বাড়িতে ঠাঁই পেয়েছিল, তাই এ বাড়ির ওপর তার একটা মায়া পড়ে গেছে।

ও. সি.-র প্রশ্নের জবাবে সে বলল সুবালা, মানে সেই কাজের মেয়েটি, টালিগঞ্জ ব্রিজ পেরিয়ে বাঁ-হাতি একটা বস্তিতে থাকে, তাকে বলেছিল। মেয়েটির স্বামী অনেকদিন নিরুদ্দেশ। কয়েক বাড়িতে ঠিকে কাজ করে সে পেট চালায়। বেহালায় ওর স্বামীর এক ভাই আছে, সেই নাকি মাঝে মাঝে দেখা করতে আসত।

ও. সি. তখুনি গাড়ি নিয়ে ছুটলেন। বস্তিটা খুঁজে বার করতে বেশি সময় লাগল না। পুলিশের গাড়ি দেখে ভিড় জমে গেল। ও. সি.-র প্রশ্নের জবাবে বস্তিবাসীরা জানাল, সুবালা কয়েক বছর ধরেই ওখানে ছিল, দিন কয়েক হলো ঘর ছেড়ে চলে গেছে। বলেছে, এক বড়লোকের বাড়িতে খাওয়া-পরার কাজ পেয়ে চলে যাচ্ছে। সাপের ফণার মতো চুলওলা লোকটির নাম বিশে, সে নাকি সুবালার স্বামীর কি রকম ভাই, মাঝে মাঝে সুবালার কাছে আসত। ইদানীং আরেকজনও তার সঙ্গে থাকত, ঢ্যাঙ্গামতো। একবার সুবালার সঙ্গে বস্তির মানুষদের ঝগড়া হওয়ায় বিশে বলেছিল বোমা মেরে বস্তি উড়িয়ে দেবে, আর তার সাথী একটা বড় ছোরা বার করে নাচাচ্ছিল। এটা হলো দিন পনেরো আগের ঘটনা, তার কয়েকদিন পরেই সুবালা ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

ও. সি. ফিরে এলেন। ওদের কোনো হদিস পাওয়া গেল না। তবে লোক দু'জনের এবং সুবালার চেহারার বিস্তারিত বর্ণনা এবং তাদের নাম বেহালা থানাকে জানিয়ে দেওয়া হলো। পুলিশের বেতার ভ্যানে ভ্যানেও খবর চলে গেল।

যে ট্যাক্সিতে বিশেরা মেয়েটিকে নিয়ে গিয়েছিল তার নম্বর ধরে ড্রাইভারের সন্ধান পাওয়া গেল। সে কিন্তু বিশেষ কিছু বলতে পারল না। দেশপ্রিয় পার্কের কাছ থেকে ওরা ট্যাক্সি ভাড়া করেছিল। লোক দু'জনের হাব-ভাব ড্রাইভারের ভাল লাগেনি, তবে মেয়েটিকে তারা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে এমন সম্ভাবনা তার মাথায় আসেনি।

এত করেও বেহালা থানা কিন্তু লোক দুটির কিংবা সুবালার সন্ধান পেল না। বেহালা মস্ত জায়গা, কোথায় যে ওরা গা-ঢাকা দিয়েছে পুলিশ খুঁজেই পেল না। হয় ওরা খুব সাবধান হয়ে গেছে, নয় বেহালা ছেড়ে অন্য কোথাও ঘাঁটি গেড়েছে। বেহালার আশ-পাশ অঞ্চলকেও ওদের সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হলো।

এদিকে মিঃ বোসের কাছে টাকা ঠিক করে রাখার জন্য চিঠি এসেছে, একটা অ্যাটাচি কেসে টাকাটা ভরে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। সময়, তারিখ এবং কোথায় তা যথাসময় জানতে পারবেন মিঃ বোস। খামের ওপর নিউ আলিপুরের ডাকঘরের ছাপ। বেহালার যে অঞ্চলে অর্করা শেষ ওদের দেখেছিল, তার কাছাকাছি যদি ওদের ঘাঁটি হয়, তবে চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলার জন্য নিশ্চয়ই ওদের একজনকে নিউ আলিপুর আসতে হয়েছিল। আসলে ঢ্যাঙ্গা লোকটা আর সুবালার মতো চেহারার মানুষ পথেঘাটে এত ঘুরছে যে, কাকে সন্দেহ করবে পুলিশ! তবে বিশের চেহারায় একটু বৈশিষ্ট্য আছে। কালো, গাট্টাগোট্টা আর চুলের সামনেটা সাপের ফণার মতো।

গরমের ছুটি শুরু হয়েছে, অর্কদের হাতে এক অখণ্ড অবসর। ও বালচন্দ্রনের সঙ্গে পরামর্শ করল, পুলিশের ভরসায় না থেকে ওরা নিজেরাই বেহালায় লোক দু'জনের সন্ধান করবে।

ওদের শেষ দেখা গিয়েছিল যে চায়ের দোকানের সামনে, সেখানে রাস্তাটা চওড়া নয়, একটা পাড়ার ভেতর দিয়ে গেছে। তবে সেই রাস্তা দিয়ে বড় রাস্তায় পড়া যায়। ও জায়গাটা পুলিশ তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালিয়েছে, সুতরাং নতুন করে কিছু জানবার ওদের নেই। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এল অর্কর। বালচন্দ্রনকে ও বলল, 'দ্যাখ্, আমার মনে হয় ওরা এখানেই কোথাও আছে।

বিশে এদিকেই থাকত, হয়তো কাছাকাছি কোনো বস্তিতে ঘর নিয়ে আছে। ওর পক্ষে বস্তিতেই থাকা সম্ভব। ওরা নিশ্চয়ই প্ল্যান করে মেয়েটিকে চুরি করেছে, সুবালা তার আগেই মেয়েটির ভার নেবার জন্য টালিগঞ্জের বস্তি ছেড়ে এখানে এসেছে। মেয়েটি ওকে চেনে, আগে বাড়িতে দেখেছে, তাই তার পক্ষে ওকে ভুলিয়ে রাখাও খুব কষ্ট নয়। সুতরাং আমরা এখানে কাছাকাছি কোথায় কোথায় বস্তি আছে তা খোঁজ করে সেখানে নজর রাখব।'

'গুড্ আইডিয়া', বালচন্দ্রন বলল।

প্রথম যে বস্তিটার খোঁজ ওরা পেল সেটা বড় রাস্তার ওপারে। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বস্তিটা। ঘরও অনেক। ওরা একটু দূরে একটা গাছের আড়াল থেকে বস্তির ওপর নজর রাখতে লাগল। ওরা এমনভাবে কথা বলছিল যেন দু'বন্ধু আড্ডা মারছে, কিন্তু চোখ বস্তির দিকে। কে আসছে যাচ্ছে তা খেয়াল রাখছে। প্রথম দিনটা বৃথাই গেল। কালো ষণ্ডামার্কা, সামনের চুল সাপের ফণার মতো, কিংবা ঢ্যাঙ্গা লোকটা ওদের নজরে পড়ল না। সুবালাকে ওরা দেখেনি তাই চেহারার বর্ণনা থেকে নাও চিনতে পারে। বস্তি থেকে অনেক মেয়েই আসছে, কাজে যাচ্ছে, তাদের কাউকেই সুবালা মনে হয় না।

সকালে দু'ঘণ্টা আর বিকেলে দু'ঘণ্টা ওরা পাহারা দিল। দ্বিতীয় দিন বিকেলে অর্ক বলল, 'এভাবে হবে না, কাউকে জিগ্যেস করতে হবে।'

একজন বুড়ি বস্তি থেকে বেরিয়ে ওদের দিকেই আসছিল। অর্ক আর বালচন্দ্রন একটু হেঁটে হঠাৎ যেন সেই বুড়ির মুখোমুখি হয়েছে এমন ভান করল, তারপর অর্কই বলল, 'আচ্ছা তুমি এই বস্তিতে থাক?'

'হ্যাঁ বাছা,' বুড়ি জবাব দিল, 'কেন বল তো?'

'ওখানে সুবালা নামে কোনো মেয়ে থাকে, বাড়ির কাজ-টাজ করে?'

'তা বলতে পারবনি বাছা, কত মেয়েই তো থাকে', বুড়ি বলল।

'এ মেয়েটি নতুন এসেছে, সঙ্গে এক বাচ্চা মেয়েও আছে।

'ও, তুমি বিশে সদ্দারের বুনের কথা বলছ?' বুড়ি এবার বলল, 'শ্বশুরবাড়িতে ঝগড়া করে ভায়ের কাছে এয়েছে, ওর মেয়েকে সেদিন বিশে নে এল। কালো মায়ের অমন ধলা বাচ্চা দেখিনি বাপু।'

'বিশে সর্দার!' বালচন্দ্রন এবার বলল।

'হ্যাঁগো, আমরা ওকে আড়ালে বলি সদ্দার, ওর দাপটে সবাই ডরায়। এই তো এক মাসটাক হলো এয়েছে। তা এসেই জোয়ান ছেলেদের নিয়ে ঘোঁট পাকাতেছে, আত্তিরে ওদের জ্বালায় ঘুমাতে পারিনে বাপু,' বুড়ি গজগজ করে বলল।

'আগে কোথায় ছিল?'

'তা জানিনে বাপু', বুড়ি এবার যেন একটু বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিল, 'তা তোমরা তার খোঁজ করতিছ কেন বাছা?'

'মানে', অর্ক বলল, 'সুবালা আগে আমাদের বাড়ি কাজ করত, না বলে চলে এসেছে, তাই ওকে আবার কাজের জন্য বলতে এসেছি।'

'অ! তা ও কি আর কাজ করবে? ভায়ের কাছে ভালই আছে। বিশের রোজগার তো কম নয়।'

'কি করে বিশে?' অর্ক জিগ্যেস করল।

'তা আমি জানিনে', বুড়ি মুখ নেড়ে বলল, 'কি দরকার আমার ওসব কথায়!'

'কোনটা বিশে সর্দারের ঘর?' অর্ক আবার জিগ্যেস করল।

'বস্তির ও মাথায় টিনের চালার ঘর, সামনের দেয়ালে নতুন অঙ্ করেছে গো, নীল অঙ্। চিনতে ভুল হবেনি।'

বুড়ি চলে গেল। তার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অর্ক বলল, 'বিশের খোঁজ যখন পাওয়া গেছে তখন আর ভাবনা নেই। আমি এখানে নজর রাখছি, তুই এবার ওই ছেলেদের ডেকে আন, আর হ্যাঁ, টালিগঞ্জ থানার ও. সি.-কে ফোন করে খবরটা দিতে ভুলিস না। বিশে লোক সুবিধের নয়।'

বালচন্দ্রন চলে যাবার পরেই ঢ্যাঙ্গা লোকটাকে দেখতে পেল অর্ক। বড় বড় পা ফেলে সে বস্তির দিকেই আসছিল। একেবারে অর্কর মুখোমুখি। এত আকস্মিক ঘটনা ঘটে গেল যে অর্কর কিছু করার ছিল না। ও শুধু মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল।

ঢ্যাঙ্গা লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল, তারপর আবার বস্তির দিকে হাঁটা দিল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অর্ক। ও বস্তির দিকে উল্টো মুখ করে গাছের তলায় বসল, বালচন্দ্রনের কত দেরি হবে কে জানে!

আচমকা কেউ ওর একটা হাত ধরে এক টানে দাঁড় করিয়ে দিল। ফিরে তাকিয়েই বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল অর্কর। কালো, ষণ্ডামার্কা চেহারার একটা লোক চোখ লাল লাল করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ঢ্যাঙ্গা লোকটা। এই তবে বিশে, কিন্তু চুল ছোট করে ছাঁটা, সাপের ফণাটা আর নেই।

ওর হাতে একটা মোচড় দিয়ে বিশে বলল, 'ব্যাপারখানা কি?'

'উঃ! আমার হাতে লাগছে,' অর্ক বলল, 'হাত ছেড়ে দিন।'

'ছেড়ে দেব!' হাতটা পিঠের কাছে মুচড়ে এনে বিশে বলল, 'সেদিন ট্যাক্সিতে আমাদের পেছন নিয়েছিল, আজ আবার এখানেও ধাওয়া করেছে!'

'আপনি কি সব বলছেন,' অর্ক সাহস করে বলল, 'আমি এখানে একজন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছি।'

'অপেক্ষা করাচ্ছি, চল আমাদের সঙ্গে।' অর্ককে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বস্তির দিকে নিয়ে চলল ওরা।

বস্তির কাছে আসতেই লোক জড়ো হতে শুরু করল।

'কি ব্যাপার বিশেদা?' কয়েকজন কমবয়সী ছেলে উৎসুক হয়ে জিগ্যেস করল।

'আমদের বস্তির কাছে ঘুরঘুর করছিল, মতলব ভাল নয় মনে হচ্ছে', বিশে জবাব দিল।

'আমি মোটেই ঘুরঘুর করছিলাম না,' অর্ক প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করল, 'আমার এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'ফের মিছে কথা,' গর্জন করে উঠল বিশে।

'ভদ্দরলোকের ছেলের এই কাণ্ড,' একজন বলল, 'আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, একটু ইস্তিরি করে দিই।'

'না, আমিই দেখছি, তোরা একটু নজর রাখিস, ওর সঙ্গে আরেকজন ছিল মনে হয়।'

অর্ককে বস্তির শেষ মাথায় একটা ঘরের সামনে এনে দাঁড়াল বিশে আর ঢ্যাঙ্গা লোকটা। যারা পেছন পেছন আসছিল তাদের এক ধমক দিয়ে হটিয়ে দিল বিশে, তারপর ঢুকে পড়ল ঘরে।

দুটো ঘর। সামনের ঘরে একটা তক্তপোশে বিছানা পাতা রয়েছে। তা ছাড়াও ঘরে আছে একটা পুরনো সোফা, দুটো লোহার চেয়ার আর একটা কাঠের গোল টেবিল।

ওকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল বিশে, তারপর পাশের ঘরে গেল। কার সঙ্গে যেন কথা বলল, অর্কর মনে হলো মেয়েলি গলা শুনতে পেল। বেরিয়ে এসে অর্কর দিকে তাকিয়ে বিশে বলল, 'এবার বল, এখানকার খোঁজ পেলে কেমন করে?'

'বলছি তো আমি একজন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম,' অর্ক জবাব দিল।

'হুঁ! সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি।'

বিশে একটা শক্ত সরু কাঠি নিয়ে অর্কর ডান হাতের আঙুলগুলোর ভেতর দিয়ে চালান করল, তারপর আঙুলে চাপ দিতে লাগল। ব্যথায় ককিয়ে উঠল অর্ক।

'কি এখনও মিছে কথা বলবে?' বিশে দাঁত বার করে হাসল।

অর্ক ভেবে দেখল, ওর সঙ্গে কথা বলে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারলে বালচন্দ্রন ছেলেদের নিয়ে এসে পড়বে, মিছিমিছি নির্যাতন সহ্য করে লাভ নেই। ও বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন।'

'পথে এসো বাবা,' ঢ্যাঙ্গা লোকটা এবার বলল, 'সেদিন ট্যাক্সিতে তোমার সঙ্গে আরেকজন ছিল, সে কোথায়?'

'সে আসেনি,' অম্লান বদনে বলল অর্ক।

'তুমি এখানে এলে কেমন করে?'

'আপনারা যে গলি দিয়ে ঢুকেছিলেন, আমরাও সেটা দিয়ে এসেছিলাম। ওখানকার কয়েকজন ছেলে আপনাদের আসতে দেখেছিল', অর্ক বলল, 'আমি ট্যাক্সিতে সত্যিই আপনাদের পিছু নিয়েছিলাম। যে মেয়েটিকে আপনারা ধরে এনেছেন, তাকে আমি চিনি, তাই আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

ওরা দু'জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

ঢ্যাঙ্গা বলল, 'তবে তো এর একটা বিহিত করতে হবে, ছেড়ে দেওয়া চলবে না।'

'সে পরে হবে', বিশে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এ বস্তির খোঁজ পেলে কেমন করে?'

'আমি একটু গোয়েন্দাগিরি করতে ভালবাসি,' অর্ক বলল, 'তাই আপনাদের খোঁজে এখানে ঘোরাঘুরি করছিলাম, একে-ওকে জিজ্ঞেস করছিলাম। এক বুড়িকে আপনার নাম আর চেহারার কথা বলতেই সে বলল এই বস্তিতে খোঁজ করে দেখতে। তাই ওই গাছটার তলায় এসেছিলাম।'

'আজই প্রথম জানতে পারলে?' ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বিশে জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ।'

'আর কেউ জানে না?'

'না।'

'সত্যি বলছ, না আবার দাওয়াই দেব?'

'না, না, সত্যি বলছি।'

বিশে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, তারপর ঢ্যাঙ্গাকে বলল, 'ওর হাত-মুখ বেঁধে ফ্যাল। রাতে বস্তায় পুরে পুকুরে ফেলে দেব।'

অর্কর শিরদাঁড়া দিয়ে যেন বরফগলা জল নেমে এল। কী সাংঘাতিক লোক! কেমন নির্বিকার মুখে বলল ওকে বস্তায় পুরে পুকুরে ফেলে দেবে। এত নিষ্ঠুর হয় মানুষ!

ওর হাত-মুখ বেঁধে ফেলা হলো।

এতক্ষণে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল সাতাশ-আঠাশ বছরের একটি মেয়ে। গায়ের রঙ শ্যামলা, ছোট ছোট চোখ, একটু খাঁদা নাক, কিন্তু খুব স্বাস্থ্যবতী। সে ঘরে ঢুকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল অর্কর মুখের দিকে। অর্ক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'এই তবে সেই ছেলে,' সুবালা ক্যাট ক্যাট করে বলল, 'এই বয়সেই পাখনা গজিয়েছে!'

'তুমি ভেতরে গিয়ে জিনিসপত্তর গুছিয়ে ফেল', বিশে বলল, 'ছেলেটার কথা কতদূর সত্যি কে জানে! আজ রাত্তিরেই সরে পড়তে হবে।'

'আপাতত খিদিরপুরে আমার ওখানেই থাকতে পার', ঢ্যাঙ্গা বলল, 'দু-একদিনের মধ্যেই একটা ঘর খালি হবে শুনেছি। তার আগে এই ছিনে জোঁকটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

'মেয়েটা বড় জ্বালাচ্ছে,' সুবালা বলল, 'আমি আর রাখতে পারছি না, ঘুমের ট্যাবলেট জলে গুলে খাইয়ে রাখতে হচ্ছে।'

'আর দু'দিন,' বিশে বলল, 'তারপর কেল্লা ফতে।'

অর্ক শিউরে উঠল। অতটুকুন মেয়েকে, ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়াচ্ছে, মরে যাবে না তো!

ঠিক তখুনি বালচন্দ্রন এসে হাজির হলো ওখানে, সঙ্গে জনা দশেক তরুণ।

'কি ব্যাপার!' বস্তির লোকজন একে একে এসে জড়ো হতে লাগল।

'এখানে বিশে বলে কেউ থাকে?' তরুণদের একজন জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ, কেন?' একজন বলল।

'আমাদের এক বন্ধুকে সে ধরে এনেছে। ওই রাস্তার ওপর যে দোকানগুলো আছে তাদের একজন দেখেছে।'

'ছেলেটা বদ মতলবে এখানে ঘোরাঘুরি করছিল,' বস্তির আরেকজন বলল।

'না, বিশে এক বাচ্চা মেয়েকে চুরি করে এনেছে, তার খোঁজেই সে এসেছিল,' তরুণদের একজন বলল।

'সে তো ওর বোনের মেয়ে,' একজন প্রতিবাদ করল।

'মিথ্যে কথা। আমরা এ পাড়ার ছেলে, দরকার হলে আরও লোকজন নিয়ে আসব।'

'এ কি জুলুম নাকি!' একজন মস্তান গোছের ছেলে এগিয়ে এল, 'ভদ্দরলোকের ছেলে বলে যা ইচ্ছে তাই করবে! ভাল চাও তো সরে পড়।'

'আমরা জুলুম করতে আসিনি, পুলিশও এখুনি এসে পড়বে,' তরুণদের মধ্যে বলিষ্ঠ চেহারার একজন এবার বলল, 'ওই বিশে একটা বাচ্চা মেয়েকে চুরি করে এনেছে, তার বদলে অনেক টাকা চাইছে। আর ক্যাবলা', সেই ছেলেটিকে লক্ষ্য করে সে বলল, 'তোকে আমি চিনি। সেবার বোমাবাজি করতে গিয়ে মার খেয়েছিলি, এর মধ্যেই ভুলে গেছিস।'

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল বিশে। তার হাতে একটা লাঠি। সে দু'হাতে লাঠিটা মাথার ওপর তুলে শূন্যে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'ভাগো সব এখান থেকে, নইলে আমি পেটাব বলছি। আমার কথা আর কাজ এক।'

তার মারমুখী ভাব দেখে বস্তির ছেলেরা ভরসা পেল। তরুণ দলকে ঘিরে ধরল। একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যায় আর কি, ঠিক সেই সময় কে একজন ছুটে এসে খবর দিল, পুলিশ। পুলিশের নাম শুনেই ভিড় পাতলা হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে সেখানে এসে পড়লেন বেহালা থানায় ও. সি.। তাঁর হাতে উদ্যত রিভলভার, পেছনে লাঠি উঁচিয়ে ছুটে আসছে একদল পুলিশ বাহিনী। টালিগঞ্জ থানার ও. সি. বালচন্দ্রনের ফোন পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেহালা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তখুনি ফোর্স নিয়ে বেরিয়ে পড়তে অনুরোধ করেছিলেন।

সামনের চুলটা কেটে ফেলায় বিশের মুখের আদলই বদলে গিয়েছিল, তবু ওকে চিনতে বালচন্দ্রনের ভুল হলো না। ও চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'হি ইজ ওয়ান অফ দেম্।'

ও. সি. বিশের দিকে রিভলভার উঁচিয়ে বললেন, 'লাঠি ফেলে দাও।'

বাধ্য ছেলের মতো সে হুকুম পালন করল।

'তোমরা এখানে কি করছ?' তরুণ দলের দিকে তাকিয়ে ও. সি. জিগ্যেস করলেন।

'আমিই ওদের ডেকে এনেছি,' বালচন্দ্রন এগিয়ে এল, 'আমি আর অর্কই এই কিড্ন্যাপারদের ফলো করেছিলাম, এই বস্তিটা আমরাই খুঁজে বার করেছি। এরা আমাদের বন্ধু, আমাদের হেল্প করতে এসেছে।'

'অর্ক কোথায়?' ও. সি. চারদিকে চোখ বুলোলেন।

'মনে হচ্ছে ওকে আটকে রেখেছে', তরুণদের একজন বলল, 'ঘরের ভেতরটা দেখলে হয় না?'

ঠিক তখুনি মাথার ঘোমটা অনেকটা টেনে বাচ্চাকে কোলে করে সুবালা ঘর থেকে বেরিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করল।

'বাচ্চাকে নিয়ে পালাচ্ছে,' বালচন্দ্রন চেঁচিয়ে উঠল, 'ক্যাচ হার!'

পুলিশের হাতে ধরা পড়ল সুবালা। বাচ্চা তখন ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বিশের দু'হাতে হাতকড়া পড়ল। ঢ্যাঙ্গা লোকটা ওই ডামাডোলে কখন যে সটকে পড়েছে কেউ লক্ষ্য করেনি।

ভেতরে হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় অর্ক সব টের পাচ্ছিল। বালচন্দ্রনের কাজে ও খুব খুশি। পুলিশ ঠিক সময় এসে না পড়লে একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে যেত।

ও. সি. ওকে নিজের হাতে মুক্ত করে হাসিমুখে বললেন, 'তুমিই গোয়েন্দা অর্ক?'

অর্ক লজ্জা পেল।

'আরে তোমার বাহাদুরির কথা টালিগঞ্জের ও. সি.-র মুখে আমি শুনেছি, তিনি তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আজ নিজের চোখে তোমার কেরামতি দেখলাম। তোমাদের সাহায্য না পেলে বাচ্চাকে উদ্ধার করা সহজ হতো না।'

ও. সি. ওর পিঠ চাপড়ে আবার বললেন, 'বিশেকে আমি জানি, একবার লক্-আপে পুরেওছিলাম। ব্যাটা পাঁকাল মাছের মতো ধূর্ত, কিন্তু এই বাচ্চা চুরির ব্যাপারে একবারও ওর কথা মনে হয়নি। আসলে ও ছিনতাইবাজ, এত বড় একটা কাণ্ড করে বসবে ভাবতেই পারিনি। ব্যাটা আবার মাঝে মাঝেই ভোল পাল্টায়। কখনও সাপের ফণার মতো চুল, কখনও একেবারে কদমছাঁট। তা ছাড়া ওর আসল নাম গণেশ, পুলিশের খাতায় তাই আছে। বিশে নামটাও আমাদের ডিসিভ করেছিল। এই ঠিকানাটাও নতুন। আগে ছিল সব্জি পাড়ায়, সেখানেও গোলমাল করেছিল, পাড়ার লোকেরা তাড়িয়ে দিয়েছে।'

বেহালা থানায় অপেক্ষা করছিলেন টালিগঞ্জ থানার ও. সি. আর মিঃ বোস ও তাঁর স্ত্রী। বালচন্দ্রনের ফোন পেয়েই ও. সি. বেহালা থানাকে জানিয়ে দিয়ে মিঃ বোসের বাড়ি ছুটেছিলেন। মেয়েকে ফিরে পেয়ে মা তাকে জড়িয়ে ধরে এমন কাঁদতে লাগলেন যে সবার চোখ সজল হয়ে উঠল।

মিঃ বোস দুই ও. সি.-র কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতেই, টালিগঞ্জ থানার ও. সি. অর্ক আর বালচন্দ্রনকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এ ছেলে দুটির কাছে, ওরা না থাকলে আপনার মেয়েকে উদ্ধার করা এত সহজ হতো না। বিশেষ করে অর্ক যদি ওদের কাছে আপনার মেয়েকে দেখে সন্দেহ না করত, তবে কোথায় আমরা খুঁজে বেড়াতাম! ও বড় হলে একজন বড় ডিটেকটিভ হবে।'

'আমার সঙ্গে ওর কন্ট্রাক্ট আছে,' বালচন্দ্রন এক ফাঁকে মুখ খুলল, 'আমি হব ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট। যেমন শার্লক হোমসের ডাঃ ওয়াটসন।'

'আমার বাড়িতে কাল সন্ধ্যেবেলা আপনাদের সবার নেমন্তন্ন, সেখানে ওদের আমি পুরস্কার দেব,' মিঃ বোস গদগদ কণ্ঠে বললেন।

ফেরার পথে অর্ক বলল, 'তুই ঠিক সময় ওদের নিয়ে এসে না পড়লে আমাকে ওরা মেরেই ফেলত।'

'গোয়েন্দাদের অত সহজে মরতে হয় না,' বিজ্ঞের মতো জবাব দিল বালচন্দ্রন।

[অগ্রহায়ণ ১৩৯৮]

জয়পুরী কঙ্কণ

অনিল ভৌমিক

সকালবেলা। বাইরে গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ শোনা গেল। ডোরবেল বাজবার আগেই রজত বসু দরজা খুলে বাইরের বারান্দয় এসে দাঁড়াল। বিতংস চৌধুরীকে নিয়ে রজত বসুর বন্ধু বিজন বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল—রজত, ইনিই বিতংস চৌধুরী, দ্য গ্রেট প্রাইভেট ডিটেকটিভ, মানে—

বিতংস বিজনের কাঁধে হাত দিয়ে থামাল। রজত নমস্কার করল। বিতংস দু-হাত একটু তুলল।

ড্রইংরুমে ঢুকে সোফায় বসল তিনজনে। বিতংস একনজর চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল—নতুন করিয়েছেন?

হ্যাঁ, দোতলার কাজ বাকি। মেটেরিয়ালসের যা দাম আর লেবারার তো—

রজতের কথা শেষ হবার আগেই বিতংস হেসে বলল—পরে শুনবো। আপনি বাড়ির সবাইকে এই ঘরে আসতে বলুন। রজত গলা চড়িয়ে ডাকল—নকুল। একটি যুবক ডোরাকাটা পায়জামা গেঞ্জি পরে ঘরে এল। রজত বলল—তোর বৌদিমণি, তিন্নি, বিন্নি মাসি সবাইকে এ ঘরে আসতে বল। নকুল চলে গেল। একটু পরেই বনশ্রী বসু, তাঁর দুই খুড়তুতো বোন তিন্নি-বিন্নি ঘরে ঢুকল। সোফায় আর শান্তিনিকেতনী দুটো মোড়ায় সবাই বসল। ভেতরের দিকে দরজার কাছে নকুল, রাঁধুনি মাসি দাঁড়াল। বিতংস বনশ্রীর দিকে তাকিয়ে বলল—আমি বিতংস—বিতংস চৌধুরী, শখের গোয়েন্দাগিরি করি। একেবারে কাজের কথায় আসি। কঙ্কণজোড়ার একটা কঙ্কণ কী করে চুরি হলো? যতটা ডিটেলস মনে পড়ে বলবেন।

বনশ্রীর চিন্তান্বিত মুখ। উনি আস্তে আস্তে বললেন—কী করে যে চুরি গেল—

হারিয়েও তো যেতে পারে। বিতংস বলল।

অসম্ভব, সবটা শুনলেই বুঝতে পারবেন। বনশ্রী বললেন।

বেশ, বলুন। বিতংস বলল।

গতকাল সন্ধ্যেবেলা—

তখন ঠিক ক'টা বাজে? বিতংস জানতে চাইল।

টি. ভি-র বাংলা নিউজ শেষ হয়েছে তখন। বনশ্রী বলল।

হুঁ, আটটা মতো।

হ্যাঁ। বোনঝির বিয়েতে যাবো, তাই ব্যাঙ্কের লকার থেকে কিছু গয়নাগাঁটি এনে রেখেছিলাম। বিকেলের দিকে—এটুকু বলে বনশ্রী তিন্নি-বিন্নিকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন—ওরা এল। আমার শোবার ঘরে আমরা সাজগোজ করছিলাম। বিন্নির আগেই সাজগোজ হয়ে গিয়েছিল। ও বাইরে গাড়িতে গিয়ে বসেছিল। একটু পরে তিন্নিও বেরিয়ে গেল। আমারও সব হয়ে গিয়েছিল। গয়নাটয়নাও পরা হয়ে গিয়েছিল শুধু জয়পুরী কঙ্কণ দুটো পরা বাকি। তখনই নকুল এসে বলল যে তিন্নি ডাকছে। আমি কঙ্কণজোড়া রেখে বাইরে গেলাম। তিন্নির সঙ্গে কথা বলছি হঠাৎ লোডশেডিং। কথা সেরে আস্তে আস্তে দেখেশুনে শোবার ঘরের দিকে যাচ্ছি দেখি নকুল টর্চ জ্বেলে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আমাকে

দেখে বলল, ও এমার্জেন্সি লাইট খুঁজছে। আমি বললাম—রান্নাঘরে আছে দ্যাখ্। অন্ধকারে শোবার ঘরে ঢুকলাম। বিছানার দিকে যাচ্ছি তখনই রাঁধুনি মাসির গলা শুনলাম—রান্নাঘরের চাবিটা দিন।

রাঁধুনি মাসি কি ঐ শোবার ঘরেই ছিল তখন? বিতংস বলল।

ঠিক বলতে পারবো না। তবে পেছন ফিরেই অন্ধকারে সাদা থান-পরা মাসিকে দেখেছি। বনশ্রী বললেন।

তারপর? বিতংস বলল।

তখনই নকুল এমার্জেন্সি লাইটটা নিয়ে ঘরে ঢুকল। ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ার থেকে মাসিকে কিচেনের চাবিটা দিলাম।

তারপর? বিতংস বলল।

এমার্জেন্সি লাইটটা টি. ভি-র পাশে রাখল নকুল। চলে গেল। বিছানার কাছে আসতেই দেখলাম একজোড়ার মধ্যে একটা কঙ্কণ নেই। বনশ্রী বললেন।

দুটোই বিছানার ওপর রেখেছিলেন? বিতংস জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ। বনশ্রী বললেন।

যখন তিন্নির সঙ্গে কথা বলতে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তখনও কি কঙ্কণজোড়া বিছানাতেই ছিল?

হ্যাঁ। বনশ্রী বললেন।

আপনার স্পষ্ট মনে আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ! বনশ্রী মাথা একটু ঝাঁকিয়েই বললেন।

আচ্ছা কঙ্কণজোড়া বিছানাতে রেখেছিলেন কেন? বিতংস বলল।

ড্রেসিং-টেবিলে মালা দুল চুড়ি চুলের কাঁটা কসমেটিকস সব যেন ডাঁই হয়েছিল। তাই কঙ্কণজোড়া বিছানায় রেখেছিলাম সবশেষে পরে নেব বলে। বনশ্রী বললেন।

হুঁ। বিতংস মুখে শব্দ করল। তারপর বিতংস তিন্নি-বিন্নির দিকে তাকাল। দুজনের মুড দেখেই বিতংস বুঝল ওদের মন ভালো নেই। কঙ্কণ চুরির ব্যাপারটায় ওরা খুব মুষড়ে পড়েছে। বিতংস তিন্নিকে বলল—আচ্ছা তিন্নি, তুমি করেই বলছি, তুমি যখন শোবার ঘর থেকে চলে আসো তখন কঙ্কণজোড়া কোথায় দেখে এসেছিলে?

বুনোদি মানে বনশ্রীদির বিছানায়। তিন্নি বলল।

হুঁ। বিন্নি, তুমি তো বেশ আগেই শোবার ঘর থেকে চলে এসেছিলে। বিতংস বলল।

বিন্নি মাথা ওঠানামা করল।

চলে আসার সময় কঙ্কণজোড়া কোথায় দেখেছিলে?

বিছানার ওপরেই। আমার দুলজোড়াও ওটার পাশেই রেখেছিলাম। দুলজোড়া পরতে পরতে কঙ্কণজোড়া দেখেছিলাম। বিন্নি বলল।

হাতে নিয়ে?

না। এমনি দেখেছিলাম। কথাটা শেষ করে বিন্নি বনশ্রীর দিকে তাকিয়ে বলল—সত্যি বুনোদি, কী সুন্দর কাজ করা!

সাড়ে পাঁচ হাজার দিয়ে জয়পুর থেকে কঙ্কণজোড়া কিনেছিলাম। ইস্, এখন জোড়ার একটা দেখলে চোখে জল.....। বনশ্রী আর বলতে পারলেন না। চোখ ছলছল করে উঠল।

বিতংস নকুলের দিকে তাকিয়ে বলল—নকুল এসো। ওর মুখচোখে ভয়ের ছাপ। বিতংস বনশ্রীকে বলল—আপনার ঐ একজোড়া কঙ্কণ খুলে দিন তো। বনশ্রী হাত থেকে কঙ্কণটা খুললেন। বিতংস ইঙ্গিতে কঙ্কণটা নকুলকে দিতে বলল। কঙ্কণটা নকুল হাতে নিল। বিতংস বলল—নকুল, হাত মুঠো করো না। কঙ্কণটা হাতের চেটোয় রাখো। নকুল তাই রাখল। বিতংস বলল—হাতটা বাড়িয়ে ধরো। নকুল হাতটা বাড়িয়ে ধরল।

এর জোড়া কঙ্কণটা তুমি দেখেছিলে? বিতংস জিজ্ঞেস করল।

না, বাবু। নকুল মাথা নেড়ে বলল।

বিতংস বনশ্রীকে বলল—ব্যাঙ্কের লকার থেকে কঙ্কণজোড়া কবে এনেছিলেন?

কালকে বেলা বারোটা নাগাদ। বনশ্রী বললেন।

কোথায় রেখেছিলেন?

ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে তালা দিয়ে রেখেছিলাম। বনশ্রী বললেন।

তাহলে নকুলের না দেখারই কথা। বিতংস বলল। তারপর নকুলকে বলল—নকুল, লোডশেডি-এর অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে তুমি যখন এমার্জেন্সি লাইটটা খুঁজছিলে তখন বিছানায় কঙ্কণজোড়া দেখেছিলে?

না, বাবু। আমি তো ঘরটার কোণায় টেবিলে আলো ফেলে ঐ লাইটটা খুঁজছিলাম।

পরে কঙ্কণটা খুঁজেছিলে? বিতংস বলল।

হ্যাঁ, লাইট এলে ঘরটা আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি।

বিতংস হাত বাড়িয়ে ধরল। নকুল কঙ্কণটা বিতংসর হাতে দিল। বিতংস কঙ্কণটা মন দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে বলল—বনশ্রীদেবী, কঙ্কণের ভেতরের অংশটা লোহার, তাই না?

হ্যাঁ, লোহার রিংয়ের ওপরেই জয়পুরী কঙ্কণ তৈরি হয়। ওপরটা সোনার—দেখুন কী সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ! বনশ্রী বললেন।

বিতংস কঙ্কণটা হাতেই রাখল। দরজার পর্দার কাছে দাঁড়ানো মাসিকে ডাকল—এসো। মাসি ঘোমটা টেনে নিয়ে এগিয়ে এল। বিতংস কঙ্কণটা দেখিয়ে বলল—এর জোড়াটাকে তুমি দেখোনি, তাই না?

না গো। মাসি মাথা নেড়ে বলল।

অন্ধকার শোবার ঘরে তুমি গিয়েছিলে কেন? বিতংস বলল।

বৌদিমণির কাছে রান্নাঘরের চাবি আনতে।

তখন নকুলকে ঐ অন্ধকার ঘরে দেখেছিলে? বিতংস বলল।

না গো। মাসি মাথা নেড়ে বলল।

হুঁ। যাও। বিতংস সোফা ছেড়ে উঠল। বলল—বনশ্রীদেবী, আপনাদের শোবার ঘরটা দেখবো।

বনশ্রী উঠে দাঁড়ালেন—চলুন।

রজত বসু বলল—আমরা যাবো?

বিতংস বলল—দরকার নেই।

শোবার ঘরে ঢুকে বিতংস চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। বেশ সাজানো-গুছোনো ঘর। হাল ফ্যাশানের নিচু খাটটা দক্ষিণের জানালার ধারেই পাতা। বিতংস জানালাটার দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্যই হলো। কাঠের জানালাটায় লোহার গ্রিল নেই। খোলা। বিতংস বলল—জানালাটায় গ্রিল নেই কেন?

বনশ্রী বললেন—জানালাটায় যে গ্রিল লাগাতে এনেছিল তার ডিজাইনটা আমার একেবারেই পছন্দ হয়নি। তাই পাল্টে দিতে বলেছি। ডিজাইন এঁকেও দিয়েছি। কালকে সকালে গ্রিল খুলে নিয়ে গেছে। দু-একদিনের মধ্যেই নতুন গ্রিল লাগানো হবে।

কালকে যখন আপনারা সাজগোজ করছিলেন তখন কি জানালাটা বন্ধ ছিল? বিতংস বলল।

হ্যাঁ, তবে সাজগোজ হয়ে গেলে গরম লাগছিল বলে জানালাটা খুলে দিয়েছিলাম। বনশ্রী বললেন।

পর্দাটা তো নেই দেখছি। বিতংস বলল।

ওটা গ্রিল লাগাবার পর লাগাবো ভেবেছি। বনশ্রী বললেন।

হুঁ। তার মানে কিছুক্ষণ জানালাটা একেবারে ফাঁকা খোলা ছিল। থেমে বলল—আচ্ছা, কঙ্কণজোড়া কোথায় রেখেছিলেন? বনশ্রী আঙুল দিয়ে বিছানায় জায়গাটা দেখালেন। বিতংস লক্ষ্য করল খোলা জানালা থেকে ঐ জায়গাটার দূরত্ব খুব বেশি না। বিতংস খাটের ধারে গেল। জানালাটার কাছে গিয়ে

বাইরে তাকাল। দেখল হাত পাঁচেক উঁচু বাউন্ডারির দেয়াল। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল পাশের বাড়ির খোলা ছাত। ছাতঘেরা দেয়ালটা হাত দুয়েক। বিতংস সরে এল। বনশ্রী কাছে এসে চাপা গলায় বললেন—বাইরের লোক নয়, ঐ নকুল আর মাসি সাঁট করে কঙ্কণটা চুরি করেছে। দুটোকেই তাড়াবো আমি।

বিতংস বলল—আমার তা মনে হয় না।

কেন বলুন তো? বনশ্রী একটু আশ্চর্য হয়েই বললেন।

দেখুন, বিতংস বলল, নকুলকে বাড়ানো হাতে কঙ্কণটা রাখতে বলেছিলাম। তাতে ওর হয়তো মনে হতো, এইরকম একটা কঙ্কণ আমি চুরি করেছি—আমার রেহাই নেই, যদি ধরা পড়ি তাহলে—এতে ওর মন দুর্বল হতো। ভয়ে ওর হাত কাঁপতো। কিন্তু ওর হাত কাঁপেনি। ও চুরি করেনি বলেই ওসব ভাবনাও ওর মনে আসেনি। একটু থেমে বিতংস বলল—আর মাসি গেঁয়ো মেয়ে। গরিব। জীবনে কখনো সোনাদানা দেখেছে কিনা সন্দেহ। কাজেই সোনার কঙ্কণ চুরি করা, বিক্রি করা—এত কুবুদ্ধি ওর মগজে নেই। বিতংস কথাগুলো আস্তে আস্তে বলল। তারপর বলল—আচ্ছা, আপনি যখন এই অন্ধকার ঘরে ঢুকেছিলেন তখন কোনো শব্দ শুনেছিলেন? বনশ্রী একটু ভেবে বললেন—না, তবে নকুল বলছিল ও নাকি একটা মৃদু কিড়কিড় শব্দ শুনেছিল। বিতংস চোখ বুঁজে মাথা একটু নেড়ে বলল—ইন্টরেস্টিং, ইন্টারেস্টিং। চোখ খুলে বলল—নকুলকে ডাকুন তো। বনশ্রী নকুলকে ডাকলেন। নকুল ঘরে ঢুকল। বিতংস বলল—আচ্ছা তুমি কখন কিড়কিড় শব্দটা শুনেছিলে?

অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে যখন এমার্জেন্সি লাইটটা খুঁজছিলাম তখন।

হঠাৎই বনশ্রী একটু হাসলেন। বললেন—বুঝেছি, টুটুন ছিপের হুইল ঘোরাচ্ছিল। বিতংস বলল—ব্যাপারটা কী বলুন তো? বনশ্রী বললেন—পাশের বাড়িতে একটি ছেলে আছে—টুটুন। ও মাঝে মাঝেই ওর বাবার মাছ ধরার ছিপ নিয়ে মাছ ধরা মাছ ধরা খেলে। হুইল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুতো ছাড়ে গুটোয়। বঁড়শিতে কাগজের ঠোঙা, প্লাস্টিকের ব্যাগ এসব গেঁথে নিয়ে খেলে।

তাহলে ঐ হুইল ঘোরাবার শব্দটাই নকুল শুনেছিল! বিতংস যেন কতকটা আপনমনে বলল। বনশ্রী মাথা নেড়ে সায় দিয়ে হাসলেন। বিতংস ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল—টুটুনের বাবাকে একটু ডাকতে পারেন?

নিশ্চয়ই। নকুলকে পাঠাচ্ছি। বনশ্রী বললেন।

ড্রইংরুমে এসে বসল সবাই। টুটুনের বাবা শিবনাথবাবু ঘরে ঢুকলেন। রজতের দিকে তাকিয়ে বললেন—কী ব্যাপার রজতবাবু? কঙ্কণটা পাওয়া গেছে? রজত মাথা নেড়ে বললেন—না। তারপর বিতংসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিতংস বলল—মাছধরা আপনার হবি, তাই না শিবনাথবাবু?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা পুকুর-জলা কোথায় মশাই যে মাছ ধরবো? সবই তো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বিল্ডিং-এর জঙ্গল মানে—শিবনাথবাবু থামলেন।

আপনার একটা বাতিল ছিপ বঁড়শি নিয়ে আপনার ছেলে টুটুন বোধহয় শূন্যে মাছধরা প্র্যাকটিস করে, তাই না? বিতংস বলল। শিবনাথ হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাত নেড়ে বললেন—আর বলেন কেন! বঁড়শি ফেলে ফেলে টুটুন যা করে বেড়ায়—সেদিন তো মশাই এক কাণ্ড! ঝি কলতলায় বাসন মাজছে। ছাত থেকে বঁড়শি ফেলে একটা জলভরা ছোট্ট প্লাস্টিকের বালতি গেঁথে—কথাটা শেষ না করে শিবনাথ হাসতে লাগলেন।

আচ্ছা, টুটুন কি স্কুলে চলে গেছে? বিতংস জানতে চাইল।

না, বলছিল শরীর ভালো না, আজকে স্কুলে যাবে না। শিবনাথ বললেন। বিতংস নকুলকে বলল—যাও তো, টুটুনকে একটু ডেকে আনো।

টুটুনকে ডাকছেন কেন? শিববাবু একটু গম্ভীর মুখে বললেন।

এমনি, একটু আলাপ করবো। বিতংস বলল।

একটু পরেই টুটুন ঘরে ঢুকল। বছর চৌদ্দ-পনেরো বয়েস। চোখে-মুখে একটু দুশ্চিন্তার ছাপ বিতংস লক্ষ্য করল। পরনে জীনসের প্যান্ট, গায়ে হলুদ কলিদার বুকখোলা পাঞ্জাবি। টুটুনকে বিতংস বলল—বসো টুটুন। টুটুন সামনের খালি সোফাটায় বসল। বিতংস বলল—একটা গল্প বলি শোন। বর্ষাকাল। একদল ব্যাঙ একটা ডোবার জলে মনের আনন্দে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ডাকছে। কয়েকজন তোমার বয়সী ছেলে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ওরা ব্যাঙগুলো দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর, ব্যাঙদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। দুটো ব্যাঙ মারা গেল। তখন একটা বুড়ো ব্যাঙ ছেলেগুলোকে বলল—তোমরা আমাদের দিকে ঢিল ছুঁড়ছো কেন? ছেলেগুলো বলল—আমরা খেলছি। বুড়ো ব্যাঙ বলল—বয়েজ, হোয়াট ইজ এ গেম টু য়ু ইজ ডেথ টু আস। বলো তো কথাটার বাংলা কী হবে?

টুটুনকে বেশ বিব্রত মনে হলো। ও ঘরের লোকদের দিকে তাকাল। বাবার দিকেও তাকাল। বেশ ভীত ভঙ্গী। বলল—কথাটার মানে—তোমরা খেলো না। আমরা মানে—টুটুন চুপ করে গেল। বিতংস বলল—ঠিক বাংলাটা হলো—বাছারা, তোমাদের কাছে যা খেলা আমাদের কাছে সেটাই মৃত্যু। টুটুন একটু চুপ করে থেকে বলল—হ্যাঁ। বিতংস বলল—আচ্ছা টুটুন, গতকাল সন্ধ্যের সময় ধরো সাড়ে সাতটায় তুমি কী করছিলে? টুটুন একটু ভাবল। বারকয়েক বাবার দিকে তাকাল। বলল—টি. ভি.-তে খবর শুনছিলাম।

প্রায়ই খবর শোন? বিতংস বলল। টুটুন বলল—না, তবে মাঝে মাঝে শুনি। আমাদের স্কুলে একটা সায়েন্স এগজিবিশান হয়েছিল। টি. ভি. থেকে তুলেছিল। খবরে অল্প একটু দেখিয়েছিল।

তুমি তাতে কোনো মডেল বা অন্য কিছু তৈরি করে দেখিয়েছিলে?

টুটুন বলল—হ্যাঁ, চুম্বকের ধর্ম নিয়ে একটা এগজিবিট দেখিয়েছিলাম।

তাহলে তো তোমাকে একটা দামী চুম্বক কিনতে হয়েছিল? বিতংস বলল।

হ্যাঁ, হর্স শু ম্যাগনেট—ঘোড়ার ক্ষুরের মতো দেখতে চুম্বক। টুটুন বলল। শিবনাথ বলে উঠলেন—ঐ সব নিয়েই তো আছে। চায়—কিনে দিই।

নিশ্চয়ই কিনে দেবেন। বিজ্ঞানের প্রতি টুটুনের এই আগ্রহকে আমি প্রশংসা করছি। বিতংস বলল। তারপর টুটুনকে বলল—আচ্ছা টুটুন, ধরো তুমি তো ছাত থেকে বঁড়শি ফেলে এটা-ওটা তোল। এবার তুমি বঁড়শি না ফেলে সে জায়গায় যদি একটা হর্স শু চুম্বক বেঁধে ফেলে দাও তাহলে তো লোহা জাতীয় কিছু নিশ্চয়ই ওটাতে আটকাবে আর তুমি হুইল ঘুরিয়ে তুলে নিতেও পারবে। পারবে কিনা?

টুটুন বেশ ভীত চোখে বিতংসের দিকে তাকাল। শুধু মাথা ওঠানামা করল। বিতংস কঙ্কণটা এগিয়ে ধরে বলল—আচ্ছা, এটাও তো চুম্বক দিয়ে তুলে নেওয়া যায়!

টুটুন এবার চমকে বাবার দিকে তাকাল। শিবনাথ সোফা ছেড়ে দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। গলা চড়িয়ে বললেন—আপনি কি বলতে চান মিসেস বোসের কঙ্কণটা টুটুন চুরি করেছে? অ্যাঁ?

বিতংস শান্তভাবে বলল—আপনি স্থির হয়ে বসুন, উত্তেজিত হবেন না। টুটুনকে আমি চোর বলিনি। শুধু একটা বিজ্ঞানের ব্যাপার সম্বন্ধে ওর মতামত জানতে চেয়েছি। এবার বসুন, টুটুনকে বলতে দিন। শিবনাথ বসলেন। টুটুন একটু চুপ করে থেকে বলল—চুম্বক তো সব ধাতুকে আকর্ষণ করে না।

বিতংস দু-হাঁটুতে চাপড় মেরে বলল—দ্যাটস ইট। ঠিক এইজন্যেই তুমি সুতোয় চুম্বকটা বেঁধে খোলা জানালা দিয়ে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলেছিলে। একটা কঙ্কণ আটকে গিয়েছিল। হঠাৎ লোডশেডিং। অন্ধকারে হুইল ঘুরিয়ে তুমি কঙ্কণটা তুলে এনেছিলে। তারপর—

বিতংসর কথা শেষ হবার আগেই টুটুন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জোরে কাঁদতে কাঁদতে প্যান্টের পকেট থেকে জোড়ার কঙ্কণটা বের করে এগিয়ে ধরল।

ঘর নিস্তব্ধ। শুধু টুটুনের কান্নার শব্দ। শিবনাথ দ্রুত ছুটে গিয়ে টুটুনের গালে এক চড় কষালেন। উনি আবার হাত তুলেছিলেন কিন্তু তার আগেই বিতংস এক লাফে উঠে গিয়ে টুটুনকে আড়াল করে দাঁড়াল। গম্ভীর গলায় বলল—শিবনাথবাবু, টুটুনকে মারবেন না। টুটুনের মন চুরি করার মতো নীচ

নয়। ও শুধু একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চেয়েছিল—চুম্বক সব ধাতুকে আকর্ষণ করে কিনা। টুটুনের মুখ ভালো করে দেখুন, ভয়ে ও সারারাত ভালো করে ঘুমতে পারেনি। কঙ্কণচুরির ব্যাপারটা নিয়ে পাড়ায় একটু হৈচৈ হয়েছে। এসব দেখেশুনে ওর বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে গিয়েছিল। ওর যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। আপনি আর ওর কষ্ট বাড়াবেন না।

বনশ্রী উঠে গিয়ে টুটুনের হাত থেকে কঙ্কণটা নিয়ে টুটুনকে জড়িয়ে ধরলেন। টুটুনের মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। আস্তে আস্তে টুটুনের কান্না বন্ধ হলো।

বিতংস বলল—তাহলে টুটুন, চুম্বকটা কঙ্কণটাকে আটকে নিয়েছিল, কারণ কঙ্কণের ভেতরে লোহার রিং। তাই কিনা? টুটুন মাথা নাড়ল। এতক্ষণে ওর মুখে হাসি দেখা দিল। বিতাংস বলল—ঐ ব্যাঙের গল্পটা মনে আছে তো? তুমি বিজ্ঞানের খেলা খেলছিলে কিন্তু তার জন্যে নকুল আর মাসির চাকরি চলে যাচ্ছিল।

কঙ্কণ উদ্ধার হলো। নকুল আর মাসিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রজত বসু এগিয়ে এসে বিতংসর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলল—সত্যি কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো!

বিতংস হেসে একটা আঙুল তুলে বলল—মিসেসকে বলুন এক কাপ গরম কফি আর দুটো কাজু বিস্কুট।

[বৈশাখ ১৪০২]

গড় চামুণ্ডেশ্বর

শিশিরকুমার মজুমদার

ভাঙা দেওয়াল আর ইঁট-পাথরের স্তূপের মাঝ দিয়ে সরু পায়ে চলা পথটার শেষে যেখানে আমরা পৌঁছালাম, সেখানটাই গড় চামুণ্ডেশ্বরের সব থেকে ভাঙাচোরা এলাকা। ওখানে এক মিনিটও আমার থাকতে ইচ্ছা ছিল না। আর কিছু না হোক, যে কোনো ফাটলের মধ্যে থেকে যে কোনো মুহূর্তে সাক্ষাৎ মৃত্যুফণা তুলে ফুঁসে উঠতে পারে। বিছা, বিষাক্ত পোকা-মাকড় থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু সে সব চিন্তা কি হলধরবাবুর মনে আছে! পড়ন্ত বেলায় চারদিকের জঙ্গল হয়ে ওঠা বিশাল সব গাছপালায় পাখির চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। তারা সবাই ব্যস্ত অন্ধকার ঘনাবার আগে রাতের আশ্রয় ঠিক করে নিতে। হলধরবাবুর সে সব দিকে নজর নেই। কি এক চিন্তায় তিনি একদিকে এগিয়ে চলেছেন। আমাকে সঙ্গে থাকতে বলেছেন, কারণ কিছু তিনি আমাকে দেখাবেন। আর আজই একটা বিষয়ের শেষও করবেন উনি। ওঁর কথায় যেন কেমন রহস্যের আভাস পেয়েছি আমি। আসলে—এই প্রায়-ধ্বংস হয়ে আসা চামুণ্ডেশ্বরের গড় আমার মনে সব সময়েই একটা ভয়মেশানো রহস্যের আভাস আনে। ওঁর কথায় সেই রহস্য আরও গভীর হয়েছে।

সিংহ বংশের শেষ পুরুষ এই হলধর সিংহ। এককালে এই চামুণ্ডেশ্বর গড় ঘিরে তাঁদের রাজ্য ছিল। নবাবী আমলের শেষে ইংরাজ আমলেও তাঁরা ইংরাজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন। তবে আর পাঁচটা রাজপরিবার যেভাবে প্রায় শেষ হয়ে গেছে ইংরাজ আমলেই, সেভাবেই এই সিংহ বংশও তাঁদের সব গৌরব হারিয়েছে। দেশ স্বাধীন হলে বাকি যা কিছু ছিল তাও গেছে। হলধর সিংহমশাই তবুও এই ধ্বংসস্তূপের মাঝেই জীবন কাটাচ্ছেন!

আমাকে উনি অনাথ আশ্রম থেকে তুলে মানুষ করেছেন। না, নিজের কাছে রেখে নয়। শহর কলকাতার হোস্টেলে থেকে আমি পড়াশুনা করেছি। কালেভদ্রে ছুটিতে আমি এসেছি চামুণ্ডেশ্বর গড়ে। বেশি দিন উনি আমাকে এখানে থাকতে দেননি। আর তার থেকেও বড় কথা, কখনও উনি আমাকে ওঁর খুব কাছের লোক হতে দেননি। আমি আজও ওঁকে হলধরবাবু বলে ডাকি। ডাকতে আমার খুবই লজ্জা করে, কিন্তু আমি নিরুপায়, ওর বেশি আর উনি এগোতেই দেন না!

স্কুল-কলেজ জীবনে কখনও আমি কোনো অভাবে পড়িনি। পাস করে এই যে আমি সরকারী অফিসে এত ভাল কাজ করি, তার একটা পয়সাও তিনি কোনোভাবে আমার কাছ থেকে নেন না। আমি যে সব কিছুতেই ওঁর অনেক দূরে সে বোধটা উনি আমাকে ভুলে যেতে দেননি।

আজ বহুদিন বাদে হঠাৎ ওঁর চিঠি পেয়েই এখানে এসেছি সব রহস্যের শেষ দেখতে বোধ হয়। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়েছে।

আপন মনে কিছুটা এগিয়ে এক জায়গায় থামলেন হলধরবাবু। কি যেন কিসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ওই দেখ, ওই সামনে দ্বাদশ পাপীর পাষাণমূর্তি। না, না, আমি বলতে চাই, দ্বাদশতম পাপীর পাষাণমূর্তি। এক থেকে একাদশ পাপী তো কবেই মুক্তি পেয়েছেন। এদিকের সবাই বলে, ওই দ্বাদশতম পাপীর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই এই চামুণ্ডেশ্বর গড়ও পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, দ্বাদশ পাপী মানে?

উনি আমার কথা শুনে হাসলেন, বললেন, মানে বারজন পাপী, যাঁরা এক এক করে এই বংশে জন্মেছিলেন। তাঁরাই এক শিল্পীর হাতে বন্দী হয়ে পরপর ওখানে খাড়া হয়েছিলেন। একদিন একসঙ্গে এগারো জনের মুক্তি হয়েছিল। এই গড়েরও অনেকটাই সেদিন একসঙ্গে ভেঙে পড়েছিল। সেই এগারো জনের মুক্তি পাবার পরই গড়ের এই অবস্থা। দ্বাদশ জনের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বাকি সব কিছুও ভেঙে পড়বে।

অবাক হয়ে আমি তাকিয়ে দেখলাম একটু দূরে একটা খাড়া দেওয়ালের সামনে কাল গ্রানাইট পাথর কুঁদে তৈরি এক খাড়া পুরুষ মূর্তি, বলিষ্ঠ তার গড়ন, মুখ চোখ দেহের ভঙ্গিও নিখুঁত। আমাদের মনে হলো, ও কোনো পাপীর মূর্তি হতে পারে না, হলধরবাবু ভুল করছেন। ও নিশ্চয়ই কোনো হিন্দু দেবতার মূর্তি। উঁচু দেওয়ালের সামনে, বেদীতে দাঁড় করান আছে!

হলধরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ওই সব পাপীদের কাহিনীই হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষদের গোটা ইতিহাস। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা থেকে শুরু করে পরপর বারজন বংশধর সেই একই পথের পথিক ছিলেন। দুনিয়ার এ হেন কোনো পাপ ছিল না, যা তাঁরা করেননি! এমন কি ইংরাজ সরকারের সঙ্গে ঠিক সময়মতো হাতও মিলিয়ে ছিলেন তাঁরা। তখনই রাজা উপাধি পেয়ে চামুণ্ডেশ্বরের মন্দির মাঝে রেখে এই গড়ও বানান তাঁরা। গোটা অঞ্চলের রাজাই বনে বসেন তাঁরা!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই গড় কি তবে বেশি দিনের নয়?

না, তেমন কিছু পুরনো এটা নয়। বললেন হলধরবাবু, শোনা যায়, কয়েক শ' বছর আগে এক অখ্যাত গণ্ডগ্রাম ছিল এই চামুণ্ডেশ্বরতলা। বটগাছের তলায় পড়ে থাকা এক পাথরকে চামুণ্ডেশ্বর বলে পূজা করত স্থানীয় লোকেরা। ভাগ্যের খোঁজে পশ্চিম থেকে বায়ুধর সিং এই মুলুকে আসেন। তাঁর দেহে বল ছিল, হাতে পাকা বাঁশের লাঠি ছিল। সে লাঠি ওঁর হাতে চলত ভীষণভাবে। আর তাঁর ছিল প্রচণ্ড লোভ, বড়লোক হবার। এদিকেই কোথাও এক ধনী পরিবারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তাঁরা তীর্থ-পরিক্রমায় যাচ্ছিলেন। বায়ুধরকে তাঁরা পাহারাদার রাখলেন। সেই তীর্থযাত্রীরা তীর্থে পৌঁছেছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে বায়ুধর প্রচুর সোনাদানা, টাকাপয়সা নিয়ে এই চামুণ্ডেশ্বরতলায় এসে হাজির হন। অল্প জায়গা জমি কিনে এখানেই পাকা আস্তানা গেড়ে বসেন। তারপর হাতের লাঠির জোরে অল্প কিছুদিনেই এই অঞ্চলে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করি, কি করতেন উনি?

ডাকাতি। বললেন হলধরবাবু, সেই শুরু এই বংশের ইতিহাস! বায়ুধরের ছেলে গুণধর। গুণের সীমা ছিল না তাঁর। তাঁর প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত কিনা জানা যায় না, তবে আশপাশের গ্রামের প্রজাদের বারবার নালিশে হঠাৎ ঘুম ভাঙল নবাবের ফৌজদারের। প্রজাদের মঙ্গলের কথা ভেবে চামুণ্ডেশ্বর গড় মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্য এলেন উনি। এসেই এখানে নিখোঁজ হয়ে গেলেন। এই গড়ের কোথাও কোনো গোপন জায়গায় মাটির তলের কুঠুরিতে তাঁর আত্মা এখনও হয়ত গুমরে মরছে। ফৌজদার না থাকাতে সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল। আর নবাববাহিনীকে ডেকে আনার জন্য আশপাশের দশ-বিশখানা গাঁয়ের চাষীদের বন্দী করে এনে চরম শাস্তি দিলেন গুণধর। সেই শাস্তিদান চলল মাসখানেক ধরে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হতভাগ্যদের করুণ আর্তনাদ বহুদূরের মানুষের প্রাণে আতঙ্ক জাগাত।

আমি বললাম, এসব কথা থাক। শুনতে আমার ভাল লাগছে না। আপনি যেন আমাকে কি দেখাবেন বলেছিলেন?

হ্যাঁ দেখাব। বললেন উনি, দেখার আগে এই কথাগুলো শুনে নাও। তাহলেই তো বুঝবে কি আমি তোমাকে দেখাতে চাই। গুণধরের ছেলে, দণ্ডধর। তিনি চামুণ্ডেশ্বরের মন্দির বানান। তাঁর দণ্ডের ভয়ে তামাম অঞ্চলের ছেলেমেয়ে বাচ্চা-বুড়ো-জোয়ান, সবাই ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে এসে বেগার খেটে এক একখানা পাথর মন্দিরের গাঁথুনিতে বসায়। মন্দির তৈরি হলে দণ্ডধর তাঁর গুরু তান্ত্রিকাচার্য মহাঘোরানন্দকে

মন্দিরের পুরোহিত করেন। তিনিই প্রতিদিন রাতে মহাবলি দিয়ে ধুমধাম করে চামুণ্ডেশ্বরের পূজা করতেন। তিনিই দণ্ডধরকে তন্ত্রে দীক্ষা দেন। দণ্ডধরের মোক্ষ লাভ হয়েছিল কিনা জানা যায় না। তবে গ্রাম ছেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে দলে দলে লোক পালাতে শুরু করে। চামুণ্ডেশ্বরের মহাবলি হবার ইচ্ছা তাদের কারও ছিল না। গড়ের চারপাশ জনশূন্য হয়ে গেল!

দণ্ডধরের ছেলে আয়ুধধর। তাঁর ছিল শিকারের শখ।

গড়ের চারপাশের জঙ্গলে তখন পাওয়া যেত পাখি। বড়জোর বুনো হয়ে যাওয়া দু-একটা পোষা শুয়োর। ও সব শিকারে শখ মিটবে কেন ওঁর। তিনি খাঁচায় বন্দী সুন্দরবনের বাঘ ধরে এনে ছেড়ে দিলেন গড়ের চারপাশে গজিয়ে ওঠা নতুন জঙ্গলে। একটা দুটো বাঘ নয়, বেশ কয়েকটা। সে সব বাঘ গড়ের উঁচু পাঁচিল টপকে গড়ের মধ্যে ঢুকতে পারত না, খিদের ঠেলায় জঙ্গল ছেড়ে গিয়ে ঢুকল আশপাশের গাঁয়ে। প্রথম প্রথম গরু-ছাগল ধরে, একসময় সব কটাই মানুষখেকো হয়ে দাঁড়াল। আয়ুধধর ঢোল পিটিয়ে চারদিকে জানিয়ে দিলেন, যে ওঁর বাঘের গায়ে হাত তুলবে তার মুণ্ডু উড়িয়ে দেবেন। এরপর আয়ুধধরের শিকার খেলা শুরু হলো। সে খেলার শেষ হলো আয়ুধধরের বাঘে খাওয়া আধখানা দেহ খুঁজে পাওয়ার পর।

এসব কথা আমার শুনতে মোটেও ভাল লাগছিল না। তাই তাড়াতাড়ি বললাম, এদিকে তো এখন কোথাও বাঘ নেই। জঙ্গলই নেই তো বাঘ থাকবে কি করে?

সে সব বাঘ ইংরাজরা মেরে শেষ করিয়েছেন দেশী শিকারীদের বারুদ টোটা দিয়ে। বন্দুক হাতে সেই সব বাঘের পিঠেই পা রেখে বড় বড় ছবি আঁকিয়েছেন সারা দেশে পাঠাবার জন্য। ও কথা থাক। এই পর্যন্ত এই বংশের কাহিনী লোকমুখে ফিরত। পঞ্চম পুরুষ থেকে একাদশ পুরুষ পর্যন্তও ওই একই ইতিহাস, কম-বেশী অত্যাচারে ভরা। তবে তা নিয়ে আর এদিকে কোনো লোককথা চালু নেই। মনে হয় পূর্বপুরুষের কীর্তিকে তাঁরা ম্লান করতে পারেননি। তা না পারলেও সিং বংশ ততদিনে সিংহ বংশ নাম নিয়েছে। আর সিংহ বিক্রমেই প্রজাদের উপরে অত্যাচার চালিয়ে গেছেন।

দ্বাদশ পুরুষ বুদ্ধিধর। সত্যিই তিনি বুদ্ধি ধরতেন খুব। তা নিয়ে তাঁর অসম্ভব অহঙ্কারও ছিল। দেশে ততদিনে কোম্পানীর রাজত্ব কায়েম হয়েছে। বুদ্ধিধরের গড়ে সাহেব-সুবোদের আনাগোনা খানাপিনা আরম্ভ হয়েছে। চারদিক যখন নীলকরদের অত্যাচারে জ্বলছে, প্রজারা চোখের জল ফেলছে তখন গড়ের হলঘরে গান-বাজনার আসর বসেছে।

বুদ্ধিধরের খাস জমিতে নীলের চারা কখনও মাথা দোলাত না! এই সময়েই কোম্পানী বাহাদুরের দেশী সেপাইরা দেশ স্বাধীন করার জন্য বিদ্রোহ করল। লোকে বলে, কোম্পানী বাহাদুর হিন্দু-মুসলমান সিপাইদের ধর্মনাশ করার চেষ্টা করেছিল বন্দুকের টোটায় গরু আর শুয়োরের চর্বি মিশিয়ে। আসলে তা নয়, অযোধ্যার নবাবকে ইংরাজরা যে হীন চক্রান্তে গদিছাড়া করল, তাদের সেই হীনতা দেখেই হিন্দু-মুসলমান সবাই ক্ষেপে গেল। দিল্লীর বাদশাকে তারা শাহেনশা ঘোষণা করে যুদ্ধ শুরু করল। চারদিকে গুলিগোলা চলতে শুরু করল। কাপুরুষ ইংরাজগুলো পালিয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। বুদ্ধিধর বেকায়দা দেখে কীর্তিগড়ের রাজার কাছে গোপনে দূত পাঠালেন। মুখে কাজে কথায় তিনি যতই না কেন ইংরাজদের পক্ষে থাকুন, আসলে তিনিও দিল্লীর বাদশা্র গোলাম। দিল্লী থেকে যে হুকুম আসবে তা তিনি তখুনি তালিম করবেন।

একথা বলে কি যেন ভাবলেন হলধরবাবু, তারপর বললেন, এসো, আরও কিছুটা আমরা এগিয়ে যাই। তাহলে দ্বাদশ মূর্তি তুমি ভাল করে দেখতে পাবে। কথার শেষে ভাঙা ইঁট-পাথরের মাঝ দিয়েই উনি এগোলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ও মূর্তিটা তাহলে কার?

উনি চলতে চলতেই উত্তর দিলেন, এই বংশের সেই কুখ্যাততম পুরুষ বুদ্ধিধরের মূর্তি ওটা। সেপাই যুদ্ধ শেষ হবার পর ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতের সম্রাজ্ঞী হন। তাঁর সরকার ওই বুদ্ধিধরকেই এই গোটা

অঞ্চলের খাজনা আদায় তহসিলের ভার দেয়। ইংরাজ সরকারের কাছে তাঁর তখন কি খ্যাতি! ওঁর বুদ্ধিতেই কীর্তিগড়ের বিদ্রোহীদের খতম করা সম্ভব হয়েছিল।

আমি বললাম, সেকি, তিনি তো দিল্লীর বাদশার গোলাম হতে চেয়েছিলেন!

ওটাই ছিল ওঁর চাল। বললেন হলধরবাবু, ওই চালেই কীর্তিগড়ের সবাই ধরা পড়ল। তারপর বহু বছর কেটে গেল। যুদ্ধের কথা সবাই ভুলল। বুদ্ধিধর কীর্তিগড়ের বিখ্যাত শিল্পী নীলরতনকে বহু টাকা দিয়ে এখানে আনলেন। ইচ্ছা তাঁর, পূর্বপুরুষদের মূর্তির সঙ্গে নিজেরও একটা মূর্তি গড়া। এত বড় বংশের বিখ্যাত সব পুরুষদের কারও কোনো স্মৃতিচিহ্ন থাকবে না, তা তো হতে পারে না। রাজী হলেন নীলরতন মূর্তি গড়তে।

কথা বলতে বলতে শেষ মূর্তিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন হলধরবাবু। কি যেন খুব ভাল করে দেখলেন মূর্তিটার মধ্যে। কেমন যেন করুণভাবে ভাসলেন একটু। বললেন, এগিয়ে এসো আরও। অতদূর থেকে এই মূর্তির সূক্ষ্ম কাজ বুঝতে পারবে না। নীলরতন ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

দূর থেকে আমার কিন্তু বারবার মনে হচ্ছিল ও মূর্তি অপূর্বসুন্দর কোনো দেবতার মূর্তি। কিছুটা কাছে গিয়ে আমি মুখ তুলে তাকালাম মূর্তির মুখের দিকে। তাকিয়েই আতঙ্কে আমি শিউরে উঠলাম। আমার মুখ দিয়ে অজান্তে একটা চাপা আর্তনাদ বার হলো। অপূর্বসুন্দর কোনো দেবতার মূর্তির মুখে চোখে একি পৈশাচিক চাহনি! আর সেই চাহনি কী ভয়ঙ্কর প্রাণবন্ত!

শান্তভাবে হলধরবাবু বললেন, ভয় পেও না, ভয় পেও না। ও হলো প্রাণহীন মূর্তির চাহনি। ও তোমার কোনোই ক্ষতি করবে না।

আমি বললাম, নীলরতন এমন মূর্তি গড়ল কেন?

নীলরতন এক শর্তে মূর্তি গড়তে রাজী হয়েছিলেন। ওঁকে নির্জনে একা কাজ করতে দিতে হবে পাঁচিল ঘেরা জায়গায়। সেখানে কারও যাবার অধিকার থাকবে না। এমন কি কাজ কতদূর এগোলো সে খবরও কেউ নিতে পারবে না। এছাড়া ওঁকে ওঁর প্রয়োজনীয় সব কিছুই দিতে হবে নিয়মিত। সব কথাতেই রাজী হয়েছিলেন বুদ্ধিধর। এখানেই পাঁচিল ঘেরা জায়গা দিয়েছিলেন ওঁকে। কোনো অভাব রাখেননি ওঁর। আর অসীম ধৈর্য নিয়ে শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে ছিলেন তিনি। মূর্তি গড়া শেষ হলো একদিন। পাঁচিল ঘেরা জায়গার দরজা খুলে বার হয়ে এলেন নীলরতন। তাঁর চোখের কোণে কালি পড়েছে তখন। পিঠও কুঁজো হয়ে গেছে। মাথার চুলেও পাক ধরেছে। যে যুবক কাজে ঢুকেছিল, সেই অকালে বুড়ো হয়ে বার হয়ে এল পরিশ্রমের শেষে। কিন্তু তাঁর মুখে-চোখে অদ্ভুত তৃপ্তির হাসি। বাইরে এসেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার কাজ শেষ, তোমরা সবাই দেখে যাও কি নিখুঁত জিনিস আমি গড়েছি। এই সিংহ বংশের সত্যি পরিচয় আর পৃথিবীর কাছে অজানা থাকবে না।

বুদ্ধিধরের তখন অনেক বয়স। পাত্রমিত্র সভাসদ সবাইকে নিয়েই তিনি ঢুকলেন সেই চৌহদ্দির মধ্যে। নীলরতন সবার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখুন মহারাজ দেখুন, দেখুন, আপনার পূর্বপুরুষদের এত নিখুঁত মূর্তি আমি গড়েছি যে এক এক করে সবাইকেই আপনি চিনতে পারবেন। তাই যদি না করতে পারব তো কিসের আমি শিল্পী? মূর্তিগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে সবাই কিন্তু আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

আমি বললাম, তার মানে, ওগুলো তাহলে কিসের মূর্তি ছিল? হাসলেন উনি। বললেন, না, না, ওগুলো সবই মানুষের মূর্তি ছিল। যেমন এই দ্বাদশ মূর্তিখানা। তবে এখানকার মতোই অন্য আর সব মূর্তিগুলোও তাদের আপন আপন রূপ প্রকাশ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই অমন ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল সবাই।

আমি বললাম, তারপর, তারপর কি হলো?

বুদ্ধিধর বেশ কিছুক্ষণ নিজের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, নীলরতন, একি ভুল করলে তুমি? অমন যার মুখের চেহারা, সে তো পশুর মতো হিংস্র হবে। হেসে নীলরতন বলেছিল, আপনি

যে আপনাকে চিনতে পেরেছেন তাতেই বোঝা যায় আমি সার্থক। তবে মহারাজ, আমাকে আপনি ভাঙতে পারবেন, ওই মূর্তিগুলোকে নয়। ওরা যে সাক্ষী। হ্যাঁ, ভাঙবে ওগুলো যখন ভবিষ্যতের কেউ তাঁদের পূর্বপুরুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে আপন জীবন দিয়ে।

কথার শেষে আমার দিকে তাকিয়ে হলধরবাবু আবার সেই কেমন যেন অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকলেন। আপনার মনে কেন জানি না একটা ভয়ের অনুভূতি জাগল। চারদিকে ততক্ষণে বিকালের কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। আবছার মধ্যে মূর্তিটাকে এখন যেন একটা নরপিশাচের মূর্তি বলে মনে হতে লাগল। ওটা যেন এখুনি প্রাণ পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুকের রক্ত চোষার জন্য!

হলধরবাবু আপন মনেই যেন বললেন, বুদ্ধিধর ভীষণ ভুল করে ফেলেছিলেন। উনি জানতেন না, কীর্তিগড় রাজপরিবারের ছেলেই নীলরতন। ইংরাজরা তো ওঁরই বুদ্ধিতে কীর্তিগড় ধ্বংস করতে পেরেছিল। রাজপরিবারের সবাইকেই ইংরাজরা তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছিল। ভাগ্যের জোরে বেঁচেছিল ঐ নীলরতন।

ভয় ছাপিয়ে আমার মনে তখন একটু একটু করে কৌতূহল জাগতে আরম্ভ করেছে। দ্বাদশ মূর্তিটার আরও কাছে গিয়ে আমি দেখলাম। ইংরাজ রাজত্বে নীলরতন, সিংহ বংশের রক্তপাত ঘটিয়ে প্রতিশোধ নিতে পারেনি বটে। তবে এমনি করে মূর্তি গড়ে সে চূড়ান্ত প্রতিশোধই নিয়েছিল। কিন্তু বাকি এগারোটা মূর্তি গেল কোথায়? জায়গাটা এককালে ঘেরা দালানের মতো ছিল। এখন দালানটা আছে, আর আছে পিছনের দেওয়ালটা। দালান জুড়ে পরপর সব ভাঙা পাথরের স্তূপ। ওখানেই তো মূর্তিগুলো থাকার কথা। আমি থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বললেন, নীলরতন বারটা মূর্তি গড়েছিল। এখানে তো একটা দেখছি, বাকিগুলো.......?

আমার কথা শেষ হবার আগেই উনি বললেন, এগারো জনের শাপমুক্তি হয়ে গেছে। ওই তো ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে আছেন তাঁরা। মুক্তি হয়নি বুদ্ধিধরের। তাঁর মুক্তির জন্যই তো আজ তোমাকে ডেকেছি এখানে আমি।

আমি বললাম, তার মানে?

উনি বললেন, বুদ্ধিধর নীলরতনের দু'চোখ উপড়ে নিয়ে জ্যান্ত তাঁকে পাঁচিলে গেঁথেছিলেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেই পাঁচিলের মধ্যে দাঁড়িয়ে হেসেছিলেন নীলরতন। সে হাসি শুনেই নাকি পাগ ়া হয়ে গেছিলেন বুদ্ধিধর! তাঁর যে শেষ পর্যন্ত কি হয় তা কেউ জানে না। বুদ্ধিধরের ছেলে ইংরাজদের কাছ থেকে কামান চেয়ে এনে গোপনে মূর্তিগুলো উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। মূর্তিগুলো ভাঙেনি। কামান দাগতে এসে সাহেব গোলন্দাজরা মূর্তিগুলো দেখে। ওদের কাছে ওগুলোর গঠন সৌন্দর্য এতই ভাল বলে মনে হয় যে কামান নিয়ে ওরা ফিরে যায়। ওদের মুখে মুখেই মূর্তিগুলোর কথা সাহেবদের মাঝে ছাড়িয়ে পড়ে। প্রথমে একজন-দুজন দেখতে আসে, ক্রমে ছুটিতে দল বেঁধে সাহেব-মেমরা দেখতে আসতে লাগল। কাছের আমবাগানে তাদের পিকনিকের জায়গা হলো। সিংহবাড়ির বার দানবের কথা, তারপর ছড়িয়ে পড়ল সব দিকে। ওগুলোকে আর ভেঙে ফেলার সুযোগই রইল না। দলে দলে সাহেব-মেমদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। বুদ্ধিধরের ছেলেকেই ওই সাহেব-মেমদের দেখাশুনা করতে হতো। তারা ওর পয়সায় খানাপিনা সেরে হাসিমুখে বলে যেত, দিজ সিনহা ডেভিলস আর রিয়েলি হরিবল! হি হু কার্ভড় দেম ইজ এ মাস্টার স্কালপ্টার। রাগে-দুঃখে বুদ্ধিধরের ছেলে ছটফট করত।

আবার থামলেন হলধরবাবু। কিছুক্ষণ আপন মনে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, আজ চতুর্দশী, শুনেছি এই চতুর্দশীর কোনো এক রাতেই বুদ্ধিধর নিরুদ্দেশ হয়ে যান। অমন ভয়ঙ্কর মানুষটার আর কোনো খবর পাওয়া যায় না। কেউ বলে তাঁকে প্রজারা গোপনে খুন করে। কেউ বলে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি হিমালয়ে চলে যান। সে যাই হোক, আজ তোমাকে ডেকেছি, তোমাকে এ বাড়ির পূর্বপুরুষদের পাপে জমা গুপ্তধনের হদিস দেব বলে। যার খবর এই বংশের প্রধান পুরুষরা পরপর শুনে এলেও, ভয়ে তার দিকে হাত বাড়ায়নি এতকাল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনাদের বংশের গুপ্তধন আমি নেব কেন?

উনি বললেন, নীলরতনের অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। এই পরিবারের পরবর্তী বহুজনের বহু সৎকাজেও ওই দ্বাদশ মূর্তি ভেঙে পড়েনি। বুদ্ধিধরের ছেলের পরে যাঁরা এ বংশে এসেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বিদ্যাবুদ্ধিতে যেমন অনেক উঁচুতে ছিলেন, তেমনি দানে-ধ্যানেও ছিলেন দিকপাল।

বুদ্ধিধরের নাতির নাতি, শক্তিধর, এই অঞ্চল থেকে নীলকর সাহেবদের আপন শক্তিতে উৎখাত করেছিলেন। জনসন কোম্পানীর পাপের বাসা নীলকুঠি ধূলোয় মিশিয়ে দিতে গিয়ে গুলিতে প্রাণ হারান তিনি। যেদিন তিনি মারা যান, ভীষণ শব্দে অভিশপ্ত মূর্তিগুলোর মধ্যে এগারোটাই পরপর একসঙ্গে ভেঙে পড়ে আপনা থেকেই। শুধু মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে এই দ্বাদশ ভয়ঙ্কর মূর্তিটা, এই বংশের সব থেকে ভয়ঙ্কর পুরুষের পাপের সাক্ষী হয়ে। কেউই পারেনি ওকে মুক্তি দিতে। হাসলেন হলধরবাবু। বললেন, আমি এই বংশের শেষ পুরুষ। তোমাকে আমি মানুষ করেছি শুধু ওই মূর্তিটাকে শাপমুক্ত করব বলে।

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে সে কাজ আপনি করবেন?

আগের মতোই হাসতে হাসতে উনি বললেন, আছে, উপায় আছে। সেই জন্যই তো তোমাকে আজ ডেকেছি আমি। আজ আমি যা করব, কথা দাও, তা শেষ করবে তুমি। এই বংশের তুমি কেউ নও। এই বংশের পাপের শেষ হয়ে গেলে তার জের আর তোমাতে বর্তাবে না। এমনি কিছু করব বলেই তো সুলক্ষণ দেখে তোমাকে আমি অনাথ আশ্রম থেকে তুলে এনে মানুষ করেছি।

আমি ভীষণ ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। আজ এ কি সব আবোল তাবোল কথা বলছেন হলধরবাবু! কি কাজ উনি রেখে যাবেন যা আমাকে শেষ করতে হবে! কি সে কাজ!

হলধরবাবু বললেন, অরুণ, আমি তোমার হাতে সেই গুপ্তভাণ্ডারের চাবি তুলে দেব। তুমি কথা দাও, এই গড়ের বুকে একটা বিশাল হাসপাতাল গড়বে। এমন হাসপাতাল, যা পৃথিবীর সেরা। যেখানে সবাই বিনামূল্যে চিকিৎসা করাতে পারবে। থামলেন হলধরবাবু, কেমন করে যেন তাকালেন আমার দিকে। ওঁর চোখের সে দৃষ্টি আমার মনে ভীষণ ভয় ধরিয়ে দিল। আজ ওঁর এ কি হলো!

উনি বলেই চললেন, সেই হাসপাতাল ঘিরে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠবে বিশাল এক শহর। গড়ের ইঁট পাথর মাটি সরিয়ে একটু একটু করে গড়ে উঠবে সে শহর। তার সঙ্গে এই সিংহ বংশের পাপের ইতিহাসও একটু একটু করে মুছে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে। তখন থাকবে শুধু আমার নাম। আর যেদিন আমার মূর্তির গলায় মালা পড়বে, জানি, ঠিক সেই দিনই ভেঙে পড়বে সব পাপের শেষ চিহ্ন ওই দ্বাদশ মূর্তিটা! সিংহ বংশের সব পাপের সেদিনই হবে শেষ। থামলেন তিনি।

আমি থাকতে না পেরে বললাম, এসব কি বলছেন আপনি! এ যুগে কি আর গুপ্তধন পাওয়া যায়! ভুলে যান ও সব কথা। মিথ্যা উত্তেজিত হবেন না।

ঠিকই বলছি আমি। উনি জোর দিয়ে বললেন, মনে রেখ, পাপের টাকা যদি তুমি অন্যভাবে খরচ কর, তাহলে তুমিও নিস্তার পাবে না। সিংহ বংশের সব পাপের বোঝাই তখন তোমার ঘাড়ে চাপবে। তুমি নরক যন্ত্রণায় জ্বলে মরবে। কথার শেষে শক্ত করে উনি আমার এক হাত ধরলেন। টলতে টলতে এগিয়ে চললেন বীভৎস সেই মূর্তিটার পিছন দিকে। আমিও যেন কেমন হয়ে গেলাম। বাধা না দিয়ে এগিয়েই চললাম। পিছনে দেওয়ালের আড়ালে একটা ছোট কুঠুরি। দরজা তার খোলা। আমাকে টেনে নিয়ে তিনি সেই ঘরের অন্ধকারের মাঝেই ঢুকলেন। অন্ধকার চোখে সরে যেতেই উনি দেওয়ালের গায়ের এক ফাটলে হাত রাখলেন। বোধ হয় বিশেষভাবে একটু চাপও দিলেন। বললেন, বুদ্ধিধরের পর আর কেউই এ ঘরে ঢোকেনি। জানি না কি আছে এর মধ্যে, তবে এ জানি, আছে সাত রাজার ধন। চোখ ধেঁধে যাবে তোমার।

ওঁর ধাক্কায় দেওয়াল নড়ল না। নড়বে কি, ও তো নিরেট পাথরে গাঁথা। ও কখনও নড়ে! বেশ বুঝতে পারলাম নানান চিন্তা-ভাবনায় হলধরবাবুর মনের অবস্থা বোধ হয় ঠিক নেই। হয়ত উনি নিজের

অজান্তেই আজও কি সব কথা ভাবছেন। অত টাকার কথা কি কেউ কখনও ভুলতে পারে। তবে যা কিছু ছিল, তা তো নিশ্চয়ই পূর্বপুরুষদের কেউ না কেউ ভোগ করে গেছেন। সব কিছু শেষ করে দিয়ে ওই গুপ্তধনের কথা রটনা করে গেছেন।

একি, দেওয়াল সরছে না কেন? চেঁচিয়ে উঠলেন হলধরবাবু, অরুণ এসো তো, হাত লাগাও। ঠিক এই জায়গাটাতে। ফাটলের বাঁদিক থেকে তৃতীয়, আর উপরের কোণ থেকে নবম, হ্যাঁ, এই পাথরটায়। জোরসে ধরে টান।

একটা বিশ্রী আওয়াজ তুলে দেওয়ালটা যেন ধসে পড়ল আমাদের চারপাশে। বহু যুগের জমানো ধুলো উড়ে অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। খক খক করে কাশতে আরম্ভ করলেন হলধরবাবু। কাশির মধ্যেই বললেন, দেখ, দেখ, কি আছে ভিতরে। অনেক অনেক হীরা জহরৎ টাকা পয়সা, নাকি সোনার বাট। যার লোভ এ বংশের অনেকেই জয় করে গেছেন। অরুণ তুমি কথা দাও, এ পয়সার তুমি সৎ ব্যবহার করবে।

আমি কোনো কিছু বলার আগেই বাইরেও কোথায় যেন ভীষণ শব্দ উঠল। বহুদিনের পুরানো কিছু যেন ভেঙে পড়ল। চারপাশের এই ভগ্নস্তূপের মাঝে তেমন কিছু হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সামনে আমি কি দেখব? ধুলোর মেঘ সরে গেলে।

ধুলোর মেঘ কাটল, আবছা অন্ধকারের মাঝে ক্রমে ক্রমে সব কিছু যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। আতঙ্কভরা চোখে আমি দেখলাম, কোথাও কিচ্ছু নেই। শুধু সামনের দেওয়ালের পাশে পড়ে আছে হলদে হয়ে যাওয়া একটা মানুষের কঙ্কাল। তাও লোহার শিকলে বাঁধা। মরচে ধরা শিকলের গাঁটগুলো ছড়িয়ে আছে হাড়ের ফাঁকে ফাঁকে। বীভৎস এই দৃশ্য অতীতের কোনো ভয়ঙ্কর শাস্তির সাক্ষী।

নজর আরও পরিষ্কার হলে দেখলাম, ঘরের দেওয়ালে ঘষে ঘষে হতভাগা কি যেন সব লিখে রেখে গেছে। সভয়ে কাছে গিয়ে পড়লাম, লেখা আছে, 'আমি বুদ্ধিধর, সারা জীবন নিজের বুদ্ধি নিয়ে গর্ব করেছি। আসলে আমি নির্বোধ। এখন তাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি।'

অনেকক্ষণ থমকে থেকে হলধরবাবু বললেন, আঃ, আমার মন থেকে অনেক বোঝা নেমে গেল। সোনাদানা না থাক এখানে, একজন মহাপাপীর আত্মোপলব্ধির কথা লেখা আছে এখানে। যে আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যায় তার তো মুক্তি হয়ে যাবার কথা? কথার শেষে উনি আমার দিকে তাকালেন। ওঁর দু'চোখে তখন কেমন যেন এক চাহনি। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, তাহলে ওই দ্বাদশ মূর্তিটা এখনও কেন অমনভাবে খাড়া আছে ওখানে? কথার শেষে প্রায় ছুটেই যেন ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন উনি। কি যেন ওঁর তখনি মনে পড়ে গেল।

আমি কিছুক্ষণ মাটিতে পড়ে থাকা কঙ্কালটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি ভয়ঙ্কর পাপের কি ভীষণ পরিণতি! তখনি আমারও মনে পড়ল, হঠাৎ যেন বাইরে কিছু ভেঙে পড়ার শব্দ শুনেছিলাম। সে শব্দ কিসের? হলধরবাবুর চিৎকার তখন শুনতে পেলাম। ভীষণ উত্তেজনায় আমার নাম ধরে বারবার ডাকছেন উনি।

ছুটে ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, ওঁর সামনে আর সেই দ্বাদশ মূর্তিটা নেই! সেখানে ভাঙা পাথরের স্তূপ। কাঁপা গলায় হলধরবাবু বললেন, আমার আত্মোৎসর্গ ছাড়াই এই অভিশপ্ত মূর্তিটা ধ্বংস হয়ে গেছে! তার মানে বংশপরম্পরায় বয়ে বেড়ান এক বীভৎস অভিশাপ থেকে আমি মুক্ত। বিশ্রী বিবেকযন্ত্রণা থেকেও আজ আমি মুক্তি পেলাম। চল, চলে যাই আমরা এই পাপপুরী ছেড়ে। লোকে তো বলেই, এই দ্বাদশ মূর্তির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই গড়ও ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই হোক! চল, চল, আমরা আর কোথাও চলে যাই।

[ফাল্গুন ১৩৯৩]

তিল থেকে তাল

শক্তিপদ রাজগুরু

বাগবাজার গঙ্গার ঘাট থেকে যাত্রী নিয়ে লঞ্চটা এসেছে হাওড়া স্টেশনের জেটিতে। যাত্রীরা নেমে গেছে সবাই। লঞ্চের সারেং বিভু সেই সকাল থেকে গঙ্গার বুকে লঞ্চ নিয়ে যাতায়াত করছে। দুপুরে এইসময় তাদের খাবার ছুটি মেলে ঘণ্টাখানেক। বিভু সারেং-এর ঘর থেকে নীচে নেমে আসে। লঞ্চটাকে জেটির ওদিকে রেখে নামবে সে। তার সহকারী কানুর কথা শুনে চাইল। কানু বলে, বিভুদা, কোনও প্যাসেঞ্জার বোধহয় তার ব্যাগটা ফেলে গেছে। ওটা জেটি অফিসে দিয়ে যাই, মাল নিতে কেউ এলে ওটা দিয়ে দেবে।

বিভু দেখে ওদিকে বেঞ্চটার ওপর একটা সাধারণ জিপ লাগানো ব্যাগ পড়ে আছে। কানু ওটা তোলার জন্য এগোতে যাবে। বিভু বলে ভীতকণ্ঠে, কানু, ওটাতে হাত দিস না।

কানু চাইল। বিভু খবরের কাগজ পড়ে, রেডিও শোনে। সে বলে, পুলিশ বলেছে বেওয়ারিশ কোনও ব্যাগ, প্যাকেট, অ্যাটাচি এসব পড়ে থাকতে দেখলে হাত না দিয়ে পুলিশকে জানাতে। কে জানে জঙ্গিদের কেউ বোমা রেখে যেতে পারে ওতে। সেবার কোন এক পুলিশ অফিসার এমনি এক বেওয়ারিশ ব্যাগ তুলতে গিয়ে বোমার ঘায়ে উড়ে গেছল। কে জানে এতে তেমন কিছু আছে কিনা। ওতে হাত দিয়ে কাজ নেই। অফিসে জানা, ওরা পুলিশে খবর দেবে।

জেটি অফিসে খবর দিতে তারাও দৌড়ে আসে। বেঞ্চের ওপর পড়ে আছে ব্যাগটা। মনে হয় ওটা যেন সাংঘাতিক একটা বস্তু। জেটির ম্যানেজার বলে, বিভু, তোমার লঞ্চ এখুনি জেটি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। ব্রিজের ত্রি-সীমানা ছাড়িয়ে দূরে গাং-এ রাখো লঞ্চ। কে জানে কখন কী হয়।

বিভুর খাওয়া-দাওয়া রইল মাথায়, সে লঞ্চ নিয়ে যায় আরও দূরে মাঝনদীতে।

এরমধ্যে খবর হয়ে গেছে যে, ওই লঞ্চে নাকি জঙ্গিদের বোমা রয়েছে। নদীতে নৌকা-চলাচল, লঞ্চ-চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। নদীর দুই তীরে যাত্রীদের ভিড়—নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। সাইরেন বাজিয়ে জলপুলিশও এসে গেছে। ওদের স্পিডবোটের আনাগোনা চলেছে। নদীর দুই তীরে কলকাতা পুলিশ, ওপারে বেঙ্গল পুলিশও ভিড় সামলাতে ব্যস্ত। বম্ব স্কোয়াডেও খবর গেছে—ওদের লোকজন এসে বোমা ডিফিউজ না করা অবধি লঞ্চ চলবে না। নদীর তীরে তখন সাজসাজ রব পড়ে গেছে। খবরের কাগজের রিপোর্টার মায় ক্যামেরা নিয়ে টিভি-চ্যানেলের লোকজনও এসে হাজির। তারা মাঝনদীতে দাঁড়িয়ে থাকা লঞ্চটার ছবি তুলছে। যে কোনও মুহূর্তে নাকি বিস্ফোরণ হতে পারে। পুলিশও লোকজনদের সরাচ্ছে।

ওদিকে বম্ব স্কোয়াডের লোকজন স্পিডবোট নিয়ে লঞ্চে হাজির হয়েছে। তারা দেখে দু'তীরের মানুষের এত কোলাহল, নদীর বুকে পুলিশের এত সাবধানতা, হৈ-চৈ, তার মাঝে পড়ে আছে ব্যাগটা। নিরীহ নিস্পন্দ একটা ব্যাগ। বিশেষভাবে শিক্ষিত একজন পুলিশ এগিয়ে গিয়ে দেখে ব্যাগটাকে। একটা কার্ডও লাগানো আছে। ওরা ব্যাগটা না খুলে সাবধানে সেই কার্ডখানা বের করে নেয়। ব্যাগটার জিপ খুললেই নাকি বিপদ হতে পারে। জিপ বন্ধ থাকা অবধি কোনও বিস্ফোরণ হবে না। ওরা সাবধানে ব্যাগটাকে তুলে নিয়ে চলে যায়।

এই সব সারতে সারতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। আবার লঞ্চ চলাচল শুরু হয়। তবে রিভার-ট্রাফিক চালু হতে বেশ কয়েক ঘণ্টা লেগে যায়। ইতিমধ্যে টিভি, রেডিওর খবরে লঞ্চ থেকে জঙ্গিবাহিনীর রেখে যাওয়া বোমার খবর সারা কলকাতার লোক জেনে গেছে। পুলিশও এবার তদন্তে নেমেছে। লালবাজারের বিশেষ সুরক্ষিত জায়গায় ওটা রাখা হয়েছে। খবর দেওয়া হয়েছে আরও বড় বোমা বিশেষজ্ঞকে পাঠাবার জন্য। কী ধরনের অত্যাধুনিক বোমা আছে সেটা জানা দরকার। তারপরই ওটাকে নিষ্ক্রিয় করা যাবে। তবে পুলিশ একটা কার্ডও পেয়েছে ব্যাগে। তাই নিয়েই তদন্তও শুরু হয়েছে।

বাগবাজারে নিরুপম চক্রবর্তী বড় ব্যবসায়ী। বাগবাজারে নিজের বাড়ি, বড়বাজারে তাঁর অফিস, ব্যবসা। তাঁর একমাত্র ছেলের উপনয়ন, বেশ জাঁকজমক করেই তিনি ছেলের উপনয়ন দেবেন। তাই দেশ থেকে তাঁদের কুলপুরোহিতের ডাক পড়েছে। নিরুবাবুদের বাড়ি বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে। নিরুবাবু কলকাতায় এসে ব্যবসা-বাণিজ্য করে এখন দিন ফিরিয়েছেন, তবু গ্রামের কথা ভোলেননি। রতন ভট্টাচার্য তাঁদেরই গ্রামের পুরোহিত।

শীর্ণ লম্বা প্যাঁকাটির মতো চেহারা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। মাঝখানে একটা শিখা। তাতে রতন খুড়ো পুজা করে একটা ফুলের পাপড়ি গিঁট দিয়ে বাঁধেন। খুড়োর দেহে মেদ-মাংস না থাকলেও গলাটা বেশ জোরালো। জোরে জোরে মন্ত্র পড়েন আর দক্ষিণার অঙ্ক বুঝে তাঁর পুজোর সময়ও নির্ধারিত হয়। খুড়ো গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছেন যজমানের বাড়িতে। নিরুবাবুর অর্ডার ছিল তাঁদের গ্রামের উৎকৃষ্ট গুড়ের পাটালি। আর একটা ব্যাগে তাঁর ধুতি, পাঞ্জাবি, নামাবলী। তার সঙ্গে তাঁর দোক্তাও এনেছেন একটা কৌটোতে। এই দোক্তাসহ পান খুড়োর নেশা। কলকাতায় দোক্তা পাবেন কিনা জানেন না। তাই বাড়িতেই তামাক পাতা ভেজে তার সঙ্গে নানা মশলা দিয়ে দোক্তা বানিয়ে একটা কৌটোতে পুরে ব্যাগেই নিয়েছেন। শ্যামবাজারে এক যজমানের বাড়িতে শ্রাদ্ধ সারতে হবে। তাই মোটা 'পুরোহিত দর্পণ' বইটাও নিয়েছেন গাইড বই হিসাবে।

দুটো ব্যাগ নিয়ে খুড়ো হাওড়া স্টেশনে নেমে লঞ্চঘাটে এসে বেলা দশটা নাগাদ লঞ্চে উঠেছেন বাগবাজারে যাবার জন্য। রাতে ট্রেনে ঘুম ঠিকমতো হয়নি। ফাঁকা লঞ্চে আয়েস করে বসেন ব্যাগ দুটোকে নামিয়ে। তারপর চোখ বুজে এসেছিল গঙ্গার ঠান্ডা হাওয়ায়। লঞ্চ এসে থেমেছে বাগবাজার ঘাটে। যাত্রীরা নেমে গেছে। হাওড়া যাবার যাত্রীরা হুড়মুড় করে লঞ্চে উঠেছে। তাদের হৈ-চৈ-এ খুড়োর ঘুম ভেঙে যায়। খুড়োও তাড়াতাড়ি ব্যাগ নিয়ে নেমে পড়েন। গঙ্গার ঘাট থেকে কিছু দূরেই নিরুবাবুর বাড়ি। বুড়ো গিয়ে হাজির হন সেখানে।

নিরুবাবু কুলপুরোহিতের থাকার ব্যবস্থা করেছেন তাঁর বাড়ির তিনতলায়। ওখানেই একটা ঘরে থাকবেন ভটচায মশায়। ওপরে ঠাকুরঘর, পুজোরও সুবিধা হবে। কিন্তু গোল বাধে তারপরই। স্নান করতে যাবেন রতনখুড়ো। দেখেন পাটালির ব্যাগটা এনেছেন কিন্তু তাঁর নিজের জামাকাপড়-দোক্তা-ভর্তি ব্যাগটাই নেই। কোথায় সেটাকে ফেলেছেন তাও ঠিক খেয়াল করতে পারেন না।

কোথায় যে ফেলে এলাম! কাপড়-চোপড় সব ছিল তাতে। এখন স্নান করি কী করে, নিরু বাবাজী?

নিরুবাবু তাঁর লোককে ডেকে বলেন, ঠাকুরমশাইকে দোকানে নিয়ে যাও। ওঁর যা-যা দরকার কিনে দাও। যান, ঠাকুরমশাই।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া চুকতে দেরি হয়। কাজের বাড়ি। অবশ্য রতনখুড়ো পুজো করে তারপর জলখাবার খেতে বসবেন। এমন সময় নিরুবাবুর বাড়িতে সাইরেন বাজিয়ে লালবাজার থেকে দু'তিনটে গাড়ি গিয়ে হাজির হয়। গাড়ি থেকে নেমে পুলিশের দল হাতে এস-এল-আর নিয়ে এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে পড়ে। পথের লোকজনদেরও আটকে দেয়। কয়েকজন পুলিশ উদ্যত রাইফেল নিয়ে বাগানে

ঢুকে পড়ে পাঁচিল টপকে। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে বাড়িতে সশস্ত্র জঙ্গি কেউ আছে। সাবধান। যে যেখানে আছেন নড়বেন না। আমরা সার্চ করছি।

নিরুবাবু বের হয়ে আসেন। কাজের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন ভরা। তারাও বিব্রত। নিরুবাবু পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেন, কী ব্যাপার, আপনারা?

আপনার বাড়িতে জঙ্গিরা এসে শেলটার নিয়েছে। তারা লঞ্চেও বোমা রেখেছে, যাত্রীসমেত লঞ্চ উড়িয়ে দেবার জন্য। আর ওই লঞ্চ হাওড়া ব্রিজের নীচ দিয়ে যাতায়াত করে। তাই সময়মতো লঞ্চটাকে ওড়াতে পারলে গোটা ব্রিজটাকেও ওড়াতে পারবে। এতবড় সাংঘাতিক পরিকল্পনা করে তারা এখানেই শেলটার নিয়েছে। নিজেদের নামও ভাঁড়িয়েছে তারা। এই দেখুন কার্ড। এটা পেয়েছি আমরা।

পুলিশ অফিসার বেশ কড়াস্বরে বলেন নিরুবাবুকে, ওই লোকটা নাম ভাঁড়িয়েছে। ওর নাম লিখেছে আপনার কার্ডে রতন ভট্টাচার্য।

নিরুবাবু অবাক হন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি রতন ভটচাযকে চেনেন। নিরীহ ধর্মভীরু বয়স্ক লোক। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। নিরুবাবু বলেন, উনি তো আমাদের গাঁয়ের কুলপুরোহিত। আমার ছেলের পৈতে দিতে এখানে এসেছেন।

পুলিশ অফিসার গর্জে ওঠেন, গাঁয়ে তো অনেকেই থাকে। তা বলে কি সেখানে চুরি, ডাকাতি, খুন এসব হয় না? চলুন, কোথায় সে?

অফিসার ভিতরে ঢোকেন। এমন সাংঘাতিক জঙ্গিকে ধরতেই হবে।

পুজো করার পর তিনতলার ঘরে রতনখুড়ো জলখাবার খেতে বসেছেন। নিরুর স্ত্রী ওঁর জন্য বড় থালায় লুচি, তরকারি, বোঁদে, রসগোল্লা এনেছে। ক্ষুধার্ত রতনখুড়ো সবে লুচি মুখে পুরতে যাবেন, এসে ঢোকেন পুলিশ অফিসার। হাতে উদ্যত রিভলবার। আরও দুজন পুলিশের হাতে রাইফেল। ওরা সাবধান হয়ে এসেছে এতবড় জঙ্গিকে ধরবার জন্য। গর্জে ওঠেন অফিসার, হাত উপরে তুলুন, হ্যান্ডস আপ্।

রতনখুড়ো সামনে ওইসব আগ্নেয়াস্ত্র দেখে চমকে উঠেছেন। হাতের লুচি পাশেই পড়ে যায়। ওদের ধমকে দু'হাত ওপরে তোলেন।

একজন পুলিশ তাঁর জামার পকেটে, কোমরে, গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে কোথাও কোনও গোপন অস্ত্র আছে কিনা। তারপর তাঁকে গোঁত্তা মেরে বলে, চলো। চলো লালবাজার—

রতনখুড়োর অবস্থা তখন করুণ। আর্তকণ্ঠে বলেন, ও নিরু বাবাজী, এরা ধরেছে কেন? কী করেছি?

একজন গর্জে ওঠে, ন্যাকা! বুড়োবয়সে টাকার লোভে জঙ্গিদের মদত দেওয়া! শয়তান। এখন বলে, কী করেছি!

পুলিশ অফিসার বলেন, নিরুপমবাবু, আপনার বাড়িতে এ শেলটার নিয়েছে। আপনার নামও জড়িয়ে আছে। আপনাকেও থানায় যেতে হবে।

নিরুপমবাবু বলেন, ভুল করছেন আপনারা।

সেটা না জানা অবধি আমাদের করার কিছু নেই। চলুন আপনিও।

কাজের বাড়ি। আত্মীয়-স্বজনরাও এসেছে। তাদের সামনে দিয়ে নিরুবাবু আর রতনখুড়োকে রাইফেল বাগিয়ে ধরে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল পুলিশ।

সকাল থেকে রতনখুড়োর খাওয়া নেই। কাল রাতে ট্রেনেও ঘুমোতে পারেননি। তারপর এই পুলিশের গুঁতো। তাঁর অবস্থা এখন কাঁপ ছটকানো ঘুড়ির মতো। নিরুপমবাবুও রাগে অপমানে গজগজ করেন। কে জানে খুড়ো হয়তো সত্যিই কিছু বেআইনি কাজ করেছে। তাঁর ঘাড়ে বন্দুক রেখে দাগতেই গিয়েছিল। শখ করে গ্রাম থেকে পুরোহিত আনতে গিয়ে এইভাবে ফেঁসে যেতে হবে ভাবেননি।

লালবাজারের পুলিশ হেড কোয়ার্টারের বিশেষ জায়গায় তখন বম্ব স্কোয়াডের স্পেশালিস্টও এসে গেছে। নিরাপদ দূরত্বে তারা নিরীক্ষণ করছে সেই ব্যাগটাকে। কী পরিমাণ কী ধরনের বিস্ফোরক আছে সেটা জানা দরকার। এসে গেছে পুলিশের গাড়ি। ব্যাগটা যে ফেলে গেছিল তাকেও ধরে আনা হয়েছে। রতন ভটচাযকে ওরা নিয়ে যায় সেইখানে। রতন ভটচায তাঁর ব্যাগটাকে ওখানে পড়ে থাকতে দেখে বলে ওঠেন, নিরু বাবাজী! ওই তো আমার হারানো ব্যাগটা। এখন দেখছি লঞ্চেই ওটা ফেলে গেছলাম।

পুলিশ অফিসার বলেন, কী আছে ওতে?

দেখাচ্ছি। দেখাচ্ছি—

রতন ভটচায এগিয়ে গিয়ে ব্যাগের চেন খুলতে এরাও সাবধান হয়ে ওঠে। সরে যায় ওরা চারিদিকে রাখা ব্যারিকেডের ওদিকে। কিন্তু অবাক হয় তারা। কোনও কিছুই ঘটে না। রতন ব্যাগ থেকে তাঁর জামাকাপড়, 'পুরোহিত দর্পণ' আর সেই কৌটো বের করতে আর একজন বলে, ওটা কী?

আমার দোক্তার কৌটো।

ঢাকনাটা খুলতেই বের হয় কড়া তামাকের সুবাস। যা পানের দোকানে পাওয়া যায়। নিরুপমবাবু বলেন, দেখলেন তো। ভুল বুঝে কী একটা কাণ্ড হয়ে গেল? অকারণে তুলে আনলেন আমাদের।

রতন বলেন, না বাবাজী। 'পুরোহিত দর্পণ' আর দোক্তার কৌটোটা হারালে যে বেদম মুশকিল হয়ে যেত। এরা এসব উদ্ধার করেছে। তাহলে যাই বাবা।

অফিসার এবার বিরক্তিভরে বলেন, এসব আর যেখানে-সেখানে ফেলে যাবেন না। যান।

[ফাল্গুন ১৪১৫]

গোয়েন্দা প্রলয় এবং সাইকেল রহস্য

দেবল দেববর্মা

সাইকেলটা পাওয়া যাচ্ছে না।

আশ্চর্য ব্যাপার! এই তো রাত্তিরে একতলার বারান্দায় দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে তড়িৎ সেটা রেখেছিল। ভবেন তখুনি সাবধান করল,—'বাইকটা অমনি বারান্দায় ফেলে রাখবি? ধর যদি কেউ নিয়ে চম্পট দেয়?' ওর কথা শুনে তড়িতের কিঞ্চিৎ ভয় হলো। কিন্তু পরেশ আর দিবাকর বলল,— 'ভয়টা কিসের? সাইকেলে যখন চাবি রইল তখন নিয়ে যাওয়া অমনি মুখের কথা? তাছাড়া ওটা যখন ঠেলে নিয়ে যাবে সেই শব্দেই তো কারো না কারো ঘুম ভাঙবে।'

সে কথা অবশ্য ঠিক। সাইকেলটা দেবাশীষ আর দিবাকরের ঘরের সামনে রয়েছে। গরমের দিন বলে রাত্তিরে ওরা দরজা খুলে রাখে। চোরের ভয় দেখালে জবাব দেয়,—'কী আর নিয়ে যাবে বল? খাতা-পেন্সিল আর দু-চারখানা বই তো সম্বল। চুরি করলেও বিক্রি করতে বাছাধন নাস্তানুবাদ হবে। এখানে তো আর ওল্ড বুক শপ নেই। তাছাড়া বছরের মাঝখানে পুরানো বই আর কে কিনবে বল?'

যে সময়ের কথা বলছি তখন এই ঝাড়গ্রাম শহরটা এমন জমজমাট হয়ে ওঠেনি। নিউ ঝাড়গ্রাম আর ওল্ড ঝাড়গ্রামের মাঝখানে প্রায় দেড় মাইল রাস্তা। দু'পাশে শালের বন, স্টেশনে যাবার পথে খানিকটা জায়গা বেশ নির্জন। তখন দিন দুপুরে ওখানে প্রায় নেকড়ে বাঘ কিংবা হুড়ার দেখা যেত। তবে সেগুলো মানুষের ক্ষতি করত না। বরং সাইকেলের শব্দ পেলেই এক লাফে পাশের ঝোপজঙ্গলে ঢুকে নিমেষে কোথায় গা-ঢাকা দিত।

সাইকেলটা তড়িতের নয়। তার মাসতুতো ভাই রমেনের। ওরা থাকে ঝাড়গ্রাম থেকে মাইল আষ্টেক দূরে, সড়িহাতে। পরশু বিকেলে রমেন এসেছে তার মাসীর বাড়ি—ওই সাইকেলে চেপে। ভারি চমৎকার সাইকেলটা—গাঢ় সবুজ রঙ...ইস্পাতের মতো ঝকঝকে হ্যান্ডেল। পিছনে একটা কেরিয়ার লাগানো। সামনের চাকাটা যেন রেসের ঘোড়ার মতো, দৌড়বার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। সীটে বসে প্যাডলে চাপ দিলেই গাড়িটা কী অনায়াসে ছুটতে শুরু করে।

ওই সাইকেলটা নিয়ে তড়িৎ স্কুলের হস্টেলে এসেছিল। আর একদিন বাদেই সামার ভেকেশান,— তাই রাত্তিরে ছেলেদের গ্র্যান্ড ফিস্ট। কেউ কেউ বন্ধুবান্ধবকে গেস্ট করে খাওয়ায়। সেই হিসেবে শঙ্কর আর দেবাশীষ তাকে হস্টেলে নেমন্তন্ন করে বলেছিল, খাওয়া-দাওয়া হতে হয়তো একটু দেরি হবে। তাই রাত্তিরটা এখানেই থেকে যাস। সকাল হলেই বাড়ি চলে যাবি।

কথাটা ওরা অবশ্য মিথ্যে বলেনি। তড়িৎ থাকে নিউ ঝাড়গ্রামে। ইস্টিশানের পাশে বাড়ি। আর ছেলেদের হস্টেলটা রাজবাড়ির কাছে পুরানো ঝাড়গ্রামে। তখনকার দিনে সন্ধ্যে মানেই অন্ধকার, রাস্তায় বিজলি বাতি দূরে থাক, তেলবাতিরও ব্যবস্থা ছিল না। আর ঝাড়গ্রাম তো একটা পুঁচকে মহকুমা শহর। নিউ ঝাড়গ্রামে এস. ডি. ও.-র অফিস আর মুন্সেফী আদালত। রেজেস্ট্রী অফিস, থানা, পোস্ট অফিস ছাড়া আর কী বা ছিল? তবে থানাটা পুরানো ঝাড়গ্রামে, হস্টেল থেকে বেশি দূরে নয়। রাত্তিরে খাওয়া সেরে বাড়ি ফিরতে হলে তড়িতকে ওই দেড় মাইল পথ অন্ধকারে একা যেতে হতো। ভূতের ভয় নাই হোক, কিন্তু জন্তু-জানোয়ার কিংবা সাপখোপের আশঙ্কা তো আছে।

দোতলায় প্রলয়ের ঘরে রাত্তিরে তড়িতের শোবার ব্যবস্থা হলো। পাশের সীটটা নৃপেন সরকারের। গত সপ্তাহে ছেলেটার হঠাৎ ধুম জ্বর। তাই হেড স্যারকে বলে ভেকেশানের আগেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাড়ি চলে গেছে। ওই খাটে একটা বিছানা পেতে তড়িৎ তোফা ঘুমলো। খাওয়ার পর রাত বারোটা পর্যন্ত বন্ধুরা মিলে জমাটি আড্ডা। তার সঙ্গে কোরাস গান, কখনও রসিকতায় সমস্বরে উচ্ছ্বসিত হাসি। নেহাৎ একদিন বাদেই সামার ভেকেশান শুরু হচ্ছে। তাই হস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট শুভঙ্কর স্যার কাউকে বকাঝকা করেননি। নইলে রাত দুপুর অব্দি এমনি গুলতানি হচ্ছে জানলে ছেড়ে কথা কইতেন না। হেডমাস্টারকে রিপোর্ট করবার আগে নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সকলকে অন্তত পাঁচ-ছ' ঘা বেত কষিয়ে দিয়ে যেতেন। তড়িৎ তখন ভাবতেও পারেনি আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার নতুন সাইকেলটা বেমালুম লোপাট হয়ে যাবে।

অবশ্য তড়িতের নিশ্চয় আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল। সাইকেলটা শুধু চাবি দিয়ে নিচে বারান্দায় ফেলে রাখা বোকামি হয়েছে। ইচ্ছে করলে গাড়িটা দোতলায় তুলে তার বিছানার পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখতে পারত। চোর কখনও ওপরে উঠে ঘরের ভিতর থেকে সাইকেলটা বের করে নিয়ে যেতে সাহস পেত না। তবে গাফিলতি তার একার নয়। ওই দেবাশীষ, পরেশ আর দিবাকরও এর জন্যে সমান দায়ী। ওরাই তো তাকে বারবার নিশ্চিন্ত করেছিল। সাইকেলে যে শুধু চাবি রইল তাই নয়, গরমের দিন বলে তারা তো দরজা খুলে রেখে ঘুমোয়। আর বারান্দায় সাইকেল নিয়ে টানাটানি করলে তাদের না হোক পাশের ঘরে শঙ্করের নিশ্চয় ঘুম ভাঙবে। ওর ঘুম এত পাতলা যে বারান্দায় খুট করে একটা শব্দ হলেই জেগে ওঠে।

বিকেলবেলায় নতুন সাইকেল দেখে সবাই কী তারিফ করেছিল। দিবাকর তার গাড়িটা নিয়ে মাঠের চারধারে পাঁই পাঁই করে এক পাক ঘুরে এলো। সাইকেল থেকে নেমে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলল, 'বিউটিফুল গাড়ি। কী দারুণ স্পীড রে—'

পরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কিনলি কবে? আগে তো দেখিনি।'

'কিনব কেন? সাইকেলটা তো আমার নয়।'

'তবে কার?'

'ওটা আমার মাসতুতো ভাই মানে রমেনের। সাইকেলটা অবশ্য নতুন কিনেছে খড়গপুর থেকে।'

শুধু দিবাকর নয়,—সন্ধ্যের আগে সৌরভ, শঙ্কর এমন কি সত্যেনও গাড়িতে উঠে বোঁ করে এক চক্কর দিয়ে এলো। তড়িতের নিশ্চয় বোঝা উচিত ছিল, বাইরে যখন ঘুরে এসেছে তখন শুধু তার বন্ধুদের নয়, নতুন গাড়ির ওপর আরো অনেকের নজর পড়েছে।

সকালবেলা দিবাকর তাকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলল। বলল, 'শীগগির ওঠ। তোর সাইকেলটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

এমন একটা দুঃসংবাদ কানে যেতেই তড়িৎ ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল। তারপর একলাফে খাট থেকে নেমে দুড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে এলো। বারান্দায় পা দিয়ে তার চোখ দুটো সেইখানে গিয়ে নিবদ্ধ হলো যেখানে গতকাল দেয়ালের গায়ে সাইকেলটা সে ঠেস দিয়ে রেখেছিল। এখন জায়গাটা ফাঁকা, সাইকেল দূরে থাক একটা ছোটখাটো জিনিসও সেখানে পড়ে নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে সৌরভ বলল, 'আমরা তো ভেবেছিলাম ভোরবেলায় উঠে সাইকেল নিয়ে তুই বাড়ি চলে গিয়েছিস।'

দিবাকর বলল, 'আমার মনে কেমন খটকা লাগল। তাই ওপরে উঠে তোকে ঘুমোতে দেখে ঠেলে তুললাম।'

শঙ্কর বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করল, 'খুব আশ্চর্য লাগছে, বুঝলি? রাত্তিরে আমি কিন্তু কোনো শব্দ শুনতে পাইনি। সাইকেলটা নিয়ে গেলেও তো একটা শব্দ হবে। অন্তত চাবি খোলার সময় খুট করে আওয়াজ হয়।'

তড়িতের মুখখানা শুকনো, নিষ্প্রভ দেখাল। প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। এখন বাড়ি ফিরে রমেনকে কী কৈফিয়ত দেবে? তার নতুন সাইকেলটা এইভাবে খোয়া যাবে জানলে নিশ্চয় তড়িতকে ওটা দিত না। বাবা শুনলে তাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন আরো কত কী বলে বকাঝকা করবে। তারপর বাড়ি ফিরে রমেনের যা অবস্থা দাঁড়াবে তা সে এখনই আন্দাজ করতে পারছে। অমন একটা দামী সাইকেল হারানোর ঘটনাকে কেউ সহজে মেনে নিতে পারবে বলে মনে হয় না।

দিবাকর এগিয়ে এসে বলল, 'কিছু তো একটা করতে হয়। সাইকেল নিয়ে চোর ব্যাটা হাওয়া হয়ে গেল আর আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব?'

'চল সুপারিনটেনডেন্ট স্যরকে ব্যাপারটা জানিয়ে আসি।' শঙ্কর বলল, 'উনি নিশ্চয় একটা কিছু বিহিত করবেন।'

'তাহলেই হয়েছে।' সৌরভ কেমন হতাশ ভঙ্গি করে তাকাল।

'শুভঙ্কর স্যরকে বলবি?' সত্যেন মন্তব্য করল, 'উনি স্রেফ একপ্রস্থ বকাঝকা করে থানাতে একটা চিঠি পাঠিয়ে দেবেন। তারপর বিকেলবেলা কিংবা সন্ধ্যের দিকে দারোগাবাবু এসে সব ঘটনা লিখে নিয়ে চলে যাবেন। ততক্ষণে চোর বাবাজী তড়িতের সাইকেল নিয়ে অন্তত চল্লিশ মাইল দূরে পালিয়ে গেছে।'

দেবাশীষ ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে জানাল, 'তাহলে কী করবি বল? সাইকেল চুরি গেলে থানায় তো একটা ডায়েরি করতেই হবে।'

দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে প্রলয় নামছিল। বেলা হয়েছে, তবে ওর একটু দেরিতেই ঘুম ভাঙে। রাত্তির এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত নানা ধরনের বই-টই পড়ে। তার মধ্যে গোয়েন্দা-কাহিনী ওর খুব প্রিয়। শার্লক হোমসের প্রায় সমস্ত ডিটেকটিভ গল্প পড়া। জুল ভার্নের নানা বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী প্রলয় সংগ্রহ করে রেখেছে। হস্টেলের সব ছেলের সঙ্গেই মেলামেশা, কিন্তু অকারণে দল পাকিয়ে হৈ-চৈ করা তার আদৌ পছন্দ নয়। বরং ওই সময়টা কোনো গ্রন্থের গভীরে সে ডুব দেয়। ডুবুরীর মতো তার অতল থেকে মণিমুক্তো সংগ্রহ করে।

প্রলয়কে দেখেই দেবাশীষ চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যালো শার্লক হোমস্। তাড়াতাড়ি নেমে এস। এখানে তোমার জন্যে একটা ইনটারেস্টিং কেস রয়েছে।'

'কেস?' প্রলয় ভ্রু কুঁচকে তাকাল।

দিবাকর বলল, 'হ্যাঁরে, কাল তড়িৎ যে সাইকেলটা নিয়ে এসেছিল সেটা রাত্তিরেই চুরি গেছে।'

চুরির কথা শুনে প্রলয় থমকে দাঁড়াল।

সৌরভ বলল, 'এরা যাচ্ছিল শুভঙ্কর স্যরকে খবর দিতে। তাহলেই পুলিশের খাতায় ডায়েরি হতো।' আড় চোখে তাকিয়ে ঈষৎ ব্যঙ্গ করে ফের বলল, 'তবে লাভ হতো না। দারোগাবাবু তদন্তে আসার অনেক আগে বামাল সমেত চোর বাবাজী বহুদূরে পালিয়ে যেত।'

প্রলয় বিজ্ঞের মতো বলল, 'তড়িতের ওটা বি. এস. এ. সাইকেল। সবুজ রঙ, পিছনে একটা কেরিয়ার। ফ্রেমের গায়ে ছোট্ট করে 'আর' অক্ষরটি লেখা। হ্যান্ডেলের সঙ্গে লাগানো গ্রীভস্‌গুলো সামান্য পুরু, অথচ বেশ নরম তাই না?'

'আশ্চর্য!' তড়িৎ অবাক হয়ে বলল, 'তুই সব খবর জানলি কেমন করে? সাইকেলে তো একবার হাতও দিসনি।'

দেবাশীষ তারিফ করে বলল, 'শার্লক হোমস্, এবার তোমার কেরামতিখানা দেখাও তো। যাতে চটপট তড়িৎ ওর সাইকেলটা ফিরে পায়।'

শঙ্কর বলল, 'হ্যাঁ, তবে বুঝব রাশি রাশি গোয়েন্দা গপ্‌পো পড়ে তুই সত্যি কিছু শিখেছিস।'

প্রলয় অনেকক্ষণ চিন্তা করল। মৃদু হেসে বলল, 'ঠিক আছে, কেসটা আমি নিলাম। তবে আমাকে চার ঘণ্টা টাইম দিতে হবে। তার মধ্যে যদি তড়িতের সাইকেলের কিনারা করতে না পারি তাহলে পুলিশে খবর দিও।'

তড়িৎ এগিয়ে এসে তার হাত দুটো ধরে বলল, 'সাইকেলটা উদ্ধার করে দে ভাই। নইলে বাড়ি ফিরে রমেনের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না।'

প্রলয় কোনো কথা না বলে তার ঘর থেকে একটা ব্যাগ নিয়ে এলো। সাইকেলটা যেখানে ছিল, পা টিপে টিপে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ কী যেন লক্ষ্য করে বারান্দার ধার ঘেঁষে কয়েকবার এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে বেড়াল।

রাস্তা থেকে ছাত্রাবাস বেশ খানিকটা দূরে। সাদা বাড়ি—সামনে অনেকখানি মাঠ। একপাশে লাল মাটির সরু পথ। বড় রাস্তায় গিয়ে পৌঁছতে অন্তত তিন-চার মিনিট লাগে।

ব্যাগ থেকে একটা বড়ো আতসকাঁচ বের করে প্রলয় বারান্দা থেকে নেমে এলো। পথের উপর ঝুঁকে কী যেন সে লক্ষ্য করছিল। গতকাল মাঝরাত্তিরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাস একটু শীতল হতেই সকলের চোখে ঘুম জড়িয়ে এসেছিল। সেই ফাঁকে চোর বাবাজী তার কম্মো সেরে বামালসুদ্ধ পালিয়েছে।

লাল মাটির সরু পথ ধরে প্রলয় বড় রাস্তা পর্যন্ত ঘুরে এলো। গতকাল বৃষ্টির দরুন মাটি এখনও ঈষৎ ভিজে। তবে রোদ উঠলেই জলটুকু টেনে নেবে।

পিছন থেকে সৌরভ মন্তব্য করল, 'এখানে খোঁজাখুঁজি করে কোনো লাভ আছে? তড়িতের সাইকেল এখন পগার পার। কতদূরে চলে গেছে কে জানে?'

প্রলয়কে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। গালে আলতো হাত রেখে সে বলল, 'চোর বোধহয় সাইকেলটা নিয়ে বেশিদূরে যেতে পারেনি। মনে হয় সেটা আশেপাশেই রয়েছে।'

'কী বলতে চাস তুই?' দিবাকর পাল্টা শুধোল। বলল, 'হস্টেলের ঘরগুলো একবার তল্লাসী করে দেখব নাকি?'

'তার প্রয়োজন নেই।' প্রলয় মাথা নাড়ল। বলল, 'চোর কখনও অত বোকা হয় না। অত বড় একটা সাইকেল হস্টেলের ঘরে লুকিয়ে রাখলে তার কি নিস্তার আছে?'

সৌরভের ঘরে ঢুকে প্রলয় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। বেশ ভারিক্কী চালে বলল, 'তাহলে ইনভেস্টিগেশন শুরু করি?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়।' দিবাকর তাকে উৎসাহিত করল। প্রলয় বলল, 'আচ্ছা, হস্টেলে নতুন লোক কেউ এসেছে? এই ধর মাস পাঁচ-ছয়ের মধ্যে?'

'তুই কি কাজের লোকের কথা বলছিস?'

'হ্যাঁ, কিংবা তাদের সঙ্গে যদি কেউ বসবাস করে। হয়তো অন্য কোথাও চাকরি নিয়ে এখানেই থাকে।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেল ঠাকুরের এক ভাইপো এসে তার সঙ্গে রয়েছে। নিউ ঝাড়গ্রামে কোন দোকানে কাজ করে। রাত্তিরটা এখানে শোয়। এ ছাড়া হস্টেলের পিছনে একটা ঘরে স্কুলের মালী থাকে। তার এক বন্ধু তিন-চার মাস হলো এখানেই আছে। সঙ্গে বছর দশ'-এর একটি মেয়ে।

সৌরভ বলল, 'শুনলাম কাল রাত্তিরে তিন-চারটে ভিখিরি এসেছিল! গ্র্যান্ড ফিস্ট কিনা, খাওয়া শেষ হলে এঁটো-কাঁটা যা পায়, তাই ওরা তুলে নেয়।'

প্রলয় মাথা নেড়ে বলল, 'এ চুরি ভিখিরির কাজ বলে মনে হয় না। আমার ধারণা চোর এখানের লোক। এদিককার অন্ধিসন্ধি সে জানে।'

ততক্ষণে সাইকেল চুরির খবর চাউর হয়ে গেছে। ভাগ্যিস শুভঙ্কর স্যর ভোরে উঠে কোথায় যেন গিয়েছেন। নইলে এতক্ষণ দাপাদাপি, হম্বিতম্বি শুরু হয়ে যেত।

চেয়ারে হেলান নিয়ে প্রলয় বলল, 'হস্টেলে কাজের লোক এবং তাদের আত্মীয়-বন্ধু যারা রয়েছে তাদের একবার ডাক।' এক মুহূর্ত থেমে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে ফের জানাল—'সকলকে এখন বাইরে যেতে হবে কিন্তু। একলা ঘরে আলাদাভাবে ওদের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।'

মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘর ফাঁকা। দিবাকর সকলকে প্রায় তাড়া দিয়ে বাইরে নিয়ে গেল। সৌরভ আর শঙ্কর ছুটল কাজের লোক আর তাদের আত্মীয়-বন্ধুদের ডেকে আনতে। পিছন থেকে সত্যেন চেঁচাল, 'না আসতে চাইলে জোর করে ধরে আনবি, বুঝলি?'

কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না। হস্টেলে চারজন লোক কাজ করে। একজন ঠাকুর, অন্যজন তার অ্যাসিস্ট্যান্ট। এছাড়া দুজন চাকর, তারা বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়। বাজার-হাট ফাইফরমাশ, প্রয়োজন হলে অন্য কাজেও খাটে। ঠাকুরের সেই ভাইপো আর মালীর বন্ধুটিও এসেছে। শুধু মালী নেই, দু'দিন আগে সে নাকি বাড়ি চলে গেছে। একেবারে সামার ভেকেশানের ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসবে।

প্রলয় প্রথমে ঠাকুরকে ডাকল। ষাটের কাছাকাছি বয়স, হস্টেলে প্রায় পনের বছর কাজ করছে। সাদাসিধে লোক। দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করে মানুষটার সম্বন্ধে তার কোনো আগ্রহ রইল না। উঁহু, রাত দুপুরে বারান্দায় গিয়ে সাইকেল চুরি করবার মতো দুঃসাহস এর হবে না।

ঠাকুর চলে যেতেই তার সহকারী এসে ঘরে ঢুকল। কোনো প্রশ্ন করবার আগেই মুখ কাঁচমাচু করে বলল, 'দাদাবাবু, বিশ্বাস করুন। এর বিন্দুবিসর্গ আমি জানিনে। সাইকেল কে নিয়েছে তাও বলতে পারব নি।'

প্রলয় আপাদমস্তক লোকটাকে নিরীক্ষণ করল। বয়স তিরিশের মতো হবে। রোগা সিড়িঙ্গে চেহারা। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় বেশ ভীতু। সাইকেল চুরির ব্যাপারে ডাকা হয়েছে বলেই বোধহয় তার পা দুটো ঈষৎ কাঁপছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে প্রলয় জিজ্ঞাসা করল, 'কাল রাত্তিরে তুমি ঘর থেকে বেরিয়েছিলে?'

'আজ্ঞে না। রান্নাঘরের পাট চুকতেই তো রাত্তির বারোটা হলো। তারপর এক ঘুমে রাত কাবার।'

'তড়িতের সাইকেলটার কি রঙ বলতে পার?'

'আজ্ঞে, আজ্ঞে না।' লোকটা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

'তুমি সাইকেল চালাতে জানো নিশ্চয়?'

'না দাদাবাবু।' সে আরো ভয় পেয়েছে মনে হলো।

প্রলয় তাকে ছেড়ে দিয়ে চাকর দুটোকে ডাকল। এদের সে ভালোরকম চেনে। তিন-চার বছর রয়েছে। ছেলেদের ঘরে ঢুকে ঝাঁটপাট দেয়। কিন্তু কোনোদিন একটা নয়া পয়সা হাতিয়েছে বলে কেউ অপবাদ দেয়নি। এদের রগড়ালে চুরির কোনো কিনারা হবে বলে প্রলয়ের মনে হলো না।

পরের জন ঠাকুরের সেই ভাইপো। কুড়ি-বাইশ বছরের ছোকরা। স্বাস্থ্য ভালো, নিপাট ভালোমানুষের মতো মুখ,—যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে শেখেনি। এমনও হতে পারে ছেলেটা ঢঙ করছে, যাতে কেউ ওকে না সন্দেহ করে।

'কোথায় কাজ কর তুমি?' প্রলয় শুধলো।

'নিউ ঝাড়গ্রামে।' বলেই সে একটা দোকানের নাম করল।

'কাল রাত্তিরে কখন ফিরলে?'

'আজ্ঞে তা প্রায় আটটা-নটা হবে।'

'এখানে মানে এই বারান্দায় একটা সাইকেল ছিল জানতে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ছোকরা মুখ তুলে তাকাল। বলল, 'ওই তো বারান্দার ওধারে সাইকেলটা দেয়ালে ঠেসানো ছিল। বেশ নতুন মানে দামী জিনিস।'

প্রলয় সন্দিগ্ধ চোখে তাকে আর একবার নিরীক্ষণ করল। ছোকরা বলে কী? নতুন আর দামী সাইকেল মানে ওর মনপসন্দ বুঝি? তারপর রাত দুপুরে মাল হাপিস করে এখন দিব্যি সাধু সেজে বেড়াচ্ছে।

ভ্রু কুঁচকে প্রলয় শুধলো, 'সাইকেল চালাতে জানো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', সে ঘাড় হেলিয়ে রইল। ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে ফের বলল, 'নিজের একটা সাইকেল থাকলে দোকানে যাতায়াতের খুব সুবিধে হতো।'

প্রলয় কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য! এসব কথা এখন কেউ বলে নাকি? টেবিলে পেন্সিলের সাহায্যে একটা টোকা মেরে আর একটা প্রশ্ন ওর দিকে সে ছুড়ে দিল, 'গতকাল রাত্তিরে ঘর থেকে বেরিয়েছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' সে স্পষ্ট জবাব দিল।

'কখন?'

'শেষ রাত্তিরে।'

'কেন উঠেছিলে?'

সলজ্জ হেসে সে উত্তর দিল, 'আজ্ঞে বিড়ি খেতে। কাকা ঘরে থাকে কিনা, তাই—'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে প্রলয় ওকে যেতে বলল। মালীর সেই বন্ধুকে এবার সে ডেকে পাঠাল। লোকটা শক্ত-সমর্থ, চল্লিশের মতো বয়স। গায়ে একটা নীল রঙের জামা, পরনে আধময়লা ধুতি।

প্রলয় প্রশ্ন করল, 'তুমি মালীর ঘরে থাক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সঙ্গে তোমার মেয়ে থাকে?'

'আজ্ঞে।'

'এখানে কোথায় কাজ কর?'

লোকটা একজন ঠিকাদারের নাম করল।

'গতকাল রাত্তিরে ওই বারান্দায় একটা সাইকেল ছিল জানতে?'

'আজ্ঞে না।' সে মাথা নাড়ল।

'রাত্তিরে তুমি ঘর থেকে বেরিয়েছিলে?'

'না বাবু। সারাদিন খেটে বেহুঁশ হয়ে ঘুমোই।'

প্রলয় বুঝতে পারল কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। লোকটা ধূর্ত। প্রশ্নের জবাবে দিব্যি নিজেকে আড়াল করে রাখতে জানে।

অগত্যা ওকে ছেড়ে প্রলয় তার মেয়েকে ডেকে পাঠাল। বছর দশ বয়স হবে। রোগা, পরনে একটা ফ্রক, তাও পিছনে তালি। খালি পা, তেল মাখেনি বলে ঈষৎ রুক্ষ লাগছে।

প্রলয় তাকে কাছে ডাকল। পকেট থেকে একটা লজেন্স বের করে দিতেই মেয়েটি ফিক করে হাসল। সে খানিকটা সহজ হয়েছে বুঝতে পেরে প্রলয় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা মালীর ঘরে থাক?'

'হ্যাঁ।' মেয়েটি জবাব দিল।

'গতকাল রাত্তিরে তোমার বাবা কি বাইরে গিয়েছিল?'

মেয়েটি মনে করবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো জবাব দিতে পারল না।

প্রলয় ওকে সাহায্য করল, 'ধর, রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে হাত বাড়িয়ে তুমি বুঝতে পারলে তোমার বাবা পাশে শুয়ে নেই।'

মেয়েটি ফের ভাবল, কিন্তু তেমন কিছু বোধহয় স্মরণ হলো না। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ঘুমের ঘোরে একবার শুধু মনে হলো বাবার পা দুটো যেন ভিজে।'

'ভিজে?' প্রলয়ের চোখ দুটি এবার উজ্জ্বল হলো। মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'তখন কত রাত্তির হবে বলতে পারো?'

মেয়েটি ফের চিন্তা করল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, 'খানিক আগেই তো শেয়ালগুলো ডেকে উঠল।'

প্রলয় উঠে দাঁড়াল। দেবাশীষ আর দিবাকরকে ডেকে বলল, 'চল, একটা ক্লু বোধহয় পাওয়া গেছে।'

'ক্লুটা কি? বলবি?' দেবাশীষ শুধলো।

'ভিজে পা আর শেয়ালের ডাক।' প্রলয় বিড়বিড় করল। এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'মনে হয় সাইকেলটা কাছেই রয়েছে।'

'কাছে মানে?' দিবাকর জিজ্ঞাসা করল। 'তোর কি মনে হয় সাইকেলটা মাঠে ফেলে রেখেছে?'

'তাই কখনও হয়?' প্রলয় পাল্টা প্রশ্ন করল। বলল, 'মাঠে পড়ে থাকলে এতক্ষণ নিশ্চয় খবর পেতিস।'

হস্টেলের পিছনে খানিকটা দূরে একটা পুকুর। পাশেই মাঠ। দুই বন্ধুকে নিয়ে প্রলয় ধীর পদক্ষেপে জলের ধারে এসে দাঁড়াল। তারপর সন্তর্পণে কী যেন খুঁজতে খুঁজতে পুকুরটার চারপাশে টহল দিতে লাগল। হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে উঠল, 'ইউরেকা, পেয়েছি পেয়েছি।'

দিবাকর চেঁচিয়ে শুধোল, 'কী পেয়েছিস?'

ততক্ষণে প্রলয় পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মিনিট দুই-তিন এদিক-সেদিক হাতড়ে সে হঠাৎ জলের নিচে থেকে সাইকেলটা টেনে তুলল।

দেবাশীষ চেঁচিয়ে উঠল,—'হুররে! তড়িতের সাইকেল পাওয়া গেছে।'

ইতিমধ্যে ছেলের দল ছুটে এসেছে। সাইকেল দেখে সবাই আহ্লাদে আটখানা। জল থেকে উঠে প্রলয় বলল, 'আগে একটা গামছা আন। গা-হাত মুছে একটু শুকিয়ে নিই।'

প্রলয় তার পর্যবেক্ষণের কথা বলছিল। রাত্তিরে এক পশলা বৃষ্টি হলো অথচ রাস্তার কোথাও সাইকেলের চাকার দাগ নেই। তখুনি সন্দেহ হলো সাইকেলটা কেউ ঠেলে নিয়ে যায়নি। অন্তত কিছুদুর পর্যন্ত কাঁধে তুলে নিয়ে গেছে। সুতরাং লোকটা শক্তসমর্থ। তাছাড়া চোখের সামনে চুরি, পাকা চোর না হলেও তার বুকের পাটা আছে। হস্টেলের কাজের লোকেদের মধ্যে কাউকে তেমন মনে হলো না। আর ঠাকুরের ওই ভাইপো? ওটা স্রেফ বকবক করে, যাকে বলে বখতিয়ার। রাত দুপুরে সাইকেল তুলে সটকে পড়ার ওর মুরোদ নেই। শেষ পর্যন্ত ওই মালীর বন্ধু, বেশ ষণ্ডা চেহারা। সাইকেল কাঁধে অন্তত সিকি মাইল দিব্যি হাঁটতে পারে। তারপর কথাবার্তায় চৌখশ, একটু ধূর্ত বলেই মনে হলো। রাত্তিরে বিছানা ছেড়ে বাইরে এসেছিল সেকথা স্বীকার করল না। কিন্তু মেয়েটা সত্যি কথা বলল। রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শুতে গিয়ে ওর মনে হলো বাবার পা দুটো ভিজে। তার একটু আগেই শেয়াল ডেকেছিল, অর্থাৎ সেটা শেষ প্রহর। তখুনি সন্দেহ হলো সাইকেলটা হয়তো সে পুকুরের জলে ডুবিয়ে রেখেছে। কাল থেকে হস্টেল ছুটি, দরজায় তালা ঝুলবে। সন্ধ্যের পর জল থেকে টেনে তুলে নিয়ে যাবে।

দিবাকর বলল, 'সাইকেলটা যে এই পুকুরে ডুবিয়ে রেখেছে তা কেমন করে বুঝলি?'

'কেন? পুকুরের ধারে কাদায় চাকার দাগ রয়েছে যে।'

সত্যেন শুধলো, 'কিন্তু মালীর ওই বন্ধু যে গাড়িটা চুরি করেছিল তার প্রমাণ কি?'

'অকাট্য প্রমাণ রয়েছে।' প্রলয় জবাব দিল। বলল, 'লক্ষ্য করে দেখবি লোকটার বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা সামান্য কাটা। সাইকেলের টায়ারের দাগের পাশে ওর সেই আঙুল কাটা পায়ের দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।'

চিৎকার করে দেবাশীষ বলল, 'থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ার শার্লক হোমস্।'

সকলের সঙ্গে তড়িতও সমস্বরে ধ্বনি দিল—'হিপ্ হিপ্ হুররে।'

[শারদীয়া ১৩৯৪]

টিয়া রহস্য

অজেয় রায়

।।১।।

দীপক দিন কয়েক বাইরে ছিল। দুপুরে বোলপুরে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরেই সে সোজা চলল বঙ্গবার্তার অফিসে। বঙ্গবার্তার সে একজন রিপোর্টার।

ভবানী প্রেসের একধারে সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তার অফিস। শ্রীনিকেতন রোডের ওপর লম্বা ঘরখানায় কালিঝুলি মাখা কয়েকজন কর্মী প্রেসের কাজে ব্যস্ত। রাস্তা থেকে প্রেসের বারান্দায় পা দিয়েই দীপক থমকে গেল। একি! খোলা বারান্দায় ছাদের হুকে বাঁধা দড়িতে ঝুলছে একটা পাখির খাঁচা। তার ভিতর দাঁড়ে বসে একটি বড়সড় টিয়া পাখি। খাঁচার ভিতর ছোট ছোট বাটিতে রয়েছে ছোলা আর জল।

এ পাখিটা কার? এখানে কেন বাইরে বারান্দায়। যাবার আগে তো দেখিনি?

খাসা দেখতে পাখিটা। চকচকে সবুজ গা। লাল বাঁকা ঠোঁট। ঘাড় বেঁকিয়ে টেরিয়ে দেখছে দীপককে। হঠাৎ পাখিটা খুব দ্রুত খানিক তীক্ষ্ণ নাকি সুরে উচ্চারণ করে উঠল—'কে কে কে'—অনেকবার।

অমনি প্রেসের পিয়ন হারু বারান্দায় উঁকি মারল।

দীপক হারুকে জিজ্ঞেস করল, 'পাখিটা কার?'

হারু আঙুল দেখাল বঙ্গবার্তার অফিস ঘরের দিকে। ওখানে বসেন ভবানী প্রেসের মালিক এবং সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তা কাগজের মালিক ও সম্পাদক শ্রীকুঞ্জবিহারী মাইতি।

কুঞ্জবাবুর যে পাখির শখ আছে জানত না দীপক। তার ওপর আবার প্রেসের বারান্দায় যেন সবাইকে দেখাতে রাখা হয়েছে পাখিটা। দীপক প্রেসের ভিতর ঢুকে ঘরের এক কোণে কাঠের পার্টিশান ঘেরা সম্পাদক মশায়ের চেম্বারের সুইং-ডোর ঠেলল।

মধ্যবয়সী গাট্টাগোট্টা কুঞ্জবাবু তাঁর ছোট্ট কামরায় চেয়ারে বসে টেবিলে ঝুঁকে প্রুফ দেখছিলেন। চশমার ওপর দিয়ে গোল গোল রক্তাভ চোখের দৃষ্টি হেনে হেঁড়ে গলায় দীপকের উদ্দেশে আধা গর্জন ছাড়লেন—'এই যে ইয়ংম্যান, শ্রীমান দীপক রায়, তা এদ্দিন ডুব মারা হয়েছিল কোথায়?'

দীপক বুঝল যে তার পদবিসুদ্ধ গোটা নাম ধরে ডাকার অর্থ, সম্পাদকমশায়ের মেজাজ খিঁচড়ে আছে। সে চেয়ার টেনে সামনে বসে হাসি মুখে বলল, 'মামার বাড়ি গিছলাম। অনেক দিন পর গেছি। আসতে দিতে চায় না।'

'হুম।'

'পাখিটা কোত্থেকে পেলেন?' কৌতূহলী দীপক প্রশ্ন করে ফেলে।

'পেলাম মানে?' ফেটে পড়েন কুঞ্জবিহারী, 'উনি আমার ঘাড়ে চেপে বসেছেন। উপকার করতে গিয়ে আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছি হে। এখন না পারছি ফেলতে, না পারছি রাখতে।'

'কি ব্যাপার?' দীপক উদ্‌গ্রীব।

হাতের পেনটা খটাস্ করে টেবিলে রেখে, চেয়ারে গা এলিয়ে কুঞ্জবিহারী জানালেন, 'আর বল কেন। পাঁচ দিন আগের ব্যাপার। ভোরে ছাদে উঠে পায়চারি করছি, কোত্থেকে ওই টিয়াটা উড়ে

এসে বসল কার্নিশে। ভয় পাচ্ছে না। ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছে আমায়, আবার কক্ কক্ করে কি সব বলছে। মজা লাগল। তারপর দেখি ওর পায়ে একটা পেতলের রিং পরানো। মনে হলো কারও পোষা পাখি পালিয়ে এসেছে।

'আগের দিন ছাদে ডাল শুকোতে দিয়েছিল। তাই কিছু পড়েছিল। পাখিটা নেমে তাই খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল। বুঝলাম, ওর খিদে পেয়েছে। নিচে গিয়ে কিছু চাল আর গম এনে দেখি পাখিটা তখনো রয়েছে। ছড়িয়ে দিতেই টপাটপ চাল-গম সাবড়ে দিল। তখন ছাদে মোড়ায় বসে ডাকলাম, আঃ আঃ। গুটি গুটি পাখিটা এসে হাজির হলো পায়ের কাছে।

'টিয়াটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। কিচ্ছু বলল না। একটু ভয় করছিল বটে। যা খড়্গের মতন ঠোঁট। ঠোক্কর দিলেই গেছি। তারপর পাখিটা আর সঙ্গ ছাড়ে না।

'ছাদ থেকে নেমে দোতলার বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি। বেরুব প্রেসে। পাখিটা উড়ে এসে ফের বসল, সামনের রেলিঙে। পাঁউরুটির টুকরো দিলাম। দিব্যি খেল। গটগট করে পায়চারি করতে লাগল বারান্দার রেলিঙ ধরে।

'তখন আমার মাথায় একটা ভাবনা জাগল, পাখিটাকে বেড়ালে না ধরে। আমাদের পাড়ায় গুচ্ছের বেড়াল ঘোরে। কার পোষা পাখি? তাই এমনি মানুষ-ঘেঁষা স্বভাব। বাড়িতে একটা পুরনো পাখির খাঁচা ছিল। তাইতে পুরে দিলাম পাখিটাকে। বাটিতে জল আর খাবার দিলাম। তারপর খাঁচা ঝুলিয়ে দিলাম বারান্দায়।

'গিন্নী আপত্তি করেছিল। আমার স্ত্রী পশু-পাখি পুষতে চায় না। বললাম, দুপুরে ফিরে ওটার ব্যবস্থা করব। কারও পোষা পাখি। পালিয়ে এসেছে। মালিককে খুঁজতে হবে।

'তা দুপুরে খেতে ফিরে দেখি গিন্নী ফায়ার। নাকি পাখিটা সমানে—'কে কে' আবার মাঝে মাঝে—'পুঁটি পুঁটি' বলে চেঁচিয়েছে।

'তা আমার গিন্নীর ছেলেবেলায় ডাকনাম ছিল পুঁটি। তাতেই খেপেছে বেশি। পত্রপাঠ পাখি বিদায় করতে হুকুম দিল।

'তখন পাখিটা নিয়ে এলাম প্রেসে। খাঁচাসুদ্ধ বাইরে বারান্দায় ঝুলিয়ে রেখেছি যদি মালিকের চোখে পড়ে। বঙ্গবার্তায় পরপর দু'দিন বিজ্ঞাপনও দিয়েছি বর্ণনা দিয়ে। কিন্তু চার দিন হয়ে গেল কেউ আসেনি টিয়াটা ক্লেম করতে। আচ্ছা ঝঞ্ঝাটে পড়েছি।'

দীপক বলল, 'আহা ঝঞ্ঝাটের কি? এখানে রইল না হয় ক'দিন। দুটো খেতে দেওয়া বৈ তো নয়। বেশ দেখতে পাখিটা।'

'নয় ঝঞ্ঝাট?' তেড়েফুড়ে ওঠেন কুঞ্জবাবু, 'রাতে তো এখানে রাখা যায় না। কেউ থাকে না প্রেসে। তাই হারুকে বলে ঠিক করেছি, ও পাখিটা বাড়ি নিয়ে যায় প্রেস বন্ধর সময়। ছোলা, ছাতু, লঙ্কা—টিয়া পাখির এইসব খাবার ব্যবস্থা হারুই করে। তাই রোজ ওকে পাঁচ টাকা করে দিতে হয়। ডেইলি গচ্চা যাচ্ছে টাকাটা।'

'ডেইলি পাঁচ কেন?' দীপক অবাক হয়ে বলে।

'কে জানে? হারুই হিসেব করে বলল। তাই দিচ্ছি। কতটা নিজে মারে গড নোজ। উপায় কি? এক এক সময় ভাবি চুলোয় যাক। দিই ছেড়ে। আবার মায়া হয়—পোষা পাখি। তেমন সতর্ক তো নয়। বেড়ালে খাবে কিংবা দুষ্টু লোকে ধরে বাজারে বিক্রি করে দেবে। কেমন হাতে পড়বে? যত্ন করবে কিনা কে জানে?' গুম মেরে গেলেন কুঞ্জবিহারী।

দীপক কুঞ্জবাবুর এই আত্মত্যাগের প্রশংসা করার আগেই তিনি ফের ফোঁস করে ওঠেন—'আর এক ঝামেলা হয়েছে। জনে জনে জবাব দিতে দিতে জেরবার হয়ে গেলুম।'

কুঞ্জবিহারী তাঁর ঝাঁটা গোঁফ ফুলিয়ে চোখমুখ ঘুরিয়ে নকল করেন—'পাখিটা কবে কিনলেন? কোত্থেকে? কথা বলে? কি খায়? হেন তেন। ছাপার কাজে যারা আসচে তাদের প্রশ্ন তো আছেই।

পথ-চলতি চেনা লোকও ঢুকছে এইসব প্রশ্ন করতে। কাজকর্মের ডিস্টারবেন্স। যাক্‌গে, আর দুটো দিন দেখব। তারপর যেখানে হয় বিদায় করব পাখিটা।'

দীপক বলল, 'ও নিয়ে ভাববেন না। বিদায় করলে আমায় দেবেন। আমি বাড়ি নিয়ে যাব। রাখব যদ্দিন না মালিকের খোঁজ পাওয়া যায়।'

গম্ভীর বদনে কুঞ্জবিহারী জানালেন, 'শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। তা ডেইলি চার্জ কি ওই পাঁচ টাকা?'

'এক পয়সাও লাগবে না।' দীপক গরম হয়ে জানায়।

'ভেরি ভেরি গুড।' একগাল হেসে কুঞ্জবিহারী টেবিল থেকে ফের প্রুফ তুলে নিয়ে বললেন, 'সন্ধ্যায় এস একবার। কিছু কাজের কথা আছে।'

দীপক উঠছে, এমন সময় পিয়ন হারু এসে বলল, 'এক বৈরাগীবাবু, ওই পাখিটা নিয়ে কি জানি বলচেন।'

'বৈরাগীবাবু! সে আবার কি?' ধমকে ওঠেন কুঞ্জবিহারী।

'আজ্ঞে তাই তো ঠাওর হলো। গেরুয়া পরা। গলায় কণ্ঠী। কপালে তিলক। হাতে একতারা।'

'কি বলছেন।' জিজ্ঞেস করে দীপক।

'আজ্ঞে বলচেন, উনি পাখিটা দেখেচেন কোন বাড়িতে।'

'বটে বটে। নিয়ে এস তাকে।' নির্দেশ দেন কুঞ্জবিহারী।

হারু ভুল বলেনি। যে মানুষটি আবির্ভূত হলেন তিনি নিঃসন্দেহে একজন বৈরাগী। মাঝবয়সী প্রসন্ন হাসি হাসি মুখ। তিনি সম্পাদক কুঞ্জবিহারীর ঘরে ঢুকে নমস্কার জানালেন।

'বসুন।' কুঞ্জবিহারীর ইঙ্গিতে দীপকের পাশের চেয়ারটায় বসলেন বৈরাগী।

'আপনার নাম?' জানতে চান কুঞ্জবাবু।

'আজ্ঞে পরান বৈরাগী।'

'আপনি বাইরের পাখিটা দেখেছেন আগে?'

'আজ্ঞে তাই তো মনে হচ্ছে। তাই কেন, আমার অনুমান ঠিকই। অমনি পায়ে আংটি পরা। অমনি গড়ন। পাখিটা এখানে এল কেমনে তাই ভাবছিলেম অবাক হয়ে। তবে খাঁচাটা অন্য।'

'কোথায় দেখেছিলেন পাখিটা?' জিজ্ঞেস করে দীপক।

'সুরুলের পুব পাড়ায়। বলাই সরকারের বাড়ি। একতলায় ঝোলানো থাকত খাঁচাসুদ্ধু এই পাখিটা। হপ্তা দুই আগেও দেখেছি। ও পাড়ায় গান গাইতে যাই যে মাঝে মাঝে।'

'পাখিটা কার? বলাই সরকারের?' দীপক জিজ্ঞেস করে।

'তা ঠিক জানি না। মনে হয় নিচের তলায় একটা ছেলে থাকত তার। ওরই ঘরের সামনে বারান্দায় ঝুলত খাঁচাটা।' বললেন পরান বৈরাগী।

'আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ।' কুঞ্জবাবু হাতজোড় করে বিদায় জানান বৈরাগীকে, 'এই পাখির আসল মালিককে খুঁজছি। খবরটা পেয়ে খুব উপকার হলো।'

পরান বৈরাগী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জবিহারী টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন, 'যাক্ বাবা, এদ্দিনে হদিস মিলল। ওহে দীপক, এখুনি চলে যাও দিকি বলাই সরকারের বাড়ি। পাখিটার গতি কর। হ্যাঁ, মালিককে টুকে দিতে পার যে পাখিটাকে খাওয়ানোর খরচ গোটা কুড়ি টাকা আমার পকেট থেকে গেছে।'

॥ ২॥

বলাই সরকারের বাড়ি খুঁজে বের করল দীপক।

ছোট পুরনো দোতলা বাড়ি। নিচের তলা একদম বন্ধ। বাইরে বারান্দায় লাগোয়া ঘরখানা তালা মারা।

'ও বলাইবাবু। সরকারমশাই'—অনেক ডাকাডাকির পর দোতলার জানালায় একজন শুকনো চেহারার বৃদ্ধ উঁকি দিলেন। বিরক্তি মেশানো খনখনে গলায় প্রশ্ন করা হলো—'কে?'

ঊর্ধ্বমুখ দীপক বলল, 'আজ্ঞে আপনার বাড়ি থেকে একটা টিয়া পাখি হারিয়েছে কি?'

'তা বলতে পাচ্ছি না।' বৃদ্ধ নীরস গলায় উত্তর দেন।

'আপনাদের একটা টিয়া পাখি ছিল তো?'

'হ্যাঁ। আমার নয় নগেনের। নিচে যে থাকে। আমার ভাড়াটে।'

'তা নগেনবাবুর ঘর তো দেখছি বন্ধ। কখন আসবেন?'

'তা বলতে পাচ্ছি না', বৃদ্ধের কণ্ঠে বিরক্তি উপচে পড়ে, 'লিখে গেছে আসতে ক'দিন দেরি হবে।'

'উনি কি একাই থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'উনি বুঝি বাইরে গেছেন?'

'হুঁ।'

'কোথায়?'

'তা বলতে পাচ্ছি না।'

এইভাবে কথা চালানো কষ্টকর। দীপক বিনীতভাবে বলল, 'আজ্ঞে একবার যদি নিচে আসেন। আমি বঙ্গবার্তার রিপোর্টার।'

'রিপোর্টার! তা আমায় কি দরকার?' বৃদ্ধের ভুরু কোঁচকায়।

'আজ্ঞে ওই টিয়াটা নিয়ে একটু কথা বলব, আর কিছু নয়। আমরা একটা টিয়া পাখি পেয়েছি। একজন বলল, সেটা নাকি আপনার বাড়িতে দেখেছে। তাই আপনার কাছে জানতে এসেছি।'

'আসচি। দাঁড়ান।' বৃদ্ধ অদৃশ্য হলেন।

একটু বাদে নিচের তলার একটা দরজা খুলে বলাইবাবু বেরোলেন। পরনে লুঙ্গির ওপর পাঞ্জাবি চাপানো। হয়তো ঘুম ভেঙে উঠে আসতে হয়েছে বলে বেজার মুখ।

দীপক জিজ্ঞেস করল, 'নগেনবাবু কি বাইরে গেছেন?'

'হ্যাঁ, তাই তো লিখে গেছে। চারদিন আগে ভোরে উঠে দেখি ওই দরজার নিচ দিয়ে গলানো নগেনের একটা চিরকুট। তাতে লেখা—ক'দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। জরুরি কাজ। কবে ফিরব ঠিক নেই। ব্যস, আর তার ঘরেও তালা দেওয়া।'

'নগেনবাবু কখন ঘরে ফিরেছিলেন সেদিন?'

'কখন ফিরেছিল জানি না। তবে অনেক রাতে। আমি শুয়ে পড়ার পর। নইলে ঠিক দরজা খোলার শব্দ পেতুম।'

'নগেনবাবু পাখিটা কোথায় রাখতেন?'

'দিনের বেলায় ওই বারান্দায় ঝুলত খাঁচা। রাতে ঘরে ঢুকিয়ে নিত।'

'নগেনবাবু আগেও তো বাইরে গেছেন?'

'গেছে। খুব কম। দু' রাত্তির। গিয়েই পরদিন ফিরেছে।'

'তখন পাখিটা কোথায় থাকত?'

বোঝা যাচ্ছিল যে দীপকের জেরায় বৃদ্ধের মেজাজ গরম হচ্ছে। ভ্রূকুটি বাড়ছে। ভ্যাটকানো মুখে জবাব দিলেন, 'শুনেচি কোথাও রেখে যেত। কার কাছে বলতে পাচ্ছি না।'

মহা মুশকিল। হঠাৎ একটা আইডিয়া খেলে দীপকের মাথায়। বলল, 'আপনি পাখিটা দেখলে চিনতে পারবেন সেটা নগেনের কিনা?'

'তা পারব।'

'তবে দাদা একটি অনুরোধ। আমার সঙ্গে একবার রিকশায় গিয়ে চট করে দেখে আসবেন ওটা নগেনের পাখি কিনা? আপনাকে নিয়ে যাব আবার পৌঁছেও দেব। এই যাব আর আসব। বড়জোর আধঘণ্টা। আমাদের সম্পাদক কুঞ্জবাবু পাখিটা নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়ে গেছেন। উনি পাখিটা রেখেছেন কিনা! কি করবেন? ওঁর বাড়ি ছেড়ে নড়ছিল না টিয়াটা। পাছে বেড়ালে ধরে তাই খাঁচায় পুরে রেখেছেন। বোঝা যায় পোষা পাখি। মালিককে খোঁজ করছেন। যদি ওটা নগেনবাবুর হয়, ক'দিন না হয় অপেক্ষা করি। নয়তো আরও খোঁজ করতে হবে। প্লিজ। ভবানী প্রেসে আছে পাখিটা।'

'ও, কুঞ্জ মাইতির কাছে। চলুন।' মনে হলো যে বৃদ্ধ কুঞ্জবাবুকে চেনেন বা নাম শুনেছেন।

পথে রিকশায় যেতে যেতে বলাই সরকার একটা নতুন খবর দিলেন—নাকি নগেন যাবার আগের দিন রাত সাড়ে-সাতটা আটটা নাগাদ একজন অচেনা লোক এসে নগেনের খোঁজ করে। তখনো অবশ্য নগেন বাড়ি ফেরেনি। নগেন কখন বাড়ি থাকে? কোথায় কাজ করে? এই সব জিজ্ঞেস করেছিল।

'কত বয়স হবে নগেনবাবুর?' দীপক জানতে চায়।

'এই আপনারই বয়সী। বছর পঁচিশ-তিরিশ।'

'কদ্দিন আছেন আপনার বাড়িতে?'

'এই বছরখানেক।'

'লোকাল লোক?'

'না।'

'কোথায় বাড়ি ওঁর?'

'মগরা। হুগলি ডিস্ট্রিক্ট।'

ভবানী প্রেসে খাঁচায় পোরা পাখিটা মনোযোগ দিয়ে দেখে বলাইবাবু ঘোষণা করলেন—'হুঁ, নগেনের পাখিই বটে।'

ফিরে যেতে যেতে দীপক জিজ্ঞেস করল বলাইবাবুকে, 'পাখিটা কদ্দিন এনেছেন নগেনবাবু?'

'তা মাস ছয়েক।'

'পাখিটাকে যত্নআত্তি করতেন?'

'তা করত।'

কতগুলো চিন্তা চকিতে খেলে যায় দীপকের মাথায়। রাতে তো পোষা পাখি খাঁচা বা ঘর ছেড়ে বাইরে যায় না। মানে যারা নিশাচর নয়। তবে কি হাত ফসকে পালায়নি? পাখিটাকে ইচ্ছে করে বের করে দেওয়া হয়েছিল? কিন্তু কেন? কি এমন জরুরি দরকার? এভাবে ছেড়ে গেলে প্রিয় পাখিটা যে মারা পড়তে পারে তা না জানার কথা নয়। তবু গেছে। কাউকে দিয়ে যাবার ফুরসত অবধি মেলেনি। সেই রাতে যে লোকটা ডাকতে এসেছিল তার সঙ্গে এভাবে নগেনের উধাও হবার যোগ আছে কি?

দীপক জিজ্ঞেস করে বলাইবাবুকে, 'আচ্ছা যে লোকটি সেই রাতে নগেনকে ডাকতে আসে সে কি ফের এসেছিল?'

'তা বলতে পাচ্ছি না।' জবাব দেন বলাইবাবু, 'মানে আমি আর কিছু জানি না।'

'নগেনবাবু কি রাত করে ফেরেন?'

'মাঝে মাঝে রাত করে। একা লোক, আড্ডা-ফাড্ডা দিয়ে আসে।'

'উনি করেন কি?'

'রেডিও মেকানিক। তারা সাউন্ড নামে দোকানটায় চাকরি করে। ঘরে প্রাইভেট কাজও করে। এমনি বেশ ভাল ছেলে। কোনও গোলমাল ছিল না।'

'আপনি ওঁকে ভাড়া দিলেন কিভাবে', জানতে চায় দীপক, 'পরিচিত কেউ নিয়ে এসেছিল?'

'আলবৎ। রেফারেন্স ছাড়া উটকো লোককে আমি ঘর ভাড়া দিই না। নিচুপট্টির শিবু ঘোষ মানে হরেন ঘোষের বেটা, রেডিও-টিভির মেকানিক, সেই নিয়ে এসেছিল নগেনকে। একখানা ঘর চাই। বিয়ে-থা করেনি। একা থাকবে। তারা সাউন্ডে চাকরি পেয়েছে। গ্যারান্টি দিল, ছেলে ভাল। ওর সঙ্গে কলকাতায় রেডিওর কাজ শিখতে গিয়ে চেনা। তাই দিলাম ভাড়া। তা এদ্দিন ছিল, গড়বড় কিছু দেখিনি।'

বলাই সরকারের বাড়ি পৌঁছে দীপক ফট করে বলাইবাবুকে বলে বসল, 'পাখিটা আপনার কাছে রাখুন না। নগেনবাবু ফিরলে দেবেন।'

বলাইবাবু আঁতকে উঠলেন, 'খেপেছেন? বুড়ো-বুড়ি থাকি। পাখির ঝামেলা কে নেবে?'

'আচ্ছা সে যাহোক ব্যবস্থা করা যাবে। নগেনবাবু ফিরলেই তাঁকে বলবেন যে পাখিটা আমাদের কাছে রয়েছে।'

বলাইবাবু বাড়ি ঢুকে গেলেন।

দীপক কিন্তু তখুনি বাড়ি ফিরল না। তার রিপোর্টার মন যেন একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে। হঠাৎ নগেনের এমন চলে যাবার কারণটা জানা চাই। সেই লোকটার সঙ্গে কি গেল কোথাও? বাড়ি না অন্য কোথাও? দেখি এ পাড়াতেই একটু খোঁজখবর করা যাক। দীপক গুটিগুটি সামনের মোড়ে দোকানটার দিকে যায়। ওখানে চা-টার সঙ্গে দুপুরে রাতে ভাত-রুটিও মেলে। তাই রাত ন'টা সাড়ে-ন'টা অবধি দোকানটা খোলা থাকে। ওই দোকানের ছোকরা কাজের লোক রামু তার পরিচিত। বেশ চালাক-চতুর ছেলে। রামু দোকানেই থাকে রাতে।

।।৩।।

রামু বলল, 'হ্যাঁ, একজন অচেনা লোক মঙ্গলবার রাতে খোঁজ করেছিল নগেনদার। মজা কি জানেন, তার একটু আগেই নগেনদা এই দোকানে ছিল। চা খাচ্ছিল। নগেনদা চলে যাবার এই মিনিট পনেরো বাদে সেই লোকটা এল। খোঁজ করল—নগেনবাবু কখন ঘরে ফেরে রাতে।

'বললাম, এই তো ছিল নগেনদা। রাতে যদি এখানে খায়, আসবে ন'টা নাগাদ।

'লোকটা জিজ্ঞেস করল, আর কোথায় খায়? বললাম, কখনো বোলপুর হোটেলে, কখনো এখানে। মানে মুখ বদলায়।

'আমি লক্ষ্য করেচি। রাত সাড়ে ন'টা অবধি লোকটা রাস্তায় একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেচে। নগেনদা কিন্তু ফেরেনি। তারপর দেখিনি লোকটাকে।'

দীপক জিজ্ঞেস করে, 'নগেনবাবু কখন ফিরেছে?'

'তা দেখিনি। তবে দশটার আগে নয়। ততক্ষণ আমি কাজ কচ্ছিলুম বাইরে। গেলে ঠিক দেখতাম। ওর ঘরের বারান্দায় পাখির খাঁচাটাও ঝুলছিল ততক্ষণ।'

'নগেনবাবু কখন চলে গেছে দেখেছ?'

রামু বলল, 'নাঃ। তবে রাত থাকতেই গেছে। আমি ভোরে উঠে আগুন দিই, তার আগেই। তখন গেলে চোখে পড়ত। তারপর থেকেই তো দেখচি নগেনদার ঘর বন্ধ।'

দীপক জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা সেই লোকটা আর নগেনবাবুর খোঁজ নিতে এসেছিল?'

'নাঃ।'

'কেমন দেখতে লোকটাকে?'

'ভদ্দরলোক। বেশ লম্বা-চওড়া। রং কালো। দাড়ি-গোঁফ আছে। খুব ঘন কালো চুল। লম্বা জুলপি। তবে কেমন জানি চোয়াড়ে টাইপ। জামা-প্যান্ট পরেছিল।'

'কত বয়েস?'

'এই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে।'

দীপক একটা টাকা বের করে রামুর হাতে দিয়ে বলল—'রাখ এটা। বকালাম, তার বকশিস।'

রামু টাকাটা তৎক্ষণাৎ পকেটে ভরে একগাল হেসে বলল—'রিপোর্টারদাদা আর কি খবর চাই?'

দীপক বলল, 'ওই লোকটা এলে বা নগেন ফিরলেই আমায় খবর দিবি, বুঝলি।'

'জরুর। মিলেগা।' ফাজিল রামু সেলাম জানিয়ে উত্তর দেয়।

টিয়া পাখিটার গতি করার চাইতে অন্য চিন্তাই পেয়ে বসল দীপককে। নগেনের রহস্যময় অন্তর্ধান। সে এবার ঢুঁ মারল নিচুপট্টির শিবু ঘোষের কাছে।

শিবু ঘোষ বাড়িতে ছিল না। সুরধ্বনি নামে রেডিও-টিভির দোকানে সে কাজ করে। সেখানে পাওয়া গেল তাকে।

শিবু ঘোষ যুবকটি ভাল মানুষ টাইপের। দীপককে সে নামে চেনে। টিয়া পাখির ব্যাপারটা জানিয়ে নগেনের পরিচয় জানতে চাইলে সে বলল—'ওর সঙ্গে একটা ইলেকট্রনিক্স স্কুলে কাজ শিখেছিলাম কলকাতায়। তখনই খুব ভাব হয়েছিল। ভাল ছেলে ছিল। পাশ করে ও কলকাতায় একটা দোকানে চাকরি নিল। আমি চলে এলাম বোলপুরে। তারপর নগেনের সঙ্গে দেখা হতো খুব কম।

'বছর তিনেক বাদে, একবার কলকাতায় গিয়ে শুনি এক দুঃসংবাদ। নগেন নাকি ডাকাতির কেসে ফেঁসে গিয়ে জেলে রয়েছে। মামলা চলছে। কেন ও এমন কাজ করল ভেবে পেলাম না। ও নিজে নাকি ডাকাতি করেনি। কিন্তু ও যে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল প্রমাণ হয়েছে। আর ওর ঘরে নাকি ডাকাতির মাল পাওয়া গেছে। কেসটা হলো—কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে তিন-চারজন লোক কায়দা করে দুপুরে ঢুকে বাড়ির কর্তা-গিন্নীকে মারধোর করে প্রচুর টাকা আর সোনাদানা নিয়ে পালায়।

'নগেন একটু শৌখিন ছিল বটে। আর ওর একটা সাধ ছিল নিজের দোকান করবে রেডিও-টিভির। হয়তো সেই টাকা যোগাড়ের লোভেই। তবে ও রাজসাক্ষী হওয়ায় সাজা বেশি হয়নি। মাত্র এক বছর।

'এরপর নগেনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলো, বছর খানেক আগে বর্ধমান স্টেশনে। নগেন বলল যে, ও বর্ধমানে একটা রেডিওর দোকানে কাজ করছে। খুব লজ্জিত ও কুণ্ঠিত মনে হলো তাকে। অকপটে স্বীকার করল যে, সে বদসঙ্গে মিশেছিল। তার মতিভ্রম হয়েছিল। বলল যে, আর কখনো সে এমন ভুল করবে না। কথায় কথায় বলল, বর্ধমানের দোকানটায় তার মাইনে বড্ড কম। তাই অন্য কোথাও কাজ খুঁজছে। আমার সাহায্য চাইল—কোনও কাজের খোঁজ আছে কিনা কিছু বেশি মাইনেতে। তবে অনুরোধ করল, সে যে জেল খেটেছে যেন সেটা ফাঁস না করি। বর্ধমানেও বলেনি। জানাজানি হলে তার চাকরি থাকবে না। তাহলে তার বাড়ির লোক না খেয়ে মরবে। কারণ বাড়িতে সেই একমাত্র রোজগেরে। বিধবা মা আর অবিবাহিত বোন আছে দেশে। নগেনই তাদের একমাত্র ভরসা।

'করুণা হলো। তাই ওকে বোলপুরে তারা সাউন্ডে একটা কাজ জুটিয়ে দিলাম খানিক বেশি মাইনেতে। খবর পেয়েছিলাম, ও বেশ ভালই কাজ করছে। তবে ইদানিং আমি বড্ড ব্যস্ত থাকতাম, তাই ওর সঙ্গে দেখা হতো কদাচিৎ। কি জানি কেন এমন হঠাৎ গেল ওভাবে।' শিবু ঘোষ ব্যাপারটায় বেশ অবাক।

'ওঁর বাড়ির ঠিকানা জানেন?' জিজ্ঞেস করে দীপক।

'ঠিকানা? তা জানি। মগরা। হুগলি ডিস্ট্রিক্ট। স্টেশনের কাছে ওদের বাড়ি। মায়ের নাম বিভাবতী দেবী। আপনি কি ওর বাড়িতে চিঠি দেবেন?'

'তাই দেব ভাবছি।' বলল দীপক। 'হয়তো কোনও জরুরি কাজে হঠাৎ বাড়ি যেতে হয়েছে। পাখিটা নিয়েই হয়েছে সমস্যা।'

শিবু বলল, 'হ্যাঁ, ওর খুব পাখির শখ। কলকাতায় মেসেও একজোড়া মুনিয়া পুষেছিল।'

দীপকের ভাবনা অন্য খাতে বইতে শুরু করে।

একজন অচেনা লোক যে সেদিন খোঁজ করেছিল নগেনের সেটা শিবুকে বলার প্রয়োজন বোধ করেনি সে। নগেনের পূর্ব ইতিহাস এবং আগন্তুকের বর্ণনা মিলিয়ে তার মনে হলো যে, কোনও কুকর্মের ধান্দায় কি নগেন হঠাৎ বোলপুর ছেড়েছে? ওই কালো লম্বা দাড়ি-গোঁফওয়ালা লোকটার সঙ্গে। অসৎ সঙ্গে একবার জড়িয়ে পড়লে তার প্রভাব এড়ানো কঠিন।

সন্ধ্যায় দীপক ভবানী প্রেসে ফিরে রিপোর্ট করতে সম্পাদক কুঞ্জবিহারী গোমড়া মুখে বললেন, 'তাহলে? সেই নগেন না খগেন কবে ফিরবে, সেই অপেক্ষায় থাকতে হবে? ধুত্তেরি তার চেয়ে বরং—'

দীপক আশ্বাস দেয়, 'ভাববেন না। আমি পাখিটা নিয়ে যাচ্ছি। আমার দু' ভাইপো-ভাইঝি ওকে মহা আদরে রাখবে। তবে মুশকিল হলো—'

দীপক চুপ করে যেতেই কুঞ্জবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন—'কেন, আবার মুশকিলটা কিসের?'

'মানে ছোটন-ঝুমা পরে পাখিটা ফেরত দিতে চাইবে কিনা সন্দেহ। দুটোই যা পশু-পাখির ভক্ত।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কুঞ্জবাবু জানালেন, 'সেটা তোমার ব্যাপার। আমার এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। মালিককে পটাতে পারলে রাখবে পাখিটা।'

খাঁচাসুদ্ধ টিয়া নিয়ে দীপক সন্ধ্যায় বাড়ি ঢুকল।

যা ভেবেছিল তাই। পনেরো বছরের ভাইপো ছোটন আর তেরো বছরের ভাইঝি ঝুমা একটু দমে গেল বটে, তবে তখুনি পরিচর্যায় লেগে গেল পাখিটার। ঝুমার একটা মন্তব্য শোনা গেল, 'দেখিস দাদা, ওর মালিক আর ফিরছে না।'

দীপকের মাথায় তখন প্ল্যান খেলছে—কাল-পরশুই যাব মগরা। টিয়ার মালিক উধাও হবার রহস্যটা দিব্যি জটিল মনে হচ্ছে।

দীপক তারা সাউন্ডে খবর নিয়ে জানল যে একটা কালো লম্বা প্যান্ট-শার্ট পরা লোক গত মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ নগেনের খোঁজ করেছিল। তবে নগেন তার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর তো ফেরেইনি। না বলে-কয়ে এভাবে ছুটি নেওয়া। ওর মাইনে কাটা যাবে।

।। ৪।।

মগরা স্টেশনের কাছে নগেন দাসের মা বিভাবতী দেবীর বাড়ি খুঁজে পেতে খুব অসুবিধা হলো না দীপকের।

জীর্ণ একতলা কোঠা বাড়ি। অনেকগুলো ঘর। বাড়ির চারপাশে বড় বড় গাছ আর ঝোপঝাড়। তবে সামনে উঠোনটুকু তকতক করছে। মনে হয় একদা এদের অবস্থা ভাল ছিল, এখন পড়ে গেছে। সাদা থান পরা এক প্রৌঢ়া দাওয়ায় বসে কি জানি করছিলেন। দীপককে এগুতে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে তাকিয়ে থাকেন।

'আপনি কি নগেন দাসের মা বিভাবতী দেবী?' নমস্কার করে বলে দীপক।

চকিতে ভদ্রমহিলা কেমন ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। তবে ঘাড় নাড়েন সম্মতি জানিয়ে।

'নগেন দাস কি এখানে এসেছেন?' প্রশ্ন করে দীপক।

আবার ঘাড় নাড়েন মহিলা। অর্থাৎ—না।

ইতিমধ্যে একটি সুশ্রী যুবতী মেয়ে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। তার পরনের শাড়ি প্রৌঢ়ার মতনই ময়লা।

'আমি বোলপুর থেকে আসছি। নগেন দাসের বিষয়ে একটু কথা বলতে চাই', জানাল দীপক।

বিভাবতী এবার ভীত অস্ফুট স্বরে বলে ওঠেন—'কেন কেন?'

কোথায় বসা যায়? দীপক এদিক-সেদিক তাকাতে মেয়েটি একটি টুল এনে রাখে। তার ওপর বসে দীপক। মেয়েটি বোধহয় নগেনের বোন। উৎসুকভাবে তাকিয়ে থাকে মেয়েটি।

দীপক বলল, 'নগেন দাস তো বোলপুরে চাকরি করেন?'

'হুঁ।' মৃদুস্বরে জবাব দেন বিভাবতী।

'নগেনবাবু কি কয়েক দিনের মধ্যে বাড়ি এসেছেন?'

'না তো।'

'উনি গত মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ কোথাও গেছেন। কোথায় গেছে জানেন?'

'এ্যাঁ।' মা-মেয়ে দু'জনের কণ্ঠ থেকে যেন আর্তনাদ বেরোয়।

মেয়েটি বলে ওঠে, 'সেকি এখনো ফেরেনি?'

দীপক বুঝল যে নগেনের অন্তর্ধানে এরা খুব ঘাবড়ে গেছে। যেন কিছু একটা আশঙ্কা করছে। কিন্তু একটা জোয়ান ছেলে নাহয় ক'দিন বাইরে গেছে তাতে অত নার্ভাস হবার কারণ কি? দীপক চারপাশটা একবার দেখে নেয়। নাঃ তাদের কথা কেউ শুনতে পাবে না। কাছাকাছি বাড়ি নেই। সে নিচু গলায় বলল, 'দেখুন নগেনবাবুর পূর্ব ইতিহাস আমি জানি। মঙ্গলবার রাতে তাঁর হঠাৎ চলে যাওয়াটা বেশ রহস্যজনক। বোলপুরে কাউকে কিছু বলে যাননি। কিছু হদিস পেতে পারি কিনা জানতে আপনার কাছে এসেছি।'

দীপক অল্প কথায় টিয়া পাখির সূত্র ধরে নগেনকে খোঁজ করার বৃত্তান্ত জানায়। সে রাতে যে একজন অচেনা লোক নগেনের খোঁজে এসেছিল, তাও বলে। জিজ্ঞেস করে, 'নগেনবাবু কোথায় যেতে পারে আন্দাজ করতে পারেন? কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ি?'

মা-মেয়ে চোখাচোখি করে। তাদের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ। বিভাবতী দেবী বিড়বিড় করেন, 'কি জানি, কি জানি কোথায় গেল?'

দীপকের স্থির বিশ্বাস হয়, এরা কিছু চেপে যাচ্ছে। তবে নগেন উধাও হবার ব্যাপারে এরা যে শঙ্কিত হয়েছে সেটা চোখেমুখে ফুটে উঠেছে। দীপক এবার সোজাসুজি প্রশ্ন করল বিভাবতী দেবীকে, 'আপনারা কি নগেনের কোনও বিপদের ভয় করছেন?'

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বিভাবতী মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে করুণ স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা।'

দীপক বলল, 'দেখুন আগেই বলেছি আমি একজন রিপোর্টার। নগেনবাবুর বিপদে আমি যদি কোনও সাহায্য করতে পারি খুশি হব। তাই কি আশঙ্কা করছেন যদি একটু খুলে বলেন। আচ্ছা আপনার ছেলে তাঁর পুরনো অসৎসঙ্গ কি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন?'

বিভাবতী জোর গলায় বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ বাবা, সে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আর কখনো কুসঙ্গে মিশবে না। আমি নিশ্চিত জানি সেই প্রতিজ্ঞা ও ভাঙবে না। বাপ-মরা ছেলে-মেয়ে দুটিকে আমি অনেক কষ্টে মানুষ করেছি। ওরা দুটিও আমায় খুবই শ্রদ্ধাভক্তি করে।'

'ওঁর কি বিপদের ভয় করছেন?' দীপকের চিন্তা এবার রহস্যে নতুন কিছু ক্লু পাবার আশায় উন্মুখ হয়।

বিভাবতী দেবী নতমুখে কাতর কণ্ঠে বলেন, 'তুমি তো বাবা জান, নগেন কর্ম্মদোষে জেল খেটেছে। তবে সাজা বেশি হয়নি, রাজসাক্ষী হওয়ায়। ওর কাছ থেকে ডাকাতির অনেক মাল পাওয়া যায়। তাছাড়া ওর মুখে খবর পেয়েই ডাকাতির প্রায় বাকি সব মাল উদ্ধার করে পুলিশ। ডাকাতগুলোর শাস্তির প্রধান কারণও নগেনের সাক্ষী। জেলে যাবার সময় ওই দলের পাণ্ডা নাকি নগেনকে ভয় দেখিয়েছিল যে জেল থেকে বেরিয়ে সে নগেনকে খুন করবে, এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে। ওই লোকটার জেল হয় ছয় বছর। বছরখানেক আগে সেই সর্দারটা ছাড়া পেয়েছে। নগেন খেয়াল রেখেছিল কবে ওই লোকটা ছাড়া পাচ্ছে। নগেন জেল থেকে বেরিয়ে কিছুদিন কলকাতায় আর

বর্ধমানে কাজ করে। তারপর যায় বোলপুর। ভাল কাজ জানে বলে ওর চাকরির অভাব হয় না। তবে সে যে জেলখাটা আসামী সেটা গোপন রাখে। আগেকার চেনাশোনাদের থেকে দূরে থাকে। লজ্জায় বাড়িও আসত খুব কম। এলেও লুকিয়ে লুকিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যেত। টাকা পাঠাত মনি অর্ডারে। তবে বোলপুরে যাবার পর এখানে চিঠি বা মনি অর্ডার করত না। পাঠাত ত্রিবেণীতে আমার এক সইয়ের কাছে। আমরা সেখানে গিয়ে নিয়ে আসতাম। পাছে এখানকার পোস্ট অফিস থেকে ওর ঠিকানা বেরিয়ে যায় সেই ভয়ে। এখানে কেউ জানে না নগেন এখন কোথায় থাকে।

'দিন দশেক আগে একটা লোক আসে এখানে। নগেন কোথায় জানতে চায়। আমরা প্রথমে বলতে চাইনি। কারণ সেই দলের সর্দারটা যে জেল থেকে বেরিয়েছে, বলেছিল নগেন। শেষে লোকটা হুমকি দেয় যে নগেনের ঠিকানা না বললে আমাদের সর্বনাশ করবে। তখন ভয়ে বলতে বাধ্য হই নগেনের বোলপুরের ঠিকানা। লোকটা শাসিয়ে চলে যায়—ওর এখানে আসার কথা যেন কাউকে না বলি। আর ভুল ঠিকানা দেওয়া হয়েছে বুঝলে আমাদের নিস্তার নেই।

'তা লোকটা চলে যাওয়া মাত্র আমি নগেনকে চিঠি দিয়ে জানাই খবরটা। কারণ লোকটার চেহারা দেখে সন্দেহ হয়েছিল যে এ সেই ডাকাত দলের পাণ্ডা। নগেনের মুখে তার বর্ণনা শুনেছিলাম যে। ওকে দলের লোক নাকি ওস্তাদ বলে ডাকত।

'তা বাবা, তুমি যে লোকটার কথা বলচ, যে নগেনের খোঁজ করছিল, বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে ওই সেই ওস্তাদ। জানি না নগেন ওর খপ্পর থেকে পালাতে পারল কিনা? না—' বলেই বিভাবতী কেঁদে ফেললেন। অর্থাৎ নগেন যদি পালাতে না পারে? যদি খুন হয়ে যায় ওস্তাদের হাতে?

নগেনের অন্তর্ধানের এই নতুন কারণটা জেনে দীপক হতবাক। কি সান্ত্বনা দেবে ভেবে পায় না। বলে, 'অত দুশ্চিন্তা করবেন না। নগেনবাবু হয়তো আপনার চিঠি পেয়ে সতর্ক ছিলেন। ওস্তাদ যেতেই গা ঢাকা দিয়েছেন। একটা কথা বলে যাই। নগেনবাবুর কোনও খবর পেলে বা সেই ওস্তাদ ফের এলে আমায় তখুনি জানাবেন। আমার ঠিকানা রেখে যাচ্ছি। হ্যাঁ, ওস্তাদের বর্ণনাটা আর একবার ভাল করে বলুন তো।'

বিভাবতী বললেন। মন দিয়ে শুনে নিল দীপক।

মগরা থেকে সোজা বোলপুরে ফিরল না দীপক। গেল কলকাতায়। লালবাজারে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের এক অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার তার বিশেষ পরিচিত। তার সাহায্যে কিছু খবর যোগাড় করতে হবে।

।। ৫।।

দীপক বোলপুরে ফিরতেই ছোটন-ঝুমা তাকে চেপে ধরল।

'কাকু, নগেনের খবর পেলে? টিয়াটার কি হবে? ফেরত নেবে নাকি?'

ছোটনরা জানত যে দীপক মগরায় গেছে নগেনের বাড়ি।

দীপক অল্প কথায় তার অভিজ্ঞতা বলে।

শুনে ছোটন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক বাবা, পুঁটি তাহলে থাকছে?' ইতিমধ্যে টিয়াটার নাম দেওয়া হয়ে গেছে পুঁটি। ছোটন-ঝুমা আবিষ্কার করেছে যে ওটাই নাকি তার আগেকার নাম। ওই নামে ডাকলেই ও সাড়া দেয়।

দীপক বলল, 'কি করে বুঝলি যে থাকছে?'

ছোটন বলল, 'বাঃ হয় নগেন খুন হবে, নয়তো প্রাণের ভয়ে আর এমুখো হবে না। পাখি ফেরত নেবে কি করে?'

দীপক রেগে বলল, 'তোরা তো আচ্ছা। পাখিটার লোভে একটা মানুষকে খুন করতে আপত্তি নেই!'

ছোটন-ঝুমা লজ্জার ভান দেখিয়ে মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হাসে।

সম্পাদক কুঞ্জবিহারী তো দীপকের মুখে নগেন-বৃত্তান্ত শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। চেয়ার চেড়ে আধখানা উঠে টেবিলে দুম্ করে এক ঘুঁষি বসিয়ে হুঙ্কার দিলেন, 'মার্ভেলাস। খুন। মার্ডার। নাটক জমে গেছে হে। দীপক তুমি ফলো করে যাও। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখে বঙ্গবার্তায় একখানা স্টোরি ছাড়বে। দুর্দান্ত হবে। কাটতি বেড়ে যাবে কাগজের। হুঁ হুঁ বাবা, ভাগ্যিস টিয়াটা আমার নজরে পড়েছিল, ধরলাম ভাগ্যিস। তাই তো এমন একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনার ক্লু মিলে গেল। আচ্ছা, স্টোরিটার নাম কি দেওয়া যায়?' কপালে বার দুই পেনের টোকা মেরে সম্পাদকমশাই ঘোষণা করলেন—'হ্যাঁ পেয়েছি। টিয়া রহস্য।'

দীপক গেল নগেনের বাড়িওলার কাছে।

বলাইবাবু তেড়েফুঁড়ে উঠলেন, 'দেখুন মশাই নগেনের কাণ্ড। একজনের ট্রানজিস্টার সারাবে বলে ঘরে এনে রেখেছিল। নাকি দু'তিন দিনে দেব বলেছিল। সাত-আট দিন হয়ে গেল, বাবুর পাত্তা নেই। খুব হম্বিতম্বি করে গেছে লোকটা। বলছিল, তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে তার ট্রানজিস্টার নিয়ে যাবে।

'তা অবশ্য হতে দিইনি। তবে বলেছি, এ মাসের ভাড়া দেওয়া আছে। বারো দিন বাদে মাস শেষ। তদ্দিনে না ফিরলে সাক্ষী রেখে, তালা খুলে নিয়ে যাক তার রেডিও। আমার আপত্তি নেই। হ্যাঁ, নগেনের একটা চিঠি এসেছে।'

'চিঠি! কৈ দেখি?'

ইনল্যান্ডটা দিতে বলাইবাবু ইতস্তত করছিলেন। দীপক ভরসা দিল—'আমায় দেখাতে কোনও ভয় নেই। নগেনের এই হঠাৎ উধাও হওয়াটা বেশ রহস্যজনক। আমি ওর বাড়ি গিছলাম। ও বাড়ি যায়নি। ওর বাড়ির লোক জানে না ও কোথায় গেছে। তারা খুব চিন্তিত হয়েছে। বঙ্গবার্তার তরফ থেকে আমি ইনভেস্টিগেট করছি কেসটা। দরকার হলে পুলিশেও ইনফর্ম করব।'

সাহস পেয়ে বলাইবাবু দীপকের হাতে দিলেন চিঠিটা।

দীপক ইনল্যান্ডটা খুলে দেখল যে এটা নগেনের মায়ের চিঠি। যে চিঠিতে তিনি নগেনকে সাবধান করে দিয়েছিলেন ওস্তাদ সম্বন্ধে। ডাক বিভাগের কৃপায় এদ্দিনে এল চিঠিটা।

দীপক ভাবল, তবে তো নগেন সতর্ক হবার সুযোগ পায়নি। ও তাহলে নির্ঘাৎ ওস্তাদের আগমন লক্ষ্য করে গোপনে। হয়তো সে যখন সামনের দোকানটায় বসে চা খাচ্ছিল—তখন। তাই উঠে তড়িঘড়ি পালায়। তারপর ঘরে আসে লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু কথা হলো যে নগেন কি ওস্তাদের চোখ এড়িয়ে নিরাপদে পালাতে পেরেছিল?

ওস্তাদ ধূর্ত বদমাশ। হয়তো আড়াল থেকে নজর রেখেছিল, নগেন কখন ঘরে ফেরে। তারপর পলাতক নগেনকে যদি সে ফলো করে? শেষে সুবিধা মতো কোথাও পেয়ে নিকেশ করে?

দীপক চায়ের দোকানের রামুকে ডেকে বলল, 'মনে রাখিস, যদি নগেন ঘরে ফেরে বা সেই কালো গুণ্ডা টাইপ লোকটা আসে, সঙ্গে সঙ্গে আমায় খবর দিবি। অমনি বকশিস পাবি।' দীপক একখানা এক টাকার নোট রামুর হাতে দিয়ে বলল—'অ্যাডভান্স।'

রামু অমনি একটা স্যালুট ঠুকে বলল, 'জো হুকুম।'

আরও এক সপ্তাহ কেটেছে।

সম্পাদক কুঞ্জবিহারী প্রায়ই খবর নেন দীপকের কাছে, 'কিহে, টিয়া পাখির কেসটা কিছু এগোল?'

'নাঃ।' দীপক মাথা নাড়ে, 'তবে অপেক্ষায় আছি। জাল পেতে রেখেছি।'

দীপক প্রত্যেক দিন অনেকগুলো দৈনিক খবরের কাগজ এনে উল্টেপাল্টে দেখে। একদিন কৌতূহলী ছোটন জিজ্ঞেস করল, 'কাকু, অতগুলো কাগজে কি পড়?'

দীপক বলল, 'কোনও বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া গেছে কিনা খুঁজি। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে বিজ্ঞাপন দেয়। কখনো কখনো নিউজ হিসেবেও বেরোয়। এমন মৃতদেহ কাছাকাছি শহরে মর্গে রেখে দেয়। আমি কয়েকটা গিয়ে দেখেও এসেছি। নগেনের খোঁজ মেলেনি অবশ্য।'

'তুমি কি ভাবছ সত্যি নগেন খুন হয়ে যেতে পারে?'

'সে সম্ভাবনা খুবই,' চিন্তিতভাবে জানায় দীপক।

'যদি খুন না হয় নগেন ফিরবে?'

'ফিরবে তো মনে হয়। তবে কবে বলা যায় না। ওর কিছু জিনিসপত্র পড়ে আছে নিজের ঘরে। তাছাড়া রেডিওর দোকানে মাইনে বাবাদ ওর কিছু টাকাও পাওনা আছে।'

'ফিরলে আর এখানে থাকছে না। টুক করে এসে জিনিসপত্র মাইনে নিয়ে পালাবে। খাঁচাসুদ্দু পাখি নিয়ে যাবে কোথা?' ঝুমার মন্তব্য।

অর্থাৎ ওরা ধরে নিয়েছে যে, টিয়া পুঁটি ওদেরই সম্পত্তি হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা যে নাও হতে পারে কারণটা ভাঙল না দীপক। বেচারিরা দুর্ভাবনায় থাকবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত জল কোথায় গড়ায়?

আরও একবার দীপক কলকাতায় গেল লালবাজারে।

বোলপুর থানার দারোগার সঙ্গেও দেখা করল।

সেদিন সকাল এগারোটা নাগাদ।

দীপক বাড়িতে বসে খবরের কাগজ ওল্টাচ্ছিল। সহসা গেটের সামনে রামুর আবির্ভাব।

'কিরে রামু?' জিজ্ঞেস করে দীপক।

রামু দীপককে কাছে আসতে ইশারা করে।

দীপক দ্রুত পায়ে তার কাছে যায়।

রামু ফিসফিসিয়ে বলে, 'সেই কালো লম্বা লোকটা এসেছিল খানিক আগে। আমায় জিজ্ঞেস করছিল, নগেনদা ফিরেছে কিনা। নগেনদার ঘরের সামনেটায় ঘুরে দেখল—'

'তারপর?' তীব্র উদ্বেগ ফোটে দীপকের কথায়।

'চলে গেল।'

'কোথায়? কোন দিকে?'

রামু মিচকে হাসে। বলে—'রিপোর্টারদাদা, বকশিস খেয়েছি, কাজে ফাঁকি পাবেন না। রামচন্দর সে পাত্তর নয়। এক কেজি পেঁয়াজ আনতে বলেছিল মালিক। লোকটা পা চালাতেই টপ করে পয়সা চেয়ে থলি হাতে লোকটার পিছু নিলুম। বাজারের দিকেই যাচ্ছিল লোকটা। দেখে নিলুম ও কোথায় ঢুকছে।'

'কোথায়?'

'ইন্ডিয়া বোর্ডিং হাউস। সটান ঢুকে গেল ভেতরে। একটু অপেক্ষা করে হোটেলটায় ঢুকে পড়লাম। আমার পাড়ার পঞ্চা কাজ করে ওখানে। তাকে জিজ্ঞেস করতে বলল যে আজ সকালেই বাইশ নম্বর রুমে উঠেছে লোকটা। একাই। ব্যস, তাপ্পর সোজা চলে এসেছি আপনার কাছে। এবার পেঁয়াজ নিয়ে ফিরব।'

দীপক জিজ্ঞেস করে, 'লোকটার কপালে কাটা দাগটা লক্ষ্য করেছিলি?'

'আলবাৎ।'

'লোকটা সন্দেহ করেনি তো ফলো করছিস!'

'খেপেছেন স্যার। অনেক দূর থেকে পথের লোকের ভিড়ে মিশে ফলো করেছি। রামুকে ধরা অত সোজা নয়।'

রামু চলে যাবার মিনিট কয়েকের ভিতর দীপক পথে নামল। সোজা গেল থানায়। আধঘণ্টার

মধ্যে বোলপুর পুলিশ অ্যারেস্ট করল ওস্তাদকে ইন্ডিয়া বোর্ডিং থেকে। এ নিয়ে একটু উত্তেজনা হলো বটে জনতার মধ্যে—কে লোকটা? ব্যাপারটা কি? কিন্তু থানার দারোগা বিশেষ মুখ খুললেন না। শুধু জানালেন যে, লোকটা দাগী আসামী, পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, হেডকোয়ার্টার্সের ইন্সট্রাকশন ছিল এক অ্যারেস্ট করার।

দু'দিন বাদে দীপক ফের মগরায় হাজির হলো বিভাবতী দেবীর কাছে।

'এস বাবা।' দীপককে আহ্বান জানালেন বিভাবতী। মিনুও কৌতূহলী মুখে কাছে এসে দাঁড়ায়।

'নগেনের কোনও খবর পেলেন?' জানতে চায় দীপক।

'কৈ না। তুমি কিছু পেলে?' বিভাবতী জিজ্ঞেস করেন।

দীপক বলল, 'আমি? হ্যাঁ পেয়েছি।'

'কি?' মা-মেয়ে দু'জনেরই কণ্ঠে উদ্বেগ ভরা প্রশ্নটা বেরোয়।

দীপক চট করে কোনও জবাব না দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দু'জনেরই মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলায়। তারপর ধীর স্বরে বলে, 'নগেনবাবু যে নিরাপদে আছেন কোথাও এটুকু আমি জানতে পেরেছি। তার ঠিকানাটা জানি না এখনো। তবে, সেটা আপনারা জানেন। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।'

'আমরা! না না।' প্রবল প্রতিবাদ করে ওঠে মা এবং মেয়ে।

দীপক মৃদু হেসে বলল, 'আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেননি। বেপাত্তা ছেলের কোনও খবর না জানলে যতটা দুর্ভাবনা ফোটা উচিত ছিল তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখলাম না আপনাদের চোখেমুখে। আমি না হয় জানতে পেরেছি যে আপনার ছেলে এখনো জীবিত কিন্তু সে খবর তো আপনাদের কাছে পৌঁছবার কথা নয়। অন্তত আমি যেভাবে জেনেছি। তার মানে আপনারা খবর পেয়েছেন অন্য সূত্রে। খুব সম্ভব নগেনবাবুই স্বয়ং আপনার ত্রিবেণীর সইয়ের বাড়িতে গোপনে চিঠি দিয়েছেন। তাই না?'

মাথা নিচু করে মৃদুকণ্ঠে স্বীকার করেন নগেনের মা, 'হ্যাঁ বাবা, ঠিকই ধরেছ। তবে ওর ঠিকানাটা—' তিনি ইতস্তত করেন।

'ব্যস ব্যস, তাঁর ঠিকানা আমি জানতে চাইছি না। আমি শুধু বলতে এসেছি যে, নগেনবাবুকে চিঠি লিখে কয়েকটা খবর জানিয়ে দিন।'

'কি খবর?' মাথা তুলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করেন বিভাবতী।

দীপক বলল, 'এক নম্বর। ওস্তাদকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ।'

'এ্যাঁ সেকি! কেন?' মা-মেয়ে চমকে ওঠে।

'কারণ ওস্তাদ জেল থেকে বেরুবার কিছু বাদে দল জুটিয়ে ফের এক জায়গায় ডাকাতি করে। পুলিশ তার প্রমাণ পেয়েছে। তাকে খুঁজছিল ধরতে। ওস্তাদ গা ঢাকা দেয়। তারপর দাড়িগোঁফ গজিয়ে চেহারা পাল্টায় খানিক। সেই চেহারা নিয়েই আসে আপনার কাছে। এরপর নগেনবাবুর সন্ধানে যায় বোলপুর। খুব সম্ভব প্রতিশোধ নিতে। সেদিন নগেনবাবু দৈবাৎ তাকে বাড়ির কাছে দেখেই চিনে ফেলেন। তাই সেই রাতেই প্রাণভয়ে পালান। ফলে বেঁচে যান। আমি ওস্তাদের ব্যাপারে কলকাতায় পুলিশ ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারি তার এই নতুন কীর্তি। মানে ফের ডাকাতির কথা। আমি বোলপুর থানাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। নিজেও চোখ রাখছিলাম। দু'দিন আগে ওস্তাদ আবার বোলপুরে নগেনবাবুর খোঁজ করতে আসার পরই সে অ্যারেস্ট হয়।

'সুতরাং নগেনবাবু এখন নির্ভাবনায় বোলপুরে আসতে পারেন। তাঁর জিনিসপত্র বাকি মাইনে নিয়ে যেতে পারেন। ইচ্ছে করলে বোলপুরে কাজও করতে পারেন। তাঁকে জানিয়ে দেবেন এসব। ভাগ্যিস আপনার চোখকে ওস্তাদ ফাঁকি দিতে পারেনি, তাই ওঁকে এত সহজে গ্রেফতার করা সম্ভব হলো।'

'ওঃ বাবা, কি যে নিশ্চিন্ত হলাম। তোমায় যে কি বলে আশীর্বাদ করব।' আনন্দে বিভাবতী দেবীর চোখে জল এসে যায়।

দীপক হেসে বলল, 'নগেনবাবুকে আর একটা কথা জানাবেন যে আমার একটি প্রার্থনা আছে। মানে, এটা ঠিক আমার প্রার্থনা নয়। বলতে পারেন আমার দুই ভাইপো-ভাইঝির আবদার, যারা নগেনবাবুর টিয়া পাখিটার দেখাশোনা করছে। পাখিটার ওপর ওদের ভীষণ মায়া পড়ে গেছে। তাই যদি পাখিটা ওদের দান করেন নগেনবাবু, ওরা বড্ড খুশি হয়।'

'হ্যাঁ বাবা, পাখিটা ওরা নিক,' বিভাবতী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, 'আমি নগেনের হয়ে পাখিটা ওদের দান করছি। তোমার এত বড় উপকারের এই সামান্য প্রতিদানটুকু দিতে পারব না! জানলে নগেন খুশি হয়েই তার টিয়েটা দিয়ে দেবে। তোমার ভাইপো-ভাইঝির কাছে ওটা সুখে থাকুক।'

দীপক উঠল। তার কাজ হাসিল। এবার বঙ্গবার্তার জন্যে জমাটি একখানা লিখে ফেলা যাক।

[শারদীয়া ১৪০১]

ছদ্মবেশী

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

চারদিকে বারুদের গন্ধ। কানে আসে শুধু ভারী বুটের শব্দ। মাঝে মাঝেই ককিয়ে ওঠে সাইরেন। ভেসে আসে বিমানের আওয়াজ, তারপরই দুম-দাম করে পড়তে থাকে বোমা। ধ্বংস, মৃত্যুযন্ত্রণা আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। প্রতি মুহূর্তে জীবন মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে চলে বেঁচে থাকার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। যুদ্ধের বিভীষিকায় কাঁপছে সমস্ত পৃথিবী। কিন্তু কাজ তো থেমে থাকে না। বিশেষ করে যুদ্ধের।

লিসেস্টারে রয়াল আর্মির দপ্তরে বসে হিসেব কষছিলো লেফটেনেন্ট ক্লিফটন জেমস। জেমস অভিনেতা। মস্ত বড় না হলেও গত পঁচিশ বছর ধরে অভিনয় করছে। শিল্পী হিসেবে একটু-আধটু নামও আছে। তবে তেমন বড় রোল কখনও পায়নি। যুদ্ধ শুরু হলে সকলের মতো সে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো। কিন্তু তাকে লড়াই করতে না পাঠিয়ে এই অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সৈন্যদের মাইনে থেকে আরম্ভ করে যুদ্ধের অন্যসব খরচ-টরচের হিসেব কষতে কষতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে লেঃ জেমস। না হয় তার একটু বয়েস হয়েছে—তাই বলে সে যুদ্ধ করতে পারবে না? সেখানে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকলেও উত্তেজনা তো আছে। আর এখানে বসে বসে শুধু হিসেব কষা, আর বিমান আক্রমণ হলে মাথা বাঁচাতে ছোটা। রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠেছে লেঃ জেমস। কিন্তু উপায় তো নেই। যুদ্ধ বলে কথা। সে যে একজন অভিনেতা এ কথাটা এখানে বোধহয় কারো মনেও নেই। থাকবে কি করে, দেশের এই ভয়ঙ্কর বিপদের দিনে সকলে যে শুধু দেশের কথাই ভাবছে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ কিংবা সাধ-আহ্লাদ নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। সকলের চোখের সামনে হিটলার এখন দৈত্যের মতো নাচছেন। তাঁর পাঠানো জঙ্গি বিমানগুলোর বোমা লন্ডন শহরটাকে প্রায় শেষ করে এনেছে। রোজ কত বাড়ি-ঘর-দোর যে ভাঙছে, কত লোক যে মরছে তার কোনো হিসেব নেই। জেমসকে ক্ষয়-ক্ষতির হিসেবও রাখতে হচ্ছে। আর ঝামেলাটা তো সেখানেই। অঙ্কে ওর তেমন মাথা নেই। কোনোদিনই ভালো লাগে না। তবু তাকে সারাদিন বসে বসে শুধু হিসেবই কষতে হচ্ছে।

সেদিন জেমস নিজের মনে কাজ করছিলো, হঠাৎ টেলিফোনটা ঝনঝনিয়ে বেজে উঠলো। রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললো, লেঃ জেমস....

ওদিক থেকে ভেসে এলো মিষ্টি গলার স্বর, কর্নেল নিভেন বলছি সদর দপ্তর থেকে।

জেমসের বুঝতে অসুবিধে হলো না, সিনেমার ডাকসাইটে স্টার ডেভিড নিভেন কথা বলছেন। ওঁর গলা এত পরিচিত যে কারোরই চিনতে ভুল হয় না। ডেভিড নিভেনও জেমসের মতো যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। জেমস উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো কর্নেল নিভেন কি বলেন শোনার জন্যে।

তোমার জন্যে একটা ভালো খবর আছে জেমস। তুমি কি কয়েকটা আর্মি ফিল্মে অভিনয় করতে চাও?

নিশ্চয়ই চাই স্যার.......

গুড.......তাহলে তোমাকে একবার লন্ডনে আসতে হবে।

আমি যাবো স্যার।

ঠিক আছে, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে জেমসের মনে হলো সে বোধহয় স্বপ্ন দেখছে। হিসেব কষতে কষতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। এতদিনে বোধহয় নিজের মনের মতো কাজ পাবে সে। খুশি হয়ে উঠলো লেঃ জেমস।

লন্ডনে যাবার চিঠিও এসে গেলো। আনন্দে নাচতে নাচতে জেমস এসে হাজির হলো কার্জন স্ট্রিটের অফিসে। একমুখ হাসি নিয়ে ডেভিড নিভেন অভ্যর্থনা জানালেন জেমসকে। ডেভিড নিভেন মস্ত বড় অভিনেতা। জেমস ভীষণ পছন্দ করে ওঁর অভিনয়। কয়েকটা বইয়ে একসঙ্গে কাজও করেছে। ডেভিডকে দেখে জেমসের খুব ভালো লাগছিলো। মনে হচ্ছিলো, সে যেন নিজের জগতে ফিরে এসেছে। ফৌজি পোশাকে হলেও ওর সামনে বসে আছেন ডেভিড নিভেন।

জেমস......

ডেভিড নিভেনের গলা শুনে চমকে উঠলো জেমস। জেমসের জিজ্ঞাসুদৃষ্টির ওপর চোখ রেখে কর্নেল নিভেন বললেন, জেমস আমি তোমায় যে কথাটা বলতে যাচ্ছি তা শুনে তুমি যেন ঘাবড়িয়ে যেও না। আমি দুঃখিত তোমায় এইভাবে ডেকে আনতে হলো বলে। কোনো আর্মি ফিল্মে তুমি অভিনয় করছো না। তোমাকে বাছা হয়েছে জেনারেল মন্টগোমারির ডবল হিসেবে।

উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো জেমস, এ কী বলছেন স্যার?

হ্যাঁ জেমস। অভিনয় তোমায় করতে হবে ঠিকই—তবে জেনারেল মন্টির ভূমিকায়। ক্যামেরার সামনে নয় এই যা।

চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে পড়লো লেঃ জেমস। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তাকে হতে হবে মন্টির ডবল! জেমস জানতোই, তাকে অনেকটা জেনারেল মন্টগোমারির মতো দেখতে। এই নিয়ে বন্ধু-বান্ধব মহলে কম ঠাট্টা-ইয়ার্কিও চলে না। একবার তো একটা খবরের কাগজে তার একটা ছবি ছাপা হয়েছিলো। তলায় ক্যাপশান ছিলো—উঁহু, আপনি ভুল করছেন। এঁর নাম লেঃ ক্লিফটন জেমস। তার মানে ছবিটি দেখে সকলেই ভুল করবেন জেনারেল মন্টি বলে!

সে তো অন্য কথা। কিন্তু তাই বলে তার পক্ষে কখনো সত্যি সত্যিই জেনারেল মন্টি সাজা সম্ভব! হতাশ হয়ে ধপ করে চেয়ারের ওপর বসে পড়লো জেমস। তবে সে ভালোভাবেই জানে, এখানে তার মতামতের কোনো মূল্য নেই। ডেভিড নিভেনের কথাই ফৌজি নির্দেশ। ভয়ঙ্কর একটা ভয়ের ভাব জেগে ওঠে জেমসের মনে। শরীরের মধ্যে শিরশির করে বইতে শুরু করে ঠাণ্ডা রক্তের স্রোত। হৃদপিণ্ডের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়।

কর্নেল নিভেন ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। জেমস, আমার সঙ্গে এসো।

নিভেনের পেছনে পেছনে জেমস এসে ঢুকলো কর্নেল লিস্টারের ঘরে।

লিস্টার, এই যে জেমস।

তারপর জেমসের দিকে ফিরে বললেন, তুমি এখানে থাকো। কর্নেল লিস্টার তোমায় সব বুঝিয়ে দেবেন।

ডেভিড নিভেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। জেমস লক্ষ্য করলো কর্নেল লিস্টার তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। দেখতে দেখতে ওঁর মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

কর্নেল লিস্টার বললেন, জেমস, বুঝতে পারছো তোমার ওপর কত বড় দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে? আমরা হিটলারের ওপর যে শেষ আঘাত হানতে যাচ্ছি তার সাফল্য নির্ভর করছে তোমার ওপরে।

কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

জেমসের গলায় দুর্ভাবনার স্পষ্ট আভাস।

কর্নেল লিস্টার হাসলেন। বললেন, বসো, আমাদের পুরো পরিকল্পনাটা তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কর্নেল লিস্টার একটুখানি চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, শোন 'ডি ডে' আসন্ন। আমরা

বিরাট একটা বাহিনী নিয়ে ফ্রান্সে নামবো। তারপর লড়তে লড়তে পৌঁছে যাবো বার্লিনে। হিটলারের গুপ্তচরবাহিনীর কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখা অসম্ভব। আমরা যে বড় একটা আঘাত হানতে চলেছি তা ওরা বুঝতে পারবে। তবে দিনক্ষণটা ওরা ধরতে পারবে না। ওরা অবশ্য এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেবে না যে আমরা অন্য যে কোনো একটা জায়গা দিয়ে আঘাত হানতে পারি। কিন্তু ওদের চররা হন্যে হয়ে ঘুরছে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে আমরা এই পরিকল্পনাটা নিয়েছি। জেনারেল ইসেনহাওয়ারও অনুমোদন করেছেন।

একটু থেমে কর্নেল লিস্টার আবার শুরু করলেন, আমাদের আক্রমণের কম্যান্ডার মন্টি-ই হবেন। কিন্তু আমরা প্রচার করবো জেনারেল মন্টগোমারি তাঁর অফিস ছেড়ে পৃথিবীর কয়েকটি দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তোমাকে সেই কাজটাই করতে হবে। তোমাকে মন্টি সেজে কয়েকটি দেশে যেতে হবে। তার মানেই তোমাকে মন্টির ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। কিন্তু সাবধান, ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন এর বিন্দু-বিসর্গও না জানতে পারে। এখন বলো, তোমার আর কিছু জানার আছে?

জেমস মাথা নাড়লো। ওর মনের মধ্যে তখন হাজার প্রশ্ন। সেই সঙ্গে ভয়, ভাবনা, আশঙ্কা। কিন্তু ভাবনার সময় জেমস পেলে না। কর্নেল লিস্টার তাঁর দু'জন সঙ্গী মিলে জেমসকে জেনারেল মন্টিগোমারি বানাবার কাজ শুরু করে দিলেন। মন্টির নিউজরিল, মন্টির ছবি দেখিয়ে জেমসকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো জেনারেলের হাঁটা-চলা, হাসি, অভিনন্দন গ্রহণ করার খুঁটিনাটি সব কিছু। দিনের পর দিন ধরে জেমসকে ড্রিল করানো হলো। মন্টি যা করেন তাই করানো হলো। সবই গোপনে এবং নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে। জেমসের ধারে-কাছে পৌঁছুবার কোনো উপায় কারও ছিলো না। একদিন ট্রেনিংয়ের শেষে কর্নেল লিস্টার বললেন, জেমস, পুরো ব্যাপারটা তুমি খেলা হিসেবে নাও। খেলাটা হচ্ছে আমাদের শত্রুর সুবিধের জন্যে। সব সময় মনে রেখো আমাদের প্রতিপক্ষ কিন্তু মোটেই সাধারণ নয়। জার্মান হাইকমান্ডকে, হিটলারের গুপ্তচরবাহিনীকে বোকা বানাতে হবে।

প্রাথমিক প্রস্তুতির পর জেমসকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো জেনারেল মন্টগোমারির ব্যক্তিগত রক্ষীদের মধ্যে। যাতে কোনোরকম সন্দেহ না দেখা দেয়, তাই জেমসকে ইন্টেলিজেন্স কোরের সার্জেন্ট হিসেবে ওখানে কাজ দেওয়া হলো। জেনারেলকে যাতে খুব কাছ থেকে দেখে জেমস নিজেকে তৈরি করে নিতে পারে সেইজন্যেই এই পোস্টিং।

এই ডিউটির প্রথমদিন ভোরবেলায় জেমসকে দেখা গেলো জেনারেল মন্টির রোলসরয়েসের ঠিক পেছনে একটি জিপে। তার পরনে আই সি সার্জেন্টের পোশাক। জিপের পেছনে পর পর আরও অনেকগুলো গাড়ি। প্রত্যেকটা গাড়ির মধ্যে তফাৎ মাত্র পাঁচ গজ করে। গাড়িগুলো এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। ভোর গড়িয়ে সকাল, কিন্তু চলার বিরাম নেই। সন্ধ্যের মুখে জেনারেলের গাড়ি এসে থামলো পোর্টস মাউথে। গাড়িগুলো পাক্কা পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলো। চারদিকটা তখন টেনশানে টানটান। তারপর এক এক করে মন্টির ব্যক্তিগত সহচররা গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এলেন। তাঁরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কনভয়ের প্রত্যেকটা গাড়ি আর আরোহীদের দেখলেন। তারপরই মন্টিকে দেখা গেলো গাড়ি থেকে নেমে আসতে। মন্টির মাথায় সেই বিখ্যাত ব্ল্যাক বেরেট টুপি, গায় চামড়ার জ্যাকেট। জেমস খুব কাছ থেকে জেনারেলের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করছিলো। মন্টির স্যালুট একটু অন্য রকম। হাতটা দু'বার নেড়ে কপালে ঠেকান। অনেকটা অভিনন্দন জানাবার ভঙ্গিতে।

একটু পরেই গাড়িগুলো আবার চলতে শুরু করলো। মন্টির রোলসরয়েসের ঠিক পাঁচ গজ পেছনে ছুটছে জেমসের জিপ। জেমস গাড়ির মধ্যে বসা জেনারেলের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করছে। শহর ছেড়ে গাড়িগুলো ততক্ষণে গ্রামের পথ ধরেছে। সকালবেলায় যে দু-চারজন লোক পথের ধারে ছিলো তারা মুহূর্তের মধ্যে মন্টিকে চিনে ফেললো। খুশি হয়ে তারা হাত নেড়ে জেনারেল মন্টগোমারিকে অভিনন্দন জানাতে লাগলো। মন্টিও হাত নেড়ে, হেসে স্যালুট করতে লাগলেন। মন্টি কাউকে বাদ দিলেন না। প্রত্যেকের অভিনন্দনের উত্তর দিলেন। একজন বৃদ্ধ শ্রমিক মন্টির হাসি আর স্যালুট পেয়ে

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। তার মনের ভাব বুঝতে জেমসের একটুও অসুবিধে হলো না। বৃদ্ধ মানুষটি নির্ঘাৎ ভাবছিলো, এই মানুষটিই আমাদের জয় এনে দেবে। বৃটেনের প্রত্যেকটি মানুষ বিশ্বাস করতো, পরবর্তী আক্রমণে মন্টি বৃটেনকে নির্ঘাৎ জয় এনে দেবেন। তাই মন্টিকে দেখলেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা খুশি হয়ে পাগলের মতো হাত নাড়তো। বৃদ্ধ জেনারেলও তাঁর মাথা থেকে টুপিটা খুলে জনতার দিকে ধীরে ধীরে নাড়াতেন।

সমুদ্রের ধারে পৌঁছে জেমস অবাক হয়ে গেলো। বুঝতে পারলো, কত বড় একটা আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে। যত দূর চোখ যায় সার সার যুদ্ধজাহাজ আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়ে আছে। আকাশে চক্কর দিচ্ছে অগুন্তি যুদ্ধবিমান। অজস্র ট্যাঙ্ক, আরমাডকার, গোলা-বারুদ জাহাজে তোলা হচ্ছে। সমুদ্রের ধার থিক থিক করছে হাজার হাজার সৈন্যে। ওঁরাই 'ডি ডে'র বিশাল আক্রমণে হিটলারের বাহিনীকে হারাবার জন্যে লড়বেন।

সমুদ্রের ধারের একটা হোটেলের ওপর থেকে মিত্রবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষরা প্রস্তুতিপর্ব লক্ষ্য করছিলেন। মন্টি উঠে গেলেন হোটেলের ছাদে। সেখান থেকে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে কম্যান্ডারদের সঙ্গে খানিকক্ষণ আলোচনা করে নিচে নেমে এলেন মন্টি। তাঁর পেছনে রীতিমতো একটা প্রসেশান। মন্টিকে খুব কাছ থেকে দেখার জন্যে, তাঁর অঙ্গ-ভঙ্গি, মুদ্রাদোষ ইত্যাদি লক্ষ্য করার জন্যে জেমস চললো তাঁর ঠিক পেছনে পেছনে। মন্টি চলে গেলেন সাধারণ সৈন্যদের কাছে। সেখানে কারো সঙ্গে কথা বললেন, কারো পিঠ চাপড়ে দিলেন, কাউকে উপদেশ দিলেন। সেই সঙ্গে অফিসারদের দিতে লাগলেন টুকটাক নির্দেশ।

জেমস লক্ষ্য করলো, মন্টির ব্যক্তিত্বই আলাদা। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। কথা না বললেও তাঁর আশেপাশে যাঁরা থাকেন তাঁরা ম্লান হয়ে যান সেই রাশভারি মানুষটির কাছে। জেমসের মনে হলো, মান্টি যদি অভিনয় করতেন তাহলে সহজেই তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নায়ক হয়ে যেতেন। তাঁর ধারে-কাছে কেউ পৌঁছুতে পারতো না।

স্থলবাহিনীর কিছু সৈন্যকে জাহাজে করে অন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আনা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পুরো সুস্থ নয়। সি-সিকনেসে ভুগছে। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছিলো অসুস্থভাব লুকোতে। মন্টি যে অসুস্থতা একেবারেই পছন্দ করেন না তা সকলেরই জানা। একটি তরুণ আপ্রাণ চেষ্টা করছিলো নিজেকে সুস্থ রাখতে। রাইফেলটা তার কাছে কয়েক টন ওজনের বলে মনে হচ্ছিলো। মন্টিকে স্যালুট করে ওদের প্লাটুনটা চলে যাবার মুহূর্তে ছেলেটা দুম করে পড়ে গেলো। কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে সে হাঁটতে শুরু করলো উল্টো দিকে। মন্টি চট করে তার কাছে চলে গিয়ে তাকে ঠিক দিকে ঘুরিয়ে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, এদিকে, এদিকে—ওদিকে নয়। তুমি খুব ভালো প্যারেড করছো। খুবই ভালো করছো। কিন্তু সব সময় তোমার সামনে যে আছে তার দিকে খেয়াল রাখবে। তাকে ফলো করবে।

ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে মন্টি বন্ধুর মতো কথা বলছিলেন। আর আনন্দে, আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিলো তার অসুস্থ ম্লান মুখটা। মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে গেলো তার অসুস্থ ভাব। একজন সুস্থ সৈনিকের মতো সে ঠিক পথে মার্চ করে চলে গেলো। জেমস বুঝলো, এইভাবেই মন্টি সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। সেইজন্যেই সকলে তাঁকে অত ভালোবাসে।

পরের ক'দিন জেমস আরও ভালোভাবে এবং কাছ থেকে মন্টিকে লক্ষ্য করলো। মন্টি সিগারেট খান না, কোনো পানীয় তো নয়ই। তাঁর শারীরিক ক্ষমতা চমকে দেবার মতো। ব্রেকফাস্টে পরিজের সঙ্গে দুধ খান না। খেতে বসে পাখি, জন্তু-জানোয়ার আর ফুল নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন। অফিসারদের পেছনে লাগেন, তাঁরা পরিবেশ আর প্রকৃতি নিয়ে বিশেষ কিছু জানেন না বলে। কিন্তু ভুলেও কখনো যুদ্ধ-টুদ্ধ নিয়ে কথা বলেন না।

জেমস মন্টিকে লক্ষ্য করতো আর অবসর সময়ে তার অনুশীলন করতো। মন্টির মতো দু'হাত পেছনে মুঠো করে হাঁটতো। মন্টির মতো থুতনি হাতের ওপর রেখে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করতো।

অনুশীলন করতো তাঁর কথা-বলার ধরন। ধীরে ধীরে জেমস আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলো। ও পারবে—মন্টি-র ভূমিকায় ও ভালোভাবেই উতরে যাবে। শুধু একটা বিষয়েই জেমস সন্দীহান। ও বোধহয় কিছুতেই জেনারেল মন্টগোমারির প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব আয়ত্ত করতে পারবে না। তবে জেমস আত্মবিশ্বাসী। ও অভিনেতা। সুতরাং মন্টির ভূমিকায় ওর সুষ্ঠুভাবে অভিনয় না করতে পারার কারণ নেই। জেমস কর্নেল লিস্টারকে ফোন করলো, আমি তৈরি স্যার।

ঠিক আছে। তুমি তাহলে কালই চলে এসো। জেনারেলের সঙ্গে তোমার একটা ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে রাখছি। একেবারে গোপন সাক্ষাৎকার কিন্তু।

কাল জেনারেলের সঙ্গে ইন্টারভিউ! কথাটা মনে হতেই জেমসের পেটের মধ্যে প্রজাপতিরা ফরফর করতে শুরু করে!

পরদিন জেমস যখন জেনারেলের ঘরে ঢুকলো তখন উনি কিছু লিখছিলেন। জেমসকে দেখে হেসে উঠে দাঁড়ালেন। জেমস অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো। ওর মনে হলো, আয়নায় ও বুঝি নিজেকেই দেখছে। নিজেকে সামলে নিয়ে জেমস জেনারেলের ভ্রূর দিকে তাকালো। বুঝলো ওর নকল ভ্রূ লাগাবার দরকার নেই। বয়সে মন্টি জেমসের থেকে অনেকটাই বড়। কিন্তু দু'জনের চেহারার মিল সত্যিই চমকে ওঠার মতো।

চেয়ার থেকে উঠে জেনারেল জেমসের কাছে চলে এলেন। গল্প শুরু করে দিলেন। জানা গেলো দু'জনেরই জন্ম অস্ট্রেলিয়ায় এবং কাছাকাছি। জেমস জেনারেলের শব্দ চয়ন আর কথা বলার ঢংটা লক্ষ্য করলো। কাটা কাটা কথা বলেন মন্টি।

মন্টি জেমসের কাঁধে, হাত রেখে বললেন, তোমায় যে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো? তোমার কোনো অস্বস্তি হচ্ছে না তো? আত্মবিশ্বাসী তো তুমি?

জেমসের ইতস্ততঃ ভাব দেখে মন্টি বলে উঠলেন, একদম ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মন্টির ব্যক্তিত্ব আর আন্তরিকতার ছোঁয়ায় জেমসের মনের মধ্যে যে ভয় আর আশঙ্কার ভাবটা জেগে উঠেছিলো তা নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। আত্মবিশ্বাসে টানটান হয়ে উঠলো জেমস। সে আর লেঃ জেমস নয়—সে এখন জেনারেল মন্টগোমারি।

কেটে গেলো এর পরও কয়েকটা দিন। জেমস সকলের চোখের আড়ালে নিজেকে তৈরি করে নিতে লাগলো। অপেক্ষা করতে লাগলো সেই নির্ধারিত সময়ের। দেখতে দেখতে এসেও গেলো সেই দিনটা।

সেদিন দুপুরে কর্নেল লিস্টার এসে হাজির হলেন। বললেন, এবার সময় হয়েছে তোমার আত্মপ্রকাশ করার। কাল সন্ধ্যে সাড়ে ছটা থেকে তুমি জেনারেল মন্টগোমারি হয়ে যাচ্ছো। তোমায় সোজা সকলের চোখের সামনে দিয়ে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে। এমনভাবে নিয়ে যাওয়া হবে যাতে সকলেই জেনারেলের যাওয়াটা দেখতে পায়। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর প্লেন তোমার জন্যে রেডি থাকবে। পরদিন সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তুমি জিব্রালটারে নামবে।

জেমস চুপ করেছিলো। ওর সারা শরীরটা শিরশির করছে। একটা ভয়ভয় ভাব ওকে গ্রাস করতে চাইছে। জেমস বুঝলো ও নার্ভাস হয়ে পড়ছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করলো। কর্নেল লিস্টার তখন বলছেন, আমরা আফ্রিকার চারিদিকে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছি যে জেনারেল ওখানে আসতে পারেন। অ্যাঙ্গলো-আমেরিকান আর্মি নিয়ে তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সে আক্রমণ চালাতে পারেন। এই গুজবকে যাতে সকলে সত্যি ভাবেন তাই তুমি মধ্য-প্রাচ্য দিয়ে যাবে। সেইরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। মনে রেখো, তোমার প্রত্যেকটি মুহূর্তের ওপর হিটলারের গুপ্তচরবাহিনী লক্ষ্য রাখবে।

আমরা তোমায় বলে দিতে পারি কি করতে হবে না হবে—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সবকিছু সব সময় ঠিক-ঠাক হয় না। তখন অবস্থা বুঝে তোমাকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। একটা কথা মনে রেখো, এখন থেকে সিনিয়ার অফিসাররা সবাই তোমার আজ্ঞাবাহক। তুমিই বস। তুমিই জেনারেল মন্টগোমারি। জনগণ যদি অভিনন্দন জানায় তাহ'লে জানবে তা শুধু তোমাকেই জানাচ্ছে। তাদের প্রত্যুত্তর দেবে তুমি। তুমি আর তুমি নও কিন্তু। তুমি হচ্ছো জেনারেল মন্টগোমারি। আমাদের সর্বাধিনায়ক। এই কথাটা মুহূর্তের জন্যেও ভুলবে না। লেঃ জেমস বলে যে একজন ছিলো সেই কথাটা আর মনে রাখবে না।

কর্নেল চলে গেলেন। জেমস মন দিয়ে শুনেছে তাঁর প্রতিটি কথা। কিন্তু কর্নেল চলে যেতেই আবার সেই ভয়-ভয় ভাব তার বুকের ওপর চেপে বসলো। আশঙ্কায় ভারী হয়ে উঠলো নিঃশ্বাস। আতঙ্কে সে যেন নীল হয়ে গেলো। কর্নেল না বললেও সে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে, হিটলারের বাহিনী তার প্রাণনাশের চেষ্টা করবেই।

চব্বিশটা ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেলো জেমস তা বুঝতেও পারলো না। পরের দিন জেনারেলের পোশাক পরে যখন আয়নার সামনে দাঁড়ালো তখন ও যেন নিজেকেই আর চিনতে পারছে না। মাথায় মন্টির বিখ্যাত কালো টুপি পরে, আর্মার্ড কোরের ব্যাজ লাগিয়ে জেমস যখন সামনে এসে দাঁড়ালো কর্নেল লিস্টার তখন চমকে গিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপরই তাঁর মুখে খেলে গেল এক চিলতে হাসি। বললেন, দারুণ!

তারপর এক গোছা খাঁকি রুমাল যাতে জেনারেলের নামের আদ্যাক্ষর বি এল এম লেখা জেমসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এগুলো জেনারেলের রুমাল। তোমার যেখানে প্রয়োজন মনে হবে সেখানেই ইচ্ছে করে ভুলে একটা করে রুমাল ফেলে যাবে। এতে হিটলারের গুপ্তচররা আরও বেশি নিশ্চিত হবে। তাদের খবর যে ভুল নয় তার প্রমাণ হিসেবে হয়তো তারা ঐ রুমালটাকেই হিটলারের সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দেবে।

হ্যান্ডশেক করে, শুভেচ্ছা জানিয়ে কর্নেল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জেমসের দু'পাশে এসে দাঁড়ালেন জেনারেলের দুই এ ডি সি ব্রিগেডিয়ার হেউড আর ক্যাপ্টেন মুর। ঠিক মন্টির মতো করে টুপিটা পরে জেমস ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তার পেছনে দুই এ ডি সি।

নিচে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলো সেনাবাহিনীর তিনটি গাড়ি। জেনারেলের গাড়ি চিনতে কারো ভুল হয় না। ফ্ল্যাগ লাগানো ছিলো গাড়িটায়। একদল কৌতূহলী মানুষ গাড়িটার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। মন্টিকে দেখেই তাঁদের মধ্যে দেখা গেলো চাপা উচ্ছ্বাস। তাঁরা চিৎকার করে উঠলেন, গুড মর্নিং মন্টি!

জেনারেলের মুখে সেই পরিচিত হাসি। সেই পরিচিত স্যালুট।

জেনারেলকে নিয়ে সদর দপ্তর থেকে গাড়ি তিনটি ছুটলো বিমানবন্দরের দিকে। রাস্তার ধারে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন মন্টিকে চিনতে তাঁদের বিন্দুমাত্রও অসুবিধে হয়নি। তাঁরা হাত নাড়িয়ে, চিৎকার করে জেনারেলকে শুভেচ্ছা জানাতে লাগলেন। জেনারেলের মুখে তখন লেগে আছে সেই পরিচিত হাসি। বিমানবন্দরে আসার আগেই চোয়াল ব্যথা হয়ে গেলো জেনারেল মন্টগোমারিরূপী জেমসের।

বিমানবন্দরে জেনারেলকে বিদায় জানাবার জন্যে সিনিয়ার অফিসাররা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মন্টিকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন। জেমসের বুকের মধ্যেটা আবার ধক্ করে উঠলো। এও এক বড় পরীক্ষা।

মন্টিকে যেভাবে গাড়ি থেকে নামতে দেখেছে ঠিক সেইভাবেই নেমে এলো জেমস। মুখে তার সেই বিখ্যাত হাসি। তার পিছনে ব্রিগেডিয়ার হেউড।

জেনারেল এক এক সিনিয়ার অফিসারদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁরা শক্ত হয়ে অ্যাটেনশানে দাঁড়িয়ে। অফিসারদের স্যালুট নিয়ে জেনারেল এগিয়ে গেলেন প্লেনের কর্মীদের দিকে। তাঁরা একপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পাইলটকে গিয়ে জেনারেল জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো স্লি? কি মনে হচ্ছে, আমাদের যাত্রাটা ভালোভাবেই কাটবে তো?

বিমানের কর্মীদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে জেনারেল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে নিচে সার দিয়ে দাঁড়ানো সকলকে স্যালুট করে প্লেনের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

জেমসের মনে হলো, তার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। প্রথম পরীক্ষাটা জেমস ভালোভাবেই উৎরে গেলো।

প্লেনটা গর্জন করে উঠে সবে ট্যাক্সিং শুরু করেছে, নিচে দাঁড়ানো মন্টির ঘনিষ্ঠ একজন

অফিসার আর একজনকে বললেন, বুড়োটিকে লক্ষ্য করেছো—কিরকম ফিট। তবে ওঁকে একটু ক্লান্ত দেখালো, তাই না?

পরদিন সকালে প্লেন এসে জিব্রালটারে নামলো। প্লেন থেকেই জেমসের চোখে পড়লো জিব্রালটারের সেই ফেমাস রকটা। জেমস আরও দেখলো, দু'দল অফিসার সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওপাশে একদল দর্শক। তাদের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু স্পেনের শ্রমিক। ব্রিগেডিয়ার হেউড বললেন, ঐ শ্রমিকদের মধ্যে বেশিরভাগই জার্মানির গুপ্তচর। সুতরাং.....

প্লেনটা ততোক্ষণে দাঁড়িয়ে গেছে। জেমস নামার জন্যে রেডি হয়ে উঠে দাঁড়ালো। হেউড বললেন, প্লেনের দরজা খুললেই আপনি সামনে গিয়ে একটু দাঁড়াবেন। যতো বেশি সংখ্যায় লোক আপনাকে দেখে ততোই ভালো।

দরজা খুলে গেলো। জেনারেল এসে বাইরে দাঁড়ালেন একমুখ হাসি নিয়ে। একটুখানি দাঁড়িয়ে দিলেন সেই বিখ্যাত মন্টি-স্যালুট। তারপর গ্যাংওয়ে ধরে টকটক করে নিচে নেমে এলেন। স্বাগত অনুষ্ঠানের পর জেনারেলকে নিয়ে গাড়ি ছুটলো গভর্নরের প্রাসাদের দিকে। রাস্তার দু' ধারের মানুষ লক্ষ্য করলেন, জেনারেল মন্টগোমারি চলেছেন। কেউ কেউ হাত নাড়লেন। প্রত্যুত্তরে পেলেন সেই বিখ্যাত স্যালুট আর হাসি।

জেমসের বুকের মধ্যে তখন হাতুড়ি পিটছে। জেনারেল স্যার রাল্ফ ইস্টউড তখন জিব্রালটারের গভর্নর। তিনি আবার মন্টির বন্ধু। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জেমস ভেবে পাচ্ছে না রাল্ফের কাছে নিজেকে লুকোবে কি করে। গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চ'ললো।

গভর্নর হাউসে বেশ ভিড়। জেনারেলকে দেওয়া গার্ড অফ অনার দেখছেন তাঁরা। গার্ড অফ অনারের পর দুই বন্ধু—জেনারেল মন্টগোমারি আর স্যার রাল্ফ এগিয়ে এলেন কাছাকাছি, স্যার রাল্ফ হাত বাড়িতে হাসিমুখে বললেন, হ্যালো মন্টি—কতদিন পরে আবার দেখা হলো। ভীষণ ভালো লাগছে।

জেমসকে বারবার করে বলে দেওয়া হয়েছিলো, স্যার রাল্ফকে মন্টি সব সময় ডাকনামে ডাকেন। জেমস হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, কেমন আছো রুস্টি? তোমায় দারুণ ফিট দেখাচ্ছে।

জেমস এগিয়ে গিয়ে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন স্যার রাল্ফকে। তারপর দু'জনে এগিয়ে চললেন গভর্নরের পড়ার ঘরের দিকে। করিডোর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকেই স্যার রাল্ফ দরজা বন্ধ করে দিলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন জেমসের মুখের দিকে। আশঙ্কায় ঘামতে লাগল জেমস। তার হৃদপিণ্ডের গতি তখন দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। বুঝতে পারছে না কি করবে। হঠাৎ দেখল, গভর্নরের মুখে হাসি। তিনি জেমসের হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে তুমি মন্টি নও। আমার মনে হচ্ছিলো, পুরো পরিকল্পনাটা বদলে গেছে। আর মন্টি নিজেই এসেছে।

আপনি সব জানেন?

জেমস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

গভর্নর হাসছিলেন। বললেন, তোমার কি মনে হয় জেমস—আমি কি সব জানি?

দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠলেন। জেমসের বুকের মধ্যে জমে ওঠা ভার অনেকটাই নেমে গেলো।

নিজের ঘরে বসে ব্রেকফাস্ট সেরে জেমস গিয়ে দাঁড়ালো জানলার কাছে। ইচ্ছে, আকাশে মেঘটেঘ করেছে কিনা দেখা। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাতে গিয়েই আতঙ্কের শিহরণ খেলে গেলো জেমসের শরীরে। গভর্নর হাউসের উল্টো দিকে একটা বাড়ির ছাদে কিছু শ্রমিক কাজ করছিলো। জেমস দেখতে পেলো দুটো লোককে। পরিষ্কার দেখলো, একটা রাইফেলের নল ওর দিকে তাক করা। জেমসের মনে হলো, ওর শরীরটা হিম হয়ে গেছে। ও নড়তে পারছে না। যে কোনো মুহূর্তে গুলিটা ছুটে এসে ওর হৃদপিণ্ড ফুটো করে দেবে।

অল্প সময়ের মধ্যেই জেমস নিজেকে ফিরে পেলো। ভয়ের ভাবটা মন থেকে তাড়িয়ে ভালো করে তাকালো ছাদটার দিকে। দুজন লোক ছাদের ওপর কাজ করছে। তাদেরই একজন একটা টেলিস্কোপ দিয়ে জেমসকে আরো ভালো করে দেখার চেষ্টা করছে। জেমস জানলার সামনে থেকে নড়লো না। ওরা যাতে তাকে আরও ভালোভাবে দেখতে পায় সেইজন্যে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। দেখতে লাগলো বাগান, গাছ-গাছালি, ফুল-পাখি, আকাশ।

একটু পরেই একজন অফিসার এসে জেমসকে স্যার রাল্ফের ঘরে নিয়ে গেলেন। স্যার রাল্ফ বললেন, ঠিক বারো মিনিট পরে তোমায় নিয়ে আমি বাড়ির পেছনের বাগানে বেড়াতে যাবো। ওখানে আমরা ঘুরবো। দুজন স্প্যানিশ ব্যবসায়ী মরক্কোর কার্পেট বিক্রি করতে আসবে। ওরা আমাদের বন্ধু ভাবে, আসলে কি বুঝতে পারছো তো! তা ওরা ফেরার পথে বাগানে হঠাৎ তোমায় দেখে ফেলবে। ব্যাপারটা কেমন হবে বুঝলে?

জেমসের খুব মজা লাগলো। ওর বুঝতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধে হলো না যে ঐ লোক দুটো জার্মানির গুপ্তচর। বন্ধুর বেশ ধরে গভর্নর হাউসে আসে খবর-টবর সংগ্রহ করতে। ওদের পরিচয় স্যার রাল্ফ ভালোভাবেই জানেন।

পরিষ্কার আকাশ। ঝলমলে রোদ বাগানের রং-বেরংয়ের ফুলের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। ভেসে আসছে পাখির ডাক। দুই বন্ধু—গভর্নর স্যার রাল্ফ ইস্টউড আর জেনারেল মন্টগোমারি বাগানে ঘুরছিলেন গল্প করতে করতে। গল্পের বিষয় ছিলো হর্টিকালচার। বাঁ-দিকে ঘুরে একটু এগোতেই দেখা গেলো একদল শ্রমিক একটা পাঁচিল সারানোর কাজ করছে। তাদেরই একজনের নজর জেনারেলের ওপর। একমনে দেখছে জেনারেলকে। জেমস চিনতে পারলো, একটু আগে এই লোকটাই টেলিস্কোপ দিয়ে তাকে দেখছিলো।

হঠাৎ লোহার গেট খুলে গেলো। দুজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। দুজনেরই পরনে স্যুট। নিখুঁতভাবে দাড়ি-গোঁফ কামানো। স্যার রাল্ফ আস্তে আস্তে বললেন, জেমস, নার্ভাস হয়ো না।

লোক দু'জনকে না দেখার ভান করে জেমস যুদ্ধ আর প্ল্যান ৩০৩ নিয়ে কথা বলতে লাগলো। লোক দুজন কাছাকাছি আসার পর গভর্নর আলতো করে জেনারেলের গায় হাত দিলেন। জেনারেল চমকে উঠে সামনে লোক দুজনকে দেখে কথা থামিয়ে দিলেন।

ব্যবসায়ী দুজন স্পেনের কায়দায় বাও করে গভর্নরকে অভিনন্দন জানালো। জেনারেলের সঙ্গে ওদের দু'জনের আলাপ করিয়ে দিলেন গভর্নর। দুজনেরই চোখে-মুখে বিস্ময় আর শ্রদ্ধা। জেনারেল ওদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করলেও ঘনিষ্ঠতার আগ্রহ দেখালেন না। তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে পেছনে হাত দিয়ে হেঁটে একটু দূরে সরে গেলেন। দূর থেকেই জেমস লক্ষ্য করলো একজন তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। দুজনে আগেই জেনারেলকে যুদ্ধ ও প্ল্যান ৩০৩ নিয়ে কথা বলতে শুনেছিলো। এবার শুনলো আবহাওয়া, ফুল আর গভর্নর হাউসের ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে।

জেমসের মনে হলো ওরা তাকে ভালোভাবেই দেখে নিয়েছে। জেমস আর সময় নষ্ট করলো না, গভর্নরের দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার কি মনে হয় রুস্টি, আবহাওয়া এইরকমই থাকবে। আমাকে আবার প্লেনে অনেকটা পথ যেতে হবে।

জেনারেল আর কথা বাড়ালেন না। অন্যদিকে চলে গেলেন। গভর্নরও ব্যবসায়ী দুজনকে নিয়ে ঘরে গেলেন। জেমস নিশ্চিন্ত, গুপ্তচর দুজন নিঃসন্দেহ হয়েছে। এখানে ওরা যা শুনলো তার সবটাই কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে হিটলারের সদর দপ্তরে। সেই সঙ্গে বদলে যাবে হাজার হাজার সৈন্যের ভাগ্য।

জেমস পরে শুনেছিলো, ঐ দুজনই ছিলো হিটলারের বিশ্বস্ত এবং চতুর গুপ্তচর। জেনারেলের খবরাখবর পাঠাবার জন্যে ওদের জিব্রালটারে পাঠানো হয়েছিলো। ওরা শুধু দুজনই ছিলো না। আরও দুজন ছিলো ওদের দলে। একজনকে ওরা রেখেছিলো বিমানবন্দরে। অন্যজন শ্রমিকের বেশে প্রথমে

সামনের বাড়ির ছাদ থেকে এবং পরে গভর্নরস হাউসের পাঁচিলে কাজ করার অছিলায় জেনারেলের ওপর নজর রেখেছিলো। চারজন গুপ্তচরই আলাদা আলাদাভাবে তাদের রিপোর্ট বার্লিনে পাঠিয়েছিল। এদের একজনের সঙ্গে জেমসের আবার পরে দেখা হয়েছিল। জেমস চিনতে পারলেও সে পারেনি।

গুপ্তচর দুজন গভর্নর হাউস ছাড়ার দু'ঘণ্টার মধ্যেই মাদ্রিদে হিটলারের প্রতিনিধি খবর পেয়ে গিয়েছিলেন যে জেনারেল মন্টগোমারি জিব্রালটারে পৌঁছে গেছেন। শীগগিরই আফ্রিকায় যাবেন। সেই সঙ্গে বার্লিনে জরুরী খবর গেলো, যেভাবেই হোক প্ল্যান ৩০৩ কি তা জানার চেষ্টা করো। তোমরা কি কোনো খবর পেয়েছো? এর পরই নাৎসীবাহিনী প্ল্যান ৩০৩ কি তা জানার জন্যে তার এজেন্টদের কাজে লাগার নির্দেশ দিয়েছিলো।

জেনারেলের বিদায় অভিনন্দনও একই রকম হলো। সেই গার্ড অব অনার। সেই স্যালুট। সেই হাসি। বিদায় অনুষ্ঠানের পর জেমস স্যার রাল্ফকে একরকম জড়িয়ে ধরে বিমানবন্দরের ক্যান্টিনে এসে ঢুকলো। জেমস জানতো নরওয়ের এক গেস্টাপো এজেন্ট ক্যান্টিন থেকে নজর রাখছে জেনারেলের ওপর। ক্যান্টিনে এসে দুজনে পায়চারি করতে করতে কথা বলছিলেন। জেনারেল বললেন, জাহাজঘাটার নিরাপত্তার ব্যাপারটাও তো আছে। আমি প্রধানমন্ত্রীকে C_4-এর কথা বলেছি। আমি জাহাজগুলোকে এমনভাবে চাই যাতে গোলন্দাজবাহিনীর একটুও সময় নষ্ট না হয়। রুস্টি, আমার প্ল্যানটা বুঝতে পেরেছো তো? আমরা যদি রাত তিনটে নাগাদ বন্দর থেকে যাত্রা করি তাহলে ইঞ্জিনিয়াররা সহজেই প্ল্যান ৩০৩-এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে।

গভর্নর চোখ টিপে ইশারা করলেন—এখনকার মতো যথেষ্ট হয়েছে। টোপ গিলেছে গুপ্তচররা। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে প্লেনে চড়ো।

প্লেন উঠলো আকাশে। এবার থামবে আলজিয়ার্সে। খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে জেনারেল মণ্টিগোমারি আসছেন বলে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। সম্ভবতঃ অ্যাংলো-আমেরিকান সৈন্য নিয়ে তিনি ফ্রান্সের দক্ষিণ দিক দিয়ে জার্মানদের ওপর আঘাত হানার পরিকল্পনা করছেন এই রকম একটা ধারণা হয়েছিলো ঐ অঞ্চলের মানুষজনের। এই ধারণাটা অবশ্য তৈরি করে দেওয়া হয়েছিলো। মন্টির 'টপ সিক্রেট ভিজিটে'র কথাটা এমনভাবে কানাকানি করে দেওয়া হয়েছিল যাতে জার্মান গুপ্তচরবাহিনী আগেভাগেই তৈরি হয়ে নিতে পারে।

বিমানবন্দরে জেনারেল উইলসনের বাহিনী স্বাগত জানালেন মন্টিকে। গার্ড অব অনার নেবার সময় মন্টি লক্ষ্য করলেন, তাঁকে দেখার জন্যে ছোটখাটো একটা ভিড় জমেছে। ঐ ভিড়ের মধ্যে আছে দুজন ইতালিয়ান। মিত্রবাহিনীর পক্ষে সহানুভূতিশীল হলেও ওরা দুজনে আসলে জার্মান গুপ্তচর। ওদের 'বস' একজন ফরাসি মেজর। তিনিও এসে গেছেন। তিনি ফরাসি ইনটেলিজেন্সের অফিসারের ভান করলেও আসলে তিনি যে গেস্টাপোর লোক, এ কথাটা মিত্রবাহিনীর ওপর মহলের লোকজন জানেন। তিনি মন্টির সঙ্গে সাক্ষাৎকার চেয়েছেন। তাও মঞ্জুর করা হয়েছে।

বিমানবন্দরেই সেই মেজরের সঙ্গে মন্টির আলাপ করিয়ে দিলেন একজন কর্নেল। লোকটাকে দেখলেই বোঝা যায়, সে একটি আস্ত শয়তান। তার কালো চোখ দুটো চকচক করছিলো। চোখের তলা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত একটা কাটা দাগ মুখটাকে আরও বীভৎস করে তুলেছে। লোকটা যে কোনো সময় যে কোনো অন্যায় কিংবা অপকর্ম করতে পারে। মেজরকে দেখেই জেমসের গা শিরশির করে উঠলো। সন্দেহজনক চোখে একবার তাকালো মেজরের দিকে। জেমসের মনে হলো, লোকটা বোধহয় তাকে গুলি করার চেষ্টা করবে। সে-সব অবশ্য কিছুই হলো না। হাসিমুখে জেনারেলের সঙ্গে করমর্দন করলেন সেই ফরাসি মেজর।

একজন মার্কিন কর্নেলের সঙ্গে জেনারেল এগিয়ে গেলেন গাড়ির দিকে। গাড়ির কাছে এসে মন্টি দাঁড়াতেই তাঁকে স্যালুট করলেন একজন সুদর্শনা। তাঁর পরনে মার্কিন মহিলা ফৌজিবাহিনীর পোশাক। স্যালুট করে মহিলা জেনারেলের অটোগ্রাফ চাইলেন।

অটোগ্রাফের ব্যাপারটা যে ঘটতে পারে কর্নেল লিস্টার তার আঁচ আগেই করেছিলেন। তাই মন্টির সই করা অনেকগুলো ছবি কর্নেল লিস্টার জেমসকে দিয়েছিলেন। হাসিমুখে জেমস সই করা একটি ছবি ভদ্রমহিলার হাতে তুলে দিয়ে বললো, মনে হয় এতেই হবে। সই করা ছবিটা হাতে পেয়ে মহিলার চোখ-মুখ খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠলো। আবার একটা স্যালুট করে ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসলেন তিনি।

বিমানবন্দর থেকে আর্মি হেড কোয়ার্টার—এই বারো মাইল পাড়ি দেবার কথা জেমস জীবনে কোনোদিন ভুলবে না। খবর ছিলো, পথেই জেনারেলের প্রাণনাশের চেষ্টা করতে পারে জার্মান গুপ্তচররা। অথচ সারা পথ সেইভাবে পাহারা দেওয়া সেই মুহূর্তে সম্ভব নয়। তাই জেনারেলের মার্কিন এসকর্ট-বাহিনীকে রকেট গতিতে গাড়ি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। যাত্রা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই নির্দেশ পালন করা হলো অক্ষরে অক্ষরে। জেমসের মনে হলো, তার গড়িটা যেন ছিটকে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে গেলো। তারপর দুরন্ত গতিতে ছুটতে লাগলো বারো মাইল পথ। পথে জেমস মন্টির মতোই কথাবার্তা বলতে লাগলো কর্নেলের সঙ্গে। এমনভাবে বলছিলো যাতে প্রত্যেকটি কথাই সেই মহিলা ড্রাইভারের কানে যায়।

পথে জেমসের চেয়ে অনেক বেশি টেনশনে ছিলেন তার পাশে বসা কর্নেল। সব সময়ই তিনি একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাবার আশঙ্কায় ঘামছিলেন। তাঁর মুখে আবার হাসি ফিরে এলো যখন গাড়িগুলো জেনারেল উইলসনের সদর দপ্তরের বিশাল কমপাউন্ডের মধ্যে ঢুকে পড়লো। জেমস দেখলো, গাড়িগুলো ঢুকে যেতেই তাদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেলো বিশাল গেটটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো জেমসের। সে মনে মনে নিজেকে তৈরি করে নিলো পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে।

এর পরের দিনগুলো কেটে যেতে লাগলো স্বপ্নের মতো। কখনো সম্বর্ধনা সভায়, কখনো সিভিলিয়ানদের সঙ্গে, কখনো অফিসারদের সঙ্গে আলোচনায়, আবার কখনও গার্ড অব অনার নিতে নিতে জেমস ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তবে মন্টিকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন এমন কিছু অফিসার ছাড়া অন্যদের জেনারেলের কাছে যাবার অনুমতি দেওয়া হতো না। আর গ্রহণ করা হতো না কোনো লাঞ্চ বা ডিনারের আমন্ত্রণ।

সেদিন সকালে ব্রিগেডিয়ার হেউড একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে এনে বললেন, মার্জনা করবেন স্যার, অধ্যাপক সালভাডর এক্স, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। উনি একজন খুব নামকরা আর্কিওলজিস্ট আর বিশ্বস্ত ইতালিয়ান।

হেউডের কথা শুনে জেমস প্রথমটায় একটু বিরক্ত হয়েছিলো। একজন আর্কিওলজিস্টের সঙ্গে কথা বলে সে কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করবে! তারপরই মনে পড়লো হেউড একজন ঝানু অফিসার—তিনি যখন বলছেন, তখন অধ্যাপক ভদ্রলোক নিশ্চয়ই...

জেনারেলের সঙ্গে অধ্যাপক অত্যন্ত বিনীতভাবে কথা বললেন। আর্কিওলজি নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা হলো। তারপর হঠাৎ কিছু মনে পড়েছে এমন ভাব করে জেমস হেউডকে নিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে মিলিটারি প্ল্যান নিয়ে একটু জোরে জোরে কথা বলতে লাগলো। অধ্যাপক ভদ্রলোক কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলেন। জেমস যা চেয়েছিলো সেই সব কথা শুনলেনও। তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

এরপরই ঘটলো একটা হৃদয়-বিদারক ঘটনা। এক ফরাসি ভদ্রলোক জার্মানদের বিরুদ্ধে রেজিস্টেন্স গ্রুপের হয়ে কাজ করতেন। কিন্তু তিনি নাৎসীবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যান। জার্মানবাহিনী এর পর ভদ্রলোকের স্ত্রীকেও ধরে। তাঁকে বলা হয়, তিনি যদি তাদের গুপ্তচর হয়ে কাজ করেন তাহলে তাঁর স্বামীকে মেরে ফেলা হবে না। যুদ্ধের পর ছেড়ে দেওয়া হবে। ভদ্রমহিলা রাজী না হলে ভদ্রলোককে এখনই মেরে ফেলা হবে। ভদ্রলোকের মতো তাঁর স্ত্রীও পরম দেশভক্ত। তিনি স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে নাৎসীবাহিনীর প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। কাজ করছেন আলজিয়ার্সে।

সেই ভদ্রমহিলা এলেন জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে। ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশের মতো। নিখুঁত

সাজপোশাক। গড়ন একটু লম্বাটে। গায়ের রং একটু যেন চাপা। মন্টি মেয়েদের সঙ্গে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। দু-চারটে কথা বলে বিদায় করে দেবার তালে থাকেন।

ঠিক মন্টির মতো করেই মহিলাকে আহ্বান করলো জেমস। দু-চারটে কথা বলার পরই ভদ্রমহিলা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে লাগলেন। তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আসলে দেশের সঙ্গে শত্রুতা করাটা তিনি মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। কাঁদতে কাঁদতে তিনি যুদ্ধকে শাপ-শাপান্ত করতে লাগলেন সেই সঙ্গে জেনারেলকে বসালেন একেবারে পুরোহিতের আসনে। আসলে একদিকে দেশপ্রেম অন্যদিকে স্বামীকে বাঁচানোর তাগিদ ভদ্রমহিলার মন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। অত্যন্ত বেদনাদায়ক পরিস্থিতি। জেমস ভেবে পাচ্ছিলো না ভদ্রমহিলাকে কি বলবে। হেউড তাড়াতাড়ি এসে ভদ্রমহিলাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেলেন।

জেমস এই ক'দিনে মনে-প্রাণে জেনারেল মন্টিগোমারি হয়ে গিয়েছিলো। যখন একা একা থাকতো তখনও। একদিন প্লেন থেকে নামার আগে হেউড জেমসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, নার্ভাস লাগছে না তো?

নার্ভাস হেউড...ডোন্ট টক রট! জেমস একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দিয়েছিলো। তাই দেখে ব্রিগেডিয়ার হেউড তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলেন, সরি স্যার।

ক'দিনে আরও ক'য়েকটি দেশ ঘুরে জেমস আলজিয়ার্সে ফিরে এলো। সে যে জেনারেল মন্টগোমারি নয় এ সন্দেহ কারো মনে স্বপ্নেও আসেনি। অর্থাৎ সে তার ওপর দেওয়া দায়িত্ব ভালোভাবেই পালন করতে পেরেছে। ধোঁকা দিতে পেরেছে হিটলারের বাঘা বাঘা সব গুপ্তচরদের। এবার তার কাজ শেষ। 'ডি ডে'র আর মাত্র ক'য়েকদিন দেরি। সব প্রস্তুতি শেষ। যে জন্যে জেমসকে জেনারেলের ছদ্মবেশে দেশে দেশে ঘুরতে হয়েছিলো তা পুরোপুরি সফল। রোমেলের অপরাজেয় গোলন্দাজবাহিনীকে সরিয়ে নিয়েছেন হিটলার। ফলে নির্ধারিত দিনে মিত্রবাহিনীর আক্রমণের কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। সব চেয়ে বড় ভয় ছিলো রোমেলের বাহিনীকে। কিন্তু গুপ্তচরদের খবরগুলো মিলে যাওয়ায় হিটলারের সন্দেহ ছিলো না, মন্টি আফ্রিকার দিকে গিয়েছেন। সুতরাং...

জেনারেলের মধ্য-প্রাচ্য সফরের খবর বার্লিনে পৌঁছুবার পরই জার্মান হাইকম্যান্ড নির্দেশ দিয়েছিলেন মন্টির প্লেন গুলি করে নামিয়ে তাঁর প্রাণনাশ করতে। পরে অবশ্য এই নির্দেশ বদলে যায়। জার্মানরা নিশ্চিত হতে চাইছিলো, সত্যিই জেনারেল মন্টি সফরে যাচ্ছেন, নাকি তাঁর ছদ্মবেশে আর কেউ। এরপর জার্মান হাইকম্যান্ড ঠিক করেন স্পেন কিংবা আফ্রিকার কোথাও মন্টিকে খুন করা হবে। জার্মান হেড কোয়ার্টার যখন নিশ্চিত হলেন যে সত্যি সত্যিই জেনারেল মন্টিই লণ্ডন ছেড়ে ক'য়েকটি দেশ ঘুরে আফ্রিকায় যাচ্ছেন তখন মন্টির জীবন বাঁচাতে এগিয়ে এলেন স্বয়ং হিটলার। তিনি নির্দেশ দিলেন, ঠিক কোথা থেকে জেনারেল আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করেছেন যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে ততক্ষণ কোনো মতেই জেনারেল মন্টগোমারিকে মারা চলবে না।

জার্মানরা কোনোদিনই তা জানতে পারেনি। ফলে বেঁচে গেলো জেমসের জীবন। বলা যায় হিটলারই বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন জেমসকে। হিটলার বাধা না দিলেই পথেই কোথাও হয় জেনারেলের প্লেনটা গুলি করে নামানো হতো, না হয় তো অন্য কোথাও গুলি করে মারা হতো ছদ্মবেশী জেনারেলকে। জেমসের ভাগ্য ভালো কোনোটাই ঘটেনি।

নির্ধারিত দিনে জেমস জেনারেলের ছদ্মবেশে জেনারেল উইলসনের হেড কোয়ার্টারে গেলো। নিজের ঘরে গিয়ে জেনারেলের পোশাক ছেড়ে পরে নিলো তার নিজের লেফট্যান্যান্টের ইউনিফর্ম। তারপর বেরিয়ে এলো পেছনের দরজা দিয়ে। জেমসের সঙ্গে জেনারেল মন্টির চেহারার অদ্ভুত মিল দেখে পাছে কারো মনে এতটুকুও সন্দেহ জাগে তাই তখনই জেমসকে একটি প্লেনে চাপিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো কায়রোয়। কায়রোর জনারণ্যে হারিয়ে গেলো জেমস।

ওদিকে হিটলারের নাৎসীবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দিতে মিত্রবাহিনী জঘন্য আবহাওয়ার মধ্যেই

ফরাসি উপকূল দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জল এবং অন্তরীক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লো নরম্যান্ডির বুকে। জেনারেল মন্টগোমারি যে তাঁকে কতটা বোকা বানিয়েছেন তা বুঝতে সেদিন বোধহয় আর অসুবিধে হয়নি হিটলারের। এবং তার পুরো কৃতিত্ব ইংলিশ পে কোরের সামান্য একজন অফিসার লেঃ ক্লিফটন জেমসের।

আর যেদিন নরম্যান্ডিতে সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছে, জাহাজ থেকে সৈন্যরা নেমে নৌকোয় চড়ে গোলা-বারুদ নিয়ে গিয়ে কূলে উঠছে, ভারী ট্যাঙ্কগুলো জাহাজ থেকে নেমে জল ভেঙে পাড়ে উঠছে, আকাশে প্লেনের গর্জনে কান পাতা দায় তখন জেমস কায়রোর কোনো এক হোটেলে বসে আরামে খবর শুনছে। —লংগেস্ট ডে-র রোমাঞ্চকর সেই যুদ্ধকে সফল করতেই জেমসকে সাজতে হয়েছিলো জেনারেল মন্টগোমারি। এবং সেটাই অভিনেতা ক্লিফটন জেমসের জীবনের সেরা অভিনয়।

(এম. ই ক্লিফটন জেমসের 'আই ওয়াজ মন্টি'স ডবল' অবলম্বনে।)

[আশ্বিন ১৩৯৮]

বজ্রবাহিনী রহস্য

সুকুমার ভট্টাচার্য

আজ নিয়ে পর পর পাঁচ দিন এসে দাঁড়ালেন লাহিড়ি মশায়। সি. আই. টি রোডের তিনতলা ফ্ল্যাট বাড়িটার উল্টোদিকের ফুটপাতে। হাতঘড়িটা দেখলেন। সাতটা বেজে পাঁচ। তার মানে অন্যদিনের থেকে পাঁচ মিনিট লেট! হোকগে। এতে খুব একটা ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করেন না তিনি। যেহেতু সন্ধে, তাই সব ফ্ল্যাটেই আলো জ্বলছে। শুধু অনেক বেশি আলোর রমরমা ওই গানের স্কুলের ঘরগুলোতে। সব দিনের মতো আজও ওই ঘরে অনেক শিক্ষার্থীর ভিড়। যাঁরা আসা-যাওয়া করেন, গুনে দেখেছেন লাহিড়ি মশায়, কিছু না হোক জনা পনের তো হবেই। সঙ্গীত শিক্ষকটি যে বাজার জমিয়ে বসেছেন, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

তবে একটা নতুন ব্যাপার আজ চোখে পড়ল। যে লাইটপোস্টটার নিচে দাঁড়িয়ে তিনি ফ্ল্যাটটার দিকে নজর রাখেন, সেটার টিউবটা আজ বিগড়ে আছে। বার বার জ্বলছে নিভছে। যার ফলে "বৃকোদার সঙ্গীতায়তন" সাইনবোর্ডটার অবস্থা এই আছে এই নেই।

অদ্ভুত নাম। মিঃ মহাজনের মুখে নামটা শুনেই হেসে ফেলেছিলেন লাহিড়ি মশায়। বলেছিলেন, 'গানের স্কুলের অনেক নাম শুনেছি মশাই। কিন্তু এমন নাম জীবনে শুনিনি।'

'যা দিনকাল, তাতে আরো কত কি শুনতে হবে, তার ঠিক কি! আজকের দিনের মানুষ চায় অ্যাট্রাকশন। সাদামাটা কোনো একটা নাম দিলে, মানুষ ঝুঁকবে ওই সঙ্গীতায়তনের ওপর? কিন্তু ওই যে বিটকেল নাম, ওই নামের জোরেই গগন ফাটছে। প্রতি শিফটে কয়েক গণ্ডা করে ছাত্র-ছাত্রী। ভদ্রলোক, মানে যিনি এর প্রতিষ্ঠাতা, তিনি নিজে বড় একটা শেখান না। কিছু মাইনে করা সঙ্গীতশিল্পী আছেন, তাঁদের দিয়ে কাজ চালান।'

'উত্তম ব্যাপার।' মন্তব্য করলেন লাহিড়ি, 'আপনি এক কথার জবাবে অনেক কথা বললেন দেখছি। আমি শুধু নামটা অদ্ভুত বলে মন্তব্য করেছিলাম।'

অপ্রস্তুত মহাজন। থানার অফিসার-ইন-চার্জ মানুষ বলে, বিলক্ষণ একটু রাশভারি গোছের। তাঁর মুখের ওপর কেউই যে অমন কথা বলতে পারেন, এটা তাঁর ধারণার বাইরে। হতে পারে লাহিড়ি মশায় তাঁকে থেকে প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তাই নিজের গুরুত্ব বজায় রাখতে আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ওই নামটা একটা চালাকি। ভদ্রলোকের আসল নাম হলো ভীম চন্দ্র সেন। আপনি বেশ ভালই জানেন, বৃকোদার নামটাও ভীমের আর একটা নাম। সবার কাছে প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণ বাড়াতে অমন অদ্ভুত নামকরণ করা হয়েছে স্কুলটার।'

'বটে! বেড়ে মজাদার মানুষ তো?' চোখ দুটো হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল লাহিড়ির।

'মজাদার বইকি! কিন্তু ভীমসেন যদি ওইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতেন, তাহলে আমাদের মাথাব্যথার কিছু ছিল না। কিন্তু অর্থস্পৃহা ভদ্রলোককে মাতাল করে তুলেছে। ওই প্রতিষ্ঠানটা যতটা না সঙ্গীত শিক্ষায়তন, তার থেকে অনেক বেশি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। মুম্বাই-চেন্নাই-ধানবাদের মাফিয়াদের উনি একটি সিক্রেট এজেন্ট। কলকাতায় তাদের এই একটাই ঘাঁটি। এখান থেকে বাবু ভীমসেন মারফৎ সারা ভারতের অধিকাংশ দুষ্কর্মের প্ল্যানস অ্যান্ড প্রোগ্রামস চালাচালি হয়।'

'বাঃ!' তারিফ করলেন লাহিড়ি, 'আপনি তো দেখছি ওদের অনেক খবরই রাখেন। কিন্তু এর মধ্যে আমার কি ভূমিকা, অর্থাৎ আমায় কি করতে হবে বুঝতে পারছি না।'

মহাজন হাসলেন। বললেন, 'হ্যাঁ। আমার আসার উদ্দেশ্যটা এখনো বলা হয়নি। দেখুন, কখনো কখনো আমাদের, মানে পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরকেও ফ্রন্ট লাইন থেকে সরিয়ে নিতে হয়। তেমন তেমন কোনো কাজ, নিজেরা না করে অন্যদের দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। এর দুটো কারণ থাকে। এক, অপরাধীদের কাছে গোয়েন্দা দপ্তরের অনেকেই কিছু অপরিচিত নন। তাদের চোখ এড়িয়ে আমাদের লোকেরা বড় একটা চলাফেরা করতে পারেন না। দুই হচ্ছে, সব মানুষ সমান নন। যা দিনকাল চলছে, হয়তো দেখা যাবে, মোটা টাকার অফার দিয়ে আমার লোককেই বাবুরা হাত করে রেখেছে।'

'বলেন কি!' হো হো করে হেসে উঠলেন লাহিড়ি, 'যাকে বলে সর্ষের মধ্যে ভূত?'

'হ্যাঁ। শুধুমাত্র এই দুটো কারণেই কেসটা আমরা আপনার হাতে দিতে চাই। আপনার কাজ হবে, ওই বৃকোদর সঙ্গীতায়তনের ওপর নজর রাখা। লক্ষ্য করা, কারা আসে, কারা যায়! গোপন সংবাদ বা অস্ত্রশস্ত্র, ইফ এনি, কি ভাবে পাচার হয়। এটুকু যদি আপনি আমাকে জানাতে পারেন, তাহলেই যথেষ্ট। তারপর যা করবার, তা আমরাই করব।'

'হুঁ!' মুখ দিয়ে শুধু এই একটা মাত্রই শব্দ উচ্চারণ করে লাহিড়ি চুপ করে রইলেন। বোধহয় তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন, এ ভার তিনি নেবেন কি নেবেন না। তারপর বললেন, 'কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'কি?' ভ্রুজোড়া ধনুক হলো মহাজনের।

'আমি যতক্ষণ না আপনার সাহায্য চাইব, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমার কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। আমার যদি কোনো বিপদও হয়, তাহলেও আপনাকে হাত গুটিয়ে থাকতে হবে। এগরীড?'

'নো।' স্পষ্ট জবাব মহাজনের, 'আমি আপনাকে গোটকতক শয়তানের পেছনে ঠেলে দিয়ে নিজে হাত গুটিয়ে বসে থাকব—এ হয় না। তবে একটা কথা দিতে পারি, যদি দেখি আপনার প্রাণ বিপন্ন, একমাত্র তেমন পরিস্থিতি ছাড়া আমি আপনার কোনো কাজে ইন্টারফেয়ার করব না।'

'ঠিক আছে। আমি তাহলে কাল থেকেই কাজে নামব।'

কথামতো এই মাঝের পাঁচটা দিন, সকাল থেকে রাত্তির নটার মধ্যে যখন পেরেছেন এসে দাঁড়িয়েছেন সি. আই. টি রোডের ওই ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনে। সকালে ঘণ্টা তিনেক খোলা থাকে সঙ্গীতায়তন। তারপর বন্ধ। খোলা হয় আবার বিকেল চারটে নাগাদ। আর সেই যে খোলে, বন্ধ হয় রাত্তির নটায়। এই ক'দিন ঢোকা-বেরনোর মুখে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকেই তিনি দেখেছেন। কেউ কেউ বা মুখচেনাও হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের কাউকে দেখেই মনে হয় না, তারা অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত। এমনকি স্বয়ং বৃকোদর, অর্থাৎ ভীমসেন, তাঁরও হাবভাব চলন-বলন, কেমন যেন নির্ভেজাল মেয়েলিপনায় ভর্তি। মনেই হয় না উনি কোনো মারাত্মক গোপন চক্রের সিক্রেট এজেন্ট!

কাল রাত্তিরে মহাজন ফোন করে জিজ্ঞেস করেছেন, 'কি খবর? প্রগ্রেস কিছু হলো?'

হেসে জবাব দিয়েছিলেন লাহিড়ি, 'আমি কেবল গান শুনেছি। খেয়াল-টপ্‌পা-গজল-ঠুংরি। অফ কোর্স রাস্তার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে যতটা শোনা যায়।'

'ও বাবাঃ! একেবারে ক্লাসিকাল!' একটু যেন অবাক মহাজন, 'অন্য গান-টান কিছু হয় না? নিদেনপক্ষে নজরুল-রবীন্দ্র কিংবা আধুনিক?'

'হয়। "গগনে গগনে ধায় হাঁকি, বিদ্যুৎ বাণী বজ্রবাহিনী বৈশাখী।" রবীন্দ্রসঙ্গীত।'

'বজ্রবাহিনী বৈশাখী!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য!' অনেক পরে বলেছিলেন, 'দেখছি একেবারে চরিত্র বিরোধী কাজকর্ম। ওককে, চালিয়ে যান আরো কয়েকদিন। দেখা যাক কি হয়।' বলে লাইন ছেড়ে দিয়েছিলেন মহাজন।

কিন্তু সবটাই বিরক্তিকর। মানে ঠায় একভাবে দাঁড়িয়ে থাকা! শেষে পায়চারি করতে শুরু করলেন লাহিড়ি। লম্বা রাজপথ। দু-পাশে তিন-চারতলা বাড়ির সারি। সার সার লাইটপোস্ট। কোন দূর পর্যন্ত গিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে। মোটর-ট্যাক্সি-বাস মাঝে মাঝে হুসহুসিয়ে ছুটে যাচ্ছে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে। দশ-বিশ পা যান, আর পিছু ফেরেন।

হঠাৎ সামনে একটা ছোকরা এসে দাঁড়াল। মুখ তুললেন লাহিড়ি। রোগা, লম্বাটে একটা বিশ-বাইশ বছরের ছোকরা। চোখে নিকেলের সাদা চশমা। মিনমিনে গলায় বলল, 'এক্সকিউজ মি, আপনি একটু আমার সঙ্গে আসতে পারেন?'

লাহিড়ি ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, 'আমি! কেন, কোথায়?'

'আমাদের গানের স্কুলে। গুরুজি ব্যস্ত তাই আসতে পারলেন না। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।'

'কিন্তু আমাকে কেন?' আবার জানতে চাইলেন লাহিড়ি।

'তা তো বলতে পারব না।'

'কি-ন-তু—' উচ্চারণটা লম্বা হয়ে গেল লাহিড়ির।

'তবে কি গিয়ে বলব, আপনি আসতে পারছেন না?'

কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? মনে মনে ভাবলেন লাহিড়ি। তার পরেই জবাব দিলেন, 'না না, তা কেন? আচ্ছা চলুন।'

বলতেই ছেলেটা হাঁটতে শুরু করল। পিছু পিছু চলতে শুরু করলেন লাহিড়ি।

ফুটপাত থেকে নেমে রাস্তা পার হতে যাবেন, হঠাৎ কোথা থেকে একটা মোটরবাইক ধাঁ করে এসে প্রায় গায়ের ওপর ব্রেক কষল লাহিড়ির। লাফিয়ে উঠে সরে যেতে গিয়েই, চোখ পড়ল আরোহীর ওপর। হেলমেটের গার্ডের ভেতর থেকে একটা ধমক শুনতে পেলেন, 'বি এলার্ট স্যার। এমন বিশ্রীভাবে কেউ রাস্তা ক্রশ করে!'

একটা কড়া জবাব ঠোঁটের ডগায় এসে আটকে গেল লাহিড়ির। চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল হাসিতে। গম্ভীরভাবে বললেন, 'আ অ্যাম সরি।'

সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট নিল বাইকটা।

রাস্তা পার হয়ে গেলেন দুজনে। পর পর সিঁড়ি ডিঙিয়ে গিয়ে পৌঁছলেন দোতলার ফ্ল্যাটটায়।

'আসুন আসুন।' বলতে বলতে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন।

লাহিড়ি তাকালেন। আগাগোড়া মেরুন রঙের পাজামা-পাঞ্জাবি পরনে এক মাঝবয়েসী ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। ফর্সা গোলগাল চিকন চেহারা। যাত্রাদলের কেষ্টঠাকুরের মতো। এক মাথা ঘন কালো কোঁকড়া চুল। পানের রসে লাল টুকটুকে ঠোঁট। একটা চেয়ার দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'বসুন। আজ ক'দিন ধরে দেখছি, ওই ফুটপাতে আপনি দাঁড়িয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে পায়চারি করেন, আর আমার গানের সুরে সুরে তাল ঠোকেন। দেখে মনে হয়েছে, আপনি একজন ভাল সঙ্গীতরসিক। তাই ডেকে আনলাম। কিছু কি ভুল হলো?'

'ভুল!' চেয়ারে বসতে বসতে লাহিড়ি রিপিট করলেন কথাটা, 'হ্যাঁ, ভুল হলো বৈকি! আনাড়িকে কেউ যদি রসিক বলে মনে করে, তাহলে সেটা ভুল ছাড়া আর কি?'

'ভুল!' স্বগতোক্তি করলেন ভদ্রলোক। তারপর বেশ জোর গলায় বললেন, 'দেখুন, ভুল আমার হয়নি। আপনার মাথা নাড়া আর তাল ঠোকা, মোটেই অরসিকের মতো নয়। এখন আপনি যদি অস্বীকার করেন আমি নাচার।'

ঘরের সব কিছুর ওপর তখন লাহিড়ির চোখ ঘুরছে। দেশী-বিদেশী নানা সঙ্গীতজ্ঞদের ছবি চারটে দেয়ালে টাঙানো। নানা বয়সের ছেলে-মেয়ে ঘরের এদিক-সেদিক বসে। কেউ তবলায় হাতুড়ি ঠুকছে, কেউ বা যন্ত্রের তার বাঁধছে। একভাবে সব কিছুর ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে লাহিড়ি বললেন, 'আপনি জানেন, কোনো কোনো মানুষ জেনে পণ্ডিত। আবার কেউ কেউ শুনে পণ্ডিত।

আমি হলাম শুনে পণ্ডিত। শুনে শুনে আমার একটা কান তৈরি হয়ে গেছে। এছাড়া আর কিছু নয়।'

'তাই!' ভদ্রলোক অবাক।

'আপনিই কি এদের শিক্ষক?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার নাম?'

'আমার নাম ভীম চন্দ্র সেন। সবাই আমায় গুরুজি বলে ডাকে।'

'বাঃ! বেশ তো!' বলে হো হো করে হেসে উঠলেন লাহিড়ি, 'সত্যি, এমন ব্যাপার বড় একটা দেখা যায় না। আমি কে জানেন?'

মাথা নাড়লেন ভীমচন্দ্র।

'আমি হলাম জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। অর্থাৎ কিনা যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির পুরকায়স্থ। একর্ডিং বেদব্যাস, আমি আপনার মাননীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।' বলে মুখের এমন এক ভঙ্গি করলেন লাহিড়ি, যা দেখে ঘরের অনেকেই হো হো করে হেসে উঠল। আর সে হাসি মিলিয়ে যাবার আগেই পাল্টা প্রশ্ন করলেন লাহিড়ি, 'ডোভার লেন সঙ্গীত সম্মেলনে গেছেন কোনোদিন?'

'কি লেন বললেন?'

'ডোভার লেন। মনে হচ্ছে নামটাই শোনেননি?'

'না,—ঠিক তেমন মনে পড়ছে না।'

'নামই শোনেননি যখন, তখন যাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।' বলে লাহিড়ি একবার চোখ মটকালেন, 'তা মশায়, আমিও যাইনি কোনোদিন। অত পয়সা কোথা, যে একশো-দুশো টাকার টিকিট কেটে ওস্তাদের গান শুনব? আমি তাই রাস্তার ফুটপাতে লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে সারারাত গান শুনতাম। আর তাল ঠুকতাম। আমি হলাম চিরকালের স্ট্রিট লিসনার। আর সে অভ্যাস যে এই বুড়ো বয়েসেও রয়ে গেছে, তা তো আপনি নিজেই দেখেছেন।'

'হ্যাঁ। তা দেখেছি। কি-ন-তু—'

ভীম সেনের কথা শেষ হবার আগেই লাহিড়ি প্রশ্ন করলেন, 'আসলে আপনি কোথাকার মানুষ? আই মীন, আপনার দেশঘর কোথায়?'

চমকে উঠলেন যেন ভীম সেন। সাপের লেজে পা পড়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠলেন তিনি, 'তার মানে! কি বলতে চান আপনি?'

লাহিড়ি আগের থেকেও নরম গলায় বললেন, 'নিশ্চয় কলকাতার মানুষ নন।'

'কি করে বুঝলেন?'

'শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা করেন, অথচ ডোভার লেন সঙ্গীত সম্মেলনের নাম শোনেননি, এমন মানুষ কখনো কলকাতার হতে পারে না। ভারতবর্ষে এমন সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ প্রায় নেই বললেই হয়।'

'ও!' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেজাজ নরম হয়ে এলো ভীম সেনের। বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি দেশের বাইরে এমনি এক ঘেরাটোপের মধ্যে বড় হয়েছি, যেখানে বাইরের কোনো খবরই তেমন পৌঁছত না।'

উৎসুক মুখে লাহিড়ি তাকিয়েছিলেন ভদ্রলোকের মুখের দিকে। আশা, ভদ্রলোক যদি কোনো জায়গার নাম করেন। কিন্তু ভীম সেন আর মুখ খুললেন না।

প্রায় তখনি আর এক মানুষ এসে ঘরে ঢুকলেন। নিশ্চয়ই মোটরবাইকেই এসেছেন। কেননা, তখনো পর্যন্ত মাথার ওপর হেলমেট। গায়ে খয়েরি রঙের সাফারি। পায়ে ব্রাউন রঙের অ্যামবাসাডার শ্যু। মুখের ওপর যেমন জুলপি, তেমনি একজোড়া গোঁফ। ঘরে ঢুকে সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন ভীম সেনের সামনে। হাবভাবে মনে হলো, মহাশয় যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছেন। বললেন, 'কি ব্যাপার, মাল তৈরি তো?'

ভীম সেন মাথা নাড়তেই বললেন, 'দিয়ে দিন। আমায় এখুনি আর এক জায়গায় ছুটতে হবে।' বলে মুখ ঘোরাতেই লাহিড়ির চোখে চোখ পড়ল। যেন চমকে উঠলেন মানুষটি। একভাবে তাকিয়ে রইলেন।

লাহিড়িও কম চমকাননি। মহাজন যেদিন প্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, সেদিন এই মানুষটিই তাঁদের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে একটানা নজর রেখেছিলেন বাড়ির ওপরে। আড়াল থেকে মহাজন দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ওদেরই কোনো এক স্পাই। বেশ কয়েকদিন হলো আমার পিছু পিছু ঘুরছে। চিনে রাখুন। খুব প্রয়োজন না হলে ঘাঁটাবেন না।'

দ্রুত পরিস্থিতিটা সামলে নেবার জন্যে একটু দেঁতো হাসি হাসলেন লাহিড়ি। কিন্তু সে মানুষ সেটা গ্রাহ্য না করে সোজা ঘুরে দাঁড়ালেন ভীম সেনের দিকে। ঈষৎ চাপা গলায় অভব্যের মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'হু ইজ দিস চ্যাপ? আই ডোন্ট থিঙ্ক, হি ইজ ইয়োর স্টুডেন্ট?'

'নো। এ সিনিয়র সিটিজেন। নেম, যুধিষ্ঠির পুরকায়স্থ।'

শুনেই চিৎকার করে উঠলেন মানুষটি, 'হোয়াট? যুধিষ্ঠির! বাঃ বহোত আচ্ছা! কেউ ভীম সেন, কেউ বা আবার যুধিষ্ঠির! গোটা মহাভারতটাই দেখছি এখানে! সো, হোয়্যার আর দি আদার্স, অর্জুন নকুল সহদেব?'

'মাইট বি সামহোয়্যার ইন ইন্ডিয়া।' মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল লাহিড়ির।

'কি বললেন?' রুখে দাঁড়ালেন মানুষটি।

'না। কিছু না।'

'হ্যাঁ, কিছু বলবেন না। কেননা কোনো বলাবলি আমরা পছন্দ করি না। কই হে ওটা দিলে?'

'হ্যাঁ। এই যে—' বলে তটস্থ ভীম সেন কয়েক পা গিয়ে আলমারি খুললেন। সেখান থেকে ব্রাউন পেপারে প্যাক করা একটা পার্শেল নিয়ে এসে ধরিয়ে দিলেন মানুষটির হাতে।

বস্তুটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন মানুষটি। তারপর চলে যেতে গিয়েই আবার ফিরে দাঁড়ালেন। ভীম সেনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সব ঠিক আছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আচ্ছা চলি।' বলেই দু' পা হেঁটে একেবারে মুখোমুখি হলেন লাহিড়ির। চাপা গলায় ফিসফিস করে বললেন, 'এই বয়েসে এতবড় ভুল করে বসলেন! আমি চাই না এই সব টিনেজার্সদের সামনে কোনো আনপ্লেজেন্ট সিন ক্রিয়েট করতে। দয়া করে আপনি কি আমার সঙ্গে গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাবেন?'

এক মুহূর্তে নিজের অসহায় অবস্থাটা বুঝতে পারলেন লাহিড়ি। ঝটিতি পকেটে হাতটা ঢুকিয়ে বললেন, 'অগত্যা! এছাড়া উপায় কি?'

'উঁহুহু! হাতটা পকেটের বাইরে আনুন। নইলে এখুনি এখানে একটা বাজে ঘটনা ঘটে যেতে পারে। লুক অ্যাট দ্য ডোর।'

দরজার দিকে তাকাতেই লাহিড়ি দেখলেন, সেখানে আর এক মানুষ। শক্ত হাতে পকেটে কিছু একটা ধরে অপলকে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

'কি হলো? অমন ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন? হারি আপ!' ধমকে উঠলেন এবার সে লোক।

বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল লাহিড়ির। প্রথমে ভীম সেন, পরে উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি যদি না যাই, আপনি কি আমায় বাধ্য করবেন যেতে?'

'রাইট! ঠিক তাই করব।'

'এখানে মিঃ সেন আছেন। এতগুলি স্টুডেন্ট আছেন। এনারা নিশ্চয়ই চান না, আমি এখান থেকে এভাবে চলে যাই। কি, আপনারা কি বলেন?'

'ওনারা আবার কি বলবেন?'

'কি মিঃ সেন, আপনি কি বলেন?'

'উনি আবার কি বলবেন?'

মুখের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা সজোরে এসে মুখ থুবড়ে পড়ল ঘরের মেঝেয়! তারপরই ধড়মড়িয়ে উঠে বসবার উপক্রম করছে, ঘরের সকলে দেখলেন, বেশ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মহাজন দ্রুত এসে দাঁড়ালেন সবার সামনে। হাতে রিভলবার।

'খবরদার!' রিভলবারের বদলে গর্জে উঠল মহাজনের কণ্ঠস্বর, 'কেউ এক পা এদিক-ওদিক যাবার চেষ্টা করবেন না।' বলেই সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন, 'স্টুডেন্টদের বাদ দিয়ে, তিনজনকেই অ্যারেস্ট করুন। আমার মনে হচ্ছে প্রত্যেকের পকেটেই বে-আইনি আর্মস আছে। সেগুলো বার করে নিন।'

এমন অভাবিত ঘটনায় সবারই মুখ আমসি। স্টুডেন্টদের ভেতর চাঞ্চল্য দেখা দিল। কেউ কেউ বা ঘর থেকে চলে যাবার উপক্রম করতেই মহাজন বললেন, 'উঁহু, কেউ এখান থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। ঘরের ওই কোণটায় সবাই গিয়ে দাঁড়ান।'

ইতিমধ্যে মহাজনের আরো কয়েকজন শাগরেদ ঢুকে পড়েছেন ঘরের ভেতর। দরজায় যে মানুষটি মুখ থুবড়ে পড়েছিল, সে উঠে বসতেই তার হাতে হ্যান্ড-কাফ পরিয়ে দেওয়া হলো। মহাজনের ইশারায় আর একজন এগিয়ে গেল প্রথম আগন্তুকের দিকে। হিংস্র শ্বাপদের মতো চোখ দুটো তাঁর জ্বলে উঠল। চিবিয়ে চিবিয়ে মহাজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেথডিক্যালি সব কিছুই তো হচ্ছে দেখছি। কিন্তু কোন অপরাধে সেটা জানতে পারি?'

'নিশ্চয় পারেন। তবে আপাতত বে-আইনি অস্ত্র সঙ্গে রাখা, আর এই বৃদ্ধকে ফর নাথিং হ্যারেস করার অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।'

বলেই তাঁর হাতের প্যাকেটটা একরকম ছিনিয়ে নিলেন মহাজন। তারপর কি ভাবে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। বললেন, 'আপনি আমার অচেনা নন মিঃ নলিনাক্ষ দিকপতি। অনেক দিন থেকেই ইউ আর ওয়ান্টেড। আজ হাতে পেলাম।'

থানাঘরে বসেছিলেন লাহিড়ি। বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনজনকে লক আপে রেখে ফিরে এলেন মহাজন। বসলেন সামনের চেয়ারে। বললেন, 'আমায় অমন হঠাৎ উপস্থিত দেখে নিশ্চয় তখন খুব অবাক হয়েছিলেন। তাই না?'

মাথা নাড়লেন লাহিড়ি, 'মোটেই নয়। রাস্তা পার হবার সময় যে ভাবে আমায় দেখা দিলেন, তখনি বুঝেছি আমি একা নই, পেছনে আপনি আছেন। নাহলে দিকপতির মুখের ওপর অত চোটপাট করতে পারতাম না। কিন্তু এটা কি হলো?' ভীম সেনের কাছ থেকে পাওয়া ব্রাউন পেপারের প্যাকেটটা মহাজনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'যেটাকে আপনি মাফিয়া চক্রের গোপন কিছু বলে মনে করেছিলেন সেটা কিন্তু তা নয়। দেখুন, শুধুমাত্র একটা গানের বই। সিম্পলি এ নোটেশন বুক অব মডার্ন ওয়েস্টার্ন সঙস!'

'বলেন কি!' বলে মহাজন প্যাকেটটা তুলে নিলেন। দেখলেন, সত্যিই মোটা একটা ইংরিজি গানের স্বরলিপির বই। অবাক মহাজন। ফরফরিয়ে পাতাগুলো উড়িয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'কোনো লুজ কাগজপত্তর ছিল না?'

'না।'

'হুঁ!'

দুজনেই চুপ। দুজনেরই চোখ টেবিলের ওপর পড়ে থাকা বইটার ওপর। মাথার ওপর সিলিং পাখাটা ঘুরছে বনবন করে। ওয়াল ক্লকটার টকটক আওয়াজ। বেয়ারা এল, নামিয়ে দিয়ে গেল দুটো চায়ের কাপ।

এ. এস. আই মানববাবু এলেন। দুজনের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, অমন চুপচাপ যে?'

লাহিড়ি চুপ করেই রইলেন। মহাজন বললেন, 'এত হুজ্জোতি একেবারে মাঠে মাটি হলো।'

'মানে!'

'এই দেখুন না, আমাদের এনকাউন্টারের ফসল! নাথিং বাট এ নোটেশন বুক অব সঙস! স্বরলিপির কেতাব।'

'তাই!' হাত বাড়িয়ে বইটা তুলে নিলেন মানববাবু। উলটেপালটে দেখতে দেখতে বললেন, 'তাহলে?'

তিনজনেরই বাকরহিত অবস্থা।

এক সময় মানববাবু বললেন, 'কিন্তু আপনারা যাই ভাবুন, আমার ধারণা আমাদের হাত কিন্তু ঠিক জায়গাতেই পড়েছে। "বজ্রবাহিনী"র কলকাতা সেন্টার যে ওটাই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তা যদি না হতো, অত অত খেয়াল-টপ্‌পার মধ্যে রবি ঠাকুরের ওই বিশেষ গানটি জায়গা পেত না।'

যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। মহাজন তাকালেন লাহিড়ির দিকে। দেখলেন, লাহিড়িও তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। মহাজন বললেন, 'বেশ, মানলাম। কিন্তু পার্টিকুলার গানটা গাওয়ার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পার?'

'সঠিক না হলেও, মনগড়া একটা ব্যাখ্যা খাড়া করতে আপত্তি কি?'

'যেমন?'

'ধরুন, বজ্রবাহিনীর তেমন কোনো মানুষ আসছেন বাইরে থেকে। সময়টা আগে থেকেই নির্ধারিত। বাইরের পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করে সঠিক ঠিকানা বার করার একটা ঝুঁকি থাকেই। তাই গান গেয়ে "বজ্রবাহিনীর" অস্তিত্ব জাহির করাটাই নিরাপদ নয়?'

'তার মানে,' মহাজন বললেন, 'গানের কথার মধ্যে ওই "বজ্রবাহিনী" শব্দটা আছে বলেই তুমি এই ব্যাখ্যা করতে চাইছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হয়তো আপনার ব্যাখ্যাই ঠিক।' লাহিড়ি বললেন, 'যাই হোক, রাত অনেক হলো। এবার আর না উঠলেই নয়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' চমক ভাঙল যেন মহাজনের। মানববাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এনার জন্যে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন মানববাবু। প্লিজ!'

মানববাবু বেরিয়ে যাবার পর লাহিড়ি বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, আমি একটা কথা বলব?'

মুখ তুললেন মহাজন।

লাহিড়ি বললেন, 'আমার মনে হয়, আমাদের সকলেরই কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। বইটাকে যত ফালতু মনে হচ্ছে, হয়তো তা নয়। হয়তো এরই মধ্যে কিছু একটা আছে যেটা আপাত চক্ষে আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। যদি কোনো আপত্তি না থাকে, বইটা কি আজ রাত্তিরের জন্যে নিয়ে যেতে পারি? একটু নেড়েচেড়ে দেখতে চাই।'

'আপত্তির কি আছে? কাল সকাল দশটার আগে ফেরত পেলেই হবে।'

'আশা করি তার মধ্যে আমার দেখা হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে।'

চিন্তান্বিত লাহিড়ি শ্লথ গতিতে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

পরদিন ভোরে টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মহাজনের। বিছানার পাশে সেন্টার টেবিলটার ওপর থেকে রিসিভারটা কানে তুলে ঘুমজড়ানো গলায় উত্তর করলেন, 'হ্যাল্‌লো?'

ওপাশ থেকে প্রশ্ন এল, 'কে কথা বলছেন? মিঃ মহাজন?'

'হ্যাঁ বলুন, মিঃ লাহিড়ি। কি ব্যাপার, এমন সাত সক্কালে?'

'পেয়েছি। বিরাট ব্যাপার। কাল সন্ধের অভিযানটা মোটেই ফ্রুটলেস এফর্ট নয়। আপনি বেশ জোরাল চার্জশীট কোর্টে ওদের এগেনস্ট-এ প্রডিউস করতে পারেন।'

'তাই!' ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলেন মহাজন, 'কোথায় ছিল, কি ভাবে পেলেন?'

'ফোনেই বলতে হবে? আপনি থানায় আসবেন না? দেখবেন না?'

'সে তো দেখবই। তবু একটু আন্দাজ দেবেন না?'

'আরে মশায়, সব ধড়িবাজ ধুরন্ধর! এমনি কায়দার ব্যাপার যে, ধরে ওঠা মুশকিল। ভাগ্যি আমার মেয়েটা গান-বাজনা নিয়েই থাকে, সে-ই সব কথা শুনে বইটা ওল্টাতে ওল্টাতে, চালাকিটা ধরে দিল। চিৎকার করে বলে, এ কি! দেখ তো বাবা, বইয়ের এই গানটার নোটেশন যেন কেমন কেমন!'

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাস মহাজন।

'তারপর আর কি! পড়ে দেখি, ঠিক তাই। নোটেশনের নিচে গানের কথাগুলো ছাপা থাকে জানেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে নোটেশনের নিচের কথাগুলো ভিন্ন। একটার পর একটা অক্ষর সাজিয়ে লেখা হয়েছে একটা কমপ্লিট কনসপিরেসির খসড়া। আর এমনিভাবে যে টের পায় কার সাধ্য!'

'তা তো হবেই। তাহলেই বুঝে দেখুন, ক্রাইম আজকের দিনে কেমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে! যাই হোক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি বাড়িতেই থাকুন। থানায় আসতে হবে না। আমিই আপনার বাড়ি যাচ্ছি এখুনি।'

[ভাদ্র ১৪০৮]

আমার প্রথম মক্কেল

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

আমার নাম উদ্দালক প্রধান। পরিচিত মহলে সবাই আমাকে ইউ পি বলে ডাকে। আমার বয়স এখন ত্রিশ। গত পাঁচ বছর ধরে বহু চেষ্টা করেও যখন মনের মতো চাকরি যোগাড় করতে পারলাম না, তখন আমি 'ইনভেস্টিগেশন গ্রুপ' নামে এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিটি খুলে বসলাম।

প্রশ্ন করতে পারেন এত কাজ থাকতে ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলতে গেলাম কেন? আমি ছোটবেলা থেকে একটু ডাকাবুকো প্রকৃতির। নিয়মিত ব্যায়াম করি। ক্যারাটে জানি। ভালো ফুটবল খেলি। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় স্পোর্টসে অনেক প্রাইজ পেয়েছি। সরকারি চাকরি করবো না ঠিক করেছিলাম। কিন্তু বেসরকারি চাকরি পেলাম না। শেষে ঠিক করলাম স্বাধীনভাবে কিছু করবো। যাতে যথেষ্ট বুদ্ধি লাগে। অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দিল। শেষে আমার বোন ঋতু বলল, দাদা, একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলবি?

আমার তখনও পর্যন্ত খুব একটা আত্মবিশ্বাস ছিল না। গোয়েন্দা উপন্যাসে পড়ি শখের গোয়েন্দাদের নানা কথা। তারা কত সহজে স্রেফ বুদ্ধি খাটিয়ে কত রহস্যের জট ছাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বাস্তব জগতে কি সত্যি এমন ঘটে! আমি শুনেছি প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি যারা চালায় তারা সবাই পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। আমার তো কোনো ট্রেনিংই নেই। কে আমায় কাজ দেবে?

কিন্তু ঋতু বলল, একবার লাক ট্রাই কর না দাদা। কাজ করতে করতেই অভিজ্ঞতা হবে। বাবাকে বলে বাইরের ঘরটা সাজিয়ে নে। ফোন তো রয়েছেই।

কিন্তু গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে পিস্তলের লাইসেন্স নিতে হবে। একটা পিস্তলের দাম কত জানিস? পনের-বিশ হাজার টাকা—

ঋতু ছাড়ার পাত্রী নয়। সে বলল, পিস্তল ছাড়াও গোয়েন্দাগিরি হয় দাদা। পিস্তলের চেয়ে যেটি আরও দরকারী সেটি সাহস ও বুদ্ধি; সেটা তোর কাছে। তুই দুর্গা বলে নেমে পড় তো।

আমি বললাম, তোকে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে হবে কিন্তু।

ঋতু বলল, ওরে বাবা, ওসব আমি পারব না। আমি বাড়ি বসে তোকে বড়জোর বুদ্ধি দিতে পারি।

এর দিন কয়েক পরেই আমি আনন্দবাজার ও স্টেটসম্যানে একটি বিজ্ঞাপন দিলাম। আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপনটি এই :

আপনার যে কোনো সঙ্কটে সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

দ্য ইনভেস্টিগেশন গ্রুপ
উদ্দালক প্রধান (ইউ. পি.)
প্রাইভেট ডিটেকটিভ।
১৯, বালিগঞ্জ টেরাস
কলকাতা-৭০০ ০১৯।
নিচে টেলিফোন নম্বর।

বিজ্ঞাপনটি বেরুল এক রবিবার। তারপর থেকে আমি ও ঋতু উত্তেজনায় টান টান হয়ে

টেলিফোনের সামনে বসে আছি। রবিবার সারাদিন গেল, সোমবার গেল, মঙ্গলবার গেল, একটা ফোনও এল না।

বাবা ঠাট্টা করে বললেন, ঘাবড়াস না, যখন কলকাতা পুলিশ হাল ছেড়ে দেবে তখন মক্কেলরা তোর কাছে আসবে।

সত্যি সত্যি বোধহয় তাই হলো। বুধবার সকাল আটটা নাগাদ বিছানায় শুয়ে শুয়ে যোগব্যায়াম করছি, ঋতু কর্ডলেস ফোনটা আমার কাছে নিয়ে এসে বলল, দাদা ফোন—

কে? কে ফোন করেছে? আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

ঋতু ফোনের স্পিকারটা এক হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, বোধ হয় তোর প্রথম মক্কেল।

।। দুই।।

আমি হ্যালো বলতেই ওপার থেকে আওয়াজ ভেসে এল, আমি কি মিঃ ইউ পি্-র সঙ্গে কথা বলতে পারি?

আমি ইউ পি বলছি।

সুপ্রভাত। আমার নাম হোসেনুর রহমান।

আমি বেশ অবাক হয়ে বললাম, আপনি কি গোয়েন্দা প্রধান মিঃ হোসেনুর রহমান?

উত্তর হলো, ঠিক ধরেছেন, আমিই সেই—

আমি একটু থতোমতো খেয়ে বললাম, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি স্যার—আমার নির্ঘাৎ ধারণা হলো পুলিশের অনুমতি না নিয়ে দুম করে একটা গোয়েন্দা এজেন্সি খুলে বসে আমি একটা বেআইনি কাজ করে বসেছি। হয়তো সেই অপরাধেই—

হোসেনুর রহমান বললেন, আপনি কি এখন বাড়িতে আছেন? আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আমার মুখ দিয়ে ভাল করে কথা সরল না। বললাম, আসুন।

টেলিফোনের সুইচ বন্ধ করে ঋতুকে বললাম, আমার প্রথম মক্কেল গোয়েন্দা প্রধান হোসেনুর রহমান স্বয়ং। আর তিনি আসছেন আমায় গ্রেফতার করতে।

ঋতু বলল, ধেৎ, হতেই পারে না। ইচ্ছে মতো পেশা বেছে নেবার অধিকার সবারই আছে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার ঋতু পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে পড়ে। সুতরাং এসব ব্যাপার সে ভালো বোঝে।

আমি মনে মনে ভাবলাম, হোসেনুর সাহেব এলে ঋতুকেই সামনে এগিয়ে দেব।

হোসেনুর সাহেবের জিপ কিছুক্ষণ পরে আমাদের বাড়ির সামনে এসে থামল। আমি দরজা খুলে তাঁকে স্বাগত জানালাম। তাঁকে আমি সামনাসামনি কখনও দেখিনি। তবে টিভিতে প্রায়ই তাঁকে দেখি। সুতরাং তাঁর চেহারা, গলার স্বর আমার মুখস্থ।

আমার অপিস ঘরে সোফায় তাঁকে বসালাম। ঋতুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, আমার বোন ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ঋতু প্রধান।

হোসেনুর করমর্দন করে বললেন, তরুণ গোয়েন্দা ও তাঁর তরুণী অ্যাসিস্ট্যান্টকে দেখে আমি খুব প্রীত হলাম মিঃ ইউ পি। গোয়েন্দাগিরি শুধু আমাদের মতো উর্দিধারী পুলিশ অফিসারদের জন্যই নয়। প্রতিদিন কত ঘটনা ঘটছে, পুলিশ সব তদন্ত করতে পারে না। অনেক কেস আইনত পুলিশের এক্তিয়ারে আসে না। আমরা চাই, আপনাদের মতো আরও তরুণ ইনভেস্টিগেশনের কাজে এগিয়ে আসুন।

আমি একটু হাল্কা বোধ করতে লাগলাম। না, হোসেনুর আমায় গ্রেফতার করতে আসেননি। বরং আমার মক্কেল হতেই এসেছেন।

তিনি একটি বিচিত্র মামলা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন।

মামলাটি হলো খুনের। খুনের ওই কেসটি আমার ভাল করে জানা আছে। আজ থেকে মাস ছয়েক আগে খবরটি খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। হোসেনুর আমাকে পেপার ক্লিপিং দেওয়ায় আমার মনে করতে সুবিধে হলো।

চামেলী হত্যাকাণ্ডের নায়ক গ্রেফতার

১/১ রমেশ মিত্র রোডে গঙ্গা-যমুনা অ্যাপার্টমেন্টের আবাসিক মিঃ আয়েঙ্গারের পত্নী চামেলী দেবীকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ ওই পরিবারের প্রাক্তন গৃহভৃত্য হীরুকে রবিবার ভোরে বাগুইহাটির একটি বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের কাছে হীরু স্বীকার করেছে সে চামেলী দেবীর গহনা চুরি করার উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল। সে ভেবেছিল ঘুমন্ত অবস্থায় চামেলী দেবীর গলা থেকে সে পাঁচভরির হারটি খুলে নিয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু চামেলী দেবীর ঘুম ভেঙে যায়। সে সময় দুজনে ধস্তাধস্তি হয়। ওই সময় হীরুর পিস্তল থেকে একটি গুলি ছিটকে চামেলী দেবীর বুকে লাগে। তিনি ঘটনাস্থলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যান।

আমি ক্লিপিংটি পড়ে বললাম, এই খবরটি আমি সেসময়ই পড়েছিলাম। পুলিশ তো অপরাধীকে গ্রেফতারই করে ফেলেছে। অপরাধীও স্বীকার করেছে। ব্যস, এরপর তো চার্জশিট দেয়া শুধু বাকি থাকে। সেটাও পুলিশের কাজ।

হোসেনুর বললেন, ভবানীপুর থানা কেসটি করছে। আপনারা জানেন, থানা যদি কোনো কেস তদন্ত করার দায়িত্ব নেয়, আমরা আর তখন তাতে ইন্টারফেয়ার করি না। আমাদের ডিডির হাতে এমনিতেই প্রচুর কেস। কলকাতায় এখন মার্ডার তো লেগেই আছে। তাই থানার হাত থেকে স্বেচ্ছায় আমরা কোনো কেস নিই না। কিন্তু আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বলছে, মামলাটি অত সহজ নয়। হীরু যা বলছে তা সত্যি নাও হতে পারে।

তার মানে আপনি সন্দেহ করছেন হীরু আসল খুনী নয়? আমি বললাম।

খুনী হতে পারে। কিন্তু হীরু অনেক সত্য গোপন করছে।

কি করে আপনার মনে হলো?

মিঃ ইউ পি, আপনি একজন ঝকঝকে বুদ্ধিমান গোয়েন্দা। বলুন তো একজন খুনী কনফেস করে কেন?

অনেক কারণে। এক নম্বর—পুলিশি অত্যাচারের শিকার হয়ে, দুই—বিবেকের তাড়নায়, তিন—আরও বড় কোনো সত্য গোপন করার জন্য।

কারেক্ট। হোসেনুর টিভি ক্যুইজ-মাস্টারের ঢঙে বলে উঠলেন। এক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে আপনার শেষের অনুমানটাই সত্যি। খুনটা কীভাবে হয়েছিল আপনার মনে আছে তো? চামেলী দেবীর বয়স পঞ্চাশ। তাঁর স্বামী মিঃ আয়েঙ্গারের বয়স পঞ্চান্ন। তিনি রবার্টসন ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন পদস্থ অফিসার। দুজনে ওই ফ্ল্যাটে থাকতেন। ওঁদের একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে রৌরকেল্লায়।

হীরু ছিল ওঁদের বিশ্বস্ত পুরনো চাকর। দশ বছর ওঁদের পরিবারে কাজ করার পর একদিন স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দেয়। বলে সে এখন ব্যবসা করতে চায়। আর কারও বাড়ি কাজ করবে না।

কতদিন আগে সে চাকরি ছাড়ে?

তিন বছর আগে। এই তিন বছরের মধ্যে আয়েঙ্গার পরিবার হীরুর খবর পায়নি। তিন বছর পরে এক দুপুরে চামেলী দেবী যখন তাঁর ফ্ল্যাটে একা ছিলেন তখন তিনি খুন হন। হত্যাকারী তাঁকে রিভলবার দিয়ে গুলি করে।

রিভলবার হীরু কোথা থেকে পেল?

ওটি মিঃ আয়েঙ্গারের রিভলবার। অফকোর্স তাঁর লাইসেন্স ছিল। রিভলবারটি কোথায় থাকত তা হীরু জানত।

কিন্তু হীরু তো রিভলবার চালাতে জানত না।

অনুমান করা যায় সে তিন বছর বন্দুকবাজিতে দড় হয়েছে। এটি কি করে হলো? সে ব্যবসা করত, কিসের ব্যবসা? ভবানীপুর থানার আই. ও-র খবর জমি কেনাবেচার দালালি করত হীরু। তাতে রিভলবার লাগে না। তাছাড়া হীরু তার স্বীকারোক্তিতে বলেছে, সে নাকি চামেলী দেবীর কাছে চাবি ফেরত দিতে গিয়েছিল। প্রথমে সে বেল বাজায়। লোডশেডিং ছিল বলে বেল কাজ করছিল না। তাই সে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ঘরে ঢোকে। দেখে চামেলী দেবী ঘুমোচ্ছেন। তাঁর গলায় পাঁচ-ছ' ভরি একটা হার। হারটা দেখে সে লোভ সামলাতে পারে না। তাই আলতো করে খুলে নিতে যায়। এমন সময় চামেলী দেবী ঘুম থেকে উঠে হীরুকে দেখে চেঁচাতে যান। হীরু তাঁর মুখ চেপে ধরতে গেলে চামেলী দেবী দেওয়ালে দেরাজের মধ্য থেকে রিভলবার বার করেন। হীরু সেটি কেড়ে নিতে যায়। তখনই গুলি ছটকে বেরিয়ে যায়। হীরু তখন ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

যাবার সময় হারটা কি নিয়ে গিয়েছিল?

থ্যাঙ্ক ইয়ু ইউ পি। এই প্রশ্নটি করে আপনি প্রমাণ করে দিলেন আপনার ইনার আই অর্থাৎ রহস্যভেদী দৃষ্টি আছে। হ্যাঁ, আমার খটকা এখানেই। হীরু হারটা নিয়ে যায়নি।

হারটা চুরি করার উদ্দেশ্যেই যদি সে এসে থাকে তাহলে হারটা না নিয়ে সে চলে গেল কেন?

হোসেনুর বলে চললেন, এখানেই আমার মনে হচ্ছে হীরু আরও কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। এই মার্ডার সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত। তিন বছর পরে হঠাৎ হীরুর চাবি ফেরত দেবার ইচ্ছে জাগল কেন? সৎ উদ্দেশ্য থাকলে সে সন্ধ্যার পর মিঃ আয়েঙ্গার অফিস থেকে আসার পর আসতে পারত।

ভবানীপুর থানা কিন্তু এত সব প্রশ্নের মধ্যে যায়নি। তারা এটাকে খুব সাধারণ ক্রাইম বলে মনে করছে, যা গৃহভৃত্যরা আকছার করে থাকে। কিন্তু সিপি চান না আমি ভবানীপুরের ওসিকে চটাই। তাই তিনি আমায় স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, তুমি চামেলী মার্ডার কেস নিয়ে মাথা গলিও না হোসেনুর। ওই কেস সলভ হয়েই গেছে। কিছুদিনের মধ্যেই আই. ও চার্জশিট দেবে। তাই কাগজে বিজ্ঞাপনটি দেখে আমি আপনার সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিলাম। দেখলাম আপনি জেনুইন প্রফেশনাল গোয়েন্দা এজেন্সি। আমার সবচেয়ে বড় সুবিধে আপনাকে কেউ চেনে না। আপনি গোপনে এই মামলার একটা সমান্তরাল তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবেন। আপনাকে তদন্ত করে দেখতে হবে এই মার্ডারের পিছনে কোনো গোপন রহস্য আছে কিনা। এর জন্য আপনার যোগ্য ফিজ আমি আপনাকে দেব। বাই দি বাই, আপনার ফিজ কত ইউ পি?

আপনি আমার প্রথম মক্কেল, আপনি যা ফিজ দেবেন তাই নেব।

তাহলে দু'হাজার টাকা ক্যাশ আপনি এখনই রাখুন। আর তিন হাজার ফাইন্যাল রিপোর্ট পেলে দেব। টাকাটা পরিশ্রমের তুলনায় খুব কম হয়ে গেল ইউ পি, আমাদের সোর্স মানি থেকে এর চেয়ে বেশি টাকা আমরা দিতে পারি না। ডোন্ট মাইন্ড। টেলিফোনে যোগাযোগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গোয়েন্দা প্রধান হোসেনুর রহমান চলে গেলেন।

।। তিন।।

আমি ও ঋতু মিলে মোটামুটি একটা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে নিলাম।

তদনুযায়ী ঠিক হলো, আমরা দুজন হীরুর ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নেব।

হীরু বাগুইহাটিতে একটি একতলা বাড়ি করেছে বলে হোসেনুরের কাছে শুনেছিলাম। তিনি আমায় ঠিকানাও দিয়েছিলেন। সেই ঠিকানা অনুযায়ী আমি ও ঋতু গিয়ে হাজির হলাম হীরুর বাড়ি।

হীরু তখনও জেল হাজতে এটা আমরা জানতাম। কিন্তু ভান করলাম যেন কিছুই জানি না।

বাড়িটি নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ার পর এক অল্পবয়সী বিবাহিতা মহিলা বেরিয়ে এল।

কাকে চাই?

এখানে হীরুবাবু থাকেন?

মহিলা আমাদের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, কোথা থেকে আসছেন?

আমার নাম উদ্দালক প্রধান। আমার বোন ঋতু। গত বছর হীরুবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। উনি আমাদের অফিসে এসেছিলেন একটা বাড়ি ভাড়ার ব্যাপারে। তা আমার নিজের এখন বাড়ির দরকার।

আপনি ওর সম্পর্কে কিছু শোনেননি?

না তো, কি হয়েছে ওঁর? আমি অবশ্য গত তিন মাস দিল্লি ছিলাম।

ওঁকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

কেন, কি করেছেন উনি?

কিছুই করেননি। শত্রুতা করে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে।

কারা?

ওসব কথা বলতে পারব না, আপনারা পরে আসবেন।

দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি ও ঋতু হীরুর বাড়ির সামনে একটি চায়ের দোকানে চা খেতে ঢুকলাম। দোকানে তিন-চারটি যুবক বসেছিল। আমরা ঢুকতেই তারা আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। প্রত্যেকের চোখে সন্দেহের দৃষ্টি। সামনের চেয়ারে ঝাঁকড়া চুল, মুখে একমুখ দাড়ি, পাজামা-পাঞ্জাবি পরা একটি তরুণ এসে বসল।

আমি বললাম, দাদা কি এখানেই থাকেন?

কেন বলুন তো?

আমরা এসেছিলাম হীরুবাবুর কাছে একটি ফ্ল্যাট ভাড়ার জন্য। তা ওঁর বাড়ি থেকে বলল উনি নাকি—

আপনি জানতেন না, কোথায় থাকেন আপনারা?

বালিগঞ্জ। আমি প্রায়ই বাইরে বাইরে কাটাই। শুনে তো একদম থ। হীরুবাবুর কি কোনো শত্রুটত্রু ছিল, যারা ওঁকে জড়িয়ে দিয়েছে?

তা বলতে পারব না দাদা।

আপনি তো চিনতেন ওঁকে?

এক পাড়ায় বাড়ি, সবাই যেমন চেনে আমিও তেমন চিনতাম।

এমন সময় হীরুদের বাড়ি থেকে একটি বাচ্চা ছেলে বেরিয়ে এসে তরুণটিকে বলল, ফ্যালা কাকা, বউদি তোমায় এখনই ডাকছে।

লোকটির নাম যে ফ্যালা তা তখনই বুঝতে পারলাম।

রাত্রিবেলা ফোন করলেন হোসেনুর রহমান।

হীরুর বাড়ি গিয়েছিলেন শুনলাম।

আপনি কি করে জানলেন?

আমার চর আছে ওদিকে। আপনি চায়ের দোকানে বসে খবরাখবর নিচ্ছিলেন তাও বলেছে। কিছু ক্লু পেলেন?

পেয়েছি। হীরু দু'বছরের মধ্যে হঠাৎ বড়লোক হয়েছিল কীভাবে? সেটা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে। এদিকে তার প্রচুর টাকার দরকার হয়ে পড়েছিল যার জন্য ওই বাড়িটা সে মর্টগেজ দেয় মানুভাই প্রপার্টিজের কাছে।

মানুভাই প্রপার্টিজ? আরে তারাই তো গঙ্গা-যমুনা ফ্ল্যাটের প্রমোটার।

হ্যাঁ, হীরুর নিয়মিত যাতায়াত ছিল মানুভাই-এর অপিসে।

কিন্তু চামেলী দেবী খুন হলেন কেন?

সেটা এখনও বুঝতে পারছি না। আমি মিঃ আয়েঙ্গারের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য দিলেন। খুন হবার আগে ক'দিন ধরেই মিসেস আয়েঙ্গার খুব উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। স্বামীকে কিছু একটা কথা বলি বলি করেও যেন বলতে পারছিলেন না। তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন তোমার রিভলবারটার কার্তিজ ঠিকঠাক আছে তো? চামেলী দেবী নিজেও রিভলবার ছোঁড়া শিখেছিলেন। কলকাতায় যখন নকশাল হাঙ্গামা হয় তখনই মিঃ আয়েঙ্গার আত্মরক্ষার জন্য রিভলবারটি কেনেন। সেই সঙ্গে স্ত্রীকেও চালানো শিখিয়ে দেন। কিন্তু এতদিন পরে স্ত্রী রিভলবারের কথা জিজ্ঞাসা করছে জেনে তিনি একটু ঘাবড়ে যান।

চামেলী দেবী বলেন, ভয় পেও না। একলা একলা থাকি। তাই রিভলবারটির হদিস জেনে নিচ্ছি।

হোসেনুর বললেন, গুড পয়েন্ট। এটা আমি জানতাম না।

আমি বললাম, ডুপ্লিকেট চাবির ব্যাপারটিও ভালো করে জেনে নিলাম। হীরুর কাছে ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি থাকত। চাকরি ছেড়ে দেবার সময় চাবিটা ফেরত নিতে আর মনে ছিল না কারো। তারপর থেকে হীরুর আর হদিসও তাঁরা পাননি। হীরু পুলিশের কাছে বলেছে দিচ্ছি দিচ্ছি করে চাবিটা সে ফেরত দিতে পারেনি। তারপর নেহাৎ বিবেকের তাড়নাতেই সে চাবিটা ফেরত দিতে গিয়েছিল।

হোসেনুর বললেন, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কি ইউ পি! আমি চাইছি খুনের আসল মোটিভটা কী? চামেলী দেবী ভয় পেয়েছিলেন কেন? কে তাঁকে ভয় দেখাচ্ছিল? কিসের ভয়?

আমি বললাম, আমি মিঃ আয়েঙ্গারের ফ্ল্যাটটি আগামীকাল দেখতে যাচ্ছি। আপনি একবার আসুন না। দুজনে মিলে তাহলে পরামর্শ করা যাবে।

হোসেনুর বললেন, বেশ, আমি যেতে পারি, তবে আপনার বন্ধু হিসাবে—ডিসি ডিডি বলে আমার পরিচয় দেবেন না।

কিন্তু আপনাকে কে না চেনে?

আমি এমনভাবে যাবো যাতে কেউ না চেনে।

।। চার।।

মিঃ আয়েঙ্গারের ফ্ল্যাট। তাঁর ড্রইংরুমে বসে আমি, ঋতু ও ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি আর শান্তিপুরী ধুতি পরে হোসেনুর রহমান।

চামেলী দেবীর মৃত্যুর পর থেকে তাঁর একমাত্র মেয়ে সুমিতা রৌরকেল্লা থেকে এসে আছে। সুমিতা রান্নাঘর থেকে আমাদের জন্য চা আর দক্ষিণ ভারতীয় চানাচুর নিয়ে এল।

আয়েঙ্গার বলছিলেন, আমার স্ত্রী মার্ডার হওয়ার পর আমার আর এই ফ্ল্যাটে থাকতে একদম ভালো লাগছে না। ভাবছি এই ফ্ল্যাট বেচে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে দেশে যাবো। আমার বাড়ি মাদুরাই জেলায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা আপনার কি মনে হয় মিঃ আয়েঙ্গার, আপনার স্ত্রী নিহত হওয়ার পিছনে নেহাৎ ছিনতাই-এর উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আততায়ী তো কিছুই নিয়ে যায়নি।

হ্যাঁ, হীরুকে পুলিশ এটি জিজ্ঞাসা করেছিল। সে বলল, খুন করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। রিভলবারের গুলি ছটকে চামেলী দেবীকে নিহত করলে সে এমন ঘাবড়ে যায় যে চুরি করার কথা তার আর মনেই থাকে না। সে প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আপনাদের ফ্ল্যাটে সিকিওরিটি নেই?

না, কো-অপারেটিভের কর্তাদের মধ্যে নানা গোলমাল চলছে। এখন একটি কোম্পানি সিকিওরিটির দায়িত্বে আছে। তারা রাত নটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত ডিউটি দেয়।

আমরা যখন কথা বলছি তখন ঋতু টয়লেটে যাবার জন্য পাশের বেডরুমে ঢুকেছে। সেখান থেকে দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এসে আমাকে বলল, দাদা, শীগ্গি দেখবি আয়। আপনারাও আসুন। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে আমরা গেলাম। ঘরটি অন্ধকার। দেওয়ালে টাঙানো একটি বড় লাইফ সাইজ আয়না। সেই আয়নায় গঙ্গা অ্যাপার্টমেন্টের সমান্তরাল একটি ফ্ল্যাটের প্রতিচ্ছবি আয়নায় ফুটে উঠেছে। ঘরের মধ্যে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক একটি প্যাকেট তুলে দিল আর একটি কমবয়সী ছেলের হাতে। ছেলেটি প্যাকেটটা নিয়ে তার অ্যাটাচি কেসে ভরে ফেলল।

ঋতু অস্ফুট স্বরে বলল, দাদা, ছেলেটিকে চিনতে পাচ্ছিস?

হ্যাঁ, ফ্যালা। বাগুইহাটিতে হীরুর বাড়ির সামনে চায়ের দোকানে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

হোসেনুর বললেন, ইউ পি, ওকে ধরো। যেন পালাতে না পারে।

হুড়মুড় করে আমরা নেমে পড়লাম।

ফ্যালা একটা ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছিল, আমি ও হোসেনুর দুজনেই ওকে জাপটে ধরলাম। ঋতু ওর হাত থেকে অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে এক দৌড় দিল।

গুড়ুম করে একটি শব্দ হলো।

কে যেন পিস্তল ছুঁড়ল ঋতুকে লক্ষ্য করে। ঋতুর গায়ে না লেগে গুলিটি একটি প্রাচীরের গায়ে লাগল। ঋতু ততক্ষণে আয়েঙ্গারের ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকে পড়েছে। পিস্তল থেকে আর একটি গুলি ছুঁড়বার আগেই কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশ এসে ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা লোকটিকে গ্রেফতার করল।

হোসেনুর রহমান বললেন, আমি তৈরি হয়েই এসেছিলাম। তবে জানতাম না, এমন ঘটনা ঘটবে।

ফ্যালার অ্যাটাচি কেস থেকে বেরিয়ে পড়ল, সোনার চেয়ে দামী হেরোইনের প্যাকেট।

।। পাঁচ।।

এই গল্পের শেষ দৃশ্য আমার বালিগঞ্জ টেরাসের বাড়ি। চামেলী হত্যারহস্য আমরা ভেদ করতে পেরেছি বলে আমার বাবা খুশি হয়ে আজ একটা ডিনার দিচ্ছেন। ডিনারে প্রধান অতিথি হোসেনুর রহমান, মিঃ আয়েঙ্গার ও তাঁর মেয়ে সুমিতা। এছাড়া আছেন সরকারপক্ষের কৌঁসুলি পাবলিক প্রসিকিউটার বিষ্ণু বাগচি। আমি বললাম, বন্ধুগণ, চামেলী দেবীর হত্যার আসল রহস্য এখন হীরু স্বীকার করেছে। তার আগে মিঃ আয়েঙ্গারের বেডরুমে ওই আয়নাটি সম্পর্কে একটু বলা দরকার। ওই আয়নাই চামেলী দেবীর হত্যার কারণ। আর ওই আয়নাই এই হত্যারহস্যের জট ছাড়াবার প্রধান সহায়ক।

এখানে হীরু সম্পর্কে একটু বলা দরকার।

গঙ্গা-যমুনা অ্যাপার্টমেন্টের মালিক মানুভাই প্রপার্টিজের মালিকের সঙ্গে হীরুর যোগাযোগ হয়। তারা হীরুকে তাদের ফ্ল্যাট বেচা-কেনার দালালিতে নিয়োগ করে। চাকরি ছেড়ে বছর দুয়েকের মধ্যে হীরু দালালি করে প্রচুর পয়সা কামায়। কিন্তু সে নানা বদনেশায় সব টাকা উড়িয়ে দেয়। এমনকি মানুভাই প্রপার্টিজের কাছে তার বাড়িটিও বাঁধা দেয়। প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে সে যখন কি করে আরও টাকা রোজগার করার কথা ভাবছে তখন তাদের পাড়ার ফ্যালা তাকে ড্রাগ পাচারের ব্যবসায়ে নামায়। ওই যমুনা অ্যাপার্টমেন্টে ঠিক আয়েঙ্গারের ফ্ল্যাটের সমান্তরাল ফ্ল্যাটটির মালিক মিঃ আর সি গুপ্তা। ভদ্রলোকের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মুখে ইংরাজির খই ফোটে। লোকে জানে তাঁর সারা পৃথিবী জুড়ে এক্সপোর্টের ব্যবসা। আসলে তাঁর ব্যবসা ড্রাগ পাচারের।

ফ্যালা হীরুকে নিয়ে আসে গুপ্তার কাছে। আর একদিন দুপুরে ওই আয়নার মধ্য দিয়ে মিসেস

আয়েঙ্গার হীরুকে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিচে নেমে হীরুর জন্য অপেক্ষা করেন। হীরুকে তিনি বলেন, তাঁর সন্দেহ হীরু কোনো বদ মতলবে এখানে এসেছে। তাঁর ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি ফেরত না দিলে তিনি কিন্তু পুলিশে খবর দেবেন। হীরু এরপর টেলিফোনে তাঁকে ভয় দেখায়, হীরুকে তিনি যে দেখেছেন, একথা কাউকে জানালে সে চামেলী দেবীকে খুন করবে।

হীরুর এরপর সন্দেহ হয় সত্যিই হয়তো চামেলী দেবী তাকে ধরিয়ে দেবেন। তাই চামেলীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য সে ফন্দি আঁটে। ঠিক করে দুপুরবেলা চামেলী দেবীর ফ্ল্যাটে ঢুকে গলায় ফাঁস দিয়ে চামেলীকে সে খুন করবে। এই উদ্দেশ্যেই সে চামেলী দেবীর ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল। কিন্তু চামেলী দেবী রিভলবার বার করতেই সমস্ত পূর্ব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। চামেলীকে মরতে হলো। সে পালাল।

কিন্তু পুলিশ তাকে গ্রেফতার করল। তখন উকিলের পরামর্শে নিজেই কেসটা অন্যরকম করে সাজাল হীরু। উদ্দেশ্য, অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু ঘটানো প্রমাণিত হলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে না, কয়েক বছরের জেল হবে মাত্র। সবচেয়ে বড় কথা সে যে ড্রাগ-পাচারের সঙ্গে জড়িত একথাও চাপা থাকবে। কারণ তার মুখ থেকে একথা একবার বেরিয়ে গেলে ড্রাগ-পাচার চক্র তাকে আর বেঁচে থাকতে দেবে না।

সেদিন যদি ফ্যালাকে ঋতু দেখে না ফেলত, আমরা কোনোদিন ভাবতেই পারতাম না চামেলী দেবীর হত্যার পিছনে আর একটা বড় রহস্য লুকিয়ে আছে।

হোসেনুর রহমান বললেন, এই সন্দেহটা প্রথম থেকেই আমার হয়েছিল, তাই আমি ইউ পি আর ঋতুকে কাজে লাগিয়েছিলাম। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা এটা ভাবতেও পারিনি। একেবারে মিঃ আয়েঙ্গারের সমান্তরাল ফ্ল্যাটে এই কাণ্ড চলছে। দুটো ফ্ল্যাটের ব্যবধান চল্লিশ ফুটের মতো। আয়নাটা এমনভাবে ফিট করা ছিল যে হীরুরা কখনও বুঝতে পারেনি সামনের জানালা দিয়ে কেউ তাদের লক্ষ্য করছে। একেই বলে ভবিতব্য। তবে লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, এই রহস্য উদ্ধারের জন্য আমাদের এন্টায়ার পুলিশ ফোর্স উদ্দালক ও ঋতু প্রধানের কাছে কৃতজ্ঞ।

সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।

সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ঋতু গিয়ে ধরল। তারপর কিছুক্ষণ পরে রিসিভারটা নিয়ে এসে ঋতু বলল, তোর ফোন।

আমি বললাম, কে?

ঋতু বলল, সম্ভবত তোর দ্বিতীয় মক্কেল।

[শারদীয়া ১৪০৪]

হাতের ছোঁয়া

শ্রীধর সেনাপতি

অতীতের জিনিসগুলো এঁরা বিক্রি করতে চান না। দু'খানা ঘর জুড়ে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত হয়ে পড়ে রয়েছে। ধুলো-ময়লায় বিবর্ণ। উই-ইঁদুর-আরশোলা-কাঁকড়াবিছের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। সাধারণত ঘরের দরজা-জানলাগুলোও সব দিন খোলা হয় না।

নকুল যে হঠাৎ কোনোদিন দরজা-জানলা খুলে অল্পক্ষণের জন্যে সেখানে চোখ বুলিয়ে আসে, সেটা তার কর্তব্যকর্মের চেয়ে দেখার কৌতূহলটাই বেশি। অল্পবয়সে মা-বাপকে হারিয়ে গ্রামের একটি মানুষের সহায়তায় অসহায় দুঃস্থ নকুল শহরে এসে দূরসম্পর্কের আত্মীয় ধনী ব্যবসায়ী দত্তবাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল। নকুলকে ইস্কুলে পড়াশোনা করার সুযোগও করে দিয়েছিলেন তাঁরা। নকুল অন্তত ম্যাট্রিকটা পাশ করতে পারলে তাঁরা খুশি হতেন। কিন্তু নকুল এমনি গাধা, ইস্কুলের ওপর ক্লাস পর্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গিয়ে শেষে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। নিজেকে সে তাই মাঝে-মধ্যে গাধা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। এখন তো সে দত্তপরিবারেরই একজন। বাড়ির ছোটবড় সকলের নকুলদা।

দত্তবাড়িকে ঘিরে নকুলের স্মৃতির ঘরে জমা হয়েছে সুখদুঃখের কত না বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা! তবে তার মধ্যে নকুলের জীবনের একটি উজ্জ্বলতর ঘটনা—ভারত যেদিন স্বাধীন হলো, তার বছরখানেক আগের। বয়স তখন আঠারো কি উনিশ।

নকুলকে একদিন হঠাৎ নির্দেশ দেওয়া হলো, ওই বিশেষ ঘর দু'খানা চটপট পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। তো যে পরিমাণ ধুলো আবর্জনা দীর্ঘদিন ধরে ওখানে জমে পাহাড় হয়ে রয়েছে, নকুলের একার সাধ্য কী অল্প সময়ের মধ্যে সেসমস্ত ঝেড়েমুছে সাফ করে ফেলার। অগত্যা বাইরে থেকেও দু'জন কাজের লোককে ডেকে আনতে হয়েছিল। নকুল তো মনেপ্রাণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখতেই চেয়েছে ওই ঘর দু'টিকে! এখন বাড়ির সকলের সুমতি হয়েছে দেখে সে যেন আনন্দে আত্মহারা! তবে মনের মধ্যে একটা কৌতূহল তাকে অবশ্যই সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। হঠাৎ ওই রকম একটা সদ্‌ইচ্ছার পেছনে আসল উদ্দেশ্যটা কী?

সেটা জানার জন্য নকুলকে বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। তিন দিন বাদে বড়বাবুর নাতি হীরকের জন্মদিন। ওই উপলক্ষে বড়বাবুর বন্ধুরা একটা বিশেষ প্রোগ্রাম ঠিক করেছেন। তাতে অবশ্য আত্মীয়স্বজনরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। প্রায় সকলেই শহরের গণ্যমান্য এবং ধনী অবস্থাপন্ন ব্যক্তি! নানা প্রকার দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন কিছু না কিছু শিল্পসামগ্রী তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের সংগ্রহে রয়েছে। তা থেকে কোনো কোনো জিনিস বাছাই করে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে বাড়িতে। একমাত্র উদ্দেশ্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের কিছু পরিমাণ আনন্দ বিতরণ করা। তা সত্ত্বেও নকুলের মনে হয়েছিল, বড়লোক মানুষদের এটা শুধু খামখেয়ালীপনাই নয়, নিজেদের ভেতর একটু জাঁকজমক দেখানোর প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বটে!

তো ওই ঘর দু'খানার মধ্যে একখানা ঘর প্রদর্শনীর স্থান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। জড়োয়া গহনা থেকে শুরু করে ধাতুর কারুকার্যমণ্ডিত নানান মূল্যবান জিনিস দিয়ে ভরে তোলা হয়েছিল ওই প্রদর্শনী।

বিখ্যাত সব শিল্পীর আঁকা ছবিও ছিল কয়েকটি। কোন জিনিস কার বাড়ি থেকে এসেছে, তাঁর নাম ও বংশপরিচয় সোনালী অক্ষরে ছাপা কার্ডে সংক্ষেপে লেখা ছিল।

ওই সমস্ত অমূল্য জিনিসপত্র ইতিপূর্বে চোখে দেখা তো দূরের কথা, দুনিয়ায় যে থাকতে পারে, নকুল ধারণাই করতে পারেনি। দেখে বিস্ময়ে আনন্দে সে হতভম্ব! নিজেকে নিজের মধ্যে যেন কিছুক্ষণ আর খুঁজে পাচ্ছিল না। কোন জিনিস ছেড়ে বিশেষ কোনটার দিকে সে নজর ফেলবে! বাপ্‌রে! বাপ্‌রে! সভয় বিস্ময়ে নকুলের গলা শুকিয়ে উঠছিল। তবে হ্যাঁ—সব ছেড়ে একটা জিনিস নকুলের দৃষ্টিকে যেন চুম্বকের মতো টানছিল বারবার। পাঁচ-ছয় ইঞ্চির বেশি লম্বা হবে না, সোনার তৈরি একটা নটরাজমূর্তি।

ঘরের মধ্যে মোটা দড়ি দিয়ে জায়গা ভাগ করা। যাতে দর্শনীয় জিনিসপত্রের খুব কাছাকাছি কেউ না পৌঁছতে পারে। হাত দিয়ে সেসব ছোঁয়া মানা। তবে নকুলের কপাল ভাল। নটরাজমূর্তির গা থেকে মাঝে-মধ্যে সাবধানে ধুলোবালি ঝাড়বার নির্দেশ বাবুরা দিয়েছিলেন একমাত্র তাকেই। প্রদর্শনীর সময় ছিল বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত। দু'ঘণ্টা।

প্রথম দিকে প্রয়োজনবোধ করা হয়নি। মূর্তিটা সবাইকে দেখানোর জন্যে রাখার প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে একটা আলাদা ব্যবস্থা করা হয়। একটা দড়ির বেড়া রচনা করে দেওয়া হয় নটরাজমূর্তিটাকে ঘিরে। জিনিসটা ছিল নন্দীবাবুদের বাড়ির। শীলবাড়ির ছেলে সঞ্জয়বাবু আর সরকারবাড়ির ছেলে তপনবাবু—ওই দু'জনের ওপরে প্রদর্শনী দেখাশোনা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া ছিল। সঞ্জয়বাবুর ইচ্ছাতেই সোনার নটরাজমূর্তির জন্য নতুন করে আলাদাভাবে দড়ির বেড়াটা দেওয়া। প্রদর্শনীঘরে ধুলোবালি সাফ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল অনেক ভাবনাচিন্তার পর। সেটা অবশ্যই মনে মনে টের পেয়েছিল নকুল।

প্রথমে সঞ্জয়বাবুরা খুঁতখুঁতে সুরে বলেছিলেন, ঝাড়ামোছা করতে গিয়ে জিনিসটা ক্ষতি করে ফেলবে না তো; সাধারণভাবে আমাদের ঘরদোর পরিষ্কার করার সময়ে তো এটা-ওটা ভেঙে নষ্ট হয়ে যেতে দেখা যায়!

নকুল ওঁদের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। নীরবে একটু একটু করে মাথা নাড়ছিল সে। না না। কোনো ক্ষতি হবে না। মনে মনে সে প্রার্থনা করছিল, ওই বিশেষ কাজটা যেন তাকেই দেওয়া হয়। আহা! কী সুন্দর মূর্তি! দেখে দুই চোখ জুড়িয়ে যায়। আনন্দপুলকে মন ভরে ওঠে। এমন জিনিসের ক্ষতিসাধন করতে পারে নকুল? কক্ষণো না।

তপনবাবু তখন বলেছিলেন, সোনার তৈরি মূর্তি, ফাঁপানো না, নীরেট। নন্দীবাড়িতেই রয়েছে শুনেছি ষাট-সত্তর বছর ধরে।

নটরাজমূর্তিটাকে কাছ থেকে অনেকবার দেখেছিলেন সঞ্জয়বাবু। ঠিক যেন নকুলের মনের মতোই তাঁরও অবস্থা। সত্যি! এমন জিনিস বারবার দেখতে ইচ্ছা করে। শুধু চোখে দেখাই নয়, সঞ্জয়বাবু বারবার মুখে বলেছেন, নকুল শুনেছিল, ওয়ান্ডারফুল! চমৎকার! এমন একটা জিনিস যে আমাদের পরিচিত আত্মীয়বন্ধুদের কারো কাছে আছে, ঘুণাক্ষরে জানতাম না। এ জিনিস নকল করার হিম্মত এখন বোধহয় কারো নেই। অদ্ভুত সুন্দর।

সঞ্জয়বাবুর মুখে এইভাবে যেন খৈ ফুটছিল তখন। নকুলের মনে হয়েছিল, পছন্দসই খেলনা পাওয়া আহ্লাদিত ছেলের মতো অবস্থা সঞ্জয়বাবুর।

হ্যাঁ, অতি উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্ম। শিল্পীর প্রতিভা অতুলনীয়। আমাকে এই মূর্তি রীতিমতো মোহিত করে দিয়েছে। সায় দিয়েছিলেন তপনবাবুও।

নকুল তখন ভয়ে ভয়ে শুধিয়েছিল, আমি কি জিনিসগুলো ঝাড়ামোছা করতে পারি?

অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তাকে। নকুলের হাতের নরম পালকের ঝাড়ু অতি যত্ন আর সতর্কতার সঙ্গে বিশেষ করে নটরাজের গায়ে স্পর্শ করতো মাঝে মাঝে। অবশ্যই প্রদর্শনীর অন্যান্য জিনিসপত্র সম্পর্কেও নকুল ছিল সজাগ। এই বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা দত্তবাড়ির বড়বাবু জীবন দত্ত স্বয়ং। এর

সমস্ত দায়দায়িত্ব তিনি নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে তিনি সেটা পূরণ করবেন ঠিকই। বড়বাবু নকুলকে যেমন স্নেহ করেন, তেমনি গভীর বিশ্বাসও রাখেন তার ওপর। সেদিক দিয়ে তাই নকুলের একটা আলাদা দায়িত্বও আছে বৈকি।

বিপদ আসতে পারে চোর-ডাকাতের দিক থেকে। তবে দর্শক তো শুধু নিজেদের পরিচিত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব। তবু একটু সতর্ক থাকতে দোষ কী! বাড়ির গেটে দু'-দু'জন বন্দুকধারী পাহারাদার খাড়া। ওদের দিন-রাত ডিউটি। ওদিকে প্রদর্শনীঘরে একদিন ছাড়া পালা করে রাত কাটাচ্ছিলেন সঞ্জয়বাবু আর তপনবাবু। গোড়ার দিকে ওঁরাও একটু যেন ভয়ে ভয়ে ছিলেন। তাই দু'জনেই চেয়েছিলেন, প্রদর্শনীটা তিন দিনে শেষ করে দেওয়া হোক। বেশি দিন ঝুঁকি নিয়ে ওটা চালিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু সেটা হয়নি। জন্মদিনের উৎসবটাই তো হলো তিন দিন ধরে। এলাহি ব্যাপার! প্রচুর খাওয়া-দাওয়া। অন্যান্য আমোদপ্রমোদও ছিল। তাই প্রদর্শনী অনেকেরই ভাল করে দেখা হয়নি। শেষে সময়টা বাড়িয়ে সাত দিন করে দেওয়া হয়।

ওরই মধ্যে একদিন......

নকুলের রীতিমতো চমক লাগে! মনে জাগে একটা সন্দেহ। সন্দেহটা যে অমূলক নয়, একসময়ে সেটা প্রমাণও পায় নকুল।

তখন সে প্রথমে জানায় তপনবাবুকে। যে সোনার মূর্তিটার গায়ের ধুলো ঝাড়ত সে পালকঝাড়ু দিয়ে, এখন অবিকল তেমনি একটা মূর্তি রয়েছে সেই জায়গাতে! আসল মূর্তিটা উধাও!

ঘটনাটা বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, তপনবাবু। গতকাল আমি ওই মূর্তির গায়ের ধুলো ঝাড়িনি। এটা আগেকার সেই মূর্তি কখনই নয়।

শুনে তপনবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন, এ কী বলছো তুমি, নকুলদা! মানে—আসল মূর্তি এটা নয়?

হ্যাঁ, তপনবাবু। আমি মূর্তিটাকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে বলতে পারি। আগে অন্তত পনেরো-বিশ বার আমি আসল মূর্তিটাকে হাত দিয়ে ছুঁয়েছিলাম। সেটার গা থেকে ধুলো পরিষ্কার করেছি পালকঝাড়ু দিয়ে। বলা যায়, আসল নটরাজমূর্তিটার স্পর্শ যেন এখনও লেগে রয়েছে আমার এই দু'খানা হাতে।

এবার তপন সরকারের গলা ভয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে, আগে ওটা আমাকে ভাল করে দেখতে দাও।

দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ান সোনার নটরাজমূর্তির কাছে। লম্বা করে নিঃশ্বাস টানেন। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিছুকাল আটকে থাকে মূর্তির ওপর।

ইমপসিবল.......বিশ্বাস হয় না—বলতে থাকেন কথাগুলো, তাঁর মাথাও নড়ে সবেগে।

তপন সরকার নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। নকুল ভাবে এমনটা হতেই পারে। কারণ ঘরে সাজিয়ে রাখা অমূল্য সব জিনিসের নিরাপত্তার ভার কাঁধে ছিল তো!

মনের অবস্থা কিছুটা সামলে নেন তপন সরকার। ফিসফিস করে বলেন, শোনো নকুলদা, তুমি বোধহয় ভুল করছো। হ্যাঁ, তোমার এটা ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। হঠাৎ তুমি নিজেকে এত বেশি বুদ্ধিমান মনে করছো কেন? এই দত্তবাড়ির আশ্রয়ে আছো তুমি, ভুলে যেও না। বলে একটু হেসে ফের শুরু করেন, আমি নানা জায়গায় বিভিন্ন সময়ে অ্যান্টিক নিয়ে চর্চা করো থাকি, এমন অনেক জিনিস ঘাঁটাঘাঁটিও করতে হয়। আমার বিচারে এই নটরাজমূর্তিটাই ক'দিন ধরে এখানে যেমন ছিল, তেমনি রয়েছে। তোমার ভুল হলেও কথাটা যদি চাউর হয়ে যায়, তাহলে ভীষণ গণ্ডগোল বাধবে। তাতে জড়িয়ে পড়বে তুমিও। কথাটা কাউকে এখন বলো না, চেপে যাও। তোমার মঙ্গলের জন্যে বলছি অবশ্য। মিথ্যে ব্যাপারটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রকাশ করবে খবরের কাগজওলারা। এখান থেকে চুরি হবে কী করে? এ সম্পর্কে আপাতত আর একটিও কথা না।

তবু সন্দিগ্ধ নকুলের কোঁচকানো ভুরু সরল হয় না। ঘটনার কথাটা এইভাবে গোপনেই সঞ্জয় শীলকে বলতে চায় সে। তার সন্দেহের ব্যাপারটা তাহলে যাচাই হয়ে যাবে। তিনিও কি এখনও পর্যন্ত নিঃসন্দেহ আছেন নটরাজমূর্তিটা সম্পর্কে? একটা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে নকুল।

সেদিন রাত্রে প্রদর্শনীঘরে সঞ্জয় শীলের একা থাকবার কথা। নকুল তাঁকে সহজে নিভৃতে পেয়ে গেল। আমতা আমতা করে সে বলে, সঞ্জয়বাবু! একটা কথা ছিল। বলবো?

হালকা মেজাজেই তখন ছিলেন সঞ্জয় শীল। বলেন, বলো, বলো। অমন চোরের মতো কথা বলছো কেন, নকুলদা! তোমার যা খুশি বলতে পারো আমাকে। একজিবিশন নিয়ে কি কিছু বলবে?

নকুল প্রায় ফিসফিস করে বলে, হ্যাঁ। হয়তো আমার কথার দাম কেউ দেবেন না। আপনারা বললে কাজ হতে পারে। আমার মনে হয়, আগের নটরাজমূর্তির জায়গায় অন্য একটা নটরাজমূর্তি বসানো হয়েছে! আর সেটা আসল সোনার তৈরি কিনা সন্দেহ জাগে। আপনিও নিজের চোখে একবার দেখুন না মূর্তিটাকে।

শুনে প্রায় আঁতকে ওঠেন সঞ্জয় শীল, এ্যাঁ! তার মানে?

সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটার দিকে তাঁর দৃষ্টি ঘুরে যায়। নকুলের মনে হয়, খবরটা শুনে তপন সরকারের চেয়ে বেশি মাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সঞ্জয় শীলের মধ্যে। তাঁর দুই চোখ থেকে যেন আগুন বেরুতে থাকে। ওই আগুনে বুঝি ভস্মীভূত হয়ে যাবে নটরাজের মূর্তিটা!

সঞ্জয় তারপর ঘুরে তাকান নকুলের দিকে। বিকৃত গলায় বলেন, তুমি যে রীতিমতো নার্ভাস করে দিলে আমার মতো মানুষকেও!

নকুল সাহস সঞ্চয় করে তবু একটা প্রশ্ন রাখে, আপনি কি মনে করেন আসল মূর্তিটা পাল্টানো হয়নি?

আমি মনে করি না পাল্টানো হয়েছে। এ সম্পর্কে যার এতটুকু জ্ঞান আছে, সেই বলবে এটা বহুদিনের প্রাচীন বস্তু। ভুল হতে পারে না। আর তুমি এখন কিনা বলছো, পুরনো মূর্তিটাকে পাল্টে নতুন একটা নকল মূর্তি একই জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তপন আর আমি তো সবসময়ে প্রদর্শনী পাহারা দিই। যাক, আমাকে যা বলার বলেছো, নকুলদা, আর কাউকে একথা বলো না। আমি চাই না তোমাকে কেউ হেয় করুক।

নকুল আমল পায় না সঞ্জয় শীলের কাছেও। অতঃপর সে রীতিমতো বিমূঢ়! সত্যি কি তার চোখে দেখার ভুল? মূর্তিটাকে পরিষ্কার করতে গিয়ে এখন যে ধারণাটা তার হয়েছে, প্রদর্শনীর গোড়ার দিকের দিনগুলোতে তো সেরকমটা হয়নি। এখন মূর্তিটার ওপর নিজের হাতের ছোঁয়াটা ভিন্ন উপলব্ধি এনে দেয় কেন? সন্দেহ! রীতিমতো একটা সন্দেহের ব্যাপার! প্রদর্শনীঘর থেকে বেরিয়ে অতঃপর কী করতে পারে নকুল? তার মনের চিন্তা গভীর হয়। ফের সে ঢুকে যায় প্রদর্শনীঘরে। হাতে যথারীতি পালকঝাড়ু। নরম মোলায়েম টাওয়েল। চওড়া বারান্দার ঘেরা জায়গাতে সাময়িকভাবে শোয়ার ব্যবস্থা করা আছে। তপন সরকার যেদিন রাত্রে থাকেন, শোন। সঞ্জয় শীলের পালা এলে সঞ্জয়। এখন সঞ্জয়ের পালা। ওখানে শুয়ে পড়েছেন।

নটরাজমূর্তির কাছে সময়টা বেশি নেয় নকুল। ঘরের মেঝে থেকে দেওয়ালের অর্ধেক দূর পর্যন্ত মোজাইক করা। সমস্ত জায়গা মাজাঘষা করে আয়নার মতো চকচকে করে তোলে। আর এই কাজ করতে করতে একসময়ে যেন বিদ্যুতের শিহরন খেলে যায় নকুলের শরীরে! হৃদপিণ্ডটা বুকের খাঁচায় একবার লাফিয়ে ওঠে!........এই তো! প্রমাণ মিলেছে। তার চোখে দেখার ভুল নয়। নকুলের সন্দেহ কেউ আর অমূলক বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না।

সঞ্জয় শীল কি ঘুমিয়ে পড়েছেন? থাক। নকুল প্রায় রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে যায় বড়বাবুর ঘরে। এ সময়ে তিনি একাই ছিলেন। নকুলকে দেখে একটু অবাক হন।

কী নকুল! হঠাৎ এত রাত্রে.......কিছু বলবে তুমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। নকুল দম নিয়ে তার সন্দেহের কথাটা প্রকাশ করে বড়বাবুর কাছে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে। এখন সে কেন ভয় পাবে? সমস্ত ঘটনাটির তথ্য প্রমাণ এসে গেছে তার হাতের মুঠোয়।

সব কথা শুনে নকুলকে সঙ্গে নিয়ে জীবন দত্ত প্রায় দৌড়ে প্রদর্শনীঘরে গিয়ে হাজির হন।

নটরাজমূর্তিটা যেখানে রাখা হয়েছিল, সেটার পেছনে দেওয়ালের মোজাইক টাইল দেখা গেল আলগা। সামান্য চেষ্টাতে একটা টাইল উঠে এল। প্রায় ওই মাপের একটা ফাঁকা জায়গা দেওয়ালের মধ্যে। অতি সম্প্রতি তৈরি বোঝা যায় একনজর ফেলেই। দেখা গেল আসল নটরাজমূর্তিটাকে তুলোয় জড়িয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওই গোপন জায়গায়।

জীবন দত্তর চোখ-মুখ প্রচণ্ড ক্রোধ আর ক্ষোভে যেন ফেটে পড়তে চায়। মূর্তিটাকে গর্ত থেকে বার করে কয়েক মুহূর্ত হারিয়ে ফেলেন কথা বলার শক্তি। তারপর বোমার মতো ফেটে পড়েন তিনি, কার কাজ? নকুল! কে করেছিল এই কুকীর্তি? তুমি জানো? ভয় নেই। আমাকে বলো।

নকুল তবু ভয়ে ভয়ে নিজের বক্তব্য বলেছিল। সমস্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি অভিজ্ঞ মানুষের মতো বিচার-বিবেচনা করে। কারো বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো তার হাতে নেই। বড় কথা, মূল্যবান জিনিসটা চুরি হয়ে যাচ্ছিল, আবার ফিরে পাওয়া গেছে—এটাই তো এক্ষেত্রে সুখের বিষয়!

জীবন দত্তর ক্রোধ তাতে প্রশমিত হয়নি। কঠিন গলায় বলেছিলেন, এই অপরাধমূলক ঘটনার পেছনে তাহলে সঞ্জয় শীল আর তপন সরকার—এই দু'জনের মধ্যে কারো গোপন হাত অবশ্যই রয়েছে। এত পাহারা আর সাবধানতার দরুন বাইরের কারো পক্ষে এমন কাজ করা সম্ভব নয়। দেওয়ালের ভেতর গোপন জায়গা বানাতে অন্য কেউ সময়ই বা পাবে কী করে? রাত্রে পাহারায় থাকতো ওই দু'জন। দু'জনের মধ্যে একজন কাজটি করেছিল, নকুল। মূর্তিটাকে গোপন জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ বা সময় পায়নি সে।

নকুল চুপ। জীবন দত্ত থেমে একটু দম নিলেন। নকুল নিজের মনের অবস্থাটা সঠিকভাবে জীবন দত্তর কাছে প্রকাশ করতেও অক্ষম। বিড়ম্বনা বুঝি একেই বলে!

জীবন দত্ত ফের বলেন, নকুল, ওই দু'জনকে তুমি প্রদর্শনীঘরে কয়েকদিন ধরে থাকতে দেখছো। দু'জনের কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা নিশ্চয় তোমার কানে যেত। এখন একটু গভীরভাবে ভেবে দেখ তো, ওদের আচরণ আর কথাবার্তার সূত্র ধরে তুমি বিশেষভাবে কাউকে সন্দেহের তালিকায় ফেলতে পারো কিনা! বরাবর তোমার বুদ্ধির আমি দাম দিই, নকুল। নির্ভয়ে বলো।

অভয় পেয়ে নকুল অবশেষে আমতা আমতা করে বলে, সঞ্জয়বাবু আর তপনবাবু—দু'জনেরই আলাদাভাবে আমাকে বলেছিলেন, নটরাজমূর্তিটা অত্যন্ত মূল্যবান আর দুষ্প্রাপ্য জিনিস। তবে আসল জিনিসটা বদলে ফেলা হয়েছে বলাতে ওঁদের মধ্যে একজনই আমাকে একটু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন। আমি নাকি মহামূর্খের মতো কথা বলছি। নিজেকে খুব বেশি বুদ্ধিমান মনে করি! পরামর্শ দিয়েছিলেন, সন্দেহের কথাটা আর কাউকে না বলতে। বড়বাবু, মূর্তিটাকে প্রথমে একনজর দেখেই যিনি আনন্দে বলে উঠেছিলেন, 'শিল্পীর প্রতিভা অতুলনীয়। মূর্তিটা রীতিমতো আমাকে মোহিত করে দিয়েছে'—আমার মতে সন্দেহের দৃষ্টি তাঁর দিকেই পড়া উচিত। আর, মূর্তিটাকে দেখামাত্র যাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল, 'ওয়ান্ডারফুল! চমৎকার! এমন জিনিস নকল করার হিম্মত কারো নেই', তাঁকেই এক্ষেত্রে নির্দোষ মনে করা যায়।

তারপরই বন্ধ হয়ে যায় প্রদর্শনী। দত্তবাড়ির আত্মীয়বন্ধুদের দর্শনীয় মূল্যবান জিনিসপত্র নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের বাড়িতে বাড়িতে। নটরাজমূর্তি চুরির চেষ্টার ব্যাপারটা চেপে যাওয়া হয়েছিল। নকল মূর্তিটা থেকে গিয়েছিল দত্তবাড়িতে। কারণ ওটার কোনো দাবিদার ছিল না।

[কার্তিক ১৪০২]

বৈজ্ঞানিক নিরুদ্দেশ

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত সাড়ে তিনটে। রাতজাগার ক্লান্তিকে দূর করার জন্যে, লালবাজার কন্ট্রোলরুমের চিফ মিঃ নায়ার সবেমাত্র কফির কাপে চুমুক দিয়েছেন, এমন সময় টেলিফোন অপারেটার জানালেন যে, চৌরঙ্গি সারকিটে ডিউটিরত মিঃ বটব্যাল তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

মিঃ নায়ার বললেন, লাইনটা দিন।

রিসিভারটা কানে লাগিয়ে তিনি বললেন, আয়ার স্পিকিং।

অপরপ্রান্ত থেকে মিঃ বটব্যাল বললেন, স্যার, রবীন্দ্র সদনের কাছে ডিউটিতে ছিলাম। রাত ঠিক আড়াইটের সময় দেখলাম পিজি হাসপাতালের দিক থেকে একটা কালো অ্যামবাসাডার গাড়ি খুব স্পীডে বেরিয়ে এসেই রেসকোর্স ধরে এগিয়ে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটাকে ফলো করলাম। আউট্রাম ঘাটের কাছে পৌঁছে গাড়িটা ম্যান অফ ওয়ার জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকা একটা জাহাজের বড় কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে সোজা উঠে গিয়ে, জাহাজটার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই কাঠের পাটাতনটাও উঠে গেল! ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে, ফোর্সদের গাড়ি থেকে নামিয়ে আমি পরবর্তী অ্যাকশানের জন্যে তৈরি হচ্ছি, এমন সময় আমাদের বেতার গাড়ির ওপরে পরপর দু'তিনটে পেট্রোল বোমা এসে পড়লো। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার করলাম। কয়েকটা গুলি গিয়ে লাগলো জাহাজের গায়। হঠাৎই সেই সময় জাহাজটা চলতে শুরু করলো, এগিয়ে গেল মাঝগঙ্গার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা চলে গেল চোখের আড়ালে।

মিঃ নায়ার বললেন, জাহাজের নাম জেনেছেন?

বটব্যাল বললেন, হ্যাঁ স্যার, জাহাজের নাম পেঙ্গুইন।

মিঃ নায়ার বললেন, আপনি এখন কোথা থেকে কথা বলছেন?

বটব্যাল বললেন, পিজি হাসপাতালের এমারজেন্সি থেকে। গাড়ির ড্রাইভার রতন সিং আহত হয়েছে। ওকে এমারজেন্সিতে ভর্তি করে দিয়েছি। পেট্রল বোমার আগুন দেখে, রেসকোর্সের কাছে যে বেতার গাড়ি ডিউটি দিচ্ছিল তারাও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সেই গাড়ি করেই রতন সিংকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। আমাদের গাড়িও ভীষণ ভাবে পুড়ে গেছে।

মিঃ নায়ার বললেন, আপনি এক্ষুণি পিজির সুপারেন্টেডেন্টের সঙ্গে দেখা করে, জানবার চেষ্টা করুন, তাঁদের কোনো রুগী মিস আপ হয়েছে কি-না। যদি মিস আপ হয়ে থাকে, তাহলে সেই রুগীর নাম-ঠিকানা এবং কেস নম্বর লিখে নিয়ে এখানে চলে এসে অফিসিয়াল রিপোর্ট প্লেস করুন।

বটব্যাল বললেন, ইয়েস স্যার।

মিঃ নায়ার বন্দর পুলিশের হেডকোয়ার্টার থেকে শুরু করে, বন্দরের সমস্ত থানাগুলোকে সজাগ করে দিয়ে তাদের নির্দেশ দিলেন পেঙ্গুইন জাহাজকে আটকাতে। তারপর অপারেটারকে বললেন, পুট মি টু পি. সি.।

সংযোগ হতেই মিঃ নায়ার বললেন, গুড মর্নিং স্যার, নায়ার স্পিকিং ফ্রম কন্ট্রোলরুম।

কমিশনার বললেন, গুড মর্নিং মিঃ নায়ার। কোনো জরুরি ব্যাপার ঘটেছে নাকি?

মিঃ নায়ার যা যা ঘটেছে সবিস্তারে কমিশনারকে জানালেন। সব শোনার পর কমিশনার বললেন, জাহাজের নাম যা বললেন, তা যদি সত্যি হয় তাহলে সর্বনাশ। সমস্ত এশিয়ার মধ্যে পেঙ্গুইন এক শক্তিশালী দল। এরা মোটা অর্থের বিনিময়ে কাজ করে। আমার মনে হয় হাসপাতাল থেকে কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে ওরা কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। আপনি নিজে পিজি হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ভাল করে খোঁজ নিন। সমস্ত বন্দর পুলিশকে অ্যালার্ট করে দিন এবং সেই সঙ্গে রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর এবং চেকপোস্টগুলোকে সজাগ করে দিন। জলপথে অসুবিধে দেখলে ওরা অন্যপথে যাবে।

নায়ার বললেন, ইয়েস স্যার।

মিঃ নায়ারের নির্দেশমতো বটব্যাল দেখা করলেন হাসপাতালের সুপারেন্টেনডেন্ট মিঃ বাসুর সঙ্গে। তখন ভোর হয়ে গেছে। বটব্যালের মুখে ঘটনার বিবরণ শুনে মিঃ বাসু বললেন, গভীর রাতে কোনো হাউস স্টাফও যদি কোথাও যায় তাহলেও আগে থেকে অফিসে রিপোর্ট করতে হয়। তাছাড়া একমাত্র এমারজেন্সি ওয়ার্ড ছাড়া গভীর রাতে অন্য কোনো রুগীকে সরানো হয় না। এমারজেন্সি থেকেও রুগীকে অন্য কোথাও পাঠালে রেকর্ড করে রাখা হয়। যাই হোক ব্যাপারটা আমি দেখছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

বটব্যাল বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মিঃ বাসু হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, সমস্ত ব্যাপারটাকে গোপন রাখতে আমরা ব্যর্থ হলাম। এই রকমভাবে গভীর রাতে নিঃশব্দে রুগীকে তুলে নিয়ে যাওয়া তো খুব সহজ নয়। যারা নিয়ে গেছে তাদের ক্ষমতা প্রচুর।

মিঃ বটব্যাল বললেন, মিঃ বাসু, ব্যাপারটা খুলে বলুন।

মিঃ বাসু বললেন, আমার সঙ্গে জেনারেল ওয়ার্ডে চলুন তাহলেই বুঝতে পারবেন।

মিঃ বটব্যাল জেনারেল ওয়ার্ডের পুরুষ বিভাগে পৌঁছে প্রথমেই একটা মিষ্টি গন্ধ পেয়ে বললেন, মিঃ বাসু, আপনি কি একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছেন?

মিঃ বাসু বললেন, হ্যাঁ। এই গন্ধটা কিছুক্ষণ আগে যখন এসেছিলাম তখনও পেয়েছিলাম।

মিঃ বটব্যাল বললেন, মনে হচ্ছে ক্লোরোফর্ম। দীর্ঘ সময় ঘুম পাড়াবার জন্যে ব্যবহার করা হয়। যাই হোক চলুন ভেতরে গিয়ে দেখা যাক।

মর্নিং শিফটের মেট্রন খুব উত্তেজিত ভাবে চিৎকার করছেন দেখে মিঃ বাসু বললেন, কি হলো সিস্টার, এত চিৎকার করে কাকে কি বলছেন?

মেট্রন সামনের টেবিলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা, নাইট মেট্রন ও অন্যান্য নার্সদের দেখিয়ে বললেন, আপনি একবার এসে ফিরে গিয়ে আবার ঘুরে এলেন কিন্তু এখনও এদের ঘুম ভাঙছে না। এদিকে রুগীদের ব্রেকফাস্ট দেওয়ার সময় হয়ে এল।

মিঃ বাসু বললেন, এদের সবাইকে স্টাফ রুমে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে তবেই অন্য কাজে হাত দেবেন। স্ট্রেচার বয়দের ডেকে এদের তুলে নিয়ে যেতে বলুন। হ্যাঁ আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি পুলিশ অফিসার মিঃ বটব্যাল, এনাকে নিয়ে আপনি উনিশ নম্বর কেবিনটা দেখিয়ে দিন, আমি এখানে আছি।

মিঃ বটব্যাল উনিশ নম্বর কেবিন থেকে শুরু করে সমস্ত ওয়ার্ডটা ঘুরে এসে বললেন, আমার মনে হয় মিঃ বাসু, সমস্ত রুগীরাও ক্লোরোফর্মে আচ্ছন্ন। দেখছেন না কেউ নড়ছে না, অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমরা কথা বলছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি তবুও দেখুন কেউই তাকিয়ে দেখছে না পর্যন্ত। আমার মনে হয় গতকাল রাতে এখানে যারা এসেছিল তারা মোটামুটিভাবে এই কাজে খুবই দক্ষ এবং সু-পরিচালিত। যাই হোক এবারে বলুন তো উনিশ নম্বর কেবিনে কে ছিলেন?

মেট্রন বললেন, বিজন হালদার।

মিঃ বাসু বললেন, সিস্টার আপনি বাথরুম এবং পেছনের বারান্দাগুলো একবার দেখে আসুন। বলা তো যায় না হয়তো মিঃ হালদার বাথরুমে গেছেন।

সিস্টার বললেন, ওকে স্যার।

সিস্টার চলে যাবার পর মিঃ বাসু বললেন, উনিশ নম্বর কেবিনে যিনি থাকতেন তিনি বিজন হালদার নন।

মিঃ বটব্যাল বললেন, তবে—

মিঃ বাসু বললেন, এখানে কিছু বলবো না। আমার অফিস ঘরে ফিরে আপনাকে সব জানাবো।

সিস্টার চারদিকটা ঘুরে এসে জানালেন, কেউ কোথাও নেই স্যার। শুধু উনিশ নম্বর ছাড়া সমস্ত রুগীই আছে।

মিঃ বাসু বললেন, ঠিক আছে সিস্টার। এবারে আপনি আপনার কাজে নেমে পড়ুন। উনিশ নম্বরের রুগীকে যে পাওয়া যাচ্ছে না, এ-কথা গোপন রাখবেন।

সিস্টার বললেন, ইয়েস স্যার।

বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের কাজ শুরু হয়ে গেল।

মিঃ বাসু তাঁর অফিসঘরে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, মিঃ বটব্যাল, উনিশ নম্বর কেবিনে ছিলেন একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। আজ থেকে বছর দুই আগে বিশ্বের সমস্ত সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ছবিসহ একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদটা ছিল ভারতবর্ষের তরুণ বিজ্ঞানী রাঘব সেন আবিষ্কৃত 'ইনভিজিবল হান্টার বা অদৃশ্য শিকারী' বিষয়ে। মিঃ সেন দাবি করেন তাঁর ইনভিজিবল হান্টারের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মাটি বা সাগরের গভীরে লুকিয়ে থাকা মূল্যবান সম্পদ অনায়াসেই উদ্ধার করা যাবে। যন্ত্রটা অপারেট করতে লোক লাগে জনা তিনেক। এর মূল ব্যাপারটা হলো, একটা তীব্র আলোকরশ্মির মাধ্যমে মাটি কিংবা সাগরের জল আলোড়িত করে সেই আলোড়িত জায়গার পাশেই একটা কম্পন গাইডার-এর দ্বারা নির্দিষ্ট জিনিস কোথায় বা কোনদিকে আছে, তার উপস্থিতি জানিয়ে দেবে। তারপর দিক নির্ণয় অনুযায়ী ইলেকট্রনিক্স ম্যাগনেট ড্রিল আলোড়িত জায়গাতে নেমে যাবে। এই ড্রিল মাটি বা জলের স্পর্শে অটোমেটিকভাবে চলবে। মাটি বা জলের একেবারে গভীরে নেমে যেতে পারবে এই ড্রিল। তারপর সেই ম্যাগনেট ড্রিল থেকে বেরোবে আর একটা আলোকরশ্মি। এই রশ্মির সঠিক উত্তাপের কথা জানা যাবে কম্পন গাইডারের ইনডিকেট চ্যানেলে। কিছুক্ষণ উত্তাপ সৃষ্টির পর ম্যাগনেট ড্রিল তীব্রভাবে ছুটে যাবে লক্ষ্যবস্তুর দিকে। এই ড্রিল এতই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যে, সমুদ্রের গভীর থেকে যে কোনো জাহাজকে ও তুলে আনতে পারে। লক্ষ্যবস্তুকে আকর্ষণ করা শুরু হলেই কম্পন গাইডার স্থির হয়ে যাবে এবং একটা ছোট্ট আলোর শলা ঠিক সুতো বা দড়ি গোটানোর মতো উল্টোদিকে ঘুরবে।

মিঃ বটব্যাল বললেন, এত বড় একটা নিউজ আমি মিস করেছি!

মিঃ বাসু বললেন, বাঙালী বৈজ্ঞানিকের এত বড় কীর্তির কথা মনে রাখার জন্যে এই বাংলা সংবাদপত্রখানা রেখে দিয়েছি, প্রয়োজন হলে আপনি এটা নিতেও পারেন।

মিঃ বটব্যাল বললেন, এই রকম একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে জেনারেল ওয়ার্ডে রাখা একেবারেই ঠিক হয়নি। রীতিমতো পাহারা দেওয়া উচিত ছিল।

মিঃ বাসু বললেন, আমি বারবার সিকিউরিটির কথা বলেছিলাম কিন্তু মিঃ সেনের দাদা প্রতাপ সেন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসার। তিনি ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যে সিকিউরিটি রাখতে বারণ করেছিলেন। সেই গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্যে পেশেন্ট কার্ডে রাঘব সেনের নাম পাল্টে দেওয়া হয়েছিল।

মিঃ বটব্যাল সব কিছু শোনার পর বললেন, কাল রাতে আপনাদের গেট ডিউটিতে যে দারোয়ান ছিল তাকে পাওয়া যাবে?

মিঃ বাসু বললেন, এক্ষুণি ডেকে পাঠাচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরে একজন হিন্দুস্তানি লোক এসে মিঃ বাসুকে সেলাম জানিয়ে বললো, হুজুর আমায় তলব করেছেন?

মিঃ বাসু বললেন, পুলিশ সাহেব তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করবেন। যা জানো সত্যি বলবে।

ভজন সিং বললো, জী সরকার।

মিঃ বটব্যাল ভজন সিংকে বললেন, কাল রাতে তুমি কি ডিউটিতে ছিলে?

ভজন সিং বললো, জী সরকার।

মিঃ বটব্যাল বললেন, কাল রাতে হাসপাতালের মধ্যে কোনো গাড়ি ঢুকেছিল কি?

ভজন সিং বললো, ভারী রাতে হাসপাতালের ঘড়িমে দো বাজবার পর একটা গাড়ি এসে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ি থেকে দুজন আদমী নেমে এসে বললো গেট খুলে দিতে। আমি গেট খুললাম না। তখন আর এক আদমী গাড়ি থেকে নেমে এসে বললো, হাসপাতাল থেকে জরুরি ফোন গেছে বলেই তারা এসেছে। রুগীর অবস্থা খুবই খারাপ। দেখলাম রহিস আদামী, অউর এতনা রাতমে গাড়ি ভি লিয়ে এসে ঝুটবাত ভি কাহে বোলেগা। পুছলাম কোন ওয়ার্ডে রুগী আছে? ওরা বললো জেনারেল ওয়ার্ডমে। গেট খুলিয়ে দিলম।

মিঃ বাসু বললেন, কতক্ষণ পরে তারা চলে গেছে জানো?

ভজন সিং বললো, জরুর। হাসপাতালের ঘড়িতে আড়াই বাজনে কো আওয়াজ ভি মিলা। উলোক মেনগেট সে বহুৎ জোর সে নিকাল গিয়া।

মিঃ বটব্যাল বললেন, গাড়ির মধ্যে কোনো রুগী ছিল?

ভজন সিং বললো, হাঁ জী দেখা। একটো বিমার আদমী মালুম হোতা শুয়া থা।

মিঃ বটব্যাল বললেন, তুমি তাদের দেখলে চিনতে পারবে?

ভজন সিং বললো, জরুর।

পিজি হাসপাতাল থেকে বেতার ভ্যানের আহত ড্রাইভারকে পুলিশ হাসপাতালে পাঠাবার সবরকম ব্যবস্থা করে লালবাজারে এসে মিঃ বটব্যাল সমস্ত রিপোর্ট ওপর মহলে পাঠিয়ে দিলেন।

কমিশনার অফ পুলিশ, ইন্সপেক্টর জেনারেল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের অফিসাররা গোপন বৈঠকে বসে ঠিক করলেন যে সংবাদটা যাতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হয় সর্বপ্রথম সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। মিঃ রাঘব সেনকে উদ্ধার করার একটা ছকও তৈরি হলো। এছাড়া প্রতিটি বন্দর, রেলওয়ে স্টেশন ও ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা বিমান বন্দরের উচ্চ মহলেও ঘটনাটা জানিয়ে দিয়ে অ্যালার্ট করে দেওয়া হলো।

এগিয়ে চলেছে জাহাজ পেঙ্গুইন তার নিজস্ব গতিতে কিন্তু নাম পাল্টে জাহাজের নাম হয়েছে 'সি বেস্ট'। বৈজ্ঞানিক সেনের আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি নেই। কেবিনেই তাঁর রক্তের চাপ ও অন্যান্য শারীরিক ত্রুটিগুলো জাহাজেরই ডাক্তার চেক আপ করেছেন। মিঃ সেনের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যেতেই তিনি বুঝতে পারলেন যে হাসপাতালের পরিবর্তে তিনি একটি চলন্ত জাহাজে শুয়ে আছেন এবং সামনেই একজন লোক তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে জাহাজ। রেডিও অপারেটার জাহাজে আসা মেসেজের জবাবে বারবার বলছে, এটা পেঙ্গুইন নয়, এই জাহাজের নাম সি বেস্ট। জাহাজের ক্যাপটেন মিঃ ফিলিপস ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। মাঝে-মধ্যে বায়নাকুলারে চোখ লাগিয়ে চারদিকটা একবার ভাল করে দেখে নিচ্ছেন। সন্ধ্যে হতে এখনো দেরি। তাঁর চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ।

বোম্বে, মাদ্রাজ, ওড়িশা এবং পোর্টব্লেয়ারের বন্দর উপকূলের পুলিশ দপ্তরে ইথারে কেবলই ভেসে আসছে পেঙ্গুইন জাহাজের কিছু সংবাদ আছে কি না। সি. আই. ডি ডিপার্টমেন্টের মিঃ অমিত কুমার

একটা ছোট্ট স্পীড বোট নিয়ে চোখে দূরবীন লাগিয়ে সাগরের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন উন্মাদের মতো। তাঁর মতো দক্ষ লোকও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ব্যাপারটা নিয়ে। বিদেশী একটা জাহাজ ভারতবর্ষ থেকে একজন দক্ষ বৈজ্ঞানিককে ধরে নিয়ে নাকের ডগা দিয়ে পালিয়ে যাবে, সেটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

গভীর রাত। সি বেস্ট (ওরফে পেঙ্গুইন) জাহাজ স্পীড কমিয়ে দিয়ে পোর্টব্লেয়ারের দিকে এগিয়ে চলেছে, এমন সময় ট্রান্সমিটার মারফৎ শোনা গেল, লিংওয়ার্থ স্পিকিং ফ্রম জিরো এইট্টি সেভেন—কাজ হয়েছে? মিঃ বুশ আছেন, তাঁকে কথা বলতে বলুন।

অপারেটার লাইনটা মিঃ বুশকে দিয়ে বললো, স্যার মিঃ লিংওয়ার্থ কথা বলতে চাইছেন।

মিঃ বুশ রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললেন, বুশ স্পিকিং ফ্রম জিরো এইট্টি।

মিঃ লিংওয়ার্থ বললেন, কাজ হয়েছে কি?

মিঃ বুশ বললেন, ইয়েস স্যার। গানি ব্যাগ স্লিপিং নাউ, হি ইজ আন্ডার সিডেটিড।

মিঃ লিংওয়ার্থ বললেন, পোর্টব্লেয়ার ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। খুব সতর্ক হয়ে কাজ করবে। ভারত সরকারের ইন্টালিজেন্স বিভাগ খুবই শক্তিশালী। ওরা ভীষণ তৎপর হয়ে উঠেছে গানি ব্যাগকে উদ্ধার করতে। যে কোনো উপায়েই হোক, আজ শেষ রাতে স্পিডি চেম্বারে করে গানি ব্যাগকে পাঠিয়ে দাও, আমরা রিসিভ করে নেবো। খুব সাবধানে কাজ করবে। গানি ব্যাগকে ডেসপ্যাচ করে জাহাজকে পোর্টে লাগিয়ে দিয়ে, পারমিট দেখিয়ে মাল তুলবে। পারমিটেও সি বেস্ট লেখা আছে। বেস্ট অফ লাক।

মিঃ অমিত কুমারের শক্তিশালী ট্রান্সমিটার সি বেস্ট জাহাজের বুশ ও লিংওয়ার্থের মধ্যে যা আলোচনা হয়েছিল সমস্তটাই টেপ করে ফেললো। অমিত কুমার এইটাই আশা করেছিলেন। নৌবাহিনীর দপ্তরকে তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপ জানিয়ে দিয়ে স্পীড বোটের সবাইকে তিনি সজাগ করে দিলেন। হাতঘড়িতে সময়টা একবার দেখে নিয়ে বুঝলেন, শেষ রাত শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। স্পীড বোটের তীব্র সার্চলাইটটা নিভিয়ে দিয়ে চোখ-কান খোলা রাখলেন সকলে।

সি বেস্ট জাহাজের কেবিনে তৎপরতার সঙ্গে মিঃ রাঘব সেনকে পাচার করার ব্যবস্থা চলছে। তাঁকে আবার স্লিপিং ড্রাগ দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে। ক্যামোফ্লেজ করা সাবমেরিনও প্রস্তুত।

রাঘব সেনকে যখন সাবমেরিনে তোলা হচ্ছে তখন অমিত কুমারের স্পীড বোটের মাথায় জ্বলে উঠলো একটা নীল আলো। সঙ্গে সঙ্গে পোর্টব্লেয়ার বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা নৌবাহিনীর জাহাজেও জ্বলে উঠলো নীল আলো। এরপরই অমিত কুমারের স্পীড বোট এবং নৌবাহিনীর চারখানা জাহাজ তীব্র সার্চলাইট জ্বেলে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল সি বেস্টকে লক্ষ্য করে। সি বেস্টের লোকেরা কিছু বোঝবার আগেই অমিত কুমারের নেতৃত্বে জাহাজটাকে যখন ঘিরে ফেলা হলো তখন ছোট্ট সাবমেরিনটা জল ছুঁই ছুঁই করছে।

সি বেস্ট জাহাজের ক্যাপটেন সহ প্রায় জনা চল্লিশ লোক ধরা পড়লো। বৈজ্ঞানিক রাঘব সেনকে উদ্ধার করার সংবাদটা স্বরাষ্ট্র দপ্তরে পৌঁছলে সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। শুধুমাত্র ইথারে ভেসে আসা আলোচনাকে শক্তিশালী ট্রান্সমিটার টেপ করতে পেরেছিল বলেই বৈজ্ঞানিক রাঘব সেনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। ভারত সরকারের দেওয়া পুরস্কার গ্রহণ করার সময় অমিত কুমার সাংবাদিকদের এই কথাই বলেছিলেন। তারপর থেকে বৈজ্ঞানিক সেনকে ঘিরে থাকতো ভারতবর্ষের বিখ্যাত ইন্টালিজেন্স ব্রাঞ্চের কম্যান্ডোরা।

[ভাদ্র ১৪০৪]

বিল্লু-মিমি-কাকাতুয়া

মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়

বিল্লুদাদা, তুই যতই ডিটেকটিভগিরি করিস না কেন, পাখিটার কাছে তুই হেরে গেছিস। ছোট বোন মিমি বিল্লুকে খ্যাপাতে লাগল।

পাখি মানে তোর ওই বদখদ কাকাতুয়াটা তো? একদিন দেখিস ওর মাথার ঝুঁটি উপড়ে দেব।

পারবিই না। ওকে ধরতে গেলেই তোকে আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দেবে। তারপর বিলু বিলু করে চেঁচাবে, সকলে ছুটে যাবে।

বাস্তবিক তাই-ই। কোলকাতায় পিসির সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউর বাড়ির একতলায় হীরালালবাবুর পাখির দোকানের কাকাতুয়াটাকে দেখার পর থেকে মিমি বায়না ধরেছিল ওকে একটা সাদা আর গোলাপী পালকওয়ালা কাকাতুয়া কিনে দিতে হবে। সে প্রায় বছর চারেক আগের কথা। বিল্লু আর মিমির বাবা সুজয় দত্ত বলেছিলেন যদি মিমি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠতে পারে তবেই একটা কাকাতুয়া পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে। এই বছরে মিমি ফার্স্ট হয়ে ক্লাস এইটে উঠেছে। সুজয় দত্ত সত্যিই একটা কাকাতুয়া কিনে ফেললেন। কাকাতুয়াটা কিনতে অনেক খরচ হলো। ওদের মা সুমিত্রা ভয়ানক রাগারাগি করেছিলেন, কিন্তু ধোপে টেকেনি। মিমি কাকাতুয়াটার নাম রাখল পিঙ্কি।

কাকাতুয়াটা বাচ্চা। তাকে বশে আনতে মিমির কম মেহনত হয়নি। বিল্লু যখনই বাড়ির বাইরে যেত পিঙ্কি বলে উঠত, 'বিলু পালাল।' মিমি শিখিয়েছে 'বিল্লু পালাল' বলতে। পিঙ্কি 'বিল্লু' বলতে পারত না—বলতো 'বিলু'। বিল্লুদের পাটনার ব্যাঙ্ক রোডের বাড়ির সামনের বারান্দায় পাখিটার খাঁচা ঝোলানো থাকে—বাড়ির গেটের একেবারে মুখোমুখি। বিল্লুকে দেখতে পাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই কাকাতুয়ার। ফলে বিল্লুর আর লুকিয়ে বাড়ি ফেরার উপায় রইল না। চুপিচুপি যে সাইকেলটাকে নিয়ে টুক করে বাড়িতে ঢুকে পড়বে তারও আর উপায় রইল না। সাইকেলের বেলটা পর্যন্ত কাকাতুয়াটা মুখস্থ করে ফেলেছে। এক্কেবারে পাজির পাঝাড়া পাখি। বিল্লুর ভারি রাগ মিমির ওপরে আর কাকাতুয়াটার ওপরে। পারলে কাকাতুয়াটার ঝুঁটি আর মিমির বিনুনি বড় কাঁচি দিয়ে একই সঙ্গে কেটে ফেলে। মাঝে মাঝে শাসায় মিমিকে। মিমি কেয়ারও করে না।

একদিন বাড়িতে হইচই পড়ে গেল। সকালে উঠে দেখা গেল কাকাতুয়াটা খাঁচাসমেত উধাও হয়ে গেছে। মিমি কান্নাকাটি শুরু করল। ও বিল্লুকেই ধরল যে সে পাখিটাকে কোথায় পাচার করে দিয়েছে। তবে মিমি ছাড়া বিল্লুকে আর কেউ দায়ী সাব্যস্ত করেনি। শেষে মিমিই বললে, বিল্লুদা, তুই যদি ওটাকে না পাচার করে থাকিস তবে তোর ডিটেকটিভগিরির কেরামতিটা দেখা না একবার। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে রে। পিঙ্কির এখন ব্রেকফাস্টের সময়, হয়তো খিদে পেয়েছে। ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল মিমি। মুখ ভেঙচে বিল্লু বললে, ব্রেকফাস্ট না হাতি, আপদ গেছে বাঁচা গেছে।

বিল্লুর কাকা অজয় দত্ত বিল্লুকে ডাকলেন কোতোয়ালীতে যাবেন বলে। একটা ডায়েরি করতে হবে। বিল্লু চলল কাকার সঙ্গে কোতোয়ালীতে। ও.সি. মিঃ সহায় বললেন, কি বিল্লুবাবু, তুমি পারবে না বোনের পাখিটাকে খুঁজে বার করতে? বিল্লুর মেজাজ গরম হয়ে গেল। মিমি ওকে কম হেনস্থা করেছে! তারপর বাড়িসুদ্ধু লোক যেন ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ডিটেকটিভ ডিটেকটিভ বলে। খালি বিদ্রূপ—ভালো কথা কেউ বলে না। ও কোথা থেকে পাখি খুঁজবে? পাখি যদি পাখা মেলে আকাশে উড়ে যায়, সে কি হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে পাখি খুঁজতে বেরোবে?

বাড়ি ফিরে এসে বিল্লু গোঁজ হয়ে বসে রইল। মন কেমনও করছে পাখিটার জন্যে। সত্যি তো আর কাকাতুয়া আকাশে উড়ে যায়নি। তাহলে গেল কোথায়? চারটের সময় স্কুল থেকে ফিরে বিল্লু খাওয়া-দাওয়া করে বেরোল। বাড়িতে বলে গেল রণধীরদের বাড়িতে যাচ্ছে। সাইকেল নিয়েই বেরোল। আজ আর কেউ 'বিলু পালাল' বলে চ্যাঁচাল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল আরও।

বেরোবার আগে মিমি ওকে অনেক সাধ্যসাধনা করেছে। তুই পিঙ্কিকে খুঁজে দে বিল্লুদা লক্ষ্মীটি। অন গড আমি তোর কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

তোর গডের নিকুচি করেছে। আমার আফসোস থেকে গেল ব্যাটার ঝুঁটিটা কাটা হলো না। যাকগে চোরেরই লাভ হলো—ঝুঁটিসুদ্ধু কাকাতুয়াটা পেয়ে গেছে।

বিল্লু কিন্তু মোটেই রণধীরদের বাড়ি গেল না। বাবা দাম না বললেও বিল্লু ভালোভাবেই জানে কাকাতুয়াটা অত্যন্ত দামী। চার বছর আগে যখন পিসির বাড়ি গিয়ে ও পাখির দোকানে কাজ নিয়েছিল, আর যে কাকাতুয়াটা ওদের নাজেহাল করে ছেড়েছিল তখনই তার দাম ছিল আটশো টাকা। এখন তো আরও বেশি। বিল্লু মনে মনে হিসেব করে নিয়েছে—

এক নম্বর—কাকাতুয়াটা রাস্তার দিকের বারান্দায় ঝোলানো থাকতো। সুতরাং পথচারীরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। কাকাতুয়াটা লোভনীয় বটে। গায়ে সাদা আর হালকা গোলাপী পালক। সকালের রোদ লেগে ঝলমল করে। রাত্তিরে পুবদিকের বারান্দায় ঢাকা জায়গায় রাখা হতো। অবশ্য সেখানে বাইরের লোকের নিমগাছ বেয়ে দোতলায় এসে চুরি করে নিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। খাঁচার ওপর কাপড় ঢাকা ছিল। পিঙ্কি বেচারা বুঝতেও পারেনি যে ওকে চুরি করে কেউ নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে চেঁচাত।

দু'নম্বর—বিল্লুদের বাড়ি পেরিয়ে যে সব ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা যাতায়াত করেন তাঁরা বেশির ভাগই এই পাড়ার মানে ব্যাঙ্ক রোডের বাসিন্দা। এ পাড়ার লোকেরা সকলেই প্রচণ্ড ধনী। এঁদের বাদ দেওয়া যেতে পারে। তাঁরা কেউই রাত্তির বেলায় পাখি চুরি করতে গাছ বেয়ে ওপরে উঠবেন না। বাকি রইল নিম্নশ্রেণীর লোকেরা। ব্যাঙ্ক রোডের পশ্চিম প্রান্তে এক সঙ্কীর্ণ গলি দক্ষিণমুখো এগিয়ে গিয়ে ডাইনে মোচড় মেড়ে আবার ডাইনে বেঁকে বাঁদিকে হেলে গিয়ে পশ্চিমমুখো গিয়ে একেবারে বড় রাস্তায় অর্থাৎ বুদ্ধমার্গে পড়েছে। চোর সেখানকার বাসিন্দা হতে পারে। কেননা তাদেরই বেশি আনাগোনা ব্যাঙ্ক রোড দিয়ে।

তিন নম্বর—পাখি খুঁজতে হলে তাকে এখনই বেরোতে হবে। কেননা পাখিচোর গত রাত্তিরে পাখিটা নিয়ে গেলেও বিক্রি করার সুযোগ হয়তো পায়নি। দিনের আলো যতক্ষণ থাকবে কাকাতুয়াটাকে বার করলে সহজেই দেখা যাবে। অবশ্য যদি গত রাত্তিরেই হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে থাকে তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।

রাস্তায় বেরিয়ে বিল্লু নিজের সাইকেলের ঘন্টি বাজাতে বাজাতে চলল পুবমুখো গান্ধী ময়দানের দিকে। কিন্তু অতদূর না এগিয়ে বাঁদিকে গিয়ে আবার বাঁদিকে—গোলঘরের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পড়ল এসে বুদ্ধমার্গে। জোরে জোরে ঘন্টি বাজাতে লাগল। একটু এগিয়ে বাঁদিকের গলিটায় ঢুকে পড়ল। যে গলিটার আরেকটা মুখ ব্যাঙ্ক রোডে। টিউবয়েল পেরিয়ে খুব আস্তে সাইকেল চালাতে লাগল বিল্লু। সাড়া মিলল এবার। ডানদিকের একটা বন্ধ ঘর থেকে সাড়া এল—'এখানে, এখানে, এখানে।' বিল্লু আরও একবার বেল বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া এল—'এখানে, এখানে, এখানে।' বিল্লু কিন্তু কোনোরকম সাড়াশব্দ না দিয়ে সাইকেল ঘুরিয়ে আবার বুদ্ধমার্গের দিকে জোরে চালাল। থামল এসে একেবারে কোতোয়ালীতে।

নভেম্বরে গোড়ার দিকে এখন। সুতরাং সন্ধ্যেটা তাড়াতাড়ি এসে পড়ে। সন্ধ্যে ছটা নাগাদ বিল্লু কোতোয়ালীতে এসে মিঃ সহায়ের খোঁজ করতে গিয়ে সহজেই পেয়ে গেল। মিঃ সহায় অবাক বিল্লুকে দেখে।

কি ব্যাপার?

আঙ্কল যত তাড়াতাড়ি পারেন আমার সঙ্গে দু'একজন সিপাই দিন। পাখিটার খোঁজ হয়তো পেয়েছি।

কি করে বুঝলে?

সাইকেলের বেল বাজিয়ে। কিন্তু আঙ্কেল পরে বলছি। দেরি হয়ে গেলে মনে হয় কাকাতুয়া আবার হারিয়ে যাবে।

একটা কেসে এক ট্রাক সিপাই বেরিয়ে গেছে। লগন আর পরমেশ্বর দুজনকে নিতে পার।

দুই ষণ্ডামার্কা সিপাই বিল্লুর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন মিঃ সহায়। বিল্লু সাইকেলটা কোতোয়ালীতে জমা রেখে সিপাই দুজনকে বললে ওর থেকে বেশ খানিকটা তফাৎ রেখে হাঁটতে।

বিল্লু হনহন করে হাঁটছে, প্লেন ড্রেসে সিপাইরা অল্প দূরত্ব রেখে বিল্লুকে অনুসরণ করছে। বুদ্ধমার্গ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাঁদিকের গলিটায় ঢুকে পড়ল বিল্লু। খানিক এগিয়ে গিয়ে টিউবওয়েলটার কাছে চোখে পড়ল কিছু লোক গজল্লা করছে। টিউবওয়েলটাকে পেছনে রেখে একটু এগিয়ে গিয়েই ডানদিকের দরজাটার সামনে চেঁচিয়ে ডাকল পি-ং-কি। ভেতর থেকে সাড়া এল—'এখানে এখানে এখানে।' পেছন ফিরে বিল্লু সিপাই দুজনকে হাত নেড়ে ডেকে দরজায় কড়া নাড়ল। একজন ছোকরা দরজা খুলে দাঁড়াল। বিল্লু বললে, ভেতরে আমার পাখি আছে, দিয়ে দাও।

একদম ঝুটা বাত।

বিল্লু বললে, ভালো চাও তো দাও, নয়তো তোমাকে পুলিশে যেতে হবে।

চোখ পাকিয়ে ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল, কভি নেহি দুঙ্গা।

ততক্ষণে বিল্লুর গলা পেয়ে কাকাতুয়া চেঁচিয়ে উঠল—'বিলু বিলু বিলু'। সিপাই দুজনও এসে পড়ল। টিউবওয়েলের কাছের লোকজনেরা এগিয়ে এসে তামাশা দেখতে লাগল। একজন ছোকরা এগিয়ে এসে বললে, আরে বিশু ভাই, ও চিড়িয়া দিয়ে দে। খামোখা মেজাজ দেখাস না।

বিল্লু ঘর পেরিয়ে উঠোনে নেমে দেখে পিঙ্কির খাঁচাটাকে একটা ময়লা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছে। কাপড়টাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিল্লু খাঁচাটাকে তুলে নিল। বিশু নামে ছোকরাকে সিপাইরা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। সকলে মিলে কোতোয়ালীতে ফিরে গেল।

হুলুস্থূল পড়ে গেছে বিল্লুদের বাড়িতে। ছেলেটা গেল কোথায়? রণধীরদের বাড়ি যাবে বলে বেরিয়েছে। অথচ ফোন করে জানা গেছে বিল্লু সেখানে নেই। মা সুমিত্রা বললেন, পিঙ্কিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে হয়তো। সুজয় দত্ত বললেন, পাখি খুঁজছে তো বলে যাবে তো? বাবু পড়াশুনো ফেলে পাখি খুঁজছেন! মিমি কিন্তু নিশ্চুপ। একমনে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছে—দাদা যেন পিঙ্কিকে নিয়ে ফিরে আসে। তা ঠাকুর কথা শুনেছে। পৌনে আটটা নাগাদ বিল্লু পিঙ্কিকে নিয়ে ফিরল।

বিল্লু মিমিকে বললে, একটা শর্তে পিঙ্কিকে ফেরত পাবি। জিজ্ঞাসু চোখে মিমি তাকিয়ে রইল। বিল্লু বললে, আমাকে নিয়ে বাজে কথা শেখাবি না।

মিমি বললে, শেখাব না, কিন্তু 'বিলু পালাল' কথাটা যে শিখে ফেলেছে। ওটা তো মুছে ফেলা যাবে না।

ওদের দিদা বললেন, তা বাপু পিঙ্কিকে ওদিককার বারান্দা থেকে সরিয়ে ফেললেই হয়।

ঠিক হলো পিঙ্কিকে সরানো হবে। মিমি অকৃতজ্ঞ নয়।

পরের দিন সক্কালবেলায় বিল্লু পড়ার সময়টা ফাঁকি মেরে কি দরকারে চুপি চুপি বার হলো। নাঃ! আর তার কোনো ভয় নেই। নির্ভয়ে গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এলো। কিন্তু রাস্তা দিয়ে পুবমুখো এগোতেই কানে এল পিঙ্কির কর্কশ কণ্ঠের মধুর ঝংকার—'বিলু পালাল, বিলু পালাল'। মিমি পিঙ্কিকে গেটের সামনের বারান্দায় না রেখে পুবদিকের দালানে রেখেছে, যেখান থেকে রাস্তাটা ভালোভাবেই দেখা যায়। বিল্লুর মুখ থেকে একটা কথাই বার হলো, বোন নয়তো রাক্কুসী, পাখি নয়তো মুখপোড়া!

[ভাদ্র ১৪০৫]

আলমারির চাবি

নির্মলেন্দু গৌতম

যে আলমারির চাবি একমাত্র অরুণ রায় ছাড়া অফিসের আর কারো কাছে নেই, সেই আলমারি থেকে মিনিট পাঁচেকের ভেতর একটা ফাইল কী করে উধাও হয়ে যেতে পারে, কিছুতেই অমল সেটা ভেবে উঠতে পারছে না।

স্থির চোখে খানিকটা সময় অরুণ রায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে অধৈর্যভাবে একটা শ্বাস নিল অমল। পা দুটো দোলাল একটু সময়। তারপর হঠাৎ অরুণ রায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'ফের একবার প্রথম থেকে পুরো ঘটনাটা আপনি আমায় বলবেন, অরুণবাবু। কেন জানি আমার মনে হচ্ছে, কোনো কথা আপনি ছেড়ে গেছেন।'

'নিশ্চয়ই বলব।' বলে মাথার চুলের ভেতর আঙুল ডুবিয়ে কী যেন ভেবে নিলেন অরুণ রায়। তারপর আরও ভালো করে এবার বলে ফেললেন পুরো ঘটনাটা।

মুন ফার্মাসিউটিক্যাল একটা নামী ওষুধ কোম্পানি। বছর পনেরো আগে ছোট একটা ওষুধ কোম্পানির চাকরি ছেড়ে নিয়ে মুন ফার্মাসিউটিক্যালে এসে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন অরুণ রায়। এখন অরুণ রায় মুন ফার্মাসিউটিক্যালের ম্যানেজার। কোম্পানির সব কাজই দেখতে হয় তাঁকে। কোম্পানির সুনাম যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য সব সময়ই চেষ্টা করে চলেছেন তিনি।

তিন দিন আগে মুন ফার্মাসিউটিক্যালের নামে দিল্লি থেকে ওষুধের মস্ত বড় একটা অর্ডার এসেছিল। প্রায় লাখ পাঁচেক টাকার ওষুধের অর্ডার ছিল সেটা। যারা অর্ডারটা দিয়েছিল, স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছিল, ঠিক পনেরো দিনের ভেতর পৌঁছে দিতে হবে অর্ডারের সমস্ত ওষুধ। নাহলে অর্ডারটা ক্যানসেল বলে ধরে নিতে হবে। অন্য কোম্পানির সঙ্গে কথা বলবে তারা। সেই কোম্পানির সঙ্গে অরুণ রায়ের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল অরুণ রায়েরই দিল্লির এক পুরোনো বন্ধু। অরুণ রায়কে সে বলেই দিয়েছিল, ওদের সঙ্গে কাজ করতে হলে ওরা যেমনভাবে বলবে, ঠিক তেমনিভাবেই কাজ করতে হবে।

গতকাল অফিসে পৌঁছেই অর্ডারটা নিয়ে কাজ শুরু করার জন্য আলমারি থেকে ফাইলটা বের করেছিলেন অরুণ রায়। ভালো করে একবার পড়ে নিয়েছিলেন অর্ডারটা। কীভাবে কী করতে হবে ঠিক করে ফেলে ফাইলটা আলমারিতে ফের তুলে রেখে নিজের হাতে আলমারিতে চাবি দিয়েছিলেন। তারপর চাবিটা পকেটে রেখে অ্যাকাউন্টস ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিলেন অর্ডারটা নিয়ে কিছু দরকারি কথা বলতে।

ঠিক পাঁচ মিনিট তার সঙ্গে কথা বলে ফের নিজের ঘরে ফিরে এসেছিলেন অরুণ রায়।

সুনীল নামে যে ছেলেটি অফিসে অরুণ রায়ের কাজকর্ম করে, অরুণ রায় ঘরে ফিরে এসে বসতেই সে বলেছিল, তিনি বেরিয়ে যাবার পরই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর একজন বন্ধু এসেছিলেন। এই ঘরেই সে বন্ধুকে বসিয়েছিল সুনীল। একটু পরেই তিনি বেরিয়ে এসে বাইরে বসে থাকা সুনীলকে বলেছিলেন, অরুণ রায়ের যখন দেরি হচ্ছে, তখন একটুখানি ঘুরে আসছেন তিনি। বলেই তিনি চলে গিয়েছিলেন।

না, অরুণ রায়ের সেই বন্ধু আর আসেনি। কাজে ডুবে গিয়ে তার কথা প্রায় ভুলেও গিয়েছিলেন অরুণ রায়।

স্টোর থেকে ওষুধ নিয়ে কথা বলতে ঠিক একঘন্টা পর এসেছিলেন স্টোরকিপার পরিতোষবাবু। ফাইলটা দরকার হয়েছিল তখন। নিজেই উঠে গিয়ে আলমারি থেকে ফাইলটা বের করবার জন্য পকেট থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুলেছিলেন অরুণ রায়। খুলেই লাফিয়ে উঠেছিলেন।

ফাইলটা যেখানে রেখেছিলেন, সেখানে নেই!

গোটা আলমারি তোলপাড় করেও ফাইলটাকে আর খুঁজে পাননি অরুণ রায়।

মুন ফার্মাসিউটিক্যালের কাছে অর্ডারটা বড় কথা নয়, বড় কথা ফাইলটা হারানোয় ফার্মাসিউটিক্যালের সুনাম নষ্ট হওয়া। না, এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না।

পুলিশে যাবার কথা একবার ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পুলিশে যাননি। কারণ, পুলিশ এসে প্রথমেই সন্দেহ করবে অফিসের লোকজনকে। কখনোই সেটা তিনি মেনে নিতে পারবেন না।

কোথায় যেতে পারে ফাইলটা সেটা ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত সেই বন্ধুর কথাটা মনে হয়েছিল অরুণ রায়ের। অ্যাকাউন্টস ম্যানেজারের ঘরে যাবার পর একমাত্র তাঁর সেই বন্ধু ছাড়া আর কেউ এ ঘরে ঢোকেনি। অ্যাকাউন্টস ম্যানেজারের ঘর থেকে ফিরে এসে স্টোরকিপার পরিতোষবাবুর আসা পর্যন্ত তিনিও ওঠেননি তাঁর চেয়ার থেকে। কাজেই সন্দেহ করতে হলে সেই বন্ধুকেই সন্দেহ করতে হয়। কিন্তু তাকে সন্দেহ করাটা অরুণ রায়ের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। কারণ আলমারির চাবিটা কোথায় পাবে সে! না, একমাত্র চাবিঅলা ছাড়া পাঁচ মিনিটের ভেতর এভাবে কেউ এই আলমারি খুলতে পারবে না। তাছাড়া, চাবি ছাড়া কোনো কিছু দিয়ে তালা খোলা গেলেও চাবি ছাড়া কখনোই কোনো তালা বন্ধ করা যায় না। তাঁর বন্ধু যদি আলমারি খুলে কোনো কারণে ফাইলটা নিয়ে যেত, তাহলে খোলাই থাকত আলমারিটা। ঘরে ঢুকেই সেটা বুঝতে পারতেন অরুণ রায়।

ব্যাপারটা নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে অফিস।

অরুণ রায় নিজেও আর কিছু ভাবতে পারছেন না। নিজেকেই তাঁর এখন অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।

দ্বিতীয়বার পুরো ব্যাপারটা বলে অমলের দিকে ঝুঁকে পড়ে অরুণ রায় বললেন, 'না অমলবাবু, আমার যদ্দূর মনে হচ্ছে, কোনো কথাই আমি ছেড়ে যাইনি।'

'দ্বিতীয়বার আপনার কাছে পুরো ব্যাপারটা শুনে আমারও তাই মনে হচ্ছে। আপনাকে এবার কয়েকটা প্রশ্ন করব আমি। বলুন, আপনার অফিসের সেই আলমারির ডুপ্লিকেট চাবিটা কি অফিসেই থাকে?'

'না, আমার বাড়ির লকারে থাকে। অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে প্রথমেই আমি দেখে নিয়েছি, চাবিটা লকারে আছে কিনা। হ্যাঁ, চাবি লকারেই ছিল।' অরুণ রায় বললেন।

অমলের দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ 'আপনার সেই বন্ধু কি আর এসেছিল আপনার সঙ্গে দেখা করতে?'

'না, আমার সেই বন্ধু আর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি।'

অমলের তৃতীয় প্রশ্ন ঃ 'বন্ধুটি কে হতে পারে, সেটা কি ধরতে পেরেছেন?'

অমলের প্রশ্নটা শুনে দু'মুহূর্ত ভাবলেন অরুণ রায়। তারপর বললেন, 'সেই বন্ধুর চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছে সুনীল, তাতে ঠিক ধরতে পারছি না কে হতে পারে সেই বন্ধু।'

অমলের চতুর্থ প্রশ্ন ঃ 'সেই বন্ধু ফের কেন এল না, তা নিয়ে কি কিছু ভেবেছেন?'

এবার নড়ে-চড়ে বসলেন অরুণ রায়। বললেন, 'আসলে, আমার মনে হয়, ঠিকই এসেছিল সে। কিন্তু অফিসে ঢুকেই কিছু একটা গোলমাল হয়েছে বুঝতে পেরে ফিরে চলে গেছে। সত্যিই, অফিসে তখন খুবই হৈচৈ হচ্ছিল।'

'তারপর কি তার একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসা উচিত ছিল না?' পঞ্চম প্রশ্ন অমলের।

অরুণ রায় একটুখানি ভেবে বললেন, 'হয়তো সময় পায়নি। কারো কাছ থেকে হয়তো গোলমালটা কী নিয়ে, সেটা জেনে ফেলে ভয়ে আর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবার কথাটা ভাবেনি। কারণ, এলেই পুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারে।'

এবার ষষ্ঠ প্রশ্ন অমলের ঃ 'অর্ডারটা নিয়ে এখন কী ভাবছেন?'

'আর কিছু ভাববার নেই। কারণ, যারা অর্ডার দিয়েছে, তাদের কখনোই বলা যাবে না, আপনাদের অর্ডারের কাগজপত্র আমাদের আলমারি থেকে উধাও হয়ে গেছে। আপনারা ফের নতুন করে অর্ডার দিন আমাদের। অর্ডারটা ওরা সঙ্গে সঙ্গে ক্যানসেল করে দেবে। আমাদের ফার্মাসিউটিকালের সুনামও তাতে নষ্ট হবে। কাজেই আমাদের পক্ষে নিঃশব্দে থাকাটাই ঠিক। ভাববে পনেরো দিনের ভেতর আমরা গুছিয়ে অর্ডারমতো ওষুধগুলো পাঠাতে পারিনি।'

এবার প্রশ্ন না করে অমল বলল, 'কিন্তু তাতেও তো আপনাদের ফার্মাসিউটিক্যালের সুনাম অনেকটাই নষ্ট হবে।'

'আলমারি থেকে কাগজ উধাও হয়ে যাবার কথাটা জানাবার চাইতে সেটা অনেক ভালো।' অরুণ রায় বললেন খানিকটা অসহায়ভাবে।

একটু সময় চুপ করে রইল অমল। আপাতত আর কোনো প্রশ্ন মাথায় আসছে না। একবার শুধু মুন ফার্মাসিউটিক্যালের অফিসটা দেখতে যাবার কথাটা বলতে হবে। সেখানে গিয়ে কথা বলতে হবে সুনীলের সঙ্গে। দেখতে হবে আলমারিটাও।

আলমারির কথা মনে হতেই চাবির কথাটা মনে এল অমলের। অরুণ রায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আলমারির যে চাবিটা সঙ্গে নিয়ে আপনি অফিসে আসেন, সে চাবিটা একবার আমায় একদিনের জন্য কি দিতে পারেন?'

সঙ্গে সঙ্গে অরুণ রায় বললেন, 'নিশ্চয়ই দিতে পারি। তবে এই মুহূর্তে চাবিটা আমার সঙ্গে নেই। অফিসের ড্রয়ারে রেখে এসেছি। ফিরে গিয়েই চাবিটা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। আপনি ঘণ্টাখানেক আছেন তো অফিসে?'

অমল বলল, 'তা আছি।'

হাতঘড়ি দেখলেন অরুণ রায়। কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করব?'

নিশ্চয়ই চাবিটা চাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করবেন অমল রায়। মনে মনে কথাটা ভেবেই অমল বলল, 'করুন।'

'আলমারির চাবিটা হঠাৎ চাইলেন কেন বলুন তো?' একটুখানি বুঝি ঝুঁকে পড়লেন অরুণ রায়।

না, অরুণ রায়কে অমল বলল না, চাবিটা হাতে পেলেই একজন চাবিঅলার কাছে যাবে অমল। তার কাছে জানতে চেষ্টা করবে, ওরকম একটা চাবি যে তালার, সেই তালাটা চাবি ছাড়া অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করে বন্ধ করা যায় কিনা। কারণ, এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই অমলের। তালাঅলার কাছে সঠিক উত্তরটা পেলে রহস্যটা নিয়ে ভাবতে সুবিধা হবে অমলের।

হাত জোড় করে এবার উঠে দাঁড়ালেন অরুণ রায়। বললেন, 'অনেক আশা নিয়ে কিন্তু আপনার কাছে আমি এসেছি, অমলবাবু। অর্ডার হারাবার দুঃখ রহস্যটা উদ্ধার হলেই ভুলতে পারব। আমার বিশ্বাস, রহস্যটা আপনি উদ্ধার করে দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।'

কিছু না বলে শুধু হাসল অমল।

'তাহলে এবার চলি।' বলে আর দাঁড়ালেন না অরুণ রায়। বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে বসে দু'হাতে চুলগুলো পেছনে ঠেলে দিল অমল।

শুভাশিসের বন্ধু অরুণ রায়। অমলের সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়ত শুভাশিস। এখনও শুভাশিসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ আছে অমলের। গতকাল সন্ধ্যায় অরুণ রায়ের কাছে ফাইলটা অমনিভাবে

বন্ধ আলমারি থেকে উধাও হয়ে যাবার কথাটা শুনেই অরুণ রায়কে অমলের কাছে পাঠিয়েছে শুভাশিস।

কিন্তু এরকম একটা রহস্যের জট খোলা যে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, ইচ্ছে করেই সেটা অরুণ রায়কে বোঝাতে চেষ্টা করেনি অমল। কারণ, অরুণ রায় সেটা কিছুতেই বুঝতে চাইতেন না।

তবে পুরো ব্যাপারটা যে সেই ফাইলেরই জন্য, স্পষ্টই তা বুঝতে পারছে অমল। মুন ফার্মাসিউটিক্যাল অত বড় একটা অর্ডার পাক, নিশ্চয়ই কেউ একজন সেটা চাচ্ছে না। অথবা মুনের অর্ডার ক্যানসেল হয়ে গেলে তার কোম্পানি সেই অর্ডারটা পাবে, এরকম একটা ব্যবস্থা করেই কোনোভাবে সে ফাইলটা সরিয়েছে।

কিন্তু আলমারির তালা খুলে ফাইলটা নেবার পর আলমারি ফের বন্ধ করে যাবার কি কোনো দরকার ছিল? না, কোনো দরকারই ছিল না। আলমারির পাল্লা দুটো খোলা রেখেই সে চলে যেতে পারত। এরকমভাবে বন্ধ আলমারি খুলে কেউ যখন কিছু নিয়ে যায়, তখন সে খুব বেশি হলে পাল্লা ঠেলে দিয়ে যায়।

কেন জানি ব্যাপারটা হঠাৎ গোলমেলে মনে হল অমলের কাছে।

আচ্ছা, অরুণ রায়কে ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে দেবার জন্য প্ল্যান করে এটা করা হয়নি তো? আলমারির দুটো চাবি। সেই দুটো চাবিই থাকে অরুণ রায়ের কাছে। বাইরের কারো পক্ষে তার ঘরে ঢুকে আলমারি খুলে ফাইল নিয়ে যেতে হলে আলমারির একটা চাবি দরকার। নাহলে তাকে ভাঙতে হবে আলমারি। কিন্তু আলমারিটা ভাঙা ছিল না। তাছাড়া, ঘরের বাইরে বসে ছিল সুনীল। ঘরের ভেতর কোনো শব্দ হলে নিশ্চয়ই সুনীল ঢুকে পড়ত ঘরে। কাজেই আলমারিটা চাবিবন্ধ থাকলে এরকম সব যুক্তি তৈরি করে শেষ পর্যন্ত সন্দেহটা অরুণ রায়ের দিকে নিয়ে যাওয়া এমন কিছু শক্ত হবে না।

কিন্তু ফাইল সরিয়ে ফেলার ব্যাপারে অরুণ রায়কে জড়াবার কী কারণ থাকতে পারে?

একটু সময় ভেবে সেটা বের করে ফেলল অমল।

এক নম্বর কারণ ঃ অরুণ রায়ের সুনাম নষ্ট করে তাঁকে মুন ফার্মাসিউটিক্যাল থেকে কোনোভাবে সরিয়ে দেওয়া। একবার সুনাম নষ্ট হলে নিশ্চয়ই অরুণ রায় আর ম্যানেজার হিসেবে থাকবেন না মুন ফার্মাসিউটিক্যালে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ অন্য কোনো কোম্পানিকে অর্ডারটা পাইয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে কিছু পাবার জন্য অরুণ রায় ফাইলটা সরিয়েছেন, একথাটা রটিয়ে দিয়ে মুন ফার্মাসিউটিক্যালের ম্যানেজারের পদ থেকে তাঁকে সরে যেতে বাধ্য করা।

এছাড়া আরও কিছু কারণ হয়তো আছে, যে কারণগুলি এই মুহূর্তে অমলের মাথায় আসছে না।

এই প্রসঙ্গে অরুণ রায়ের যে বন্ধু দেখা করতে এসে মিনিট পাঁচেক বসে থেকে চলে গেছে, তার কথা মনে এল অমলের। সে কি সত্যিই অরুণ রায়ের বন্ধু, না ফাইলটা সরিয়ে নেবার জন্য অন্য কোনো কোম্পানির পাঠানো কোনো লোক! সুযোগ বুঝে অরুণ রায়ের ঘরে ঢুকে কাজটা শেষ করে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করেনি। অরুণ রায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ফিরেও আসেনি।

কী জানি, হয়তো তালা খোলার ব্যাপারে অসাধারণ দক্ষ লোক সে। এমন কোনো চাবি হয়তো সে তৈরি করেছে, যে চাবি দিয়ে যে কোনো তালা খোলা যায়, বন্ধও করা যায়।

ঠিক কীভাবে আর কোন দিক দিয়ে যে শুরু করবে, তা ভাবতে পারছে না অমল।

অধৈর্যভাবে বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে অমল নানান দিক থেকে ভাবতে থাকল ঘটনাটাকে।

ঘণ্টা দেড়েক পর যে লোকটি অরুণ রায়ের কাছ থেকে এসে অমলের সামনে দাঁড়াল, তাকে

দেখেই অমল বুঝতে পারল সে সুনীল। ইচ্ছে করেই তবু দু'মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমিই তো সুনীল?'

'হ্যাঁ স্যার, আমিই সুনীল।' ছোট করে হেসে বলল সুনীল। তারপর বুক পকেট থেকে কাগজের একটা প্যাকেট বের করে অমলের হাতে দিয়ে বলল, 'এর ভেতরে স্যার আলমারির চাবিটা আছে।'

প্যাকেটটা একবার দেখে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল অমল। তারপর সুনীলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আমায় বলো তো অরুণ রায়ের যে বন্ধু সেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, ফাইলটা সে-ই নিয়েছে বলে কি তোমার মনে হয়?'

দু'মুহূর্ত নিঃশব্দে কী যেন ভাবল সুনীল। ঠিক তেমনি ছোট করে হাসল। তারপর বলল, 'সেটা আমি ঠিক বলতে পারব না, স্যার। বলাটা আমার পক্ষে ঠিকও হবে না।'

'লোকটির চেহারাটা তোমার মনে আছে?' এবার প্রশ্ন করল অমল।

সুনীল বলল, 'আসলে স্যার, ঠিক দেখার মতো করে দেখিনি স্যারের বন্ধুকে। তবে তিনি যে খুব লম্বা, সেটা মনে আছে। খয়েরি রঙের একটা টাই ছিল তাঁর গলায়। তাঁর চোখে কালো রঙের একটা চশমাও ছিল।'

'সঙ্গে ব্যাগ-ট্যাগ কিছু কি ছিল?' ফের অমল প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ স্যার, একটা ব্রিফকেস ছিল তাঁর হাতে।' বলে দু'মুহূর্তের জন্য থামল সুনীল। তারপর হঠাৎ হাত জোড় করে অমলের দিকে ঝুঁকে পড়ে অসহায়ভাবে বলল, 'আপনি আমায় আর কোনো প্রশ্ন করবেন না, স্যার। বিশ্বাস করুন, এর বাইরে আমি আর কিছু বলতে পারব না।'

'ঠিক আছে আমি আর তোমায় কোনো প্রশ্ন করব না।' অমল বলল।

দু'হাত জোড় করে রেখেই এবার সুনীল বলল, 'তাহলে স্যার, আমি এখন যাব?'

'যাও। তোমার স্যারকে গিয়ে বলবে, ঠিক সময়মতো আমি তাঁকে টেলিফোন করব।'

'আচ্ছা।' বলে সুনীল আর দাঁড়াল না। প্রায় ছুটেই চলে গেল ঘর থেকে।

সুনীল চলে যেতেই কাগজের প্যাকেটটা থেকে চাবিটা বের করল অমল। সঙ্গে সঙ্গে চাবিটা থেকেই বুঝি অসম্ভব হালকা একটা গন্ধ ভেসে এল নাকে। চাবিটা নাকের সামনে তুলে ধরল অমল। হ্যাঁ, চাবিটাতেই হালকা একটা গন্ধ লেগে আছে। কেন জানি খুব চেনা চেনা গন্ধ বলেও মনে হচ্ছে গন্ধটাকে।

সাবানের গন্ধ কি?

হ্যাঁ, সাবানেরই গন্ধ। সেজন্যেই চেনা চেনা মনে হচ্ছে অমলের।

অনেকটা সময় ধরে চাবিটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল অমল। না, কোথাও সাবান লেগে থাকার কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু হালকা একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু চাবিতে সাবানের গন্ধ কেন! নিশ্চয়ই সাবান দিয়ে চাবিটা ধোয়া হয় না। বুকপকেট থেকে চাবির প্যাকেটটাকে বের করেছে সুনীল। না, সুনীলের বুকপকেটে সাবান ছিল না! বুকপকেটে সাবান নেবার কোনো প্রশ্নই নেই। কাজেই সাবানের সঙ্গেও আসেনি চাবির প্যাকেটটা। তাছাড়া, পকেটের ভেতরে কাগজের প্যাকেটে সাবান থাকলেও চাবিতে তার গন্ধ লেগে যাবে এটা হতে পারে না। কাজেই কোনোভাবেই সাবানের গন্ধ থাকা উচিত নয় চাবিটাতে।

কেন জানি অমলের মনে হল, এই সাবানের গন্ধের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অরুণ রায়ের ঘরের সেই আলমারি খোলা এবং বন্ধ করার রহস্য।

খানিকটা অধৈর্যভাবে এবার ভাবতে শুরু করল অমল।

আচ্ছা, চাবির সঙ্গে সাবানের কী সম্পর্ক থাকতে পারে?

নিজেকে নিজেই প্রশ্নটা করল অমল।

প্রশ্নটা করেই টানটান হয়ে বসল উত্তেজনায়। সাবানের ওপর ঠিকঠাক একটা চাবির ছাপ তুলে

চাবিঅলার কাছ থেকে চাবি বানিয়ে নেওয়া যায় সহজেই। তাহলে কি এই চাবিটার ছাপ তোলার জন্যে সাবান ব্যবহার করেছে কেউ! সে জন্যেই কি চাবিতে লেগে আছে সাবানের গন্ধ!

মুহূর্তে টেলিফোনটা তুলে নিল অমল। ডায়াল করল অরুণ রায়ের নম্বর।

অরুণ রায়ই ধরলেন টেলিফোনটা।

অমল কোনো ভূমিকা না করেই বলল, 'খুব তাড়াতাড়ি ভেবে বলুন, আপনি আপনার আলমারির চাবি কাকে কাকে ব্যবহার করতে দেন?'

'একমাত্র সুনীল ছাড়া আর কারো হাতে আমি আমার আলমারির চাবি দিই না। কেন আমায় এরকম একটা প্রশ্ন করলেন বলুন তো!' রীতিমতো অবাক হয়েই বললেন অরুণ রায়।

অরুণ রায়ের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ব্যস্ত গলায় অমল বলল, 'সুনীল কি ফিরেছে?'

'না, এখনো ফেরেনি।' অরুণ রায় বললেন।

'শুনুন, আপনি কোথাও বেরোবেন না। আমি আসছি।' বলেই টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল অমল। অরুণ রায়কে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না। কারণ অমল জানে, অরুণ রায়কে বলার সুযোগ দিলে অজস্র প্রশ্ন করতে শুরু করবেন তিনি। এই মুহূর্তে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অমলের পক্ষে সম্ভব নয়।

কথাটা ভাবতে ভাবতেই কাগজের প্যাকেটটাতে চাবিটা ভরে ফেলল অমল। তারপর বেরিয়ে পড়বার জন্য উঠে পড়ল।

আধঘণ্টার মধ্যেই অরুণ রায়ের অফিসে পৌঁছে গেল অমল।

অরুণ রায়ের দরজার বাইরে বসেছিল সুনীল। অমলকে দেখেই খানিকটা অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি কি স্যার কিছু ভুল করে এসেছি?'

'না না, কিছু ভুল করনি। অন্য একটা দরকারে আমি অরুণবাবুর কাছে এসেছি।' বলেই অরুণ রায়ের ঘরে ঢুকে পড়ল অমল।

অরুণ রায় কিছু বলার আগেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে অমল বলল, 'বাড়িতে ফিরে আপনার আলমারির চাবিটাকে কি আপনি সাবানের বাক্সে রাখেন?'

'সেকি, চাবি সাবানের বাক্সে রাখব কেন! বাড়িতে ফেরার পরও চাবি আমার পকেটেই থাকে। কখনোই পকেট থেকে আমি চাবিটা বের করি না।' অবাক হয়ে বললেন অরুণ রায়।

তার মানে, অমল ঠিকই ভেবেছে। সাবানের ওপর আলমারির চাবিটার একটা ছাপই নেওয়া হয়েছে।

একটু বুঝি উত্তেজিত হয়ে উঠল অমল। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আপনি একবার সুনীলকে ভেতরে আসতে বলবেন?'

অমল স্পষ্টই বুঝতে পারল, কী যেন বুঝতে চেষ্টা করেও অরুণ রায় তা বুঝে উঠতে পারলেন না। স্থির চোখে অমলের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে 'বলছি' বলে বেলটা বাজালেন।

সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরে ঢুকল সুনীল।

অমল সুনীলের দিকে তাকাল। কীভাবে শুরু করবে, মনে মনে তা ভেবে নিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর অসম্ভব চেষ্টায় নিজেকে সহজ রেখে বলল, 'দিল্লির অর্ডারের ফাইলটা কি তুমি ওদের দিয়ে দিয়েছ?'

মুহূর্তে কথা হারিয়ে ফেলে একটা পাথরের মূর্তির মতো হয়ে গেল সুনীল।

অরুণ রায় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। অমল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সুনীলের দিকে তাকিয়ে ফের বলল, 'তুমিই যে সাবানের ওপর চাবিটার ছাপ নিয়ে সেই ছাপ থেকে চাবিঅলাকে দিয়ে একটা চাবি তৈরি করিয়ে নিয়ে এরকম একটা কাজ করেছ, সেটা কিন্তু কেউ কিছুতেই কোনোদিন ধরতে

পারত না। ভাগ্যে আমি অরুণবাবুকে চাবিটা আমায় পাঠিয়ে দিতে বলেছিলাম আর চাবিটাতে সাবানের গন্ধ পেয়ে মাথা ঘামিয়েছিলাম ব্যাপারটা নিয়ে। তোমার স্যারকে টেলিফোন করে জেনে নিয়েছিলাম, তোমাকেই শুধু আলমারির চাবিটা ব্যবহার করতে দেন তিনি। সেই সুযোগটাই তুমি চমৎকারভাবে নিয়েছ।'

না, এতটুকু নড়ল না সুনীল।

অমল ফের বলল, 'কিছুতেই যাতে কেউ তোমায় সন্দেহ করতে না পারে, সেজন্য তুমি অরুণবাবুর বন্ধুকেও এনে ফেলেছিল পাঁচ মিনিটের জন্য। শেষ পর্যন্ত অরুণবাবু কিন্তু তাকেই সন্দেহ করতেন।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অরুণ রায়। অমলের দিকে ঝুঁকে পড়ে অবাক হওয়া গলায় বললেন, 'আপনি যা বলছেন, তা কি সত্যি!'

'আপনি সেটা সুনীলকেই জিগ্যেস করে দেখুন। সুনীল যদি আপনাকে সত্যি কথাটা না বলে, তাহলে পুলিশের হাতেই তুলে দিতে হবে সুনীলকে।' বলেই সুনীলের দিকে ফিরল অমল।

এবার কাঁপতে শুরু করেছে সুনীল। উঠছে নামছে বুকটা। নিজেকেই সামলে নেবার জন্য বুঝি হাত বাড়িয়ে টেবিলটাকে ধরেছে। ঠিক কী করবে, তা বুঝি ভেবে উঠতে পারছে না।

কয়েকটা মুহূর্ত সুনীলের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ উত্তেজিতভাবে অরুণ রায় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বলতে পারলেন না। কারণ, তার আগেই দু'হাতে মুখ ঢেকে প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল সুনীল। কিছু বুঝি একটা বলতেও চাইল। গলায় আটকে গেল কথাটা।

অমল বলল, 'তোমার কোনো কথা আমরা শুনতে চাই না, সুনীল। যেভাবেই হোক, তুমি শুধু আমাদের ফাইলটা ফিরিয়ে দেবে।'

মুখের ওপর থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিল সুনীল। ভাঙা গলায় বলল, 'ফাইলটা ফিরিয়ে দিলে আমায় পুলিশে দেবেন না তো, স্যার?'

'তার মানে, ফাইলটা তোমার কাছেই আছে এখনও!' অধৈর্য গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন অরুণ রায়।

'হ্যাঁ স্যার, ফাইলটা এখনো আমার কাছেই আছে। আমার সঙ্গে এখুনি আমার বাড়িতে চলুন, ফাইলটা আমি আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। কিন্তু স্যার, পুলিশের হাতে আমায় তুলে দেবেন না বলুন!' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল সুনীল।

'ঠিক আছে, পুলিশের হাতে তোমায় তুলে দেওয়া হবে না। কিন্তু কার জন্য আর কেন তুমি সাবানের ওপরে ছাপ তুলে আলমারির চাবি তৈরি করিয়ে ফাইলটা সরিয়েছিলে, সেটা আমাদের বলতে হবে তোমায়। নিশ্চয়ই তুমি তোমার জন্য ফাইলটা সরাওনি। কী, তোমার নিজের জন্য কি তুমি ফাইলটা সরিয়েছিলে?' অমল প্রশ্ন করল।

'না স্যার, আমার জন্য আমি ফাইলটা সরাইনি স্যার। দত্ত ফার্মাউসিটিক্যাল থেকে একজন এসে আমায় বলেছিল, ফাইলটা যদি আমি ওদের হাতে তুলে দিতে পারি তাহলে ওরা আমায় ওদের কোম্পানিতে চাকরি দেবে। কিছু টাকাও দেবে সেই সঙ্গে। সাবানের ওপর ছাপ তোলার বুদ্ধিটাও ওরাই দিয়েছিল। সেই ছাপ থেকে চাবিটাও আমায় তৈরি করে এনে দিয়েছিল ওরাই। বলেছিল, স্যার বেরিয়ে যাবার পর আলমারি থেকে ফাইলটা সরিয়ে নিয়ে স্যার ফিরলেই বলতে হবে, আপনার একজন বন্ধু এসেছিল দেখা করার জন্য। আপনার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে, 'একটু ঘুরে আসছি' বলে চলে গেছে। সব সন্দেহ তাহলে তার দিকে চলে যাবে। সত্যি বলছি স্যার, প্রথমটা আমি কিছুতেই রাজি হইনি ওদের কথায়। কিন্তু এখানকার চাইতে ভালো একটা চাকরি পাবার লোভেই শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলাম। আসলে এ চাকরিটাতে আমার ঠিকঠাক চলছে না, স্যার।'

'ফাইলটা এখনও ওদের দাওনি কেন?' প্রশ্ন করল অমল।

মুহূর্তের জন্য একবার অরুণ রায়কে দেখে নিয়ে সুনীল বলল, 'কাল ওরা টাকা নিয়ে এসে

ফাইলটা নিয়ে যাবে বলেছে। চাকরিটা দেবে তিন মাস পরে। কেউ যাতে কিছুতেই আমায় কোনোভাবে সন্দেহ করতে না পারে, সেজন্যেই তিন মাস পরে চাকরিটা দেবে।'

'ঠিক আছে, তুমি এখন আমাদের তোমার বাড়িতে নিয়ে চলো। আগে আমরা সেই ফাইলটা চাই।' বলেই উঠে দাঁড়াল অমল।

অরুণ রায়ও উঠে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে।

অরুণ রায়ের দিকে তাকাল সুনীল। কী যেন ভেবে বড় করে একটা শ্বাস নিল। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে পা বাড়াল বাইরে যাবার জন্য।

দু'হাতে অমলের হাত জড়িয়ে ধরলেন অরুণ রায়। ছোট করে হাসলেন। বললেন, 'আপনি কেন গোয়েন্দা না হয়ে খবরের কাগজের রিপোর্টার হতে গেলেন বলুন তো?'

অমল হাসল, কোনো উত্তর দিল না।

[ভাদ্র ১৪১৫]

শাকুন-শাস্ত্র

কুমার মিত্র

এ গল্প যখনকার আমরা তখন ছেলেমানুষ। প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। সেই সময় আমাদের গ্রামে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে। তখন যারা ছেলেমানুষ ছিল এবং এখন প্রায়-প্রৌঢ়, তাদের অনেকেরই সে-ঘটনার কথা এখনও স্মরণে আছে। মতিউর রহমান আর তার ছেলে শামসুর, শেখ সোলেমান—এদের কথা আমিও ভুলিনি। শামসুর তো আমার সহপাঠীই ছিল। একই ক্লাশে দুজনে পড়তাম। প্রথমে হোসেনিয়া কাদেরিয়া প্রাইমারি স্কুলে, তারপর কল্যাণপুর হাই স্কুলে।

আমাদের গ্রামের নাম আমতলী। শান্ত-সুন্দর গ্রাম। আধাআধি হিন্দু-মুসলমানের বাস। কিন্তু কোনোরকম বাদ-বিসম্বাদ ছিল না। দিব্যি মিলে-মিশে বাস করত সবাই। লোকসংখ্যা হাজার পাঁচেকের মতো। বেশির ভাগই চাষী-মজুর। তবে কিছু লোক ছিল যারা ছোটখাট ব্যবসা করত কিংবা চাকরি-বাকরি করত। গাঁয়ে কোনো উত্তেজনা ছিল না। রাজনীতির ঝুটঝামেলা তখনও গাঁ-দিগরে আসর জাঁকিয়ে বসেনি। সবাই যে যার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু একটা খবরে সারা গ্রাম একদিন চঞ্চল হয়ে উঠল।

পীর মোল্লা কালী, এই নিয়ে আমতলী। লোকে বলত। সেই গ্রাম ডাকাতের গ্রাম নামে চিহ্নিত হয়ে গেল। খবর শোনা গেল মোল্লাপাড়ার সোলেমান শেষ কোথায় যেন ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। সেইসঙ্গে তার কয়েকজন শাগরেদ। সঙ্গীদের দুজন আবার বারুইপাড়ার লোক। সকলেই আমতলীর মানুষ। সোলেমান শেখকে আগে থেকেই চিনতাম। প্রকাণ্ড চেহারা, লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। হাড়ে-মাসে জড়ানো শক্তপোক্ত শরীর। দু'মণী ধানের বোঝা এক ঝাঁকুনিতে মাথায় তুলে নিতে পারত। ইয়াকুব মল্লিকের খটীর গোলদারি দোকানে মাল তোলার কাজ করত, আবার কখনও নৌকোর গুণ টানত। আমতলী থেকে নতুন হাট পর্যন্ত পাঁচ মাইল রাস্তা। মল্লিক সাহেবের মালবোঝাই প্রকাণ্ড নৌকোটাকে একাই সোলেমান মিঁয়া গাইঘাটার খাল বেয়ে গুণ টেনে নিয়ে এসেছে, এ তো অনেকেই দেখেছে। ওর পাকানো পাকানো পেশীওয়ালা ঘামঝরা বাদামী শরীরটার দিকে আমরা ছোটরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখতাম।

লোকটার অন্য গুণও ছিল। দুর্দান্ত লাঠি খেলতে পারত। আমাদের পাড়ার চৈতী গাজনে যে লাঠির কেরামতি দেখিয়েছিল তা চোখ মেলে দেখার মতোই। সে লোকটা ডাকাত হয়ে গেল, অবিশ্বাস্য! কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। ও ভিনগাঁয়ে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল—এ খবরে কোথাও ভুল ছিল না। কেননা, ওর দু'বছরের জেল হয়ে গিয়েছিল। কার কখন যে কি মতিগতি হয় বলা শক্ত।

জেল থেকে বেরোবার পর মানুষটা কেমন বদলে গেল। কোনো কিছুর পরোয়া করে না, কাউকে তোয়াক্কা করে না। যা-খুশি করে বেড়ায়। একে ধরে মারে, ওকে ধরে পেটায়। এর মুরগি ধরে নিয়ে এসে খায় তো ওর পাঁঠা কেড়ে নিয়ে এসে বন্ধুবান্ধব মিলে ভোজ লাগায়। কিছু বলতে

গেলে বলে, 'আমার যা কাজ তাতে গায়ে হিম্মৎ থাকা দরকার। পারলে আটকাক না মানুষ।'

কেউ হয়তো সাহস করে বলে, 'হিম্মৎ দরকার তো কিনে খাও।'

সোলেমান হাসে, 'কিনেই যদি খাব তো জেল খাটতে গেলাম কেন?'

এরপর আর কথা নেই। সোলেমান মিঁয়াকে আটকাতে যাবার সাহসই বা কার আছে? পারলে হাতে মাথা কাটে লোকটা। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে? মোট কথা, দিনে দিনে লোকটার অত্যাচার বেড়ে চলে। প্রতিবাদ করার সাহস হয় না কারো।

এদিকে সোলেমান মিঁয়ার সাহসটা আরো বাড়িয়ে দিলেন জোতদার রাঘব চৌধুরী। তখন অবিশ্যি জমিদারী যুগ আর নেই। চৌধুরীরা চার পুরুষ ধরে দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব চালিয়ে একেবারে শেষ দশায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ওরই মধ্যে দু'আনি শরিকের শেষ বংশধর রাঘব চৌধুরী নিজের এলেমে প্রচুর জোত-জামি করেছিলেন। জমিদার নয়, তবে জোতদার বটে। লেঠেলের দল পুষতেন। রাঘব চৌধুরী একদিন সোলেমান মিঁয়াকে ডেকে বললেন, 'তোমার লাঠিবাজি আমি দেখেছি রাজবেড়ের রথের মেলায়। রাজবেড়ে তো আমাদেরই গ্রাম, রথের মেলাও চৌধুরীদের। মানে আমারই পূর্বপুরুষরা রথের মেলা চালু করেছিলেন। আমাদের বংশের সবারই শেষ অবস্থা। শুধু আমিই টিমটিম করে জ্বলছি। নানা হ্যাপায় আছি হে। চারদিকে শত্রু। আবার জ্ঞাতিশত্রু হচ্ছে সেরা শত্রু। আমার লেঠেলের দল আছে তো জানই। তাতে তোমাকে পেলে বড় ভাল হয়। জোর বাড়ে। আসবে? তোমাকে লেঠেলদের মাতব্বর করে দোব। কারো আন্ডারে কাজ করতে হবে না।'

শোনা কথা সোলেমান নাকি মস্তো একটা সেলাম বাজিয়ে বলেছিল, 'চৌধুরী মশাইয়ের দয়ার শরীর! আমি লেঠেল নয়, ডাকাত। তবে আমার দরকার পড়লে হুজুরের দরবারে আসব বৈকি।' সোলেমানের কথার মধ্যে শ্লেষ ছিল, রাঘব চৌধুরী সেটা বোধহয় ধরতে পারেননি। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বাড়িতে ডাকাত পড়ে এবং বিস্তর সোনাদানা-টাকাকড়ি গায়েব হয়ে যায়। শোনা যায় এ-ডাকাতিও সোলেমানেরই কর্ম।

তা হোক বা না হোক, এরপর সোলেমান শেখের খাতির আরো বেড়ে গেল। সেইসঙ্গে বাড়ল ওর অত্যাচারও। যে লোক জোতদারকে গ্রাহ্য করে না, সে আর পাঁচটা লোককে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে যাবে কেন? এমন অবস্থা হলো যে গাঁয়ের রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ায়। সোলেমান চলে গেলে দম চেপে থাকা অবস্থা কাটিয়ে চলতে শুরু করে। একবার কে যেন পেছন থেকে ওকে টপকে এগিয়ে গিয়েছিল। তার সাহস দেখে রাগে লাল হয়ে সোলেমান তার মাথা থেকে তরমুজের ঝুড়িটা তুলে নিয়ে দশ হাত দূরে ছুঁড়ে দিয়েছিল। দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছিল, 'সোলেমান শেখকে দেখেও দেখিস না, তোর এত বড় সাহস?' এমনি মেজাজী ছিল লোকটা।

কিন্তু বাচ্চারা তো অতোশতো বোঝে না। বোঝে না বলে তাদের সাহসও বেশি। একদিন হয়েছে কি, বিকেলবেলা শামসুর স্কুল থেকে ফিরছে, উল্টো দিক থেকে সোলেমান শেখ কোথায় যেন যাচ্ছিল। গাঁয়ের লোক, তাই সোলেমানকে সে চিনত। অস্ফুটে সে বলে বসল, 'ব্যাটা ডাকাত।'

নিচু গলায় বললেও কথাটা কানে গিয়েছিল সোলেমানের। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি বললি, আমি ডাকাত! এই ছোঁড়া, শোন। তোর কলজে কটা রে? বাড়াবাড়ি করলে উপড়ে নোব।'

শামসুর ছাত্র হিসেবে যেমন ভাল ছিল, তেমনি ছিল মনের সাহস। একটুও ভয় না পেয়ে বুক চেতিয়ে বলল, 'ডাকাতকে ডাকাত বলব না তো কি বলব! পীর-পয়গম্বর বলব!'

ব্যস, আর যায় কোথায়! পরক্ষণেই শামসুরের হাত থেকে ছিটকে পড়ল বই-খাতা। ওর চুলের মুঠি ধরে সপাটে গালে কটা চড় কষিয়ে সোলেমান বলল, 'বড্ড বেড়ে গেছিস, না! তুই মতিউর

রহমানের ব্যাটা, তাই না! সেজন্যেই এত সাহস! শোন, তোর বাপকে গিয়ে বলবি তোদের যে পাটকিলে রঙের বকরিটা আছে, গলায় পুঁতির মালা, ওটা আমি গিয়ে নিয়ে আসব। চমৎকার খ্যাঁট হবে। তোর বাপ তো শুনি অনেকরকম বুজরুকি জানে, আশ্চর্য কিসব ক্ষমতা আছে। পারলে যেন আটকায়। যা, ভাগ। বাপকে গিয়ে সব বলবি কিন্তু।'

শামসুর কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গিয়ে সবই খুলে বলে আব্বাজানকে। সব শেষে বলে, 'লোকটা তোমাকে বুজরুক বলেছে বাপজান।' মতিউর বুড়ো মুখে কিছু বলে না, ঘন ঘন দাড়ি চোমরায়। তবে ওর চোখের দিকে তাকালে দেখা যেত সেখানে চিকুর ঝিলিক দিচ্ছে।

এই মতিউর রহমান লোকটিকে নিয়ে আমতলী গ্রামে অনেক গল্প ছিল। লোকটি বেশ রহস্যময়। ছোকরা বয়েস লোকটি একবার বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফিরল প্রায় পনেরো বছর পরে। তখন ওর চেহারাছাঁদ, হাবভাব সব বদলে গেছে। মুখে দাড়ির জঙ্গল, গলায় হিংলাজের মালা। পরনে ঢোলা জোব্বা। উর্দু বলে গড়গড় করে। কেউ বলে—ও আরব দেশে পালিয়ে গিয়েছিল, কেউ বলে ভারতেই ছিল—তবে বেদুইনদের পাল্লায় পড়ে নানা মুল্লুকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কেউ বলে তান্ত্রিকের পাল্লায় পড়ে তন্ত্রবিদ্যা শিখে এসেছে। এইসব সাত-সতেরো গল্প ওকে নিয়ে। কি হিন্দু, কি মুসলমান—সবাই তাকে রহমানচাচা বলত। তা রহমান সাহেব লোক এমনিতে মন্দ ছিল না। একটেরে বাড়িতে বউ-বাচ্চা নিয়ে একলাই থাকত। কারো সঙ্গে তেমন মেলামেশা করত না, কারো সাতে-পাঁচেও থাকত না। তবে দেখা হয়ে গেলে সবার সঙ্গেই কথাবার্তা বলত। ওর ছেলের বন্ধুরা গেলে সত্যপীরের শিরনি খেতে দিত। শামসুরের সঙ্গে গিয়ে আমরা অমন কতবার খেয়ে এসেছি। কলাপাতায় শিরনি এগিয়ে দিয়ে বলত, 'খাও বাবারা। শিরনিতে দোষ নাই। হিন্দুদের যেমন মহাপ্রসাদ, এও তেমনি।' আমরা খেতাম সানন্দে। বেশ স্বাদ। লোকটিকে আমাদের ভাল লাগত, আবার একটু ভয়ও করত। ওই যে বললাম লোকটিকে নিয়ে সম্ভব-অসম্ভব অনেকরকম গল্প ছিল—সেজন্যেই।

লোকে বলত, রহমানচাচা শাকুন-শাস্ত্র জানে। আমরা কথাটার মানে জানতাম না। পাড়ার বৃদ্ধ আচায্যিমশাইকে জিগ্যেস করেছিলাম, 'শাকুন-শাস্ত্রটা কি দাদু?'

আচায্যিমশাই পণ্ডিত মানুষ। আগে স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন, আবার পুজো-আচ্চাও করতেন। উনি বলেছিলেন, 'শাকুন-শাস্ত্র হলো পশুপক্ষীর রব দ্বারা মানুষের শুভাশুভ নির্ধারণের শাস্ত্র। এ শাস্ত্র যে জানে সে পক্ষী বা পশুর ভাষা বুঝতে পারে।'

'তাই হয় নাকি!' আমাদের অবিশ্বাস কাটতে চায় না।

'তা তো জানি না বাছারা। তবে কথাসরিৎসাগরের গল্পে একথা আছে। পূর্বকালে শাকুনিক বলে একরকম সম্প্রদায় ছিল যারা শকুনের ভাষা বুঝত। শকুনের বুঝলে শেয়ালের ভাষাই বা বোঝা যাবে না কেন?'

'বলছেন রহমানচাচা শকুন-শেয়ালের ভাষা জানে? আর সব জীবজন্তুর কথা বুঝতে পারে?'

'সেটি বলতে পারব না বাবারা। লোকে বলে। তোমরা যেমন শুনছ আমিও তেমনি শুনি।'

লোকে বলত আরো কত কি। রহমানচাচা রাতের বেলা ঘুমোয় না। রাতবিরেতে শ্মশান-মশান-গোরস্তানে ঘুরে বেড়ায়। নদীর ধারের জঙ্গলে চাচা বসে আছে আর ওর চারপাশ ঘিরে বসে আছে একরাশ শেয়াল, খটাস, রাত-পাখি। চাচার হাত থেকে তারা মাংসের টুকরো তুলে নিয়ে খাচ্ছে আর চাচা শুধু বলছে, 'খা, খা। আশ মিটিয়ে খা।' এ দৃশ্য নাকি দেখেওছে কেউ কেউ। বলতে কি, রহমান চাচাকে নিয়ে আমাদের আমতলী গ্রামে গল্প-আলোচনার শেষ ছিল না।

এহেন লোককে ঘাঁটিয়েছে সোলেমান শেখ—একথা শুনে সবাই বলল, 'শেখ মিঁয়া কাজটা ভাল করলে না। পিঁপড়ের পাখনা গজালে কি হয় সেটা ব্যাটা বোধহয় জানে না।'

জানলেই বা কি! সোলেমান শেখ কি কাউকে ডরাবার লোক? এক সন্ধ্যেয় এসে রহমানচাচার

গোয়ালঘর থেকে পাটকিলে রঙের বকরিটাকে হিড়হিড় করে বের করে নিয়ে এল। বলল, 'নিয়ে যাচ্ছি এটাকে। আটকাবে নাকি? মন্তর ঝেড়ে থামিয়ে দেবে?'

রহমানচাচার তখন কানই নেই শেখ মিঁয়ার দিকে। বাড়ির আশপাশের জঙ্গলে তখন প্রথম প্রহরের শেয়াল ডাকছিল। চাচা যেন নিজের মনেই বলতে লাগল, 'তোদের খিদে পেয়েছে বলছিস? অনেককাল নরমাংস খাসনি! খাবি, খাবি, শীগগির খাবি।' তারপর সোলেমান মিঁয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'শেয়ালগুলোর কি ইচ্ছে হয়েছে জানিস? বলছে মানুষের রক্তমাংস খাবে। তোর গতরে অনেক রক্তমাংস সোলেমান। ওদের দিয়েই তোকে খাওয়াব। তোর রেহাই নেই। আমার যে ইজ্জতে ঘা দেয় তাকে আমি রেহাই দিই না।'

একজন কমজোরী বুড়োর আস্ফালন শুনে সোলেমানের মতো লোক যা করতে পারে সে তাই করল। খ্যা-খ্যা করে হাসল, আর সর্বক্ষণ সঙ্গে যে গাঁটভরা মানুষপ্রমাণ লাঠিটা থাকে তাই দিয়ে মানুষটার পেটে খোঁচা মারল। সেইসঙ্গে বলল, 'বুজরুক বুড়ো কোথাকার। খালি কথার বাদশা।'

রহমানচাচার বোধহয় লেগেছিল। পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'এই লাঠির দাপট কোনো কাজেই লাগবে না মরণকালে। পরে বুঝবি আমার কথা।'

আর একচোট হেসে বকরিটাকে টানতে টানতে আর শিস দিতে দিতে চলে গেল সোলেমান শেখ।

গোটা গ্রাম এদিকে সিঁটিয়ে আছে। কি হয়, কি হয় ভাব। কিন্তু হবে আর কি, রহমানচাচা মরে গেল হঠাৎ। সোলেমান শেখ আর একবার হাসলে তাতে। বললে, 'বুজরুকটা তো মরেই গেল। এবার বোধহয় আসমান থেকে, না না, দোজখ থেকে আমাকে দেখে নেবে।'

এরপর ঠিক কি হয়েছিল আমরা জানি না। বড়দের মুখে শোনা কথা।

একদিন গভীর রাতে খালের ধারের বাঁধ-বরাবর বাড়ি ফিরছিল সোলেমান মিঁয়া। ওর সঙ্গে ছিল শাগরেদ মাফুজ আলি। লাঠি ছাড়া সোলেমান শেখকে ভাবাই যায় না, বিশেষ করে রাতের দিকে। হাতে তেল-পাকানো গেঁটে লাঠিটাও ছিল। ইয়াকুব মল্লিকের খটী পেরিয়ে যেই খানিকটা এগিয়েছে, অমনি একরাশ শেয়াল কাছেপিঠেই কোথায় সমস্বরে হুক্কাহুয়া করে উঠল। বাঁধের নিচে যেখানটায় রহমানচাচার বাড়ি—আওয়াজটা এল সেদিক থেকেই। রাতে তো রোজ শেয়াল ডাকেই। এ আওয়াজ সেরকম নয়। মাফুজ আলি পরে বলেছে এরকম শেয়ালের ডাক আগে বা পরে সে কখনও শোনেনি। সে এক রক্ত-হিম-করা চিৎকার।

তারপর কোত্থেকে যেন অগুনতি শেয়াল দুড়দাড় আওয়াজ করে, বনবাদাড় ভেঙে ছুটে এল আর সোলেমানকে ঘিরে দাঁড়াল। ফটফটে জ্যোৎস্নার রাত ছিল সেটা। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছিল ছোট ছোট জন্তুগুলো রাগে ফুলে উঠে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। গায়ের রোঁয়াগুলো শরীরের ওপর সোজা দাঁড়িয়ে। জিভগুলো ঝুলে লকলক করছে, ঠোঁট উল্টে গিয়ে শ্ব-দন্তগুলো ঝকঝক করছে ফিনিকফোঁটা জ্যোৎস্নায়। আর কেউ কোত্থাও নেই, অথচ কোত্থেকে যেন ভেসে আসছে একটা রক্ত-জমিয়ে-দেওয়া আদেশ, 'খা। খা। খেয়ে নে। বজ্জাতটার রক্তমাংস পেট পুরে খা।' এ আওয়াজ কার বুঝতে বাকি থাকেনি মাফুজ আলি আর সোলেমান শেখের।

সোলেমান ডাকাত বাপের ব্যাটার মতোই লড়েছিল। কিন্তু সে লড়াই মানুষের সঙ্গে হলে ফল হয়তো অন্যরকম হতো। কিন্তু ক্ষুধার্ত গোটা পঞ্চাশ জন্তুর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি সোলেমান। ওর লাঠির ঘায়ে দুটো শেয়াল ছিটকে পড়ে তো দশটা লাফিয়ে পড়ে কামড় বসায়। দরদরিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে শরীর থেকে। ও যত আর্তনাদ করে ততই কোন শূন্য থেকে ভেসে আসতে থাকে সেই আওয়াজ, 'খা, খা। পেট পুরে খা।' মাফুজ আলি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল বলে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের শেষ দিকটা দেখতে পায়নি।

পরের দিন শুধু আমতলী কেন, আশপাশের কয়েকখানা গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছিল বাঁধের ওপর। আন দশাসই মানুষটাকে চেনার জো নেই। চোখ কান নাক আর বাকি শরীরের মাংস খুবলে খুবলে খেয়ে নিয়েছে। শুধু পড়ে আছে হাড়সার একটা বিকৃত লাশ।

এ-ঘটনা পরে অনেকদিন ধরে আলোচিত হয়েছে আমতলীতে। যে যার মতো ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু কেউ রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি। মাফুজ আলি অবশ্য কসম খেয়ে বলেছে রহমানচাচা শেয়াল দিয়ে খাইয়ে দিয়েছে সোলেমান মিঁয়াকে। কিন্তু মাফুজ নেশাখোর মানুষ—তার কথা কতদূর সত্যি?

এরপর বহুকাল কেটে গেছে। শাকুন-শাস্ত্র বলে সত্যি-সত্যি কোনো শাস্ত্র আছে কিনা কিংবা মানুষ তাদের হুকুমমতো চালাতে পারে কিনা, এ প্রশ্ন অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিকে করেও কোনো জবাব পাইনি। সোলেমান শেখের মৃত্যু আজো রহস্য-যবনিকার আড়ালেই রয়ে গেছে।

[মাঘ ১৪০৬]

অপারেশন এক্স

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

সোফায় বসে সিগ্রেট ধরালো কর্নেল ব্যান্ডো। ছিপছিপে চেহারায় ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা। উজ্জ্বল চোখ দুটোয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি।

অ্যাশট্রে এগিয়ে দিয়ে পিটার হাসলো, দাদা মাস দুয়েক আগে মারা গেছেন। এয়ারফোর্সের দুর্ধর্ষ বৈমানিক ছিলেন। যুদ্ধবিমান ছিল হাতের খেলনা। হি ডায়েড আনসীন এন্ড আনসাঙ্গ। এমনই হয়। এয়ার কমোডর রনি ডিমেলোকে ভুলে গেছে ফৌজি দপ্তর। পিটারের কণ্ঠে ঘন বিষণ্ণতা, তবু আমি খুশি কর্নেল, দাদা ছিলেন আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আপনি তার খোঁজ নিতে এসেছেন। বলতে বলতে চুপ করে গেলো পিটার ডিমেলো।

ওদের বংশে ফৌজি রক্ত। রনির বাবা সানি ছিলেন বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। ঠাকুর্দা জনি ডিমেলো এয়ার ভাইস মার্শাল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্বনামধন্য অফিসার, ভিক্টোরিয়া ক্রসে সম্মানিত বায়ুসৈনিক।

সিগ্রেট নিভে গেছিল, লাইটারে ধরালো ব্যান্ডো, সঙ্গে মিষ্টি জলতরঙ্গের বাজনা। তাকিয়ে আছে পিটারের দিকে—বলিষ্ঠ চেহারা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, পরনে ড্রেসিং গাউন। চশমা খুলে সেন্টার টেবিলে রাখে পিটার, দাদার অসুখের খবর পেয়ে ছুটে এসেছি। কিন্তু ক'দিনই বা সময় পেলাম। দিন সাতেকের মধ্যে সব শেষ—কলেরায় মারা গেলেন। চেষ্টার ত্রুটি করিনি, বড় শ্বাস ফেললো, আর্মি এডুকেশন কোরে রয়েছি। লিয়েন সার্ভিসে বাইরে। গাল্ফ কান্ট্রির বিভিন্ন য়ুনিভার্সিটিতে পড়াই—সাবজেক্ট হিস্ট্রি, নেপোলিয়ন।

এসব কথা কানে ঢুকছিল না ব্যান্ডোর। কর্নেল আসলে সামরিক বিভাগের নামকরা গুপ্তচর, সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ এন্ড অ্যানালিটাক উইং 'র'তে কর্মরত। সতর্ক চোখে ঘরটা দেখছিল। বসবার ঘর যেমন হয়। সাজানো-গোছানো। সোফা সেট, লম্বা টানা কাচের আলমারি, শো-পিস। ওপরে পর পর ছবি—সামরিক পোশাকে ডিমেলো বংশের তিন পুরুষ। এখন বাবার পাশে ফটো হয়ে হাসি হাসি মুখে রনি। সামনের দেয়ালে মস্ত বড় অয়েল পেন্টিং-এ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। রনির হিরো। বাঁ দিকের দেয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যীশু, পাশে মা মেরীর প্রতিমূর্তি। ঘরে ধূপ জ্বলছিল—আবহাওয়া কেমন গম্ভীর। ডিমেলোরা বাঙালী ক্রিশ্চান—ক্যাথলিক। বারাসাত ছাড়িয়ে ডানদিকে বাঁক নিয়ে দৌড়ে গেছে টাকি রোড বাংলাদেশ বর্ডারের দিকে। এই রাস্তার পাশে একটু ভেতরে গির্জার পেছনদিকে ওদের বাড়ি। হাত-পা ছড়ানো মস্ত কম্পাউন্ড, নাম সেন্ট হেলেনা। ব্যান্ডোর চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই নির্জন দ্বীপ—যেখানে বন্দী ছিলেন পরাজিত নির্বাসিত সম্রাট। চারদিকে সমুদ্র, তীরে আছড়ে পড়ছে ঢেউ আর ঢেউ। নীল শুধু নীল। এই বাড়ির নামে নাম—সেন্ট হেলেনা। আর এখানে অ্যানুয়েল লিভে এসে মারা গেল রনি, সম্রাটের মতন। ব্যান্ডো ছবির দিকে তাকিয়ে কত কি যেন ভাবছে।

পিটার বললো, নেপোলিয়ন শুধু দাদার নয়, আমারও হিরো। শুনে খুশি হবেন গবেষণা করে একটা বই লিখেছি—'নেপোলিয়ন দ্য গ্রেট'। দেশে-বিদেশে সামরিক বিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হচ্ছে।

জানি মিঃ পিটার। রনি ছিল আমার ফার্স্ট ফ্রেন্ড, ওর মুখে বইটার কথা শুনেছি। রাশিয়া থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরেছিল। তারপরই ছুটিতে এখানে। ফি বছর আসতো। আমিও অনেকবার এই বাড়িটায় এসেছি। থেকেছি ওর সঙ্গে।

আপনিও আসতেন?

হ্যাঁ, আমি। আপনার জানার কথা নয়। বাইরে থাকতেন বেশির ভাগ। এবার অনেক বছর পর ফিরলেন। তাই না?

শূন্য দৃষ্টি পিটারের, ইয়েস কর্নেল, আট বছর।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ব্যান্ডো। রনি এ জায়গাটা মনের মতো সাজিয়েছিল। বলতো, রিটায়ার করে নিজেকে গুটিয়ে নেব সেন্ট হেলেনায়। লেখাপড়া, বই আর কুকুর নিয়ে সময় কাটাবো।

আগ্রহ বাড়ে পিটারের, কুকুর কেন?

ব্যান্ডো হাসলো, ওর পোষা কুকুরের নাম লাকি, প্রভুভক্ত ডোবারম্যান। এখানে লাকিকে নিয়েই মেতে থাকতো। ও ফিরে গেলে সকাল-বিকাল বাড়ির গেটের সামনে অপেক্ষা করতো লাকি, মাসের পর মাস। রনি ছুটিতে এলে ওর আনন্দ দেখে কে। রনি বলতো, বই, গাছগাছালি আর কুকুর মানুষের প্রকৃত বন্ধু। কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। মানুষের শত্রু মানুষ নিজে।

এবার আসল কথায় আসি। আমি এখানে এসেছি দিল্লীর নির্দেশে। আমাদের সন্দেহ রনির মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।

চমকে উঠলো পিটার, সন্দেহের কারণ?

ওর মতো দুর্ধর্ষ বৈমানিক মারা গেলে শত্রুপক্ষের লাভ, আমাদের ক্ষতি—তাই।

একথা আমিও ভেবেছিলাম কর্নেল ব্যান্ডো। গির্জার ফাদার এলবার্টের মেসেজ পেয়েই ছুটে এসেছি। কিন্তু দাদার মৃত্যু হয়েছে আন্ত্রিক রোগে। ন্যাচারাল ডেথ, ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। তবুও আমি পোস্টমর্টেম করিয়েছিলাম। জানি মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। সেই রিপোর্টেও কিছু নেই।

আমরা ফৌজি। উই ডোন্ট বিলিভ রিপোর্ট অব দ্য সিভিলিয়ন ডক্টরস, কবর থেকে ডেডবডি তুলে এনে আমরা দেখব। পোস্টমর্টেম করবেন আমাদের এ এম সির বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা।

বলেন কী! চমকে উঠলো পিটার, না ব্যান্ডো, মাটির তলা থেকে দাদার ডেডবডি—সে আমি সইতে পারবো না। কঙ্কাল হয়ে গেছে এতদিনে। মাস দুয়েক হয়ে গেল।

হাঁ, কঙ্কালটাই পরীক্ষা করব আমরা। তার ওপর আর্মি বিশেষজ্ঞরা বসিয়ে দেবেন নকল মাংসপেশী, মুখ। দেখলে মনে হবে জীবন্ত।

তাতে লাভ?

মিঃ পিটার, প্লীজ ডোন্ট গেট আপসেট। আজকাল স্বনামধন্য লোকদের কবর দেওয়ার বদলে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মৃতদেহ প্রিজার্ভ করা হচ্ছে, মিশরের মমির মতো। লেলিনের কথা নিশ্চয়ই জানেন। কাচের বাক্সে শুয়ে আছেন। মনে হয় ডাকলেই উঠে বসবেন। পুনেতে আর্মড ফোর্স মেডিক্যাল কলেজের মিউজিয়ামে রনির মতো বীরদের মমি করে রাখব আমরা, ফর ইনসপিরেশন অব ইয়ঙ্গার জেনারেশন। তাছাড়া কাচের জারে স্পেশিমেন হিসেবে থাকবে স্মৃতিস্মারক, প্রয়াত হিরোদের চুল, নখ। ভুললে চলবে না, দে গেভ দেয়ার লাইভ্স ফর আওয়ার বেটার টুমরো।

এখন ফৌজি কর্তৃপক্ষ যা ভাবছেন, একশ বছর আগে ডিমেলো পরিবার সে কথা চিন্তা করেছিল। এই যে, শো-পিসের দিকে তাকান, পর পর তিনটে কাচের জার। ভেতরে রয়েছে সামরিক পোশাক পরা পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ—সঙ্গে মাথার চুল আর নখ। রনি, বাবা, ঠাকুর্দার। কফিনে ঢোকাবার আগে স্মৃতিচিহ্ন আমরা রাখি, পারিবারিক প্রথা আমাদের।

দুঃখ লাগে পিটার, বড় মাপের মানুষগুলোর ছবি ছোট কাচের জারে—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো ব্যান্ডো। এগিয়ে গিয়ে বাজপাখির দৃষ্টিতে দেখছিল, আমি জানি মিঃ পিটার। আপনাদের ফ্যামিলি

ট্র্যাডিশনের কথা রনির কাছে শুনেছি। দেখে খুশি হলাম, রনির চুল আর নখও রয়েছে। এগুলো আমাদের দিন। সযত্নে মিউজিয়ামে রাখবো।

দীর্ঘশ্বাস পিটারের, পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন কেই বা হাতছাড়া করতে চায়, তবে যখন বলছেন নিশ্চয়ই পাবেন। তিনটে কাচের জার নামিয়ে সেন্টার টেবিলে রাখলো।

ব্রিফকেস থেকে ফাইল বার করলো ব্যান্ডো, ওপরে লেখা অপারেশন এক্স।

পিটার অবাক, অপারেশন এক্স কেন?

হো হো করে হাসলো কর্নেল, লাইটারে সিগ্রেট ধরালো, সেই টুংটাং সুরেলা আওয়াজ—এক্স মানে অজানা। রনি ডিমেলো ছিল এয়ার কমোডর, তার মৃত্যুটা আমাদের কাছে রহস্যের মতো। সেই জন্যে গোয়েন্দা বিভাগের নতুন ফাইল 'অপারেশন এক্স'।

এই ব্যাপারে আপনাকে আমিও সাহায্য করতে চাই কর্নেল সাব, আমার ফাইল আপনাকে দিচ্ছি, ভেতরে রয়েছে দাদার ডেথ সার্টিফিকেট, অসুখের বিবরণ, সঙ্গে আমার ডায়েরি। এতে পাবেন শেষ সাতদিনের কথা। আলমারি থেকে ফাইল আর ডায়েরি বার করে জারগুলোর পাশে রাখলো পিটার।

রক্তের রঙ লাল?

ডাক্তারি রিপোর্ট আর ডায়েরিতে চোখ বুলোচ্ছে ব্যান্ডো। বাকরুদ্ধ কণ্ঠস্বর পিটারের, এই মস্ত বাড়িটা আর ভালো লাগে না। দাদার স্মৃতি আমায় সর্বক্ষণ তাড়া করে বেড়ায়। এখানে আমরা মাত্র দুজন। আমি আর পরিচারক যোশেফ। আমার সিকিউরিটি কাম বডিগার্ড বলতে পারেন। গির্জার ফাদার অনুগ্রহ করে যোশেফকে দিয়েছেন। আর আছে লাকি, দাদার প্রিয় ডোবারম্যান।

লাকি! চোখ দুটোয় আনন্দ ব্যান্ডোর, সাড়াশব্দ পাচ্ছি না যে! আগে দেখলেই ছুটো আসতো, লাফ দিয়ে জড়িয়ে ধরতো।

বিমর্ষ গলা পিটারের, দাদা চলে যাবার পর খেতেই চায় না, দিনরাত বসে আছে কবরের পাশে। আমায় দেখলে তাড়া করে, দাদাকে মাটির তলায় রাখতে দিচ্ছিলো না। হয়তো ভাবে জোর করে শুইয়ে দিয়েছি, মাটি খুঁড়ে দেখতে চায়।

ব্যান্ডো নিরুত্তর। তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। এখন মে মাস। দুপুরের বাতাসে আগুনের হলকা। কিন্তু এ জায়গাটা খোলামেলা। গরমের তেজ কম। পাঁচিল ঘেরা চকচকে ঝকঝকে বাড়ি, রনির ড্রিম হাউস—সেন্ট হেলেনা। অন্যদিকে পারিবারিক সমাধিস্থল। শান বাঁধানো বেদী—পাথরের ক্রস। শিলালিপিতে পরিচয়। জন্ম-মৃত্যুর তারিখ। সামনে ফৌজি প্রথায় মাটিতে গেঁথে আছে বেয়োনেটের ফলা—উল্টানো রাইফেলের হাতলের মাথায় হেলমেট। সামরিক শোক চিহ্ন—লাস্ট স্যালুট।

কর্নেলের থমথমে গলা, এয়ার কমোডর ডিমেলোকে ভুলে গেছে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স—এ ধারণা ঠিক নয় মিঃ পিটার। মৃত্যুসংবাদ আমরা দেরিতেই পেয়েছি। কাছেই কলকাতা—কমান্ড হসপিটাল, সেখানেও নেওয়া হয়নি। যাক্‌গে বোধহয় সময় পাননি। কিন্তু মরণোত্তর সম্মান জানাবো আমরা। ডেডবডি তুলে এনে কাটা-ছেঁড়া হবে—সেটা ডাক্তারদের ব্যাপার, অপারেশন এক্স-এর একটা দিক। অপরদিকে ফৌজি কায়দায় সমাধি দেব—জোয়ানরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে উইথ 'রিভার্স আর্ম'—শূন্যে ছোঁড়া হবে গুলি, থার্টি গান স্যালুট। বিউগলে বাজবে বিদায়ের করুণ সুর, মাটি ছড়িয়ে দেবেন স্বয়ং এয়ার মার্শাল—বায়ুসেনার সর্বাধিনায়ক।

কথায় বাধা পড়লো। যোশেফ ঘরে ঢুকলো। হাতে ট্রে—কোল্ড ড্রিঙ্কস, গ্লাস। পিটার ড্রিঙ্কস গ্লাসে ঢেলে কাচের জারগুলো সরিয়ে এগিয়ে দিলো, নিন, গলা ভিজিয়ে নিন ব্যান্ডো সাহেব। বড্ড গরম। অনেকক্ষণ এসেছেন, ভালো লাগবে।

থ্যাঙ্কস্‌, গ্লাসে চুমুক দিল, ফটো সহ জারগুলো ভালো করে দেখছে, আশ্চর্য! রনির চুল এই জারে—সত্যি? ধবধবে সাদা চুল। অথচ ঘন কালো চুল ছিল ওর।

সেটাই আশ্চর্য। হঠাৎই যেন সব চুল পেকে গেছল রনিদার। এই নিন, জারটা হাতে তুলে দিল পিটার, ভালো করে দেখুন।

তাড়াহুড়োয় ভুল করেছেন পিটার সাব, এটাতে আপনার ঠাকুর্দার ছবি রয়েছে। ঘুরিয়ে দেখালো। আসল কথা মন খারাপ হলে যা হয়, ফটোটা না দেখলে আমারও ভুল হতো। এই যে এটা রনির স্মৃতিস্মারক কাচের স্পেশিমেন বাক্স, সঙ্গে ছবি। চুলগুলো পাকা—অন্য দুটোয় তা নয়—পূর্বপুরুষ দুজনের আই মিন রনির ড্যাডি এন্ড গ্র্যান্ডপার হেয়ার ব্ল্যাক। অবশ্য অল্পবয়সেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁদের। বীর যোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেন।

ব্যান্ডোর কথা শুনতে শুনতে করুণ হয়ে উঠছে পিটারের চোখ-মুখ। এবারে প্রসঙ্গান্তরে আসতে চাইলো সে, আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে, আপনি বরঞ্চ ফাইল আর আমার দেওয়া ডায়েরিটায় চোখ বুলোন। আমার লেখা এই বইটাও পড়তে পারেন। চলুন, ওপরের গেস্টরুমে, রিলাক্স করবেন।

বইটা হাতে নিল কর্নেল। ফরেন পাবলিকেশন। দুর্দান্ত গেট আপ, সুন্দর ছাপা। মিঃ পিটার, বইটার দাম কত বলুন, কিনব। রনির মুখে বইটার কথা শুনেছি।

কিনবেন কেন? একটা কপি আমি আপনাকে দিচ্ছি, উইথ কমপ্লিমেন্টস। দিন সই করে দিই, ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত দিয়ে ডট পেন বার করলো পিটার।

না, না, নীল কালিতে নয়, ব্রিফকেস খুলে একগাদা পেন মেলে ধরলো ব্যান্ডো, পেন জমানো আমার হ্যাবিট। এই নিন লাল পেন। রক্তের অক্ষরে লিখুন, জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য সৈনিকদের ধমনীতে টগবগ করে ফুটছে ফৌজি রক্ত।

হাসলো পিটার, মলাট উল্টে প্রথম পাতায় খসখস করে লিখলো কর্নেলের নাম, তলায় স্বাক্ষর—পিটার ডিমেলো।

খুশির গলা ব্যান্ডোর, দেখুন পিটার সাব, সাদা পাতায়, আই মিন হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে রেড লেটার, লাল হরফে আপনার সুন্দর সই। দারুণ কন্ট্রাস্ট, সো প্রমিনেন্ট তাই না?

হ্যাঁ, লাল কালিতে লেখা, আমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের চিহ্ন।

হঠাৎ হো হো করে উঠলো ব্যান্ডো, ধরা পড়ে গেলেন পিটার, আপনি কালার ব্লাইন্ড, রঙ চিনতে পারেন না।

ধেৎ, কী বলছেন আপনি?

ঠিকই বলেছি সাহেব, আই অ্যাম ডেফিনিট, সাদা চুল আই মিন রনির জারটা গুলিয়ে ফেলেছিলেন, ফটো দেখে সামলে নিলেন। দেখুন বই-এর পাতা, সাদা বললাম, মেনে নিলেন, ওটা কিন্তু সাদা নয়। ইচ্ছে করেই অন্য কালির পেন দিয়েছিলাম—ধরতে পারেননি। ওটা লাল নয়, কালো। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, অনেকের এরকম থাকে। বুঝতে দেয় না। খুঁত কেই বা জানাতে চায়।

পিটার চুপ।

কালার ব্লাইন্ডদের আর্মিতে নেওয়া হয় না—আপনি এডুকেশন কোরে রয়েছেন—টিচার। সিভিলিয়ান পোস্ট। আপনার ক্ষেত্রে ছাড়।

কাঁপা গলা পিটারের। ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি—কে আপনি?

পরিচয় ঠিকই দিয়েছি, আমার নিক নেম ব্যান্ডো। ফার্স্ট নেম সত্যজিৎ, সেকেন্ড নেম বন্দ্যোপাধ্যায়। খাঁটি বঙ্গ-সন্তান আপনাদেরই মতো। কর্নেল এস. জে. বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে হয়ে গেছি ব্যান্ডো।

পিটারের চোখ-মুখ শুকনো, মাই গুডনেস, আপনি সেই 'অপারেশন ঈগলের' দুর্দান্ত গোয়েন্দা! এয়ারপোর্ট হোটেলে জাল পেতে ধরেছিলেন মিসাইল বিজ্ঞানীদের হত্যাকারীকে! অভিনন্দন স্যার!

লাইটার-রহস্য এবং সংস্কৃত

ব্যান্ডোর মুখের হাসিটা কেমন যেন রহস্যময়। লাইটারের টুংটাং শব্দে সিগ্রেট ধরালো, মিঃ পিটার, একটু আগে প্রশ্ন করেছিলেন বার বার সিগ্রেট ধরাচ্ছি, দু'এক টান দিয়ে রেখে দিচ্ছি অ্যাশট্রেতে, নিভে যাচ্ছে আবার ঠোঁটে সিগ্রেট হাতে লাইটার। অবাক হয়ে গেছেন তাই না! রহস্যটা বলি।

নড়ে-চড়ে বসলো পিটার। বাইরে দুপুরের রোদ নরম হয়ে আসছে ক্রমে। পর্দা দুলিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকলো।

লাইটার জ্বাললো ব্যান্ডো, আলোর ঝলক। সঙ্গে শব্দ, বইটা সরিয়ে দাঁড় করালো ছোট টেবিলে। অপরদিকে সোফায় পিটার—ব্যগ্রতার চোখমুখ।

এবার দেখুন, আসলে এটা কিন্তু ট্রান্সমিটার, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, মিনি রেকর্ডপ্লেয়ার উইথ মাইক্রোফ্লিম। ভেতরে রয়েছে মাইক্রোটেপ, রিল। লাইটারের পেছন দিকে ছোট একটা বোতাম টিপতেই পিটারের টেপ করা কথা সব ভেসে উঠলো। ব্যান্ডো বললেন, জানেন পিটার সাহেব, লাইটারের আলোতেই প্রয়োজনীয় ছবি উঠে আসছে।

অস্ফুট কণ্ঠস্বর পিটারের, ফ্যানটাসটিক!

এবার কবজির ঢাউস হাতঘড়ির চাবিটা টান দিতেই বেরিয়ে এল অ্যান্টেনা, সঙ্গে পাতলা সরু তার, এটা মোবাইল ফোন। মাইক্রো সেট, ডায়ালের অক্ষরে চাপ দিতেই বিপ বিপ শব্দে রিং হচ্ছে কোথাও, মুখের কাছে ধরলো ঘড়িটা, ইয়েস দিস ইজ ব্যান্ডো। কোড অপারেশন এক্স। ক্যালকাটা কলিং—অ্যান্টেনার সরু তারের প্রান্তে ছোট্ট বোতাম—ইয়ার পিস। কানে গুঁজে কথা শুনছে। ভালো করে না দেখলে ধরে কার সাধ্যি! অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে কর্নেল। ভাষা বুঝতে পারছে না পিটার। তাকিয়ে রয়েছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

কী, ভাষা ধরতে পারলেন না নিশ্চয়ই, সংস্কৃতে কথা বলছিলাম।

ইউ মিন স্যান্সক্রিট। আশ্চর্য!

ইয়েস, দেবভাষা। ঘড়িতেও টেপ হয়ে গেছে। আশ্চর্য হবার কথাই বটে। নিশ্চয়ই জানেন টেররিস্ট মোকাবিলায় ইজরায়েলের নো হাউ বিশ্ববিখ্যাত। আমাদের বন্ধু দেশ। ওখানকার সামরিক দপ্তর থেকে এক সাহেব এসেছেন। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত জুড়ে সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তাণ্ডবে সরকার হিমশিম। পেছনে রয়েছে পাকিস্তানের আই. এস. আই-এর মদত। ইন্ডিয়া ইজ গোয়িং টু বি আ সুপার পাওয়ার—ওরা ভয় পাচ্ছে। ইজরায়েলের সাহেব আমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন, হাউ টু ট্যাকল্ দেম। ইংরেজি জানেন না, ওঁর ভাষা আমরাও বুঝি না। কিন্তু সংস্কৃত অনর্গল বলেন। ওখানে স্যান্সক্রিট স্কুলের পাঠ্য—আমারও প্রিয় ভাষা। কথাবার্তা সেই ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছিলো। এটা বর্ডার এরিয়া তাই। রনি সম্পর্কে অ্যাডভাইস নিলাম।

ওয়ান মিনিট প্লিজ, ঘড়িতে চাপ দিয়ে নম্বর মেলাতেই লালবাজার গোয়েন্দা সদর দপ্তর...গুড আফটার নুন কবিরুল সাহেব,...ইয়েস...কী বললেন ফ্যাক্সে বায়ুসেনার সদর দপ্তর থেকে এই মাত্তর খবর পেয়েছেন...থ্যাঙ্কস, স্টেট গভর্নমেন্ট হ্যাজ এগ্রিড ফর এক্সহিউমেশন অব ডেডবডি...নো ডিফিকাল্টি....আজ রাতেই পোস্টমর্টেম হবে। রাইট, আমি রনির চুল আর দাঁত সহ স্পেশিমেন জার পাঠিয়ে দিচ্ছি...কমান্ড হাসপাতালে...থ্যাঙ্কস মিঃ ইসলাম, ওভার।

পিটারের বিস্ময়ের কণ্ঠ, চুল আর দাঁত দিয়ে কী হবে?

জানি না, ওটা আর্মি মেডিক্যাল কোরের ব্যাপার। দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে মিলিটারি পুলিশ হ্যাজ মুভড্ অলরেডি টু কালেক্ট ইট ফর কমান্ড হসপিটাল।

সার্টিফিকেট

কথা শেষ হতে না হতেই এসে গেল স্পেশাল মেসেঞ্জার! স্পেশিমেন নিয়ে বেরিয়ে গেল ঝড়ের

গতিতে। বার বার ঘড়িতে সময় দেখছে পিটার। জিপের শব্দে জানালার পর্দা সরিয়ে দেখলো, যোশেফ স্টিয়ারিং-এ বসে। আই অ্যাম অলরেডি লেট কর্নেল, মিঃ মালহোত্রা আমার লিগাল অ্যাডভাইসার, ওয়েট করছেন। অনেক দূরের পথ। এয়ারপোর্টের কাছে, যশোর রোড, ২নং গেট। ব্যাপারটা খুলে বলি, দাদার অবর্তমানে সমস্ত পারিবারিক সম্পত্তি, জমিজিরেত আমার ঘাড়েই চেপেছে। বাজার দর প্রায় কোটি টাকা। সাক্সেসন সার্টিফিকেট বেরিয়ে গেছে কোর্ট থেকে।

নিশ্চয়ই আপনার ফেবারে।

বংশে আর যে কেউ নেই। এসব নিয়ে কি করব? না, না, এদেশে থাকার ইচ্ছে নেই। প্রমোটারদের সঙ্গে কথা হয়েছে। দাদার স্মৃতি সেন্ট হেলেনা অক্ষত থাকবে—গাছগাছালি জংলা জায়গা সাফাই করে, পুকুর বুজিয়ে তৈরি হবে রনি হাউসিং কমপ্লেক্স। মধ্যবিত্তদের জন্য খুবই কম দামে বিক্রি হবে বাড়িগুলো। থাকবে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল। ফিরে যাবার আগে ফাইনাল করে যেতে চাই।

ব্যান্ডোর কণ্ঠে হতাশা, তার মানে বিজনেস? অনেক টাকা পাবেন।

উত্তর নেই পিটারের মুখে।

প্রমোটারকে না দিয়ে ডিফেন্স মিনিস্ট্রিকে দান করে দিন। যতদূর শুনেছি রনির তাই ইচ্ছে ছিল। আমরা পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখে ফৌজি কলোনি বানাব। গাছগাছালি কাটবো না। গাছ আমাদের বন্ধু। এখানে তৈরি হবে মিলিটারি স্কুল, কম্যান্ডো ট্রেনিং সেন্টার।

ঠিক বলেছেন, আপনার কথা ভেবে দেখার মতো। আগে সাক্সেসন সার্টিফিকেট হাতে আসুক, তারপর দেখি কি করা যায়।

আবার ঘড়ি দেখলো পিটার, হর্ন দিচ্ছে যোশেফ, এক্সকিউজ মি কর্নেল সাহেব, আমি সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরব। উঠে দাঁড়ালো রনির ভাই।

ব্যান্ডো উঠলো, জাস্ট আ মিনিট প্লিজ, মিঃ ডেভিড সুরিটা সাড়ে ছটায় আসবে খবর পাঠিয়েছে। আপনার সঙ্গে দরকার, ওয়েট করবে।

চমকে উঠলো পিটার, ডেভিড, কোন ডেভিড?

আপনি চেনেন নাকি?

না, না—নিশ্চয়ই আপনাদের ফৌজি লোক।

আমিও চিনি না। তবে আপনি এখানে পৌঁছুবার আগে হপ্তা তিনেক ছিল এ বাড়িটায়। ওর কাছে রনির অনেক খবর পাবো আশা করি।

গাড়ির হর্ন আবার, পিটার উত্তরে কি বললো, বোঝা গেল না।

চটপট ড্রেস চেঞ্জ করে তিনতলা থেকে নেমে এলো। ব্যান্ডো হাত নাড়ালো, বেস্ট অব লাক মিঃ পিটার, আমিও কাজে বেরোচ্ছি। পরে দেখা হবে। জিপ বেরিয়ে যেতেই ওয়াকি টকিতে কথা বলছে ব্যান্ডো, ফ্লাইট লেফটেনান্ট কাপুর, ক্যান ইউ হিয়ার মি...ইউ আর ওয়েটিং আউটসাইড... ফলো দ্য জিপ...ছায়ার মতো লেগে থাক, ওর সঙ্গে, ওভার।

পিটার চলে যেতেই মাথায় একরাশ চিন্তা। নেপোলিয়নের ছবিটা দেখছিল। বাঁ দিকের দেয়াল আলমারির দিকে হঠাৎই নজর গেল। আগে এখানে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ভলিউমগুলো থরে থরে সাজান ছিল। রনির প্রিয় বই। কোথায় গেল? তার বদলে আলমারি ভর্তি নতুন বই—নেপোলিয়ন দ্য গ্রেট। কেন? হাতল টানলো, না—বন্ধ, চাবি দেওয়া। যে কোনো তালা খুলতে পারে কর্নেল। একটা সরু তারই যথেষ্ট। ডট পেনের রিফিল বার করে বিশেষ কায়দায় ঘোরাতেই খুলে গেল পাল্লা। একটা বইয়ের পাতা উল্টাতেই বিস্ময়ে হতবাক, সব বিদেশী টাকা—ডলার। পাতার পর পাতা উল্টে চলেছে ব্যান্ডো—খাঁজে খাঁজে ডলার আর ডলার। হাত বুলোতে মিহি পাউডারের মতো গুঁড়ো উঠে আসছে আঙুলে। পোকায় না কাটার জন্যে বিশেষ ওষুধ হয়তো। নোটের নাম্বারগুলো

মনে হচ্ছে পরিচিত—পকেটের মিনি কম্পিউটারের মেমরি চালু করতেই বেরিয়ে এল খবর। ইন্টারপোলের মেসেজ—এ সবই ব্যাঙ্ক ডাকাতির অর্থ, মিলে যাচ্ছে নম্বর। সিঙ্গাপুর লয়েড ব্যাঙ্ক থেকে লুঠ হয়ে যাওয়া ডলার।

ব্রিফকেসের রহস্য

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো ব্যান্ডো। এখন বিকেল। চারদিকে বেলা শেষের আলোয় বিষণ্ণতার ঢল। আকাশে মেঘ। এলোমেলো হাওয়ায় গাছের মাথাগুলো দুলছিল। আম, জাম, হিজল, শিরিষ, য়ুক্যালিপটাস। কবরখানার পাশে ফুটে আছে নানা রঙের মরসুমী ফল। টাটকা তাজা বাতাস সুবাসে ভরপুর। ফুলে ফুলে প্রজাপতির ওড়াউড়ি। হাওয়ায় সঙ্গীতের সুর। সব শেষ হয়ে যাবে? বিক্রি হয়ে যাবে রনির সাধের সেন্ট হেলেনা! অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক চিরে।

হঠাৎ কোথা থেকে দৌড়ে এলো লাকি। ঘাপটি মেরে লুকিয়েছিল এতক্ষণ। আগের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো, উঠে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলো। ঈশ্! কত রোগা হয়ে গেছে লাকি! মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলো কর্নেল, লাকি, মাই ডিয়ার বয়, মাই সান। লাকি মুখ ঘষছে ব্যান্ডোর বুকে, চোখ দুটোয় জল।

হাই সাটাজিত, মাই সান। কখন এলে?

এই নামে আজকাল কেউ ডাকে না। কে? চমকে পেছন ফিরে দেখে ফাদার এলবার্ট, ছেলেবেলাকার স্কুলে প্রিন্সিপাল ছিলেন, রিটায়ার করে এখানে। গির্জার পুরোহিত। সোসাইটি অব জেসুইট্সের সেন্ট ভিনসেন্ট গির্জা। ধবধবে সাদা চুল, দাড়ি এবং আলখাল্লায় চোখে-মুখে পবিত্রতার ঢল। কাঁধে ঝুলছে লম্বা সাইড ব্যাগ। বুকে লম্বা চেনের সঙ্গে ক্রস।

প্রণাম করলো ব্যান্ডো। ফাদার বললেন, গড ব্লেস ইউ মাই সান। ব্যাগ থেকে রুটি, বিস্কুট, মাংসের বাটি বার করে লাকির সামনে ধরলেন। গত বছর পাঁচেক ধরে এখানে আছি। এই বাড়িতে রোজই আসি, ঠিক বিকেলের দিকে।

গোগ্রাসে ফাদারের দেওয়া খাবার খাচ্ছে লাকি। ঘাড়ে-পিঠে হাত বুলোচ্ছেন ফাদার, জানো সাটাজিত, সারাদিন ও কিছু খায় না। রনিকে পাহারা দেয়। বসে থাকে আমার প্রতীক্ষায়। রনির সমাধিক্ষেত্রের সামনে দাঁড়ান ফাদার, বুকে ক্রস আঁকলেন, যিসাসের লকেটে হাত দিয়ে চোখ বুঁজে একটু বাদে তাকালেন, প্রার্থনা করো। প্রার্থনার একটা শক্তি রয়েছে। শুধু রনি কেন, আমি তোমাদের সবার জন্যেই প্রার্থনা করি। তুমি আর রনি দুজনেই আমার ছাত্র। ডু গুড আনটু অল। ভালোবাস, সবাইকে ভালোবাস। লাভ ইজ গড।

ফাদারের সামনে বাচ্চা ছেলে হয়ে গেছে যেন ব্যান্ডো, হাতটা ধরে মাথায় ঠেকালো, কী সৌভাগ্য আমার, আপনাকে দেখব ভাবিনি। চলুন ফাদার, ওপরে গেস্টরুমে। আপনার সামনে বসে বাইবেলের গল্প শুনব সেই আগের মতো।

ওকে জড়িয়ে ধরেছেন ফাদার, চলো মাই সান, আই লাইক মাই স্টুডেন্টস।

ফুলবাগানের মাঝ দিয়ে সুন্দর রাস্তা চলে গেছে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। কবরখানা থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছেন ফাদার, সঙ্গে ব্যান্ডো। প্রজাপতি আর ফড়িং উড়ছে ঘুরে ফিরে। ঘরে ফিরছে পাখিরা। টিয়া, চন্দনা, ফুলটুসি। য়ুক্যালিপটাস গাছের দিক থেকে একজোড়া ময়ূর ডেকে উঠলো।

হঠাৎ সামনে এসে পথ আটকাল লাকি, ফাদারের আলখাল্লা ধরে টানছে, গর্জে উঠছে বারবার, কিছু বলতে চায় বুঝি। ফাদার দাঁড়িয়ে পড়লেন, হোয়াট হ্যাপেন্ড মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, এনিথিং রঙ?

লাকি ততক্ষণে একদৌড়ে দেয়ালের কাছে বাড়ির সীমানায় পৌঁছে গেছে, চিৎকার করছে, ডেকে উঠছে বার বার, মাটি আঁচড়াচ্ছে।

ফাদার বললেন, চলো ব্যাপারটা দেখি গে। থাবার নখে মাটি সরিয়ে ফেলেছে লাকি। দুজনে পৌঁছুতে শান্ত হলো। দু'পায়ের থাবার মধ্যে একটা ব্রিফকেস, দাঁতের কামড়ে হ্যান্ডেল ধরে তুলে দেখাচ্ছে।

ব্রিফকেসের ধুলো ঝাড়ল ব্যান্ডো, বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে আছেন ফাদার, বিদেশী জিনিস, কম্বিনেশন লক। নম্বর তিনটা নয় ছটা।

ফাদার বলেন, নম্বর যার ব্রিফকেস সেই জানে। জানি না কি আছে ভেতরে? অন্য লোকের পক্ষে খোলা ইমপসিবল।

ইমপসিবল কথাটা আমার অভিধানে নেই ফাদার, হিপ পকেট থেকে পাতলা চৌকো বাক্স বার করে নম্বরগুলোর সামনে ধরলো, ক্যালকুলেটারের মতো দেখতে—মৃদু চাপ দিতেই বাক্সের পর্দায় লেখা ফুটে উঠলো 'ডাজ নট কনটেন মেটাল অর বোম্ব'—যাক্ ফাদার, নিশ্চিন্ত হলাম, কোনো বিস্ফোরক পদার্থ বা অস্ত্রশস্ত্র নেই। কিন্তু ভারী বাক্স, দেখা যাক কী আছে। চৌকো বাক্সটার নিচে চাপ দিল, বললো, কম্বিনেশন লকের নম্বরের জন্য সার্চার রোবটকে নির্দেশ দিলাম.....বাক্সের মুখটা তখন লকের দিকে, পর্দায় ফুটে উঠছে নম্বর বার বার, মুছে যাচ্ছে, কিছুক্ষণ বাদে স্থির হয়ে গেল ছটা সংখ্যা, সিক্স ডিজিট—৭৫১৮২১। যন্ত্রটা পকেটে রেখে হাসলো ব্যান্ডো, ফাদার, সার্চার ভুল করে না। এই দেখুন।

নম্বরগুলো ঘুরিয়ে সাজাতেই খুলে গেল ব্রিফকেস—নোটে ভর্তি! আমেরিকান ডলার!

ফাদার বললেন, আশ্চর্য!

আশ্চর্য হবার কিছু নেই ফাদার। এ সমস্ত ব্যাঙ্ক ডাকাতির টাকা। পিটার এখানে আসার মাস খানেক আগে বাড়িটায় রহস্যময় এক আগন্তুক এসেছিল। অস্ত্রশস্ত্রের চোরা-কারবারী, দেশের শত্রু, বিদেশী এজেন্ট। কাঁচাপাকা চুল, মুখভর্তি দাড়ির জঙ্গল। আশ্চর্য সমুদ্রনীল রঙ চোখ দুটো। কুচকুচে কালো মণি। এবার তড়ি-ঘড়ি ফিরে এসেছিল রনি, বোধহয় ওকেই ধরতে। আর্মি ইনটেলিজেন্সের খবর এদিকে কোথাও গুপ্ত অস্ত্রভাণ্ডার রয়েছে, এ কে ৪৭, রকেট লঞ্চার, মর্টার, অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্র। এটা বর্ডার এলাকা। পাচার হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ হয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, উগ্রপন্থীদের হাতে হাতে ঘুরছে।

দীর্ঘশ্বাস ফাদারের, বাড়িটার দেখাশুনা গত বছর চারেক ধরে আমিই করে আসছি। কেয়ারটেকার বলতে পারো। কেউ এলে খুলে দিই। রনির চিঠি নিয়ে একজন এসেছিল, আমি থাকতে দিয়েছিলাম। পরে শুনেছিলাম চিঠিটা জাল।

রনির মুখে আর কিছু শোনেননি ফাদার?

সময় পেল কোথায় বলার। এসেই ম্যালেরিয়া, সর্দি, কাশি, জ্বর। দিন দশেকের ভেতর ভালো না হতেই আবার অসুস্থ। আমার কাছে খবর পেয়ে পিটার এল। আশ্বস্ত হলাম। রনি সেই যে বিছানা নিল, আর উঠলো না। কঙ্কালসার চেহারা—কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

একতলার বসার ঘরের সামনে পৌঁছে গেছে দুজনে কথা বলতে বলতে। ব্যান্ডোর কাঁধে ফাদারের হাত, জানো সাটাজিত, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

একথা কেন ফাদার?

বারান্দায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরের গাছগাছালির উপর উদাস দৃষ্টি ফাদারের, রিটায়ার করে এই চার্চে এলাম, কলকাতার মতো পলিউশন নেই। টাটকা তাজা বাতাস। কেমিস্ট্রি পড়াতাম তোমাদের, মনে আছে?

ব্যান্ডো হেসে উঠলো, সেজন্যই তো কথা বলতে ভয় পাই। মনে হয় এখুনি জিজ্ঞেস করবেন নাইট্রাস অক্সাইডের কম্পোজিশন, না পারলে কান ধরে দাঁড় করিয়ে দেবেন বেঞ্চে।

ইয়েস কেমিস্ট্রি, এটম আর মলিকুলের খেলা জগতে—বছর পাঁচেকের মধ্যে দেখতে দেখতে বদলেই

গেল জায়গাটা। কাতারে কাতারে লোকজন আসছে, আসছে বর্ডার পেরিয়ে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। গাছ কেটে, পুকুর বুজিয়ে, গড়ে তুলেছে নতুন বসত। শ্যালো ওয়াটার পাম্প এবং ডিপ টিউবেল দিয়ে সেচের জন্য উঠিয়ে নিচ্ছে মাটির জল। আমি কেমিস্ট্রির লোক, বুঝতে পারি কী ভয়ঙ্কর এক সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, ফাদারের গলা কাঁপছিল, পরীক্ষা করে দেখি, এখানকার খাবার জলে আর্সেনিক বিষ। ছোট লেবরেটারি আছে আমার, রোজ পরীক্ষা করি আর চমকে উঠি।

আর্সেনিক কেন ফাদার?

প্রকৃতির প্রতিশোধ বলতে পারো। পুকুর-টুকুর বুজিয়ে, গাছ-টাছ কাটলে ভূস্তরের পরিবর্তন হয়। মাটির তলায় স্বাভাবিক খনিজ স্তরে আর্সেনিক থাকে। সবুজ বিপ্লব আর অধিক খাদ্য ফলানোর নামে বাড়ছে ক্ষেতখামার—কীটনাশক পদার্থ স্প্রে হচ্ছে। সেচের জন্য পুকুর না কেটে মানুষ তুলে নিচ্ছে পৃথিবীর সঞ্চিত জল। অনেকগুলো ডিপ টিউবেলের জল পরীক্ষা করে আর্সেনিক পেয়েছি। সরকারকে জানিয়েছিলাম। প্রথমে গা করেনি। কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যে বেশ কিছু লোক অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। হাতে-পায়ে-চামড়ায় ঘা, ক্ষতস্থানে ক্যান্সার। সুদীর্ঘকাল ধরে আর্সেনিকযুক্ত জল খেয়ে লোকজনের এই উপসর্গ। তখন টনক নড়লো। সিল করে দিয়েছে দূষিত জলের নলকূপ, কিন্তু ক্ষতি যা হবার হয়েই গেছে। আর্সেনিককে বলবো 'নীরব হত্যাকারী', চুপিসাড়ে শরীরে ঢোকে। বিষে বিষে ক্ষয়ে যায় মানুষ। এদিকে কেন, বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই এখন সেই ভয়ঙ্কর শত্রুর দাপট। মৃত্যু মনে হয় স্বাভাবিক। ধরে কার সাধ্যি! আর্সেনিকমুক্ত জল পেতে গেলে যে সব দরকারী যন্ত্রপাতি দরকার, কারখানার প্রয়োজন—তা নেই এদেশে। কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে এই আর্সেনিক—কী ভয়ঙ্কর!

ব্যান্ডোর চোখে ভাবান্তর, বলে উঠলো, সেন্ট হেলেনা, নেপোলিয়ন—এবার কমোডর রনি ডিমেলো, আর্সেনিক। মনে হয় মিল আছে ফাদার, ইংরেজরা যতই সাফাই গাক, ওরা স্লো পয়জনিং করেছিল। নেপোলিয়ন মারা গেছলেন ঐ সেঁকো বিষের জন্য।

ইউ আর কারেক্ট মাই বয়, আর্সেনিক ইজ 'ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক'। শরীরে ঢুকে যায়, বেরোতে পারে না। চুল, নখ, দাঁত আর হাড়ের কানাগালিতে আটকে যায়। বহু বছর বাদে চুল, হাড় পরীক্ষা করলেও ধরা পড়ে। মমির মতো সাদা ফ্যাকাশে হয় মৃতদেহ—সাদা চুল।

কী বলছেন ফাদার! রনির কেসটা আর্সেনিক পয়জনিং নয় তো?

নো, নো, ঝটপটই চলে গেছে রনি। দূষিত জলের আর্সেনিকে মৃত্যু হয় কিন্তু সময় লাগে অনেক অনেক বেশি।

হাতের মুঠি দৃঢ় হলো ব্যান্ডোর, কণ্ঠে উত্তেজনা, নো ফাদার, আই অ্যাম ডেফিনিট ইট্‌স আ কেস অব মার্ডার, পেছনে বিদেশী এজেন্ট। পরমাণু অস্ত্র বহনকারী বিশেষ প্লেন চালাবার দক্ষতা একমাত্র এদেশে ওরই ছিল। সেকেন্ড অ্যাটম বোম্ব টেস্ট আন্ডারগ্রাউন্ডে এ বছরই হবার কথা। পরমাণু বোমা গুপ্ত জায়গা থেকে রাজস্থানের মরুভূমির কাছে ফৌজি বিমানে ল্যান্ড করার কথা ছিল ওর, পিছিয়ে গেলাম আমরা। একটু থামলো ব্যান্ডো, সেঁকো বিষ পারদের তুলনায় চার গুণ শক্তিশালী। মারণ ডোজ, আই মিন ফ্যাটাল ডোজ অব আর্সেনিক ১২৫ মিলিগ্রাম, ঠিক বলছি তো?

আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ মাই বয়, তোমার ঠিকই মনে আছে—সেই কবে পড়িয়েছিলাম।

যদি ঐ পরিমাণ বিষ চা কিংবা কফির সঙ্গে এক চামচ মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে মৃত্যু অবধারিত—পোস্টমর্টেমে ধরা পড়বে না। রনির মতো উপসর্গে মরে যাবে যে কেউ।

রাইট মাই সান—এ কথাটা কিন্তু ভাবিনি। রনির মৃত্যু কলেরার মতো রোগে।

রহস্য নম্বর ৭৫১৮২১

নিচের ঘরে সোফায় বসে কথাবার্তা হচ্ছিলো। ফাদার এবং ব্যান্ডো। সামনে লাকি থাবা গেড়ে বসে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ঘরে আলো জ্বলছে—ধূপ পুড়ছে যিসাসের সামনে।

ফাদার বলছিলেন, তোমার কথাটা ভাবার মতো, রনির মৃত্যু সম্পর্কে যা বলছো হতেও পারে। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? পোস্টমর্টেম নর্মাল।

ফাদার, এই ফটোটা কাইন্ডলি দেখুন, চিনতে পারেন কিনা—পকেট থেকে একটা পাসপোর্ট ছবি ফাদারের দিকে এগিয়ে দিল ব্যান্ডো।

ইয়েস দ্যাট ম্যান। সেই অদ্ভুত চোখ, দাড়ি। হ্যাঁ, সেই রহস্যময় আগন্তুক, কোথায় পেলে?

যোশেফ দিয়েছে ফাদার। ও আমাদের লোক, বহুদিন ধরেই বাড়িটার দিকে নজর রাখছিল। ইন্টারপোল থেকেও এই ফটো পেয়েছি, ওর নাম ডেভিড ডিসুজা।

যোশেফ তোমাদের লোক! গোয়েন্দা! বুঝতেই পারিনি।

সোফায় বসে নেপোলিয়নের ছবিটা দেখছিল কর্নেল, ভাগ্যের কী আশ্চর্য পরিহাস—বাড়ির নাম সেন্ট হেলেনা! কেউ কেউ হয়তো ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। আজ রাত্তিরে কবর থেকে তোলা হবে রনিকে। তারিখ ৮ মে। মে মাসের এই তারিখেই পোস্টমর্টেম হয়েছিল সেই সম্রাটের—অদ্ভুত মিল, কাকতালীয় কিন্তু আশ্চর্য সত্য।

ইয়েস মাই সান, ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। ঈশ্বর করুণাময় অথচ কঠোর। যদি আর্সেনিক পয়জনিং-এ মৃত্যু হয় রনির তাহলে অপরাধী ধরা পড়বেই। প্লিজ ওয়েট।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ব্যান্ডো, ফাদার, সামনের অয়েল পেন্টিং দেখুন, নেপোলিয়ন—নিচে লেখা জন্ম ও মৃত্যু সাল, ১৭৬৯—১৮২১ এ. ডি.। ১৮২১ সালের ৭ মে মারা গেছলেন সম্রাট। তার মানে ৭।৫।১৮২১, ৭৫১৮২১—ব্রিফকেসের লকের নাম্বারটা কিন্তু তাই। অপরাধী যেই হোক, ওঁর মৃত্যু তারিখ মুখস্থ—প্রিয় নাম্বার। নিশ্চয়ই নেপোলিয়ন বিশেষজ্ঞ। ফোনের নাম্বার, জন্মতারিখ, বিবাহবার্ষিকী—এসব নম্বর আমরা ভুলি না। সেরকমভাবে কম্বিনেশন লকের অক্ষর সাজাই—ভুল যাতে না হয়।

পিটারকে সন্দেহ করতে হয় তাহলে! হি ইজ অথোরিটি রিগার্ডিং নেপোলিয়ন।

নো ফাদার, পিটার রনির নিজের ভাই। ও এ কাজ করবে না। লেট আস্ সি এন্ড ওয়েট।

ঘড়ি দেখলো ব্যান্ডো, অনুগ্রহ করে একটু বসুন ফাদার। আমি বাইরে যাচ্ছি, হেডকোয়ার্টারে মেসেজ দেব। এখন সোয়া ছটা, পিটার ফিরে আসছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে থাকুন। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে যাব। লাকি, মাই ফ্রেন্ড, ফাদারকে দেখ।

একছুটে চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় বেরিয়ে গেল ব্যান্ডো। মিশে গেলে বাইরের অন্ধকারে। জিপ এসে গেছে, গাড়ি থেকে নামলো পিটার আর যোশেফ।

সেই চোখ

সন্ধ্যা সাড়ে ছটা। বাইবেল পড়ছেন ফাদার। সাক্সেসন সার্টিফিকেট ভাঁজ করে ছোট টেবিলে রাখলো পিটার, ব্যান্ডো কোথায় ফাদার? ক্লান্ত দেখাচ্ছিল পিটারকে, যা ঝামেলা, সার্টিফিকেট বার করতেই মাস খানেক লেগে গেল।

বাইরে পায়ের শব্দ, ফাদার বললেন, নিশ্চয়ই ব্যান্ডো আসছে।

যোশেফ এসে দাঁড়ালো, ব্যান্ডো নয়, ডেভিড ডিসুজা, মিঃ পিটার স্যার।—হি ওয়ান্টস টু মিট ইউ।

ডেভিড ডিসুজা! বিস্ময়ের গলা পিটারের।

ঘরে ঢুকে পড়েছে তখন আগন্তুক। ফাদার অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। সেই লোক যার ফটো একটু আগে ব্যান্ডো দেখিয়েছিল, এই-ই জাল চিঠি নিয়ে এসেছিল। সেই অদ্ভুত চোখ, কাঁচাপাকা চুল, দাড়ি। ভয়ঙ্কর দৃষ্টি।

যোশেফ বললো, বসুন ডেভিড সাহেব, কী খাবেন চা না কফি?

কফি প্লিজ, চিনি নয় কিন্তু। গুড ইভিনিং ফাদার, আবার দেখা হলো। আর আপনি তো পিটার ডিমেলো, আমায় চিনতে পারছেন না? কী ব্যাপার, ওরকম বড় বড় চোখে তাকাচ্ছেন কেন?

মুহূর্তের ভেতর রিভলবার উঠে এল পিটারের হাতে, আপনি সেই ডাকাত, কুখ্যাত অপরাধী! নড়বার চেষ্টা করবেন না ডেভিড, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবেন।

সশব্দে হাসল ডেভিড, উত্তেজিত হচ্ছেন কেন পিটার! আপনার এত রাগ কেন? ডেভিডকে চেনেন নাকি? বলতে বলতে মাথা নিচু করে কন্টাক্ট লেন্স খুলে ফেলে তাকালো, চোখ আর মণির রঙ পাল্টে ফেলেছিলাম, এবার চোখের দিকে তাকান, আসল চোখ দেখুন। পরচুলা খুলে ফেলল ডেভিড একটানে।

ফাদারের বিস্ময়ের কণ্ঠ, ব্যান্ডো, তুমি!

ইয়েস ফাদার, আমি। গলার স্বরও পালটে দিয়েছিলাম। দুজনেই বোকা বনে গেছলেন। হাসছে ব্যান্ডো, ফটো দেখলে যে কোনো রূপে সাজতে পারি—এবার নিশ্চয়ই বুঝলেন ডেভিড আর ব্যান্ডো একই লোক। সাজপোশাক আলাদা।

বুলেটপ্রুফ জামাটা উল্টে পরেছিল ব্যান্ডো, এবার সোজা করে নিল। ডিপ মেরুন কালার থেকে নেভি ব্লু রং এখন। আগের মতন। ব্যান্ডো বলছিল, পিটার সাব, ওপরে তিনতলায় রেস্ট নিন, ধকল আপনার কম যায়নি। আমাকে সারারাত জাগতে হবে। আজ রনির ডেডবডি তোলা হবে কবর থেকে। আপনিও সাবধানে থাকবেন। মনে রাখবেন ইয়োর লাইফ ইজ অলসো ইন ডেঞ্জার। শত্রুপক্ষ আপনাকে ছাড়বে না, আপনি অনেক খবর জানেন। বলে যদি দেন তাহলে ওদের ক্ষতি।

আই ডোন্ট কেয়ার, সব আপনাকে বলেছি।

না, না, সাবধানের মার নেই। তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এই পুরো জায়গা এখন আন্ডার আর্মি কমান্ড। মাছি গলার উপায় নেই।

ফাদার বললেন, এবার আমায় উঠতে হচ্ছে সাটাজিত, ঈশ্বরের আশীর্বাদে সত্য নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে।

হতাশ দেখাচ্ছিল পিটারকে। বিধ্বস্ত চেহারা, আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

যোশেফ ঘরে ঢুকলো সঙ্গে সঙ্গে। ব্যান্ডো বললো, থ্যাঙ্কস যোশেফ, তুমি খাবারের সঙ্গে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিও। সকাল ৮টার আগে যাতে ঘুম না ভাঙে পিটারের। জাল গুটিয়ে এনেছি। কাল ফাইনাল রাউন্ড।

ও. কে. স্যার।

মৃত্যু না হত্যা?

সকাল ৯টা। ড্রয়িং রুমে সোফায় গা এলিয়ে বসে ব্যান্ডো। একদিকে ফাদার এলবার্ট, অপরদিকে পিটার। ঘরে জমাট নিস্তব্ধতা। কথা নেই কারো মুখে।

রাতজাগা ব্যান্ডোর চোখে ক্লান্তির ছাপ নেই। বাইরের কবরখানার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল। বোঝার উপায় নেই কত কাণ্ড ঘটে গেছে রাত্তিরে। সামরিক বিভাগের বিশেষ প্রক্ষিণপ্রাপ্ত কুকুর—লিভিং মেটাল ডিটেকটার—দাপিয়ে বেরিয়েছে সারা জায়গা জুড়ে। গন্ধ শুঁকেছে, দাঁড়িয়েছে, ছুটেছে। জোয়ানরা খুঁড়ে ফেলেছে মাটি—উঠে এসেছে নানা ধরনের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র। মেশিনগান থেকে রকেট লঞ্চার, আর. ডি. এক্স-এর বাক্স—কলকাতা উড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কৃষ্ণপক্ষের রাত্তিরে নাইট ভিশন চশমা পরে জওয়ানরা কাজ সেরেছে। অপারেশন এক্স সম্পূর্ণ। গুপ্ত অস্ত্রভাণ্ডার থেকে গাড়ি বোঝাই অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে গেলেন যখন ব্রিগেডিয়ার সিং তখন রাত তিনটে। অন্যদিকে আর্মির ডাক্তাররা কবর থেকে তোলা রনির ডেডবডি তুলে ছবি তুলেছেন বার বার। কী আশ্চর্য! মৃতদেহে পচন নেই! কোঁচকানো চামড়ায়, ফ্যাকাশে চোখমুখে মমি হয়ে শুয়ে আছে রনি। ধবধবে সাদা চুল।

...রাত চারটায় জ্বলে উঠেছিল সার্চ লাইটের জোরালো আলো। পোস্টমর্টেম শেষ তখন। সামরিক অভিবাদন সহ বিদায়ের শেষ সুর তখন বিউগেলে। কফিনে ডেডবডি রেখে কবরের সামনে টুপি খুলে দাঁড়ালেন এয়ার মার্শাল—বায়ুসেনার সর্বাধিনায়ক। স্যালুট করলেন। ব্যান্ডো দাঁড়িয়ে ছিল। দ্রুত মেরামত করা হলো সব জায়গা। নতুন করে ঠিক করা হলো ক্ষতিগ্রস্ত কবরস্থান। ফিরিয়ে দেওয়া হলো সেই আগের চেহারা। ব্যান্ডো দাঁড়িয়ে ছিল অশ্রুসজল চোখে—বুকের ভেতর অব্যক্ত এক যন্ত্রণা। ফৌজিরা ফিরে গেল ঠিক পাঁচটায়। ঘড়ির মাইক্রোফোনে মেসেজ পাঠালো ব্যান্ডো—দিল্লীর সদর দপ্তর—ইয়েস ব্যান্ডো স্পিকিং, অপারেশন এক্স ওভার—মিশন সাক্সেসফুল, ইয়েস মার্ডার। আর্সেনিক। কালকের ঘটনা চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিলো।

প্রথম পিটার মুখ খুললো, এত কাণ্ড ঘটে গেছে বুঝতেই পারিনি। কেস অব মার্ডার? কী বলছেন আপনি?

ব্যান্ডোর কণ্ঠস্বর শান্ত, হ্যাঁ খুন। গুপ্ত অস্ত্রভাণ্ডারের খবর আগেই পেয়েছিল রনি। অপরাধীকে চিনতেও পেরেছিল। কিন্তু তখন আর তার কথা বলার শক্তি নেই। তার আগেই ব্রেকফাস্টের দুধে আর্সেনিকের মারণ-ডোজ মিশিয়ে দিয়েছে খুনী। আমরা তাকে সনাক্ত করেছি পিটার। ক্লোজ সার্কিট টিভিতে দিল্লীতে বসেই দেখেছি।

হু ইজ দ্যাট মার্ডারার? টেবিলে ঘুষি মেরে চেঁচিয়ে উঠল পিটার, আই ওয়ান্ট টু কিল হিম। হি মাস্ট বি অ্যান এজেন্ট অব আই. এস. আই।

ঠিক বলেছেন। তিনি ভারতীয় কিন্তু দেশদ্রোহী। আগে আমার কথাটা শেষ করতে দিন, আপনার কাছ থেকে পাওয়া রনির চুল আর নখে পাওয়া গেছে আর্সেনিক—লিথাল ডোজ। খুনী সেই মিঃ ডেভিড, বিদেশী এজেন্ট। ছাত্র সেজে পি. এইচ. ডি. করার ছুতোয় আপনার কাছে আই মিন পিটার ডিমেলোর সঙ্গে মিশে গেল। নতুন গবেষণা—'ট্রু স্টোরি অব সেভেন ফাইভ এইট্টিন টুয়েন্টি ওয়ান, এ ডেথ অব অ্যান এম্পারার।' নেপোলিয়নের মৃত্যু-রহস্যের উপর আলোকপাত। বই হয়ে বোধহয় বেরিয়ে গেছে এতদিনে।

সিগ্রেট ধরালো ব্যান্ডো, লাকি বসে আছে পিটারের পেছনে, গোঁ গোঁ করে উঠছে বার বার। আক্রোশের গলা। উঠে দাঁড়ালো লাকি, সেই ব্রিফকেসটার হাতল মুখে করে ব্যান্ডোর পাশে রাখলো।

থ্যাঙ্কস মাই ফ্রেন্ড, ব্রিফকেসটা এগিয়ে দিল পিটারের দিকে ব্যান্ডো, এটা চিনতে পারেন—কম্বিনেশন লক, দেখুন না যদি খুলতে পারেন।

এর নাম্বার আমার জানার কথা নয় কর্নেল।

দৃঢ় কণ্ঠস্বর ব্যান্ডোর, আপনি নেপোলিয়ন বিশেষজ্ঞ—'ট্রু স্টোরি' বই লিখেছেন। নিশ্চয়ই পারবেন, ইয়েস ইউ নো দ্য নাম্বার। কালপ্রিট আপনার মতোই নেপোলিয়ন ভক্ত, সাহায্য করেছে বই লেখায়। এই কেসটা ডেভিডের।

তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? সে খুনী, ব্যাঙ্ক ডাকাত।

কী করে জানলেন খুনী, কাকে খুন করেছে? রনিকে? আপনাকেও খুন করার চেষ্টা করেছিল নাকি? বলুন, খুলে বলুন।

ম্লান হাসি পিটারের, যখন অপরাধী ধরেই ফেলেছেন, আমাকে বলতে হবে কেন, এই কম্বিনেশন লকের সুন্দর গল্প বানাতে পারেন—এখন হয়তো বলেই বসবেন আমিই অপরাধী, খুন করেছি রনিকে, নেপোলিয়নের মতো, আর্সেনিক প্রয়োগে।

ফাদার বাইবেল পড়ছেন, এবার তাকালেন, পিটার মাই সান, কিছু জানলে বল, ঈশ্বরের কাছে কেঁদে বললে তিনি সব ক্ষমা করে দেন।

ব্যান্ডো বলে উঠলো, রাইট ফাদার, তিনি ক্ষমা করেন—করুণাময় অথচ কঠোর! তাঁর কাছে

সবই ধরা পড়ে। যাক্‌গে পিটার সাহেব, কালপ্রিট হিসাবে আপনাকে মিন করছি না, আপনি রনির ভাই, আপনার কথা আলাদা। সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম। রনির হত্যাকারী এখন হাতের মুঠোয়।

সিগ্রেটটা নিভিয়ে গ্লাসের জলে চুমুক দিল ব্যান্ডো, অতি চালাকির গলায় দড়ি—পচা শামুকে মাঝে মাঝে পা কাটে। সেই নতুন বইটায় নেপোলিয়নের মৃত্যুরহস্য রয়েছে—তারিখটা মনে করুন—এবার নাম্বার ঘোরান। ৬টা নাম্বার—কী! মনে হচ্ছে ভুলে গেছেন। আমি সেই ৭।৫।১৮২১-এ ঘুরিয়ে দিচ্ছি—এই যে খুলে গেছে ব্রিফকেস। নেপোলিয়নের মৃত্যুদিন—ডেথ অব এম্পারার।

চমকে উঠলো পিটার, এত টাকা! ভাবাই যায় না!

আপনার আলমারিতে বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে আরো আছে পিটার। ব্রিফকেসের ডালার ভেতরে আঙুলের ছাপ, বইয়ের টাকায় ছাপ, রনিকে যে গ্লাসে দুধে লিথাল ডোজ আর্সেনিক দেওয়া হয়েছিল সেখানেও ছাপ পাওয়া গেছে।

কর্নেল, মুখে হাসি পিটারের, ছাপ দিয়ে কি আসে যায়, নিশ্চয়ই ডেভিডের সঙ্গে মিলে গেছে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানেন হাতের ছাপে আমরা সবাই আলাদা। একজনের সঙ্গে আরেকজনের মেলে না। কিন্তু ফিঙ্গার প্রিন্টগুলো একই ব্যক্তির, আপনি যখন এখানে তখন ডেভিড হাওয়া হয়ে গেছে। রনিকে দুধ রোজ সকালে আপনি দিতেন অথচ গ্লাসে ডেভিডের আঙুলের ছাপ কি করে এলো সেটাই রহস্য।

খুব সোজা কর্নেল, বোধহয় ছদ্মবেশে এসেছিল।

তাহলে ডেভিড পিটার সাজতে পারে, প্রয়োজন হলে পিটার ডেভিড—তাই না?

পিটার ছটফট করছিল, কথা ঘুরোতে চাইছে, আমাকে একটু লিগাল অ্যাডভাইসারের কাছে যেতে হবে কর্নেল। সার্টিফিকেট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো, হাউ টু সেল দ্য প্রপার্টি।

ঐ সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলে দিন পিটার।

কেন?

ফাদার বললেন, রনির উইল আমার কাছে, অলরেডি রেজিস্টার্ড। এই সব জমি জায়গা বাড়ি সব এখন চার্চের সম্পত্তি, সোসাইটি অব জেসুইট্‌স অনাথ আশ্রম বানাবে, হোম ফর দ্য হোমলেস—

ব্যান্ডো বললো, আই. এস. আই এজেন্টদের কাছে এ জায়গাটা ছিল আদর্শ স্থান। আপনি সাক্সেসন সার্টিফিকেট পেলে ওদের সুবিধা হতো, গুপ্ত অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুলতই। আর এটা হয়ে উঠতো বিদেশী এজেন্টদের স্বর্গরাজ্য। অলরেডি তাই হয়ে গেছলো। আপনিও খুন হয়ে যেতেন একদিন।

কথাগুলোয় পাত্তা দিল না পিটার, বাঃ চমৎকার গল্প। সুন্দর বলতে পারেন—রনি আমার ভাই, ওর সঙ্গে শেষের দিকে কত কথাই না হয়েছে। ডেভিড কিংবা অস্ত্রভাণ্ডার সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু বলতো—

না, বলার মতো অবস্থায় ছিল না, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, যে কোনো লোক নিজেকে পিটার বলে পরিচয় দিলে মেনে নিত।

হোয়াট ডু ইউ মিন, আমি পিটার নই? শুনুন ফাদার, কর্নেল কীসব বলছে—

মাই সান, গত পাঁচ বছর ধরে আমি এখানে, তোমায় প্রথম দেখলাম। আগে চিনতাম না। যার চেনার কথা সে রনির শোকে পাগল—তোমাকে পিটার বলে মানতে চায় না, তাড়া করে। হ্যাঁ, আমি লাকির কথা বলছি। সুদীর্ঘকাল পরে দেখলেও কুকুরের চেনার ক্ষমতা প্রশ্নাতীত।

পিটার চুপ, জানি না আপনাদের কি উদ্দেশ্য, আমাকে ফাঁসিয়ে কী লাভ? কর্নেল, আসল কথা খুলে বলুন। আমি আসতামই না, ফাদারের তার পেয়েই এসেছি—

হ্যাঁ পিটার—চোরের মায়ের সবসময়ই বড় গলা। আগে আমায় বলতে দিন। রনি হত্যার ছক বছর চারেক আগেই কষা হয়েছিল। ডেভিডকে ছাত্র সাজিয়ে পাঠানো হলো পিটারের কাছে। দারুণ

ভাবে মিশে গেল ডেভিড। ও এদিককারই ছেলে। থিসিসের নাম করে কাছের মানুষ হয়ে গেল পিটারের। উদ্দেশ্য অন্য। তার স্যার পিটার ডিমেলো আসলে আমাদের গুপ্তচর। ওঁর কাছ থেকে বিদেশী চক্রান্তের খবর নিয়মিত পেতাম। ম্যাপে দেখবেন এ জায়গাটার কী ইমপর্টেন্স। দেশপ্রেমিক ডিমেলো পরিবারের বাড়ি আই. এস. আই-এর সদর দপ্তর হলে অনেক সুবিধা। কারও সন্দেহ হবে না। তক্কে তক্কে ছিল ডেভিড। রনির অসুস্থতার খবর ডেভিডের হাতে পৌঁছেছিল—তার আগে অবশ্য এখানকার সব জেনে নিয়েছে ও। তিল তিল করে জায়গাটাকে গুপ্ত অস্ত্রাগার এবং অস্ত্র বেচাকেনার টাকার স্বর্গ করে তুলেছিল। আর ডেভিড ছিল কালার ব্লাইন্ড, মিঃ পিটার, আপনিও কালার ব্লাইন্ড—সেই অপরাধী।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো পিটার, দু'হাতে দুটো রিভলভার, একটা যোশেফ আরেকটা ফাদারের দিকে, ইয়েস আমিই ডেভিড। বিদেশী এজেন্ট। রনির ভাই সেজে এসেছিলাম, পিটার এখন আমাদের হাতে বন্দী। রনি আর লাকি আমায় ধরে ফেলেছিল। রনিকে বলার সুযোগ দিইনি, তার আগেই সরিয়ে দিয়েছি। আমায় যেতে দিন, না হলে এ দুজন খুন হয়ে যাবে। ব্যান্ডো—কম মেহনত করিনি, পিটারের আস্থা অর্জনের জন্য। নেপোলিয়ন গুলে খেয়েছি। জানি এই এলাকাটার জলে আর্সেনিক, রনির মৃত্যুতে সন্দেহ হবে না কারো। আর সাতটা দিন সময় পেলেই সব অস্ত্র, টাকা-পয়সা পাচার করে এখানকার মালিক হয়ে যেতাম—খুন করে ফেলতাম পিটারকে।

হেসে উঠলো ব্যান্ডো, হাতের অস্ত্র ফেলে দিন ডেভিড, ওদের দুজনকে খুন করতে পারেন, আমায় পারবেন না—আমার বুলেটপ্রুফ জামা আর শরীরে রয়েছে পাতলা কৃত্রিম চামড়ার ইলেকট্রনিক আস্তরণ। গুলি লাগে না—ইজরায়েলে তৈরি। ডবল প্রোটেকশন বলতে পারেন। আর বেরোবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ। বেরুটে সমুদ্রের ধারে নির্জন জায়গায় পিটারকে বন্দী করে রেখেছেন? বাঁচিয়ে রেখেছেন এখনও? কিন্তু কোনো লাভ নেই। মরে গেলেও পিটার মুখ খুলবে না। বলবে না বর্ডারের কোথায় কোথায় ক্ষেপণাস্ত্র বসানো আছে।

লাফ দিয়ে হঠাৎই ডেভিডের ঘাড় কামড়ে ধরল লাকি। এক ঝটকায় বসে পড়ল ডেভিড, ট্রিগার টিপল—

লাভ নেই ডেভিড। একটা গুলিও নেই আপনার অস্ত্রে, যোশেফ আগেভাগে সব সরিয়ে ফেলেছে। তবে আপনি দারুণ অভিনয় জানেন, ভালোই হলো স্বীকার করলেন। আমি সব জানতাম। গল্প ফাঁদতে হয়েছিল ঠিকই, সেটা কাচের জার মানে রনির চুল আর নখ হাতাবার জন্যে। মাস দুয়েক ধরে আপনি এখানে। বাইরের কোনো খবর পাচ্ছেন না। আপনার শক্তিশালী ওয়ারলেস যন্ত্রটাও খারাপ করে রেখেছে যোশেফ। তা না হলে ধরে ফেলতেন পিটার এখন মুক্ত। ইজরায়েলের আর্মি ইনটেলিজেন্সের সাহায্যে কমান্ডোরা নির্জন গুপ্ত স্থান থেকে তুলে নিয়ে এসেছে পিটারকে। আপনার গোটা দশেক শাগরেদ মারা গেছে। পিটার এখন তেল আবিবে, ভালো আছে। আমিও সেই অপারেশনে ছিলাম। ওখান থেকেই এসেছি ডেভিড সাহেব ওরফে নকল পিটারকে গ্রেপ্তার করতে—বড় বড় শ্বাস ফেলছে ব্যান্ডো, হাতে রিভলবার।

এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন ডেভিড, দেশদ্রোহিতার শাস্তি মৃত্যু—আমি পাঁচ গুনছি, যিসাসের কাছে পাপ স্বীকার করুন—ওয়ান, টু, থ্রি...., হঠাৎ থেমে গেল ব্যান্ডো, না, আপনাকে মারবো না, আমার একটা গুলির মূল্য আপনার মতো ঘৃণ্য লোকের জীবনের চেয়েও বেশি।

ফাদার বললেন, আইন নিজের হাতে তুলে নিও না ব্যান্ডো, দেখলে তো ঈশ্বর আছেন, তিনি ধরিয়ে দিলেন, শাস্তি তিনিই দেবেন।

বাইরের জিপ থেকে ভারী পায়ের শব্দে ঘরে ঢুকে পড়েছেন তখন পুলিশ কমিশনার মিঃ ইসলাম, সঙ্গে ফৌজি পুলিশ। ব্যান্ডো বললো, ডেভিডকে মারলে তোমাদের গুপ্ত খবর আর পাবে না—কাইন্ডলি অ্যারেস্ট হিম মিঃ ইসলাম, যা বলবার উনি আদালতে বলবেন।

[শারদীয়া ১৪০৫]